তাফসীর ইব্‌ন কাসীর

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড

মূলঃ
হাফিয ইমাদুদ্দিন ইব্‌ন কাসীর (রঃ)
অনুবাদঃ ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

Contents

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড

(সূরা ১ ঃ ফাতিহা এবং সূরা ২ ঃ বাকারাহ)

মূল ঃ হাফিয আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইব্‌ন কাসীর (রহঃ)

অনুবাদ ঃ ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান

(সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক পুর্নলিখিত)

www.almodina.com

প্রকাশক ঃ
তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি
(পক্ষে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান)
বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮
গুলশান, ঢাকা ১২১২

প্রথম প্রকাশ ঃ
রামাযান ১৪০৬ হিজরী
মে ১৯৮৬ ইংরেজী

সর্বশেষ মুদ্রণ ঃ
জমাদিউল আউওয়াল ১৪৩৫ হিজরী
মার্চ ২০১৪ ইংরেজী

পরিবেশক ঃ
হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী
৩৮ নর্থ সাউথ রোড, বংশাল, ঢাকা
ফোন ঃ ৭১১৪২৩৮
মোবাইল ঃ ০১৯১-৫৭০৬৩২৩
০১৬৭-২৭৪৭৮৬১

বিনিময় মূল্য ঃ ৳ ৪৫০/- মাত্র।

যার কাছে আমি পেয়েছিলাম তাফসীর সাহিত্যের মহতী শিক্ষা এবং যিনি ছিলেন এ সব ব্যাপারে আমার প্রাণ-প্রবাহ, আমার সেই শ্রদ্ধাস্পদ আব্বা মরহুম অধ্যাপক আবদুল গনীর নামে আমার এই শ্রম-সাধনা ও অনূদিত তাফসীরের অবিস্মরণীয় অবিচ্ছেদ্য স্মৃতি জড়িত থাকল।

ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান

সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির সদস্যবৃন্দ

১। ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান
বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮
গুলশান, ঢাকা ১২১২
টেলিফোন ঃ ৮৮২৪০৮০

২। মোঃ আবদুল ওয়াহেদ
বাসা নং-৫৮, সড়ক নং-২৮
গুলশান, ঢাকা-১২১২
টেলিফোন ঃ ৮৮২৪০৮০

৩। ইউসুফ ইয়াসীন
২৪ কদমতলা
বাসাবো, ঢাকা ১২১৪
মোবাইল ঃ ০১৫৫২-৩২৩৯৭৫

৪। মুহাম্মদ ওবায়দুর রহমান
মুজীব ম্যানশন
বিনোদপুর বাজার, রাজশাহী ৬২০৬

৫। মোঃ মোফাজ্জল হোসেন
সহ-অধ্যক্ষ, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া,
যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর (৯ খন্ডে সমাপ্ত)

১। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড

১। সূরা ফাতিহা, ৭ আয়াত, ১ রুকু (পারা ১)
২। সূরা বাকারাহ, ২৮৬ আয়াত, ৪০ রুকু (পারা ২-৩)

২। চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম খন্ড

৩। সূরা আলে ইমরান, ২০০ আয়াত, ২০ রুকু (পারা ৩-৪)
৪। সূরা নিসা, ১৭৬ আয়াত, ২৪ রুকু (পারা ৪-৬)
৫। সূরা মায়িদাহ, ১২০ আয়াত, ১৬ রুকু (পারা ৬-৭)

৩। অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ খন্ড

৬। সূরা আন‘আম, ১৬৫ আয়াত, ২০ রুকু (পারা ৭-৮)
৭। সূরা ‘আরাফ, ২০৬ আয়াত, ২৪ রুকু (পারা ৮-৯)
৮। সূরা আনফাল, ৭৫ আয়াত, ১০ রুকু (পারা ৯-১০)
৯। সূরা তাওবাহ, ১২৯ আয়াত, ১৬ রুকু (পারা ১০-১১)
১০। সূরা ইউনুস, ১০৯ আয়াত, ১১ রুকু (পারা ১১)

৪। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ খন্ড

১১। সূরা হুদ, ১২৩ আয়াত, ১০ রুকু (পারা ১১-১২)
১২। সূরা ইউসুফ, ১১১ আয়াত, ১২ রুকু (পারা ১২-১৩)
১৩। সূরা রা‘দ, ৪৩ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৩)
১৪। সূরা ইবরাহীম, ৫২ আয়াত, ৭ রুকু (পারা ১৩)
১৫। সূরা হিজর, ৯৯ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৪)
১৬। সূরা নাহল, ১২৮ আয়াত, ১৬ রুকু (পারা ১৪)
১৭। সূরা ইসরা, ১১১ আয়াত, ১২ রুকু (পারা ১৫)

৫। চর্তুদশ খন্ড

১৮। সূরা কাহফ, ১১০ আয়াত, ১২ রুকু (পারা ১৫-১৬)
১৯। সূরা মারইয়াম, ৯৮ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৬)
২০। সূরা তা-হা, ১৩৫ আয়াত, ৮ রুকু (পারা ১৬)
২১। সূরা আম্বিয়া, ৭ আয়াত, ১ রুকু (পারা ১৭)
২২। সূরা হাজ্জ, ৭ ৮আয়াত, ১০ রুকু (পারা ১৭)

৬। পঞ্চদশ খন্ড

২৩। সূরা মু’মিনূন, ১১৮ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৮)

২৪। সূরা নূর, ৬৪ আয়াত, ৯ রুকু (পারা ১৮)
২৫। সূরা ফুরকান, ৭৭ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৯)
২৬। সূরা শুআরা, ২২৭ আয়াত, ১১ রুকু (পারা ১৯)
২৭। সূরা নামল, ৯৩ আয়াত, ৭ রুকু (পারা ১৯-২০)
২৮। সূরা কাসাস, ৮৮ আয়াত, ৯ রুকু (পারা ২০)
১৯। সূরা আনকাবূত, ৬৯ আয়াত, ৭ রুকু (পারা ২০-২১)
৩০। সূরা রূম, ৬০ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ২১)
৩১। সূরা লুকমান, ৩৪ আয়াত, ৪ রুকু (পারা ২১)
৩২। সূরা সাজদাহ, ৩০ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২১)
৩৩। সূরা আহযাব, ৭৩ আয়াত, ৯ রুকু (পারা ২১-২২)

৭। ষষ্ঠদশ খন্ড

৩৪। সূরা সাবা, ৫৪ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ২২)
৩৫। সূরা ফাতির, ৪৫ আয়াত, ৫ রুকু (পারা ২২)
৩৬। সূরা ইয়াসীন, ৮৩ আয়াত, ৫ রুকু (পারা ২২-২৩)
৩৭। সূরা সাফফাত, ১৮২ আয়াত, ৫ রুকু (পারা ২৩)
৩৮। সূরা সা'দ, ৮৮ আয়াত, ৫ রুকু (পারা ২৩)
৩৯। সূরা যুমার, ৭৫ আয়াত, ৮ রুকু (পারা ২৩-২৪)
৪০। সূরা গাফির বা মু'মীন, ৮৫ আয়াত, ৯ রুকু (পারা ২৪)
৪১। সূরা ফুসসিলাত, ৫৪ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ২৪-২৫)
৪২। সূরা শূরা, ৫৩ আয়াত, ৫ রুকু (পারা ২৫)
৪৩। সূরা যুখরূফ, ৮৯ আয়াত, ৭ রুকু (পারা ২৫)
৪৪। সূরা দুখান, ৫৯ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৫)
৪৫। সূরা জাসিয়া, ৩৭ আয়াত, ৪ রুকু (পারা ২৫)
৪৬। সূরা আহকাফ, ৩৫ আয়াত, ৪ রুকু (পারা ২৬)
৪৭। সূরা মুহাম্মাদ, ৩৮ আয়াত, ৪ রুকু (পারা ২৬)
৪৮। সূরা ফাত্‌হ, ২৯ আয়াত, ৪ রুকু (পারা ২৬)

৮। সপ্তদশ খন্ড

৪৯। সূরা হুজুরাত, ১৮ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৬)
৫০। সূরা কাফ, ৪৫ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৬)
৫১। সূরা যারিয়াত, ৬০ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৬-২৭)
৫২। সূরা তূর, ৪৯ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৭)

৫৩। সূরা নাজম, ৬২ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৭)
৫৪। সূরা কামার, ৫৫ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৭)
৫৫। সূরা আর রাহমান, ৭৮ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৭)
৫৬। সূরা ওয়াকিয়া, ৯৬ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৭)
৫৭। সূরা হাদীদ, ২৯ আয়াত, ৪ রুকু (পারা ২৭)
৫৮। সূরা মুজাদালা, ২২ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৮)
৫৯। সূরা হাশর, ২৪ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৮)
৬০। সূরা মুমতাহানা, ১৩ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৮)
৬১। সূরা সাফ্ফ, ১৪ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৮)
৬২। সূরা জুমু‘আ, ১১ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৮)
৬৩। সূরা মুনাফিকূন, ১১ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৮)
৬৪। সূরা তাগাবুন, ১৮ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৮)
৬৫। সূরা তালাক, ১২ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৮)
৬৬। সূরা তাহরীম, ১২ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৮)
৬৭। সূরা মুল্ক, ৩০ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯)
৬৮। সূরা কালাম, ৫২ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯)
৬৯। সূরা হাক্কাহ, ৫২ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯)
৭০। সূরা মা‘আরিজ, ৪৪ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯)
৭১। সূরা নূহ, ২৮ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯)
৭২। সূরা জিন, ২৮ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯)
৭৩। সূরা মুযযাম্মিল, ২০ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯)
৭৪। সূরা মুদদাসসির, ৫৬ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯)
৭৫। সূরা কিয়ামাহ, ৪০ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯)
৭৬। সূরা দাহর বা ইনসান, ৩১ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯)
৭৭। সূরা মুরসালাত, ৫০ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯)

৯। অষ্টাদশ খন্ড

৭৮। সূরা নাবা, ৪০ আয়াত, ২ রুকু (পারা ৩০)
৭৯। সূরা নাযিয়াত, ৪৬ আয়াত, ২ রুকু (পারা ৩০)
৮০। সূরা আবাসা, ৪২ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৮১। সূরা তাকভির, ২৯ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৮২। সূরা ইনফিতার, ১৯ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)

৮৩। সূরা মুতাফফিফিন, ৩৬ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৮৪। সূরা ইনসিকাক, ২৫ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৮৫। সূরা বুরূজ, ২২ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৮৬। সূরা তারিক, ১৭ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৮৭। সূরা ‘আলা, ১৯ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৮৮। সূরা গাসিয়া, ২৬ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৮৯। সূরা ফাজ্‌র, ৩০ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৯০। সূরা বালাদ, ২০ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৯১। সূরা শাম্‌স, ১৫ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৯২। সূরা লাইল, ২১ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৯৩। সূরা দুহা, ১১ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৯৪। সূরা ইনসিরাহ, ৮ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৯৫। সূরা তীন, ৮ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৯৬। সূরা আলাক, ১৯ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৯৭। সূরা কাদর, ৫ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৯৮। সূরা বাইয়িনা, ৮ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
৯৯। সূরা যিলযাল, ৮ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১০০। সূরা আদিয়াত, ১১ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১০১। সূরা কারিয়াহ, ১১ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১০২। সূরা তাকাছুর, ৮ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১০৩। সূরা আসর, ৩ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১০৪। সূরা হুমাযাহ, ৯ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১০৫। সূরা ফীল, ৫ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১০৬। সূরা কুরাইশ, ৪ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১০৭। সূরা মাঊন, ৭ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১০৮। সূরা কাওছার, ৩ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১০৯। সূরা কাফিরূন, ৬ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১১০। সূরা নাস্‌র, ৩ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১১১। সূরা লাহাব বা মাসাদ, ৫ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১১২। সূরা ইখলাস, ৪ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১১৩। সূরা ফালাক, ৫ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)
১১৪। সূরা নাস, ৬ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ৩০)

সূরা	পারা	পৃষ্ঠা
সূরা ফাতিহা	(পারা-১)	৬৩-১১১
সূরা বাকারাহ	(পারা-১)	১১২-৪০১
সূরা বাকারাহ	(পারা-২)	৪০১-৬৩৪
সূরা বাকারাহ	(পারা-৩)	৬৩৪-৭১১
তাফসীরের বিভিন্ন খন্ডে বর্ণিত বিশেষ বিশেষ বিষয়সমূহ		৭১২-৭২৪

সূচীপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা
* প্রকাশকের আরয	২৭
* অনুবাদকের আরয	২৯
* ইমাম ইব্‌ন কাসীরের (রহঃ) জীবনী	৩৫
* অনুবাদক পরিচিতি	৪৩
* সূচনা	৪৭
* কিভাবে কুরআনের তাফসীর করতে হবে	৫১
* ইসরাঈলী বর্ণনা ও কিচ্ছা-কাহিনী	৫৪
* তাবেঈনগণের তাফসীর প্রসঙ্গ	৫৪
* কারও মতামতের উপর ভিত্তি করে তাফসীর করা	৫৫
* জানা থাকলে বর্ণনা করতে হবে, অন্যথায় চুপ থাকতে হবে	৫৫
* মাক্কী ও মাদানী সূরাসমূহ	৫৭
* কুরআনের আয়াত সংখ্যা	৫৮
* কুরআনের মোট শব্দ ও অক্ষর	৫৮
* কুরআনকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করা হয়েছে	৫৮
* কুরআনুম মাজীদের অংশ বা খন্ড	৫৯
* ‘সূরা’ শব্দের বিশ্লেষণ	৬০
* ‘আয়াত’ শব্দের অর্থ	৬১
* ‘কালেমাহ’ শব্দের অর্থ	৬১
* কুরআনে আরাবী শব্দ ব্যতীত আর কোন শব্দ আছে কি?	৬২
* ‘ফাতিহা’ শব্দের অর্থ এবং এর বিভিন্ন নাম	৬৩
* সূরা ফাতিহায় আয়াত, শব্দ ও অক্ষরের সংখ্যা	৬৪
* সূরা ফাতিহাকে উম্মুল কিতাব বলার কারণ	৬৪
* সূরা ফাতিহার ফাযীলাত	৬৫
* সূরা ফাতিহা ও সালাত আদায় প্রসঙ্গ	৬৭
* আলোচ্য হাদীস সম্পর্কিত আলোচনা	৬৮
* প্রতি রাক‘আতে অবশ্যই সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে	৬৯
* ইসতি‘আযাহ্ বা আ‘উযুবিল্লাহ প্রসঙ্গ	৭০
* কুরআন তিলাওয়াত করার আগে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া	৭২

* রাগান্বিত হলে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে হবে ৭৩
* ইসতি‘আযাহ কি যরুরী ৭৪
* আ‘উযুবিল্লাহ বলার ফাযীলাত ৭৪
* আ‘উযুবিল্লাহর নিগূঢ় তত্ত্ব ৭৫
* শাইতান শব্দটির আভিধানিক বিশ্লেষণ ৭৭
* رَجِيْم শব্দের অর্থ ৭৮
* ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’ কী সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াত ৭৯
* ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’ উচ্চস্বরে পাঠ করা প্রসঙ্গ ৮০
* ‘বিসমিল্লাহ’র ফাযীলাত ৮২
* প্রতিটি কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে হবে ৮৩
* ‘আল্লাহ’ শব্দের অর্থ ৮৩
* আর রাহমানির রাহীম الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ এর অর্থ ৮৫
* حمد শব্দের অর্থ ৮৮
* ‘হাম্‌দ’ ও ‘শোক্‌র’ এর মধ্যে পার্থক্য ৮৯
* ‘হাম্‌দ’ শব্দের তাফসীর ও সালাফগণের অভিমত ৮৯
* ‘আল-হাম্‌দ’ শব্দের ফাযীলাত ৮৯
* ‘হাম্‌দ’ শব্দের পূর্বে ‘আল’ শব্দ প্রয়োগের গুরুত্ব ৯০
* ‘রাব্ব’ শব্দের অর্থ ৯১
* ‘আলামীন’ শব্দের অর্থ ৯১
* সৃষ্টবস্তুকে ‘আলাম’ বলার কারণ ৯২
* বিচার দিনে আল্লাহই একক ক্ষমতার মালিক ৯৩
* ‘ইয়াওমিদ্দীন’ এর অর্থ ৯৪
* আল্লাহই সবকিছুর একচ্ছত্র মালিক ৯৪
* ‘দীন’ শব্দের অর্থ ৯৫
* ইবাদাত শব্দের ধর্মীয় তত্ত্ব ৯৬
* কিছু করার পূর্বে আল্লাহর উপর নির্ভর করার উপকারিতা ৯৬
* সূরা ফাতিহা আল্লাহর প্রশংসা শিক্ষা দেয় ৯৭
* তাওহীদ আল উলুহিয়া ৯৮
* তাওহীদ আর রুবুবিয়াহ ৯৮
* আল্লাহ তাঁর নাবীকে বলেছেন ‘দাস’ ৯৯

* বিপদাপদে আল্লাহর কাছে সাজদাবনত হতে হবে ৯৯
* প্রশংসামূলক বাক্য আগে উল্লেখ করার কারণ ১০০
* সূরায় হিদায়াত শব্দের বিশ্লেষণ ১০০
* সিরাতাল মুস্তাকীম এর বিশ্লেষণ ১০১
* মু'মিনরাই হিদায়াতের আবেদন জানায় ১০২
* সূরা ফাতিহার সার সংক্ষেপ ১০৭
* নি'আমাত হচ্ছে আল্লাহর তরফ হতে দান ১০৮
* 'আমীন' বলা প্রসঙ্গ ১০৯
* সূরা বাকারাহ মাদীনায় অবতীর্ণ ১১২
* সূরা বাকারাহর মাহাত্ম্য ও গুণাবলী ১১৩
* সূরা বাকারাহ ও সূরা আলে ইমরানের বৈশিষ্ট্য ১১৫
* একক অক্ষরসমূহের আলোচনা ১১৭
* একক অক্ষর দিয়ে বিভিন্ন সূরার শুরু ১১৭
* একক অক্ষরগুলি মুজিযা প্রকাশ করছে ১১৮
* কুরআনে সন্দেহের কোন কিছু নেই ১২০
* হিদায়াত তাদের জন্য যাদের রয়েছে তাকওয়া ১২১
* কারা মুত্তাকী ১২২
* দুই ধরনের হিদায়াত রয়েছে ১২৩
* তাকওয়া কী ১২৪
* ঈমান কী ১২৫
* 'গাইব' বলতে কি বুঝায় ১২৬
* 'ইকামাতে সালাত' এর অর্থ ১২৮
* 'ব্যয় করতে হবে' কোথায় ১২৮
* 'সালাত' কী ১২৯
* ঈমানদারদের বর্ণনা ১২৯
* হিদায়াত ও সফলতা শুধু ঈমানদারদের জন্য ১৩২
* 'খাতামা' শব্দের অর্থ ১৩৪
* 'গিসাওয়াতু' কী ১৩৬
* 'মুনাফিক' কারা ১৩৭
* 'নিফাক' কী ১৩৮
* মুনাফিকীর গোড়া পত্তন ১৩৮

* ২ ঃ ৮ নং আয়াতের তাফসীর ১৩৯
* 'পীড়া' শব্দের অর্থ ১৪১
* বিপর্যয় সৃষ্টি করা কী ১৪৪
* মুনাফিকদের বিপর্যয়ের ধরণ ১৪৫
* মুনাফিকদের ধূর্ততা ১৪৮
* মানব ও জিন শাইতান ১৪৮
* উপহাস/তামাসা ১৪৯
* মুনাফিকরা তাদের ষড়যন্ত্রের জন্য শাস্তি পাবে ১৫০
* মুনাফিকদেরকে উদ্ভ্রান্তের মধ্যে ছেড়ে দেয়ার অর্থ কী ১৫১
* মুনাফিকদের ধরণ ১৫৪
* মুনাফিকদের আর এক পরিচয় ১৫৫
* ঈমানদার ও কাফিরের শ্রেণীবিভাগ ১৫৯
* হৃদয়ের প্রকারভেদ ১৬১
* তাওহীদ আল উলুহিয়া ১৬২
* এ বিষয়ের হাদীসসমূহ ১৬৪
* আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ ১৬৬
* নাবী ও নাবুওয়াত সত্য ১৬৮
* একটি চ্যালেঞ্জ ১৬৯
* কুরআনের মুজিযা ১৭১
* কুরআন কাব্য নয় ১৭২
* রাসূলকে (সাঃ) সর্বোচ্চ মুজিযা দেয়া হয়েছে 'আল কুরআন' ১৭৪
* কুরআনে বর্ণিত 'পাথর' কী ১৭৫
* জাহান্নাম কী এখনও বর্তমান ১৭৬
* মু'মিন ব্যক্তিদের প্রতিদান ১৭৮
* জান্নাতের ফল-মূলের সাথে সাযুজ্য ১৭৮
* জান্নাতের স্ত্রীগণ হবেন পুতঃ পবিত্র ১৭৯
* পৃথিবীর জীবন যাপনের সাথে তুলনামূলক আলোচনা ১৮১
* মুনাফিকের লক্ষণ ১৮৬
* 'ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া' কী ১৮৭
* আল্লাহর অস্তিত্ব সম্বন্ধে দলীলসমূহ ১৮৮
* আল্লাহর ক্ষমতা সম্বন্ধে দলীল ১৮৯

Contents

* সৃষ্টির সূচনা ১৮৯
* আসমানের আগে পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছে ১৯১
* জগত সৃষ্টির মোট সময় ১৯২
* আদম-সন্তান বংশ পরম্পরায় পৃথিবীতে বসবাস করছে ১৯৩
* খলিফা/প্রতিনিধি নিয়োগ করার বাধ্য-বাধকতা ১৯৬
* মালাইকার উপর আদমের (আঃ) সম্মান ১৯৮
* একটি সুদীর্ঘ হাদীস ১৯৯
* 'সুবহানাল্লাহ' এর অর্থ ২০১
* আদমের (আঃ) জ্ঞানের পরিচয় প্রদান ২০১
* মালাইকার সাজদাহ দ্বারা আদমকে (আঃ) মর্যাদা দান ২০৩
* আদমকে (আঃ) সাজদাহ করতে বলা হয়েছিল, যদিও তিনি মালাক ছিলেননা ২০৪
* আল্লাহরই জন্য ছিল আনুগত্য, আদমকে (আঃ) সাজদাহ করার মাধ্যমে ২০৪
* আদমকে (আঃ) পুনরায় সম্মানিত করা হয় ২০৬
* আদমের (আঃ) জান্নাতে প্রবেশের পূর্বেই হাওয়াকে (আঃ) সৃষ্টি করা হয় ২০৬
* আল্লাহ আদমকে (আঃ) পরীক্ষা করলেন ২০৭
* আদম (আঃ) ছিলেন অনেক লম্বা ২০৮
* আদম (আঃ) মাত্র এক ঘন্টা জান্নাতে ছিলেন ২০৮
* একটি সন্দেহের নিরসন ২০৯
* আদম (আঃ) অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান ২০৯
* জগতের চিত্র ২১১
* বানী ইসরাঈলকে ইসলামের দিকে আহ্বান ২১৩
* ইয়াকুবের (আঃ) নাম ছিল ইসরাঈল ২১৩
* বানী ইসরাঈলকে আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে ২১৪
* আল্লাহর সাথে বানী ইসরাঈলদের ওয়াদার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে ২১৪
* সত্যকে আড়াল করা কিংবা পরিবর্তন করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ২১৮
* অন্যকে উপদেশ দিয়ে নিজে তা না করার জন্য তিরস্কার ২১৯
* একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য ২১৯
* আমলহীন উপদেশদাতার শাস্তি ২২০
* একটি ঘটনার বর্ণনা ২২১
* ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য লাভ হবে ২২২
* বানী ইসরাঈলকে অসংখ্য নি'আমাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে ২২৫

* মুহাম্মাদের (সাঃ) উম্মাত বানী ইসরাঈলের চেয়ে উত্তম ২২৬
* শাস্তি দানের ভয় প্রদর্শন ২২৭
* কাফিরদের ব্যাপারে কোন সুপারিশ, মুক্তিপণ কিংবা সাহায্য গ্রহণ করা হবেনা ২২৭
* ফিরাউন ও তার সেনাবাহিনী হতে বানী ইসরাঈলকে রক্ষা করা হয়েছিল ২৩১
* আশুরায় সিয়াম পালন করা প্রসঙ্গ ২৩২
* বানী ইসরাঈলের গাভীর পূজা করা ২৩৩
* তাওবাহ কবূল হওয়ার জন্য বানী ইসরাঈলদের একে অন্যকে হত্যা ২৩৪
* বানী ইসরাঈলের যারা আল্লাহকে দেখতে চেয়েছিল তাদের প্রাণ হরণ এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ২৩৬
* আল্লাহর নি'আমাত স্বরূপ মেঘের ছায়া, মান্না ও সালওয়া দান ২৩৮
* 'মান্না' ও 'সালওয়া' এর বিবরণ ২৩৮
* অন্যান্য নাবীর (আঃ) সহচর থেকে সাহাবীগণের (রাঃ) মর্যাদা ২৪০
* সাহায্য প্রাপ্তির পর ইয়াহুদরা কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে আল্লাহদ্রোহী হল ২৪১
* বারটি গোত্রের জন্য বারটি ঝর্ণা দান ২৪৪
* বানী ইসরাঈলরা মান্না, সালওয়ার পরিবর্তে নিকৃষ্ট খাদ্য পছন্দ করল ২৪৫
* বানী ইসরাঈলকে লাঞ্ছনা ও দারিদ্রতা গ্রাস করল ২৪৭
* 'তাকাব্বুর' শব্দের অর্থ ২৪৮
* সৎ আমলকারীগণের জন্য সব সময়েই রয়েছে উত্তম প্রতিদান ২৪৯
* 'মু'মিন' শব্দের অর্থ ২৫০
* 'ইয়াহুদ' এর ইতিহাস ২৫১
* খৃষ্টানদের কেন 'নাসারা' বলা হয় ২৫১
* সাবেঈ দল ২৫২
* ইয়াহুদীদের কাছ থেকে যে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল ২৫৩
* ইয়াহুদীদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং চেহারার পরিবর্তন ২৫৫
* ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ ২৫৬
* যে ইয়াহুদীদের বানর ও শুকরে রূপান্তরিত করা হয়েছিল তাদের বংশধর বর্তমানের বানর ও শুকর নয় ২৫৭
* বানী ইসরাঈলের নিহত ব্যক্তি ও গাভীর ঘটনা ২৫৯
* গাভীর ব্যাপারে ইয়াহুদীদের একগুয়েমীর জন্য আল্লাহ তাদের কাজকে কঠিন করে দেন ২৬১
* নিহত ব্যক্তিকে পুনরায় জীবন দান ২৬৩

* ইয়াহুদীদের কঠোরতা ২৬৫
* কঠিন বস্তু/পাথরের মধ্যে বোধশক্তি আছে ২৬৬
* রাসূলের (সাঃ) জীবদ্দশায় ইয়াহুদীদের ঈমান ছিলনা ২৭০
* রাসূলকে (সাঃ) সত্য নাবী জানা সত্ত্বেও ইয়াহুদীরা তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি ২৭১
* 'উম্মী' শব্দের অর্থ ২৭৩
* সত্যত্যাগী ইয়াহুদীদের জন্য দুর্ভোগ ২৭৪
* ইয়াহুদীদের অলীক কল্পনা যে, তারা মাত্র কয়েক দিন জাহান্নামের আযাব ভোগ করবে ২৭৫
* ছোট ছোট পাপ আস্তে আস্তে বড় ও ধ্বংসাত্মক কাজে প্রবৃত্ত করে ২৭৮
* আল্লাহ বানী ইসরাঈলের নিকট হতে যে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন ২৭৯
* মাদীনার দু'টি বিখ্যাত গোত্রের শান্তি চুক্তি এবং তা ভঙ্গ করা ২৮৩
* বানী ইসরাঈলের অবাধ্যতা এবং নাবীদের হত্যা করা ২৮৫
* জিবরাঈলের (আঃ) অপর নাম রূহুল কুদুস ২৮৭
* ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) হত্যা করতে চেয়েছিল ২৮৮
* ঈমান না আনার কারণে ইয়াহুদীদের অন্তর মোহরাচ্ছাদিত ২৮৮
* রাসূলের (সাঃ) আগমনের পর ইয়াহুদীরা অবিশ্বাস করল, যদিও তারা তাঁর অপেক্ষায় ছিল ২৯০
* অভিশাপের উপর অভিশাপ ২৯২
* ইসলাম কবূল না করেও ইয়াহুদরা ঈমানদার বলে মিথ্যা দাবী করে ২৯৪
* বানী ইসরাঈলের অবাধ্যতার কারণে তাদের মাথার উপর পাহাড় তুলে ধরা হয় ২৯৬
* ইয়াহুদীদের আহ্বান করে বলতে বলা হয়, আল্লাহ যেন মিথ্যাবাদীকে ধ্বংস করেন ২৯৭
* কাফিরেরা চায় যে, তাদেরকে দীর্ঘ জীবন দান করা হোক ৩০০
* ইয়াহুদীরা জিবরাঈলের (আঃ) শত্রু ৩০১
* কোন মালাককে অন্য মালাইকার উপর অগ্রাধিকার দেয়া, কোন নাবীকে অন্য নাবীগণের উপর অগ্রাধিকার দেয়ার মতই ঈমান না আনার পর্যায়ভুক্ত ৩০২
* নাবী মুহাম্মাদের (সাঃ) রিসালাত প্রাপ্তির প্রমাণ ৩০৭
* ইয়াহুদীরা তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছিল ৩০৭
* সুলাইমানের (আঃ) সময়েও যাদু ছিল ৩০৮
* হারূত-মারূতের ঘটনা ৩০৯

* যাদু শিক্ষা করা কুফরী ৩১১
* স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো হয় যাদুর মাধ্যমে ৩১৩
* আল্লাহর নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ট ঘটনা ঘটবেই ৩১৩
* বক্তব্য পেশ করার আদব ৩১৫
* আহলে কিতাব ও কাফিরেরা মুসলিমদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে ৩১৭
* 'নাস্‌খ' এর মূল তত্ত্ব ৩১৮
* 'নাসখ্‌' এর মূলতত্ত্বের উপর মূলনীতির আলেমগণের অভিমত ৩১৯
* আল্লাহ তাঁর আয়াতের পরিবর্তন করেন, যদিও ইয়াহুদীরা তা অবিশ্বাস করে ৩২০
* অধিক জিজ্ঞাসাবাদ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ৩২৩
* আহলে কিতাবীদের অনুসরণ করা যাবেনা ৩২৬
* সৎ কাজের আদেশ দানে উৎসাহ প্রদান ৩২৭
* ইয়াহুদীদের প্রতারণা, আমিত্ব এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাদের ব্যাপারে ভীষণ সতর্ক বাণী ৩২৯
* অহংকার ও বিদ্বেষ বশে ইয়াহুদ ও খৃষ্টানরা একে অপরের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয় ৩৩২
* সবচেয়ে বড় অন্যায় হল লোকদেরকে মাসজিদে আসায় বাধা দেয়া অথবা তাড়িয়ে দেয়া ৩৩৪
* বাইতুল্লাহর বিধ্বস্ত হওয়ার বর্ণনাক্রমিক তালিকা ৩৩৪
* ইসলাম প্রতিষ্ঠিত থাকবেই ৩৩৬
* কিবলাহ নির্ধারণ ৩৩৮
* কুরআন মাজীদে সর্বপ্রথম রহিতকৃত (মানসূখ) হুকুম ৩৩৮
* মাদীনাবাসীদের কিবলাহ হল পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে ৩৪০
* 'মহান আল্লাহর সন্তান-সন্তুতি রয়েছে' এ দাবীর খন্ডন ৩৪১
* সবকিছু আল্লাহর আয়ত্বাধীণ ৩৪৩
* পূর্বে আকাশ ও পৃথিবীর কোন নমুনা ছিলনা ৩৪৪
* এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ ৩৪৬
* তাওরাতে রাসূল (সাঃ) সম্পর্কে বর্ণনা ৩৪৯
* রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) সান্ত্বনা প্রদান ৩৫০
* 'সঠিক তিলাওয়াত' এর অর্থ ৩৫১
* ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন একজন মহান নেতা ৩৫৫

* ইবরাহীমের (আঃ) পরীক্ষা, كَلِمَاتٌ শব্দের তাফসীর এবং
পরীক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর কৃতকার্যতার সংবাদ ৩৫৭
* কোন্ কথাগুলি দ্বারা ইবরাহীম (আঃ) পরীক্ষিত হয়েছিলেন ৩৫৭
* অন্যায় দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়না ৩৫৯
* আল্লাহর ঘরের (কা'বা ঘর) মর্যাদা ৩৬০
* মাকামে ইবরাহীম ৩৬১
* আল্লাহর ঘর পরিস্কার রাখার নির্দেশ ৩৬৫
* মাক্কা হল পবিত্রতম স্থান ৩৬৬
* ইবরাহীম (আঃ) মাক্কাকে নিরাপত্তা ও
উত্তম রিয্কের শহরের জন্য দু'আ করেছিলেন ৩৬৮
* কা'বা ঘর তৈরী এবং ইবরাহীমের (আঃ) আন্তরিক প্রার্থনা ৩৭১
* জনহীন উপত্যকায় 'জারহাম' গোত্রের আগমন ৩৭৩
* প্রিয় পুত্রের সাথে প্রথম সাক্ষাৎ ৩৭৪
* দ্বিতীয় বার সাক্ষাতের চেষ্টা ৩৭৫
* কা'বা ঘর নির্মাণ ৩৭৫
* কা'বা ঘর নতুন করে নির্মাণ ৩৭৬
* কালো পাথর স্থাপন করা নিয়ে বিরোধ ৩৭৮
* রাসূলের (সাঃ) ইচ্ছা অনুযায়ী যুবাইর (রাঃ) কা'বা ঘর পুর্ননির্মাণ করেন ৩৭৯
* কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে এক ইথিওপীয় দ্বারা কা'বা ঘর ধ্বংস হবে ৩৮২
* ইবরাহীমের (আঃ) প্রার্থনা ৩৮৩
* 'মানাসিক' কী ৩৮৪
* সর্বশেষ নাবীর ব্যাপারে ইবরাহীমের (আঃ) প্রার্থনা ৩৮৫
* 'কিতাব ওয়াল হিকমাহ' এর অর্থ ৩৮৬
* নির্বোধরাই ইবরাহীমের (আঃ) সরল পথ থেকে বিচ্যুত ৩৮৭
* আমৃত্যু তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে ৩৯১
* ইয়াকুবের (আঃ) মৃত্যুর সময় নাসীহাত ৩৯২
* আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা এবং
সমস্ত নাবীগণকে মুসলিমরা স্বীকার করে ৩৯৫
* কিবলার পরিবর্তন ও সালাতের দিক নির্দেশনা ৪০২
* উম্মাতে মুহাম্মাদীর মর্যাদা ৪০৫
* কিবলা পরিবর্তনের গভীর বিচক্ষণতা ৪০৮

* কুরআনের আয়াতের প্রথম রহিতকরণ হয় কিবলাহ পরিবর্তনের দ্বারা ৪১২
* কা'বা ঘরই কি কিবলাহ, নাকি ইহা একটি ইশারা ৪১৩
* ইয়াহুদীরা জানত যে, পরে কিবলাহ পরিবর্তিত হবে ৪১৩
* ইয়াহুদীদের একগুয়েমী এবং অবাধ্যতা ৪১৪
* ইয়াহুদীরা রাসূলের (সাঃ) আগমন সত্য জানত, কিন্তু তারা গোপন রাখে ৪১৫
* প্রত্যেক জাতিরই কিবলাহ রয়েছে ৪১৬
* কিবলাহ পরিবর্তনের কথা তিনবার বলার কারণ ৪১৮
* পূর্বের কিবলাহ পরিবর্তনের বিচক্ষণতা ৪১৯
* রাসূল মুহাম্মাদকে (সাঃ) রিসালাত প্রদান
মুসলিমদের জন্য আল্লাহর এক বিরাট নি'আমাত ৪২০
* ধৈর্য ও সালাতের মর্যাদা ৪২৩
* শহীদগণের রয়েছে নি'আমাতপূর্ণ জীবন ৪২৪
* মু'মিনগণ বিপদে ধৈর্য ধারণের জন্য প্রতিদান পেয়ে থাকেন ৪২৬
* বিপদাপদে 'আমরা আল্লাহরই উপর নির্ভরশীল' বলায় উপকারিতা ৪২৬
* 'এতে কোন দোষ নেই' বাক্যটির অর্থ ৪২৮
* সাফা-মারওয়ায় দৌড়ানোয় নিগুঢ়তা (হিকমাত) ৪২৯
* ঐ সমস্ত লোকের উপর আল্লাহর অভিশাপ
যারা ধর্মীয় আদেশ নিষেধ গোপন করে ৪৩২
* অবিশ্বাসীদেরকে অভিশাপ দেয়া যাবে ৪৩৪
* তাওহীদের প্রমাণ ৪৩৬
* দুনিয়া এবং আখিরাতে মুশরিকদের অবস্থা ৪৩৯
* হালাল খাওয়া এবং শাইতানের পদাঙ্ক অনুসরণ না করা ৪৪৪
* মুশরিকরা অন্য মুশরিকদেরই অনুসরণ করে ৪৪৭
* অবিশ্বাসীরা পশুর চেয়েও অধম ৪৪৭
* হালাল খাবার খাওয়া এবং হারাম খাদ্যের বিবরণ ৪৪৮
* বিশেষ অপারগ অবস্থায় নিষিদ্ধ ব্যবস্থা শিথিলযোগ্য ৪৫১
* আল্লাহর আয়াত গোপন করার জন্য ইয়াহুদীদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে ৪৫৩
* খাঁটি বিশ্বাস ও সঠিক পথের শিক্ষা ৪৫৬
* 'সম-অধিকার' আইন এবং এর তাৎপর্য ৪৬১
* কিসাসের উপকারিতা এবং এর অপরিহার্যতা ৪৬৩
* উত্তরাধিকারীদের জন্য অসিয়াত বাতিল করা হয়েছে ৪৬৫

* অসিয়াত তাদের জন্য যারা উত্তরাধিকারী আইনের আওতায় পড়েনা ৪৬৬
* ন্যায়ানুগ অসিয়াত হওয়া উচিত ৪৬৬
* সঠিকভাবে/ন্যায়ানুগ অসিয়াত করার উপকারিতা ৪৬৭
* সিয়াম পালন করার আদেশ ৪৬৯
* বিভিন্ন প্রকার সিয়ামের বর্ণনা ৪৭০
* অসুস্থ ও অক্ষম ব্যক্তির সিয়ামের পরিবর্তে ফিদইয়া প্রদান ৪৭০
* রামাযান মাসের মর্যাদা এবং এ মাসে কুরআন নাযিল হওয়া ৪৭২
* পবিত্র কুরআনের মর্যাদা ৪৭২
* রামযান মাসে সিয়াম পালন করা ফার্‌য ৪৭৩
* সফরে সিয়াম পালন সম্পর্কিত কতিপয় বিধি-বিধান ৪৭৩
* সহজ, কোন কিছু কঠিন করা নয় ৪৭৫
* ইবাদাত করতে হবে আল্লাহর যিক্‌র করার সাথে সাথে ৪৭৫
* আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রার্থনা শুনতে পান ৪৭৭
* আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রার্থনা কবূল করে থাকেন ৪৭৮
* তিন ব্যক্তির প্রার্থনা ফিরিয়ে দেয়া হয়না ৪৭৯
* রামাযানের রাতে পানাহার ও স্ত্রী গমন করা যাবে ৪৮০
* সাহরী খাওয়ার শেষ সময় ৪৮২
* সাহরী খাওয়ার নির্দেশ ৪৮৩
* 'যুনুব' অবস্থায় সিয়াম শুরু করা যাবে ৪৮৪
* সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করতে হবে ৪৮৫
* একাধিক্রমে সিয়াম পালন করা যাবেনা ৪৮৫
* ই'তিকাফ ৪৮৭
* ঘুষ নেয়া নিষেধ এবং ইহা জঘন্য অপরাধ (পাপ) ৪৯০
* কোন বিচারকের বিচারের ফলে নিষিদ্ধ বিষয় জায়েয হয়না ৪৯০
* প্রথম চাঁদ বা আল হেলাল ৪৯২
* তাকওয়া সঠিক আমল করতে সাহায্য করে ৪৯২
* যারা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে এবং যেখানে পাওয়া যাবে সেখানেই তাদেরকে হত্যা করতে আদেশ করা হয়েছে ৪৯৪
* যুদ্ধে নিহতদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ না কাটা এবং যুদ্ধলব্ধ মালামাল থেকে চুরি না করার নির্দেশ ৪৯৫
* ফিতনা হত্যা অপেক্ষাও জঘন্য ৪৯৬

* আত্মরক্ষার উদ্দেশ্য ছাড়া 'হারাম এলাকায়' যুদ্ধ করা নিষেধ ৪৯৬
* ফিতনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে ৪৯৮
* আত্মরক্ষা ছাড়া নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা যাবেনা ৫০২
* আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার আদেশ ৫০৩
* উমরাহ ও হাজ্জ করার নির্দেশ ৫০৬
* কেহ পথে বাধাপ্রাপ্ত হলে সেখানেই পশু কুরবানী করবে, মাথা মুন্ডন করবে এবং ইহরাম ত্যাগ করবে ৫০৭
* ইহরাম অবস্থায় মাথা মুন্ডন করলে 'ফিদইয়া' দিতে হবে ৫১০
* তামাত্তু হাজ্জ ৫১১
* তামাত্তু হাজ্জ পালনকারীর সাথে কুরবানীর পশু না থাকলে ১০ দিন সিয়াম পালন করবে ৫১২
* মাক্কাবাসীরা হাজ্জে তামাত্তু করবেনা ৫১৪
* হাজ্জের জন্য কখন ইহরাম বাঁধতে হবে ৫১৫
* হাজ্জের মাসসমূহ ৫১৬
* হাজ্জ পালন অবস্থায় স্ত্রী গমন করা যাবেনা ৫১৭
* হাজ্জের সময় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকতে হবে ৫১৯
* হাজ্জের সময় তর্ক-বিতর্ক থেকে বিরত থাকতে হবে ৫২০
* হাজ্জের সময় আল্লাহর যিক্‌রে মশগুল থাকতে হবে এবং হাজ্জের পাথেয় থাকতে হবে ৫২০
* পরকালের পাথেয় ৫২১
* হাজ্জের সময় আর্থিক লেন-দেন করা ৫২২
* আ'রাফা মাঠে অবস্থান ৫২৩
* কখন আ'রাফা ও মুজদালিফা ত্যাগ করতে হবে ৫২৪
* মাশআর আল হারামের বর্ণনা ৫২৫
* আ'রাফা মাইদানে অবস্থানের পর ঐ স্থান ত্যাগ করার নির্দেশ ৫২৭
* আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা ৫২৮
* হাজ্জের আহকামসমূহ পালন করার পর ইহকাল ও পরকালের ভালাইর জন্য প্রার্থনা করা ৫৩০
* তাশরীকের দিনগুলিতে বেশি বেশি আল্লাহর যিক্‌র করতে হবে ৫৩৩
* 'নির্দিষ্ট দিন' কী ৫৩৪

* মুনাফিকদের চরিত্র ৫৩৬
* মুনাফিকরা উপদেশ গ্রহণ করেনা ৫৩৯
* মু'মিনরা আল্লাহকে খুশি করার জন্য উম্মুখ থাকে ৫৩৯
* পুরাপুরি ইসলামে আনুগত্য প্রকাশ
করতে হবে ৫৪১
* ঈমান আনার ব্যাপারে বিলম্ব করা উচিত নয় ৫৪৩
* 'আল্লাহর অনুগ্রহ' ও 'মু'মিনদের উপহাস' করার শাস্তি ৫৪৪
* স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও মতভেদ করা হল দীনকে অস্বীকার করা ৫৪৭
* পরীক্ষার পর বিজয় লাভ ৫৫০
* দান-খাইরাত করা প্রসঙ্গ ৫৫২
* মুসলিমদের জন্য জিহাদ ফার্‌য করা হয়েছে ৫৫৩
* নাখলায় সেনা অভিযান এবং নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা ৫৫৫
* মাদকদ্রব্য ক্রমান্বয়ে নিষিদ্ধ করণ ৫৬১
* সাধ্যমত দান করা উচিত ৫৬৩
* ইয়াতিমের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ ৫৬৪
* মুশরিক নর-নারীকে বিয়ে করা অবৈধ ৫৬৭
* ঋতুবতী মহিলাদের সাথে সহবাস করা যাবেনা ৫৬৯
* স্ত্রীদের মলদ্বার ব্যবহার করা নিষেধ ৫৭২
* 'তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের ক্ষেত্র বিশেষ' এর অর্থ ৫৭২
* ভাল কাজ পরিত্যাগ করার শপথ করা যাবেনা ৫৭৬
* অভ্যাসগত শপথের জন্য কোন কাফফারা নেই ৫৭৭
* 'ইলা' সম্পর্কে আলোচনা ৫৭৯
* তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দাত ৫৮১
* 'আল-কুরু' এর অর্থ ৫৮১
* ঋতু এবং তা থেকে পবিত্র হওয়ার ব্যাপারে মহিলাদের বক্তব্য প্রাধান্য পাবে ৫৮২
* ইদ্দাত অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার প্রথম অধিকার স্বামীর ৫৮৩
* স্বামী-স্ত্রী উভয়ের উপর রয়েছে উভয়ের অধিকার ৫৮৩
* স্ত্রীর উপর স্বামীর শ্রেষ্ঠত্ব ৫৮৪
* তালাক দিতে হবে তিন মাসে তিনবার ৫৮৬
* মোহর ফিরিয়ে নেয়া ৫৮৭
* 'খোলা তালাক' এবং মোহর ফিরিয়ে দেয়া ৫৮৮

* খোলা তালাকের ইদ্দাত ৫৮৯
* আল্লাহর দেয়া সীমা লংঘন করা হল অত্যাচার ৫৮৯
* একই বৈঠকে তিন তালাক দেয়া অবৈধ/হারাম ৫৮৯
* তৃতীয় তালাকের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া যাবেনা ৫৯০
* হিলা বিয়েতে অংশগ্রহণকারীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ ৫৯১
* তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা কখন তার প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে যেতে পারবে ৫৯২
* তালাক দেয়া স্ত্রীর প্রতি সদয় ব্যবহার করতে হবে ৫৯৩
* তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তার পূর্ব-স্বামীর কাছে ফিরে যেতে চাইলে অভিভাবকের বাধা দেয়া উচিত নয় ৫৯৫
* অভিভাবক ছাড়া বিয়ে বৈধ নয় ৫৯৫
* ২ ঃ ২৩২ নং আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্য ৫৯৬
* মাতৃদুগ্ধ পান করার সময়সীমা দুই বছর ৫৯৭
* দুই বছর পরেও স্তন্য দান প্রসঙ্গ ৫৯৯
* অর্থের বিনিময়ে দুধ পান করানো ৫৯৯
* শিশুকে সংকটে নিপতিত না করা ৬০০
* দুই বছর পার হওয়ার আগেই দুগ্ধ-দান বন্ধ করা প্রসঙ্গ ৬০১
* বিধবার ইদ্দাতের সময় সীমা ৬০২
* ইদ্দাত পালনের আদেশ দানের গুঢ় রহস্য ৬০৩
* দাসীদের ইদ্দাত পালন ৬০৪
* স্বামীর জন্য স্ত্রীর ইদ্দাত পালন করা ওয়াজিব ৬০৪
* ইদ্দাতের সময় পরোক্ষভাবে বিয়েরপ্রস্তাব দেয়া ৬০৬
* সহবাস হওয়ার আগেই তালাক দেয়া প্রসঙ্গ ৬০৯
* তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে অর্থ প্রদান ৬০৯
* সহবাসের পূর্বেই তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী মোহরের অর্ধেক পাবে ৬১০
* মধ্যবর্তী ওয়াক্ত কোন্‌টি ৬১২
* আসরের সালাত মধ্যবর্তী ওয়াক্তের সালাত হওয়ার দলীল ৬১৩
* সালাত আদায়ের সময় কথা বলা যাবেনা ৬১৪
* ভয়-ভীতির সময় সালাত আদায় ৬১৫
* স্বাভাবিক অবস্থায় খুশু-খুযুর সাথে সালাত আদায় করা ৬১৬
* ২ ঃ ২৪০ নং আয়াত বাতিল হওয়া প্রসঙ্গ ৬১৮
* তালাক দেয়ার সময় অর্থ প্রদান করার যুক্তি ৬২০

* মৃত্যু ঘটানো লোকদের বর্ণনা ৬২১
* জিহাদ থেকে পলায়ন করলেই মৃত্যু থেকে রেহাই পাওয়া যাবেনা ৬২৩
* 'উত্তম ঋণ' এবং উহার প্রতিদান ৬২৪
* ঐ ইয়াহুদীদের বর্ণনা যারা তাদের জন্য
একজন বাদশাহ নিযুক্ত করার আবেদন জানিয়েছিল ৬২৬
* আল্লাহ তা'আলা কোন কোন নাবীকে অন্য নাবীদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন ৬৩৫
* আয়াতুল কুরসীর মর্যাদা ৬৩৮
* আয়াতুল কুরসীতে রয়েছে আল্লাহর ইসমে আযম ৬৪০
* আয়াতুল কুরসীতে রয়েছে ১০টি পূর্ণাঙ্গ বাক্য ৬৪১
* ধর্মের ব্যাপারে কোন জোর-যবরদস্তি নেই ৬৪৬
* তাওহীদ হল ঈমানের মূল স্তম্ভ ৬৪৭
* ইবরাহীম (আঃ) ও নমরূদ বাদশাহর সাথে তর্ক-বিতর্ক ৬৫১
* উযায়েরের (আঃ) ঘটনা ৬৫৪
* ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে জানতে চাইলেন,
আল্লাহ কিভাবে মৃতকে পুনরায় জীবন দেন ৬৫৭
* ইবরাহীমের (আঃ) প্রার্থনায় আল্লাহর সাড়া দেয়া ৬৫৭
* আল্লাহর উদ্দেশে ব্যয় করার প্রতিদান ৬৫৯
* দান করে তা স্মরণ করিয়ে দেয়ায় নিষেধাজ্ঞা ৬৬২
* অসৎ কাজ সৎ কাজকে মুছে দেয় মুছে দেয় ৬৬৫
* হালাল আয় থেকে ব্যয় করতে উৎসাহিত করা ৬৬৭
* সৎ কাজের ব্যাপারে শাইতানী কুমন্ত্রণা ৬৬৯
* 'হিকমাত' এর বিশ্লেষণ ৬৭০
* প্রকাশ্যে অথবা অপ্রকাশ্যে দান করার গুরুত্ব ৬৭১
* মুশরিকদেরকে দান করা প্রসঙ্গ ৬৭৪
* কে দান-সাদাকা পাবার যোগ্য ৬৭৬
* কুরআনে দান-সাদাকাকারীকে প্রশংসা করা হয়েছে ৬৭৮
* সুদের সাথে জড়িতদের শাস্তিদান প্রসঙ্গ ৬৭৯
* সুদের মধ্যে আল্লাহর বারাকাত নেই ৬৮৪
* আল্লাহ দান-সাদাকাকে বৃদ্ধি করেন ৬৮৫
* অবিশ্বাসী পাপীদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেননা ৬৮৫
* আল্লাহ শোকর আদায়কারীর প্রশংসা করেন ৬৮৫

* আল্লাহভীরুতা অর্জন এবং সুদ পরিহার করা ৬৮৭
* সুদের অপর নাম আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাঃ) সাথে যুদ্ধ করা ৬৮৮
* আর্থিক অনটনে জর্জরিত দেনাদারের প্রতি দয়ার্দ্র থাকা ৬৮৮
* লিখিত লেন-দেনে পরবর্তী সময়ে উপকার রয়েছে ৬৯৩
* চুক্তি লিখার সময় সাক্ষীর উপস্থিত থাকতে হবে ৬৯৬
* বন্ধক রাখার ব্যাপারে কুরআনের আদেশ ৭০১
* বান্দা যদি মনে মনে কিছু ভাবে সে জন্য কি সে দায়ী হবে ৭০৩
* হে আল্লাহ! ২ ঃ ২৮৫-২৮৬ আয়াতের বদৌলতে
আমাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন! ৭০৭
* সূরা বাকারাহর শেষ দুই আয়াতের তাফসীর ৭০৮
* তাফসীর ইব্‌ন কাসীরের বিভিন্ন খন্ডে বর্ণিত বিশেষ বিশেষ বিষয়সমূহ ৭১২

প্রকাশকের আরয

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য যিনি এই বিশ্ব ভূবনের মালিক। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁর নিকট সাহায্য চাচ্ছি, তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমাদের নাফ্সের অনিষ্টতা ও 'আমলের খারাবী থেকে বাঁচার জন্য আমরা তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ সুবহানাহু যাকে হিদায়াত দান করেন তাকে কেহ গোমরাহ্ করতে পারেনা, আর যে গোমরাহ্ হয় তাকে কেহ হিদায়াত দিতে পারেনা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, পরাক্রমশালী এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। তিনি তাঁকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে প্রেরণ করেছেন। দুরূদ ও সালাম সৃষ্টির সর্বোত্তম সৃষ্টি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাথীদের প্রতি এবং কিয়ামাত পর্যন্ত যারা নিষ্ঠার সাথে তাঁর অনুসরণ করবে তাদের প্রতি। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে সে হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে এবং যে তাদের নাফরমানী করবে সে স্বীয় নাফসের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই করবেনা এবং সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি আমাদের অশেষ শুকরিয়া যে, তিনি আমাদেরকে কুরআনের একটি অমূল্য তাফসীর প্রকাশ করার গুরু দায়িত্ব পালনের তাওফীক দিয়েছেন।

১৯৮৪ সালে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান কর্তৃক অনুবাদকৃত 'তাফসীর ইব্ন কাসীর' আমাদের হস্তগত হওয়ার পর আমরা তা ছাপানোর দায়িত্ব গ্রহণ করি। ঐ সময় জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেব আমাদের জানিয়েছিলেন যে, আর্থিক সহায়তা না পাওয়ায় আর ছাপানো যাচ্ছিলনা বলে তিনি প্রায় নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। যা হোক, আল্লাহর অশেষ দয়ায় তাঁর কালামের প্রচার যেহেতু হতেই থাকবে, তাই তিনি আমাদেরকে তাফসীর খন্ডগুলি নতুন করে ছাপানোর ব্যবস্থা করার সুযোগ দিলেন। এ ব্যাপারে দেশী ও প্রবাসী বেশ কিছু ভাই-বোনেরা এগিয়ে আসেন। যাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন তাফসীর পবিলিকেশন কমিটির মূল উদ্যোক্তা জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের তৎকালীন 'ফাইসন্স' এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকা অবস্থায় ঐ সংস্থার কর্মচারী-কর্মকর্তাদের মাসিক বেতন থেকে প্রদেয় অনুদান। এ ছাড়াও আর যাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন 'তাফসীর মাজলিস' এর বোনদের অকাতর দান। যাদের কথা বলা হল তাদের অনেকেই আজ আর বেঁচে

নেই। কিন্তু দানের টাকায় যে কাজ হাতে নেয়া হয়েছিল তা জারী রয়েছে। আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কাছে দু'আ করছি, তিনি যেন তাদের দান ও পরিশ্রমের জাযা খাইর দান করেন এবং আখিরাতের হিসাব সহজ করে দেন। আমীন!!

বিশ্বের অন্যতম সেরা তাফসীর বলে স্বীকৃত 'তাফসীর ইব্‌ন কাসীর' ছাপিয়ে সুপ্রিয় পাঠকবর্গের কাছে পৌঁছে দিতে পেরে আনন্দ পাচ্ছিলাম ঠিকই, কিন্তু একটা অতৃপ্তিও বার বার মনকে খোঁচা দিচ্ছিল। মনে একটি সুপ্ত বাসনা লালিত হচ্ছিল যে, আল্লাহ সুবহানাহু সুযোগ দিলে তাফসীর খন্ডগুলিতে যে ইসরাঈলী রিওয়ায়াত এবং দুর্বল কিংবা যঈফ হাদীস রয়েছে তা বাছাই করে বাদ দিয়ে নতুনভাবে পাঠকবর্গের কাছে পেশ করব। এ ব্যাপারে জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব ও জনাব ইউসুফ ইয়াসীন সাহেব জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেবকে বিগত বছরগুলিতে তাগিদও দিয়েছেন। কিন্তু প্রবাসের ব্যস্ততা এবং নানা বাঁধার কারণে জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেবের পক্ষে তা করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। যা হোক, আল্লাহর অসীম দয়ায় তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির পক্ষ থেকে একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠন করে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নতুন আঙ্গিকে তাফসীর খন্ডগুলিকে পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হচ্ছি। বাজারে যে তাফসীর খন্ডগুলি রয়েছে তা শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্রতিটি খন্ডের নতুর সংস্করণ বের করার চেষ্টা করব। ওয়ামা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ।

প্রতিটি তাফসীর খন্ডে, বিষয়বস্তুর উপর লক্ষ্য রেখে, আমরা তাফসীরের বিভিন্ন শিরোনাম সংযোজন করেছি যাতে পাঠকবর্গের নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের আলোচনা খুঁজে পেতে সুবিধা হয়। এ ছাড়া বর্ণিত হাদীসের সূত্র নম্বরগুলিও সংযোজন করেছি। কুরআনের কোন কোন শব্দ বাংলায় লিখা কিংবা উচ্চারণ সঠিক হয়না বলে ওর আরাবী শব্দটিও পাশে লিখে দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া পাঠককূলের কেহ যদি আমাদেরকে কোন সদুপদেশ দেন তাহলে তা সাদরে গ্রহণ করব। মুদ্রণ জনিত কারণে কোন ত্রুটি থেকে থাকলে তাও আমাদের অবহিত করলে পরবর্তীতে সংশোধনের চেষ্টা করব ইন্‌শাআল্লাহ।

এ বিরাট কাজে যা কিছু ভুল ত্রুটি হয়েছে তা সবই আমাদের, আর যা কিছু গ্রহণযোগ্য তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে। আমরা মহান আল্লাহর সাহায্য চাই, তিনি যেন তাঁর পবিত্র কালামের তাফসীর পাঠ করার মাধ্যমে আমাদের প্রতি হিদায়াত নাসীব করেন এবং উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন। আমীন! সুম্মা আমীন!!

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি

অনুবাদকের আরয

যে পবিত্র কুরআন মানুষের সর্ববিধ রোগে ধনন্তরী মহৌষধ, যার জ্ঞানের পরিধি অসীম অফুরন্ত, যার বিষয় বস্তুর ব্যাপকতা আকাশের সমস্ত নীলিমাকেও অতিক্রম করেছে, যার ভাব গাম্ভীর্য অতলস্পর্শী মহাসাগরের গভীরতাকেও হার মানিয়েছে, সেই মহাগ্রন্থ কুরআন নাযিল হয়েছে সুরময় কাব্যময় ভাষা আরবীতে। সুতরাং এর ভাষান্তরের বেলায় যে সাহিত্যশৈলী ও প্রকাশ রীতিতে বাংলা ভাষা প্রাঞ্জল, কাব্যময় ও সুরময় হয়ে উঠতে পারে, তার সন্ধান ও অভিজ্ঞতা রাখেন উভয় ভাষায় সমান পারদর্শী স্বনামধন্য লেখক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ আলেমবৃন্দ। তাই উভয় ভাষায় অভিজ্ঞ হক্কানী আলেম, নায়েবে নাবী ও সাহিত্য শিল্পীদের পক্ষেই কুরআনের সার্থক তরজমা ও তাফসীর সম্ভবপর এবং আয়ত্তাধীন।

মানবকূলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁরাই যাঁরা পবিত্র কুরআনের পঠন-পাঠনে নিজেকে নিয়োজিত করেন সর্বতোভাবে। তাই নাবী আকরামের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পুতঃবাণী সকল যুগের জ্ঞান-তাপস ও মনীষীদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে পাক কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রণয়ন করার কাজে।

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর হচ্ছে কালজয়ী মুহাদ্দিস মুফাসসির যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী আল্লামা হাফিয ইব্‌ন কাসীরের একনিষ্ঠ নিরলস সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের অমৃত ফল। তাফসীর জগতে এ যে বহুল পঠিত সর্ববাদী সম্মত নির্ভরযোগ্য এক অনন্য সংযোজন ও অবিস্মরণীয় কীর্তি এতে সন্দেহ সংশয়ের কোন অবকাশ মাত্র নেই। হাফিজ ইমাদুদ্দীন ইব্‌ন কাসীর এই প্রামাণ্য তথ্যবহুল, সর্বজন গৃহীত ও বিস্তারিত তাফসীরের মাধ্যমে আরবী ভাষাভাষীদের জন্য পবিত্র কালামের সত্যিকারের রূপরেখা অতি স্বচ্ছ সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেছেন তাঁর ক্ষুরধার বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে। এসব কারণেই এর অনবদ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বকে সকল যুগের বিদগ্ধ মনীষীরা সমভাবে অকপটে এবং একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই এই সসাগরা পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশে, সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের, এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষায়তনের গ্রন্থাগারেও সর্বত্রই এটি বহুল পঠিত, সুপরিচিত, সমাদৃত এবং হাদীস-সুন্নাহর আলোকে এক স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী।

তাফসীর ইব্‌ন কাসীরের এই ব্যাপক জনপ্রিয়তা, কল্যাণকারিতা এবং অপরিসীম গুরুত্ব ও মূল্যের কথা সম্যক অনুধাবন করে আজ থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে এটি উর্দূতে পূর্ণাঙ্গভাবে ভাষান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উর্দূ অনুবাদের গুরু দায়িত্বটি অম্লানবদনে পালন করেছিলেন উপমহাদেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলেম, প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও বিদগ্ধ মনীষী মওলানা মুহাম্মাদ সাহেব জুনাগড়ী। এই উপমহাদেশের আনাচে কানাচে দলমত নির্বিশেষে সকল মহলেই এটি সমাদৃত ও সর্বজন গৃহীত।

এই উর্দূ এবং অন্যান্য ভাষায় ইব্‌ন কাসীরের অনুবাদের ন্যায় আমাদের বাংলা ভাষায়ও বহু পূর্বে এই তাফসীরটির অনুবাদ হওয়া যেমন উচিত ছিল, তেমনি এর প্রকট প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও এই সংখ্যা গরিষ্ঠের তুলনায় এবং এই প্রকট প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় কুরআন তরজমা ও তাফসীর রচনার প্রয়াস নিতান্ত অপর্যাপ্ত ও অপ্রতুল।

দুঃখের বিষয় 'ইব্‌ন কাসীরের' ন্যায় এই তাফসীর সাহিত্যের একটি অতি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ততম উপাদান এবং এর অনুবাদের অপরিহার্য প্রয়োজনকে এ পর্যন্ত শুধু মৌখিকভাবে উপলব্ধি করা হয়েছে। প্রয়োজন মেটানোর বা পরিপূরণের তেমন কোন বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ভাষান্তরের জগদ্দল পাথরই হয়ত প্রধান অন্তরায় ও পরিপন্থী হিসাবে এতদিন ধরে পথ রোধ করে বসেছিল। অথচ বাংলা ভাষাভাষী এই বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী ও অগণিত ভক্ত পাঠককুল স্বীয় মাতৃভাষায় এই অভিনব তাফসীর গ্রন্থকে পাঠ করার স্বপ্নসাধ আজ বহুদিন থেকে মনের গোপন গহনে পোষণ করে আসছেন। কিন্তু এই সুদীর্ঘ দিন ধরে মুসলিম সমাজের এই লালিত আকাংখা, এই দুর্বার বাসনা-কামনা আর এই সুপ্ত অভিলাষকে চরিতার্থ করার মানসে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের মত জাতীয় সংস্থা ছাড়া আর কেহ এই দুর্গম বন্ধুর পথে পা বাড়ানোর দুঃসাহস করেননি। দেশবাসীর ধর্মীয় জ্ঞান পিপাসা আজো তাই বহুল পরিমাণে অতৃপ্ত।

কুরআনুল হাকীমের প্রতি আমার দুর্বার আকর্ষণ শৈশব এবং কৈশর থেকেই। আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন আব্বা মরহুম অধ্যাপক মওলানা আবদুল গনী সাহেবের কাছেই সর্বপ্রথম আমার কুরআন এবং তাফসীরের শিক্ষা। অতঃপর দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ খ্যাতিমান কুরআন-হাদীস বিশারদদের কাছে

শিক্ষা গ্রহণের পর দীর্ঘ দুই যুগেরও অধিককাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীসমূহের হাদীস ও তাফসীরের ক্লাশ নিয়েছি।

এ সব ন্যায়সঙ্গত এবং অনুকূল প্রেক্ষাপটের কারণেই আমি বহুদিন ধরে তাফসীর ইব্ন কাসীরকে বাংলায় ভাষান্তরিত করার সুপ্ত আকাংখা অন্তরের গোপন গহনে লালন করে আসছিলাম। কিন্তু এ পর্যন্ত একে বাস্তবে রূপ দেয়ার তেমন কোন সম্ভাবনাময় সুযোগ-সুবিধা আমি করে উঠতে পারিনি।

তাই আজ থেকে প্রায় দেড় যুগ আগে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে এই বিরাট তাফসীরের অনুবাদ কাজে হাত দিই এবং অতিসন্তর্পণে এই কন্টকাকীর্ণ পথে সতর্ক পদচারণা শুরু করি।

আল্লাহ তা'আলার অশেষ শুকরিয়া এই বিশ্বস্ততম এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও হাদীসভিত্তিক এই তাফসীর ইব্ন কাসীর তথা ইসলামী প্রজ্ঞার প্রধান উপাদন ও উৎস এবং রত্নভান্ডারের চাবিকাঠি আজ বাংলা ভাষী পাঠক-পাঠিকার হাতে অর্পণ করতে সক্ষম হলাম। এ জন্য আমি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান ও ধন্য মনে করছি।

আমার ন্যায় একজন সদাব্যস্ত পাপীর পক্ষে যেহেতু এককভাবে এত বড় দুঃসাহসী ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে বিজ্ঞ পাঠককূলের হাতে অর্পণ করা কোন ক্রমেই সম্ভবপর ছিল না, তাই আমি কতিপয় মহানুভব বিদগ্ধ ও বিজ্ঞ আলেমের অকুণ্ঠ সাহায্য-সহায়তা ও সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি। এই সহযোগিতার হাত যাঁরা প্রসারিত করেছেন তন্মধ্যে চাঁপাই নওয়াবগঞ্জ হিফযুল উলুম মাদ্রাসার স্বনামধন্য শিক্ষক আবদুল লতীফের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য। আর এই স্নেহস্পদ কৃতি ছাত্রের ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ কামনায় আল্লাহর কাছেই সুদূর প্রবাসে বসে প্রতিনিয়ত আকুল মিনতি জানাই।

তাফসীর ইব্ন কাসীরের বাংলা তরজমা প্রকাশের পথে সবচেয়ে বেশী অন্তরায়, প্রতিকূলতা এবং সমস্যা দেখা দিয়েছিল অর্থের। প্রথম খন্ড থেকে একাদশ খন্ড এবং আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসান সাহেবের সহযোগিতায় ত্রিশতম তথা আম্মাপারা খন্ড প্রকাশনার পর আমি যখন প্রায় ভগ্নোৎসাহ অবস্থায় হতাশ প্রাণে হাত গুটিয়ে বসার উপক্রম করছিলাম, ঠিক এমনি সময়ে একান্ত ন্যায়নিষ্ঠ ও আন্তরিকতার সংগে আমার প্রতি সার্বিক সহযোগিতার হাত প্রসারিত করলেন তদানীন্তন ফাইসন্স বাংলাদেশ লিমিটেডের প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব।

জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব বাকী খণ্ডগুলির সুষ্ঠু প্রকাশনার উদ্যোগ নিতে গিয়ে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটিও গঠন করেন। এই সদস্যমন্ডলীর মধ্যে তিনি এবং আমি ছাড়া বাকি দু'জন হচ্ছেন তার সহকর্মী জনাব নূরুল আলম ও মরহুম মুহাম্মাদ মকবুল হোসেন সাহেব। কিছু দিন পর গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব এই কমিটিতে যোগ দেন। এভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অপ্রত্যাশিত ও অকল্পনীয়ভাবে তাঁর মহিমান্বিত মহাগ্রন্থ আল্‌ কুরআনুল কারীমের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের অচল প্রায় কাজটিকে সচল ও অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করলেন এবং এ ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা করেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব, বেগম বদরিয়া রশীদ এবং বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ। সুতরাং সকল প্রকার প্রশংসা ও স্তব-স্তুতি একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার।

এই কমিটির কিছু সংখ্যক সুহৃদ ব্যক্তির আর্থিক অনুদানে এবং বিশেষ করে বেগম বাদরিয়া রশীদ ও বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ -এর যৌথ প্রচেষ্টায় বিভিন্ন তাফসীর মাজলিশে যোগদানকারী বোনদের আর্থিক অনুদানের এবং প্রকাশিত খন্ডগুলি ক্রয় করার দৃষ্টান্ত চির অম্লান হয়ে থাকবে।

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি পুরা তাফসীর -এর মুদ্রণ ব্যবস্থা, অর্থানুকূল, অনুপ্রেরনা, উৎসাহ-উদ্দীপনা, বিক্রয় ব্যবস্থা ও অন্যান্য তত্ত্বাবধানের গুরু দায়িত্ব যেভাবে পালন করেছেন, তার জন্য আমি আল্লাহর দরবারে জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের জন্য এবং তার সহকর্মীবৃন্দের, তার বন্ধু-বান্ধব, আর্থিক সাহায্যকারী সব ভাই বোন ও তাদের পরিবারবর্গের জন্যে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ, মঙ্গল ও শুভ কামনা করতে গিয়ে প্রাণের গোপন গহণ থেকে উৎসারিত দোয়া, মুনাজাত ও আকুল মিনতি প্রতিনিয়তই পেশ করছি।

আরো মুনাজাত করছি যেন আল্লাহ রাব্বুল আল্লামীন এই কুরআন তাফসীর প্রচারের বদৌলতে আমাদের সবার মরহুম আব্বা আম্মার রূহের প্রতি স্বীয় অজস্র রাহমাত, আশীষ ও মাগফিরাতের বারিধারা বর্ষণ করেন। আমীন! রোজ হাশরের অনন্ত সাওয়াব রিসানী এবং বারাকাতের পীযুষধারায় স্নাতসিক্ত করে আল্লাহপাক যেন তাঁদের জান্নাত নাসীব করেন। সুম্মা আমীন!

বিশ্বের অন্যতম সেরা তাফসীর বলে স্বীকৃত 'তাফসীর ইব্‌ন কাসীর' ছাপিয়ে সুপ্রিয় পাঠকবর্গের কাছে পৌঁছে দেয়ার পরও একটা অতৃপ্ত বাসনা বার বার মনে চেপে বসেছিল। তা হল তাফসীর খন্ডগুলিতে যে ইসরাঈলী

রিওয়ায়াত এবং দুর্বল কিংবা যঈফ হাদীস রয়েছে তা বাছাই করে বাদ দিয়ে নতুনভাবে পাঠকবর্গের কাছে পেশ করা। আল্লাহর অসীম দয়ায়, তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির পক্ষ থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা এটি পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হচ্ছি। এ জন্য আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

এই অনুদিত তাফসীরের উপস্থাপনা এবং অন্যান্য যে কোন ব্যাপারে যদি সুধী পাঠকমহলের পক্ষ থেকে তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় তাহলে তা পরম কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদসহ গৃহীত হবে। এভাবে এই মহা কল্যাণপ্রদ কাজটিকে আরো উন্নতমানের এবং একান্ত রুচিশীলভাবে সম্পন্ন করার মানসে যে কোন মূল্যবান মতামত, সুপরামর্শ ও সদুপদেশ আমরা বেশ আগ্রহ ও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে সদা প্রস্তুত। কারণ, আমার মত অভাজন অনুবাদকের পক্ষে নানা ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে যেভাবে যতটুকু সম্ভব হয়েছে, ততটুকুই আমি আপাততঃ সুধী পাঠকবৃন্দের খিদমতে হাজির করতে প্রয়াস পেয়েছি।

১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাসে একান্তই আকস্মিকভাবে আমার জীবনের মোড় ও গতিপথ একেবারেই পাল্টে যায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তথা স্বদেশের গন্ডি ও ভৌগোলিক সীমারেখা পেরিয়ে দূর-দূরান্তের পথে প্রবাসে পাড়ি জমিয়ে অবশেষে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে এসে উপনীত হই। অতঃপর এখানেই বসবাস করতে শুরু করি।

তাফসীর প্রকাশনার শুভ সন্ধিক্ষণে সাগর পারের এই সুদূর নগরীতে অবস্থান করে আরো কয়েক জনের কথা আমার বার বার মনে পড়ছে। এরা আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য-সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে। এই প্রাণপ্রিয় স্নেহস্পদদের মধ্যে ড, ইউসুফ, ডা. রুস্তম, মেজর ওবাইদ, নাজিবুর, আতীক, হাবীব, মুহাম্মাদ ও আবদুল্লাহ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য ও উল্লেখ্য। একান্ত ন্যায়সঙ্গতভাবে আমি আরো দৃঢ় প্রত্যাশা করছি যে এই কুরআন তাফসীরের মহান আদর্শ ও আলোকেই যেন তারা গড়ে তুলতে পারে স্বীয় জীবনধারা।

রোজ হাশরে সবাই যখন নিজ নিজ আমলনামা সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাযির হবে তখন আমাদের মত এই দীনহীন আকিঞ্চনদের সৎ আমল যেহেতু একেবারেই শূন্যের কোঠায়, তাই আমরা সেদিন মহান আল্লাহর

সম্মুখীন হব এই সমস্ত সদ্গ্রন্থরাজিকে ধারণ করে। 'ওয়ামা যালিকা আলাল্লাহি বি-আযীয।' রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আন্তাস্ সামীউল আলীম।

এবারে আসুন উর্ধ্বগগণে তাকিয়ে অনুতপ্ত চিত্ত্বে আল্লাহর মহান দরবারে করজোড়ে মিনতি জানাই ঃ ' রাব্বানা লাতু আখিযনা ইন্নাসিনা... ' অর্থাৎ 'প্রভু হে, যদি ভুল করে থাকি তাহলে দয়া করে এ জন্য তুমি আমাদের পাকড়াও করনা। ইয়া রাব্বাল আলামীন! মেহেরবানী করে তুমি আমাদের সবাইকে তোমার পাক কালাম সম্যক অনুধাবন, সঠিক হৃদয়ঙ্গম এবং তার প্রতি আমল করার পূর্ণ তাওফীক দান কর। একান্ত দয়া পরবশ হয়ে তুমি আমাদের সবার এ শ্রম সাধনা কবূল কর। একমাত্র তোমার তাওফীক এবং শক্তি প্রদানের উপরেই তাফসীর তরজমার এই মহত্তম পরিকল্পনার সুষ্ঠ পরিসমাপ্তি নির্ভরশীল। তাই এ সম্পর্কিত সকল ভ্রমপ্রমাদকে ক্ষমা-সুন্দর চোখে দেখে পবিত্র কুরআনের এই সামান্যতম খিদমাত আমাদের সবার জন্যে পারলৌকিক মুক্তির সম্বল ও নাজাতের মাধ্যম করে দাও। আমীন! সুম্মা আমীন!!

বিনয়াবনত

ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান

সাবেক প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
আরবী ও ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়,
বাংলাদেশ।

প্রাক্তন পরিচালক,
উচ্চতর ইসলামিক শিক্ষা কেন্দ্র
ইষ্ট মিডৌ এ্যাভনিউ, নিউইয়র্ক,
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

ইমাম ইব্‌ন কাসীরের (রহঃ) জীবনী

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে সমস্ত তাফসীর শাস্ত্রজ্ঞ, মুহাদ্দিস, ফাকীহ, ধর্মীয় জ্ঞান, তত্ত্ব ও শাস্ত্রালোচনায় বিপুল পারদর্শিতা ও সর্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় দিয়ে এই মর-জগতের বুকে অমরত্ব লাভ করেছেন এবং যেসব মনীষী পবিত্র কুরআন, হাদীস তথা শাশ্বত সুন্নাহ্‌র বিজয় নিকেতন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছেন, তন্মধ্যে হাফিয ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইব্‌ন কাসীরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

তাঁর প্রকৃত নাম ইসমাঈল, আবুল ফিদা তাঁর কুনিয়াত বা উপনাম এবং ইমাদুদ্দীন (ধর্মের স্তম্ভ) তাঁর উপাধি। সুতরাং তাঁর 'শাজরা-ই-নাসাব' বা কুলজীনামাসহ পূরা নাম ও বংশ পরিচয় হচ্ছে ঃ আবুল ফিদা ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইব্‌ন উমার ইব্‌ন কাসীর ইব্‌ন যার আল-কারশী, আল-বাসরী, আদ্‌ দিমাশকী।

কিন্তু সাধারণ্যে তিনি ইব্‌ন কাসীর নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। বস্তুতঃ 'আল-বাসরী' নামক তাঁর এই 'নিসবাত'টি হচ্ছে জন্মস্থান বাচক উপাধি এবং 'আদ্‌ দিমাশকী' নামক তাঁর এই 'নিসবাত'টি হচ্ছে তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা বা তা'লীম ও তারবি'য়াত বাচক উপাধি।

জন্ম ও শিক্ষা-দীক্ষা ঃ

ইমাম ইব্‌ন কাসীর (রহঃ) সিরীয়া প্রদেশের প্রসিদ্ধ শহর বাসরার অধীন মাজদাল নামক মহল্লায় ৭০১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইব্‌ন কাসীরের জন্মের সময়ে তাঁর পিতা সেই অঞ্চলের খতীব পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। চার বছর বয়সে শিশু ইব্‌ন কাসীরের স্নেহময় পিতা শিহাবুদ্দীন উমার ৭০৫ হিজরী মুতাবিক ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। তখন তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর শাইখ আবদুল ওয়াহাব তাঁর প্রতিপালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

ইব্‌ন কাসীরের (রহঃ) শিক্ষকবৃন্দ

তিনি জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের কাছে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করে ফিকাহ শাস্ত্রের অধ্যয়ন শুরু করেন। অতঃপর শাইখ বুরহানুদ্দীন ইবরাহীম ইব্‌ন আবদুর রাহমান ফাযারী (মৃত্যু ৭২৯ হিজরী/১৩২৮ খৃষ্টাব্দ) এবং শাইখ কামালুদ্দীন ইব্‌ন কাযী শুহবার কাছে ফিকাহ শাস্ত্রের পাঠ সমাপ্ত করেন।

মুহাদ্দিস হাজ্জার ছাড়া তাঁর সমসাময়িক যেসব মুহাদ্দিসের কাছ থেকে ইমাম ইব্‌ন কাসীর একাগ্র চিত্তে হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে নিম্নোক্ত মনীষীদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য ঃ

১) বাহাউদ্দীন ইব্ন কাসিম ইব্ন মুযাফ্ফর ইব্ন আসাকির (মৃত্যু ৭২৩ হিজরী/১৩২৩ খৃষ্টাব্দ)

২) শাইখুয্ যাহিরিয়া আফীফুদ্দীন ইসহাক ইব্ন ইয়াহিয়া আল আমিদী (মৃত্যু ৭২৫ হিজরী/১৩২৪খৃষ্টাব্দ)

৩) ঈসা ইবনুল মুত্ইম।

৪) মুহাম্মাদ ইব্ন যারাদ।

৫) বদরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন সুয়াইদী (মৃত্যু ৭১১ হিজরী/১৩১১ খৃষ্টাব্দ)

৬) শাইখুল ইসলাম তাকিউদ্দিন আহমাদ ইব্ন তাইমীয়া আল হাররানী (মৃত্যু ৭২৮ হিজরী/ ১৩২৭ খৃষ্টাব্দ)।

৭) ইব্নুর রাযী।

৮) আহমাদ ইব্ন আবী তালিব (ইবনুশ শাহনাহ) (মৃত্যু ৭৩০ হিজরী)

৯) ইবনুল হাযযার (মৃত্যু ৭৩০ হিজরী)

১০) আলী ইব্ন উমার আস সুওয়াইনী

১১) আবূ মূসা আল কারাফাই

১২) আবুল ফাত্হ আল দাব্বুসী

১৩) ইব্নুর রাযী।

১৪) হাফিয জামালুদ্দিন ইউসুফ আল মযযী শাফিঈ (মৃত্যু ৭৪২ হিজরী/১৩৪১ খৃষ্টাব্দ)।

১৫) আল্লামা হাফিয শামসুদ্দীন যাহাবী (মৃত্যু ৭৪৮ হিজরী/১৩২৭ খৃষ্টাব্দ।

১৬) আল্লামা ইমাদুদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্ন আশ-শীরাযী (মৃত্যু ৭৪৯ হিজরী/১৩৪৮ খৃষ্টাব্দ)।

হাফিয ইব্ন কাসীর (রহঃ) উপরোক্ত মুহাদ্দিসদের মধ্যে যাঁর কাছ থেকে সব চেয়ে বেশি শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ লাভ করে উপকৃত হয়েছিলেন তন্মধ্যে ‘তাহযীবুল কামাল’ প্রণেতা সিরীয়া দেশীয় মুহাদ্দিস আল্লামা হাফিয জামালুদ্দিন ইউসুফ ইব্ন আবদুর রাহমান মিয্যী শাফিঈ (মৃত্যু ৭৪২ হিজরী/১৩৪১ খৃষ্টাব্দ) বিশেষভাবে উল্লেখের দাবীদার।

ইমাম ইব্ন কাসীরের প্রতি সমসাময়িক মনীষীদের শ্রদ্ধা নিবেদন

হাফিয শামসুদ্দীন যাআবী (মৃত্যু ৭৪৮ হিজরী/১৩৪৭ খৃষ্টাব্দ) তাঁর ‘আল-মুজামুল মুখতাস’ এবং ‘তাযকিরাতুল হুফ্ফায’ নামক অনবদ্য গ্রন্থদ্বয়ে বলেন ঃ

'ইব্‌ন কাসীর একজন খ্যাতনামা মুফ্‌তী (ফাতওয়া প্রদানে বিশেষজ্ঞ), বিজ্ঞ মুহাদ্দিস, আইন অভিজ্ঞ ফিকাহ শাস্ত্রবিদ, বিচক্ষণ তাফসীরকার এবং রিজাল শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী। হাদীসের মতন (মূল অংশ) সম্পর্কে তাঁর অভিনিবেশ ছিল উল্লেখযোগ্য।

হাফিয হুসাইনী এবং আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে ইমাম ইব্‌ন কাসীর সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন ঃ 'তিনি হাদীসের বিশিষ্ট অধ্যাপক, হাদীস শাস্ত্রের হাফিয, প্রখ্যাত আলিম এবং ইমাম, বক্তৃতায় সুনিপুণ এবং বহু গুণ ও উৎকর্ষের অধিকারী।'

আল্লামা শাইখ ইব্‌ন ইমাদ হাম্বালী (মৃত্যু ১০৮৯ হিজরী/১৬৭৮ খৃষ্টাব্দ) ইমাম ইব্‌ন কাসীরকে (রহঃ) 'আল হাফিযুল কাবীর' বা মহান হাফিয অর্থাৎ কুরআনের শ্রেষ্ঠ শ্রুতিধর বলে আখ্যায়িত করেন।

অনুরূপভাবে তাঁর খ্যাতনামা প্রিয় শিষ্য আল্লামা হাফিয ইব্‌ন হজ্জি (মৃত্যু ৮১৬ হিজরী/১৪১৩ খৃষ্টাব্দ) স্বীয় শ্রদ্ধাস্পদ উস্তাদ (ইব্‌ন কাসীর) সম্পর্কে অভিমত জানাতে গিয়ে বলেন ঃ

'আমরা যেসব হাদীস শাস্ত্রজ্ঞকে পেয়েছি তন্মধ্যে তিনি (ইব্‌ন কাসীর) হাদীসের মতন বা মূল অংশ সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ শ্রুতিধর এবং দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে, হাদীস রিজাল শাস্ত্র জ্ঞানে ও বিশুদ্ধ-দুর্বল হাদীস নির্ধারণে ছিলেন সবার চেয়ে অভিজ্ঞ। তাঁর সমসাময়িক উলামা ও উস্তাদবৃন্দ সবাই তাঁর এই মান মর্যাদার কথা এক বাক্যে স্বীকার করেন। তাঁর কাছে আমি বহুবার যাতায়াত করেছি, তবু এ কথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, যতবারই আমি তাঁর খিদমাতে গিয়ে উপনীত হয়েছি, প্রতিবারই কোন না কোন বিষয়ে তাঁর কাছে জ্ঞানলাভে ধন্য ও কৃতার্থ হয়েছি। আল্লামা হাফিয ইব্‌ন নাসিরুদ্দীন আদ্-দিমাশকী (মৃত্যু ৮৪২ হিজরী/১৪৩৮ খৃষ্টাব্দ) তাঁর (ইব্‌ন কাসীরের) প্রসঙ্গে বলেন ঃ

আল্লামা হাফিয ইমাদুদ্দীন ইব্‌ন কাসীর ছিলেন মুহাদ্দিসগণের নির্ভর, ঐতিহাসিকদের অবলম্বন এবং তাফসীর বিদ্যা বিশারদদের উন্নত ধ্বজা'। হাফিয ইব্‌ন হাজার আসকালানী (৮৫২ হিজরী) তাঁর 'আদ্‌দুরারুল কামীনা' গ্রন্থে বলেন ঃ

'হাদীসের মতন বা মৌল অংশ এবং রিজাল বা চরিত-অভিধান শাস্ত্রের পঠন-পাঠন ও অধ্যয়নে তিনি সব সময় নিমগ্ন থাকতেন। তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি

ও স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর, আর তিনি রসিকতা-প্রিয় ছিলেন। জীবদ্দশায় তাঁর গ্রন্থরাজি চারদিকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে'।

তিনি যেমন ছিলেন লিখা-পড়ায় অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং জ্ঞান অন্বেষণে ছিলেন অত্যন্ত তৎপর, তেমনি তার ছিল ক্ষুরধার লেখনী। ফিক্‌হ, তাফসীর এবং হাদীস শাস্ত্রে তার ছিল পূর্ণ দখল। পড়ালেখার সাথে সাথে তিনি বই পুস্তক লিখা ও দীনের প্রচার কাজে নিজকে ব্যস্ত রেখেছিলেন।

ঐতিহাসিকগণও ইমাম ইব্‌ন কাসীরের (রহঃ) সর্বতোমুখী প্রতিভা, স্মৃতিশক্তি এবং অগাধ জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইব্‌ন ইমাদ (মৃত্যু ১০৯৮ হিজরী/ ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দ) বলেন ঃ

তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি ও ধীশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। কোন বিষয়কে একবার মুখস্থ করে নিলে তাঁর বিস্মরণ খুব কমই হত। আর তিনি মেধাবীও কম ছিলেননা। আরাবী সাহিত্যও তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং মধ্যম পর্যায়ের কবিতাও তিনি রচনা করতেন'।

আল্লামা ইব্‌ন তাইমিয়ার সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক ঃ

ইব্‌ন কাসীরের স্বনাম খ্যাত শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আল্লামা হাফিয ইব্‌ন তাইমিয়ার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ট নিবিড় সম্বন্ধ থাকার কারণে শিক্ষা ও জ্ঞানার্জন ব্যাপারে এই শিষ্যের উপর উস্‌তাদের প্রভাববিস্তার করেছিল অতি প্রগাঢ়ভাবে। ইব্‌ন কাসীর অধিকাংশ মাস্‌য়ালায় হাফিয ইব্‌ন তাইমিয়ার অনুসারী ছিলেন। ইব্‌ন কাযী শাহাবা স্বীয় 'তাবাকাত' গ্রন্থে বলেন ঃ

আল্লামা ইমাম ইব্‌ন তাইমিয়ার সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক ছিল। শুধু তাই নয়, তিনি ইব্‌ন তাইমিয়ার মত ও পথকে পূর্ণ সমর্থন যুগিয়ে বিতর্ক করতেন এবং তাঁর বহু মতের অনুসরণ করতেন। তিন তালাকের মাস্‌য়ালাতেও তিনি ইব্‌ন তাইমিয়ার মতানুযায়ী ফতওয়া দিতেন। এ কারণে তাঁকে এক ভীষণ অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় এবং অন্তহীন নির্যাতন যাতনা ভোগ করতে হয়।

ইমাম ইব্‌ন কাসীর (রহঃ) রচিত গ্রন্থমালা ঃ

১। আল্লামা হাফিয ইব্‌ন কাসীর তাঁর অমর স্মৃতির নিদর্শন হিসাবে এই মরজগতের বুকে যেসব মহামূল্য ধন-সম্পদ ও বিষয় বৈভব ছেড়ে গেছেন, তন্মধ্যে তাঁর লিখিত تَفْسِيْرُ الْقُرْآنِ الْعَظِيْم 'তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম'

যা 'তাফসীর ইব্‌ন কাসীর' নামেই বেশি পরিচিত। পবিত্র কুরআনের এই সু-প্রসিদ্ধ ভাষ্য গ্রন্থ সম্পর্কে আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) বলেন ঃ لَمْ يُؤَلَّفْ عَلَى نَمْطه مِثْلُـــهُ অর্থাৎ এ ধরনের অন্য কোন তাফসীর লিপিবদ্ধই হয়নি। কায়রোর প্রখ্যাত আলেম যাহিদ ইব্‌ন হাসান আল-কাউসারী আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতীর বরাতে বলেন هُوَ مِنْ اَفْيَد كُتُبِ التَّفْســـيْرِ بِالرِّوَايَـــةِ 'রিওয়ায়েতের বিশিষ্ট তাফসীরসমূহের মধ্যে এটি হচ্ছে সবচেয়ে কল্যাণপ্রদ ও উপকারী'।

২। اَلتَّكْمِيْلُ فِىْ مَعْرِفَةِ الثِّقَات وَالضُّعَـــفَاءِ وَالْمَجَاهِيْلِ আত্‌তাক্‌মিলাহ্ ফী মা'রিফাতিস সিকাত ওয়ায্‌যুআ'ফায়ে ওয়াল মাজাহীল'। হাজী খলীফা মোল্লা কাতিব চাল্‌পী তাঁর অমর গ্রন্থ 'কাশফুয যুনূনে' এই গ্রন্থখানির 'আত্‌তাক্‌মিলাহ্ ফী আসমাইস সিকাত ওয়ায্‌যুআ'ফা বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু স্বয়ং গ্রন্থকার তাঁর 'আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ' গ্রন্থে এবং 'ইখতিসারু উলূমিল হাদীস' নামক অনবদ্য পুস্তকে উপরোক্ত নামেই উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থটির নাম থেকেই তার আলোচ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে। এটি রিজাল শাস্ত্রের (চরিত-অভিধান শাস্ত্র বা রাবীদের জীবনী সংগ্রহ বিজ্ঞান) একখানি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। আল্লামা 'হুসাইনী' দিমাশকীর আলোচনা মতে এই আলোচ্য গ্রন্থ পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে। লেখক এতে হাফিয জামাল ইউসুফ ইব্‌ন আবদুর রাহমান মিয্‌যীর 'তাহযীবুল কামাল' এবং হাফিয শামসুদ্দীন যাহাবীর 'মীযানুল ই'তিদাল' নামক চমৎকার গ্রন্থদ্বয়কে একত্রিত করেছেন। শুধু তাই নয়, নিজের পক্ষ থেকে বহু মূল্যবান তথ্য সংযোজন করে বেশ পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশ করেন। গ্রন্থকার স্বয়ং অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন ঃ

هُوَ اَنْفَعُ شَيْئًا لِلْفَقِيْهِ الْبَارِعِ وَكَذَلِكَ لِلْمُحَدِّث

'আলোচ্য গ্রন্থখানি বিশেষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শাস্ত্রবিদের জন্য যেমন লাভজনক, ঠিক তেমনি মুহাদ্দিসের পক্ষেও উপকারী।

৩। اَلْبِدَايَـــةُ وَالنِّهَايَـــةُ 'আল বিদায়া ওয়ান-নিহায়া। ইব্‌ন কাসীর রচিত ইতিহাস বিষয়ক ১৪ খন্ডের এই বিরাট গ্রন্থখানি তাঁর এক অনবদ্য সৃষ্টি। মিসর থেকে একাধিকবার এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। এতে সৃষ্টির

প্রাথমিককাল থেকে শুরু করে শেষ যুগ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা ও অবস্থার কথা সুন্দরভাবে সবিস্তারে বিধৃত হয়েছে। প্রথমে নাবী-রাসূলগণ ও পরে প্রাচীন জাতির তথা বিগত উম্মাতদের বিস্তারিত বিবরণ এবং শেষে সীরাতে নবভীর বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। তারপর খিলাফাতে রাশেদা থেকে শুরু করে একেবারে গ্রন্থকারের সময়কাল পর্যন্ত বিস্তৃত ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্যাবলী সুন্দর ও স্বার্থকভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর সেই সঙ্গে বিধৃত হয়েছে এই পৃথিবীর লয়প্রাপ্তি তথা রোয কিয়ামাতের আলামতসমূহ এবং আখিরাত বা পরজগতের অবস্থার কথাও ব্যাপক ও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। হাজী খলীফা তাঁর সুপ্রসিদ্ধ 'কাশফুয্ যুনূন' গ্রন্থে বলেন ঃ

আল্লামা হাফিয ইব্‌ন কাসীর তাঁর অবধারিত মৃত্যুর দুই বছর পূর্ব পর্যন্ত সংঘটিত সমস্ত ঘটনাবলীকে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। বিশেষ করে এতে সীরাতুন্নাবী অংশকে বেশ চমৎকার ও সার্থকভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

৪। اَلْهَدْىُ وَالسُّنَنُ فِىْ اَحَادِيْث الْمَسَانِيْد وَالسُّــــنَن 'আল-হাদয়ু ওয়াস সুনান ফী আহাদিসিল মাসানীদে ওয়াস সুনান'। এই গ্রন্থখানি 'জামিউল মাসানীদ' নামেও প্রসিদ্ধ। এতে 'মুসনাদ আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল', 'মুসনাদ বায্‌যার, 'মুসনাদ আবূ ইয়ালা', 'মুসনাদ ইব্‌ন আবী শাইবা' এবং সাহিহায়িন এবং সুনান চতুষ্টয়ের রিওয়ায়াতগুলিকে একত্র করে বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

৫। طَبَقَـــاتُ السَّــــافعيَّة তাবাকাতুশ শাফিঈয়াহ। এই গ্রন্থে শাফিঈ ফকীহদের বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে।

৬। شَرْحُ صَـــحِيْحِ الْبُخَـــارِىْ 'শারহু সাহীহিল বুখারী'। গ্রন্থকার ইব্‌ন কাসীর বুখারীর এই ভাষ্যটি লিখতে শুরু করেছিলেন এবং এ কাজে বেশ কিছুদূর তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তা' সম্পূর্ণ করতে পারেননি।

৭। اَلاَحْكَـــامُ الْكَبِيْـــرُ 'আল-আহ্‌কামুল কাবীর'। এ গ্রন্থখানিতে তিনি শুধুমাত্র আহ্‌কাম বা অনুশাসন সম্পর্কিত হাদীসগুলিকে বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু 'কিতাবুল হাজ্জ' পর্যন্ত পৌঁছে আর বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেননি।

৮। اخْتِصَارُ عُلُوْمِ الْحَدِيْث 'ইখতিসারু উলূমিল হাদীস' আল্লামা নওয়াব সিদ্দীক হাসান খাঁ ভূপালী তাঁর 'মিনহাযুল উসূল ফী ইসতিলাহি আহাদীসির্‌ রাসূল' গ্রন্থে এর নাম اَلْبَاعِثُ الْحَدِيْثُ عَلَى مَعْرِفَةِ عُلُوْمِ الْحَـــدِيْث 'আল বা'ইসুল হাদীস 'আলা মা'রিফাতে উলূমিল হাদীস' বলে উল্লেখ করেছেন। এটি আল্লামা ইব্‌নস সালাহ (মৃত্যু ৬৪৩ হিজরী) লিখিত সুপ্রসিদ্ধ উসূলুল হাদীসের কিতাব 'উলূমিল হাসীস' ওরফে 'মুকাদ্দিমা ইব্‌নুস সালাহ' مُقَدَّمَـــةُ ابْنُ الصَّـــلاَحِ গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার। গ্রন্থকার ইব্‌ন কাসীর এর স্থানে স্থানে বহু সুন্দর জ্ঞাতব্য বিষয় বিশদভাবে সংযোজন করেছেন।

৯। مُسْنَدُ الشَّيْخَيْن 'মুসনাদুস শাইখাইন'। এতে আবূ বাকর (রাঃ) এবং 'উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ সংগৃহীত হয়েছে। গ্রন্থকার ইব্‌ন কাসীর (রহঃ) তাঁর 'ইখতিসারু 'উলূমিল হাদীস' গ্রন্থে আর একখানি 'মুসনাদে উমর' নামক গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এটা একটা স্বতন্ত্র গ্রন্থ, না কি উপরিউক্ত গ্রন্থেরই দ্বিতীয় খণ্ড তা সঠিকভাবে জানা যায়না।

১০। اَلسِّيْرَةُ النَّبُوِيَّـــةُ 'আসসীরাতুন নাবভীয়াহ'। এ একখানি বৃহদাকার উৎকৃষ্ট সীরাত গ্রন্থ।

১১। تَخْرِيجُ اَحَادِيْـــث اَدِلَّـــةِ التَّنْبِيْـــةِ 'তাখরীজু আহাদীসি আদিল্লাত তামবীহ'।

১২। مُخْتَصَرُ كِتَابِ الْمَدْخَلِ للاِمَـــامِ الْبَيْهَقِـــىْ 'মুখতাসার কিতাবুল মাদখাল লিল ইমাম বাইহাকী'। এই গ্রন্থের নাম গ্রন্থকার স্বয়ং 'ইখতিসারু 'উলূমিল হাদীস' এর ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন। এটি ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হুসাইন আল বাইহাকী (৪৫৮ হিজরী) কৃত 'কিতাবুল মাদখালের' সংক্ষিপ্ত সার।

১৩। رِسَالَةُ الاِجْتِهَادِ فِىْ طَلَـــبِ الْجِهَـــادِ 'রিসালাতুল ইজতিহাদ ফী তালাবিল জিহাদ'। খৃষ্টানরা যখন 'আয়াস' দূর্গ অবরোধ করে সেই সময়ে তিনি এই পুস্তিকাখানি আমীর মনজাকের উদ্দেশে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এটি মিসর থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

মোট কথা, তার লিখিত পবিত্র কুরআনের তাফসীর, হাদীসে রাসূল (সঃ), সীরাতুন্নবী (সঃ), ইতিহাস, ফিক্‌হ শাস্ত্র ইত্যাদি সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী আজও বেশ জনপ্রিয়, সবার কাছে বিশেষ সমাদৃত ও দলমত নির্বিশেষে গ্রহণীয়। প্রায় সকল যুগের ঐতিহাসিকবৃন্দ ও তাফসীরকারগণ তাঁর ইতিহাস ও তাফসীর সম্বন্ধীয় এবং অন্যান্য গ্রন্থাবলীর প্রভূত প্রশংসা করেন।

ইব্‌ন কাসীরের মৃত্যু

অবধারিত মৃত্যুর আগে এই নশ্বর জীবনের শেষভাগে হাফিয ইব্‌ন কাসীর দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েন। অতঃপর ১৩৭২ খৃষ্টাব্দ মুতাবিক ৭৭৪ হিজরীর ২৬ শা'বান রোজ বৃহস্পতিবার এই মহামনীষী অস্থায়ী দুনিয়ার বুক থেকে বিদায় নিয়ে আখিরাতের সেই অনন্তলোকে যাত্রা করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

অনুবাদক পরিচিতি

১৯৩৬ সালে বাবলাবোনা নামক এক ছায়া ঢাকা নিভৃত গ্রামে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান এর জন্ম। পিতা অধ্যাপক মওঃ আবদুল গণী সাহেবের কাছেই তার প্রথম হাতে খড়ি। প্রথমে রাজশাহী নবাবগঞ্জের পার্শ্ববর্তী গ্রাম এবং পরে ঢাকা সরকারী আলিয়া মাদ্রাসা থেকে কৃতিত্বের সাথে কামিল পাশ করেন ১৯৫৫ সালে। ১৯৬২ সালে লাহোর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. ও. এল ডিগ্রী নিয়ে তিনি দাদনচকে প্রথম স্তরের ডিগ্রী কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। তার পিতা আবদুল গণী সাহেবও এককালে ওখানে অধ্যাপনা করতেন।

সেখান থেকে চলে গিয়ে তিনি নবাবগঞ্জ ডিগ্রী কলেজে অধ্যাপনা করার সময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, এ, পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করেন। ১৯৬৭ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিভাগের প্রভাষক হন। পরবর্তীতে আরাবী বিভাগের সভাপতি, সহযোগী অধ্যাপক এবং সর্বশেষ তিনি অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারেও তিনি কিছু দিন উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসাবে কাজ করেছিলেন। ১৯৮১ সালের শুরুতে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। বর্তমানে তিনি নিউইয়র্ক শহরে একটি ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্রের পরিচালক।

গতিশীল প্রবন্ধকার হিসাবে ঢাকার ছাত্র জীবন থেকেই তিনি বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। বিভিন্ন ভাষায় তার প্রবন্ধমালা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়েছে এবং পরবর্তীতে নয়াদিল্লী, বেনারস ও ইসলামাবাদ থেকে পুস্তাকাকারে প্রকাশিত হয়ে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়।

ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমানের সাহিত্য কর্ম ও রচনা শৈলীর অধিকাংশই ইসলামী সাহিত্যকে নিয়ে অনুবর্তিত। এ নিয়েই তার নশ্বর জীবন হয়ে উঠেছে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। দেশ-বিদেশের বহু সাময়িক পত্র-পত্রিকায়, বিভিন্ন শিক্ষায়তন এবং উচ্চতম বিদ্যাপীঠের ম্যাগাজিনে বহু মৌলিক এবং ভাষান্তরিত প্রবন্ধাবলী, নাটিকা, ছোট গল্প ইত্যাদি প্রকাশ পায়। বিগত রাষ্ট্র-বিপ্লব ও গণ-

আন্দোলন জনিত ধ্বংস যজ্ঞের শিকার হয়ে তার বেশ কিছু পাণ্ডুলিপি বিনষ্ট ও অবলুপ্ত হয়ে গেছে চিরতরে।

একাধারে ৪-৫টি ভাষায় সমান পারদর্শী এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাষাসমূহের প্রায় সবটাতেই তার কিছু না কিছু বই পুস্তক ও প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হয়েছে। তিনি শিশু সাহিত্যেরও চর্চা করে থাকেন। তার লিখা "বটগাছের ভূত", "মৃত্যুর ভয়", ছোটদের ইব্‌ন বতুতা প্রভৃতি লিখাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

বিভিন্ন ভাষায় লিখিত তার বইগুলির মধ্যে "মাযামীনে মুজীব" (নয়া দিল্লী থেকে প্রকাশ) 'ইমাম বুখারী' 'ইমাম মুসলিম' 'মুহাদ্দিস প্রসঙ্গ' 'হযরত ইবরাহীম' 'আল্লামা জারুল্লাহ' 'মুসলমানদের সাহিত্য সাধনা' 'ইসলামী সাহিত্যে তসলিমুদ্দীন', 'মিসরের ছোট গল্প' 'মার্গারেট', 'স্মৃতিময় শৈশব' 'কুরআন কণিকা' 'তাফসীর ইব্‌ন কাসীর' 'আরবী সাহিত্যের ইতিহাস' 'মাদীনার আনসার ও হযরত আবূ আইউব আনসারী', 'কুরআনের চিরন্তন মুজিযা' 'বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা' 'মওঃ মুহাম্মদ জুনাগড়ী (রহঃ), 'নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামায', 'ইদ্রিস মিয়া', 'মুহাদ্দিস আযীমাবাদী' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখ্যের দাবীদার। উপরোক্ত বিষয়বস্তুই হচ্ছে তার রচনাশৈলী ও সাহিত্য চর্চার প্রধান উপজীব্য বিষয়।

স্বীয় মাতৃভাষা বাংলায় রচিত তার অধিকাংশ রচনাশৈলীর মাধ্যমে এই ভাষা ও সাহিত্যের ইসলামী ধারাটিকে সুসমৃদ্ধ ও সরস করে তুলতে তিনি সক্ষম হয়েছেন। এভাবে মুসলিম মানস ও ব্যক্তিত্ব, ইতিহাস এবং প্রাসঙ্গিক বিষয় বস্তুগুলিকে নতুন আঙ্গিকে প্রথম বারের মতো তিনি বিদগ্ধ পাঠক মহলের সামনে তুলে ধরতে পেরেছেন। এসব রচনাশৈলী ও সাহিত্যধারা প্রকৃত প্রস্তাবে তার অনুসন্ধিৎসু পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণা মূলক মনোবৃত্তিরই পরিচায়ক। এ সবের মাধ্যমে বহু অজ্ঞাত ইতিহাস এবং দূর্লভ ও অপ্রাপ্তব্য তত্ত্ব ও তথ্যের সাথে আমাদের সম্যক পরিচয় ঘটেছে।

একান্তই নিঃস্ব, রিক্ত ও নিঃসহায়দের যুগ যন্ত্রণা বুকের মাঝে পুষে রেখে এক মাত্র আল্লাহর আশীষ ধারাকে রক্ষাকবজ করে শিক্ষকতার মাধ্যমে তার এই ক্ষণস্থায়ী নশ্বর জীবনের সূত্রপাত ঘটে। প্রায় তিন যুগ ধরে নিরলস

শিক্ষাদান ও লাগাতার সাহিত্য সেবাই তার জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য। বিষয়বস্তুর গভীরতম প্রদেশে অনুপ্রবেশ করে তথ্যানুসন্ধানের আজন্ম প্রবণতাই তার সম্মুখ পানে হাজির করেছে পরিশীলিত বাণী আর তার সাহিত্য সৃষ্টিতে যুগিয়েছে বিচিত্র ধরণের মাল-মসলা এবং উপাদান উপকরণ। নিরন্তর সাহিত্য সৃষ্টিতে তার বিচিত্র অর্ন্তদৃষ্টি ও বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সমাহার ঘটেছে উপর্যুপরি প্রকাশিত গ্রন্থমালায়। অবিশ্রান্ত সংগ্রাম এবং অবিরাম প্রচেষ্টার মাধ্যমেই তিনি প্রথমে উপনীত হয়েছেন গন্ড-গ্রাম-গঞ্জের নিভৃত কোণ থেকে শহরে বন্দরে এবং পরে রাজধানী নগরে, আর সর্বশেষ এসেছেন সুদূর আমেরিকার মাটিতে তথা নিউইয়র্ক নগরীতে। বর্তমানে তিনি এই শহরে এই উচ্চাঙ্গের শিক্ষা কেন্দ্রের (এডুকেশন সেন্টার) পরিচালক।

কিন্তু এই সুদূর প্রবাসের অতি ব্যস্ত এবং সংগ্রাম মুখর জীবনেও তার লেখনী কিংবা সাহিত্য চর্চায় কোন রূপ ছেদ বা ভাটা পড়েনি, বরং তার বলিষ্ঠ কলমের মাধ্যমে তা পূর্বের মতোই রয়েছে চির চলমান এবং সদা আগুয়ান।

সূচনা

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য যিনি স্বীয় কিতাব কুরআন মাজীদকে **الْحَمْدُ** দ্বারা শুরু করেছেন এবং বলছেন ঃ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ. ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ. مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ

অন্য স্থানে বলেন ঃ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰتِ وَٱلنُّورَ ۖ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন আলো ও অন্ধকার; এ সত্ত্বেও যারা কাফির হয়েছে তারা অপর কিছুকে তাদের রবের সমকক্ষ নিরূপণ করেছে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১) এরূপভাবে তিনি তাঁর সৃষ্টজীবের সমাপ্তিও স্বীয় প্রশংসার মাধ্যমে করেছেন। জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীর পরিণাম সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

وَتَرَى ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ حَآفِّينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۖ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ.

এবং তুমি মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে দেখতে পাবে যে, তারা আরশের চতুস্পার্শ্বে ঘিরে তাদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে। আর তাদের বিচার করা হবে ন্যায়ের সাথে। বলা হবে ঃ প্রশংসা জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহর প্রাপ্য। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৭৫) এজন্যই আল্লাহ তা'আলার ফরমান রয়েছে ঃ

وَهُوَ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِى ٱلْأُولَىٰ وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই; দুনিয়া ও আখিরাতে প্রশংসা তাঁরই, বিধান তাঁরই আয়ত্ত্বাধীন; তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৭০)

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য যিনি স্বীয় রাসূলদেরকে পাঠিয়েছেন। এ প্রসংঙ্গে তিনি বলেন ঃ

رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

আমি সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শক রূপে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি যাতে রাসূলগণের পরে লোকদের মধ্যে আল্লাহ সম্বন্ধে কোন অপবাদ দেয়ার অবকাশ না থাকে এবং আল্লাহ পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৬৫)

ঐ সকল রাসূলের ক্রম পরম্পরা এমন নিরক্ষর আরাবী নাবী দ্বারা শেষ করেছেন যিনি সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল পথের সন্ধান দিয়েছেন। তাঁর সময় থেকে শুরু করে কিয়ামাত পর্যন্ত সমস্ত জিন ও মানবের কাছে তিনি নাবী রূপে প্রেরিত হয়েছেন। পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে ঃ

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ ۖ فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِىِّ ٱلْأُمِّىِّ ٱلَّذِى يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَٰتِهِۦ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

বল ঃ হে মানবমন্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি, যিনি আকাশ ও ভূ-মন্ডলের সার্বভৌমত্বের একচ্ছত্র মালিক, তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। সুতরাং আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর সেই বার্তাবাহক নিরক্ষর নাবীর প্রতি ঈমান আনয়ন কর। যে আল্লাহ ও তাঁর কালামে বিশ্বাস স্থাপন করে থাকে, তোমরা তারই অনুসরণ কর। আশা করা যায়, তোমরা সরল সঠিক পথের সন্ধান পাবে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৫৮) আরও এক জায়গায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন ঃ

لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ ۚ

যেন আমি তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এটি পৌঁছবে তাদের সকলকে এর দ্বারা সতর্ক করি। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৯) সুতরাং আরাব, অনারাব, কালো ও সাদা যে মানুষের নিকট এই কুরআনের উদাত্ত বাণী পৌঁছেছে, আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সকলের জন্যই ভয় প্রদর্শক। এই জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَن يَكْفُرْ بِهِۦ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ

অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে ব্যক্তি এই কুরআন অমান্য করবে, তাহলে জাহান্নাম হবে তার প্রতিশ্রুত স্থান। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১৭) অন্যত্র পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হচ্ছে ঃ

فَذَرْنِى وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ

যারা আমাকে এবং এই বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে ছেড়ে দাও আমার হাতে, আমি তাদেরকে এমনভাবে ক্রমে ক্রমে ধরব যে, তারা জানতে পারবেনা। (সূরা কলম, ৬৮ ঃ ৪৪) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

‘আমার পয়গাম্বরী এত ব্যাপক যে, আমি প্রত্যেক লাল ও কালোর প্রতি নাবীরূপে প্রেরিত হয়েছি।’ মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, ‘অর্থাৎ প্রত্যেক দানব এবং মানবের প্রতি।’ (আহমাদ ৫/১৪৫) সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত দানব ও মানবের নিকট আল্লাহর বার্তাবাহক, সকলের নিকট তিনি মহিমান্বিত আল্লাহর বাণী ও মর্যাদাপূর্ণ কুরআন ঠিকভাবেই পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবেনা। সম্মুখ হতেও নয়, পশ্চাৎ হতেও নয়; এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসাহ আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ৪২) সুতরাং আলেম সমাজের প্রধান কর্তব্য হল সবার কাছে আল্লাহর এই পবিত্র বাণীর ভাব ও মর্ম প্রকাশ করে দেয়া, এর সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করা, যথা নিয়মে এর পঠন পাঠন নিজে শিক্ষা করা ও অপরকে শিক্ষা দেয়া। আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন ঃ

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُۥ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوْا۟ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ

আর যখন আল্লাহ, যাদেরকে গ্রন্থ প্রদান করা হয়েছে তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন, তারা নিশ্চয়ই এটি লোকদের মধ্যে ব্যক্ত করবে এবং তা গোপন করবেনা; কিন্তু তারা ওটা তাদের পশ্চাতে নিক্ষেপ করল এবং ওটা অল্প মূল্যে বিক্রি করল। অতএব তারা যা ক্রয় করেছিল তা নিকৃষ্টতর। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৮৭) এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা অন্যত্র বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَـٰنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَـٰٓئِكَ لَا خَلَـٰقَ لَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর প্রতি অঙ্গীকার ও স্বীয় শপথ সামান্য মূল্যে বিক্রি করে, পরকালে তাদের কোনই অংশ নেই এবং উত্থান দিবসে আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেননা এবং তাদের প্রতি দৃষ্টিপাতও করবেননা এবং পরিশুদ্ধও করবেননা। তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৭৭)

সুতরাং আমাদের পূর্বে যেসব উম্মাতকে আসমানী কিতাব দেয়া হয়েছিল, তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল এবং দুনিয়া লাভের কাজে মগ্ন হয়েছিল ও আল্লাহ তা'আলার নিষিদ্ধ জিনিসের পিছনে পড়ে মহান আল্লাহর কিতাবকে পরিত্যাগ করেছিল, আল্লাহ তা'আলা তাদের জঘন্য কাজের কথা বর্ণনা করেছেন। সুতরাং আমাদের মুসলিম সমাজের উচিত যে, আমরা যেন এমন কাজ না করি যা নিন্দার কারণ হয়, বরং আল্লাহর নির্দেশাবলীকে মনঃপ্রাণ দিয়ে অবনত মাথায় পালন করা এবং পবিত্র কুরআন শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়ার কাজে ব্যস্ত থাকাই হবে আমাদের একমাত্র কর্তব্য। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন ঃ

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَـٰسِقُونَ. ٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يُحْىِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْـَٔايَـٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

যারা ঈমান আনে তাদের হৃদয় ভক্তি-বিগলিত হওয়ার সময় কি আসেনি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে? এবং পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের মত যেন তারা না হয়, বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে পড়েছিল। তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী। জেনে রেখ, আল্লাহই ধরিত্রীকে ওর মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। আমি নিদর্শনগুলি তোমাদের জন্য বিশদভাবে ব্যক্ত করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ১৬-১৭)

এই দুই আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, কি সুন্দরভাবে বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, এভাবে বৃষ্টির সাহায্যে শুষ্ক ভূমি সতেজ হয়ে উঠে, ঠিক তেমনিভাবে যে অন্তর অবাধ্যতা ও পাপের কারণে শক্ত হয়ে গেছে, ঈমান ও হিদায়াতের ফলে তা নরম ও দ্রবীভূত হয়ে থাকে। পরম দাতা ও দয়ালু বিশ্ব-প্রভুর কবূলের প্রতি আশা-ভরসা রেখে আমরাও আকুল প্রার্থনা জানাচ্ছি যে, তিনি যেন আমাদের অন্তরকেও নরম করে দেন। আমীন!

কিভাবে কুরআনের তাফসীর করতে হবে

তাফসীরের ব্যাপারে উত্তম ও সঠিক নিয়ম এই যে, কুরআনের তাফসীর কুরআন দ্বারাই হবে। কারণ কুরআন মাজীদের বর্ণনা এক স্থানে সংক্ষিপ্ত হলেও অন্য স্থানে তার বিস্তারিত বর্ণনা ও ব্যাখ্যাও রয়েছে। তারপর কোন অসুবিধার ক্ষেত্রে কুরআনের তাফসীর সাধারণতঃ হাদীস দ্বারাই হয়ে থাকে। কারণ হাদীস কুরআন কারীমেরই ব্যাখ্যা ও তাফসীর। বরং ইমাম আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইদরীস শাফিঈ (রহঃ) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সমস্ত নির্দেশ প্রদান করেন কুরআন মাজীদ থেকেই অনুধাবন করার পর। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا

নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি, যেন তুমি তদনুযায়ী মানুষদেরকে আদেশ প্রদান কর, যা আল্লাহ তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং তুমি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষে বিতর্ককারী হয়োনা। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১০৫) আরও এক জায়গায় ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِى ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ ۙ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

আমি তো তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছি যারা এ বিষয়ে মতভেদ করে তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য এবং মু'মিনদের জন্য পথ-নির্দেশ ও দয়া স্বরূপ। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৬৪) অন্য একস্থানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

তাদের প্রেরণ করেছিলাম স্পষ্ট নিদর্শন ও গ্রন্থসহ এবং তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি মানুষকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল, যাতে তারা চিন্তা ভাবনা করে। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৪৪) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

‘আমাকে কুরআন কারীম দেয়া হয়েছে এবং তার সঙ্গে তারই মত আরও একটি জিনিস দেয়া হয়েছে।’ (আহমাদ ৪/১৩১)

এর ভাবার্থ হচ্ছে সুন্নাত। এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, হাদীসসমূহও আল্লাহরই প্রত্যাদেশ। কুরআন মাজীদ যেমন ওয়াহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে তেমনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসও আল্লাহর অবতীর্ণ বাণী। কিন্তু কুরআন ওয়াহী মাতলু’[১] এবং হাদীসসমূহ ওয়াহী গায়ের মাতলু’। সুতরাং এরই উপর ভিত্তি করে যখন কোন আয়াতের তাফসীর কুরআন ও হাদীসের মধ্যে পাওয়া না যাবে তখন সাহাবীগণের (রাঃ) কথার দিকে ফিরে যাওয়া উচিত। তাঁরা কুরআনের তাফসীর খুব ভাল জানতেন, কারণ যে ইঙ্গিত ও অবস্থা তখন ছিল তার সম্যক জ্ঞান তাঁদের থাকতে পারে যাঁরা সেই সময়ে স্বশরীরে বিদ্যমান ছিলেন। তাছাড়া পূর্ণ বিবেক, বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং সৎ আমল তাঁরাই লাভ করেছিলেন। বিশেষ করে ঐ সব মহামানব যাঁরা তাঁদের মধ্যেও বড় মর্যাদাসম্পন্ন এবং বিদগ্ধ আলেম ও চিন্তাবিদ ছিলেন, যেমন চারজন খলীফা যাঁরা অত্যন্ত সৎ ও হিদায়াত প্রাপ্ত ছিলেন, অর্থাৎ আবূ বাকর (রাঃ), উমার (রাঃ), উসমান (রাঃ), আলী (রাঃ) এবং যেমন আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ)। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ ‘সেই আল্লাহর শপথ, যিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, আল্লাহর কিতাবের এমন কোন আয়াত নেই যার সম্পর্কে আমার বিলক্ষণ জানা নেই যে, তা কি ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং কোথায় অবতীর্ণ হয়েছিল। যদি আমি জানতাম যে, আল্লাহর এই পবিত্র কিতাবের জ্ঞান আমার চেয়ে আর কারও বেশি আছে এবং সেখানে কোনও প্রকারে পৌঁছা সম্ভব হয় তাহলে অবশ্যই তাঁর কাছে হাযির হয়ে তাঁর অনুগত বাধ্য ছাত্র হিসাবে আমি নিজেকে পেশ করতাম।’ এ ছাড়া আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) তাঁদেরই মধ্যে কুরআনের একজন বিশেষজ্ঞ ও বিদগ্ধ পণ্ডিত

[১] ওয়াহী মাতলু’ -কুরআন হাকীম যা সালাতে পাঠ করলে সালাত আদায় হয়ে থাকে। আর ওয়াহী গায়ের মাতুল’ হাদীসসমূহ যা সালাতে পাঠ করলে সালাত আদায় হয়না।

ছিলেন। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাতো ভাই এবং কুরআন মাজীদের একজন প্রথিতযশা ব্যাখ্যাতা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং তাঁর জ্ঞানের প্রাচুর্যের জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা জানিয়ে বলেছিলেন ঃ

اَللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَعَلِّمْهُ التَّاوِيْلَ

হে আল্লাহ! আপনি তাকে ধর্মের প্রকৃত প্রজ্ঞা দান করুন এবং পবিত্র কুরআনের তাফসীরেরও জ্ঞান দান করুন। (ফাতহুল বারী ১/২০৫) আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলতেন ঃ ‘কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যাকারী হলেন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ)।’ (তাবারী ১/৯০) আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদের (রাঃ) এই কথাকে সামনে রেখে চিন্তা করুন যে, তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল হিজরী ৩২ সনে, আর আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) তাঁর পরেও সুদীর্ঘ ৩৬ বছর জীবিত ছিলেন, তাহলে সেই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে তিনি ধর্মীয় জ্ঞানে কত না উন্নতি লাভ করে থাকবেন! আবূ অয়েল (রহঃ) বলেন ঃ ‘আলীর (রাঃ) যুগে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হাজ্জের দলপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি ভাষণে সূরা বাকারাহ পাঠ করেন এবং এমন সুন্দরভাবে তাফসীর করেন যে, যদি তুরস্ক, রোম ও দহিলামের কাফিররা তা শুনত তাহলে তারাও তৎক্ষণাৎ বিনা বাক্যে মুসলিম হয়ে যেত।’ (তাবারী ১/৮১) কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, তিনি উক্ত ভাষণে সূরা নূরের তাফসীর করেছিলেন।

এ কারণেই ইসমাঈল ইব্‌ন আবদুর রাহমান সুদ্দী কাবীর স্বীয় তাফসীরে ঐ দুই মহান ব্যক্তির অধিকাংশ তাফসীর নকল করে থাকেন। কিন্তু আহলে কিতাব থেকে এই সম্মানিত ব্যক্তি মাঝে মাঝে যে বর্ণনা নিয়ে থাকেন তাতেও তিনি ব্যক্ত করেন যে, বানী ইসরাঈল থেকে রেওয়ায়িত গ্রহণ করা বৈধ। সহীহ বুখারীতে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

‘একটি আয়াত হলেও তোমরা তা আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দিবে। বানী ইসরাঈল হতে বর্ণনা নেয়ায়ও কোন দোষ নেই। ইচ্ছাপূর্বক আমার পক্ষ হতে মিথ্যা কথা প্রচারকারী সরাসরি জাহান্নামী।’ ইয়ারমুকের যুদ্ধে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রাঃ) ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের কিতাবদ্বয়ের দু’টি পাণ্ডুলিপি পেয়েছিলেন। এই হাদীসটিকে লক্ষ্যবস্তু করে ঐ পুস্তকদ্বয়ের কথাগুলোকেও তিনি নকল করতেন।

ইসরাঈলী বর্ণনা ও কিচ্ছা-কাহিনী

স্মরণ রাখা দরকার যে, বানী ইসরাঈলের বর্ণনাগুলো শুধুমাত্র ধর্মীয় নীতির পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রহণ করা যায়, তা থেকে ধর্মীয় নীতি সাব্যস্ত হতে পারেনা। বানী ইসরাঈলের বর্ণনাগুলি তিন ভাগে বিভক্ত ঃ

(১) যেগুলির সত্যতা স্বয়ং আমাদের এখানেই বিদ্যমান রয়েছে। অর্থাৎ যদি পবিত্র কুরআনের কোন আয়াত বা হাদীসের অনুরূপ কোন বর্ণনা বানী ইসরাঈলের কিতাবেও পাওয়া, তার সত্যতায় কোন মতবিরোধ নেই।

(২) যেগুলো মিথ্যা হওয়ার প্রমাণ আমাদের নিকটেই বিদ্যমান রয়েছে। অর্থাৎ ওটা কোন আয়াত বা হাদীসের উল্টো। ওটা অসত্য হওয়ায় কোন সন্দেহ নেই।

(৩) যেগুলোকে আমরা না পারি মিথ্যা বলতে, আর না পারি সত্য বলতে। যেহেতু আমাদের নিকট এমন কোন বর্ণনা নেই যা অনুরূপ হওয়ার কারণে আমরা তাকে সঠিক বলতে পারি বা এমন কোন বর্ণনা নেই যার উপর ভিত্তি করে আমরা ওকে মিথ্যা বা ভুল বলতে পারি। এই বর্ণনাগুলোও এরূপ যে, ওতে আমাদের ধর্মের কোন উপকার নেই। যেমন গুহাবাসীগণের নাম, ইবরাহীম (আঃ) যে পাখীগুলিকে খণ্ড খণ্ড করেছিলেন, অতঃপর আল্লাহর আদেশে ওরা জীবিত হয়েছিল ঐ পাখীগুলির নাম কি ছিল, যে নিহত ব্যক্তিকে মূসার (আঃ) যুগে গাভী যবাহ করে ওর একটি গোশত খণ্ড দ্বারা আঘাত করা হয়েছিল এবং যার ফলে আল্লাহর আদেশে সে পুনর্জীবিত হয়েছিল, ওটা কোন্ খণ্ড ছিল এবং কোন্ জায়গায় ছিল, আর সেটি কোন্ বৃক্ষ ছিল যার উপর মূসা (আঃ) আলো দেখেছিলেন এবং যেখান থেকে আল্লাহর কথা শুনেছিলেন ইত্যাদি। সুতরাং ওগুলি এমনই জিনিস যার উপর আল্লাহ তা'আলা যবনিকা নিক্ষেপ করেছেন, আর ঐগুলো জানায় বা না জানায় কোন লাভ বা ক্ষতি সম্পর্কে আমরা অজ্ঞাত রয়েছি এবং তাতে নিয়োজিত থাকলে ইহলৌকিক বা পারলৌকিক কোন উপকারও নেই।

তাবেঈগণের তাফসীর প্রসঙ্গ

কোন আয়াতের তাফসীর কুরআন, হাদীস এবং সাহাবীবৃন্দের কথার মধ্যে পাওয়া না গেলে ধর্মীয় ইমামগণের অধিকাংশের অভিমত এই যে, এরূপ স্থলে তাবেঈগণের তাফসীর নেয়া হবে। যেমন মুজাহিদ ইব্‌ন জাবর (রহঃ) যিনি তাফসীরের ব্যাপারে আল্লাহর একটি নিদর্শন ছিলেন। তিনি স্বয়ং বলেন ঃ 'আমি তিনবার প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত পবিত্র কুরআন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) নিকট শিখেছি ও বুঝেছি। একটি আয়াতকে জিজ্ঞেস করে করে এবং বুঝে বুঝে পড়েছি।

ইমাম ইব্‌ন জারির বর্ণনা করেন, ইব্‌ন আবী মুলাইকাহ (রহঃ) বলেন ঃ 'আমি স্বয়ং মুজাহিদকে (রহঃ) দেখেছি যে, তিনি কিতাব, কলম নিয়ে ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) নিকট যেতেন এবং কুরআনের তাফসীর জিজ্ঞেস করে করে তাতে নিরন্তর লিপিবদ্ধ করতেন। তিনি এভাবেই সম্পূর্ণ কুরআনের তাফসীর নকল করেন।' সুফইয়ান শাউরী (রহঃ) বলতেন যে, মুজাহিদ (রহঃ) কোন আয়াতের তাফসীর করে দিলে তার সত্যাসত্য যাচাই করা বাহুল্য মাত্র। তার তাফসীরই যথেষ্ট।

মুজাহিদের (রহঃ) মত সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) ক্রীতদাস ইকরিমাহ (রহঃ), 'আতা ইব্‌ন আবী রাবাহ্ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), মাসরুক ইব্‌ন আজদা' (রহঃ), সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ) প্রভৃতি তাবেঈ ও তাবে'তাবেঈগণের এবং তাঁদের পরবর্তী যুগের তাফসীর বিশ্বাসযোগ্যরূপে গণ্য করা হবে। কখনও এরূপও হয়ে থাকে যে, কোন আয়াতের তাফসীরের মধ্যে যখন ঐ সব আলেমগনের কথা বর্ণনা করা হয় এবং তাঁদের শব্দের মধ্যে বাহ্যত মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, তখন বিদ্যাহীন ব্যক্তিরা সেটিকে মৌলিক মতভেদ মনে করে বলে থাকে যে, এই আয়াতের তাফসীরে মতভেদ রয়েছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে এরূপ হয়না। বরং একটি জিনিসের ব্যাখ্যা কেহ হয়ত সংক্ষেপ করেছেন, কেহ হয়ত করেছেন ওর দৃষ্টান্তের দ্বারা, আবার কেহ হয়ত স্বয়ং ঐ জিনিসকেই বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এমতাবস্থায় শব্দের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হলেও অর্থ একই থাকে। এসব স্থলে জ্ঞানীদের সন্দেহে পতিত না হওয়াই উচিত। আল্লাহই সবার জন্য সঠিক পথের পরিচালক।

কারও মতামতের উপর ভিত্তি করে তাফসীর করা

শুধুমাত্র স্বীয় অভিমত দ্বারা তাফসীর করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যে ব্যক্তি কুরআনের মধ্যে স্বীয় মত ঢুকিয়ে দিল কিংবা না জেনে -শুনে কিছু বলে দিল, সে জাহান্নামের মধ্যে স্বীয় স্থান নির্দিষ্ট করে নিল।' তিরমিযী, নাসাঈ এবং আবূ দাঊদে এই হাদীসটি রয়েছে এবং ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান বলে আখ্যায়িত করেছেন।

জানা থাকলে বর্ণনা করতে হবে, অন্যথায় চুপ থাকতে হবে

এ কারণেই পূর্ব যুগের সালাফগণের একটি বড় দল না জেনে-শুনে তাফসীর করতে খুব ভয় করতেন, বরং তাঁদের সর্ব অবয়ব কেঁপে উঠত। আবূ বাকর সিদ্দীকের (রাঃ) উক্তি আছে ঃ 'যদি কুরআনের মধ্যে এমন কথা বলি যা আমার

জানা নেই তাহলে কোন্ মাটি আমাকে উঠাবে ও কোন্ আকাশ আমাকে ছায়া দিবে? একবার উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) وَ فَاكِهَةً وَّ اَبًا আয়াতটি পাঠ করেন। অতঃপর বলেন ঃ فَاكِهَةٌ কে তো আমি জানি, কিন্তু এই اَبٌ কি জিনিস?' তিনি নিজে নিজেই বলেন ঃ 'এই কষ্টের তোমার প্রয়োজন কি?' ভাবার্থ এই যে, اَبٌ এর অর্থ তো জানা আছে অর্থাৎ ভূমি হতে উৎপাদিত শস্য। কিন্ত ওর অবস্থা ও গুণ সম্পর্কে জানা নেই। স্বয়ং এই আয়াতেই বিদ্যমান রয়েছে,

فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا. وَعِنَبًا وَقَضْبًا

আমি যমীনের মধ্য হতে ফসল এবং আঙ্গুর উৎপাদন করেছি। (সূরা আ'বাসা, ৮০ ঃ ২৭-২৮) তাফসীর-ই- ইব্ন জারীরে বিশুদ্ধ সনদের সঙ্গে বর্ণিত আছে যে, ইব্ন আবী মুলাইকাহ্ (রহঃ) বলেন ঃ 'ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) কোন এক ব্যক্তি একটি আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞেস করলে তিনি কিছুই বর্ণনা করলেননা। অথচ যদি ওর তাফসীর আপনাদের মধ্যে কোন লোককে জিজ্ঞেস করা হত তাহলে তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়ে দিতেন।' অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করল ঃ

'কুরআনুল হাকীমের মধ্যে এক হাজার বছরের সমান একটি দিন উল্লেখ আছে, ওটা কি? ইব্ন আব্বাস (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'ঐ দিনটি হবে পৃথিবীর ৫০ হাজার বছরের সমান' এর অর্থ কী? লোকটি বলল ঃ আমি আপনাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছি। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বললেন ঃ আল্লাহ তাঁর কিতাবে এ ধরণের দু'টি দিনের কথা উল্লেখ করেছেন এবং তিনিই এ ব্যাপারে জ্ঞান রাখেন। যার কুরআনের কোন বিষয়ের জ্ঞান নেই সেই ব্যাপারে মন্তব্য করা আল্লাহ পছন্দ করেননা।

আল-লাইস (রহঃ) ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (রহঃ) কুরআন থেকে তার জানা বিভিন্ন বিষয়ে লোকদেরকে তা'লিম দিতেন। এ ছাড়া আইউব ইব্ন আউন (রহঃ) এবং হিসাম আদ-দাস্তআই (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন (রহঃ) বলেছেন ঃ আমি উবাইদাহকে (আস-সালমানী) কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ কুরআন নাযিলের বিভিন্ন প্রেক্ষাপট সম্পর্কে যারা জানতেন তারা তো দুনিয়া হতে বিদায় নিয়েছেন, সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক পথের অনুসন্ধান কর। শা'বি (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, মাসরুক (রহঃ) বলেছেন ঃ

তাফসীর করা থেকে সাবধান থেক, কারণ ইহা এমন বর্ণনা যার সাথে আল্লাহ তা'আলা জড়িত আছেন। (তাবারী)

মুসলিম ইব্‌ন ইয়াসার (রহঃ) বলতেন ঃ 'কুরআনের তাফসীর করার সময় তোমরা আগে পিছে দেখে নিও। কারণ এতে আল্লাহ তা'আলার প্রতি পূর্ণ সম্বন্ধ রেখে কথা বলা হচ্ছে।' মাসরুক (রহঃ) উক্তি করেন ঃ 'তাফসীরের ব্যাপারে তোমরা অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন কর, কেননা এতে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা হতে বর্ণনা করা হয়। (তাবারী ১/৮৬) এই সমুদয় উক্তি যা অতীতের মহান ব্যক্তিগণ হতে করা হয়েছে তাতে এ কথাই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়ে উঠেছে যে, ঐ সমস্ত আলেম কখনও না জেনে কুরআনের ভাবার্থের ব্যাপারে মুখ খুলতেননা।

এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, ঐসব সম্মানিত জ্ঞানী ব্যক্তি যখন কুরআনের তাফসীরের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করে তা হতে বিরত থাকতেন, তাহলে তাঁদের হতে তাফসীর কেন নকল করা হয়েছে? এর উত্তরে বলা যাবে যে, যা তাঁরা জানতেননা শুধু সেখানেই নীরব থাকতেন এবং যা জানতেন তা বর্ণনা করতেন। সুতরাং না জানা অবস্থায় নীরবতা অবলম্বন করা এবং জ্ঞাত বিষয় প্রকাশ করাই সকলের উচিত। পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হচ্ছে ঃ

لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُۥ

আর যখন যাদেরকে গ্রন্থ প্রদান করা হয়েছে তাদের কাছ থেকে আল্লাহ অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন, তারা নিশ্চয়ই এটি লোকদের মধ্যে ব্যক্ত করবে এবং তা গোপন করবেনা। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৮৭) হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

'যাকে ধর্মনীতি সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করা হয় এবং সে তা জানা সত্ত্বেও গোপন করে, কিয়ামাতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো হবে।' (আহমাদ, তিরমিযী ইত্যাদি)

মাক্কী ও মাদানী সূরাসমূহ

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ 'সূরা বাকারাহ (২), আলে ইমরান (৩), নিসা (৪), মায়িদাহ (৫), বারাআত ((৯), রা'দ (১৩), নাহল (১৬), হাজ্জ (২২), নূর (২৪), আহযাব (৩৩), মুহাম্মাদ (৪৭), ফাতহ্ (৪৮), হুযুরাত (৪৯), আর-রাহমান (৫৫), হাদীদ (৫৭), মুজাদালাহ (৫৮), হাশ্‌র (৫৯), মুমতাহানাহ (৬০), সাফ (৬১), জুমুআ (৬২), মুনাফিকূন (৬৩), তাগাবুন ৬৪), তালাক (৬৫), তাহরীম (৬৬), যিলযাল (৯৯) এবং নাসর (১১০) সূরাসমূহ মাদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং অন্যান্য সমুদয় সূরা মাক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে।

কুরআনের আয়াত সংখ্যা

কুরআনুল হাকীমের মোট আয়াত ৬ (ছয়) হাজার। এর চেয়ে বেশি আছে কিনা সে বিষয়ে কুরআন বিশেষজ্ঞদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। কারও কারও মতে এর চেয়ে বেশি নেই। কেহ কেহ বলেন যে, ছয় হাজারের চেয়ে আরও দু'শ চারটি আয়াত বেশি রয়েছে। কেহ কেহ মোট ছয় হাজার দু'শ চৌদ্দটির কথা উল্লেখ করেছেন। আবার কেহ দু'শ ঊনিশটি, কেহ দু'শ পঁচিশটি এবং কেহ দু'শ ছাব্বিশটির বেশীর কথা উল্লেখ করেছেন। আবূ আমর দানী 'কিতাবুল বায়ানের' মধ্যে এসব কথা লিপিবদ্ধ করেছেন।

কুরআনের মোট শব্দ ও অক্ষর

কুরআন মাজীদের শব্দ সম্পর্কে 'আতা ইব্‌ন ইয়াসার (রহঃ) বলেন যে, সাতাত্তর হাজার চারশ' উনচল্লিশটি শব্দ রয়েছে। অক্ষরের সংখ্যা সম্পর্কে মুজাহিদ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সম্পূর্ণ কুরআনুল হাকীমের মোট অক্ষর হল তিন লক্ষ একুশ হাজার একশ' আশিটি। ফযল ইব্‌ন 'আতা ইব্‌ন ইয়াসার (রহঃ) বলেন যে, মোট অক্ষর হল তিন লক্ষ তেইশ হাজার পনেরটি। হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ স্বীয় শাসনামলে কারী, হাফিয ও লেখকদের একত্রিত করে নির্দেশ দেন যে, তারা যেন কুরআনুল হাকীমের অক্ষরগুলি গণনা করে তাকে অবহিত করেন। তারা সর্বসম্মতিক্রমে হিসাব করে বলেন যে, কুরআনে মোট তিন লক্ষ সাতশ' চল্লিশটি অক্ষর রয়েছে।

কুরআনকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করা হয়েছে

হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ বলেন ঃ 'অক্ষর হিসাবে কুরআনের অর্ধাংশ কোথায় হবে আমাকে বলুন?' গণনা করে জানা গেল যে, সূরা কাহফ' এর وَلْيَتَلَطَّفْ. পর্যন্ত (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ১৯) কুরআনের ঠিক অর্ধাংশ হবে। আর সূরা বারাআতের (৯) একশ আয়াত পর্যন্ত কুরআনুল কারীমের এক তৃতীয়াংশ হবে। সূরা শু'আরা (২৬) এর একশ' আয়াতের সূচনার উপর বা একশ' এক আয়াতের সূচনার উপর কুরআন মাজীদের দুই-তৃতীয়াংশ হয় এবং সেখান হতে শেষ পর্যন্ত শেষ তৃতীয়াংশ। আর যদি কুরআন মাজীদের মানযিল গণনা করা যায়, অর্থাৎ যদি কুরআন কারীমকে সাত ভাগ করা হয় তাহলে প্রথম মানযিল صَدَّ এর د এর উপর শেষ হবে (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৫৫) যা নিম্নের আয়াতে রয়েছে ঃ

فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِۦ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ

দ্বিতীয় মানযিল শেষ হবে সূরা আ'রাফের যেখানে حَبِطَتْ (৭ ঃ ১৪৭) রয়েছে। তৃতীয় মানযিল শেষ হবে أُكُلُهَا (১৩ ঃ ৩৫) এর উপর গিয়ে যা সূরা রাদের মধ্যে বিদ্যমান। চতুর্থ মানযিল শেষ হবে সূরা হাজ্জের আয়াত جَعَلْنَا مَنسَكًا (২২ ঃ ৩৪) (আলিফ) এর উপর। পঞ্চম মানযিল শেষ হবে সূরা আহযাবের আয়াত وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ (৩৩ ঃ ৩৬) এর উপর। ষষ্ঠ মানযিল শেষ হবে সূরা ফাত্‌হ এর الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ (৪৮ ঃ ৬) এর উপর এবং সপ্তম মানযিল হল কুরআনুল হাকীমের শেষাংশ।

সালাম ইব্‌ন মুহাম্মাদ হামানী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, তাঁরা উপর্যুপরি চার মাস ধরে অক্লান্ত পরিশ্রমের পর এসব অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলি জানতে পারেন এবং তা সমসাময়িক শাসনকর্তা হাজ্জাজের কাছে বর্ণনা করেন। কেহ কেহ বলেন যে, হাজ্জাজ প্রতি রাতে নিয়মিতভাবে এক চতুর্থাংশ কুরআন তিলাওয়াত করতেন। কুরআনের প্রথম চতুর্থাংশ শেষ হয় সূরা আন'আম (৬) এর শেষ আয়াতে, দ্বিতীয় চতুর্থাংশ সূরা কাহফের وَلْيَتَلَطَّفْ (১৮ ঃ ১৯) শব্দের উপর হয় যা সমগ্র কুরআনের অর্ধাংশ। তিন চতুর্থাংশ হয় সূরা যুমার (৩৯) এর শেষের উপর এবং সম্পূর্ণ হয় কুরআনের শেষ সূরায় (সূরা নাস ঃ ১১৪)।

শাইখ আবূ আমরদানী স্বীয় পুস্তক 'কিতাবুল বায়ানে' এসব কথার মধ্যে যে ইখ্‌তিলাফ বা মতবিরোধ রয়েছে তা বর্ণনা করেছেন। আল্লাহই এ ব্যাপারে উত্তম জ্ঞাতা।

কুরআনুম মাজীদের অংশ বা খন্ড

কুরআন মাজীদের খণ্ড বা অংশসমূহ হচ্ছে সুপ্রসিদ্ধ ত্রিশটি পারা। সাহাবীগণ যে কুরআন মাজীদকে সাত মানযিলে বিভক্ত করে পড়তেন, এরূপ একটি বর্ণনাও হাদীসে রয়েছে। মুসনাদ আহমাদ, সুনান আবূ দাঊদ এবং সুনান ইব্‌ন মাজায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় সাহাবীগণকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ঃ 'আপনারা কুরআনের ওযীফা কিভাবে করেন'? উত্তরে তাঁরা বলেছিলেন ঃ ১ম তিন সূরায় এক মানযিল,

পরবর্তী পাঁচটি সূরায় ২য় মানযিল, এর পরবর্তী ৭টি সূরায় ৩য় মানযিল, পরবর্তী ৯টি সূরায় ৪র্থ মানযিল, এর পরবর্তী ১১টি সূরায় পঞ্চম মানযিল, পরবর্তী ১৩টি সূরায় ৬ষ্ঠ মানযিল এবং মুফাস্‌সালের অর্থাৎ সূরা কাফ হতে সূরা নাস অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত সপ্তম মানযিল। (আহমাদ, আবূ দাঊদ, ইব্‌ন মাজাহ) এভাবেই নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ (রাঃ) সাত মানযিলে বিভক্ত করে কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত করতেন।

'সূরা' শব্দের বিশ্লেষণ

سُوْرَةٌ শব্দের শাব্দিক আলোচনা করতে গিয়ে কেহ কেহ বলেন যে, এর অর্থ পৃথকীকরণ ও উচ্চতা। জাহেলী যুগের প্রখ্যাত কবি নাবিগার নিম্নের কবিতার মধ্যে سُوْرَةٌ শব্দটি এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَعْطَاكَ سُوْرَةً * تَرَى كُلَّ مَلَك دُوْنَهَا يَتَذَبْذَبُ

'তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ তোমাকে এমন মহান মর্যাদা দান করেছেন যা নিম্ন স্তর দিয়ে প্রতিটি রাজা-বাদশাহ ইতস্ততঃ আনাগোনা করে।' তবে কুরআনের সূরাসমূহের সঙ্গে এই অর্থের সম্পর্ক এভাবে হবে যে, যেন কুরআনের পাঠক এক সূরা বা উচ্চ মর্যাদা হতে আরও উচ্চতম মর্যাদার দিকে পৃথক পৃথকভাবে যেতে পারে বা আরোহণ করতে পারে। এ কথাও বলা হয়েছে যে, এর অর্থ হল উচ্চতা বা দেয়াল। এ জন্যই দূর্গ বা নগর প্রাকারকে আরাবী ভাষায় 'سُوَرٌ' বলা হয়। আবার কেহ কেহ বলেন যে, লোটা বা বর্তনের মধ্যে যে অংশ অবশিষ্ট থাকে তাকে আরাবী ভাষায় 'سُوْرَةٌ' বলা হয়। যেহেতু সূরাও পবিত্র কুরআনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাই একে সূরা নামে অভিহিত করা হয়েছে। অতঃপর 'হামযাহ'কে হালকা করে দিয়ে তাকে 'واؤ' এর সঙ্গে পরিবর্তন করা হয়েছে। একটি মত এটাও আছে যে, সূরার অর্থ হল সম্পূর্ণতা ও পরিপূর্ণতা। পূর্ণ উষ্ট্রীকে আরাবী ভাষায় 'سُوْرَةٌ' বলে। সম্ভবতঃ দূর্গকে 'سُوَرٌ' বলার কারণ এই যে, ওটা যেমন প্রাসাদকে ঘিরে থাকে ও একত্রিত করে থাকে ঠিক তেমনই সূরাও আয়াতসমূহকে জমা করে থাকে। কাজেই ওকে সূরা বলা হয়েছে। 'سُوْرَةٌ'

শব্দের বহুবচন 'سُوَرٌ' হয়, আবার কখনও কখনও 'سَوْرَاتٌ' এবং سَوَارَاتٌও হয়ে থাকে।

'আয়াত' শব্দের অর্থ

'আয়াত' এর শাব্দিক অর্থ হল চিহ্ন বা নিদর্শন। যেহেতু আয়াতের উপর বাক্য শেষ হয় এবং পূর্ববর্তী বাক্যটি পরবর্তী বাক্য হতে পৃথক হয় সেজন্য তাকে آيت বলা হয়। কুরআনুল হাকীমে آيت শব্দটি চিহ্ন বা নিদর্শনের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ إِنَّ آيَةَ مُلْكِه অর্থাৎ তাঁর (তালূত (আঃ) এর) বাদশাহ হওয়ার নিদর্শন বা চিহ্ন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৪৮)

أية এর অর্থ বিস্ময়করও হয়ে থাকে। যেহেতু এটা আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর জিনিস এবং অলৌকিক বিষয়, কোন মানুষই এ ধরনের কথা বলতে পারেনা, এজন্য একেও আয়াত বলা হয়। اَيَةٌ শব্দের বহুবচন اَىِ, اٰيَاىِ এবং اٰيَاتٌ হয়ে থাকে।

'কালেমাহ' শব্দের অর্থ

আরাবীতে একটি শব্দকে 'কালিমাহ' বলা হয়। কখনও কখনও ওতে দু'টি মাত্র অক্ষর থাকে। যেমন ما ، لا ، له ইত্যাদি। আবার কখনও বেশীও থাকে। খুব বেশি হলে 'কালিমাহ' এর মধ্যে দশটি অক্ষর আসে। যেমন لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ (২৪ ঃ ৫৫), أَنُلْزِمُكُمُوهَا (১১ ঃ ২৮) এবং فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ (১৫ ঃ ২২)। আবার কখনও একটি কালিমাহ দ্বারাই একটি আয়াত হয়। যেমন وَالْفَجْرِ (সূরা ফাজ্‌র, ৮৯ ঃ ১), وَالضُّحَى (৯৩ ঃ ১) এবং وَالْعَصْرِ (১০৩ ঃ ১)। অনুরূপভাবে কুফাবাসীদের নিকট الم ، طه ، يس ، حم প্রমুখ সূরাসমূহের প্রাথমিক শব্দগুলিও এক একটি আয়াত এবং حم عسق তাদের মতে দু'টি কালিমাহ এবং তারা ছাড়া অন্যেরা বলে যে, এইগুলি আয়াত নয়, বরং সূরাসমূহেরই প্রারম্ভিক শব্দ। আবূ

আমর আদ-দানী বলেন যে, ‘সূরা আর-রাহমানের مُدْهَامَّتَانْ (৫৫ ঃ ৬৪) শব্দটি ব্যতীত কুরআনের মধ্যে একটি কালিমাহ এর আয়াত আর নেই।

কুরআনে আরাবী শব্দ ব্যতীত আর কোন শব্দ আছে কি?

কুরতুবী বলেন, ‘জামহুর উলামা এ ব্যাপারে একমত যে, কুরআনের মধ্যে আরাবী ভাষা ছাড়া আজমী বা অনারাব ভাষার গঠন প্রণালী ও আঙ্গিক আদৌ নেই, তবে মাঝে মাঝে অনারাব নাম রয়েছে মাত্র; যেমন, ইবরাহীম, নূহ, লূত। এ ব্যাপারে অবশ্য মতভেদ রয়েছে যে, এগুলি ছাড়া কুরআনের মধ্যে অনারাবদের অন্য কিছু আছে কি না। ইমাম বাকিল্লানী এবং তাবারী তো পরিষ্কারভাবে এ কথা অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন যে, আজমিয়াত বা অনারাবের সঙ্গে যেটুকু সাদৃশ্য রয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে আরাবীই বটে, শুধুমাত্র বিভিন্ন ভাষায় কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে।

সূরা ১ ঃ ফাতিহা, মাক্কী

سُوْرَةُ الْفَاتِحَة مَاكِّ

(আয়াত ঃ ৭, রুকূ' ঃ ১)

(اَيَاتُهَا : ٧. رُكُوْعَاتُهَا : ١)

'ফাতিহা' শব্দের অর্থ এবং এর বিভিন্ন নাম

এই সূরাটির নাম 'সূরা আল্ ফাতিহা। কোন কিছু আরম্ভ করার নাম 'ফাতিহা' বা উদ্‌ঘাটিকা। কুরআনুল হাকীমের প্রথমে এই সূরাটি লিখিত হয়েছে বলে একে 'সূরা আল ফাতিহা বলা হয়। তাছাড়া সালাতের মধ্যে এর দ্বারাই কিরা'আত আরম্ভ করা হয় বলেও একে এই নামে অভিহিত করা হয়েছে। 'উম্মুল কিতাব'ও এর অপর একটি নাম। জামহুর বা অধিকাংশ ইমামগণ এ মতই পোষণ করে থাকেন। তিরমিযীর একটি বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

এই সূরাটি হল উম্মুল কুরআন, উম্মুল কিতাব, সাবআ' মাসানী এবং কুরআন আযীম'। এই সূরাটির নাম 'সূরাতুল হামদ' এবং 'সূরাতুস্ সালাত'ও বটে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'আমি সালাতকে (অর্থাৎ সূরা ফাতিহাকে) আমার মধ্যে এবং আমার বান্দাদের মধ্যে অর্ধেক অর্ধেক করে ভাগ করে দিয়েছি। যখন বান্দা বলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে।' (তিরমিযী ৮/২৮৩) এই হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, সূরা ফাতিহার নাম সূরা-ই-সালাতও বটে। কেননা এই সূরাটি সালাতের মধ্যে পাঠ করা শর্ত রয়েছে। এই সূরার আর একটি নাম সূরাতুশ্ শিফা। এর আর একটি নাম 'সূরাতুর রুকিয়্যাহ'। আবূ সাঈদ (রাঃ) সাপে কাটা রুগীর উপর ফুঁ দিলে সে ভাল হয়ে যায়। এ দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ

'এটা যে রুকিয়্যাহ (অর্থাৎ পড়ে ফুঁক দেয়ার সূরা) তা তুমি কেমন করে জানলে?' (ফাতহুল বারী ৪/৫২৯) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আবুল আলীয়া (রহঃ) বলেন যে, এই সূরাটি মাক্কী। কেননা এক আয়াতে আছে ঃ

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَـٰكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِى وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ

আমি তো তোমাকে দিয়েছি সাত আয়াত যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয় এবং দিয়েছি মহান কুরআন। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৮৭) আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

সূরা ফাতিহায় আয়াত, শব্দ ও অক্ষরের সংখ্যা

এ সূরার আয়াত সম্পর্কে সবাই একমত যে ওগুলি ৭টি। بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمـٰنِ الرَّحِيمِ এই সূরাটির পৃথক আয়াত কিনা তাতে মতভেদ রয়েছে। সমস্ত কারী, সাহাবী (রাঃ) এবং তাবেঈর (রহঃ) একটি বিরাট দল এবং পরবর্তী যুগের অনেক বয়োবৃদ্ধ মুরব্বী একে সূরা ফাতিহার প্রথম, পূর্ণ একটি পৃথক আয়াত বলে থাকেন। এই সূরাটির শব্দ হল পঁচিশটি এবং অক্ষর হল একশো তেরটি।

সূরা ফাতিহাকে উম্মুল কিতাব বলার কারণ

ইমাম বুখারী (রহঃ) সহীহ বুখারীর 'কিতাবুত্ তাফসীরে' লিখেছেন ঃ 'এই সূরাটির নাম উম্মুল কিতাব' রাখার কারণ এই যে, কুরআন মাজীদের লিখন এ সূরা হতেই আরম্ভ হয়ে থাকে এবং সালাতের কিরা'আতও এ থেকেই শুরু হয়। (ফাতহুল বারী ৮/৬)

একটি অভিমত এও আছে যে, যেহেতু পূর্ণ কুরআনুল হাকীমের বিষয়াবলী সংক্ষিপ্তভাবে এর মধ্যে নিহিত রয়েছে, সেহেতু এর নাম উম্মুল কিতাব হয়েছে। ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন ঃ আরাব দেশের মধ্যে এ প্রথা চালু আছে যে, তারা একটি ব্যাপক কাজ বা কাজের মূলকে ওর অধীনস্থ শাখাগুলির 'উম্ম' বা 'মা' বলে থাকে। যেমন أُمُّ الرَّاسِ তারা ঐ চামড়াকে বলে যা সম্পূর্ণ মাথাকে ঘিরে রয়েছে এবং সামরিক বাহিনীর পতাকাকেও তারা أُمٌّ বলে থাকে যার নীচে জনগণ একত্রিত হয়। মাক্কাকেও উম্মুল কুরা বলার কারণ এই যে, ওটাই সারা বিশ্ব জাহানের প্রথম ঘর। বলা হয়ে থাকে, পৃথিবী সেখান হতেই ব্যাপ্তি ও বিস্তার লাভ করেছে। (তাবারী ১/১০৭) মুসনাদ আহমাদে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'উম্মুল কুরা' সম্পর্কে বলেছেন ঃ 'এটাই 'উম্মুল কুরআন' এটাই 'সাবআ' মাসানী' এবং এটাই কুরআনুল আযীম।' (আহমাদ ২/৪৪৮) অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'ইহাই 'উম্মুল কুরআন,' ইহাই 'ফাতিহাতুল কিতাব' এবং ইহাই 'সাবআ' মাসানী।' (তাবারী ১/১০৭)

সূরা ফাতিহার ফাযীলাত

মুসনাদ আহমাদে আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ 'আমি সালাত আদায় করছিলাম, এমন সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ডাক দিলেন, আমি কোন উত্তর দিলাম না। সালাত শেষ করে আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ এতক্ষণ তুমি কি কাজ করছিলে?' আমি বললাম ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি সালাত আদায় করছিলাম।' তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলার এই নির্দেশ কি তুমি শুননি?

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱسْتَجِيبُوا۟ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ

হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দাও যখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের জীবন সঞ্চারের দিকে আহ্বান করেন। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ২৪) মাসজিদ হতে যাবার পূর্বেই আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, পবিত্র কুরআনের মধ্যে সবচেয়ে বড় সূরা কোন্‌টি। অতঃপর তিনি আমার হাত ধরে মাসজিদ হতে চলে যাবার ইচ্ছা করলে আমি তাঁকে তাঁর অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম। তিনি বললেন ঃ 'ঐ সূরাটি হল 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন'। এটাই সাবআ' মাসানী এবং এটাই কুরআন আযীম যা আমাকে দেয়া হয়েছে।' (আহমাদ ৪/২১১) এভাবেই এই বর্ণনাটি সহীহ বুখারী, আবূ দাঊদ, নাসাঈ এবং ইব্‌ন মাজাহয়ও অন্য সনদে বর্ণিত হয়েছে। (হাদীস নং ৮/৬, ২৭১; ২/১৫০, ২/১৩৯ এবং ২/১২৪৪) মুসনাদ আহমাদে আরও রয়েছে, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উবাই ইব্‌ন কা'বের (রাঃ) নিকট যান যখন তিনি সালাত আদায় করছিলেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ 'হে উবাই (রাঃ)! এতে তিনি (তাঁর ডাকের প্রতি) মনোযোগ দেন কিন্তু কোন উত্তর দেননি। আবার তিনি বলেন ঃ 'হে উবাই!' তিনি বলেন ঃ 'আস্‌সালামু আলাইকা।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'ওয়া আলাইকাস সালাম।' তারপর বলেন ঃ 'হে উবাই! আমি তোমাকে ডাক দিলে উত্তর দাওনি কেন?' তিনি বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি সালাত আদায় করছিলাম।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন উপরোক্ত আয়াতটিই পাঠ করে বলেন ঃ

‘তুমি কি يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ এই আয়াতটি শুননি?’

তিনি বলেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! হ্যাঁ (আমি শুনেছি), এরূপ কাজ আর আমার দ্বারা হবেনা।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন ঃ

‘তুমি কি চাও যে, তোমাকে আমি এমন একটি সূরার কথা বলি যার মত কোন সূরা তাওরাত, ইঞ্জীল এবং কুরআনে নেই? তিনি বলেন ঃ ‘হ্যাঁ অবশ্যই বলুন।’ তিনি বলেন ঃ এখান থেকে যাবার পূর্বেই আমি তোমাকে তা বলে দিব।’ অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার হাত ধরে চলতে চলতে অন্য কথা বলতে থাকেন, আর আমি ধীর গতিতে চলতে থাকি। এই ভয়ে যে না জানি কথা বলা বাকি থেকে যায়, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাড়ীতে পৌঁছে যান। অবশেষে দরজার নিকট পৌঁছে আমি তাঁকে তাঁর অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেই।’ তিনি বললেন ঃ ‘সালাতে কি পাঠ কর?’ আমি উম্মুল কুরা’ পাঠ করে শুনিয়ে দেই। তিনি বললেন ঃ

‘সেই আল্লাহর শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, এরূপ কোন সূরা তাওরাত, ইঞ্জীল, যাবুরের মধ্যে নেই যা কুরআনে রয়েছে। এটাই হল ‘সাবআ’ মাসানী’। (আহমাদ ২/৪১২, তিরমিযী ৮/২৮৩, হাকিম ১/৫৬০) জামে’উত তিরমিযীতে আরও একটু বেশি বর্ণিত আছে। তা হল এই ঃ

‘এটাই মহান কুরআন যা আমাকে দান করা হয়েছে।’ এই হাদীসটি সংজ্ঞা ও পরিভাষা অনুযায়ী হাসান ও সহীহ। আনাস (রাঃ) হতেও এ অধ্যায়ে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। মুসনাদ আহমাদেও এভাবে বর্ণিত আছে। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে পরিভাষার প্রেক্ষিতে হাসান গারীব বলে থাকেন। মুসনাদ আহমাদে আবদুল্লাহ ইব্ন যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ‘একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গমন করি। সে সময় সবেমাত্র তিনি সৌচক্রিয়া সম্পাদন করেছেন। আমি তিনবার সালাম দেই, কিন্তু তিনি উত্তর দিলেননা। তিনি বাড়ীর মধ্যেই চলে গেলেন। আমি দুঃখিত ও মর্মাহত অবস্থায় মাসজিদে প্রবেশ করি। অল্পক্ষণ পরেই পবিত্র হয়ে তিনি আগমন করেন এবং তিনবার সালামের জবাব দেন। অতঃপর বলেন, ‘হে আবদুল্লাহ ইব্ন যাবির! জেনে রেখ, সম্পূর্ণ কুরআনের মধ্যে সর্বোত্তম সূরা হল الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ এই সূরাটি। (আহমাদ ৪/১৭৭, মুআত্তা ১/৮৪) এর ইসনাদ খুব চমৎকার।

সূরা ফাতিহার মর্যাদার ব্যাপারে উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ ছাড়াও আরও হাদীস রয়েছে। সহীহ বুখারীতে 'ফাযায়িলুল কুরআন' অধ্যায়ে আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ 'একবার আমরা সফরে ছিলাম। এক স্থানে আমরা অবতরণ করি। হঠাৎ একটি দাসী এসে বলল ঃ 'এ এলাকার গোত্রের নেতাকে সাপে কেটেছে। আমাদের লোকেরা এখন সবাই অনুপস্থিত। ঝাড় ফুঁক দিতে পারে এমন কেহ আপনাদের মধ্যে আছে কি? আমাদের মধ্য হতে একটি লোক তার সাথে গেল। সে যে ঝাড় ফুঁকও জানত তা আমরা জানতামনা। সেখানে গিয়ে সে কিছু ঝাড় ফুঁক করল। আল্লাহর অপার মহিমায় তৎক্ষণাৎ সে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করল। অতঃপর সে ৩০টি ছাগী দিল এবং আমাদের আতিথেয়তার জন্য অনেক দুধও পাঠিয়ে দিল। সে ফিরে এলে আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ 'তোমার কি এ বিদ্যা জানা ছিল?' সে বলল ঃ 'আমিতো শুধু সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁক দিয়েছি।' আমরা বললাম ঃ 'তাহলে এ প্রাপ্ত মাল এখনই স্পর্শ করনা। প্রথমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করে নেই।' মাদীনায় এসে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন ঃ 'এটা যে ফুঁক দেয়ার সূরা তা সে কি করে জানল? এ মাল ভাগ কর। আমার জন্যও এক ভাগ রেখ।' (ফাতহুল বারী ৮/৬৭১)

সহীহ মুসলিম ও সুনান নাসাঈতে আছে যে, একদা জিবরাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বসেছিলেন, এমন সময় উপর হতে এক বিকট শব্দ এলো। জিবরাঈল (আঃ) উপরের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ আজ আকাশের ঐ দরজাটি খুলে গেছে যা ইতোপূর্বে কখনও খুলেনি। অতঃপর সেখান হতে একজন মালাক/ফেরেশতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললেন, 'আপনি খুশি হোন! এমন দু'টি নূর আপনাকে দেয়া হল যা ইতোপূর্বে কেহকেও দেয়া হয়নি। তা হল সূরা ফাতিহা ও সূরা বাকারাহর শেষ আয়াতগুলি। ওর এক একটি অক্ষরের উপর নূর রয়েছে।' এটি সুনান নাসাঈর শব্দ।

সূরা ফাতিহা ও সালাত আদায় প্রসঙ্গ

সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যে ব্যক্তি সালাতে উম্মুল কুরআন পড়ল না তার সালাত অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ, পূর্ণ নয়।' আবূ হুরাইরাহকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা হল ঃ 'আমরা যদি

ইমামের পিছনে থাকি তাহলে? তিনি বললেন ঃ 'তাহলেও চুপে চুপে পড়ে নিও।' আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে শুনেছি, তিনি বলতেন ঃ

'আল্লাহ ঘোষণা করেন ঃ 'আমি সালাতকে আমার এবং আমার বান্দার মধ্যে অর্ধ অর্ধ করে ভাগ করেছি এবং আমার বান্দা আমার কাছে যা চায় তা আমি তাকে দিয়ে থাকি। যখন বান্দা বলে, الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ তখন আল্লাহ বলেন ঃ 'আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল।' বান্দা যখন বলে, الرَّحْمـــنِ الرَّحِيمِ তখন আল্লাহ বলেন ঃ 'আমার বান্দা আমার গুণাগুণ বর্ণনা করল।' বান্দা যখন বলে, مَــلك يَوْمِ الدِّين তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'আমার বান্দা আমার মাহাত্ম্য বর্ণনা করল।' কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, আল্লাহ তা'আলা উত্তরে বলেন ঃ 'আমার বান্দা আমার উপর (সবকিছু) সর্মপণ করল।' যখন বান্দা বলে إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যের কথা এবং আমার বান্দা আমার নিকট যা চাবে আমি তাকে তাই দিব' অতঃপর বান্দা যখন اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُستَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ পাঠ করে তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

'এসব আমার বান্দার জন্য এবং সে যা কিছু চাইল তা সবই তার জন্য।' (মুসলিম ১/২৯৬, নাসাঈ ৫/১১, ১২) কোন কোন হাদীসের বর্ণনায় শব্দগুলির মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে।

আলোচ্য হাদীস সম্পর্কিত আলোচনা

এখন এই হাদীসের উপকারিতা ও লাভালাভ লক্ষ্যণীয় বিষয়। প্রথমতঃ এই হাদীসের মধ্যে صَلَوةٌ অর্থাৎ সালাতের সংযোজন রয়েছে এবং তার তাৎপর্য ও ভাবার্থ হচ্ছে কিরা'আত। যেমন কুরআনের মধ্যে অন্যান্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلاً

তোমরা সালাতে তোমাদের স্বর উচু করনা এবং অতিশয় ক্ষীণও করনা; এই দুই এর মধ্য পন্থা অবলম্বন কর। (সূরা ইসরাহ, ১৭ ঃ ১১০) এর তাফসীরে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে প্রকাশ্যভাবে বর্ণিত আছে যে, এখানে 'সালাওয়াত' শব্দের

অর্থ হল কিরা'আত বা কুরআন পঠন। (ফাতহুল বারী ৮/২৫৭) এভাবে উপরোক্ত হাদীসে কিরা'আতকে 'সালাত' বলা হয়েছে। এতে সালাতের মধ্যে কিরা'আতের যে গুরুত্ব রয়েছে তা বিলক্ষণ জানা যাচ্ছে। আরও প্রকাশ থাকে যে, কিরা'আত সালাতের একটি মস্তবড় স্তম্ভ। এ জন্যই এককভাবে ইবাদাতের নাম নিয়ে ওর একটি অংশ অর্থাৎ কিরা'আতকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অপর পক্ষে এমনও হয়েছে যে, এককভাবে কিরা'আতের নাম নিয়ে তার অর্থ সালাত নেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলার কথা ঃ

وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

কারণ ফাজরের কুরআন পাঠ স্বাক্ষী স্বরূপ। (সূরা ইসরাহ, ১৭ ঃ ৭৮) এখানে কুরআনের ভাবার্থ হল সালাত। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসে রয়েছে যে, ফাজরের সালাতের সময় রাত্রি ও দিনের মালাইকা/ফেরেশতাগণ একত্রিত হন। (ফাতহুল বারী ৮/২৫১, মুসলিম ১/৪৩৯)

প্রতি রাক'আতে অবশ্যই সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা জানা গেল যে, সালাতে কিরা'আত পাঠ খুবই যরুরী এবং আলেমগণও এ বিষয়ে একমত। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে উল্লেখ আছে যে, সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা যরুরী এবং অপরিহার্য এবং তা পড়া ছাড়া সালাত আদায় হয়না। অন্যান্য সমস্ত ইমামের এটাই মত। এই হাদীসটি তাঁদের দলীল যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি সালাত আদায় করল, অথচ তাতে উম্মুল কুরআন পাঠ করলনা, ঐ সালাত অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ; পূর্ণ নয়'। (আহমাদ ২/২৫০) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করেনা তার সালাত হয়না।' (ফাতহুল বারী ২/২৭৬, মুসলিম ১/২৯৫) সহীহ ইব্ন খুযাইমাহ্ ও সহীহ ইব্ন হিব্বানে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'ঐ সালাত হয়না যার মধ্যে উম্মুল কুরআন পড়া না হয়।" (হাদীস নং ১/২৪৮ ও ৩/১৩৯) এ ছাড়া আরও বহু হাদীস রয়েছে যে, প্রতি রাক'আতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব।

Contents

ইসতি'আযাহ বা আ'উযুবিল্লাহ প্রসঙ্গ

পবিত্র কুরআনে রয়েছে ঃ

خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَـٰهِلِينَ. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَـٰنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ

তুমি বিনয় ও ক্ষমা পরায়ণতার নীতি গ্রহণ কর এবং লোকদেরকে সৎ কাজের নির্দেশ দাও, আর মূর্খদেরকে এড়িয়ে চল। শাইতানের কু-মন্ত্রণা যদি তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে তুমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৯৯-২০০) অন্য এক জায়গায় বলেন ঃ

ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ ۚ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ. وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَٰتِ ٱلشَّيَـٰطِينِ. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ

মন্দের মুকাবিলা কর উত্তম দ্বারা, তারা যা বলে আমি সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। আর বল ঃ হে আমার রাব্ব! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি শাইতানের প্ররোচনা হতে। হে আমার রাব্ব! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার নিকট ওদের উপস্থিতি হতে। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৯৬-৯৮) অন্য এক জায়গায় ইরশাদ হচ্ছে ঃ

ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُۥ عَدَٰوَةٌ كَأَنَّهُۥ وَلِىٌّ حَمِيمٌ. وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَـٰنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

মন্দকে প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। এই গুণের অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকেই যারা ধৈর্যশীল, এই গুণের অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকেই যারা মহাভাগ্যবান। যদি শাইতানের কু-মন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে আল্লাহকে স্মরণ করবে; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ৩৪-৩৬)

এ মর্মে এই তিনটিই আয়াত আছে এবং এই অর্থের অন্য কোন আয়াত নেই। আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতসমূহের মাধ্যমে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, মানুষের শত্রুতার সবচেয়ে ভাল ঔষধ হল প্রতিদানে তাদের সঙ্গে সৎ ব্যবহার করা।

এরূপ করলে তারা তখন শত্রুতা করা থেকেই বিরত থাকবেননা, বরং অকৃত্রিম বন্ধুতে পরিণত হবে। আর শাইতানদের শত্রুতা হতে নিরাপত্তার জন্য আল্লাহ তাঁরই নিকট আশ্রয় চাইতে বলেন। কারণ সে মানুষের বিনাশ ও ধ্বংসের মধ্যে আনন্দ পায়। তার পুরাতন শত্রুতা হাওয়া ও আদমের (আঃ) সময় হতেই অব্যাহত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন ঃ

يَـٰبَنِىٓ ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ كَمَآ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ

'হে আদমসন্তান! শাইতান যেন তোমাদেরকে সেরূপ প্রলুব্ধ করতে না পারে যেরূপ তোমাদের মাতা-পিতাকে (প্রলুব্ধ করে) জান্নাত হতে বহিস্কার করেছিল। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ২৭) অন্য স্থানে বলা হচ্ছে ঃ

إِنَّ ٱلشَّيْطَـٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُوا۟ حِزْبَهُۥ لِيَكُونُوا۟ مِنْ أَصْحَـٰبِ ٱلسَّعِيرِ

শাইতান তোমাদের শত্রু; সুতরাং তাকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ কর। সে তো তার দলবলকে আহ্বান করে শুধু এ জন্য যে, তারা যেন জাহান্নামের সাথী হয়। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৬)

أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِى وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ۚ بِئْسَ لِلظَّـٰلِمِينَ بَدَلًا

তাহলে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে ও তার বংশধরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করছ? তারা তো তোমাদের শত্রু; সীমা লংঘনকারীদের জন্য রয়েছে কত নিকৃষ্ট বদলা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৫০) এতো সেই শাইতান যে আমাদের আদি পিতা আদমকে (আঃ) বলেছিল ঃ 'আমি তোমার একান্ত শুভাকাংখী।' তাহলে চিন্তার বিষয় যে, আমাদের সঙ্গে তার চালচলন কি হতে পারে? আমাদের জন্যই তো সে শপথ করে বলেছিল ঃ

فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ

সে বলল ঃ আপনার ক্ষমতার শপথ! আমি তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করব। তবে তাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদেরকে নয়। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ৮২-৮৩) এ জন্য মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَإِذَا قَرَأۡتَ ٱلۡقُرۡءَانَ فَٱسۡتَعِذۡ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ. إِنَّهُۥ لَيۡسَ لَهُۥ سُلۡطَٰنٌ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُونَ. إِنَّمَا سُلۡطَٰنُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوۡنَهُۥ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِۦ مُشۡرِكُونَ

যখন তুমি কুরআন পাঠ করবে তখন অভিশপ্ত শাইতান হতে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করবে। তার কোন আধিপত্য নেই তাদের উপর যারা ঈমান আনে ও তাদের রবের উপরই নির্ভর করে। তার আধিপত্য শুধু তাদেরই উপর যারা তাকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করে এবং যারা (আল্লাহর সাথে) শরীক করে। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৯৮-১০০) ঈমানদারগণ ও প্রভুর উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের উপর তার কোন ক্ষমতাই নেই। তার ক্ষমতা তো শুধু তাদের উপরই রয়েছে যারা তার সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে এবং আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে শির্ক করে।

কুরআন তিলাওয়াত করার আগে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَإِذَا قَرَأۡتَ ٱلۡقُرۡءَانَ فَٱسۡتَعِذۡ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ

যখন তুমি কুরআন পাঠ করবে তখন অভিশপ্ত শাইতান হতে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করবে। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৯৮) তিনি আরও বলেন ঃ

إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ

যখন তোমরা সালাতের উদ্দেশে দন্ডায়মান হও তখন (সালাতের পূর্বে) তোমাদের মুখমন্ডল ধৌত কর এবং হাতগুলিকে ধুয়ে নাও। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৬)

জামহুর উলামার প্রসিদ্ধ মাযহাব এই যে, কুরআন পাঠের পূর্বে আ'উযুবিল্লাহ' পাঠ করা উচিত, তাহলে কুমন্ত্রণা হতে রক্ষা পাওয়া যাবে। সুতরাং ঐ বুযুর্গদের নিকট আয়াতের অর্থ হচ্ছে ঃ 'যখন তুমি পড়বে' অর্থাৎ তুমি পড়ার ইচ্ছা করবে। যেমন নিম্নের আয়াতটি ঃ

'যখন তুমি সালাত আদায় করার জন্য দাঁড়াও' (তাহলে ওযূ করে নাও) এর অর্থ হল ঃ 'যখন তুমি সালাতের জন্য দাঁড়ানোর ইচ্ছা কর।' হাদীসগুলির ধারা অনুসারেও এই অর্থটিই সঠিক বলে মনে হয়। মুসনাদ আহমাদের হাদীসে আছে

যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতের জন্য দাঁড়াতেন তখন 'আল্লাহু আকবার' বলে সালাত আরম্ভ করতেন, অতঃপর

سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالَى جَدُّكَ وَ لاَ إِلَهَ غَيْرُكَ.

তিনবার পড়ে لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ পড়তেন। তারপর পড়তেন ঃ

أَعُوْذُ بِاللَّهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَ نَفْخِهِ وَ نَفْــثِهِ.

সুনান আরবায়ও এ হাদীসটি রয়েছে। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন যে, এই অধ্যায়ে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হাদীস এটাই। (আহমাদ ৩/৬৯, আবূ দাঊদ ১/৪৯০, তিরমিযী ২/৪৭, নাসাঈ ২/১৩২) ইমাম ইব্ন মাজাহ (রহঃ) স্বীয় সুনানে এই অর্থ বর্ণনা করেছেন। (ইব্ন মাজাহ ১/২৬৫) আবূ দাঊদে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতে প্রবেশ করেই তিনবার 'আল্লাহু আকবার কাবীরা' তিনবার 'আলহামদুলিল্লাহ কাসীরা' এবং তিনবার 'সুবহানাল্লাহি বুকরাতাও ওয়া আসীলা' পাঠ করতেন। অতঃপর পড়তেন। للَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَ نَفْخِهِ وَ نَفْــثِهِ. (আবূ দাঊদ ১/৪৮৬)

সুনান ইব্ন মাজাহয়ও অন্য সনদে এই হাদীসটি সংক্ষিপ্তভাবে এসেছে। (হাদীস নং ১/২৬৬)

রাগান্বিত হলে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে হবে

মুসনাদ আবি ইয়ালায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে দু'টি লোকের ঝগড়া বেধে যায়। ক্রোধে একজনের নাসারন্ধ্র ফুলে উঠে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'লোকটি যদি أَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়ে নেয় তাহলে তার ক্রোধ এখনই ঠাণ্ডা ও স্তিমিত হয়ে যাবে।' ইমাম নাসাঈ (রহঃ) স্বীয় কিতাব اَلْيَوْمُ وَاللَّيْلَةُ এর মধ্যেও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, সুলাইমান ইব্ন সূরার বলেছেন ঃ

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আমরা উপবিষ্ট থাকা অবস্থায় দুই লোক তর্ক করছিল। তাদের একজন অপরজনকে গালাগালি করছিল এবং রাগে তার মুখমন্ডল রক্তিমাভ হয়েছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ঃ আমি এমন একটি বাক্য জানি, যদি সে তা এখন উচ্চারণ করে তাহলে তার রাগান্বিত অবস্থা চলে যাবে। তা হল আ'উযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বলা। তখন ঐ লোককে অন্যরা বললেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন তা কি তুমি শুনতে পাওনি? লোকটি বলল ঃ আমি পাগল নই। (ফাতহুল বারী ৬/৩৮৮, মুসলিম ৪/২০১৫, আবূ দাঊদ ৫/১৪০, নাসাঈ ১০২৩৩)

সহীহ মুসলিম, সুনান আবূ দাঊদ এবং সুনান নাসাঈতেও বিভিন্ন সনদে এবং বিভিন্ন শব্দে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে আরও হাদীস রয়েছে। এ সবের বর্ণনার জন্য যিক্র, ওযীফা এবং আমলের বহু কিতাব রয়েছে।

ইসতি'আযাহ কি যরুরী

জামহুর উলামার মতে 'ইসতি'আযাহ্' বা 'আঊযুবিল্লাহ' পড়া মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। সুতরাং তা না পড়লে পাপ হবেনা। 'আতা ইব্ন আবী রিবাহের (রহঃ) অভিমত এই যে, কুরআন পাঠের সময় আ'ঊযু পড়া ওয়াজিব, তা সালাতের মধ্যেই হোক বা সালাতের বাইরেই হোক। ইমাম রাযী (রহঃ) এই কথাটি নকল করেছেন। 'আতার (রহঃ) কথার দলীল প্রমাণ হল আয়াতের প্রকাশ্য শব্দগুলি। কেননা এতে فَاسْتَعِذْ শব্দটি 'আমর' বা নির্দেশ সূচক ক্রিয়াপদ। ঠিক তদ্রূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সদা সর্বদা এর উপর আমলও তা অবশ্য করণীয় হওয়ার দলীল। এর দ্বারা শাইতানের দুষ্টামি ও দুস্কৃতি দূর হয় এবং তা দূর করাও এক রূপ ওয়াজিব। আর যা দ্বারা ওয়াজিব পূর্ণ হয় সেটাও ওয়াজিব হয়ে দাঁড়ায়।

আ'উযুবিল্লাহ বলার ফাযীলাত

আ'ঊযুবিল্লাহির মধ্যে রয়েছে বিস্ময়কর উপকার ও মাহাত্ম্য। আজে বাজে কথা বলার ফলে মুখে যে অপবিত্রতা আসে তা বিদূরিত হয়। ঠিক তদ্রূপ এর দ্বারা মহান আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হয় এবং তাঁর ব্যাপক ও একচ্ছত্র ক্ষমতার কথা স্বীকার করা হয়। আর আধ্যাত্মিক প্রকাশ্য শত্রুর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্বীয় দুর্বলতা ও অপারগতার কথা স্বীকার করে নেয়া হয়। কেননা মানুষ শত্রুর

মুকাবিলা করা যায়। অনুগ্রহ ও সদ্ব্যবহার দ্বারা তার শত্রুতা দূর করা যায়। যেমন পবিত্র কুরআনের ঐ আয়াতগুলিতে রয়েছে যেগুলি ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন ঃ

إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا

নিশ্চয়ই আমার দাসদের উপর তোর কোন ক্ষমতা নেই; কর্ম বিধায়ক হিসাবে তোর রাব্বই যথেষ্ট। (সূরা ইসরাহ, ১৭ ঃ ৬৫)' যে মুসলিম কাফিরের হাতে মৃত্যুবরণ করেন, তিনি শহীদ হন। যে সেই গোপনীয় শত্রু শাইতানের হাতে মারা পড়ে সে আল্লাহর দরবার থেকে হবে বহিষ্কৃত, বিতাড়িত। মুসলিমের উপর কাফিরেরা জয়যুক্ত হলে মুসলিম প্রতিদান পেয়ে থাকেন। কিন্তু যার উপর শাইতান জয়যুক্ত হয় সে ধ্বংস হয়ে যায়। শাইতান মানুষকে দেখতে পায়, কিন্তু মানুষ শাইতানকে দেখতে পায়না বলে কুরআনুল হাকীমের শিক্ষা হল ঃ 'তোমরা তার অনিষ্ট হতে তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর যিনি তাকে (শাইতানকে) দেখতে পান, কিন্তু সে তাঁকে দেখতে পায়না।

আ'উযুবিল্লাহর নিগূঢ় তত্ত্ব

আ'ঊযুবিল্লাহ পড়া হল আল্লাহ তা'আলার নিকট বিনীত হয়ে প্রার্থনা করা এবং প্রত্যেক অনিষ্টকারীর অনিষ্টতা হতে তাঁর নিকট আশ্রয় চাওয়া। عَيَاذُه এর অর্থ হল অনিষ্টতা দূর করা, আর اَيَاذُه এর অর্থ হল মঙ্গল ও কল্যাণ লাভ করা।

'আ'ঊযু' এর অর্থ হল এই যে, আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি যেন বিতাড়িত শাইতান ইহজগতে ও পরজগতে আমার কোন ক্ষতি করতে না পারে। যে নির্দেশাবলী পালনের জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি তা পালনে যেন আমি বিরত না হয়ে পড়ি। আবার যা করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে তা যেন আমি না করি। এটা তো বলাই বাহুল্য যে, শাইতানের অনিষ্টতা হতে একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ছাড়া আর কেহ রক্ষা করতে পারেনা। এ জন্য বিশ্ব প্রভু আল্লাহ মানুষরূপী শাইতানের দুষ্কার্য ও অন্যায় হতে নিরাপত্তা লাভ করার যে পন্থা শিখালেন তা হল তাদের সঙ্গে সদাচরণ। কিন্তু জিন রূপী শাইতানের দুষ্টামি ও দুষ্কৃতি হতে রক্ষা পাওয়ার যে উপায় তিনি বলে দিলেন তা হল তাঁর স্মরণে আশ্রয় প্রার্থনা। কেননা না তাকে ঘুষ দেয়া যায়, না তার সাথে সদ্ব্যবহারের ফলে সে দুষ্টামি হতে বিরত হয়। তার অনিষ্টতা হতে তো বাঁচাতে পারেন একমাত্র

আল্লাহ রাব্বুল ইয্যাত। প্রাথমিক তিনটি আয়াতে এ বিষয় আলোচিত হয়েছে। সূরা আরাফে আছে ঃ

خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَـٰهِلِينَ

তুমি বিনয় ও ক্ষমা পরায়ণতার নীতি গ্রহণ কর, এবং লোকদেরকে সৎ কাজের নির্দেশ দাও, আর মূর্খদেরকে এড়িয়ে চল। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৯৯) ইহা হল মানুষের সাথে ব্যবহার সংক্রান্ত। অতঃপর একই সূরায় আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَـٰنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

শাইতানের কু-মন্ত্রণা যদি তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে তুমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর, তিনি সর্ব শ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ২০০) সূরা মু'মিনূনে রয়েছে ঃ

ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ ۚ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ. وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَٰتِ ٱلشَّيَـٰطِينِ. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ

মন্দের মুকাবিলা কর উত্তম দ্বারা, তারা যা বলে আমি সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। আর বল ঃ হে আমার রাব্ব! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি শাইতানের প্ররোচনা হতে। হে আমার রাব্ব! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার নিকট ওদের উপস্থিতি হতে। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৯৬-৯৮)

এই তিনটি আয়াতের বিস্তারিত বর্ণনা ও অনুবাদ ইতোপূর্বেই করা হয়েছে। সুতরাং পুনরাবৃত্তির আর তেমন প্রয়োজন নেই। অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ۚ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُۥ عَدَٰوَةٌ كَأَنَّهُۥ وَلِىٌّ حَمِيمٌ. وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَـٰنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

ভাল এবং মন্দ সমান হতে পারেনা। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। এই গুণের অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকেই যারা ধৈর্যশীল, এই গুণের অধিকারী করা হয়

শুধু তাদেরকেই যারা মহাভাগ্যবান। যদি শাইতানের কু-মন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে আল্লাহকে স্মরণ করবে; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ৩৪-৩৬)

শাইতান শব্দটির আভিধানিক বিশ্লেষণ

আরাবী ভাষার অভিধানে شَيْطَان শব্দটি شَطَنٌ থেকে উদগত। এর আভিধানিক অর্থ হল দূরত্ব। যেহেতু এই মারদুদ ও অভিশপ্ত শাইতান প্রকৃতগতভাবে মানব প্রকৃতি হতে দূরে রয়েছে, বরং নিজের দুষ্কৃতির কারণে প্রত্যেক মঙ্গল ও কল্যাণ হতে দূরে আছে, তাই তাকে শাইতান বলা হয়। এ কথাও বলা হয়েছে যে, এটা شَاطَ হতে গঠিত হয়েছে। কেননা সে আগুন হতে সৃষ্টি হয়েছে এবং شَاطَ এর অর্থ এটাই। কেহ কেহ বলেন যে, অর্থের দিক দিয়ে দুটোই ঠিক। কিন্তু প্রথমটিই বিশুদ্ধতর। আরাব কবিদের কবিতার মধ্যে এর সত্যতা প্রমাণিত হয় সর্বতোভাবে।

কবি সীবাওয়াইর উক্তি আছে যে, যখন কেহ শাইতানী কাজ করে তখন আরাবেরা বলে ঃ تَشَيْطَنَ فُلاَنٌ কিন্তু تَشَيَّطَ فُلاَنٌ বলেনা। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ শব্দটি شَاطَ হতে নয়, বরং شَطَنٌ হতেই নেয়া হয়েছে। এর সঠিক অর্থ হচ্ছে দূরত্ব। কোন জিন, মানুষ বা চতুস্পদ প্রাণী দুষ্টামি করলে তাকে শাইতান বলা হয়। কুরআনুম মাজীদে রয়েছে ঃ

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَـٰطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا

আর এমনিভাবেই আমি প্রত্যেক নাবীর জন্য বহু শাইতানকে শত্রুরূপে সৃষ্টি করেছি; তাদের কতক মানুষ শাইতানের মধ্য হতে এবং কতক জিন শাইতানের মধ্য হতে হয়ে থাকে, এরা একে অন্যকে কতকগুলি মনোমুগ্ধকর ধোকাপূর্ণ ও প্রতারণামূলক কথা দ্বারা প্ররোচিত করে থাকে। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১১২) মুসনাদ আহমাদে আবূ যার (রাঃ) হতে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন ঃ ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ

'হে আবূ যার! দানব ও মানব শাইতান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর।' আমি বলি, মানুষের মধ্যেও কি শাইতান আছে? তিনি বলেন ঃ হ্যাঁ'। (আহমাদ ৫/১৭৮) সহীহ মুসলিমে আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'মহিলা, গাধা এবং কালো কুকুর সালাত নষ্ট করে দেয়।' তিনি বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! লাল, হলদে কুকুর হতে কালো কুকুরকে স্বতন্ত্র করার কারণ কি?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'কালো কুকুর শাইতান।' (মুসলিম ১/৩৬৫)

যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন ঃ 'উমার (রাঃ) একবার তুর্কী ঘোড়ার উপরে আরোহণ করেন। ঘোড়াটি সগর্বে চলতে থাকে। উমার (রাঃ) ঘোড়াটিকে মারপিটও করতে থাকেন। কিন্তু ওর সদর্প চাল আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি নেমে পড়েন এবং বলেন ঃ 'আমার আরোহণের জন্য তুমি কোন্ শাইতানকে ধরে এনেছ! আমার মনে অহংকারের ভাব এসে গেছে। সুতরাং আমি ওর পৃষ্ঠ হতে নেমে পড়াই ভাল মনে করলাম।' (তাবারী ১/১১১)

رَجِيْم শব্দের অর্থ

رَجِيْم শব্দটি فَعِيْل এর ওজনে اسم مَفْعُوْل এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ সে মারদুদ বা বিতাড়িত। অর্থাৎ প্রত্যেক মঙ্গল হতে সে দূরে আছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَٰبِيحَ وَجَعَلْنَٰهَا رُجُومًا لِّلشَّيَٰطِينِ

আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং ওগুলিকে করেছি শাইতানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ। (সূরা মূল্ক, ৬৭ ঃ ৫)

إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَٰنٍ مَّارِدٍ. لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُۥ شِهَابٌ ثَاقِبٌ

আমি নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্র রাজির সুষমা দ্বারা সুশোভিত করেছি। এবং রক্ষা করেছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শাইতান হতে। ফলে তারা উর্ধ্ব জগতের কিছু

শ্রবণ করতে পারেনা এবং তাদের প্রতি উল্কা নিক্ষিপ্ত হয় সকল দিক হতে বিতাড়নের জন্য এবং তাদের জন্য রয়েছে অবিরাম শাস্তি। তবে কেহ হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ৬-১০) অন্য জায়গায় ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِى ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّـٰهَا لِلنَّـٰظِرِينَ. وَحَفِظْنَـٰهَا مِن كُلِّ شَيْطَـٰنٍ رَّجِيمٍ. إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتْبَعَهُۥ شِهَابٌ مُّبِينٌ

আকাশে আমি গ্রহ নক্ষত্র সৃষ্টি করেছি এবং ওকে করেছি সুশোভিত, দর্শকদের জন্য। প্রত্যেক অভিশপ্ত শাইতান হতে আমি ওকে রক্ষা করে থাকি। আর কেহ চুরি করে সংবাদ শুনতে চাইলে ওর পশ্চাদ্ধাবন করে প্রদীপ্ত শিখা। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ১৬-১৮)

‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’ কি সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াত?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمـَـٰنِ الرَّحِيمِ

অতীব মেহেরবান পরম করুণাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি।

সকল সাহাবী (রাঃ) আল্লাহর কিতাব কুরআন মজীদকে বিসমিল্লাহর দ্বারাই আরম্ভ করেছেন। আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, সূরা ‘নামল’ এর এটি একটি আয়াত। তবে এটি প্রত্যেক সূরার প্রারম্ভে একটি পৃথক আয়াত কিনা, অথবা প্রত্যেক সূরার একটি আয়াতের অংশ বিশেষ কিনা, কিংবা এটি কি শুধুমাত্র সূরা ফাতিহারই আয়াত, অন্য সূরার নয়, কিংবা এক সূরাকে অন্য সূরা হতে পৃথক করার জন্যই কি একে লিখা হয়েছে এবং এটি আদৌ আয়াত নয়, এ সব বিষয়ে বেশ মতভেদ রয়েছে।

আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ), আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) আলী (রাঃ), ‘আতা (রহঃ), তাঊস (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), মাকহুল (রহঃ) এবং যুহরীর (রহঃ) এটাই নীতি ও অভিমত যে, ‘বিসমিল্লাহ’ ‘সূরা বারাআত’ ছাড়া কুরআনের প্রত্যেক সূরারই একটা পৃথক আয়াত। এসব সাহাবী (রাঃ) ও তাবেঈ (রহঃ) ছাড়াও আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক (রহঃ), ইমাম শাফিঈ (রহঃ), ইমাম আহমাদের (রহঃ) একটি কাওলে এবং ইসহাক ইব্ন রাহওয়াহ (রহঃ) ও আবূ উবাইদ কাসিম ইব্ন সালামেরও (রহঃ) এটাই অভিমত। তবে ইমাম মালিক (রহঃ) এবং

ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) ও তাঁদের সহচরগণ বলেন যে, 'বিসমিল্লাহ' সূরা ফাতিহারও আয়াত নয় বা অন্য কোন সূরারও আয়াত নয়।

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' উচ্চস্বরে পাঠ করা প্রসঙ্গ

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' উচ্চস্বরে পাঠ করতে হবে নাকি নিম্নস্বরে এ নিয়েও মতভেদের অবকাশ রয়েছে। যারা একে সূরা ফাতিহার পৃথক একটি আয়াত মনে করেননা তারা একে নিম্নস্বরে পড়ার পক্ষপাতি। এখন অবশিষ্ট রইলেন শুধু ঐ সব লোক যারা বলেন যে, এটি প্রত্যেক সূরার প্রথম আয়াত। তাদের মধ্যেও আবার মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফিঈর (রহঃ) অভিমত এই যে, সূরা ফাতিহা ও অন্যান্য প্রত্যেক সূরার পূর্বে একে উচ্চস্বরে পড়তে হবে। সাহাবা (রাঃ), তাবেঈন (রহঃ) এবং মুসলিমদের পূর্ববর্তী যুগের ইমামগণের এটাই মাযহাব। সাহাবীগণের (রাঃ) মধ্যে একে উচ্চস্বরে পড়ার পক্ষপাতি হলেন আবূ হুরাইরাহ (রাঃ), ইব্ন উমার (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মু'আবিয়া (রাঃ), উমার (রাঃ), আবূ বাকর (রাঃ) এবং উসমান (রাঃ)। আবূ বাকর (রাঃ) এবং উসমান (রাঃ) হতেও গারীব বা দুর্বল সনদে ইমাম খতীব (রহঃ) এটা নকল করেছেন। বাইহাকী (রহঃ) ও ইব্ন আবদুল বার্ (রহঃ) উমার (রাঃ) ও আলী (রাঃ) হতেও এটি বর্ণনা করেছেন। তাবেঈগণের মধ্যে সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), আবূ কালাবাহ্ (রহঃ), যুহরী (রহঃ), আলী ইব্ন হাসান (রহঃ), তাঁর ছেলে মুহাম্মাদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (রহঃ), 'আতা (রহঃ), তাঊস (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সা'লিম (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব কারাজী (রহঃ), আবূ বাকর ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আম্র (রহঃ) ইব্ন হাযম, আবূ ওয়ায়েল (রহঃ), ইব্ন সীরীন (রহঃ), মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির (রহঃ), আলী ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রহঃ), তাঁর ছেলে মুহাম্মাদ, ইব্ন উমারের (রাঃ) গোলাম নাফি, যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ), উমার ইব্ন আবদুল আযীয (রহঃ), আরযাক ইব্ন কায়েস (রহঃ), হাবীব ইব্ন আবী সাবিত (রহঃ), আবূ শা'শা' (রহঃ), মাকহুল (রহঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফফাল ইব্ন মাকরান (রহঃ), এবং বাইহাকীর বর্ণনায় আবদুল্লাহ ইব্ন সাফওয়ান (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন হানাফিয়্যাহ (রহঃ) এবং আবদুল বারের বর্ণনায় আমর ইব্ন দীনার (রহঃ)। এরা সবাই সালাতের যেখানে কিরা'আত উচ্চস্বরে পড়া হয়, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীমকেও উচ্চ শব্দে পড়তেন।

এর একটি প্রধান দলীল এই যে, এটি যখন সূরা ফাতিহারই একটি আয়াত তখন পূর্ণ সূরার ন্যায় একে উচ্চস্বরে পড়তে হবে। তাছাড়া সুনান নাসাঈ, সহীহ

ইব্‌ন খুযাইমা, সহীহ ইব্‌ন হিব্বান, মুসতাদরাক হাকিম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) সালাত আদায় করলেন এবং কিরা'আতে উচ্চ শব্দে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়লেন এবং সালাত শেষে বললেন ঃ 'তোমাদের সবার চেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সালাতের সঙ্গে আমার সালাতেরই সামঞ্জস্য বেশী।' দারাকুতনী, খাতীব এবং বাইহাকী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (নাসাঈ ২/১৩৪, ইব্‌ন খুযাইমাহ ১/২৫১, ইব্‌ন হিব্বান ৩/১৪৩, হাকিম ১/২৩২,দারাকুতনী ১/৩০৫ এবং বাইহাকী ২/৪৬)

সহীহ বুখারীতে আছে যে, আনাসকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা হয় ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিরা'আত কিরূপ ছিল?' তিনি বললেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক খাড়া শব্দকে লম্বা করে পড়তেন।' (ফাতহুল বারী ৮/৭০৯) তিনি بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمـــَنِ الرَّحِيمِ পাঠ করে শুনালেন এবং বললেন بِسْمِ اللّٰهِ কে মদ্ (লম্বা) করেছেন الرَّحْمـــَنِ এর উপর মদ্ করেছেন ও رَحِيمِ এর উপর মদ্ করেছেন। মুসনাদ আহমাদ, সুনান আবূ দাঊদ, সহীহ ইব্‌ন খুযাইমাহ এবং মুসতাদরাক হাকিমে উম্মে সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক আয়াত শেষে থামতেন এবং তাঁর কিরা'আত পৃথক পৃথক হত। যেমন بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمـــَنِ الرَّحِيمِ পড়ে থামতেন, তারপর الْحَمْدُ للّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ পড়তেন, পুনরায় থেমে الرَّحْمـــَنِ الرَّحِيمِ পড়তেন। দারাকুতনী (রহঃ) এ হাদীসটিকে সঠিক বলেছেন। (আহমাদ ৬/৩০২, আবূ দাঊদ ৪/২৯৪, ইব্‌ন খুযাইমাহ ১/২৪৮, হাকিম২/২৩১, দারাকুতনী ১/৩০৭) ইমাম শাফিঈ (রহঃ) ও ইমাম হাকিম (রহঃ) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, মু'আবিয়াহ (রাঃ) মাদীনায় সালাত আদায় করালেন এবং 'বিসমিল্লাহ' পড়লেননা। সে সময় যেসব মুহাজির সাহাবী (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন তাঁরা এতে আপত্তি জানালেন। সুতরাং তিনি পুনরায় যখন সালাত আদায় করানোর জন্য দাঁড়ালেন তখন উচ্চস্বরে 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করলেন। (হাকিম ১/২৩৩, মুসনাদ আশ শাফিঈ ১/৮০) প্রায় নিশ্চিতরূপেই উল্লিখিত সংখ্যক হাদীস এ মাযহাবের দলীলের জন্য যথেষ্ট। এখন বাকী থাকল তাঁদের বিপক্ষের হাদীস, বর্ণনা, সনদ, দুর্বলতা ইত্যাদি। ওগুলির জন্য অন্য জায়গা রয়েছে।

দ্বিতীয় মতামত এই যে, 'বিসমিল্লাহ' জোরে পড়তে হবেনা। খলীফা চতুষ্টয়, আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফ্ফাল, তাবেঈন ও পরবর্তী যুগের দলসমূহ হতে এটা সাব্যস্ত আছে। আবূ হানীফা (রহঃ), সাওরী (রহঃ) এবং আহমাদ ইব্ন হাম্বালের (রহঃ) এটাই মাযহাব। ইমাম মালিকের (রহঃ) মাযহাব এই যে, 'বিসমিল্লাহ' পড়তেই হবেনা, জোরেও নয়, আস্তেও নয়। তাঁর প্রথম দলীল তো সহীহ মুসলিমের আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি যাতে রয়েছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতকে তাকবীর ও কিরা'আতকে اَلْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينَ দ্বারা শুরু করতেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আছে যে, আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ 'আমি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবূ বাকর (রাঃ), উমার (রাঃ) এবং উসমানের (রাঃ) পিছনে সালাত আদায় করেছি। তাঁরা সবাই اَلْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينَ দ্বারা সালাত আরম্ভ করতেন। সহীহ মুসলিমে আছে যে, বিসমিল্লাহ পাঠ করতেননা। কিরা'আতের প্রথমেও না, শেষেও না। (ফাতহুল বারী ২/২৬৫, মুসলিম ১/২৯৯) সুনানে আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফফাল (রাঃ) হতেও এরূপই বর্ণিত আছে। (তিরমিযী ২৪৪) এ হল ঐসব ইমামের 'বিসমিল্লাহ' আস্তে পড়ার দলীল। এ প্রসঙ্গে এটাও স্মর্তব্য যে, এ কোন বড় রকমের মতভেদ নয়। প্রত্যেক দলই অন্য দলের সালাতকে শুদ্ধ বলে থাকেন।

'বিসমিল্লাহ'র ফাযীলাত

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সোয়ারীর উপর তাঁর পিছনে যে সাহাবী (রাঃ) উপবিষ্ট ছিলেন তাঁর বর্ণনাটি এই ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উষ্ট্রীটির কিছু পদস্খলন ঘটলে আমি বললাম যে শাইতানের সর্বনাশ হোক। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

তোমরা ইহা (অভিশপ্ত শাইতান) বলনা, কারণ এতে সে গর্বে বড় হয়ে যায়, এমনকি একটি বড় ঘর হয়ে যায়। বরং বিসমিল্লাহ বল, কারণ এতে শাইতান ছোট হতে হতে মাছির মত হয়ে যায়। (আহমাদ ৫/৫৯)

ইমাম নাসাঈ (রহঃ) স্বীয় কিতাব 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ' এর মধ্যে এবং ইব্ন মিরদুওয়াই (রহঃ) স্বীয় তাফসীরে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং সাহাবীর (রাঃ) নাম বলেছেন উসামা ইব্ন উমায়ের (রাঃ)। (নাসাঈ ৬/১৪২) আর তাতেই আছে ঃ এটা একমাত্র বিসমিল্লাহরই বারাকাত।'

প্রতিটি কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে হবে

প্রত্যেক কাজ ও কথার প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ বলা মুস্তাহাব। খুৎবার শুরুতেও বিসমিল্লাহ বলা উচিত। হাদীসে আছে যে, বিসমিল্লাহ দ্বারা যে কাজ আরম্ভ করা না হয় তা কল্যাণহীন ও বারাকাতশূন্য থাকে। মুসনাদ আহমাদ এবং সুনানে রয়েছে, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ), সাঈদ ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এবং আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

যে ব্যক্তি অযূর সময় বিসমিল্লাহ বলেনা তার উযূ হয়না।' (আহমাদ ৩/৪১, আবূ দাউদ ১/৭৫, তিরমিযী ১/১১৫, নাসাঈ ১/৬১, ইব্ন মাজাহ ১/১৪০) এ হাদীসটি হাসান বা উত্তম। কোন কোন আলেম তো উযূর সময় বিসমিল্লাহ বলা ওয়াজিব বলে থাকেন। খাওয়ার সময়েও বিসমিল্লাহ পড়া মুস্তাহাব। সহীহ মুসলিমে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমার ইব্ন আবী সালামাহকে (রাঃ) (যিনি তাঁর সহধর্মিনী উম্মে সালামাহর (রাঃ) পূর্ব স্বামীর পুত্র ছিলেন) বলেন ঃ

'বিসমিল্লাহ বল, ডান হাতে খাও এবং তোমার সামনের দিক থেকে খেতে থাক।' (মুসলিম ২/১৬০০) কোন কোন আলেম এ সময়েও বিসমিল্লাহ বলা ওয়াজিব বলে থাকেন। স্ত্রীর সঙ্গে মিলনের সময়েও বিসমিল্লাহ বলা উচিত। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে কেহ স্বীয় স্ত্রীর সঙ্গে মিলনের ইচ্ছা করলে যেন সে এটা পাঠ করে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

আল্লাহর নামের সঙ্গে আরম্ভ করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে এবং যা আমাদেরকে দান করবেন তাকেও শাইতানের কবল হতে রক্ষা করুন।

তিনি আরও বলেন যে, এই মিলনের ফলে যদি সে গর্ভধারণ করে তাহলে শাইতান সেই সন্তানের কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। (ফাতহুল বারী ৯/১৩৬, মুসলিম ২/১০৫৮)

'আল্লাহ' শব্দের অর্থ

اَللّٰهُ বারাকাত বিশিষ্ট ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন মহান প্রভুর একটি বিশিষ্ট নাম। বলা হয় যে, এটাই اِسْمِ اَعْظَم কেননা সমুদয় উত্তম গুণের সঙ্গে এটাই গুণান্বিত হয়ে থাকে। যেমন পবিত্র কুরআনে রয়েছে ঃ

هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَـٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ ۖ هُوَ ٱلرَّحْمَـٰنُ ٱلرَّحِيمُ. هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَـٰمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ. هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَـٰلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তিনি অদৃশ্য এবং দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা; তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু। তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত; যারা তাঁর শরীক স্থির করে আল্লাহ তা হতে পবিত্র ও মহান। তিনিই আল্লাহ, সৃজনকর্তা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, সকল উত্তম নাম তাঁরই। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা হাশর, ৫৯ ঃ ২২-২৪)

এ আয়াতসমূহে 'আল্লাহ' ছাড়া অন্যান্য সবগুলিই গুণবাচক নাম এবং ওগুলি 'আল্লাহ' শব্দেরই বিশেষণ। সুতরাং মূল ও প্রকৃত নাম 'আল্লাহ'। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا

আর আল্লাহর জন্য সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে, সুতরাং তোমরা তাঁকে সেই সব নামেই ডাকবে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৮০)

قُلِ ٱدْعُوا۟ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُوا۟ ٱلرَّحْمَـٰنَ ۖ أَيًّا مَّا تَدْعُوا۟ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ

বল ঃ তোমরা 'আল্লাহ' নামে আহ্বান কর অথবা 'রাহমান' নামে আহ্বান কর, তোমরা যে নামেই আহ্বান করনা কেন, সব সুন্দর নামই তো তাঁর! (সূরা ইসরাহ, ১৭ ঃ ১১০)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

‘আল্লাহ তা‘আলার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। এক শতের একটা কম। যে ওগুলি গণনা করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (ফাতহুল বারী ১১/২১৮, মুসলিম ৪/২০৬২) ‘জামে‘উত তিরমিযী ও সুনান ইব্ন মাজাহও নামগুলি এসেছে। (তিরমিযী ৯/৪৮০, ইব্ন মাজাহ ২/২১৬৯) ঐ দুই হাদীস গ্রন্থের বর্ণনায় শব্দের কিছু পার্থক্য আছে এবং সংখ্যায় কিছু কম-বেশি রয়েছে।

الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ (আর রাহমানির রাহীম) এর অর্থ

اَلرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ শব্দ দু’টিকে رَحْمَتْ থেকে নেয়া হয়েছে। অর্থের দিক দিয়ে দু’টির মধ্যেই ‘মুবালাগাহ’ বা আধিক্য রয়েছে, তবে ‘রাহীমের’ চেয়ে ‘রাহমানের’ মধ্যে আধিক্য বেশি আছে। আল্লামা ইব্ন জারীরের (রহঃ) কথা অনুযায়ী জানা যায় যে, এতে প্রায় সবাই একমত। সহীহ তিরমিযীতে বর্ণিত আছে, আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ (রাঃ) বলেন, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, মহান আল্লাহ বলেন ঃ

আমিই আর-রাহমান, আমি রাহেম সৃষ্টি করেছি এবং আমার নাম থেকেই রাহেম নামের সৃষ্টি। অতএব যে এর হিফাযাত করে, আমি তার সাথে সম্পর্ক অটুট রাখি এবং যে ছিন্ন করে আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি। (তিরমিযী ৬/৩৩)

ইতোপূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, রাহমানের অর্থ হল দুনিয়া ও আখিরাতে দয়া প্রদর্শনকারী এবং রাহীমের অর্থ শুধু আখিরাতে রহমকারী। কেহ কেহ বলেন যে, رَحْمَن শব্দটি مُشْتَق নয়। কারণ যদি তা এ রকমই হত তাহলে مَرْحُوْم এর সঙ্গে মিলে যেত। অথচ কুরআনুল হাকীমের মধ্যে

وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا

এবং তিনি মু’মিনদের প্রতি পরম দয়ালু। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৪৩) এসেছে।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এই দু’টি নামই করুণা ও দয়া বিশিষ্ট। একের মধ্যে অন্যের তুলনায় দয়া ও করুণা বেশি আছে।

ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, রাহমানের অর্থ হল যিনি সমুদয় সৃষ্ট জীবের প্রতি করুণা বর্ষণকারী। আর রাহীমের অর্থ হল যিনি মু’মিনদের উপর দয়া বর্ষণকারী। যেমন কুরআনুল হাকীমের নিম্নের দু’টি আয়াতে রয়েছে ঃ

ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۚ ٱلرَّحْمَـٰنُ

অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৫৯) আল্লাহ বলেন ঃ

ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ

দয়াময় আরশে সমাসীন। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৫)

আল্লাহ সুবহানাহু বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর 'আর-রাহমান' নামসহ আরশে অবস্থান করছেন এবং তার সকল সৃষ্টিকে তাঁর দয়া ও রাহমাত ঘিরে রেখেছে। তিনি বলেন ঃ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا *'এবং তিনি মু'মিনদের প্রতি পরম দয়ালু।* (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৪৩)

সুতরাং জানা গেল যে, رَحْمَن এর মধ্যে رَحِيْم এর তুলনায় مُبَالَغَة অনেক গুণ বেশি আছে। (কুরতুবী ১/১০৫) কিন্তু হাদীসের একটি দু'আর মধ্যে يَا رَحْمَنُ الدُّنْيَا وَالاَخِرَة وَرَحِيْمَهُمَا এভাবেও এসেছে। 'রাহমান' নামটি আল্লাহ তা'আলার জন্যই নির্ধারিত। তিনি ছাড়া আর কারও এ নাম হতে পারেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ রয়েছে ঃ

قُلِ ٱدۡعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدۡعُواْ ٱلرَّحۡمَٰنَ ۖ أَيًّا مَّا تَدۡعُواْ فَلَهُ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ

বল ঃ তোমরা 'আল্লাহ' নামে আহ্বান কর অথবা 'রাহমান' নামে আহ্বান কর, তোমরা যে নামেই আহ্বান করনা কেন, সব সুন্দর নামই তো তাঁর! (সূরা ইসরাহ, ১৭ ঃ ১১০) অন্য একটি আয়াতে আছে ঃ

وَسۡـَٔلۡ مَنۡ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رُّسُلِنَآ أَجَعَلۡنَا مِن دُونِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ءَالِهَةً يُعۡبَدُونَ

তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে তুমি জিজ্ঞেস কর, আমি কি দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত কোন দেবতা স্থির করেছিলাম যার ইবাদাত করা যায়? (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৪৫) মুসাইলামা কায্যাব যখন নাবুওয়াতের দাবী করে এবং নিজেকে 'রাহমানুল ইয়ামামা' নামে অভিহিত করে, আল্লাহ তা'আলা তখন তাকে অত্যন্ত লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত করেন এবং চরম মিথ্যাবাদী নামে সে সারা দেশে সবার কাছে পরিচিত হয়ে ওঠে। আজও তাকে মুসাইলামা কায্যাব বলা হয় এবং প্রত্যেক মিথ্যা দাবীদারকে তার সাথে তুলনা করা হয়। আজ প্রত্যেক পল্লীবাসী ও শহরবাসী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত আবালবৃদ্ধ সবাই তাকে মিথ্যাবাদী বলে বিলক্ষণ চেনে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

قُلِ ٱدْعُوا۟ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُوا۟ ٱلرَّحْمَٰنَ ۖ أَيًّا مَّا تَدْعُوا۟ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ

বল ঃ তোমরা 'আল্লাহ' নামে আহ্বান কর অথবা 'রাহমান' নামে আহ্বান কর, তোমরা যে নামেই আহ্বান করনা কেন, সব সুন্দর নামই তো তাঁর! (সূরা ইসরাহ, ১৭ ঃ ১১০)

মুসাইলামা কায্যাব এ জঘন্যতম স্পর্ধা দেখালেও সে সমূলে ধ্বংস হয়েছিল এবং তার ভ্রষ্ট সঙ্গীদের ছাড়া এটা অন্যের উপর চালু হয়নি। 'রাহীম' বিশেষণটির সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা অন্যদেরকেও বিশেষিত করেছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

তোমাদের নিকট আগমন করেছে তোমাদেরই মধ্যকার এমন একজন রাসূল যার কাছে তোমাদের ক্ষতিকর বিষয় অতি কষ্টদায়ক মনে হয়, যে হচ্ছে তোমাদের খুবই হিতাকাংখী, মু'মিনদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল, করুণা পরায়ণ। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১২৮)

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবীকে رَحِيْمٌ বলেছেন। এভাবেই তিনি স্বীয় কতগুলি নাম দ্বারা অন্যদেরকেও স্মরণ করেছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَٰهُ سَمِيعًۢا بَصِيرًا

আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু হতে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য; এ জন্য আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন। (সূরা ইনসান/দাহ্র, ৭৬ ঃ ২)

এখানে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে سَمِيْعٌ ও بَصِيْرٌ বলেছেন। মোট কথা এই যে, আল্লাহর কতগুলি নাম এমন রয়েছে যেগুলির প্রয়োগ ও ব্যবহার অন্য অর্থে অন্যের উপরও হতে পারে এবং কতগুলি নাম আবার আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উপর ব্যবহৃত হতেই পারেনা। যেমন আল্লাহ, রাহমান, খালেক, রাযেক ইত্যাদি। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা প্রথম নাম নিয়েছেন 'আল্লাহ', অতঃপর ওর বিশেষণ রূপে 'রাহমান' এনেছেন। কেননা 'রাহীমের' তুলনায় এর বিশেষত্ব ও প্রসিদ্ধি অনেক গুণে বেশী। আল্লাহ সর্বপ্রথম তাঁর সবচেয়ে বিশিষ্ট নাম নিয়েছেন, কেননা নিয়ম রয়েছে সর্বপ্রথম সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন নাম নেয়া।

রাহমান ও রাহীম শুধু আল্লাহ তা'আলারই নাম। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) এ কথাটি নকল করেছেন। কেহ কেহ বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ করার পূর্বে কুরাইশ কাফিরেরা রাহ্মানের সঙ্গে পরিচিতিই ছিলনা।

قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَـٰنَ ۖ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ

এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ সুবহানাহু তাদের ধারণা খণ্ডন করেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির বছরেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলীকে (রাঃ) বলেছিলেন ঃ 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখ।' কাফির কুরাইশরা তখন বলেছিল আমরা রাহমান ও রাহীমকে চিনিনা। সহীহ বুখারীতে এ বর্ণনাটি রয়েছে।

উম্মে সালমার (রাঃ) হাদীসটি পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। সেখানে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক আয়াতে থামতেন এবং এভাবেই একটা দল বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীমের উপর আয়াত করে তাকে আলাদাভাবে তিলাওয়াত করে থাকেন। আবার কেহ কেহ মিলিয়েও পড়েন।

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
১। আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা, যিনি বিশ্বজগতের রাব্ব।	١. ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ

حمد শব্দের অর্থ

ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه এর অর্থ এই যে, কৃতজ্ঞতা শুধু আল্লাহর জন্য, তিনি ছাড়া আর কেহ এর যোগ্য নয়, তা সে সৃষ্ট জীবের মধ্যে যে কেহ হোক না কেন। কেননা সমুদয় দান যা আমরা গণনা করতে পারিনা এবং তার মালিক ছাড়া কারও সেই সংখ্যা জানা নেই, সবই তাঁর কাছ থেকেই আগত। তিনিই তাঁর আনুগত্যের সমুদয় মালমসলা আমাদেরকে দান করেছেন। আমরা যেন তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলতে পারি সেজন্য তিনি আমাদেরকে শারীরিক সমুদয় নি'আমাত দান করেছেন। অতঃপর ইহলৌকিক অসংখ্য নি'আমাত এবং জীবনের সমস্ত প্রয়োজন আমাদের অধিকার ছাড়াই তিনি

আমাদের নিকট না চাইতেই পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁর সদা বিরাজমান অনুকম্পা এবং তাঁর প্রস্তুতকৃত পবিত্র সুখের স্থান, সেই অবিনশ্বর জান্নাত আমরা কিভাবে লাভ করতে পারি তাও তিনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন। সুতরাং আমরা এখন নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, এসবের যিনি মালিক, প্রথম ও শেষ সমুদয় কৃতজ্ঞতা একমাত্র তাঁরই ন্যায্য প্রাপ্য। (তাবারী ১/১৩৫) এটা একটি প্রশংসামূলক বাক্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজের প্রশংসা নিজেই করেছেন এবং ঐ প্রসঙ্গেই তিনি যেন বলে দিলেন ঃ তোমরা বল اَلْحَمْدُ لِلّٰه অর্থাৎ 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।' কেহ কেহ বলেন যে, 'আলহামদু লিল্লাহ' বলে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র নাম ও বড় বড় গুণাবলীর দ্বারা তাঁর প্রশংসা করা হয়। (তাবারী ১/১৩৭)

'হাম্‌দ' ও 'শোক্‌র' এর মধ্যে পার্থক্য

আরাবী ভাষায় যাঁরা পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন তাঁরা এ বিষয়ে এক মত যে, شُكْر এর স্থলে حَمْد ও حَمْد এর স্থলে شُكْر ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, প্রত্যেক কৃতজ্ঞের কৃতজ্ঞতা প্রকাশক কথা হল اَلْحَمْدُ لِلّٰه

'হাম্‌দ' শব্দের তাফসীর ও সালাফগণের অভিমত

উমার (রাঃ) একবার বলেছিলেন ঃ سُبْحَانَ اللّٰه ও لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ এবং কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, اَللّٰهُ اَكْبَرْ কে আমরা জানি, কিন্তু اَلْحَمْدُ لِلّٰه এর ভাবার্থ কি?' আলী (রাঃ) উত্তরে বললেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা এ কথাটিকে নিজের জন্য পছন্দ করেছেন। (তাবারী ১/১৫) এবং কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, এটা বললে আল্লাহকে খুবই ভাল লাগে।' ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ 'এটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশক বাক্য। এর উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। (তাবারী ১/১৩)

'আল-হাম্‌দ' শব্দের ফাযীলাত

আসওয়াদ ইব্‌ন সারী' (রাঃ) একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আরয করেন ঃ 'আমি মহান আল্লাহর প্রশংসামূলক কয়েকটি কবিতা রচনা করেছি। অনুমতি পেলে শুনিয়ে দিব।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা নিজের প্রশংসা শুনতে পছন্দ

করেন।' (আহমাদ ৩/৪৩৫, নাসাঈ ৪/৪১৬) মুসনাদ আহমাদ, সুনান নাসাঈ, জামে'উত তিরমিযী এবং সুনান ইব্‌ন মাজাহ্‌য় যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'সর্বোত্তম যিক্‌র হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং সর্বোত্তম প্রার্থনা হচ্ছে 'আলহামদুলিল্লাহ।' (তিরমিযী ৯/৩২৪, নাসাঈ ৬/২০৮, ইব্‌ন মাজাহ ২/১২৪৯) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটিকে পরিভাষা অনুযায়ী 'হাসান গারীব' বলেছেন। সুনান ইব্‌ন মাজাহ্‌য় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'আল্লাহ তাঁর বান্দাকে কিছু দান করার পর যদি সে তার জন্য 'আলহামদুলিল্লাহ' পাঠ করে তাহলে তার প্রদত্ত বস্তুই গৃহিত বস্তু হতে উত্তম হবে।' (ইব্‌ন মাজাহ ২/১২৫০)

সুনান ইব্‌ন মাজাহয় ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ একদা এক ব্যক্তি এই দু'আ পাঠ করল ঃ

يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ.

হে আমার রাব্ব! তোমার বিশাল ক্ষমতা এবং মহান সত্ত্বার মর্যাদানুসারে তোমার জন্যই সমস্ত প্রশংসা।

এতে মালাইকা সাওয়াব লিখার ব্যাপারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। অবশেষে তাঁরা আল্লাহ সুবহানুর নিকট আরয করলেন ঃ আপনার এক বান্দা এমন একটি কালেমা পাঠ করেছে যার সাওয়াব আমরা কি লিখব বুঝতে পারছিনা।' বিশ্বপ্রভু সব কিছু জানা সত্ত্বেও জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'সে কী কথা বলেছে?' তাঁরা বললেন যে, সে এই কালেমা বলেছে। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন ঃ 'সে যা বলেছে তোমরা হুবহু তাই লিখে নাও। আমি তার সাথে সাক্ষাতের সময়ে নিজেই তার যোগ্য প্রতিদান দিব।' (ইব্‌ন মাজাহ ২/১২৪৯)

'হাম্‌দ' শব্দের পূর্বে 'আল' শব্দ প্রয়োগের গুরুত্ব

'আল হামদু'র আলিফ লাম 'ইসতিগরাকের' জন্য ব্যবহৃত অর্থাৎ সমস্ত প্রকারের 'হামদ' বা স্তুতিবাদ একমাত্র আল্লাহর জন্যই সাব্যস্ত। যেমন হাদীসে রয়েছে ঃ

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ وَ لَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ وَ بِيَدِكَ الْخَيْرُ كُلُّهُ وَإِلَيْكَ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ.

'হে আল্লাহ! সমুদয় প্রশংসা তোমারই জন্য, সারা দেশ তোমারই, তোমারই হাতে সামগ্রিক মঙ্গল নিহিত রয়েছে এবং সমস্ত কিছু তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করে থাকে।' (আত তাগরীব ওয়াত তাহরীব ২/২৫৩)

'রাব্ব' শব্দের অর্থ

সর্বময় কর্তাকে 'রাব্ব' বলা হয় এবং এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে নেতা এবং সঠিকভাবে সজ্জিত ও সংশোধনকারী। এসব অর্থ হিসাবে আল্লাহ তা'আলার জন্য এ পবিত্র নামটিই শোভনীয় হয়েছে। 'রাব্ব' শব্দটি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য ব্যবহৃত হতে পারেনা। তবে সম্বন্ধ পদ রূপে ব্যবহৃত হলে সে অন্য কথা। যেমন رَبُّ الدَّارِ বা গৃহস্বামী ইত্যাদি। বলা হয়েছে যে, রাব্ব হল আল্লাহর মহান নামসমূহের অন্যতম নাম।

'আলামীন' শব্দের অর্থ

عَالَمِيْنَ শব্দটি عَالَمٌ শব্দের বহু বচন। আল্লাহ ছাড়া সমুদয় সৃষ্টবস্তুকে عَالَم বলা হয়। عَالَم শব্দটিও বহু বচন এবং এ শব্দের এক বচনই হয়না। আকাশের সৃষ্টজীব এবং পানি ও স্থলের সৃষ্টজীবকেও عَوَالِم অর্থাৎ কয়েকটি عَالَم বলা হয়। অনুরূপভাবে এক একটি যুগ-কাল ও এক একটি সময়কেও عَالَم বলা হয়।

ফার্রা (রহঃ) ও আবূ উবাইদার (রহঃ) মতে প্রতিটি বিবেকসম্পন্ন প্রাণীকে 'আলাম বলা হয়। দানব, মানব ও শাইতানকে 'আলাম বলা হবে। জন্তুকে 'আলাম বলা হবেনা। যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এবং আবূ মুহাইসীন (রহঃ) বলেন যে, প্রত্যেক প্রাণীকেই 'আলাম বলা হয়। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, প্রত্যেক শ্রেণীকে একটা 'আলাম বলা হয়।

জায্যায (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা ইহজগত ও পরজগতে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সবই 'আলাম। কুরতুবী (রহঃ) বলেন যে, এ মতটিই সত্য। কেননা এর মধ্যে সমস্ত 'আলামাই জড়িত রয়েছে। যেমন

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ. قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَآ ۖ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ

ফির'আউন বলল ঃ জগতসমূহের রাব্ব আবার কি? মূসা বলল ঃ তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর রাব্ব, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ২৩-২৪)

সৃষ্টবস্তুকে 'আলাম' বলার কারণ

عَلَم শব্দটি **عَلَامَت** শব্দ হতে নেয়া হয়েছে। কেননা 'আলাম সৃষ্ট বস্তু তার সৃষ্টিকারীর অস্তিত্বের পরিচয় বহন করে এবং তাঁর একাত্মবাদের চিহ্নরূপে কাজ করে থাকে। (কুরতুবী ১/১৩৯)

২। যিনি পরম দয়ালু, অতিশয় করুণাময়।	٢. ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

এর তাফসীর পূর্বেই করা হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তির আর কোন প্রয়োজন নেই। কুরতুবী (রহঃ) বলেন যে, মহান আল্লাহ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ এর বিশেষণের পর اَلرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ নামক বিশেষণটি ভয় প্রদর্শনের পর আশা ভরসার উদ্রেক কল্পে আনয়ন করেছেন। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

نَبِّئْ عِبَادِىٓ أَنِّىٓ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ. وَأَنَّ عَذَابِى هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ

আমার বান্দাদেরকে বলে দাও ঃ নিশ্চয়ই আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর আমার শাস্তি; তা অতি মর্মন্তদ শাস্তি। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৪৯-৫০) (কুরতুবী ১/১৩৯) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌۢ.

নিঃসন্দেহে তোমার রাব্ব ত্বরিত শাস্তিদাতা, আর নিঃসন্দেহে তিনি ক্ষমাশীল ও কৃপানিধান। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৬৫)

'রাব্ব' শব্দটির মধ্যে ভয় প্রদর্শন রয়েছে এবং 'রাহমান' ও 'রাহীম' শব্দ দু'টির মধ্যে আশা ভরসা রয়েছে। সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যদি ঈমানদারগণ আল্লাহর ক্রোধ এবং তাঁর ভীষণ শাস্তি সম্পর্কে পূর্ণভাবে অবহিত হত তাহলে তাদের অন্তর হতে জান্নাতের নন্দন কাননের লোভ লালসা সরে যেত এবং কাফিরেরা যদি আল্লাহ তা'আলার দান ও দয়া দাক্ষিণ্য সম্পর্কে

পূর্ণ জ্ঞান রাখত তাহলে তারা কখনও নিরাশ ও হতাশাগ্রস্ত হতনা।' (মুসলিম ৪/২১০৯)

৩। যিনি বিচার দিনের মালিক।	٣. مَـٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ

বিচার দিনে আল্লাহই একক ক্ষমতার মালিক

মহান আল্লাহর এ উক্তি অনুসারে কিয়ামাত দিবসের সঙ্গে তাঁর অধিকারকে নির্দিষ্ট করার অর্থ এই নয় যে, কিয়ামাত ছাড়া অন্যান্য জিনিসের অধিকারী হতে তিনি অস্বীকার করছেন, কেননা ইতোপূর্বে তিনি স্বীয় বিশেষণ 'রাব্বূল আলামীন' রূপে বর্ণনা করেছেন এবং ওর মধ্যেই দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই জড়িত রয়েছে। কিয়ামাত দিবসের সঙ্গে অধিকারকে নির্দিষ্টকরণের কারণ এই যে, সেই দিন তো আর কেহ সার্বিক অধিকারের দাবীদারই হবেনা। বরং সেই প্রকৃত অধিকারী আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কেহ মুখ পর্যন্ত খুলতে পারবেনা। এমনকি টুঁ শব্দটিও করতে পারবেনা। যেমন তিনি বলেন ঃ

يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ صَفًّا ۖ لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَقَالَ صَوَابًا

সেদিন রুহ্ ও মালাইকা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে; দয়াময় যাকে অনুমতি দিবেন সে ছাড়া অন্যরা কথা বলবেনা এবং সে সঙ্গত কথা বলবে। (সূরা নাবা, ৭৮ ঃ ৩৮) অন্য এক জায়গায় ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَـٰعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَرَضِىَ لَهُۥ قَوْلًا

দয়াময়ের সামনে সব শব্দ স্তব্ধ হয়ে যাবে; সুতরাং মৃদু পদধ্বনি ছাড়া তুমি কিছুই শুনতে পাবেনা। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১০৯) তিনি আরও বলেন ঃ

يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِىٌّ وَسَعِيدٌ

যখন সেই দিন (কিয়ামাত) আসবে তখন কোন ব্যক্তি আমার অনুমতি ছাড়া কথাও বলতে পারবেনা, অনন্তর তাদের মধ্যে কতক তো দুর্ভাগা হবে এবং কতক হবে ভাগ্যবান। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১০৫)

‘ইয়াওমিদ্দীন’ এর অর্থ

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ يَوْمِ الدِّيْنِ এর ভাবার্থ হচ্ছে সমগ্র সৃষ্ট জীবের হিসাব দেয়ার দিন অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন, যেদিন সমস্ত ভাল-মন্দ কাজের ন্যায্য ও চুলচেরা প্রতিদান দেয়া হবে। তবে হ্যাঁ, যদি মহান আল্লাহ কোন কাজ নিজ গুণে মার্জনা করেন তাহলে তা হবে তাঁর ইচ্ছা ভিত্তিক কাজ। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/১৯) সাহাবা (রাঃ), তাবেঈন (রহঃ) এবং পূর্ব যুগীয় সৎ ব্যক্তিগণ হতেও এটা বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহই সবকিছুর একচ্ছত্র মালিক

কেননা মহান আল্লাহই সব কিছুরই প্রকৃত মালিক। যেমন তিনি বলেন ঃ

هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَـٰمُ

তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন মা’বূদ নেই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি। (সূরা হাশর, ৫৯ ঃ ২৩)

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে এই মারফূ‘ হাদীসটি বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

‘ঐ ব্যক্তির নাম আল্লাহ তা‘আলার নিকট অত্যন্ত জঘন্য ও নিকৃষ্ট যাকে শাহান শাহ বা রাজাধিরাজ বলা হয়। কারণ সব কিছুরই প্রকৃত মালিক আল্লাহ ছাড়া আর কেহ নেই।’ (ফাতহুল বারী ১/৬০৪, মুসলিম ৩/১৬৮৮) উক্ত সহীহ হাদীস গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে এসেছে ঃ

‘আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা সেদিন সমগ্র যমীনকে স্বীয় মুষ্ঠির মধ্যে গ্রহণ করবেন এবং আকাশ তাঁর ডান হাতে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ হয়ে জড়িয়ে থাকবে, অতঃপর তিনি বলবেন ঃ ‘আমি আজ প্রকৃত বাদশাহ, যমীনের সেই প্রতাপশালী বাদশাহরা কোথায় গেল? কোথায় রয়েছে সেই মদমত্ত অহংকারীরা?’ (ফাতহুল বারী ১৩/৪০৪, মুসলিম ৪/২১৪৮) কুরআন কারীমে আরও রয়েছে ঃ

لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ ٱلْوَٰحِدِ ٱلْقَهَّارِ

যেদিন মানুষ বের হয়ে পড়বে সেদিন আল্লাহর নিকট তাদের কিছুই গোপন থাকবেনা। ঐ দিন কর্তৃত্ব কার? এক, পরাক্রমশালী আল্লাহরই। (সূরা মু’মিন, ৪০ ঃ ১৬) অন্যকে তাই শুধু রূপক অর্থে মালিক বলা হয়েছে। ঃ কুরআন কারীমে রয়েছে ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا

নিশ্চয়ই আল্লাহ তালূতকে তোমাদের জন্য রাজা রূপে নির্বাচিত করেছেন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৪৭) এখানে তালুতকে মালিক বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে বলা হয়েছে ঃ

وَكَانَ وَرَاءهُم مَّلِكٌ *কারণ তাদের সামনে ছিল এক রাজা।* (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৭৯) কুরআন মাজীদের একটি আয়াতে আছে ঃ

إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَآءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا

তিনি তোমাদের মধ্যে বহু নাবী সৃষ্টি করেছেন, রাজ্যাধিপতি করেছেন। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ২০) সহীহ বুখারী ও মুসলিমে একটি হাদীসে আছে ঃ مِثْلُ الْمُلُوْكِ عَلَى الأَسِرَّةِ 'সিংহাসনে অধিষ্ঠিত বাদশাহদের ন্যায়।' (ফাতহুল বারী ৬/৮৯, মুসলিম ৩/১৫১৮)

'দীন' শব্দের অর্থ

دِيْن শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রতিদান, প্রতিফল এবং হিসাব নিকাশ। যেমন আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল হাকীমে বলেন ঃ يَوْمَئِذ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ

সেদিন আল্লাহ তাদের প্রাপ্ত প্রতিফল পুরোপুরি দিবেন। (সূরা নূর, ২৪ ঃ ২৫) পবিত্র কুরআনের অন্য জায়গায় আছে ঃ أَئِنَّا لَمَدِينُونَ

আমাদেরকে কি প্রতিফল দেয়া হবে? (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ৫৩) হাদীসে আছে ঃ বিজ্ঞ সেই ব্যক্তি যে নিজেই নিজের কাছে প্রতিদান নেয় এবং এমন কার্যাবলী সম্পাদন করে যা অবধারিত মৃত্যুর পরে কাজে লাগে।' (ইবন মাজাহ ২/১৪২৩) অর্থাৎ নিজের আত্মার কাছে নিজেই হিসাব নিকাশ নিয়ে থাকে। যেমন ফারুকে আযম (রাঃ) বলেছেন ঃ তোমাদের হিসাব নিকাশ গৃহীত হওয়ার পূর্বে তোমরা নিজের হিসাব নিজেই গ্রহণ কর এবং তোমাদের কার্যাবলী দাঁড়ি পাল্লায় ওযন হওয়ার পূর্বে তোমরা নিজেরাই ওযন কর এবং তোমরা আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার পূর্বে সেই বড় উপস্থিতির জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ কর যেদিন তোমাদের কোন কাজ গোপন থাকবেনা।' যেমন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَوۡمَئِذٍ تُعۡرَضُونَ لَا تَخۡفَىٰ مِنكُمۡ خَافِيَةٌ

সেদিন উপস্থিত করা হবে তোমাদেরকে এবং তোমাদের কিছুই গোপন থাকবেনা। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ১৮)

৪। আমরা আপনারই ইবাদাত করছি এবং আপনারই নিকট সাহায্য চাচ্ছি।	٤. إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ

'ইবাদাত' শব্দের ধর্মীয় তত্ত্ব

'ইবাদাত' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সার্বিক অপমান ও নীচতা। যেমন 'তারীকে মোয়াব্বাদ' সাধারণ ঐ পথকে বলে যা সবচেয়ে হীন ও নিকৃষ্ট হয়ে থাকে। এ রকমই بَعِيْرٌ مُعَبَّدٌ ঐ উটকে বলা হয় যা হীনতা ও দুর্বলতার চরম সীমায় পদার্পণ করে। শারীয়াতের পরিভাষায় প্রেম, বিনয়, নম্রতা এবং ভীতির সমষ্টির নাম 'ইবাদাত'।

কিছু করার পূর্বে আল্লাহর উপর নির্ভর করার উপকারিতা

চতুর্থ আয়াতটির অর্থ এ দাঁড়ায় ঃ 'আমরা আপনার ছাড়া আর কারও ইবাদাত করিনা এবং আপনার ছাড়া আর কারও উপর নির্ভর করিনা।' আর এটাই হচ্ছে পূর্ণ আনুগত্য ও বিশ্বাস। সালাফে সালেহীন বা পূর্বযুগীয় প্রবীণ ও বয়োবৃদ্ধ বিজ্ঞজনদের কেহ কেহ এ মত পোষণ করেন যে, সম্পূর্ণ কুরআনের গোপন তথ্য রয়েছে সূরা ফাতিহার মধ্যে এবং এ পূর্ণ সূরাটির গোপন তথ্য إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ এই আয়াতটিতে রয়েছে ঃ

আয়াতটির প্রথমাংশে রয়েছে শির্কের প্রতি অসন্তুষ্টি এবং দ্বিতীয়াংশে রয়েছে স্বীয় ক্ষমতার উপর অনাস্থা ও মহাশক্তিশালী আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা। এ সম্পর্কীয় আরও বহু আয়াত পবিত্র কুরআনে বিদ্যমান রয়েছে। যেমন তিনি বলেন ঃ

فَٱعۡبُدۡهُ وَتَوَكَّلۡ عَلَيۡهِۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُونَ.

সুতরাং তাঁর ইবাদাত কর এবং তাঁর উপর নির্ভর কর, আর তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে তোমার রাব্ব অনবহিত নন। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১২৩) তিনি আরও বলেন ঃ

قُلْ هُوَ ٱلرَّحْمَـٰنُ ءَامَنَّا بِهِۦ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا

বল ঃ তিনি দয়াময়, আমরা তাঁকে বিশ্বাস করি ও তাঁরই উপর নির্ভর করি। (সূরা মূল্‌ক, ৬৭ ঃ ২৯) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلًا

তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই; অতএব তাঁকেই কর্ম-বিধায়ক রূপে গ্রহণ কর। (সূরা মুয্যাম্মিল,৭৩ ঃ ৯)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ এই আয়াতেও এই বিষয়টিই রয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে সম্মুখস্ত কেহকে লক্ষ্য করে সম্বোধন ছিলনা। কিন্তু এ আয়াতটিতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং এতে বেশ সুন্দর পারস্পরিক সম্বন্ধ রয়েছে। কেননা বান্দা যখন আল্লাহর গুণাবলী বর্ণনা করল তখন সে যেন মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহর সম্মুখে হাযির হয়ে গেল। এখন সে মালিককে সম্বোধন করে স্বীয় দীনতা, হীনতা ও দারিদ্রতা প্রকাশ করল এবং বলতে লাগল ঃ 'হে আল্লাহ! আমরা তো আপনার হীন ও দুর্বল দাস মাত্র এবং আমরা সব কাজে, সর্বাবস্থায় ও সাধনায় একমাত্র আপনারই মুখাপেক্ষী। এ আয়াতে এ কথারও প্রমাণ রয়েছে যে, এর পূর্ববর্তী সমস্ত বাক্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে এ খবর দেয়া হয়েছিল।

সূরা ফাতিহা আল্লাহর প্রশংসা শিক্ষা দেয়

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় উত্তম গুণাবলীর জন্য নিজের প্রশংসা নিজেই করেছিলেন এবং বান্দাদেরকে ঐ শব্দগুলি দিয়েই তাঁর প্রশংসা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এজন্যই যে ব্যক্তি এ সূরাটি জানা সত্ত্বেও সালাতে তা পাঠ করেনা তার সালাত হয়না। যেমন সহীহ বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে উবাদাহ ইব্‌ন সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'ঐ ব্যক্তির সালাতকে সালাত বলা যায়না যে সালাতের মধ্যে সূরা ফাতিহা পাঠ করেনা।' (ফাতহুল বারী ২/২৭৬, মুসলিম ১/২৯৫) সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, আল্লাহ বলেছেন ঃ আমি সালাতকে আমার মধ্যে ও আমার বান্দার মধ্যে

অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করে নিয়েছি। অর্ধেক অংশ আমার ও বাকী অর্ধেক অংশ আমার বান্দার। বান্দা যা চাবে তাকে তাই দেয়া হবে।

বান্দা যখন اَلْحَمْدُ للّٰه رَبِّ الْعَالَمِيْنَ বলে, তখন আল্লাহ বলেন ঃ 'আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল।' বান্দা যখন বলে الرَّحْمـٰنِ الرَّحِيمِ তখন তিনি বলেন ঃ 'আমার বান্দা আমার গুণগান করল।' যখন সে বলে مَـٰلِكِ يَوْمِ الدِّينِ তখন তিনি বলেন ঃ 'আমার বান্দা আমার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করল।' সে যখন বলে إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'এটা আমার এবং আমার বান্দার মধ্যেকার কথা এবং আমার বান্দার জন্য তাই রয়েছে যা সে চাবে।' অতঃপর বান্দা যখন اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ পাঠ করে তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'এ সবই তো আমার বান্দার জন্য এবং আমার বান্দা যা চাবে তার জন্য তাই রয়েছে।' (মুসলিম ১/২৯৭)

তাওহীদ আল উলুহিয়া

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, إِيَّاكَ نَعْبُدُ এর অর্থ হচ্ছে ঃ 'হে আমার রাব্ব! আমরা বিশেষভাবে একাত্মবাদে বিশ্বাসী, আমরা ভয় করি এবং মহান সত্ত্বায় সকল সময়ে আশা রাখি। আপনি ছাড়া আর কারও আমরা ইবাদাতও করিনা, কেহকে ভয়ও করিনা এবং কারও উপর আশাও রাখিনা।' আর وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ এর তাৎপর্য ও ভাবার্থ হচ্ছে ঃ 'আমরা আপনার পূর্ণ আনুগত্য বরণ করি ও আমাদের সকল কাজে একমাত্র আপনারই কাছে সহায়তা প্রার্থনা করি।

তাওহীদ আর রুবুবিয়াহ

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ 'এর ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, 'তোমরা একমাত্র তাঁরই উপাসনা কর এবং তোমাদের সকল কাজে তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর।' إِيَّاكَ نَعْبُدُকে পূর্বে আনার কারণ এই যে, ইবাদাতই হচ্ছে মূল ঈপ্সিত বিষয়, আর সাহায্য চাওয়া ইবাদাতেরই মাধ্যম ও

ব্যবস্থা। আর সাধারণ নিয়ম হচ্ছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে পূর্বে বর্ণনা করা এবং কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে পরে বর্ণনা করা। আল্লাহ তা‘আলাই এসব ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল জানেন।

আল্লাহ তাঁর নাবীকে বলেছেন ‘দাস’

যেখানে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বড় বড় দানের কথা উল্লেখ করেছেন সেখানেই শুধু তিনি তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম **عَبْد** বা দাস নিয়েছেন। বড় বড় নি‘আমাত যেমন কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ করা, সালাতে দাঁড়ানো, মিরাজ করানো ইত্যাদি। যেমন তিনি বলেন ঃ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَـٰبَ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই যিনি তাঁর দাসের প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ১) আরও বলেন ঃ

وَأَنَّهُۥ لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ

আর এই যে, যখন আল্লাহর বান্দা তাঁকে ডাকার জন্য দন্ডায়মান হল। (সূরা জিন, ৭২ ঃ ১৯) অন্যত্র বলেন ঃ

سُبْحَـٰنَ ٱلَّذِىٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَيْلًا

পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে ভ্রমণ করিয়েছিলেন। (সূরা ইসরাহ, ১৭ ঃ ১)

বিপদাপদে আল্লাহর কাছে সাজদাবনত হতে হবে

আল্লাহ তা‘আলা কুরআন মাজীদে এ শিক্ষা দিয়েছেন ঃ ‘হে নাবী! বিরুদ্ধবাদীদের অবিশ্বাসের ফলে যখন তোমার মন সংকীর্ণ হয়ে পড়ে তখন তুমি আমার ইবাদাতে লিপ্ত হয়ে যাও।’ তাই নির্দেশ হচ্ছে ঃ

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّـٰجِدِينَ. وَٱعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِينُ.

আমি তো জানি যে, তারা যা বলে তাতে তোমার অন্তর সংকুচিত হয়। সুতরাং তুমি তোমার রবের প্রশংসা দ্বারা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর

এবং সাজদাহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও। আর তোমার মৃত্যু উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার রবের ইবাদাত কর। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৯৭-৯৯)

৫। আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন।	٥. ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ

প্রশংসামূলক বাক্য আগে উল্লেখ করার কারণ

যেহেতু বান্দা প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করেছে এবং তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করেছে, সেহেতু এখন তার কর্তব্য হবে স্বীয় প্রয়োজন পূরণের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা। যেমন পূর্বেই হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 'অর্ধেক আমার জন্য এবং অর্ধেক আমার বান্দার জন্য, আর আমার বান্দা যা চাবে তা সে পাবে।'

একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে, اهدنَـــا الصِّرَاطَ المُستَقيمَ এর মধ্যে কি পরিমাণ সূক্ষ্মতা ও প্রকৃষ্টতা রয়েছে! প্রথমে বিশ্বপ্রভুর যথোপযুক্ত প্রশংসা ও গুণগান, অতঃপর নিজের ও মুসলিম ভাইদের প্রয়োজন পূরণের জন্য আকুল প্রার্থনা। প্রার্থিত বস্তু লাভের এটাই উৎকৃষ্ট পন্থা। এ উত্তম পন্থা নিজে পছন্দ করেই মহান আল্লাহ এ পন্থা স্বীয় বান্দাদের বাতলে দিলেন। কখনও কখনও প্রার্থনার সময় প্রার্থী স্বীয় অবস্থা ও প্রয়োজন প্রকাশ করে থাকে। যেমন মূসা (আঃ) বলেছিলেন ঃ

رَبِّ إِنِّي لِمَآ أَنزَلۡتَ إِلَيَّ مِنۡ خَيۡرٖ فَقِيرٞ

হে আমার রাব্ব! আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করবেন আমি তার কাঙ্গাল। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ২৪) ইউনুস (আঃ) দু'আ করার সময় বলেছিলেন ঃ

لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبۡحَٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ

আপনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই; আপনি পবিত্র, মহান; আমি তো সীমা লংঘনকারী। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৮৭) কোন কোন প্রার্থনায় প্রার্থী শুধুমাত্র প্রশংসা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেই নীরব থাকে।

সূরায় হিদায়াত শব্দের বিশ্লেষণ

এখানে হিদায়াতের অর্থ ইরশাদ ও তাওফীক অর্থাৎ সুপথ প্রদর্শন ও সক্ষমতা প্রদান।' অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَهَدَيْنَـٰهُ ٱلنَّجْدَيْنِ

এবং আমি তাদেরকে দু'টি পথ দেখিয়েছি। (সূরা বালাদ, ৯০ ঃ ১০) কখনও 'হিদায়াত' শব্দটি اِلَى এর সঙ্গে مُتَعَدِّىْ বা সকর্মক ক্রিয়া হয়ে থাকে। যেমন বলেন ঃ

ٱجْتَبَـٰهُ وَهَدَىٰهُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ

আল্লাহ তাকে মনোনীত করেছিলেন এবং তাকে পরিচালিত করেছিলেন সরল পথে। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১২১) এবং অন্য জায়গায় বলেন ঃ

فَٱهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْجَحِيمِ

তাদেরকে ত্বারিত কর জাহান্নামের পথে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ২৩) এখানে হিদায়াতের অর্থ পথ প্রদর্শন ও রাস্তা বাতলে দেয়া। এইরূপ ঘোষণা রয়েছে ঃ

وَإِنَّكَ لَتَهْدِىٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ

তুমি তো প্রদর্শন কর শুধু সরল পথ। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৫২) জিন বা দানবের কথা কুরআন মাজীদে রয়েছে ঃ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَىٰنَا لِهَـٰذَا

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৪৩) (অর্থাৎ অনুগ্রহ পূর্বক সৎপথে পরিচালিত হওয়ার তাওফীক দান করেছেন)

'সিরাতাল মুস্তাকীম' এর বিশ্লেষণ

صِّرَاطَ الْمُستَقِيمَ এর কয়েকটি অর্থ আছে। ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন তাবারী বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে সুস্পষ্ট, সরল ও পরিষ্কার রাস্তা যার কোন জায়গা বা কোন অংশই বাঁকা নয়। এ বিষয়ে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ একমত যে, *সিরাতাল মুস্তাকীম* হল ঐ সরল-সঠিক পথ যার কোন শাখা-প্রশাখা নেই। উদাহরণ স্বরূপ, জারীর ইব্ন আতীয়া আল-খাতাফীর একটি কবিতা উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ বিশ্বাসীদের নেতা রয়েছেন সেই পথে যা সব সময়েই সরল-সঠিক এবং অন্যান্য পথে রয়েছে বক্রতা। তাবারী (রহঃ) বলেছেন, এ বিষয়ে অনেক উদাহরণ রয়েছে। অতঃপর তিনি বলেন ঃ আরাবরা *সিরাত* শব্দটি বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাপারে

ব্যবহার করে থাকে, তা সৎ কাজের জন্য হোক অথবা অসৎ কাজের জন্য হোক। কিন্তু সৎ ব্যক্তির জন্য সঠিক এবং অসৎ ব্যক্তির বেলায় বক্র শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। কুরআনে যে সরল-সঠিক পথের কথা বলা হয়েছে তা হল ইসলাম। (তাবারী ১/১৭০)

মুসনাদ আহমাদে একটি হাদীসে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'আল্লাহ তা'আলা صِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ এর একটা দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। (তা এই যে) সীরাতে মুস্তাকীমের দুই দিকে দু'টি প্রাচীর রয়েছে। তাতে কয়েকটি খোলা দরজা আছে। দরজাগুলির উপর পর্দা লটকানো রয়েছে। সীরাতে মুস্তাকীমের প্রবেশ দ্বারে সব সময়ের জন্য একজন আহ্বানকারী নিযুক্ত রয়েছে। সে বলছে ঃ 'হে জনমণ্ডলী! তোমরা সবাই এই সোজা পথ ধরে চলে যাও, আঁকা বাঁকা পথে যেওনা।' ঐ রাস্তার উপরে একজন আহ্বানকারী রয়েছে। যে কেহ এ দরজাগুলির কোন একটি খুলতে চাচ্ছে সে বলছে ঃ সাবধান, তা খুলনা, যদি খুলে ফেল তাহলে সোজা পথ থেকে সরে পড়বে।' সীরাতে মুস্তাকীম হচ্ছে ইসলাম, প্রাচীরগুলি আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ, প্রবেশ দ্বারে আহ্বানকারী হচ্ছে কুরআন কারীম এবং রাস্তার উপরের আহ্বানকারী হচ্ছে আল্লাহর ভয় যা প্রত্যেক মুসলিমের অন্তরে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে উপদেষ্টা রূপে অবস্থান করে থাকে।' (আহমাদ ৪/১৮২) এ হাদীসটি মুসনাদ ইব্ন আবী হাতিম, তাফসীর ইব্ন জারীর, জামে' তিরমিযী এবং সুনান নাসাঈতেও রয়েছে এবং এর ইসনাদ হাসান সহীহ। আল্লাহই এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল জানেন। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে 'হক বা সত্য'। তাঁর এ কথাটিই সবচেয়ে ব্যাপক এবং এসব কথার মধ্যে পারস্পরিক কোন বিরোধ নেই।

মু'মিনরাই হিদায়াতের আবেদন জানায়

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, মু'মিনের তো পূর্বেই আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়াত লাভ হয়ে গেছে, সুতরাং সালাতে বা বাইরে হিদায়াত চাওয়ার আর প্রয়োজন কি? তাহলে সেই প্রশ্নের উত্তর এই যে, এতে উদ্দেশ্য হচ্ছে হিদায়াতের উপর সদা প্রতিষ্ঠিত থাকার তাওফীক চাওয়া। কেননা বান্দা প্রতিটি মুহুর্তে ও সর্বাবস্থায় প্রতিনিয়তই আল্লাহ তা'আলার প্রতি আশাবাদী ও মুখাপেক্ষী। সে নিজে স্বীয় জীবনের লাভ ক্ষতির মালিক নয়। বরং নিশিদিন সে আল্লাহরই প্রত্যাশী ও মুখাপেক্ষী। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে শিখিয়েছেন যে, সে

যেন সর্বদা হিদায়াত প্রার্থনা করে এবং তার উপর সদা প্রতিষ্ঠিত থাকার তাওফীক চাইতে থাকে। ভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তাঁর দরজায় ভিক্ষুক করে নিয়েছেন। সে আল্লাহকে ডাকলে আল্লাহ তার ডাকে সাড়া দিয়ে তার আকুল প্রার্থনা মঞ্জুর করার গুরু দায়িত্ব স্কন্ধে নিয়েছেন। বিশেষ করে অসহায় ও মুহতাজ ব্যক্তি যখন দিনরাত আল্লাহকে ডাকতে থাকে এবং প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনা জানায়, আল্লাহ তখন তার সেই আকুল প্রার্থনা কবূলের জিম্মাদার হয়ে যান। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআন মাজীদে বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَـٰبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَـٰبِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ

হে মু'মিনগণ! তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং এই কিতাবের প্রতি যা তিনি তাঁর রাসূলের উপর অবতীর্ণ করেছেন এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৩৬) এ আয়াতে ঈমানদারগণকে ঈমান আনার নির্দেশ দেয়া এমনই, যেমন হিদায়াত প্রাপ্তগণকে হিদায়াত চাওয়ার নির্দেশ দেয়া। এই দুই স্থানেই উদ্দেশ্য হচ্ছে তার উপরে অটল, অনড় ও দ্বিধাহীনচিত্তে স্থির থাকা। আর এমন কার্যাবলী সদা সম্পাদন করা যা উদ্দেশ্য লাভে সহায়তা করে। দেখুন মহান আল্লাহ তাঁর ঈমানদার বান্দাগণকে নিম্নের এ প্রার্থনা করারও নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ

হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে পথ প্রদর্শনের পর আমাদের অন্তরসমূহ বক্র করবেননা এবং আমাদেরকে আপনার নিকট হতে করুণা প্রদান করুন, নিশ্চয়ই আপনি প্রভূত প্রদানকারী। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৮)

সুতরাং اهدنـــا الصِّرَاطَ المُستقيمَ এর অর্থ দাঁড়ালো ঃ 'হে আল্লাহ! আমাদেরকে সরল ও সোজা পথের উপর অটল ও স্থির রাখুন এবং তা হতে আমাদেরকে দূরে অপসারিত করবেননা।'

৬। তাদের পথ, যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন;	٦. صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

৭। তাদের পথে নয় যাদের প্রতি আপনার গযব বর্ষিত হয়েছে, তাদের পথেও নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।	٧. غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ

এর বর্ণনা পূর্বেই গত হয়েছে যে, বান্দার এ কথার উপর মহান আল্লাহ বলেন, 'এটা আমার বান্দার জন্য এবং আমার বান্দার জন্য ঐ সব কিছুই রয়েছে যা সে চাবে।' এ আয়াতটি সীরাতে মুস্তাকীমের তাফসীর এবং ব্যাকারণবিদ বা নাহ্বীদের নিকট এটা 'সীরাতে মুস্তাকীম' হতে বদল হয়েছে এবং আতফ্ বায়ানও হতে পারে। আল্লাহ তা'আলাই এ সম্পর্কে সবচেয়ে ভাল জানেন। আর যারা আল্লাহর পুরস্কার লাভ করেছে তাদের বর্ণনা সূরা নিসার মধ্যে এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَـٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّـٰلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُوْلَـٰٓئِكَ رَفِيقًا. ذَٰلِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا

আর যে কেহ আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত হয়, তারা ঐ ব্যক্তিদের সঙ্গী হবে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন; অর্থাৎ নাবীগণ, সত্য সাধকগণ, শহীদগণ ও সৎ কর্মশীলগণ; এবং এরাই সর্বোত্তম সঙ্গী। এটাই আল্লাহর অনুগ্রহ এবং আল্লাহর জ্ঞানই যথেষ্ট। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৬৯-৭০)

আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে ঃ 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ঐ সব মালাক/ফেরেশতা, নাবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সৎলোকের পথে পরিচালিত করুন যাদেরকে আপনি আপনার আনুগত্য ও ইবাদাতের কারণে পুরস্কৃত করেছেন।'

বলা হচ্ছে ঃ 'হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সরল সোজা পথ প্রদর্শন করুন, ঐ সব লোকের পথ যাদেরকে আপনি পুরস্কৃত করেছেন, যারা হিদায়াত বা সুপথ প্রাপ্ত এবং অটল অবিচল ছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুগত ছিলেন। যারা আল্লাহর নির্দেশ পালনকারী ও নিষিদ্ধ কাজ হতে দূরে-বহুদূরে অবস্থানকারী ছিলেন। আর ঐ সব লোকের পথ হতে রক্ষা করুন যাদের উপর আপনার ধূমায়িত ক্রোধ ও অভিশাপ বর্ষিত

হয়েছে, যারা সত্যকে জেনে শুনেও তা থেকে দূরে সরে গেছে এবং পথভ্রষ্ট লোকদের পথ হতেও আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখুন যাদের সঠিক পথ সম্পর্কে কোন ধারণা ও জ্ঞানই নেই, যারা পথভ্রষ্ট হয়ে লক্ষ্যহীনভাবে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায় এবং তাদেরকে সরল, সঠিক সাওয়াবের পথ দেখানো হয়না।

ঈমানদারদের পন্থা তো এটাই যে, সত্যের জ্ঞানও থাকতে হবে এবং তার আমলও থাকতে হবে। ইয়াহুদীদের আমল নেই এবং খৃষ্টানদের জ্ঞান নেই। এ জন্যই ইয়াহুদীরা অভিশপ্ত হল এবং খৃষ্টানরা হল পথভ্রষ্ট। কেননা জেনে শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে আমল পরিত্যাগ করা লা'নত বা অভিশাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ مَن لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ

যাদেরকে (ইয়াহুদীদেরকে) আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন এবং যাদের প্রতি গযব নাযিল করেছেন। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৬০)

খৃষ্টানরা যদিও একটা জিনিসের ইচ্ছা করে, কিন্তু তার সঠিক পথ তারা পায়না। কেননা তাদের কর্মপন্থা ভুল এবং তারা সত্যের অনুসরণ হতে দূরে সরে পড়েছে। অভিশাপ ও পথভ্রষ্টতা এই দুই দলের তো রয়েছেই, কিন্তু ইয়াহুদীরা অভিশাপের অংশে একধাপ এগিয়ে রয়েছে। যেমন কুরআন কারীমে রয়েছে ঃ

قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ

যারা (খৃষ্টানরা) অতীতে নিজেরা ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে এবং অন্যান্যদেরকেও ভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করেছে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৭৭)

এ কথার সমর্থনে বহু হাদীস ও বর্ণনা পেশ করা যেতে পারে। মুসনাদ আহমাদে আছে যে, আদী ইব্ন আবী হাতিম (রাঃ) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেনাবাহিনী একদা আমার ফুফুকে এবং কতকগুলো লোককে বন্দী করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হাযির করেন। আমার ফুফু তখন বলেন ঃ 'আমাকে দেখা-শোনা করার লোক দূরে সরে রয়েছে এবং আমি একজন অধিক বয়স্কা অচলা বৃদ্ধা। আমি কোন খিদমাতের যোগ্য নই। সুতরাং দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন। আল্লাহ আপনার উপরও দয়া করবেন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'যে তোমার খবরাখবর নিয়ে থাকে সে ব্যক্তিটি কে?' তিনি বললেন ঃ 'আদী ইব্ন আবী হাতিম।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'সে কি ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে এদিক ওদিক পালিয়ে বেড়াচ্ছে?' অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বিনা শর্তে মুক্তি দেন। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরে আসেন তখন তাঁর সাথে আর একটি লোক ছিলেন। খুব সম্ভব তিনি আলীই (রাঃ) ছিলেন। তিনি আমার ফুফুকে বললেন ঃ ‘যাও, তাঁর কাছে গিয়ে সাওয়ারীর প্রার্থনা কর।’ আমার ফুফু তার কাছে প্রার্থনা জানালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে তা মঞ্জুর করেন এবং তিনি সাওয়ারী পেয়ে যান। তিনি ওখান হতে মুক্তি লাভ করে সোজা আমার নিকট চলে আসেন এবং বলেন ঃ ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দানশীলতা তোমার পিতা হাতিমকেও ছাড়িয়ে গেছে। তাঁর কাছে একবার কেহ গেলে আর শূন্য হাতে ফিরে আসেনা।’ এ কথা শুনে আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হই। আমি দেখি যে, ছোট ছেলে ও বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরা তাঁর কাছে অবাধে যাতায়াত করছে এবং তিনি তাদের সাথে অকুণ্ঠচিত্তে অকৃত্রিমভাবে আলাপ আলোচনা করছেন। এ দেখে আমার বিশ্বাস হল যে, তিনি কাইসার ও কিসরার মত বিশাল রাজত্ব ও সম্মানের অভিলাষী নন। তিনি আমাকে দেখে বলেন ঃ ‘আদী! *‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’* বলা হতে পালিয়ে বেড়াচ্ছ কেন? আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহ উপাসনার যোগ্য আছে কি? *‘আল্লাহু আকবার’* বলা হতে এখন তুমি মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ কেন? মহাসম্মানিত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা থেকে বড় আর কেহ আছে কি?’ (তাঁর এই কথাগুলি এবং তাঁর সরলতা ও অকৃত্রিমতা আমার উপর এমনভাবে দাগ কাটলো ও ক্রিয়াশীল হল যে) তৎক্ষণাত আমি ইসলাম কবূল করলাম এবং দেখতে পেলাম যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখমন্ডল আনন্দে রক্তিমাভ বর্ণ ধারণ করেছে। তিনি বললেন ঃ

‘যারা (আল্লাহর) ক্রোধ অর্জন করেছে তারা হল ইয়াহুদী এবং যারা ধ্বংসের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে তারা হল খৃষ্টান।’ এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযীও (রহঃ) বর্ণনা করেছেন এবং তিনি একে হাসান গারীব বলেছেন। (আহমাদ ৪/৩৭৮, তিরমিযী ৮/২৮৯)

مَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ দ্বারা ইয়াহুদকে বুঝানো হয়েছে এবং ضَالِّيْنَ দ্বারা খৃষ্টানদেরকে বুঝানো হয়েছে।’ আরও একটি হাদীসে আছে যে, আদীর (রাঃ) প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই তাফসীরই করেছিলেন। এ হাদীসের অনেক সনদ আছে এবং বিভিন্ন শব্দে সে সব বর্ণিত হয়েছে।

ইতিহাসের পুস্তকসমূহে বর্ণিত আছে যে, যায়িদ ইব্ন আমর ইব্ন নুফায়িল যখন খাঁটি ধর্মের অনুসন্ধানে স্বীয় বন্ধুবান্ধব ও সাথী-সঙ্গীসহ বেরিয়ে পড়েন এবং এদিক

ওদিক বিচরণের পর শেষে সিরিয়ায় এলেন। তখন ইয়াহুদীরা তাঁদেরকে বলল ঃ ‘আল্লাহর অভিশাপের কিছু অংশ না নেয়া পর্যন্ত আপনারা আমাদের ধর্মে আসতেই পারবেননা।’ তাঁরা উত্তরে বললেন ঃ ‘তা হতে বাঁচার উদ্দেশেই তো আমরা সত্য ধর্মের অনুসন্ধানে বের হয়েছি, কাজেই কিরূপে তা গ্রহণ করতে পারি?’ তাঁরা খৃষ্টানদের সাথে সাক্ষাৎ করলে তারা বলল ঃ ‘আল্লাহ তা‘আলার লা’নত ও অসন্তুষ্টির কিছু অংশ না নেয়া পর্যন্ত আপনারা আমাদের ধর্মেও আসতে পারবেননা।’

তাঁরা বললেন ঃ ‘আমরা এটাও করতে পারিনা।’ তারপর যায়িদ ইব্ন আমর ইব্ন নুফাইল স্বাভাবিক ধর্মের উপরই রয়ে গেলেন। তিনি মূর্তি পূজা ও স্বগোত্রীয় ধর্মত্যাগ করলেন, কিন্তু ইয়াহুদী ও খৃষ্টান ধর্ম কোনক্রমেই গ্রহণ করলেননা। তবে তাঁর সঙ্গী সাথীরা খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করল, কেননা ইয়াহুদীদের ধর্মের সঙ্গে এর অনেক মিল ছিল। যায়িদের ধর্মেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন অরাকা ইব্ন নাওফিল। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওতের যুগ পেয়েছিলেন এবং আল্লাহর হিদায়াত তাঁকে সুপথ প্রদর্শন করেছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান এনেছিলেন ও সেই সময় পর্যন্ত যে ওয়াহী অবতীর্ণ হয়েছিল তিনি তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হউন।

সূরা ফাতিহার সার সংক্ষেপ

এই কল্যাণময় ও বারাকাতপূর্ণ সূরাটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীর সমষ্টি। এই সাতটি আয়াতে আল্লাহ তা‘আলার যোগ্য প্রশংসা, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, পবিত্র নামসমূহ এবং উচ্চতম বিশেষণের সুন্দর বর্ণনা রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই রোজ কিয়ামাতের বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং বান্দাদের প্রতি নির্দেশ রয়েছে যে, তারা যেন সেই মহান প্রভুর নিকট অত্যন্ত বিনীতভাবে যাঞ্চা করে, যেন তাঁর কাছে নিজের দারিদ্র্যতা ও অসহায়ত্বের কথা অকপটে স্বীকার করে, তাঁকে সব সময় অংশীবিহীন ও তুলনাবিহীন মনে করে, খাঁটি অন্তরে তাঁর ইবাদাত; তাঁর আহদানিয়াত বা একাত্মবাদে বিশ্বাস করে, তাঁর কাছে সরল সোজা পথ ও তার উপর সুদৃঢ় ও অটল থাকার জন্য নিশিদিন আকুল প্রার্থনা জানায়। এই অবিসম্বাদিত পথই একদিন তাকে রোজ কিয়ামাতের পুলসিরাতও পার করাবে এবং নাবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সৎ লোকদের পাশে জান্নাতুল ফিরদাউসের নন্দন কাননে স্থান দিবে। সাথে সাথে আলোচ্য সূরাটির মধ্যে যাবতীয় সৎকার্যাবলী সম্পাদনের প্রতি নিরন্তর উৎসাহ দেয়া হয়েছে যাতে কিয়ামাতের দিন বান্দা আত্মকৃত সাওয়াবসমূহ সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে। এ ছাড়া

মিথ্যা ও অন্যায় পথে চলার ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে, যাতে কিয়ামাত দিবসেও সে বাতিলপন্থীদের দল থেকে দূরে থাকতে পারে।

নি'আমাত হচ্ছে আল্লাহর তরফ হতে দান

ধীরস্থির ও সূক্ষ্মভাবে জাগ্রত মস্তিষ্ক নিয়ে চিন্তা ভাবনা করলে অতি সহজেই অনুধাবন করা যাবে যে, আল্লাহ তা'আলার বর্ণনারীতি কি সুন্দর! আলোচ্য সূরায় **اَنْعَمْتَ** নামক বাক্যাংশে দানের ইসনাদ বা সম্পর্ক আল্লাহর দিকে করা হয়েছে এবং **اَنْعَمْتَ** বলা হয়েছে। কিন্তু **غَضَب** এর ইসনাদ করা হয়নি; বরং এখানে কর্তাকেই লোপ করা হয়েছে এবং **مَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ** বলা হয়েছে। এখানে বিশ্ব প্রভুর মহান মর্যাদার প্রতি যথাযোগ্য লক্ষ্য রাখা হয়েছে। অবশ্য প্রকৃতপক্ষে মূল কর্তা আল্লাহ তা'আলাই। যেমন অন্যস্থানে বলা হয়েছে ঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم

তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি, যারা আল্লাহ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে? (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ ঃ ১৪) এরূপভাবেই ভ্রষ্টতার পরিণতি পথভ্রষ্টের দিকেই করা হয়েছে। অথচ অন্য এক জায়গায় আছে ঃ

مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ وَلِيًّا مُّرْشِدًا

আল্লাহ যাকে সৎ পথে পরিচালিত করেন সে সৎ পথ প্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি কখনও তার কোন পথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবেনা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ১৭) অন্যত্র আছে ঃ

مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَا هَادِىَ لَهُۥ ۚ وَيَذَرُهُمْ فِى طُغْيَـٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ

আল্লাহ যাদেরকে বিপথগামী করেন, তাদের কোন পথ প্রদর্শক নেই, আর আল্লাহ তাদেরকে তাদেরই বিভ্রান্তির মধ্যে উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে ছেড়ে দেন। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৮৬) এ রকমই আরও বহু আয়াত রয়েছে যদ্বারা এ কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, পথ প্রদর্শনকারী ও পথ বিভ্রান্তকারী হচ্ছেন একমাত্র মহান আল্লাহ।

কাদরিয়্যাহ দল, যারা কতকগুলি অস্পষ্ট আয়াতকে দলীলরূপে গ্রহণ করে বলে থাকে যে, বান্দা তার ইচ্ছাধীন ও মুক্ত স্বাধীন, সে নিজেই পছন্দ করে এবং নিজেই সম্পাদন করে। কিন্তু তাদের এ কথা ভ্রমাত্মক ও প্রমাদপূর্ণ। এটা খণ্ডনের

জন্য ভূরি ভূরি স্পষ্ট আয়াতসমূহ বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু বাতিল পন্থীদের এটাই রীতি যে, তারা স্পষ্ট আয়াতকে পরিহার করে অস্পষ্ট আয়াতের পিছনে লেগে থাকে। বিশুদ্ধ হাদীসে আছে ঃ

'যখন তোমরা ঐ লোকদেরকে দেখ যারা অস্পষ্ট আয়াতসমূহের পিছনে লেগে থাকে তখন বুঝে নিবে যে, তারা ওরাই যাদের নাম স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নিয়েছেন এবং স্বীয় কিতাবে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং তোমরা তাদের থেকে সতর্ক থাক।' (ফাতহুল বারী ৮/৫৭) এ নির্দেশনামায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইঙ্গিত এই আয়াতের প্রতি রয়েছে ঃ

فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَـٰبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِۦ

অতএব যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে, ফলতঃ তারাই অশান্তি সৃষ্টি ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের উদ্দেশে অস্পষ্টের অনুসরণ করে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৭)

সুতরাং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত যে, বিদ'আতীদের অনুকূলে কুরআনুল হাকীমের মধ্যে সঠিক ও অকাট্য দলীল একটিও নেই। কুরআন মাজীদের আগমন সূচিত হয়েছে সত্য ও মিথ্যা, হিদায়াত ও গুমরাহীর মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শনের জন্যই। বৈপরীত্য ও মতবিরোধের জন্য আসেনি বা তার অবকাশও এতে নেই। এতো মহাবিজ্ঞ ও প্রশংসিত আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ হয়েছে।

আমীন বলা প্রসঙ্গ

সূরা ফাতিহা শেষ করে আমীন বলা মুস্তাহাব। اٰمِيْن শব্দটি يَاسِيْن শব্দটির মত এবং এটা اٰمِيْن ও পড়া হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে ঃ 'হে আল্লাহ! আপনি কবূল করুন।' আমীন বলা মুস্তাহাব হওয়ার দলীল হল ঐ হাদীসটি যা মুসনাদ আহমাদ, আবূ দাঊদ এবং তিরমিযীতে অ'য়েল ইব্ন হুজর (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে غَيرِ الْمَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ পড়ে আমীন বলতে শুনেছি। তিনি স্বর দীর্ঘ করতেন।' (আহমাদ ৪/৩১৫, আবূ দাঊদ ১/৪৭৪, তিরমিযী ২/৬৭) সুনান আবূ দাঊদে আছে যে, তিনি স্বর উচ্চ করতেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে 'হাসান' বলেছেন। আলী (রাঃ), ইব্ন মাসউদ (রাঃ), আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীগণ

হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্বশব্দ আমীন তাঁর নিকটবর্তী প্রথম সারির লোকেরা স্পষ্টতঃই শুনতে পেতেন। (আবূ দাঊদ ১/৫৭৫) সুনান আবূ দাঊদ ও সুনান ইব্ন মাজাহয় এও আছে যে, 'আমীনের শব্দে মাসজিদ প্রতিধ্বনিত হয়ে বেজে উঠত।' (আবূ দাঊদ ১/৫৭৫, ইব্ন মাজাহ ১/২৭৯) ইমাম দারাকুতনীও (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং একে 'হাসান' বলে মন্তব্য করেছেন। আরও বর্ণিত আছে যে, বিলাল (রাঃ) বললেন ঃ

'হে আল্লাহর রাসূল! আমি সালাতে যোগ দেয়ার পূর্বে 'আমীন' বলা শেষ করবেননা।' (আবূ দাঊদ ১/৫৭৬, দারাকুতনী ১/৩৩৫) সালাতের বাইরে থাকলেও 'আমীন' বলতে হবে। তবে যে ব্যক্তি সালাতে থাকবে তার জন্য বেশি জোর দেয়া হয়েছে। সালাত আদায়কারী একাকী হোক বা মুক্তাদী হোক বা ইমাম হোক, সর্বাবস্থায় তাকে আমীন বলতেই হবে। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'তোমাদের কেহ যদি সালাতে 'আমীন' বলে, তা যদি মালাইকার আমীন বলার সাথে মিলে যায় তাহলে তার পূর্বের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে।' (ফাতহুল বারী ১১/২০৩, মুসলিম ১/৩০৭) সহীহ মুসলিমে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'ইমাম যখন আমীন বলেন এবং অন্যরাও আমীন বলে তখন মালাইকার আমীন বলার সাথে যাদের আমীন বলা মিলে যাবে তাদের পিছনের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে।' (মুসলিম ১/৩০৭) এর ভাবার্থ এই যে, তার 'আমীন' ও মালাইকার 'আমীন' বলার সময় একই হয় বা কবূল হওয়া হিসাবে অনুরূপ হয় অথবা আন্তরিকতায় অনুরূপ হয়। সহীহ মুসলিমে আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) হতে মারফূ রূপে বর্ণিত আছে ঃ 'ইমাম যখন وَلاَ الضَّآلِّيْنَ বলেন তখন তোমরা 'আমীন' বল, আল্লাহ দু'আ কবূল করবেন।' (মুসলিম ১/৩০৩) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঃ 'আমাদের আশা ভঙ্গ করবেননা।' অধিকাংশ আলেম বলেন যে, এর অর্থ হল ঃ 'হে আল্লাহ! আপনি আমাদের প্রার্থনা কবূল করুন।'

মুসনাদ আহমাদে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ইয়াহুদীদের আলোচনা হলে তিনি বলেন ঃ

'আমাদের তিনটি জিনিসের উপর ইয়াহুদীদের যতটা হিংসা বিদ্বেষ আছে ততটা হিংসা অন্য কোন কিছুর উপর নেই। (১) জুমু'আ, আল্লাহ আমাদেরকে

তার প্রতি হিদায়াত করেছেন ও পথ দেখিয়েছেন এবং তারা এ থেকে ভ্রষ্ট রয়েছে। (২) কিবলাহ এবং (৩) ইমামের পিছনে আমাদের আমীন বলা।' (আহমাদ ৬/১৩৪)

ইব্‌ন মাজাহর (রহঃ) হাদীসে রয়েছে ঃ 'সালাম' ও 'আমীন' ইয়াহুদীদের যতটা বিরক্তি উৎপাদন করে অন্য কোন জিনিস তা করেনা। (ইব্‌ন মাজাহ ২/২৭৮)

সূরা ফাতিহার তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ২ ঃ বাকারাহ মাদানী سُوْرَةُ الْبَكَرَهْ مَادَنِيَّةٌ

(আয়াত ঃ ২৮৬, রুকূ' ঃ ৪০) (اَيَاتُهَا : ٢٨٦. رُكُوْعَاتُهَا : ٤٠)

সূরা বাকারাহ মাদীনায় অবতীর্ণ

সূরা বাকারাহর সম্পূর্ণ অংশই মাদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং মাদীনায় প্রথম যেসব সূরা অবতীর্ণ হয়েছে, এটিও তার একটি। তবে অবশ্যই এর وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৮১) এই আয়াতটি সবশেষে অবতীর্ণ হয়েছে এ কথা বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ কুরআন মাজীদের এ আয়াতটি সবশেষে অবতীর্ণ হয়েছে এরূপ সম্ভাবনা রয়েছে। সম্ভবতঃ তা শেষের দিকে অবতীর্ণ হয়েছে। এভাবে সুদের নিষিদ্ধতার আয়াতগুলিও শেষের দিকে নাযিল হয়েছে। খালিদ ইব্ন মি'দান সূরা বাকারাহকে فُسْطَاطُ الْقُرْاَنِ অর্থাৎ কুরআনের শিবির বলতেন। কিছু সংখ্যক আলেমের উক্তি আছে যে, এর মধ্যে এক হাজার সংবাদ, এক হাজার অনুজ্ঞা এবং এক হাজার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এতে দু'শ' সাতাশিটি আয়াত আছে। এর শব্দ হচ্ছে ছ'হাজার দুশ' একুশটি এবং এতে অক্ষর আছে পঁচিশ হাজার পাঁচশ'টি।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এ সূরাটি মাদানী। আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রাঃ), যায়িদ ইব্ন সাবিত (রাঃ) এবং বহু ইমাম, আলেম এবং মুফাস্সির হতে সর্বসম্মতভাবে এটাই বর্ণিত হয়েছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি 'বাত্নে ও'য়াদীতে শাইতানের উপর পাথর নিক্ষেপ করেছিলেন। বাইতুল্লাহ তাঁর বাম দিকে ছিল এবং মিনা ছিল ডান দিকে এবং তিনি বলছিলেন, 'এ স্থান হতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাথর নিক্ষেপ করেছিলেন যাঁর উপর সূরা বাকারাহ অবতীর্ণ হয়েছিল।'

ইব্ন মিরদুওয়াই (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীগণের (রাঃ) মধ্যে কিছু শিথিলতা লক্ষ্য করলেন তখন তিনি তাঁদেরকে يَا اَصْحَابَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةَ বলে ডাক দিলেন। খুব সম্ভব এটা হুনায়েনের যুদ্ধের ঘটনা হবে। যখন মুসলিম সৈন্যদের পদস্খলন ঘটেছিল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশক্রমে

আব্বাস (রাঃ) তাদেরকে 'হে গাছওয়ালাগণ!' অর্থাৎ 'হে বাইয়া'তে রিযওয়ানকারীগণ' এবং 'হে সূরা বাকারাহ ওয়ালাগণ' বলে ডাক দিয়েছিলেন। যেন তাঁদের মধ্যে আনন্দ ও বীরত্বের সৃষ্টি হয়। সুতরাং সেই ডাক শোনা মাত্রই সাহাবীগণ (রাঃ) চতুর্দিক থেকে বিদ্যুৎ গতিতে দৌড়ে এলেন। মুসাইলামা, যে মিথ্যা নাবুওয়াতের দাবী করেছিল, তার সাথে যুদ্ধ করার সময়েও ইয়ামামার রণ প্রান্তরে বানু হানীফার প্রভাবশালী ব্যক্তিরা মুসলিমদেরকে বেশ বিচলিত ও সন্ত্রস্ত করেছিল এবং তাঁদের পা টলমল করে উঠেছিল, তখন সাহাবীগণ (রাঃ) এভাবেই লোকদেরকে يَا اَصْحَابَ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ বলে ডাক দিয়েছিলেন। সেই শব্দ শুনে সবাই ফিরে এসে একত্রিত হয়েছিলেন, আর এমন শৌর্য ও বীরত্বের সাথে প্রাণপণে যুদ্ধ করেছিলেন যে, মহান আল্লাহ তা'আলা সেই ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে মুসলিমদেরকেই জয়ী করেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ও সাহাবীগণের উপর সব সময় সন্তুষ্ট থাকুন। (আল মাজমা' ৬/১৮০)

সূরা বাকারাহর মাহাত্ম্য ও গুণাবলী

মুসনাদ আহমাদ, সহীহ মুসলিম, জামে' তিরমিযী এবং সুনান নাসাঈতে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'তোমরা নিজেদের ঘরকে কবরে পরিণত করনা, যে ঘরে সূরা বাকারাহ পাঠ করা হয় সেখানে শাইতান প্রবেশ করতে পারেনা।' (আহমাদ ২/২৮৪, মুসলিম ১/৫৩৯, তিরমিযী ৮/১৮০ নাসাঈ ৫/১৩) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান সহীহ বলেছেন। অন্য একটি হাদীসে আছে যে, যে ঘরে সূরা বাকারাহ পড়া হয় সেখান হতে শাইতান পলায়ন করে। হাদীসটি ইমাম নাসাঈ (রহঃ) তাঁর 'আল ইয়াওমু ওয়াল লাইলাতু' নামক পুস্তকে এবং ইমাম হাকিম স্বীয় গ্রন্থ 'মুসতাদরাক' এ বর্ণনা করেছেন। (হাদীস নং ৫/১৩ ও ২/২৬০)

মুসনাদ দারিমীতে ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যে ঘরে সূরা বাকারাহ পড়া হয় সেই ঘর থেকে শাইতান গুহ্যদ্বার দিয়ে বায়ু নিঃসরণ করতে করতে পলায়ন করে।

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদের (রাঃ) উক্তি আছে যে, যে ঘরে সূরা বাকারাহর প্রথম চারটি আয়াত, আয়াতুল কুরসী, তার পরবর্তী দু'টি আয়াত এবং সব শেষের তিনটি আয়াত, একুনে দশটি আয়াত পাঠ করা হয়, শাইতান সেই ঘরে ঐ রাতে যেতে পারেনা এবং সেইদিন ঐ বাড়ীর লোকদের শাইতান অথবা কোন

খারাপ জিনিস কোন ক্ষতি করতে পারেনা। (দারিমী ২/৩২২) এ আয়াতগুলি পাগলের উপর পড়লে তার পাগলামীও দূর হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যেমন প্রত্যেক জিনিসের উচ্চতা থাকে তেমনই কুরআনের উচ্চতা হচ্ছে সূরা বাকারাহ। যে ব্যক্তি রাত্রিকালের নীরব ক্ষণে নিজের নিভৃত কক্ষে তা পাঠ করে, তিন রাত্রি পর্যন্ত শাইতান সেই ঘরে যেতে পারেনা। আর দিনের বেলায় যদি পড়ে তাহলে তিন দিন পর্যন্ত সেই ঘরে শাইতান পা দিতে পারেনা। (তাবারানী ৬/১৬৩, ইব্ন হিব্বান ২/৭৮)

জামে' তিরমিযী, সুনান নাসাঈ এবং সুনান ইব্ন মাজাহয় রয়েছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটা ছোট্ট সেনাবাহিনী এক জায়গায় পাঠালেন এবং তিনি তার নেতৃত্বভার এমন ব্যক্তির উপর অর্পণ করলেন যিনি বলেছিলেন ঃ 'আমার সূরা বাকারাহ মুখস্থ আছে।' সে সময় একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বললেন ঃ 'আমিও তা মুখস্ত করতাম। কিন্তু পরে আমি এই ভয় করেছিলাম যে, না জানি আমি তার উপর আমল করতে পারব কি না।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

'কুরআন শিক্ষা কর, কুরআন পাঠ কর। যে ব্যক্তি তা শিখে ও পাঠ করে, অতঃপর তার উপর আমলও করে, তার উপমা এ রকম যেমন মিশ্ক পরিপূর্ণ পাত্র, যার সুগন্ধি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আর যে ব্যক্তি তা শিক্ষা করল, অতঃপর ঘুমিয়ে পড়ল তার দৃষ্টান্ত সেই পাত্রের মত যার মধ্যে মিশ্ক তো ভরা রয়েছে, কিন্তু উপর হতে মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।' ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান বলেছেন এবং মুরসাল বর্ণনাও রয়েছে। আল্লাহই এ সম্পর্কে ভাল জানেন। (তিরমিযী ৮/১৮৬, নাসাঈ ৫/২২৭ এবং ইব্ন মাজাহ ১/৭৮)

সহীহ বুখারীতে রয়েছে, উসাইদ ইব্ন হুজাইর (রাঃ) একদা রাতে সূরা বাকারাহর পাঠ আরম্ভ করেন। তাঁর ঘোড়াটি, যা তাঁর পার্শ্বেই বাঁধা ছিল, হঠাৎ করে লাফাতে শুরু করে। তিনি পাঠ বন্ধ করলে ঘোড়া সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। আবার তিনি পড়তে আরম্ভ করলে ঘোড়াও লাফাতে শুরু করে। তিনি পুনরায় পড়া বন্ধ করেন এবং ঘোড়াটিও স্তব্ধ হয়ে থেমে যায়। তৃতীয় বারও এরূপই ঘটে। তাঁর শিশু পুত্র ইয়াহ্ইয়া ঘোড়ার পাশেই শুইয়ে ছিল। কাজেই তিনি ভয় করলেন যে, না জানি ছেলের আঘাত লেগে যায়। সুতরাং তিনি পড়া বন্ধ করে ছেলেকে উঠিয়ে নেন। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করেন যে, ঘোড়ার চমকে উঠার কারণ কি? সকালে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে ঘটনাটি আনুপূর্বিক বর্ণনা করেন। তিনি শুনতে

থাকেন ও বলতে থাকেন ঃ ‘উসাইদ! তুমি পড়েই যেতে!’ উসাইদ (রাঃ) বলেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল! তৃতীয় বারের পরে প্রিয় পুত্র ইয়াহইয়ার কারণে আমি পড়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিয়েছিলাম। অতঃপর আমি মাথা আকাশের দিকে উঠালে ছায়ার ন্যায় একটি জ্যোতির্ময় জিনিস দেখতে পাই এবং দেখতে দেখতেই তা উপরের দিকে উত্থিত হয়ে শূন্যে মিলিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ঃ

‘তুমি কি জান সেটা কি ছিল? তাঁরা ছিলেন গগন বিহারী অগণিত জ্যোতির্ময় মালাক/ফেরেশতা। তোমার (পড়ার) শব্দ শুনে তাঁরা ত্রস্তপদে নিকটে এসেছিলেন। যদি তুমি পাঠ বন্ধ না করতে তাহলে তাঁরা সকাল পর্যন্ত এরকমই থাকতেন এবং মাদীনার সকল লোক তা দেখে চক্ষু জুড়াতো। একটি মালাক/ফেরেশতাও তাদের দৃষ্টির অন্তরাল হতেননা।’ (ফাতহুল বারী ৮/৬৮০) এ হাদীসটি ইমাম কাসিম ইব্‌ন সালাম স্বীয় কিতাব ‘কিতাবু ফাযাইলিল কুরআন’ এ রিওয়ায়াত করেছেন।

সূরা বাকারাহ ও সূরা আলে ইমরানের বৈশিষ্ট্য

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবূ নাঈম থেকে বর্ণনা করেন, নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

‘তোমরা অভিনিবেশ সহকারে সূরা বাকারাহ শিক্ষা কর। কারণ এর শিক্ষা অতি কল্যাণকর এবং এ শিক্ষার বর্জন অতি বেদনাদায়ক। বাতিলপন্থী যাদুকরও এর মুখস্ত করার ক্ষমতা রাখেনা।’ অতঃপর কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার বললেন ঃ

‘সূরা বাকারাহ ও সূরা আলে ইমরান শিক্ষা কর। এ দু’টি হচ্ছে জ্যোতির্ময় নূর বিশিষ্ট সূরা। কিয়ামাতের দিন এরা এদের পাঠকের উপর সামিয়ানা, মেঘমালা অথবা পাখির ঝাঁকের ন্যায় ছায়া বিস্তার করবে। কুরআনের পাঠক কাবর থেকে উঠে দেখতে পাবে যে, এক জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডল বিশিষ্ট সুন্দর যুবক তার পাশে দাঁড়িয়ে বলছে ঃ ‘তুমি আমাকে চিন কি?’ এ বলবে ঃ ‘না’। সে বলবে ঃ ‘আমি সেই কুরআন যে তোমাকে দিনে ক্ষুধার্থ ও পিপাসার্ত রেখেছিল এবং রাতে বিছানা হতে দূরে সরিয়ে সদা জাগ্রত রেখেছিল। প্রত্যেক ব্যবসায়ী তার ব্যবসার পিছনে রয়েছে; কিন্তু আজ সমুদয় ব্যবসা তোমার পিছনে আছে।’ আজ তার ডান হাতে রাজ্য এবং অনন্তকালের জন্য বাম হাতে চির অবস্থান দেয়া হবে। তার মাথায় সার্বিক সম্মান ও অনন্ত মর্যাদার মুকুট পরানো হবে। তার বাপ-মাকে এমন দু’টি সুন্দর মূল্যবান পরিধেয় বস্ত্র পরানো হবে যার মূল্যের সামনে সারা দুনিয়াও অতি নগণ্য মনে হবে। তারা বিচলিত হয়ে বলবে ঃ ‘এ দয়া ও অনুগ্রহ, এ পুরস্কার ও অবদানের কারণ

কি?' তখন তাদেরকে বলা হবে ঃ 'তোমাদের ছেলেদের কুরআন পাঠের কারণে তোমাদেরকে এ পুরস্কার দেয়া হয়েছে।' অতঃপর তাদেরকে বলা হবে ঃ 'পড়ে যাও এবং ধীরে ধীরে জান্নাতের সোপানে আরোহণ কর।' সুতরাং তারা পড়তে থাকবে ও উচ্চ হতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করবে। সে ধীরে ধীরেই পাঠ করুক বা তাড়াতাড়ি পাঠ করুক।' (আহমাদ ৫/৩৫২) সুনান ইব্‌ন মাজাহয় এ হাদীসটি আংশিকভাবে বর্ণিত আছে। (হাদীস নং ২/১২৪২) এর ইসনাদ হাসান এবং মুসলিমের শর্ত বিদ্যমান। এর বর্ণনাকারী ইব্‌ন মুহাজির হতে ইমাম মুসলিমও (রহঃ) বর্ণনা নিয়েছেন এবং ইমাম ইব্‌ন মুঈনও তাকে নির্ভরযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন। ইমাম নাসাঈর (রহঃ) মতে এতে কোন দোষ নেই। মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'কুরআন পাঠ করতে থাক, কারণ তা তার পাঠকের জন্য কিয়ামাতের দিন সুপারিশ করবে। দু'টি জ্যোতির্ময় সূরা, সূরা বাকারাহ ও সূরা আলে ইমরান পড়তে থাক। এ দু'টি সূরা কিয়ামাতের দিন এমনভাবে আসবে যেমন দু'টি সামিয়ানা, দু'টি মেঘ খণ্ড অথবা পাখির দু'টি বিরাট ঝাঁক। তাছাড়া সে তার পাঠকদের পক্ষ হতে আল্লাহ তা'আলার নিকট সুপারিশ করবে।' পুনরায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

'সূরা বাকারাহ পাঠ করতে থাক; কেননা এর পাঠে বারাকাত আছে এবং তা বর্জন বা পরিত্যাগ করায় খুবই আফসোস রয়েছে। এর মুখস্ত করার শক্তি বাতিলপন্থীদের নেই।' সহীহ মুসলিমেও অনুরূপ হাদীস আছে। (আহমাদ ৫/২৪৯, মুসলিম ১/৫৫৩) মুসনাদ আহমাদের আর একটি হাদীসে আছে ঃ

'কিয়ামাতের দিন কুরআন ও কুরআন পাঠকদের আহ্বান করা হবে। সূরা বাকারাহ ও সূরা আলে ইমরান অগ্রে অগ্রে চলবে। মেঘমালা অথবা পাখির ঝাঁকের মত (চলতে থাকবে) এবং বিশ্ব-রবের নিকট সুপারিশ করবে। সহীহ মুসলিম ও জামে' তিরমিযীতেও এ হাদীসটি আছে। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান গারীব বলেছেন। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সূরা দু'টি (রাতের সালাতে) এক রাক'আতে পাঠ করতেন। (আহমাদ ৪/১৮৩, মুসলিম ১/৫৫৪, তিরমিযী ৮/১৯১)

আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। আলীফ-লাম-মীম।	١. الٓمٓ

একক অক্ষরসমূহের আলোচনা

الٓمٓ এর মত مُقَطَّعَةٌ বা খণ্ডকৃত অক্ষরগুলি যা অনেক সূরার প্রথমে এসেছে, এগুলির তাফসীরের ব্যাপারে মুফাস্‌সিরদের মধ্যে বেশ মতভেদ রয়েছে। কেহ কেহ বলেন যে, ওগুলির মর্মার্থ শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই সম্যক অবহিত। অন্য কেহ এগুলির অর্থ জানেনা। এ জন্য তারা এ অক্ষরগুলির কোন তাফসীর করেননা। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) এ কথা আবূ বাকর (রাঃ), উমার (রাঃ), উসমান (রাঃ), আলী (রাঃ) এবং ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হতে নকল করেছেন।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, সূরাসমূহের প্রথমে যে অক্ষরগুলি আছে যেমন الر، طسم، حم، ص، ق ইত্যাদি এ সবগুলিই حُرُوْف هِجَا, কোন কোন আরাবী ভাষাবিদ বলেন যে, এই অক্ষরগুলি যা পৃথক পৃথকভাবে ২৮টি আছে, তন্মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করে বাকীগুলিকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। যেমন কেহ বলে থাকে ঃ 'আমার পুত্র ا، ب، ت، ث লিখে, তখন ভাবার্থ এই দাঁড়ায় যে, তার পুত্র এ ধরনের ২৮টি অক্ষর লিখে। কিন্তু প্রথম কয়েকটির নাম উল্লেখ করে বাকীগুলি ছেড়ে দেয়া হয়েছে। (তাবারী ১/২০৮)

একক অক্ষর দিয়ে বিভিন্ন সূরার শুরু

পুনরুক্ত অক্ষরগুলিকে বাদ দিয়ে সূরাসমূহের প্রথমে এ প্রকারের চৌদ্দটি অক্ষর এসেছে। অক্ষরগুলি হচ্ছে ঃ

ا، ل، م، ص، ر، ك، ه، ى، ع، ط، س، ح، ق، ن

এসব একত্রিত করলে نَصٌّ حَكِيْمٌ فَاطِعٌ لَهُ سَرٌّ গঠিত হয়। সংখ্যা হিসাবে এ অক্ষরগুলি হয় চৌদ্দটি এবং মোট অক্ষর হল আটাশটি। সুতরাং এগুলি পূরা অর্ধেক হচ্ছে এবং এগুলি পরিত্যক্ত অক্ষরগুলি হতে বেশি মর্যাদাপূর্ণ।

এটা সুনিশ্চিত কথা যে, আল্লাহ তা'আলার কথা কখনও বাজে ও অর্থহীন হতে পারেনা। তাঁর কথা এ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। কিন্তু কতকগুলো নির্বোধ বলে থাকে যে, এসব অক্ষরের কোন তাৎপর্য বা অর্থই নেই। তারা সম্পূর্ণ ভুলের উপর রয়েছে। ওগুলির কোন না কোন অর্থ অবশ্যই রয়েছে। যদি নিস্পাপ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে তার কোন অর্থ সাব্যস্ত হয় তাহলে আমরা সেই অর্থ করব ও বুঝবো। আর যদি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন

অর্থ না করে থাকেন তাহলে আমরাও কোন অর্থ করবনা, বরং বিশ্বাস করব যে, তা আল্লাহর নিকট থেকে এসেছে।

ءَامَنَّا بِهِۦ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا

আমরা ওতে বিশ্বাস করি, সমস্তই আমাদের রবের নিকট হতে সমাগত। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৭)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা দান করেননি এবং আলেমদের মধ্যে এ ব্যাপারে অত্যধিক মতভেদ রয়েছে। যদি কারও কোন কথার দলীল জানা থাকে তাহলে ভাল কথা, সে তা মেনে নিবে। নতুবা মঙ্গল এই যে, এগুলি আল্লাহ তা'আলার কথা তা বিশ্বাস করবে এবং এও বিশ্বাস করবে যে, এগুলির অর্থ অবশ্যই আছে, যা একমাত্র আল্লাহই জানেন, আমাদের নিকট তা প্রকাশ পায়নি।

একক অক্ষরগুলি মুজিযা প্রকাশ করছে

এবার আর একটি হিকমাত বর্ণনা করা হয়েছে। তা এই যে, এগুলি উল্লেখ করায় কুরআন মাজীদের একটি মুজিযা বা অলৌকিকত্ব প্রকাশ পেয়েছে, যা আনয়ন করতে সমস্ত সৃষ্টজীব অপারগ হয়েছে। অক্ষরগুলি দৈনন্দিন ব্যবহৃত অক্ষর দ্বারা বিন্যস্ত হলেও তা সৃষ্টজীবের কথা হতে সম্পূর্ণ পৃথক। মুবার্রাদ (রহঃ) এবং মুহাক্কিক আলেমগণের একটি দল ফার্রা (রহঃ) ও কাতরাব (রহঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে।

যামাখ্শারী (রহঃ) তাফসীরী কাশ্শাফের মধ্যে এ কথার সমর্থনে অনেক কিছু বলেছেন। শায়খ ইমাম আল্লামা আবূ আব্বাস ইব্ন তাইমিয়াহ (রহঃ) এবং হাফিয মুজতাহিদ আবুল আজ্জাজ মিজ্জীও (রহঃ) ইমাম ইব্ন তাইমিয়ার বরাতে হিকমাতটি বর্ণনা করেছেন। যামাখ্শারী (রহঃ) বলেন যে, সমস্ত অক্ষর একত্রিতভাবে না আসার এটাই কারণ। তবে হ্যাঁ, ঐ অক্ষরগুলিকে বার বার আনার কারণ হচ্ছে মুশরিকদের বার বার অপারগ ও লা-জবাব করে দেয়া, তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা। যেমনভাবে কুরআনুল হাকীমের মধ্যে অধিকাংশ কাহিনী ও ঘটনা কয়েকবার বর্ণনা করা হয়েছে এবং বার বার স্পষ্ট ভাষায় কুরআনের অনুরূপ কিতাব আনার ব্যাপারে তাদের অপারগতার বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

কোন স্থানে শুধুমাত্র একটি অক্ষর এসেছে। যেমন ق، ن، ص কোন কোন স্থানে এসেছে দু'টি অক্ষর, যেমন حم, কোন জায়গায় তিনটি অক্ষর এসেছে, যেমন الم, কোন কোন স্থানে চারটি অক্ষর এসেছে, যেমন المر ও المص এবং কোন কোন জায়গায় এসেছে পাঁচটি অক্ষর যেমন كهيعص এবং حم عسق কেননা আরাবদের শব্দগুলি সমস্তই এরকমই এক অক্ষর বিশিষ্ট, দুই অক্ষর বিশিষ্ট, তিন অক্ষর বিশিষ্ট, চার অক্ষর বিশিষ্ট এবং পাঁচ অক্ষর বিশিষ্ট। তাদের পাঁচ অক্ষরের বেশি শব্দ নেই।

যখন এ কথাই সাব্যস্ত হল যে, এ অক্ষরগুলি কুরআন মাজীদের মধ্যে মুজিযা বা অলৌকিক স্বরূপ আনা হয়েছে তখন যে সূরাগুলির প্রথমে এ অক্ষরগুলি এসেছে সেখানে কুরআনেরও আলোচনা হওয়া এবং এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা হওয়া উচিত। হয়েছেও তাই। উনিত্রিশটি সূরায় এগুলি এসেছে। যেমন ঃ

الٓمٓ (২ ঃ ১), المر (১৩ ঃ ১), المص (৭ ঃ ১), كهسعص (১৯ ঃ ১), حم، عسق (৪২ ঃ ১-২),

এখানেও এ অক্ষরগুলির পরে বর্ণনা আছে যে, এই কুরআন আল্লাহর কালাম হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। অন্য স্থানে আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

الٓمٓ. ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُ. نَزَّلَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ

আলিফ, লাম, মীম। আল্লাহ ছাড়া কোনই ইলাহ (উপাস্য) নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও নিত্য বিরাজমান। তিনি সত্যসহ তোমার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, যা পূর্ববর্তী বিষয়ের সত্যতা প্রতিপাদনকারী। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১-৩) এখানেও এ অক্ষরগুলির পরে কুরআনুল হাকীমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা হয়েছে। অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

الٓمٓصٓ. كِتَٰبٌ أُنزِلَ إِلَيۡكَ فَلَا يَكُن فِي صَدۡرِكَ حَرَجٞ

আলিফ লাম-মিম-সাদ। 'এ একটি কিতাব যা তোমার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, সুতরাং তোমার অন্তরে যেন মোটেই সংকীর্ণতা না আসে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১-২) অন্যত্র আছে ঃ

الٓرۚ كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ إِلَيۡكَ لِتُخۡرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذۡنِ رَبِّهِمۡ

আলিফ লাম রা। এই কিতাব, ইহা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানব জাতিকে তাদের রবের নির্দেশক্রমে বের করে আনতে পার অন্ধকার হতে আলোর দিকে। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ১-২) আবার ইরশাদ হচ্ছে ঃ

الٓمٓ. تَنزِيلُ ٱلۡكِتَٰبِ لَا رَيۡبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ

আলিফ লাম মীম। এই কিতাব জগতসমূহের রবের নিকট হতে অবতীর্ণ, এতে কোন সন্দেহ নেই। (সূরা সাজদাহ, ৩২ ঃ ১-২) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

حمٓ. تَنزِيلٌ مِّنَ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

হা মীম। ইহা দয়াময়, পরম দয়ালুর নিকট হতে অবতীর্ণ। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ১-২) আরও এক জায়গায় তিনি বলেন ঃ

حمٓ. عٓسٓقٓ. كَذَٰلِكَ يُوحِيٓ إِلَيۡكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكَ ٱللَّهُ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ

হা, মীম। আইন, সীন, কাফ। পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ এভাবেই তোমার পূর্ববর্তীদের মতই তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেন। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ১-৩) এরকমই অন্যান্য সূরার সূচনাংশের প্রতি চিন্তা করলে জানা যাবে যে, এসব অক্ষরের পরে পবিত্র কালামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহান মর্যাদার বর্ণনা রয়েছে, যদ্বারা এ কথা ভালভাবে জানা যায় যে, এ অক্ষরগুলি মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতার অপারগতা প্রমাণ করার জন্যই আনা হয়েছে।

২। ইহা ঐ গ্রন্থ যার মধ্যে কোন সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই; ধর্মভীরুদের জন্য এ গ্রন্থ পথ নির্দেশ।	٢. ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبَۛ فِيهِۛ هُدًى لِّلۡمُتَّقِينَ

কুরআনে সন্দেহের কোন কিছু নেই

كِتَٰبٌ এর অর্থ কুরআনুল কারীম। رَيۡبَ এর অর্থ হচ্ছে সংশয় ও সন্দেহ। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) এবং আরও কয়েকজন সাহাবী (রাঃ) হতে

এ অর্থ বর্ণিত হয়েছে। (তাবারী ১/২২৮) আবূ দারদা (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আবূ মালিক নাফি' (রহঃ), যিনি ইব্ন উমারের কৃতদাস, 'আতা (রহঃ), আবুল আলীয়া (রহঃ), রাবী' ইব্ন আনাস (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ (রহঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। আদী ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বলেন যে, মুফাস্‌সিরগণের মধ্যে এতে কোন মতভেদ নেই। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৩১) رَيْبَ শব্দটি আরাবদের কবিতায় অপবাদের অর্থেও এসেছে।

لاَ رَيْبَ فِيْهِ এর অর্থ হল এই যে, এই কুরআন আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। যেমন সূরা সাজদাহয় বলা হয়েছে ঃ

الٓمٓ. تَنزِيلُ ٱلْكِتَـٰبِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ

আলিফ লাম মীম। এই কিতাব জগতসমূহের রবের নিকট হতে অবতীর্ণ। (সূরা সাজদাহ, ৩২ ঃ ১-২) কেহ কেহ বলেছেন যে, এটা خَبَر হলেও نَهِيْ এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ **لاَ تَرْتَابُوْا فِيْهِ** 'তোমরা এতে আদৌ সন্দেহ করনা।' কোন কোন কারী لاَ رَيْبَ এর উপরে **وَقْف** করে থাকেন এবং **فِيْهِ هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ** কে পৃথক বাক্য রূপে পাঠ করেন। কিন্তু **لاَ رَيْبَ فِيْهِ** এর উপর **وَقْف** করা বা না থামা খুবই উত্তম। কেননা একই বিষয় এভাবেই সূরা সাজদাহর আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে এবং এর মধ্যে তুলনামূলকভাবে **فِيْهِ هُدًى** এর চেয়ে বেশি **مُبَالَغَة** হয়।

হিদায়াত তাদের জন্য যাদের রয়েছে তাকওয়া

এ স্থানে হিদায়াতকে মুত্তাকীনের সঙ্গে বিশিষ্ট করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هُدًى وَشِفَآءٌ ۖ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ

বল ঃ মু'মিনদের জন্য ইহা পথ নির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন হবে তাদের জন্য অন্ধত্ব। তারা এমন যে, যেন তাদেরকে আহ্বান করা হয় বহু দূর হতে। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ৪৪) অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّـٰلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

আমি অবতীর্ণ করি কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য সুচিকিৎসা ও দয়া, কিন্তু তা সীমা লংঘনকারীদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। (সূরা ইসরাহ, ১৭ ঃ ৮২) এ বিষয়ের আরও বহু আয়াত রয়েছে এবং এগুলির ভাবার্থ এই যে, যদিও কুরআন কারীম সকলের জন্যই হিদায়াত স্বরূপ, তথাপি শুধু সৎ লোকেরাই এর দ্বারা উপকার পেয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

(হে মানব জাতি!) তোমাদের কাছে তোমাদের রবের তরফ হতে এমন বিষয় সমাগত হয়েছে যা হচ্ছে নাসীহাত এবং অন্তরসমূহের সকল রোগের আরোগ্যকারী, আর মু'মিনদের জন্য ওটা পথ প্রদর্শক ও রাহমাত। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৫৭)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) ও ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হিদায়াতের অর্থ হচ্ছে আলো।

কারা মুত্তাকী

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, মুত্তাকীন তারাই যারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে শির্ক হতে দূরে থাকেন এবং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশাবলী মেনে চলেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, মুত্তাকীন তারাই যারা আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করে হিদায়াতকে পরিত্যাগ করেননা এবং তাঁর রাহমাতের আশা রেখে তাঁর তরফ থেকে অবতীর্ণ কিতাবকে বিশ্বাস করে থাকেন। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, মুত্তাকীন তারাই যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতের পরে বলেন ঃ

ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡغَيۡبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ

যারা অদৃশ্য বিষয়গুলিতে বিশ্বাস করে এবং যথা নিয়মে সালাত কায়েম করে, আর আমি তাদেরকে যে সব রিয্ক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৩-৪)

ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, এসব গুণ মুত্তাকীনদের মধ্যে একত্রে জমা হয়। জামে' তিরমিযী ও সুনান ইব্ন মাজাহয় আতীয়াহ সা'দী (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'বান্দা প্রকৃত মুত্তাকী হতে পারেনা যে পর্যন্ত না সে ঐ সমুদয় জিনিস ছেড়ে দেয় যাতে কোন দোষ নেই এই ভয়ে যে, দোষের মধ্যে যেন না পড়ে। (তিরমিযী ৭/১৪৭, ইবন মাজাহ ২/১৪০৯)

দুই ধরনের হিদায়াত রয়েছে

কখনও কখনও হিদায়াতের অর্থ হয় অন্তরের মধ্যে ঈমানের স্থিতিশীলতা। বান্দার অন্তরে এই হিদায়াতের উপর মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেহ ক্ষমতা রাখেনা। পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হচ্ছে ঃ

إِنَّكَ لَا تَهۡدِى مَنۡ أَحۡبَبۡتَ

তুমি যাকে ভালবাস, ইচ্ছা করলেই তাকে সৎ পথে আনতে পারবেনা। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৫৬) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেন ঃ

لَّيۡسَ عَلَيۡكَ هُدَٰهُمۡ

তাদেরকে সুপথে আনার দায়িত্ব তোমার নয়। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৭২) অন্য স্থানে তিনি বলেন ঃ

مَن يُضۡلِلِ ٱللَّهُ فَلَا هَادِىَ لَهُۥ

যাদেরকে আল্লাহ বিপথগামী করেন, তাদের কোন পথ প্রদর্শক নেই। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৮৬) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

مَن يَهۡدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلۡمُهۡتَدِ ۖ وَمَن يُضۡلِلۡ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ وَلِيًّا مُّرۡشِدًا

আল্লাহ যাকে সৎ পথে পরিচালিত করেন সে সৎ পথ প্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি কখনও তার কোন পথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবেনা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ১৭)

কখনও কখনও হিদায়াতের অর্থ হয়ে থাকে সত্য, সত্যকে প্রকাশ করা এবং সত্য পথ প্রদর্শন করা। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَإِنَّكَ لَتَهْدِىٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ

তুমি তো প্রদর্শন কর শুধু সরল পথ। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৫২) অন্যত্র আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرٌ ۖ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

তুমি তো শুধুমাত্র ভয় প্রদর্শনকারী এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে পথ প্রদর্শক। (সূরা রা‘দ, ১৩ ঃ ৭) পবিত্র কুরআনের অন্য স্থানে আছে ঃ

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَٰهُمْ فَٱسْتَحَبُّوا۟ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ

আর সামুদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার তো এই যে, আমি তাদেরকে পথ নির্দেশ করেছিলাম, কিন্তু তারা সৎ পথের পরিবর্তে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করেছিল। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ১৭) অন্য স্থানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَهَدَيْنَٰهُ ٱلنَّجْدَيْنِ

আমি তাদেরকে দু’টি পথ দেখিয়েছি। (সূরা বালাদ, ৯০ ঃ ১০)

তাকওয়া কী

উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) উবাই ইব্ন কা‘বকে (রাঃ) প্রশ্ন করেন ঃ তাক্ওয়া কি?’ তিনি উত্তরে বলেন ঃ

‘কাঁটাযুক্ত দুর্গম পথে চলার আপনার কোন দিন সুযোগ ঘটেছে কি?’ তিনি বলেন ঃ ‘হ্যাঁ’। তখন উবাই (রাঃ) বলেন ঃ ‘সেখানে আপনি কি করেন?’

উমার (রাঃ) বলেন ঃ ‘কাপড় ও শরীরকে কাঁটা হতে রক্ষা করার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করি।’ তখন উবাই (রাঃ) বলেন ঃ تَقْوَى ও ঐ রকমই নিজেকে রক্ষা করার নাম।

৩। যারা অদৃশ্য বিষয়গুলিতে বিশ্বাস স্থাপন করে	٣. ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ

ঈমান কী

আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন যে, সত্য বলে স্বীকার করাকে ঈমান বলে। ইব্ন আব্বাসও (রাঃ) এটাই বলেন। যুহরী (রহঃ) বলেন যে, 'আমলকে ঈমান বলা হয়। রাবী' ইব্ন আনাস (রহঃ) বলেন যে, ঈমান আনার অর্থ হচ্ছে 'অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করা'। (তাবারী ১/২৩৫) ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এসব মতের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। এগুলির একই অর্থ। ভাবার্থ এই যে, তারা মুখের দ্বারা, অন্তর দ্বারা ও আমল দ্বারা অদৃশ্যের উপর ঈমান আনে এবং আল্লাহর ভয় রাখে। 'ঈমান' শব্দটি আল্লাহর উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর এবং তাঁর রাসূলগণের (আঃ) উপর বিশ্বাস স্থাপন করা-এ কয়টির সমষ্টিকে বুঝিয়ে থাকে। আমি বলি যে, আভিধানিক অর্থে শুধু সত্য বলে স্বীকার করাকেই ঈমান বলে। কুরআন মাজীদেও এ অর্থের ব্যবহার এসেছে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤۡمِنُ لِلۡمُؤۡمِنِينَ

সে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করে, আর মু'মিনদের বিশ্বাস করে। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৬১) ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা তাদের পিতাকে বলেছিল ঃ

وَمَآ أَنتَ بِمُؤۡمِنٖ لَّنَا وَلَوۡ كُنَّا صَٰدِقِينَ

কিন্তু আপনি তো আমাদের বিশ্বাস করবেননা, যদিও আমরা সত্যবাদী। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১৭)

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ

কিন্তু তাদের নয়, যারা মু'মিন ও সৎ কর্মপরায়ণ। (সূরা তীন, ৯৫ ঃ ৬)

যা হোক, ঈমানের যথেচ্ছ ব্যবহার হতে পারে বিশ্বাস, আমল এবং প্রচারের মাধ্যমে। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৩৫) এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি যে, ঈমানের হ্রাস অথবা বৃদ্ধি ঘটে থাকে। এ বিষয়ে সহীহ বুখারীর প্রথম অংশে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

ইমাম শাফিঈ (রহঃ), ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বাল (রহঃ), ইমাম আবূ উবাইদাহ (রহঃ) প্রভৃতি ইমামগণ একমত হয়ে বর্ণনা করেছেন যে, মুখে উচ্চারণ করা ও কার্যসাধন করার নাম হচ্ছে ঈমান এবং ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়ে থাকে। বহু হাদীসে এর প্রমাণ আছে যা আমরা বুখারীর শরাহয় বর্ণনা করেছি।

কেহ কেহ ঈমানের অর্থ করেছেন 'আল্লাহর ভয়।' যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخۡشَوۡنَ رَبَّهُم بِٱلۡغَيۡبِ

নিশ্চয়ই যারা তাদের রাব্বকে না দেখেই ভয় করে। (সূরা মূল্‌ক, ৬৭ ঃ ১২) অন্য এক জায়গায় তিনি বলেন ঃ

مَّنۡ خَشِيَ ٱلرَّحۡمَٰنَ بِٱلۡغَيۡبِ وَجَآءَ بِقَلۡبٖ مُّنِيبٍ

যারা না দেখেই দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে এবং বিনীত চিত্তে উপস্থিত হয়। (সূরা কাফ, ৫০ ঃ ৩৩) প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ভয়ই হচ্ছে ঈমান ও ইল্‌মের সারাংশ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء

আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাঁকে ভয় করে। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ২৮)

'গাইব' বলতে কি বুঝায়

غَيْب শব্দটির অর্থ সম্বন্ধে মুফাস্‌সিরগণের মধ্যে অনেক মতভেদ রয়েছে। কিন্তু ঐ সবগুলিই সঠিক এবং সব অর্থই নেয়া যেতে পারে। আবুল আলীয়া (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর উপর, মালাইকার উপর, কিতাবসমূহের উপর, কিয়ামাতের উপর, জান্নাতের উপর, জাহান্নামের উপর, আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের উপর এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। কাতাদাহ ইব্‌ন দিয়ামাহরও (রহঃ) ইহাই অভিমত। (তাবারী ১/২৩৬)

একদা আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদের (রাঃ) মাজলিসে সাহাবীগণের (রাঃ) গুণাবলীর আলোচনা চলছিল। তিনি বলেন ঃ যাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছেন তাদের তো কর্তব্যই হল তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা; কিন্তু আল্লাহর শপথ! ঈমানী মর্যাদার দিক দিয়ে তারাই উত্তম যারা না দেখেই তাঁকে বিশ্বাস করে থাকেন। অতঃপর তিনি الم. ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ পর্যন্ত পাঠ করলেন'। (মুসনাদ ইব্‌ন আবী হাতিম ১/৩৪, হাকিম ২/২৬০) ইমাম হাকিম (রহঃ) এই বর্ণনাটিকে সঠিক বলে থাকেন। মুসনাদ আহমাদেও এ বিষয়ের একটি হাদীস আছে। ইব্‌ন মুহাইরীজ (রহঃ) আবূ জুমু'আ (রাঃ) নামক সাহাবীকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'এমন

একটি হাদীস আমাকে শুনিয়ে দিন যা আপনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে শুনেছেন। তিনি বলেন ঃ 'আচ্ছা, আমি আপনাকে খুবই ভাল একটা হাদীস শুনাচ্ছি। একবার আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে নাশ্তা করছিলাম। আমাদের সঙ্গে আবূ উবাইদাহ ইব্ন জাররাহ্ও (রাঃ) ছিলেন। তিনি বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের চেয়েও উত্তম আর কেহ আছে কি? আমরা আপনার সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেছি, আপনার সঙ্গে ধর্ম যুদ্ধে অংশ নিয়েছি।' তিনি বললেন ঃ

'হ্যাঁ,আছে। ঐ সমুদয় লোক তোমাদের চেয়ে উত্তম যারা তোমাদের পরে আসবে এবং আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে অথচ তারা আমাকে দেখতেও পাবেনা।' (আহমাদ ৪/১০৬)

তাফসীর ইব্ন মিরদুওয়াই-এ রয়েছে সা'লিহ ইব্ন জুবাইর (রহঃ) বলেন ঃ আবূ জুমু'আ আনসারী (রাঃ) বাইতুল মুকাদ্দাসে আমাদের নিকট আগমন করেন। রিযা ইব্ন হাইঅহ্ও (রাঃ) আমাদের সঙ্গেই ছিলেন। তিনি ফিরে যেতে থাকলে আমরা তাকে পৌঁছে দেয়ার জন্য তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলি। তিনি আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় বলেন ঃ 'আপনাদের এই অনুগ্রহের প্রতিদান ও হক আমার আদায় করা উচিত। শুনে রাখুন! আমি আপনাদেরকে এমন একটা হাদীস শুনাবো যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে শুনেছি।' আমরা বলি ঃ 'আল্লাহ আপনার উপর দয়া করুন! আমাদেরকে তা অবশ্যই বলুন'। তিনি বললেন ঃ 'শুনুন! আমরা দশজন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। মুআয' ইব্ন জাবালও (রাঃ) ছিলেন। আমরা বললাম ঃ

'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের চেয়েও কি বড় সাওয়াবের অধিকারী আর কেহ হবে? আমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি এবং আপনার অনুসরণ করেছি। তিনি বললেন ঃ

'তোমরা কেন করবেনা? আল্লাহর রাসূল তো স্বয়ং তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছেন। আকাশ হতে আল্লাহর ওয়াহী তোমাদের সামনেই বার বার অবতীর্ণ হচ্ছে। ঈমান তো ঐ সব লোকের যারা তোমাদের পরে আসবে, তারা দুই জিলদের মধ্যে কিতাব পাবে এবং তার উপরেই ঈমান এনে আমল করবে। তারাই তোমাদের দ্বিগুণ সাওয়াবের অধিকারী।' (ইব্ন আসাকীর ৬/৩৬৮)

এবং সালাত প্রতিষ্ঠিত করে ও আমি তাদেরকে যে উপজীবিকা	وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا

রَزَقْنَـٰهُمْ يُنفِقُونَ	প্রদান করেছি তা হতে দান করে থাকে।

‘ইকামাতে সালাত’ এর অর্থ

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ ‘তারা ফারয সালাত আদায় করে, রুকূ সাজদাহ, তিলাওয়াত, নম্রতা এবং মনযোগ প্রতিষ্ঠিত করে।’ (তাবারী ১/২৪১) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, সালাত প্রতিষ্ঠিত করার অর্থ হচ্ছে সালাতের সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা, ভালভাবে উযূ করা এবং রুকূ’ ও সাজদাহ যথাযথভাবে আদায় করা। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৩৭) মুকাতিল (রহঃ) বলেন যে, সময়ের হিফাযাত করা, পূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করা, ‘রুকূ ও সাজদাহ ধীর-স্থিরভাবে আদায় করা, ভালভাবে কুরআন পাঠ করা, আত্তাহিয়্যাতু এবং দুরূদ পাঠ করার নাম হচ্ছে ইকামাতে সালাত। (ইবন আবী হাতিম ১/৩৭)

‘ব্যয় করতে হবে’ কোথায়

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ এর অর্থ হচ্ছে যাকাত আদায় করা। (তাবারী ১/২৪৩) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইব্ন মাসউদ (রাঃ) এবং আরও কয়েকজন সাহাবী (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে মানুষের তার সন্তান সন্ততিকে পানাহার করানো। এটা যাকাতের হুকুমের পূর্বেকার আয়াত। যাহ্হাক (রহঃ) বলেন যে, সূরা বারা‘আতে যাকাতের যে সাতটি আয়াত আছে তা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে এই নির্দেশ ছিল যে, বান্দা যেন নিজ সাধ্য অনুসারে কমবেশী কিছু দান করতে থাকে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ ‘এই মাল তোমাদের নিকট আল্লাহর আমানাত, অতি সত্বরই এটা তোমাদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে। সুতরাং ইহলৌকিক জীবনে তা থেকে আল্লাহর পথে ব্যয় কর।’

কুরআনুল হাকীমের অধিকাংশ জায়গায় সালাত ও মাল খরচ করার বর্ণনা মিলিতভাবে এসেছে। এ জন্য সালাত হচ্ছে আল্লাহর হক এবং তাঁর ইবাদাত, যা তাঁর একাত্মবাদ, প্রশংসা, শ্রেষ্ঠত্ব, তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন, তাঁর উপর ভরসা এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা করার নাম। আর খরচ করা হচ্ছে সৃষ্ট জীবের প্রতি অনুগ্রহ করা, যার দ্বারা তাদের উপকার হয়। এর সবচেয়ে বেশি হকদার হচ্ছে তার পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন এবং দাসদাসী। অতঃপর দূরের লোক এবং অপরিচিত ব্যক্তিরা তার হকদার। সুতরাং অবশ্য করণীয় সমস্ত ব্যয় ও ফারয যাকাত এর অন্তর্ভুক্ত। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি। (১) আল্লাহ তা'আলার একাত্মবাদ ও নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রেরিতত্ত্বের সাক্ষ্য প্রদান। (২) সালাত প্রতিষ্ঠা করা। (৩) যাকাত প্রদান করা। (৪) রামাযানে সিয়াম পালন করা এবং (৫) বাইতুল্লাহর হাজ্জ সম্পাদন করা। (ফাতহুল বারী ১/৬৪, মুসলিম ১/৪৫) এ সম্পর্কে আরও বহু হাদীস রয়েছে।

'সালাত' কী

আরাবী ভাষায় সালাতের অর্থ হচ্ছে প্রার্থনা। আরাব কবিদের কবিতা এর সাক্ষ্য দেয়। সালাতের প্রয়োগ হয়েছে সালাতের উপর যা রুকূ সাজদাহ এবং অন্যান্য নির্দিষ্ট কতকগুলি কাজের নাম এবং যা নির্দিষ্ট সময়ে কতকগুলি নির্দিষ্ট শর্ত, সিফাত ও পদ্ধতির মাধ্যমে পালিত হয়।

৪। এবং তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছিল, যারা তদ্বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আখিরাতের প্রতি যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে	٤. وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِٱلْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ 'তুমি তোমার রাব্ব আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে যা কিছু প্রাপ্ত হয়েছ এবং তোমার পূর্ববর্তী নাবীগণ যা কিছু প্রাপ্ত হয়েছিল তারা ঐ সমুদয়ের সত্যতা স্বীকার করে। এ নয় যে, কোনটা মানে ও কোনটা মানেনা, বরং রবের সমস্ত কথাই বিশ্বাস করে এবং পরকালের উপরও দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।' (তাবারী ১/২৪৪) অর্থাৎ পুনরুত্থান, কিয়ামাত, জান্নাত, জাহান্নাম, হিসাব, মীযান ইত্যাদি সমস্তই পূর্ণভাবে বিশ্বাস করে। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/৩৯) কিয়ামাত দুনিয়া ধ্বংসের পরে হবে বলে তাকে আখিরাত বলা হয়েছে।

ঈমানদারদের বর্ণনা

এখানে ঐ সমস্ত লোকদের কথা বলা হয়েছে যাদের পূর্ণ বর্ণনা পরবর্তী আয়াতে রয়েছে ঃ (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৩) ঈমানদার আরাবেরই হোক অথবা আহলে কিতাব হোক কিংবা অন্য যে কোন ধরণের লোক হোক। মুজাহিদ

(রহঃ), আবুল আলীয়া (রহঃ), রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ) এবং কাতাদাহর (রহঃ) এটাই মত।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেন ঃ 'সূরা বাকারাহর প্রথম চারটি আয়াতে মু'মিনদের আলোচনা রয়েছে, এবং তার পরবর্তী তেরটি আয়াতে মুনাফিকদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।' (তাবারী ১/২৩৯) সুতরাং এ চারটি আয়াত প্রত্যেক মু'মিনের জন্য সাধারণ বা সমভাবে প্রযোজ্য। সে আরাবী হোক, আযমী হোক, কিতাবী হোক, মানবের মধ্যে হোক বা দানবের মধ্যেই হোক না কেন। কারণ এর মধ্যে প্রত্যেকটি গুণ অন্যের ক্ষেত্রেই একেবারে যরুরী শর্ত। একটাকে বাদ দিয়ে অন্যটা হতেই পারেনা। অদৃশ্যের উপর ঈমান আনা, সালাত প্রতিষ্ঠা করা এবং যাকাত দেয়া শুদ্ধ নয়, যে পর্যন্ত না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর এবং পূর্ববর্তী নাবীগণের উপর যে কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল তার উপর ঈমান আনবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পরকালের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে। যেমন প্রথম তিনটি পরবর্তী তিনটি ছাড়া গ্রহণযোগ্য নয়। তদ্রূপ পরবর্তী তিনটিও পূর্ববর্তী তিনটি ছাড়া পরিশুদ্ধ হয়না। এ জন্য ঈমানদারদের প্রতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নির্দেশ হচ্ছে ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ

হে মু'মিনগণ! তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং এই কিতাবের প্রতি যা তিনি তাঁর রাসূলের উপর অবতীর্ণ করেছেন এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৩৬) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا تُجَٰدِلُوٓاْ أَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ ۖ وَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱلَّذِىٓ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَٰحِدٌ

তোমরা উত্তম পন্থা ব্যতীত কিতাবীদের সাথে বিতর্ক করবেনা, তবে তাদের সাথে করতে পার যারা তাদের মধ্যে সীমা লংঘনকারী এবং বল ঃ আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আমরা বিশ্বাস করি এবং আমাদের

মা'বূদ ও তোমাদের মা'বূদ তো একই। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৪৬) পবিত্র কুরআনের আর এক স্থানে ঘোষিত হয়েছে ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ ءَامِنُوا۟ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم

হে গ্রন্থপ্রাপ্তরা! তোমাদের সঙ্গে যা আছে তার সত্যতা প্রতিপাদনকারী যা অবতীর্ণ করেছি তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪৭) অন্য জায়গায় আছে ঃ

قُلْ يَـٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَىْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا۟ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ

বল ঃ হে আহলে কিতাব! তোমরা কোনো পথেই প্রতিষ্ঠিত নও যে পর্যন্ত না তাওরাত, ইঞ্জীল এবং যে কিতাব (অর্থাৎ কুরআন) তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে তার উপর আমল কর। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৬৮) অন্য জায়গায় সমস্ত ঈমানদারকে সংবাদ প্রদান করে কুরআন মাজীদে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَـٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِۦ

রাসূল তার রাব্ব হতে তৎপ্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা বিশ্বাস করে এবং মু'মিনগণও (বিশ্বাস করে); তারা সবাই আল্লাহকে, তাঁর মালাইকাকে, তাঁর গ্রন্থসমূহকে এবং তাঁর রাসূলগণকে বিশ্বাস করে থাকে; (তারা বলে) আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কেহকেও পার্থক্য করিনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৮৫) আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরও বলেন ঃ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَلَمْ يُفَرِّقُوا۟ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ

এবং যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করেনা। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৫২)

এ বিষয়ে আরও বহু আয়াত রয়েছে যাতে প্রত্যেক মুসলিমের আল্লাহর উপর, তাঁর সমস্ত রাসূলের উপর এবং সমস্ত কিতাবের উপর ঈমান আনার কথা স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করা হয়েছে। আহলে কিতাবের ঈমানদারগণের যে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা অবশ্য ভিন্ন কথা। কেননা তাদের কিতাবের উপর

তাদের ঈমান হয় পূর্ণ পরিণত। অতঃপর যখন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে তখন কুরআনুল হাকীমের উপরও তাদের ঈমান পূর্ণ পরিণত হয়ে থাকে। এ জন্যই তারা দ্বিগুণ সাওয়াবের অধিকারী হয়। এই উম্মাতের লোকেরও পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনে বটে, কিন্তু তাদের ঈমান হয় সংক্ষিপ্ত আকারে। যেমন সহীহ হাদীসে আছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আহলে কিতাব তোমার নিকট কোন সংবাদ প্রচার করলে তোমরা তাকে সত্যও বলনা আর মিথ্যাও বলনা, বরং বলে দাও - যা কিছু আমাদের উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে তার উপরও বিশ্বাস করি এবং যা কিছু তোমাদের উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে তার উপরও আমরা বিশ্বাস রাখি।’ (আবূ দাঊদ ৪/৫৯) কখনও কখনও এমনও হয়ে থাকে যে, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনে, তুলনামূলকভাবে আহলে কিতাব অপেক্ষা তাদের ঈমানই বেশি পূর্ণ ও দৃঢ় হয়। এই হিসাবে তারা হয়তো আহলে কিতাব অপেক্ষা বেশি সাওয়াব লাভ করবে; যদিও তারা তাদের নাবীর (আঃ) উপর এবং শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনার কারণে দ্বিগুণ সাওয়াবের অধিকারী। কিন্তু এরা ঈমানের পরিপক্কতার কারণে সাওয়াবে তাদের সমান। আল্লাহ তা’আলাই এ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানেন।

৫। এরাই তাদের রবের পক্ষ হতে প্রাপ্ত হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং এরাই পূর্ণ সফলকাম।	٥. أُوْلَـٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

হিদায়াত ও সফলতা শুধু ঈমানদারদের জন্য

ঐ সব লোক, যাদের গুণাবলী পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, যেমন অদৃশ্যের উপর ঈমান আনা, সালাত কায়েম করা, আল্লাহর দেয়া বস্তু হতে দান করা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর ঈমান আনা, তাঁর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস রাখা, পরকালের প্রতি বিশ্বাস রেখে সেখানে উপকার দেয় এরূপ কাজ করা এবং মন্দ ও হারাম কাজ থেকে

বেঁচে থাকা। এসব লোকই হিদায়াত প্রাপ্ত, এদেরকেই আল্লাহর নূর ও তাঁর সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা ভূষিত করা হয়েছে। আর এ সমুদয় লোকের জন্যই ইহকালে ও পরকালে সফলতা রয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) 'হিদায়াতের' তাফসীর করেছেন নূর ও দৃঢ়তা দ্বারা এবং 'ফালাহ' এর তাফসীর করেছেন প্রয়োজন মিটে যাওয়া ও পাপ এবং দুষ্কার্য থেকে বেঁচে যাওয়া ইত্যাদি দ্বারা।

৬। নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করছে তাদের জন্য উভয়ই সমান; তুমি তাদেরকে ভয় প্রদর্শন কর বা না কর, তারা বিশ্বাস স্থাপন করবেনা।

٦. إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيۡهِمۡ ءَأَنذَرۡتَهُمۡ أَمۡ لَمۡ تُنذِرۡهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ

যারা সত্যকে গোপন করতে অভ্যস্ত এবং তাদের ভাগ্যে এই রয়েছে যে, তারা কখনও সেই ওয়াহীকে বিশ্বাস করবেনা যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন অন্য এক স্থানে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتۡ عَلَيۡهِمۡ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ. وَلَوۡ جَآءَتۡهُمۡ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلۡعَذَابَ ٱلۡأَلِيمَ

নিঃসন্দেহে, যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে তারা কখনো ঈমান আনবেনা, যদিও তাদের নিকট সমস্ত প্রমাণ পৌঁছে যায়, যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৬-৯৭) এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা দুষ্টমতি আহলে কিতাবদের সম্পর্কে বলেন ঃ

وَلَئِنۡ أَتَيۡتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَـٰبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبۡلَتَكَ

এবং যাদেরকে গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছে তাদের নিকট যদি তুমি সমুদয় নিদর্শন আনয়ন কর তবুও তারা তোমার কিবলাহকে গ্রহণ করবেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৪৫)

এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ যাদের জন্য দুর্ভোগ লিখে রেখেছেন তারা তাদেরকে শান্তির পথ দেখানোর জন্য কোন পথ প্রদর্শক পাবেনা এবং আল্লাহ যাদেরকে বিপথে পরিচালিত করেন তারা কখনো সৎপথ প্রদর্শক খুঁজে পাবেনা। তিনি বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! তুমি তাদের জন্য দুঃখ করনা, তাদেরকে দা'ওয়াত দিতে থাক। তাদের মধ্যে যারা তোমার দা'ওয়াত কবূল করবে,

নিশ্চয়ই তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান। আর যারা অস্বীকার করে মুখ ফিরিয়ে নিবে তাদের জন্য তুমি বিমর্ষ হয়োনা কিংবা তাদের নিয়ে চিন্তা-ভাবনাও করনা। কারণ

فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَٰغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ

তোমার কর্তব্য তো শুধু প্রচার করা; আর হিসাব-নিকাশ তো আমার কাজ। (সূরা রা‘দ, ১৩ ঃ ৪০)

إِنَّمَآ أَنتَ نَذِيرٌ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ وَكِيلٌ

তুমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র, আল্লাহই সবকিছু পরিবেষ্টনকারী। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১২)

আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ ব্যাপারে খুবই আগ্রহ ছিল যে, সবাই যেন ঈমানদার হয়ে যায় এবং হিদায়াত কবূল করে নেয়। কিন্তু মহান রাব্ব বলে দিলেন যে, এ সৌভাগ্য প্রত্যেকের জন্য নয়। এ দান ভাগ করে দেয়া হয়েছে। যার ভাগ্যে এর অংশ পড়েছে আপনা আপনি তোমার কথা মেনে নিবে, আর যে হতভাগা সে কখনও মানবেনা। (তাবারী ১/২৫২)

৭। আল্লাহ তাদের অন্তরসমূহের উপর ও তাদের কর্ণসমূহের উপর মোহরাংকিত করে দিয়েছেন এবং তাদের চক্ষুসমূহের উপর আবরণ পড়ে আছে এবং তাদের জন্য রয়েছে ভয়ানক শাস্তি।	٧. خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰٓ أَبْصَٰرِهِمْ غِشَٰوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

‘খাতামা’ শব্দের অর্থ

মুফাস্সির সুদ্দী (রহঃ) বলেছেন যে, خَتَمَ এর অর্থ মোহর করে দেয়া। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৪৪) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ ‘শাইতান তাদের উপর বিপুলভাবে জয়লাভ করেছে এবং তারা তারই আজ্ঞাবহ দাসে পরিণত হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত তাদের অন্তরে ও কানে আল্লাহর মোহর লেগে গেছে এবং চোখের উপর পর্দা পড়ে গেছে। সুতরাং তারা হিদায়াতকে দেখতেও পাচ্ছেনা, শুনতেও পাচ্ছেনা এবং তা

বুঝতেও পারছেনা!' (ইব্ন আবী হাতিম ১/৪৪) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ 'পাপ মানুষের অন্তরে চেপে বসে এবং তাকে চারদিক থেকে ঘিরে নেয়। এটাই হচ্ছে মোহর। অন্তর ও কানের জন্য প্রচলিত অর্থে মোহর। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৪৪) মুজাহিদ (রহঃ) তাঁর হাতটি দেখিয়ে বলেন ঃ 'অন্তর হচ্ছে হাতের তালুর মত। বান্দার পাপের কারণে তা বন্ধ হয়ে যায়। বান্দা একটা পাপ করলে তখন তার কনিষ্ঠ আঙ্গুলটি বন্ধ হয়ে যায়। যখন দু'টি পাপ করল তখন তার দ্বিতীয় আঙ্গুলও বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে সমস্ত আঙ্গুল বন্ধ হয়ে যায়। এখন মুষ্টি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেল এবং ওর ভিতর কোন কিছু প্রবেশ করতে পারবেনা। এভাবেই নিরন্তর পাপের ফলে অন্তরের উপর কালো পর্দা পড়ে যায় এবং মোহর লেগে যায়। তখন আর সত্য তার মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়না। (তাবারী ১/২৫৮)

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন ঃ 'উম্মাতের ইজমা আছে যে, মহান আল্লাহ মোহর করাকেও নিজের একটি বিশেষ গুণ রূপে বর্ণনা করেছেন যে, মোহর কাফিরদের কুফরীর প্রতিদান স্বরূপ হয়ে থাকে। যেমন তিনি বলেন ঃ

بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ

বরং তাদের অবিশ্বাস হেতু আল্লাহ ওদের অন্তরে মোহর এঁটে দিয়েছেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৫৫) (কুরতুবী ১/১৮৭) হাদীসেও আছে যে, আল্লাহ তা'আলা অন্তরকে পরিবর্তন করে থাকেন। প্রার্থনায় আছে ঃ

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ.

'হে অন্তরের পরিবর্তন আনয়নকারী! আমাদের অন্তরকে দীনের উপর অটল রাখুন।' হুজাইফা (রাঃ) হতে ফিতনার অধ্যায়ে একটি সহীহ হাদীস বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'অন্তরের মধ্যে ফিতনা এমনভাবে উপস্থিত হয় যেমন ছেঁড়া মাদুরের একটা খড়কুটা। যে অন্তর তা গ্রহণ করে নেয় তাতে একটা কালো দাগ পড়ে যায় এবং যে অন্তরের মধ্যে এই ফিতনা ক্রিয়াশীল হয়না তাতে একটা সাদা দাগ পড়ে যায়, আর সেই শুভ্রতা বাড়তে বাড়তে সম্পূর্ণ সাদা হয়ে গিয়ে সমস্ত অন্তরকে আলোকে উদ্ভাসিত করে দেয়। অতঃপর ফিতনা এই অন্তরের কোন ক্ষতি করতে পারেনা। পক্ষান্তরে, অন্য অন্তরে কৃষ্ণতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে যায় এবং শেষে সমস্ত অন্তরকে কালিমাময় করে দেয়। তখন তা উল্টানো কলসের মত হয়ে যায়, ভাল কথাও তার ভাল লাগেনা এবং মন্দ কথাও খারাপ লাগেনা।' (মুসলিম ১/১২৮) ইমাম ইব্ন জারীরের (রহঃ) ফাইসালা এই যে, সহীহ হাদীসে এসেছে ঃ

'মু'মিন যখন পাপ করে তখন তার অন্তরে একটা কালো দাগ হয়ে যায়। যদি সে পাপকাজ হতে ফিরে আসে ও বিরত হয় তাহলে ঐ দাগটি আপনি সরে যায় এবং তার অন্তর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। আর যদি সে পাপ করতেই থাকে তাহলে সেই পাপও ছড়িয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত তার সমস্ত অন্তরকে ছেয়ে ফেলে।' এটাই সেই মরিচা যার বর্ণনা নিম্নের আয়াতে রয়েছে ঃ

كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ

না, এটা সত্য নয়, বরং তাদের কৃতকর্মের ফলেই তাদের মনের উপর মরিচা জমে গেছে। (সূরা মুতাফ্‌ফিফীন, ৮৩ ঃ ১৪) (সুনান নাসাঈ ৬/৫০৯, তিরমিযী ৯/২৫৪, ইব্‌ন মাজাহ ২/১৪১৮) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাহলে জানা গেল যে, পাপের প্রাচুর্য অন্তরের উপর পর্দা ফেলে দেয় এবং এর পরে আল্লাহর মোহর হয়ে যায়। একেই বলে খাত্‌ম এবং তবা'। এরূপ অন্তরের মধ্যে ঈমান প্রবেশ করার ও কুফর বের হওয়ার আর কোন পথ থাকেনা। এই মোহরের বর্ণনাই এই আলোচ্য আয়াতে করা হয়েছে।

'গিসাওয়াতু' কী

এটা আমাদের চোখের দেখা যে, যখন কোন জিনিসের মুখে মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়, তখন যে পর্যন্ত মোহর ভেঙ্গে না যায় সে পর্যন্ত তার ভিতর কিছু যেতেও পারেনা এবং তা থেকে কিছু বেরও হতে পারেনা। এ রকমই কাফিরদের অন্তরে ও কানে আল্লাহর মোহর লেগে গেছে, সেই মোহর সরে না যাওয়া পর্যন্ত তার ভিতরে হিদায়াত প্রবেশ করতে পারবেনা এবং তা থেকে কুফরও বেরিয়ে আসতে পারবেনা। কারণ তাদের অন্তর সীল করে দেয়া হয়েছে; শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তিকে দুর্বল করে দেয়া হয়েছে। এর তাফসীরে সুদ্দী (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এর অর্থ হল তারা না বুঝতে পারে, আর না শুনতে পায়। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন যে, তাদের দৃষ্টির উপর একটি আবরণ এটে দেয়া হয়েছে, ফলে তারা দেখতে পায়না। (তাবারী ১/২৬৬) পবিত্র কুরআনে আছে ঃ

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۖ فَإِن يَشَإِ ٱللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ ۗ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَـٰطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَـٰتِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ

তারা কি বলে যে, সে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে? যদি তা'ই হত তাহলে আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমার হৃদয় মোহর করে দিতেন। আল্লাহ মিথ্যাকে মুছে দেন এবং নিজ বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অন্তরে যা আছে সে বিষয়ে তিনি তো সবিশেষ অবহিত। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ২৪) অন্য স্থানে আছে ঃ

أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَـٰهَهُۥ هَوَىٰهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِۦ وَقَلْبِهِۦ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِۦ غِشَـٰوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنۢ بَعْدِ ٱللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

তুমি কি লক্ষ্য করছ তাকে, যে তার খেয়াল খুশীকে নিজের মা'বূদ বানিয়ে নিয়েছে? আল্লাহ জেনে শুনেই তাকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং তার কর্ণ ও হৃদয় মোহর করে দিয়েছেন এবং তার চক্ষুর উপর রেখেছেন আবরণ। অতএব, কে তাকে পথ নির্দেশ করবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবেনা? (সূরা জাসিয়া, ৪৫ ঃ ২৩)

'মুনাফিক' কারা

সূরার প্রথম চারটি আয়াতে মু'মিনদের বিশেষণ বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর এই দু'টি আয়াতে কাফিরদের বর্ণনা দেয়া হল। এখন কপটচারী মুনাফিকদের বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে যারা বাহ্যতঃ ঈমানদাররূপে প্রকাশ পায়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ও গোপনে গোপনে তারা কাফির। সাধারণতঃ তাদের চতুরতা গোপন থেকে যায় বলে তাদের আলোচনা কিছুটা বিস্তারিতভাবে হয়েছে এবং তাদের অনেক নিদর্শনও বর্ণনা করা হয়েছে। তাদেরই সম্বন্ধে সূরা বারাআত অবতীর্ণ হয়েছে এবং সূরা নূর ইত্যাদিতে তাদের সম্বন্ধেই আলোচনা রয়েছে যাতে তাদের থেকে পূর্ণভাবে রক্ষা পাওয়া যায় এবং মুসলিমরা তাদের জঘন্য ও নিন্দনীয় স্বভাব থেকে দূরে সরে থাকতে পারে। তাই মহান আল্লাহ বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন ঃ

৮। আর মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে যারা বলে, আমরা আল্লাহর উপর এবং শেষ দিনের উপর ঈমান এনেছি, অথচ তারা মোটেই ঈমানদার নয়।	٨. وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ

৯। তারা আল্লাহ ও মু'মিনদের সঙ্গে ধোঁকাবাজী করে। প্রকৃত পক্ষে তারা নিজেদের ব্যতীত আর কারও সাথে ধোঁকাবাজী করেনা, অথচ তারা এ সম্বন্ধে অনুভব করতে পারেনা।	٩. يُخَـٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

'নিফাক' কী

'নিফাক' এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে ভাল গুণগুলির প্রকাশ ও মন্দ গোপন করা। 'নিফাক' দু' প্রকার ঃ (১) বিশ্বাস জনিত ও (২) কাজ জনিত। প্রথম প্রকারের মুনাফিক তো চির জাহান্নামী এবং দ্বিতীয় প্রকারের মুনাফিক জঘন্যতম পাপী। ইনশাআল্লাহ সঠিক স্থানে এর বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হবে।

ইব্ন যুরাইয (রহঃ) বলেন যে, মুনাফিকের কথা তার কাজের উল্টা, তার গোপনীয়তা তার প্রকাশ্যের বিপরীত। তার আগমন তার প্রস্থানের উল্টা এবং উপস্থিতি অনুপস্থিতির বিপরীত হয়ে থাকে। (তাবারী ১/২৭০)

মুনাফিকীর গোড়াপত্তন

নিফাক ও কপটতা মাক্কায় তো ছিলইনা, বরং সেখানে ছিল তার বিপরীত। কিছু লোক এমন ছিলেন যাঁরা বাহ্যতঃ ও আপাতঃ দৃষ্টিতে কাফিরদের সঙ্গে থাকতেন, কিন্তু অন্তরে ছিলেন মুসলিম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মাক্কা ছেড়ে মাদীনায় হিজরাত করেন তখন ওখানকার আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় আনসার উপাধি লাভ করে তাঁর সঙ্গী হলেন ও অন্ধকার যুগের মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করে মুসলিম হলেন। কিন্তু ইয়াহুদীরা তখনও যেই তিমিরের সেই তিমিরেই থেকে মহান আল্লাহর এ দান হতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত থাকল। তাদের মধ্যে শুধু আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম এই সত্য ধর্মের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখন পর্যন্ত মুনাফিকদের জঘন্যতম দল সৃষ্টি হয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব ইয়াহুদী ও আরাবের অন্যান্য কতকগুলি গোত্রের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। এই দল সৃষ্টির সূচনা এভাবে হয় যে, মাদীনায় ইয়াহুদীদের ছিল তিনটি গোত্র ঃ (১) বানূ কাইনুকা, (২) বানূ নাযীর এবং (৩) বানু কুরাইযাহ। বানু কাইনুকা ছিল খাযরাজের মিত্র এবং বাকী দু'টি গোত্র ছিল

আউসের মিত্র। অল্প কিছু ইয়াহুদী ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে মাদীনায় কোন মুনাফিকের উপস্থিতি ছিলনা। কারণ তখন মুসলিমগণ এতখানি শক্তিশালী ছিলনা যে, কাফিরদের মনে কোন ভয়-ভীতি সৃষ্টি হতে পারে। বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা যখন ইসলাম ও এর অনুসারীদের বিজয় দান করেন তখন মাদীনার এক নেতা ছিল আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালুল।

আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূল খাযরাজ গোত্রের লোক হলেও আউস ও খাযরাজ উভয় দলের লোকই তাকে খুব সম্মান করত। এমনকি আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে বাদশাহ বলে ঘোষণা দেয়ার পূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। এমতাবস্থায় আকস্মিকভাবে এই গোত্রের মন ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হল। ফলে তার বাদশাহ হওয়ার আশার গুড়ে বালি পড়ল। এই দুঃখ, পরিতাপতো তার অন্তরে ছিলই, এদিকে ইসলামের অপ্রত্যাশিত ক্রমোন্নতি, আর ওদিকে যুদ্ধের উপর্যুপরি বিজয় দুন্দুভি তাকে একেবারে পাগল প্রায় করে তুললো। এখন সে চিন্তা করল যে, এমনিতে কাজ হবেনা। অতএব সে ঝট করে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করে নিল এবং অন্তরে কাফির থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো। দলের যে কিছু লোক তার অধীনে ছিল তাদেরকেও সে এই গোপন পন্থা বাতলে দিল এবং এভাবেই মাদীনা ও তার আশে পাশে কপটাচারীদের একটি দল রাতারাতি কায়েম হয়ে গেল। আল্লাহর ফযলে এই কপটদের মধ্যে মাক্কার মুহাজিরদের একজনও ছিলেননা। আর থাকবেনই বা কেন? এই সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ তো নিজেদের পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও ধন-সম্পদ সবকিছু আল্লাহর রাহে উৎসর্গ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে এসেছিলেন! আল্লাহ তাঁদের সবার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

২ ঃ ৮ নং আয়াতের তাফসীর

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, এই কপটচারীরা আউস ও খাযরাজ গোত্রভুক্ত ছিল এবং কতক ইয়াহুদীও তাদের দলে ছিল। এই আয়াতে আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের কপটতার বর্ণনা রয়েছে। (তাবারী ১/২৬৯) আবুল আলীয়া (রহঃ) হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) এটাই বর্ণনা করেছেন। বিশ্বপ্রভু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এখানে কপটাচারীদের অনেকগুলো বদ অভ্যাসের বর্ণনা দিয়েছেন, যেন মুসলিমেরা তাদের বাহ্যিক অবস্থা দেখে প্রতারিত না হয় এবং তাদেরকে মুসলিম মনে করে অসতর্ক না থাকে, নচেৎ একটা বিরাট হাঙ্গামা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে। এটা

স্মরণ রাখা উচিত যে, অসৎকে সৎ মনে করার পরিণাম খুবই খারাপ ও ভয়াবহ। যেমন এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, এরা মুখে তো অবশ্যই স্বীকার করছে, কিন্তু অন্তরে ঈমান নেই। এভাবেই সূরা মুনাফিকূনেও বলা হয়েছে ঃ

إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَٰفِقُونَ قَالُوا۟ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ

মুনাফিকরা যখন তোমার নিকট আসে তখন তারা বলে ঃ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল। আর আল্লাহ জানেন যে, তুমি নিশ্চয়ই তাঁর রাসূল। (সূরা মুনাফিকূন, ৬৩ ঃ ১) কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুনাফিকদের কথা তাদের বিশ্বাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলনা বলেই তাদের জোরদার সাক্ষ্য দান সত্ত্বেও আল্লাহ তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলে স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করলেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَكَٰذِبُونَ

আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী। (সূরা মুনাফিকূন, ৬৩ ঃ ১)

তিনি আরও বললেন وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ তারা ঈমানদার নয়। তারা ঈমানকে প্রকাশ করে ও কুফরীকে গোপন রেখে নিজেদের বোকামী দ্বারা আল্লাহকে ধোকা দিচ্ছে এবং মনে করছে যে, এটা তাদেরকে আল্লাহর কাছে উপকার ও সুযোগ সুবিধা দিবে এবং কতকগুলি মু'মিন তাদের প্রতারণার জালে আবদ্ধ হবে। কুরআন মাজীদের অন্য স্থানে আছে ঃ

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ

যেদিন আল্লাহ পুনরুত্থিত করবেন তাদের সকলকে, তখন তারা তাঁর (আল্লাহর) নিকট সেরূপ শপথ করবে যেরূপ শপথ তোমাদের নিকট করে এবং তারা মনে করে যে, এতে তারা উপকৃত হবে। সাবধান! তারাই তো মিথ্যাবাদী। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ ঃ ১৮) এখানেও তাদের ভুল বিশ্বাসের পক্ষে তিনি বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে তারা তাদের কাজের মন্দ পরিণতি সম্পর্কে অবহিতই নয়। এ ধোকা তো তারা নিজেদেরকেই দিচ্ছে। যেমন কুরআনের অন্য জায়গায় ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَٰدِعُهُمْ

নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করে এবং তিনিও তাদেরকে ঐ প্রতারণা প্রত্যাপর্ণ করছেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৪২) অর্থাৎ ফলাফল দান করেন।

ইব্‌ন জুরাইয (রহঃ) এর তাফসীর করতে গিয়ে বলেন যে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কালেমা মুখে প্রকাশ করে তারা জীবনের নিরাপত্তা কামনা করে। এই কালেমাটি তাদের অন্তরে স্থান পায়না। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/৪৬) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, মুনাফিকদের অবস্থা এই-ই ঃ তাদের মুখ পৃথক, অন্তর পৃথক, কাজ পৃথক, বিশ্বাস পৃথক, সকাল পৃথক, সন্ধ্যা পৃথক, তারা নৌকার মত যা বাতাসে কখনও এদিকে ঘুরে কখনও ওদিকে ঘুরে। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/৪৭)

১০। তাদের অন্তরে পীড়া রয়েছে, পরন্ত আল্লাহ তাদের পীড়া আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাদের জন্য গুরুতর শাস্তি রয়েছে যেহেতু তারা অসত্য বলত।	١٠. فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌۢ بِمَا كَانُوا۟ يَكْذِبُونَ

'পীড়া' শব্দের অর্থ

পীড়ার অর্থ এখানে সংশয় ও সন্দেহ। (তাবারী ১/২৮০) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) এবং অন্যান্য কয়েকজন সাহাবী (রাঃ) হতে এটাই বর্ণিত আছে। মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), আবুল আলীয়া (রহঃ), রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ) এবং কাতাদাহরও (রহঃ) এটাই মত। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/৪৮) ইকরিমাহ (রহঃ) এবং তাউস (রহঃ) এর তাফসীর করেছেন 'রিয়া' বা কৃত্রিমতা এবং ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে এর তাফসীর 'নিফাক' বা কপটতাও বর্ণিত হয়েছে। যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে ধর্মীয় রোগ, শারীরিক রোগ নয়। ইসলাম সম্পর্কে তাদের সংশয় ও সন্দেহজনিত একটা বিশেষ রোগ ছিল, আল্লাহ তাদের সেই রোগ বাড়িয়ে দিলেন। (তাবারী ১/২৮০) যেমন কুরআন মাজীদে আছে ঃ

فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَزَادَتْهُمْ إِيمَـٰنًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ

অবশ্যই যে সব লোক ঈমান এনেছে, এই সূরা তাদের ঈমানকে বর্ধিত করেছে এবং তারাই আনন্দ লাভ করছে। আর যাদের অন্তরসমূহে রোগ রয়েছে, এই সূরা তাদের মধ্যে তাদের কলুষতার সাথে আরও কলুষতা বর্ধিত করেছে। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১২৪-১২৫) অর্থাৎ তাদের পাপ ও গুমরাহী আরও বেড়ে যায় এবং এই প্রতিদান তাদের কাজের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই তাফসীরই উত্তম। এই ফরমানও ঠিক এরই মত ঃ

وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا۟ زَادَهُمْ هُدًى وَءَاتَىٰهُمْ تَقْوَىٰهُمْ

যারা সৎ পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তাদের সৎ পথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে মুত্তাকী হওয়ার শক্তি দান করেন। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ১৭) কারীগণ ইয়াকযিবূনকে ইউকায্যিবূনা -ও পড়েছেন। মুনাফিকদের মধ্যে এই বদ অভ্যাস ছিল যে, তারা মিথ্যা কথাও বলত এবং অবিশ্বাসও করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুনাফিকদেরকে চেনা সত্ত্বেও তাদেরকে হত্যা করেননি। এর কারণ এই যে, সহীহ বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমারকে (রাঃ) বলেন ঃ 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সঙ্গীগণকে হত্যা করে থাকেন এ চর্চা হওয়াটা আমি আদৌ পছন্দ করিনা।'

চৌদ্দজন প্রধান ও কুখ্যাত লোকের 'নিফাক' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিশ্চিত রূপেই জানতেন। এসব কলুষিত লোক তারাই ছিল যারা তাবূকের যুদ্ধে পরস্পরের সুপরিকল্পিত পরামর্শক্রমে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল যে, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে প্রতারণা করবেই। তারা তাঁকে হত্যা করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র এঁটেছিল যে, রাতের দুর্ভেদ্য অন্ধকারে যখন তিনি অমুক খাদের নিকটবর্তী হবেন তখন তাঁর উষ্ট্রিকে তারা তাড়া করবে। এর ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাদের মধ্যে পড়ে যাবেন। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবীকে ওয়াহীর মাধ্যমে এই মারাত্মক জঘন্য কপটতার কথা জানিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুজাইফাকে (রাঃ) ডেকে এ ঘটনার সংবাদ দেন, এমন কি এক এক করে ঐ কপটদের নাম পর্যন্তও তিনি বলে দেন। তথাপি তিনি উপরোক্ত কারণে তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ জারী করলেননা। এরা ছাড়া অন্যান্য মুনাফিকদের নাম তাঁর জানা ছিলনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَـٰفِقُونَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ ۖ مَرَدُوا۟ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ

আর তোমাদের মরুবাসীদের মধ্য হতে কতিপয় লোক এবং মাদীনাবাসীদের মধ্য হতেও কতিপয় লোক এমন মুনাফিক রয়েছে যারা নিফাকের চরমে পৌঁছে গেছে। তুমি তাদেরকে জাননা, আমিই তাদেরকে জানি। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১০১) অন্য এক জায়গায় তিনি বলেন ঃ

لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ ٱلْمُنَـٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِى ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا. مَّلْعُونِينَ ۖ أَيْنَمَا ثُقِفُوٓا۟ أُخِذُوا۟ وَقُتِّلُوا۟ تَقْتِيلًا

মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এবং যারা নগরে গুজব রটনা করে, তারা বিরত না হলে আমি নিশ্চয়ই তাদের বিরুদ্ধে তোমাকে প্রবল করব; এরপর এই নগরীতে তোমার প্রতিবেশী রূপে তারা স্বল্প সময়ই থাকবে অভিশপ্ত হয়ে, তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই ধরা হবে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৬০-৬১)

এই আয়াতগুলি থেকে জানা গেল যে, ঐ মুনাফিকরা কে কে ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা জানতেননা। তবে তাদের নিন্দনীয় স্বভাবের যে বর্ণনা দেয়া হয়েছিল তা যাদের মধ্যে পাওয়া যেত, তাদের উপর নিফাক প্রযোজ্য হত। যেমন এক জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্পষ্টভাবেই বলেন ঃ

وَلَوْ نَشَآءُ لَأَرَيْنَـٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَـٰهُمْ ۚ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِى لَحْنِ ٱلْقَوْلِ

আমি ইচ্ছা করলে তোমাকে তাদের পরিচয় দিতাম। ফলে তুমি তাদের লক্ষণ দেখে তাদেরকে চিনতে পারবে, তুমি অবশ্যই কথার ভঙ্গিতে তাদেরকে চিনতে পারতে। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ৩০)

এই কপটাচারী মুনাফিকদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিল আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালূল। যায়িদ ইব্‌ন আরকাম (রাঃ) তার কপটতাপূর্ণ স্বভাব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে সাক্ষ্য দানও করেছিলেন, যা মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বিবৃত হয়েছে। এ সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাই যখন সে মারা যায় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জানাযার

সালাত আদায় করেছেন। অন্যান্য মুসলিম সাহাবীগণের (রাঃ) মত তিনিও তার দাফন কাজে অংশগ্রহণ করেছেন। এমন কি উমার (রাঃ) যখন একটু জোর দিয়ে তার কপটতার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, তখন তিনি বলছেন ঃ

'আরাবের লোক সমালোচনা করবে যে, মুহাম্মাদ তাঁর সহচরগণকে হত্যা করে থাকেন, এ আমি চাইনা।' (বুখারী ৪৯০৫, মুসলিম ২৫৮৪) সহীহ হাদীসের বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমাকে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার বা না করার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে।' কিন্তু আমি ক্ষমা প্রার্থনা করাকেই পছন্দ করেছি।' অন্য একটি বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'আমি যদি জানতাম যে সত্তর বারের অধিক ক্ষমা প্রার্থনা করলে তাকে মার্জনা করা হবে তাহলে আমি অবশ্যই তার অধিকই করতাম। (ফাতহুল বারী ৮/১৮৪, মুসলিম ৪/২১৪১)

১১। এবং যখন তাদেরকে বলা হয় ঃ তোমরা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করনা তখন তারা বলে ঃ আমরা তো শুধুই শান্তি স্থাপনকারী।	١١. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ
১২। সাবধান! নিশ্চয়ই তারাই অশান্তি সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা বুঝেনা।	١٢. أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ

বিপর্যয় সৃষ্টি করা কী

আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আরও কয়েকজন সাহাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতেও মুনাফিকদের বর্ণনা রয়েছে এবং এই ধূলির ধরণীতে তাদের বিবাদ বিপর্যয় সৃষ্টি, কুফর এবং অবাধ্যতা সম্পর্কে মুসলিমদেরকে হুঁশিয়ার ও সতর্ক করা হচ্ছে। এ দুনিয়ায় আল্লাহর অবাধ্য হওয়া এবং অপরকে নাফরমান ও অবাধ্য হওয়ার আদেশ করাই হচ্ছে দুনিয়ার বুকে

বিবাদ সৃষ্টি করা। আর যমীন ও আসমানের শান্তি রয়েছে আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, যখন তাদেরকে আল্লাহর অবাধ্যতা হতে বিরত থাকতে বলা হয় তখন তারা বলে 'আমরা তো সঠিক সনাতন পথের উপরেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছি।'

মুনাফিকদের বিপর্যয়ের ধরণ

ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, ঐ মুনাফিকদের বিবাদ ও গণ্ডগোল সৃষ্টি করার অর্থ হচ্ছে তারা ঐসব কাজ করত যা করতে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছিলেন এবং তাঁর ফার্যগুলিও তারা হেলা করে নষ্ট করত। শুধু তাই নয়, আল্লাহ তা'আলার সত্য ধর্মের প্রতি তারা সন্দেহ পোষণ করত এবং তাঁর সত্যতার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখতনা। মু'মিনদের কাছে এলে তাদের ঈমানের কথা তারা প্রচার করত, অথচ তাদের অন্তর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সম্বন্ধে সন্দেহে পরিপূর্ণ ছিল। তারা সুযোগ সুবিধা পেলেই আল্লাহর শত্রুদের সাহায্য ও সহায়তা করত এবং তাঁর সৎ বান্দাদের বিরুদ্ধাচরণ করত। আর এতসব করা সত্ত্বেও নিজেদেরকে সঠিক আমলকারী মনে করত। (তাবারী ১/২৮৯) কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করাকেও কুরআন মাজীদে ফাসাদ বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِى ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

যারা কুফরী করছে তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু, তোমরা যদি (উপরোক্ত) বিধান কার্যকর না কর তাহলে ভূ-পৃষ্ঠে ফিতনা ও মহা বিপর্যয় দেখা দিবে। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৭৩) এই আয়াতটি মুসলিম ও কাফিরের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিন্ন করে দিল। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْكَـٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَـٰنًا مُّبِينًا

হে মু'মিনগণ! তোমরা মু'মিনদেরকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করনা, তোমরা কি আল্লাহর জন্য তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও? (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৪৪) অর্থাৎ তোমাদের মুক্তির সনদ কেটে যাক এই কি তোমরা চাও? অতঃপর তিনি আরও বলেন ঃ

إِنَّ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে অবস্থান করবে এবং তুমি কখনও তাদের জন্য সাহায্যকারী পাবেনা। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৪৫)

মুনাফিকদের বাহ্যিক আচরণ ভাল ছিল বলে মুসলিমদের নিকট তাদের প্রকৃত অবস্থা গোপন থেকে যায়। তারা মু'মিনগণকে মুখমিষ্টি অথচ অবাস্তব কথা দিয়ে ধোঁকা দেয় এবং তাদের মিথ্যা দাবী ও কাফিরদের সাথে তাদের গোপন বন্ধুত্বের ফলে মুসলিমগণকে ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। সুতরাং বিবাদ ও হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী এই মুনাফিকরাই। অতএব যদি এরা কুফরের উপরেই কায়েম থাকত তাহলে তাদের ভয়াবহ ষড়যন্ত্র ও গভীর চতুরতা কখনও মুসলিমদের জন্য এত ক্ষতিকর হতনা। আর যদি তারা পূর্ণ মুসলিম হয়ে যেত এবং ভিতর ও বাহির তাদের এক হত তাহলে তারা এই নশ্বর দুনিয়ার নিরাপত্তা লাভের সাথে সাথে আখিরাতের মুক্তি ও সফলতার অধিকারী হয়ে যেত। এত ভয়াবহ পন্থা অবলম্বন করা সত্ত্বেও যখন তাদেরকে শান্তি প্রতিষ্ঠার উপদেশ দেয়া হয়, তখন তারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বলে ঃ আমরা তো শান্তি স্থাপনকারী,আমরা কারও সাথে বিবাদ করতে চাইনা। আমরা মু'মিন ও কাফির এই দুই দলের মধ্যে সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে ঐক্য বজায় রাখতে চাই।' (ইব্ন আবী হাতিম ১/৫২) আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তারা বলত ঃ 'আমরা দুই দল অর্থাৎ মুসলিম ও আহলে কিতাবের মধ্যে সন্ধি স্থাপনকারী।' কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, এ শুধু তাদের মূর্খতা। যাকে তারা সন্ধি বলছে ওটাই তো প্রকৃত বিবাদ। কিন্তু তাদের বোধশক্তি নেই।

১৩। এবং যখন তাদেরকে বলা হয় ঃ লোকে যেরূপ বিশ্বাস করেছে তোমরাও তদ্রুপ বিশ্বাস স্থাপন কর, তখন তারা বলে ঃ নির্বোধেরা যেরূপ বিশ্বাস করেছে আমরাও কি সেইরূপ বিশ্বাস করব? সাবধান! নিশ্চয়ই তারাই নির্বোধ, কিন্তু তা তারা অবগত নয়।	١٣. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا۟ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓا۟ أَنُؤْمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ ۗ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَـٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ

ভাবার্থ এই যে, যখন এই মুনাফিকদেরকে সাহাবীগণের (রাঃ) মত আল্লাহর উপর, তাঁর মালাইকা/ফেরেশতাগণের উপর, কিতাবসমূহের উপর এবং রাসূলগণের (আঃ) উপর ঈমান আনতে, মৃত্যুর পর পুনর্জীবন এবং জান্নাত ও জাহান্নামের সত্যতা স্বীকার করতে ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য বরণ করতে, ভাল কাজ করতে ও মন্দ কাজ হতে বিরত থাকতে বলা হয় তখন এই অভিশপ্ত দলটি এরূপ ঈমান আনাকে নির্বোধদের ঈমান আনা বলে আখ্যায়িত করে থাকে। (তাবারী ১/২৯৩) রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলামের (রহঃ) তাফসীরেও এ কথা বর্ণিত হয়েছে। (তাবারী ১/২৯৪) মুনাফিকরা বলত ঃ আমরা ও তারা একই মতাদর্শে রয়েছি এবং একই পথ অনুসরণ করছি তা কি করে হতে পারে, অথচ আমরাতো দেখছি যে, তারাতো নির্বোধের দল? এখানে নির্বোধ বলতে এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, তারা অশিক্ষিত, সাধারণ মানের মানুষ যাদের ভাল-মন্দের জ্ঞান খুব কমই রয়েছে। অধিকাংশ বিজ্ঞজনের মতে, নির্বোধ বা বোকা বলতে আল্লাহ তা'আলা শিশু/বাচ্চাদের বুঝিয়েছেন, যেমন কুরআন মাজীদের এক জায়গায় আছে ঃ

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَـٰمًا

আল্লাহ তোমাদের জন্য যে ধন-সম্পত্তি নির্ধারণ করেছেন তা অবোধদেরকে প্রদান করনা। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৫) ঐ মুশরিকদের উপর এখানেও বিশ্বপ্রভু আল্লাহ জোর দিয়ে বলছেন যে, নির্বোধ তো এরাই, কিন্তু সাথে সাথে তারা এতই গণ্ডমূর্খ যে, নিজেদের নির্বুদ্ধিতার অনুভূতিও রাখেনা এবং মূর্খতা ও ভ্রষ্টতা অনুধাবনও করতে পারেনা। এর চেয়ে বেশি তাদের অন্ধত্ব, দৃষ্টিহীনতা এবং সুপথ থেকে দূরে সরে থাকা আর কি হতে পারে?

১৪। এবং যখন তারা মু'মিনদের সাথে মিলিত হয় তখন তারা বলে ঃ আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি; এবং যখন তারা নিজেদের দলপতি ও দুষ্ট নেতাদের সাথে গোপনে মিলিত হয় তখন বলে ঃ আমরা তোমাদের সঙ্গেই আছি, আমরা	١٤. وَإِذَا لَقُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا۟ إِلَىٰ شَيَـٰطِينِهِمْ قَالُوٓا۟ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ

তো শুধু ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও প্রহসন করে থাকি।	
১৫। আল্লাহ তাদের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছেন এবং তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছেন। ফলে তারা নিজেদের অবাধ্যতার মধ্যে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ফিরছে।	١٥. ٱللَّهُ يَسۡتَهۡزِئُ بِهِمۡ وَيَمُدُّهُمۡ فِي طُغۡيَٰنِهِمۡ يَعۡمَهُونَ

মুনাফিকদের ধূর্ততা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ॥ وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُونَ এসব মুনাফিকরা মুসলিমদের নিকট এসে নিজেদের ঈমান, বন্ধুত্ব ও মঙ্গল কামনার কথা প্রকাশ করে তাদেরকে ধোঁকায় ফেলতে চায়, যাতে জান ও মালের নিরাপত্তা এসে যায় এবং যুদ্ধলব্ধ মালেও ভাগ পাওয়া যায়। আর যখন নিজেদের দলে থাকে তখন তাদের হয়েই কথা বলে।

মানব ও জিন শাইতান

ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, প্রত্যেক পথভ্রষ্টকারী ও অবাধ্যকে شَيْطَان বলা হয়। তারা জিন বা দানব থেকেই হোক অথবা মানব থেকেই হোক। কুরআনুল হাকীমেও এসেছে ঃ

وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَٰطِينَ ٱلۡإِنسِ وَٱلۡجِنِّ يُوحِي بَعۡضُهُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ زُخۡرُفَ ٱلۡقَوۡلِ غُرُورٗا

আর এমনিভাবেই আমি প্রত্যেক নাবীর জন্য বহু শাইতানকে শত্রুরূপে সৃষ্টি করেছি; তাদের কতক মানুষ শাইতানের মধ্য হতে এবং কতক জিন শাইতানের মধ্য হতে হয়ে থাকে, এরা একে অন্যকে কতকগুলি মনোমুগ্ধকর, ধোকাপূর্ণ ও প্রতারণাময় কথা দ্বারা প্ররোচিত করে থাকে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১২)

হাদীসে এসেছে ঃ 'আমরা জিন ও মানুষের শাইতান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।

উপহাস/তামাসা

আবূ যার (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! মানুষের মধ্যে কি শাইতান আছে? তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'হ্যাঁ' যখন এই মুনাফিকরা মুসলিমদের সঙ্গে মিলিত হয় তখন বলে ঃ 'আমরা তো তোমাদের সঙ্গেই আছি, অর্থাৎ যেমন তোমরা, তেমনই আমরা, আমরা তো তাদেরকে উপহাস করছিলাম।' (তাবারী ১/৩০০) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) এবং কাতাদাহর (রহঃ) তাফসীরও এটাই। (তাবারী ১/৩০০) মহান আল্লাহ শাইতানদেরকে উত্তর দিতে গিয়ে তাদের প্রতারণামূলক কাজের মুকাবিলায় বলেন যে, আল্লাহ তা'আলাও তাদেরকে উপহাস করবেন এবং অবাধ্যতার মধ্যে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ফিরতে দিবেন। যেমন কুরআন মাজীদের এক জায়গায় আছে ঃ

يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَـٰفِقُونَ وَٱلْمُنَـٰفِقَـٰتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱنظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُوا۟ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُوا۟ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُۥ بَابٌۢ بَاطِنُهُۥ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَـٰهِرُهُۥ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ

সেদিন (কিয়ামাতের দিন) মুনাফিক নর-নারী মু'মিনদের বলবে ঃ তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম, যাতে আমরা তোমাদের জ্যোতির কিছু গ্রহণ করতে পারি। বলা হবে ঃ তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও এবং আলোর সন্ধান কর। অতঃপর উভয়ের মাঝে স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর যাতে একটি দরজা থাকবে, ওর অভ্যন্তরে থাকবে রাহমাত এবং বহির্ভাগে থাকবে শাস্তি। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ১৩) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ঘোষনা করেন ঃ

وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ ۚ إِنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓا۟ إِثْمًا

অবিশ্বাসীরা যেন এ ধারণা না করে যে, আমি তাদেরকে যে অবকাশ দিয়েছি তা তাদের জীবনের জন্য কল্যাণকর; তারা স্বীয় পাপ বর্ধিত করবে এ জন্যই আমি তাদেরকে অবসর প্রদান করি। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৭৮) অতঃপর

তিনি বলেন ঃ ইহা এবং এ ধরণের বিষয়ই আল্লাহ তা'আলা মুনাফিক এবং মুশরিকদের উপহাস বা হাসি-ঠাট্টাচ্ছলে উল্লেখ করেছেন। এরকমই আল্লাহ তা'আলার কথা ঃ

وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ ٱللَّهُ ۖ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَـٰكِرِينَ

তারা (কাফিরেরা) ষড়যন্ত্র করেছিল এবং আল্লাহও কৌশল করলেন, আর আল্লাহ শ্রেষ্ঠতম কৌশলী। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৫৪)

মুনাফিকরা তাদের ষড়যন্ত্রের জন্য শাস্তি পাবে

মহান আল্লাহর সত্ত্বা প্রতারণা ও উপহাস থেকে পবিত্র। আল্লাহ কাফিরদের প্রতারণা ও বিদ্রূপের উপযুক্ত প্রতিফল দিবেন। কাজেই বিনিময়ে পূর্বোক্ত আয়াতের ঐ শব্দগুলিই ব্যবহার করা হয়েছে। দু'টি শব্দের অর্থ দুই জায়গায় পৃথক পৃথক হবে। যেমন কুরআনুম মাজীদে আছে ঃ

وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ

মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ দ্বারা এবং যে ক্ষমা করে দেয় ও আপোষ-নিস্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট রয়েছে। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৪০) অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ

অতঃপর যে কেহ তোমাদের প্রতি অত্যাচার করে, তাহলে সে তোমাদের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করবে তোমরাও তার প্রতি সেরূপ অত্যাচার কর। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৯৪) এতে বুঝা গেল যে, প্রতিশোধ গ্রহণ করা অন্যায় নয়। বাড়াবাড়ির মুকাবিলায় প্রতিশোধ নেয়া বাড়াবাড়ি নয়। কিন্তু দুই স্থানে একই শব্দ আছে, অথচ প্রথম অন্যায় ও বাড়াবাড়ি হচ্ছে যুল্ম এবং দ্বিতীয় অন্যায় ও বাড়াবাড়ি হচ্ছে সুবিচার। আর একটি ভাবার্থ এই যে, মুনাফিকরা তাদের এই নাপাক নীতি দ্বারা মুসলিমদেরকে উপহাস ও বিদ্রূপ করত। মহান আল্লাহও তাদের সঙ্গে এইরূপই করলেন যে, দুনিয়ায় তাদেরকে তিনি নিরাপত্তা দান করলেন, তারা এতে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল, অথচ এটা অস্থায়ী নিরাপত্তা। কিয়ামাতের দিন তাদের কোন নিরাপত্তা নেই। এখানে যদিও তাদের জান ও মাল রক্ষা পেল, কিন্তু আল্লাহর নিকট তারা বেদনাদায়ক শাস্তির শিকারে পরিণত হবে।

মুনাফিকদেরকে উদ্ভ্রান্তের মধ্যে ছেড়ে দেয়ার অর্থ কী

ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) উপরোক্ত কথাটিকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। কেননা বিনা কারণে যে ধোঁকা ও বিদ্রূপ হয়, আল্লাহ তা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। তবে প্রতিশোধ হিসাবে আল্লাহ সুবহানুর দিকে এসব শব্দের সম্বন্ধ লাগানোয় কোন দোষ নেই।

আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাসও (রাঃ) এ কথাই বলেন যে, এটা তাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ ও শাস্তি। **يَمُدُّهُمْ** এর অর্থ 'ঢিল দেয়া (তাবারী ১/৩১১) এবং বাড়ানো' (ইব্ন আবী হাতিম ১/৫৭) বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন ঃ

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِۦ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ. نُسَارِعُ لَهُمْ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ بَل لَّا يَشْعُرُونَ

তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সাহায্য স্বরূপ যে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি দান করি তদ্দারা তাদের জন্য সর্ব প্রকার মঙ্গল ত্বরান্বিত করছি? না, তারা বুঝেনা। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৫৫-৫৬) আল্লাহ রাব্বুল ইয্যাত আরও বলেন ঃ

فَذَرْنِى وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ

যারা আমাকে এবং এই বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে ছেড়ে দাও আমার হাতে, আমি তাদেরকে এমনভাবে ক্রমে ক্রমে ধরব যে, তারা জানতে পারবেনা। (সূরা কলম, ৬৮ ঃ ৪৪)

وَنُقَلِّبُ أَفْـِٔدَتَهُمْ وَأَبْصَٰرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا۟ بِهِۦٓ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِى طُغْيَٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ

আর যেহেতু তারা প্রথমবার ঈমান আনেনি, এর ফলে তাদের মনোভাবের ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে দিব এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মধ্যেই বিভ্রান্ত থাকতে দিব। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১০) (তাবারী ১/৩০৭) 'তুগিয়ান' শব্দটি এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে সীমা লংঘন করা হিসাবে, যেমন আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াতে উল্লেখ করেন ঃ

إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَٰكُمْ فِى ٱلْجَارِيَةِ

যখন প্লাবন হয়েছিল তখন আমি তোমাদেরকে (মানব জাতিকে) আরোহণ করিয়েছিলাম নৌযানে। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ১১)

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতে 'আমাহ' শব্দটি প্রয়োগ করার অর্থ হচ্ছে পথচ্যুত হওয়া বা সরে যাওয়া। তিনি আরও বলেন যে, 'তুগইয়ানিহীম ইয়া মাহুন' হল তাদেরকে অবিশ্বাস এবং বিপথগামীতা ঘিরে রেখেছে যার ফলে তারা সন্দেহের ঘোরে নিপতিত রয়েছে এবং তা থেকে বের হয়ে আসার সঠিক পথ খুঁজে পাচ্ছেনা। কারণ আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর এঁটে দিয়েছেন এবং দৃষ্টিশক্তিকে রুদ্ধ করে দিয়েছেন। ফলে তারা হিদায়াতের পথ খুঁজে পাচ্ছেনা এবং তাদের পথচ্যুতি থেকেও বেরিয়ে আসতে পারছেনা। (তাবারী ১/৩০৯)

তাহলে ভাবার্থ দাঁড়াল এই যে, এদিকে এরা পাপ করছে আর ওদিকে তাদের দুনিয়ার সুখ-সম্পদ ও ধনৈশ্বর্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, কাজেই এরা সুখী হচ্ছে, অথচ প্রকৃতপক্ষে এটা একটা শাস্তিই বটে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَٰكُمْ فِى ٱلْجَارِيَةِ

যখন প্লাবন হয়েছিল তখন আমি তোমাদেরকে (মানব জাতিকে) আরোহণ করিয়েছিলাম নৌযানে। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ১১) পথভ্রষ্টতাকে عَمَهٌ বলা হয়।

১৬। এরা তারাই যারা সু-পথের পরিবর্তে কু-পথকে ক্রয় করেছে, সুতরাং তাদের বাণিজ্য লাভজনক হয়নি এবং তারা সরল সঠিক পথে চলেনি।	١٦. أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُاْ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَٰرَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) এবং আরও কয়েকজন সাহাবী হতে বর্ণিত আছে যে, তারা হিদায়াতকে ছেড়ে গুমরাহীকে গ্রহণ করেছিল। আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন ঃ 'ঈমানের পরিবর্তে কুফরীকে গ্রহণ করেছিল।' মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ তারা ঈমান আনার পরে কাফির হয়েছিল।' কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ 'তারা হিদায়াতের চেয়ে গুমরাহীকেই অধিক পছন্দ করেছিল।' যেমন অন্যস্থানে ছামূদ সম্প্রদায় সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَٰهُمْ فَٱسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ

আর সামুদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার তো এই যে, আমি তাদেরকে পথ নির্দেশ করেছিলাম, কিন্তু তারা সৎ পথের পরিবর্তে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করেছিল। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ১৭) ভাবার্থ এই যে, মুনাফিকরা হিদায়াত হতে সরে গিয়ে গুমরাহীর উপর এসে গেছে এবং হিদায়াতের পরিবর্তে গুমরাহীকেই গ্রহণ করেছে। তারা ঈমান এনে পুনরায় কাফির হয়েছে। হয়ত বা আসলেই ঈমান লাভের সৌভাগ্য হয়নি। যেমন কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে ঃ

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ

এটা এ জন্য যে, তারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে; ফলে তাদের হৃদয় মোহর করে দেয়া হয়েছে। (সূরা মুনাফিকূন, ৬৩ ঃ ৩) মুনাফিকদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের লোক ছিল। আবার এমনও মুনাফিক ছিল যাদের ভাগ্যে ঈমান লাভই ঘটেনি। এ জন্যই আল্লাহ বলেন যে, এরা তারাই যারা সু-পথের পরিবর্তে কু-পথকে ক্রয় করেছে, সুতরাং তাদের বাণিজ্য লাভজনক হয়নি এবং তারা সরল সঠিক পথে চলেনি। সুতরাং এরা এই সওদায় কোন উপকারও লাভ করেনি এবং পথও প্রাপ্ত হয়নি, বরং হিদায়াতের বাগান হতে বের হয়ে কাঁটার জঙ্গলে পড়ে গেছে। (তাবারী ১/৩১৬) নিরাপত্তার প্রশস্ত মাঠ হতে বেরিয়ে ভীতিপ্রদ অন্ধকার ঘরে এবং সুন্নাতের পবিত্র বাগান হতে বের হয়ে বিদ‘আতের শুষ্ক জঙ্গলে এসে পড়েছে। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৬০)

১৭। এদের অবস্থা ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে অগ্নি প্রজ্বলিত করল, অতঃপর যখন তার পার্শ্ববর্তী সমস্ত স্থান আলোকিত হল, তখন আল্লাহ তাদের আলো ছিনিয়ে নিলেন এবং তাদের অন্ধকারের মধ্যে ছেড়ে দিলেন, সুতরাং তারা কিছুই দেখতে পায়না।	١٧. مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّآ أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُۥ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِى ظُلُمَـٰتٍ لَّا يُبْصِرُونَ
১৮। তারা বধির, মূক, অন্ধ। অতএব তারা প্রত্যাবৃত্ত হবেনা।	١٨. صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا

	يَرۡجِعُونَ

মুনাফিকদের ধরণ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَتِلۡكَ ٱلۡأَمۡثَٰلُ نَضۡرِبُهَا لِلنَّاسِۖ وَمَا يَعۡقِلُهَآ إِلَّا ٱلۡعَٰلِمُونَ

মানুষের জন্য এ সব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে থাকি, কিন্তু শুধু জ্ঞানী ব্যক্তিরাই এটা বুঝে। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৪৩) আয়াতটির ভাবার্থ এই যে, যে মুনাফিকরা সঠিক পথের পরিবর্তে ভ্রান্ত পথ এবং দৃষ্টির পরিবর্তে দৃষ্টিহীনতাকে ক্রয় করে থাকে, তাদের দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে অন্ধকারে আগুন জ্বালিয়েছে, তার ফলে আশে পাশের জিনিস তার চোখে পড়েছে। মনের উদ্বিগ্নতা দূর হয়ে উপকার লাভের আশার সঞ্চার হয়েছে, এমন সময়ে হঠাৎ আগুন নিভে গেছে এবং চারিদিক ভীষণ অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। কাজেই সে রাস্তা দেখতে পাচ্ছেনা। এছাড়া লোকটি বধির, সে কারও কথা শুনতে পায়না; সে বোবা, তার কথা রাস্তার কেহ শুনতে পায়না এবং সেও রাস্তার কোন লোককে জিজ্ঞেস করতে পারেনা; সে অন্ধ, আলোতেও সে কাজ চালাতে পারেনা। এখন তাহলে সে পথ পাবে কি করে? মুনাফিকরা ঠিক তারই মত। সঠিক পথ ছেড়ে তারা পথ হারিয়ে ফেলেছে এবং ভাল ছেড়ে মন্দের কামনা করছে। এই উদাহরণে বুঝা যাচ্ছে যে, ঐসব লোক ঈমান কবূল করার পরে কুফরী করেছিল।

আল্লাহ তাদের আলো ছিনিয়ে নিয়েছেন, এর অর্থ এই যে, যে আলো তাদের জন্য উপকারী ছিল তা সরিয়ে নিয়েছেন এবং যেমনভাবে আগুন নিভে যাবার পর তা ধুঁয়া এবং অন্ধকার থেকে যায় তদ্রুপ তাদের কাছে ক্ষতিকর জিনিস যেমন সন্দেহ, কুফর এবং নিফাক রয়ে গেছে, সুতরাং তারা নিজেরাও পথ দেখতে পায়না, অন্যের ভাল কথাও শুনতে পায়না এবং কারও কাছে প্রশ্নও করতে পারেনা। এখন পুনরায় সঠিকপথে আসা অসম্ভব হয়ে গেছে। একই ধরণের বাক্য কুরআনের অন্য স্থানে বর্ণিত হয়েছে ঃ (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৪৬) এ কারণেই তারা পিছন ফিরে আলোর সন্ধান পাচ্ছেনা, যে আলোতে তারা বিরাজ করছিল। তারাতো বিপথে পরিচালিত হয়ে তা চিরতরে হারিয়ে ফেলেছে।

فَإِنَّهَا لَا تَعۡمَى ٱلۡأَبۡصَٰرُ وَلَٰكِن تَعۡمَى ٱلۡقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ

বস্তুতঃ চক্ষু তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৪৬)

১৯। অথবা আকাশ হতে বারি বর্ষণের ন্যায় - যাতে অন্ধকার, গর্জন ও বিদ্যুৎ রয়েছে, তারা বজ্রধ্বনি বশতঃ মৃত্যুভয়ে তাদের কর্ণসমূহে স্ব স্ব অঙ্গুলী গুজে দেয়, এবং আল্লাহ অবিশ্বাসীদের পরিবেষ্টনকারী।	١٩. أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَـٰتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَـٰبِعَهُمْ فِىٓ ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَٰعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ ۚ وَٱللَّهُ مُحِيطٌۢ بِٱلْكَـٰفِرِينَ
২০। অচিরে বিদ্যুৎ তাদের দৃষ্টি হরণ করবে, যখন তাদের প্রতি আলোক প্রদীপ্ত হয় তখন তারা চলতে থাকে এবং যখন তাদের উপর অন্ধকার আচ্ছন্ন হয় তখন তারা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে এবং যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন - নিশ্চয়ই তাদের শ্রবণশক্তি ও তাদের দৃষ্টিশক্তি হরণ করতে পারেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।	٢٠. يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَـٰرَهُمْ ۖ كُلَّمَآ أَضَآءَ لَهُم مَّشَوْا۟ فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا۟ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَـٰرِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

মুনাফিকদের আর এক পরিচয়

এটা দ্বিতীয় উদাহরণ যা দ্বিতীয় প্রকারের মুনাফিকদের জন্য বর্ণনা করা হয়েছে। এরা সেই সম্প্রদায় যাদের নিকট কখনও সত্য প্রকাশ পেয়ে থাকে এবং কখনও সন্দেহে পতিত হয়। সন্দেহের সময় তাদের দৃষ্টান্ত বৃষ্টির মত। صَيِّبٌ এর অর্থ হচ্ছে বৃষ্টিপাত। (তাবারী ১/৩৩৪) ইব্ন মাসউদ (রাঃ), ইব্ন আব্বাস

(রাঃ) ও অন্যান্যরা 'কাসাইব' এর অর্থ করেছেন বৃষ্টি। (তাবারী) এ ছাড়া আবুল আলীয়া (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), 'আতা (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আতীয়া আল আউফি (রহঃ), খুরাসানী (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং রাবী ইব্ন আনাসও (রহঃ) অনুরূপ মতামত প্রকাশ করেছেন। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৬৬) যাহ্হাক (রহঃ) বলেন, উহা হল মেঘ। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৬৭) যা হোক, অধিকাংশের মতে ইহা হল বৃষ্টি যা উপর হতে নেমে আসে। কিন্তু খুব প্রসিদ্ধ অর্থ হচ্ছে বৃষ্টি। ظُلُمَاتٌ এর ভাবার্থ হচ্ছে সন্দেহ, কুফর ও নিফাক। رَعْدٌ এর অর্থ হচ্ছে বজ্র, যা ভয়ংকর শব্দের দ্বারা অন্তর কাঁপিয়ে তোলে। মুনাফিকের অবস্থাও ঠিক এইরূপ। সব সময় তার মনে ভয়, ত্রাস ও উদ্বেগ থাকে। যেমন কুরআনুম মাজীদে আছে ঃ

يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۚ هُمُ

তারা যে কোন শোরগোলকে মনে করে তাদেরই বিরুদ্ধে। (সূরা মুনাফিকূন, ৬৩ ঃ ৪) অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَئًا أَوْ مَغَٰرَٰتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ

আর তারা (মুনাফিকরা) আল্লাহর শপথ করে বলে যে, তারা (মুনাফিকরা) তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত; অথচ তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং তারা হচ্ছে কাপুরুষের দল। যদি তারা কোন আশ্রয়স্থল পেত, অথবা গুহা কিংবা লুকিয়ে থাকার একটু স্থান পেত তাহলে তারা অবশ্যই ক্ষিপ্র গতিতে সেদিকে ধাবিত হত। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৫৬-৫৭) বিজলীর সঙ্গে সেই ঈমানের আলোর তুলনা করা হয়েছে যা কখনও কখনও তাদের অন্তরে উজ্জ্বল হয়ে উঠে, সে সময়ে তারা মরণের ভয়ে তাদের আঙ্গুলগুলি কানের মধ্যে ভরে দেয়, কিন্তু ওটা মুনাফিকদের কোন উপকারে আসেনা। এরা আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা ও ইচ্ছার অধীন রয়েছে। সুতরাং এরা বাঁচতে পারেনা। আল্লাহ তা'আলা এক জায়গায় বলেন ঃ 'তোমাদের নিকট কি ঐ সেনাবাহিনীর কাহিনী পৌঁছেছে, অর্থাৎ ফির'আউন ও ছামূদের? বরং কাফিরেরা অবিশ্বাস করার মধ্যে রয়েছে। আর আল্লাহ তাদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে রয়েছেন।'

هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ. فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ. بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِى تَكْذِيبٍ وَٱللَّهُ مِن وَرَآئِهِم مُّحِيطٌ

তোমার নিকট কি পৌঁছেছে সৈন্য বাহিনীর বৃত্তান্ত ফির'আউন ও ছামূদের? তবুও কাফিরেরা মিথ্যা আরোপ করায় রত, এবং আল্লাহ তাদের পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। (সূরা বুরূজ, ৮৫ ঃ ১৭-২০)

বিদ্যুতের চক্ষুকে কেড়ে নেয়ার অর্থ হচ্ছে তার শক্তি ও কাঠিন্য এবং ঐ মুনাফিকদের দৃষ্টিশক্তিতে দুর্বলতার অর্থ হচ্ছে তাদের ঈমানের দুর্বলতা।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ 'এর ভাবার্থ এই যে, যখন ইসলামের বিজয় সাধিত হয়, তখন তাদের মনে কিছুটা স্থিরতা আসে, কিন্তু যখনই ওর বিপরীত পরিলক্ষিত হয় তখনই তারা কুফরীর দিকে ফিরে যায়। (তাবারী ১/৩৪৯) যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُۥ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِۦ

মানুষের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহর ইবাদাত করে দ্বিধার সাথে; তার মঙ্গল হলে তাতে তার চিত্ত প্রশস্ত হয় এবং কোন বিপর্যয় ঘটলে সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ১১)

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তাদের আলোতে চলার অর্থ হচ্ছে সত্যকে জেনে ইসলামের কালেমা পাঠ করা এবং অন্ধকারে থেমে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে কুফরীর দিকে ফিরে যাওয়া। (তাবারী ১/৩৪৬) আরও বহু মুফাস্‌সিরের এটাই মত, আর সবচেয়ে বেশি সঠিক ও স্পষ্টও হচ্ছে এটাই। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/৭৫)

কিয়ামাত দিবসেও তাদের এই অবস্থা হবে যে, যখন লোকদেরকে তাদের ঈমানের পরিমাপ অনুযায়ী আলো দেয়া হবে, কেহ পাবে বহু মাইল পর্যন্ত, কেহ কেহ তারও বেশী, কেহ তার চেয়ে কম, এমনকি শেষ পর্যন্ত কেহ এতটুকু আলো পাবে যে, কখনও আলোকিত হবে এবং কখনও অন্ধকার। কিছু লোক এমনও হবে যে, তারা একটু দূরে গিয়েই থেমে যাবে, আবার কিছু দূর পর্যন্ত আলো পাবে, আবার নিভে যাবে। আবার কতকগুলো লোক এমন দুর্ভাগাও হবে যে, তাদের আলো সম্পূর্ণ রূপে নিভে যাবে। এরাই হবে পূর্ণ মুনাফিক, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ফরমান রয়েছে ঃ

يَوۡمَ يَقُولُ ٱلۡمُنَٰفِقُونَ وَٱلۡمُنَٰفِقَٰتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقۡتَبِسۡ مِن نُّورِكُمۡ قِيلَ ٱرۡجِعُواْ وَرَآءَكُمۡ فَٱلۡتَمِسُواْ نُورًا

সেদিন মুনাফিক নর-নারী মু'মিনদের বলবে ঃ তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম, যাতে আমরা তোমাদের জ্যোতির কিছু গ্রহণ করতে পারি। বলা হবে ঃ তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও এবং আলোর সন্ধান কর। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ১৩) মু'মিন নারী ও পুরুষের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَوۡمَ تَرَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَسۡعَىٰ نُورُهُم بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَبِأَيۡمَٰنِهِم بُشۡرَىٰكُمُ ٱلۡيَوۡمَ جَنَّٰتٌ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ

সেদিন তুমি দেখবে মু'মিন নর-নারীদেরকে তাদের সম্মুখ ভাগে ও দক্ষিণ পার্শ্বে তাদের জ্যোতি প্রবাহিত হবে। বলা হবে ঃ আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ জান্নাতের, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ১২) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوۡبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمۡ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمۡ سَيِّـَٔاتِكُمۡ وَيُدۡخِلَكُمۡ جَنَّٰتٍ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ يَوۡمَ لَا يُخۡزِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥۖ نُورُهُمۡ يَسۡعَىٰ بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَبِأَيۡمَٰنِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَتۡمِمۡ لَنَا نُورَنَا وَٱغۡفِرۡ لَنَآۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٍ قَدِيرٌ

সেই দিন নাবী এবং তাঁর বিশ্বাসী বান্দাদেরকে আল্লাহ অপদস্ত করবেননা। তাদের জ্যোতি তাদের সম্মুখে এবং ডান পাশে ধাবিত হবে। তারা বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান করুন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আপনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান। (সূরা তাহ্রীম, ৬৬ ঃ ৮) এই আয়াতসমূহের পর নিম্নের এ বিষয়ের হাদীসগুলিও উল্লেখযোগ্য ঃ

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, আমল অনুযায়ী তারা আলো পাবে, সেই আলোতে তারা পুলসিরাত অতিক্রম করবে। কোন কোন লোকের নূর পাহাড়ের সমান হবে, কারও হবে খেজুর গাছের সমান, আর সবচেয়ে ছোট নূর ঐ লোকের হবে, যার শুধু বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর নূর থাকবে। ওটা কখনও জ্বলে উঠবে এবং কখনও নিভে যাবে। (তাবারী ২৩/৩১৭৯)

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, কিয়ামাতের দিন সমস্ত একাত্মবাদীকে নূর দেয়া হবে। যখন মুনাফিকদের নূর নিভে যাবে তখন একাত্মবাদীরা ভয় পেয়ে বলবে ঃ 'হে আল্লাহ! আমাদের নূরকে পূর্ণ করে দিন। (মুসতাদরাক হাকিম ২/৪৯৫)। যাহ্‌হাক ইব্‌ন মুজাহিমেরও (রহঃ) এটাই মত। যাহ্‌হাক ইব্‌ন মুজাহিম (রহঃ) বলেন ঃ কিয়ামাত দিবসে প্রতিটি ঈমানদার ব্যক্তিকে একটি করে নূর বা আলো দেয়া হবে। যখন তারা পুলসিরাতের কাছে পৌঁছবে তখন মুনাফিকের আলো নিভে যাবে। ঈমানদার ব্যক্তিরা তা দেখে চিন্তিত হয়ে পড়বে এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে ঃ হে আল্লাহ! আমাদেরকে দেয়া তোমার আলো অটুট রাখ।

ঈমানদার ও কাফিরের শ্রেণীবিভাগ

কিয়ামাতের দিন কয়েক প্রকারের লোক হবে ঃ (১) খাঁটি মু'মিন যাদের বর্ণনা পূর্বের চারটি আয়াতে হয়েছে। (২) খাঁটি কাফির, যার বর্ণনা তার পরবর্তী দু'টি আয়াতে হয়েছে। (৩) মুনাফিক, এদের আবার দু'টি ভাগ আছে। প্রথম হচ্ছে খাঁটি মুনাফিক যাদের উপমা আগুনের আলো দিয়ে দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় হচ্ছে সেই মুনাফিক যারা সন্দেহের মধ্যে আছে। কখনও ঈমানের আলো জ্বলে, কখনও নিভে যায়। তাদের উপমা বৃষ্টির সঙ্গে দেয়া হয়েছে। এরা প্রথম প্রকারের মুনাফিক হতে কিছু কম দোষী।

ঠিক এভাবেই সূরা নূরেও আল্লাহ তা'আলা মু'মিনের ও তার অন্তরের আলোর উপমা সেই উজ্জ্বল প্রদীপের সঙ্গে দিয়েছেন যা উজ্জ্বল চিমনীর মধ্যে থাকে এবং স্বয়ং চিমনিও উজ্জ্বল তারকার মত হয়। যেহেতু একেতো স্বয়ং ঈমানদারের অন্তর উজ্জ্বল, দ্বিতীয়তঃ খাঁটি শারীয়াত দিয়ে তাকে সাহায্য করা হয়েছে। সুতরাং এ হচ্ছে নূরের উপর নূর। এভাবেই অন্য স্থানে কাফিরদের উপমাও তিনি বর্ণনা করেছেন যারা মূর্খতা বশতঃ নিজেদেরকে অন্য কিছু একটা মনে করে, অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা কিছুই নয়। তিনি বলেন ঃ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَعْمَـٰلُهُمْ كَسَرَابٍۭ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْـَٔانُ مَآءً حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَهُۥ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا

যারা কুফরী করে, তাদের আমলসমূহ মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ; পিপাসার্ত যাকে পানি মনে করে থাকে, কিন্তু সে ওর নিকট উপস্থিত হলে দেখবে ওটা কিছু

নয়। (সূরা নূর, ২৪ ঃ ৩৯) আল্লাহ সুবহানাহু ঐ কাফিরদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন যারা খাঁটি মূর্খতায় জড়িত হয়ে পড়েছে ঃ

أَوْ كَظُلُمَـٰتٍۢ فِى بَحْرٍۢ لُّجِّىٍّۢ يَغْشَىٰهُ مَوْجٌۭ مِّن فَوْقِهِۦ مَوْجٌۭ مِّن فَوْقِهِۦ سَحَابٌۭ ۚ ظُلُمَـٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُۥ لَمْ يَكَدْ يَرَىٰهَا ۗ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُۥ نُورًۭا فَمَا لَهُۥ مِن نُّورٍ

অথবা (কাফিরদের কাজ) প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের ন্যায়, যাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার উপরে রয়েছে ঘন কালো মেঘ, একের উপর এক অন্ধকার। তার হাতকে বের করলে সে তা আদৌ দেখতে পায়না। আল্লাহ যাকে জ্যোতি দান করেননা তার জন্য কোন জ্যোতি নেই। (সূরা নূর, ২৪ ঃ ৪০)

সুতরাং কাফিরদেরও দু'টি ভাগ হল। প্রথম হল ওরা যারা অন্যদেরকে কুফরীর দিকে আহ্বান করে এবং দ্বিতীয় হচ্ছে যারা তাদেরকে অনুকরণ করে। যেমন সূরা হাজ্জের প্রথমে রয়েছে ঃ

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَـٰدِلُ فِى ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍۢ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَـٰنٍۢ مَّرِيدٍۢ

মানুষের কতক অজ্ঞতা বশতঃ আল্লাহ সম্বন্ধে বিতন্ডা করে এবং অনুসরণ করে প্রত্যেক বিদ্রোহী শাইতানের। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৩) অন্যত্র আছে ঃ

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَـٰدِلُ فِى ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍۢ وَلَا هُدًۭى وَلَا كِتَـٰبٍۢ مُّنِيرٍۢ

মানুষের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহ সম্বন্ধে বিতন্ডা করে, তাদের না আছে জ্ঞান, না আছে পথ নির্দেশক, আর না আছে কোন দীপ্তিমান কিতাব। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৮) এ ছাড়া সূরা ওয়াকি'আহর প্রথমে ও শেষে এবং সূরা নিসায় মু'মিনদেরও দুই প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে। তারা হচ্ছে সাবেকিন ও আসহাব-ই ইয়ামীন অর্থাৎ আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী এবং পরহেযগার ও সৎ ব্যক্তিগণ। সুতরাং এ আয়াতসমূহ দ্বারা জানা গেল যে, মু'মিনদের দু'টি দল, আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী ও সৎ। কাফিরদেরও দু'টি দল, কুফরের দিকে আহ্বানকারী ও তাদের অনুসরণকারী। মুনাফিকদেরও দু'টি ভাগ, খাঁটি ও পাক্কা মুনাফিক এবং সেই মুনাফিক যাদের মধ্যে নিফাকের এক আধটি শাখা আছে।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যার মধ্যে তিনটি অভ্যাস আছে সে নিশ্চিত মুনাফিক। আর যার মধ্যে ওর একটি আছে তার মধ্যে নিফাকের একটি অভ্যাস আছে যে পর্যন্ত না সে তা পরিত্যাগ করে। (তিনটি অভ্যাস হচ্ছে কথা বলার সময় মিথ্যা বলা, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা এবং গচ্ছিত দ্রব্য আত্মসাৎ করা)। (ফাতহুল বারী ১/১১১, মুসলিম ১/৭৮) এর দ্বারা সাব্যস্ত হল যে, কখনও কখনও মানুষের মধ্যে নিফাকের কিছু অংশ থাকে তা কার্য সম্বন্ধীয়ই হোক অথবা বিশ্বাস সম্বন্ধীয়ই হোক। যেমন আয়াত ও হাদীস দ্বারা জানা গেল।

হৃদয়ের প্রকারভেদ

মুসনাদ আহমাদে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'অন্তর চার প্রকার ঃ (১) সেই পরিষ্কার অন্তর যা উজ্জ্বল প্রদীপের মত ঝলমল করে। (২) ঐ অন্তর যা পর্দায় ঢাকা থাকে। (৩) উল্টো অন্তর এবং (৪) মিশ্রিত অন্তর। প্রথমটি হচ্ছে মু'মিনের অন্তর যা পূর্ণভাবে উজ্জ্বল। দ্বিতীয়টা কাফিরের অন্তর যার উপর পর্দা পড়ে রয়েছে। তৃতীয়টা খাঁটি মুনাফিকের অন্তর যা জেনে শুনে অস্বীকার করে এবং চতুর্থটা হচ্ছে মুনাফিকের অন্তর যার মধ্যে ঈমান ও নিফাক এ দুটোর সংমিশ্রণ রয়েছে। ঈমানের দৃষ্টান্ত সেই সবুজ উদ্ভিদের মত যা নির্মল পানি দ্বারা বেড়ে ওঠে। নিফাকের উপমা ঐ ফোঁড়ার ন্যায় যার মধ্যে রক্ত ও পুঁজ বাড়তে থাকে। এখন যে জিনিসের মূল বেড়ে যায়, তার প্রভাব অন্যের উপর পড়ে থাকে। এই হাদীসটি সনদ হিসাবে খুবই মযবুত। (আহমাদ ৩/১৭)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ "আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের কান ও চক্ষু ধ্বংস করে দিবেন' এর ভাবার্থ এই যে, তারা যখন সত্যকে জেনে ছেড়ে দিয়েছে তাহলে তাদের জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জিনিসের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করলে শাস্তি দিবেন অথবা ক্ষমা করবেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) আরও বলেন ঃ কেহকে শাস্তি দেয়া কিংবা ক্ষমা করা সম্পূর্ণই আল্লাহর ইচ্ছাধীন। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৭৬) ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুনাফিকদের সাবধান করার জন্য এখানে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, মুনাফিকসহ সবকিছুই তাঁর করায়ত্বে রয়েছে। যার কাছ থেকে খুশি তার শ্রবণশক্তি এবং দৃষ্টিশক্তি তিনি ছিনিয়ে নিতে পারেন, এতে বাধা দেয়ার ক্ষমতা কারও নেই। (তাবারী ১/৩৬১)

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَعۡمَـٰلُهُمۡ كَسَرَابِۭ بِقِيعَةٍ

যারা কুফরী করে, তাদের আমলসমূহ মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ। (সূরা নূর, ২৪ ঃ ৩৯)

أَوْ كَظُلُمَٰتٍ فِى بَحْرٍ لُّجِّىٍّ

অথবা (কাফিরদের কাজ) প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের ন্যায়। (সূরা নূর, ২৪ ঃ ৪০)

২১। হে মানববৃন্দ! তোমরা তোমাদের রবের ইবাদাত কর যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা ধর্মভীরু হও।	٢١. يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
২২। যিনি তোমাদের জন্য ভূতলকে শয্যা ও আকাশকে ছাদ স্বরূপ সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর তদ্বারা তোমাদের জন্য উপজীবিকা স্বরূপ ফলপুঞ্জ উৎপাদন করেন, অতএব তোমরা আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করনা এবং তোমরা এটা অবগত আছ।	٢٢. ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَٰشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

তাওহীদ আল উলুহিয়াহ

এখান থেকে আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ বা একাত্মবাদ ও তাঁর উলুহিয়াতের বর্ণনা শুরু হচ্ছে। তিনি স্বীয় বান্দাগণকে অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বের দিকে টেনে এনেছেন, তিনিই প্রত্যেক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নি'আমাত দান করেছেন, তিনিই যমীনকে বিছানা স্বরূপ বানিয়েছেন এবং আকাশকে ছাদ করেছেন। যেমন অন্য আয়াতে আছে ঃ

وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنْ ءَايَٰتِهَا مُعْرِضُونَ

এবং আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ; কিন্তু তারা আকাশস্থিত নিদর্শনাবলী হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৩২) আকাশ হতে বারিধারা বর্ষণ করার অর্থ হচ্ছে মেঘমালা হতে বৃষ্টি বর্ষণ করা এমন সময়ে যখন মানুষ ওর পূর্ণ মুখাপেক্ষী থাকে। অতঃপর ঐ পানি থেকে বিভিন্ন প্রকারের ফলমূল উৎপন্ন করা, যা থেকে মানুষ এবং জীবজন্তু উপকৃত হয়, যেমন কুরআন মাজীদের বিভিন্ন জায়গায় এর বর্ণনা এসেছে। এক স্থানে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ

তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বাসোপযোগী এবং আকাশকে করেছেন ছাদ এবং তোমাদের আকৃতি করেছেন উৎকৃষ্ট এবং তোমাদেরকে দান করেছেন উৎকৃষ্ট রিয্ক। এই তো আল্লাহ, তোমাদের রাব্ব। কত মহান জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহ! (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৬৪) উপরোক্ত আয়াতের মর্ম হচ্ছে এই যে, আল্লাহই হলেন সবকিছুর স্রষ্টা, আহারদাতা, মালিক ও সংরক্ষণকারী; বর্তমানে, অতীতে এবং ভবিষ্যতেও। অতএব একমাত্র তিনিই ইবাদাত পাবার যোগ্য এবং তাঁর সাথে অন্য কেহকে কিংবা কোন কিছুকে শরীক করা যাবেনা। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন *'অতএব তোমরা আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করনা'*। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَا تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

আল্লাহ তা'আলার জন্য অংশীদার স্থাপন করনা, তোমরা তো বিলক্ষণ জান ও বুঝ। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২২)

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, ইব্ন মাসউদ (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সবচেয়ে বড় পাপ কোন্টি?' তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে অংশীদার স্থাপন করা।' ' (ফাতহুল বারী ৮/৩৫০, মুসলিম ১/৯০) আর একটি হাদীসে আছে, মু'আযকে (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করেন ঃ

'বান্দার উপরে আল্লাহর হক কি তা কি তুমি জান? (তা হচ্ছে এই যে,) তাঁর ইবাদাত করবে এবং তাঁর ইবাদাতে অন্য কেহকেও অংশীদার করবেনা।' ' (ফাতহুল বারী ১৩/৩৫৯, মুসলিম ১/৫৯)অন্য একটি হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'তোমাদের মধ্যে যেন কেহ এ কথা না বলে যে, যা আল্লাহ একা চান ও অমুক চায়।' বরং যেন এই কথা বলে যে, যা কিছু আল্লাহ একাই চান অতঃপর অমুক চায়। (আহমাদ ৫/৩৮৪, ৩৯৪, ৩৯৮)

এ বিষয়ের হাদীসসমূহ

ইমাম আহমাদ (রহঃ) হারিশ আল আসআরী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইয়াহইয়া ইব্ন যাকারিয়াকে (আঃ) পাঁচটি বিষয় বাস্তবায়িত করার আদেশ দেন এবং বানী ইসরাঈলকেও তা পালন করার জন্য তাগাদা দিতে আদেশ করেন। কিন্তু ইয়াহইয়া (আঃ) সেই আদেশ পালন করতে একটু দেরী করেন। ঈসা (আঃ) ইয়াহইয়াকে (আঃ) বলেন ঃ আপনাকে এবং বানী ইসরাঈলকে পাঁচটি বিষয় পালন করার জন্য আল্লাহ আদেশ করেছিলেন, সুতরাং হয় আপনি তাদের আদেশ করুন, না হয় আমিই সেই আদেশ পালন করছি। ইয়াহইয়া (আঃ) বললেন ঃ হে আমার ভাই! আপনি যদি আমার আগে তা পালন করেন তাহলে আমি আশংকা করছি যে, আল্লাহ আমাকে শাস্তি দিবেন অথবা আমার পায়ের নিচের মাটি ধ্বসে যাবে। অতঃপর ইয়াহইয়া (আঃ) বানী ইসরাঈলকে বাইতুল মুকাদ্দাসে একত্রিত করলেন, যতক্ষণ না মাসজিদ কানায় কানায় পূর্ণ হল। তিনি মাসজিদের বারান্দায় এসে আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং বললেন ঃ আল্লাহ আমাকে পাঁচটি বিষয় বাস্তবায়নের আদেশ করেছেন এবং তোমাদেরকেও তা পালন করতে বলার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। প্রথমটি হল একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে কেহকে শরীক করবেনা। এর উদাহরণ হল, যেমন কোন এক লোক তার নিজ উপার্জিত অর্থ দ্বারা একটি গোলাম ক্রয় করল, গোলামটি তার মালিকের জন্য কাজ করতে শুরু করল, কিন্তু পরিশ্রমের ফসল অন্য লোককে দিয়ে দিল। তোমাদের মধ্যে এমন কেহ আছে কি যে তার গোলামের এরূপ কাজকে সমর্থন করবে? আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই তোমাদের আহার যোগান দিচ্ছেন। অতএব তাঁরই ইবাদাত কর এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করনা। আর আমি তোমাদেরকে সালাত আদায় করার নির্দেশ দিচ্ছি,

কারণ আল্লাহ তাঁর মুখমন্ডল তোমাদের মুখমন্ডলের দিকে ফিরিয়ে রেখেছেন, যতক্ষণ না তাঁর গোলাম/বান্দারা তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে না নেয়। অতএব যখন তোমরা সালাত আদায় করবে তখন তোমরা এদিক ওদিক তাকাবেনা। আমি তোমাদেরকে আরও নির্দেশ দিচ্ছি সিয়াম পালন করার। এর উদাহরণ হল এমন যে, একদল লোকের মাঝে এক লোকের কাছে একটি কাপড়ের টুকরায় মৃগ-নাভীর সুগন্ধি লাগানো ছিল, ফলে ঐ দলের সবাই সুগন্ধির ঘ্রাণ পাচ্ছিল। অবশ্যই আল্লাহর কাছে সিয়াম পালনকারীর মুখের গন্ধ মৃগ-নাভীর সুগন্ধির চেয়ে উত্তম। আমি তোমাদেরকে আরও নির্দেশ দিচ্ছি যাকাত প্রদান করতে। এর উদাহরণ হল ঐ ব্যক্তির মত যে শত্রুর হাতে বন্দী হয়েছে, অতঃপর তার হাত দু'টি তার ঘাড়ের সাথে বেঁধে হত্যা করার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সে তাদেরকে বলল ঃ আমি কি তোমাদেরকে এর পরিবর্তে মুক্তি-পণ দিতে পারি? সে তার মুক্তি-পণ বাবদ ছোট-বড় সবকিছু দিতে থাকল যতক্ষণ না তারা তাকে ছেড়ে দিল। আমি তোমাদেরকে আরও নির্দেশ দিচ্ছি যে, সব সময় আল্লাহকে স্মরণ করবে। এর ফায়দা হল ঐ ব্যক্তির ন্যায় যাকে তার শত্রু বিরামহীনভাবে পিছু ধাওয়া করছে, অবশেষে সে একটি পরিত্যক্ত দুর্গে আশ্রয় নিল। বান্দা যখন আল্লাহকে স্মরণে রাখে তখন সে সবচেয়ে উত্তম আশ্রয়প্রাপ্ত হয়।

অতঃপর হারিস (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আরও বর্ণনা করেন ঃ আমিও তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নাসিহাত করছি। তোমরা সবাই মিলে জামা'আতবদ্ধ হয়ে থাকবে, তোমাদের নেতাদের কথা শুনবে এবং মান্য করবে, হিজরাত করবে এবং আল্লাহর উদ্দেশে জিহাদ করবে। যে এক হাত পরিমানও জামা'আত থেকে দূরে সরে যাবে সে যেন ইসলামী জামা'আতের বন্ধন থেকে সরে গেল, যতক্ষণ না সে জামা'আতের সাথে আবার মিলিত হল। যে জাহিলিয়াতের কোন বাক্য উচ্চারণ করল সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে, যাদেরকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সাহাবীগণ (রাঃ) বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যদি তারা যাকাত প্রদান করে এবং সিয়াম পালন করে তবুও? তিনি বললেন ঃ যদিও তারা সালাত কায়েম করে, সিয়াম পালন করে এবং নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবী করে। সুতরাং মুসলিমদেরকে তাদের নামে ডাকবে যেমনটি আল্লাহ বলেন ঃ 'মুসলিম' - আল্লাহয় বিশ্বাসী বান্দা। (আহমাদ ৪/১৩০)

এ হাদীসটি হাসান। এই আয়াতের মধ্যেও এটাই বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তোমাদেরকে আহার্য দিচ্ছেন। সুতরাং তাঁরই ইবাদাত কর। তাঁর সঙ্গে কেহকেও অংশীদার করনা। এ আয়াত

দ্বারা সাব্যস্ত হচ্ছে যে, ইবাদাতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার একাত্মবাদের পূর্ণ খেয়াল রাখা উচিত। সমগ্র ইবাদাতের যোগ্য একমাত্র তিনিই।

আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ

ইমাম রাযী (রহঃ) প্রভৃতি মনীষীগণ আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের উপরেও এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করেছেন এবং প্রকৃত পক্ষে এই আয়াতটি আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের উপরে খুব বড় দলীল। আকাশ ও পৃথিবীর বিভিন্ন আকার, বিভিন্ন রং, বিভিন্ন স্বভাব এবং বিভিন্ন উপকারের প্রাণীসমূহ, ওদের সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব, তাঁর ব্যাপক ক্ষমতা ও নৈপুণ্য এবং তাঁর বিরাট সাম্রাজ্যের সাক্ষ্য বহন করছে।

কোন এক বেদুঈনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ঃ 'আল্লাহ যে আছে তার প্রমাণ কি?' সে উত্তরে বলেছিল ঃ 'সুবহানাল্লাহ! উটের বিষ্ঠা দেখে উট আছে এর প্রমাণ পাওয়া যায়, পায়ের চিহ্ন দেখে পথিকের পথ চলার প্রমাণ পাওয়া যায়; তাহলে এই যে বড় বড় নক্ষত্র বিশিষ্ট আকাশ, বহু পথ বিশিষ্ট যমীন, বড় বড় ঢেউ বিশিষ্ট সমুদ্র কি সেই মহাজ্ঞানী ও সূক্ষ্মদর্শী আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ দেয়না? (আর রাযী ২/৯১)

আবূ নুয়াস (রহঃ) এই জিজ্ঞাস্য বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেছিলেন ঃ 'আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষিত হওয়া ও তা হতে বৃক্ষরাজি সৃষ্টি হওয়া এবং তরতাজা শাখার উপর সুস্বাদু ফলের অবস্থান আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব এবং তাঁর একাত্মবাদের দলীল হওয়ার জন্য যথেষ্ট। ইব্‌ন মুআয (রহঃ) বলেন ঃ 'আফসোস! আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা এবং তাঁর সত্ত্বাকে অবিশ্বাস করার উপর মানুষ কি করে সাহসিকতা দেখাচ্ছে অথচ প্রত্যেক জিনিসই সেই বিশ্বরবের অস্তিত্ব এবং তাঁর অংশীবিহীন হওয়ার উপর সাক্ষ্য প্রদান করছে!' অতএব যারা আকাশের দিকে তাকিয়ে উহার বিশালতা, প্রশস্ততা এবং বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে, যার কিছু স্থির এবং কিছু চলনশীল, যারা সমুদ্রের প্রতি লক্ষ্য করে যার উভয় দিক ভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত, যার পাহাড়সমূহ ভূমিকে স্থির রাখার জন্য মাটিতে প্রোথিত তাদের জন্য এতে রয়েছে উপদেশ। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدٌۢ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَٰنُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ. وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبِّ وَٱلْأَنْعَٰمِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَٰنُهُۥ كَذَٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰٓؤُا۟

পাহাড়ের মধ্যে আছে বিচিত্র বর্ণের ফল - শুভ্র, লাল ও নিকষ কালো। এভাবে রং বেরংয়ের মানুষ, জানোয়ার ও চতুস্পদ জন্তু রয়েছে। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাঁকে ভয় করে। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ২৭-২৮)

অন্যান্য বিজ্ঞজনের বাক্য হচ্ছে ঃ 'তোমরা আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত কর, ওর উচ্চতা, প্রশস্ততা, ওর ছোট বড় উজ্জ্বল তারকারাজির প্রতি লক্ষ্য কর, ওগুলির ঔজ্জ্বল্য ও জাঁকজমক, ওদের আবর্তন ও স্থিরতা এবং ওদের প্রকাশ পাওয়া ও গোপন হওয়ার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। অতঃপর সমুদ্রের দিকে চেয়ে দেখ যার ঢেউ খেলতে রয়েছে ও পৃথিবীকে ঘিরে আছে। তারপর উঁচু নীচু পাহাড়গুলির দিকে দেখ যা যমীনের বুকে প্রোথিত রয়েছে এবং ওকে নড়তে দেয়না, ওদের রং ও আকৃতি বিভিন্ন। বিভিন্ন প্রকারের সৃষ্ট বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ কর, আবার ক্ষেত্র ও বাগানসমূহকে সবুজ সজীবকারী প্রবাহমান সুদৃশ্য নদীগুলির দিকে তাকাও, ক্ষেত্র ও বাগানের সবজীগুলি এবং ওদের নানা প্রকার ফল, ফুল এবং সুস্বাদু মেওয়াগুলির কথা চিন্তা কর যে, মাটিও এক এবং পানিও এক, কিন্তু আকৃতি, গন্ধ, রং, স্বাদ এবং উপকার দান পৃথক পৃথক। এসব কারিগরী কি তোমাদেরকে বলে দেয়না যে, ওদের একজন কারিগর আছেন? এসব আবিষ্কৃত জিনিস কি উচ্চরবে বলেনা যে, ওদের আবিষ্কারক কোন একজন আছেন? এ সমুদয় সৃষ্টজীব কি স্বীয় সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব, তাঁর সত্ত্বা ও একাত্মবাদের সাক্ষ্য প্রদান করেনা? এ হচ্ছে দলীল যা মহা সম্মানিত ও মহা মর্যাদাবান আল্লাহ স্বীয় সত্ত্বাকে স্বীকার করার জন্য প্রত্যেক চক্ষুর সামনে রেখে দিয়েছেন যা তাঁর ব্যাপক ক্ষমতা, পূর্ণ নৈপুণ্য, অদ্বিতীয় রাহমাত, অতুলনীয় দান এবং অফুরন্ত অনুগ্রহের উপর সাক্ষ্য দান করার জন্য যথেষ্ট। আমরা স্বীকার করছি যে, তিনি ছাড়া অন্য কোন পালনকর্তা, সৃষ্টিকর্তা এবং রক্ষাকর্তা নেই। তিনি ছাড়া কোন সত্য উপাস্যও নেই এবং নিঃসন্দেহে তিনি ছাড়া সাজদাহর হকদারও আর কেহ নেই।

২৩। এবং আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি, যদি তোমরা তাতে সন্দিহান হও তাহলে তৎসদৃশ একটি 'সূরা' আনয়ন কর এবং তোমাদের সেই সাহায্যকারীদেরকে ডেকে নাও	٢٣. وَإِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِۦ وَٱدْعُوا۟

শُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ	যারা আল্লাহ হতে পৃথক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও!
٢٤. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ وَلَن تَفْعَلُوا۟ فَٱتَّقُوا۟ ٱلنَّارَ ٱلَّتِى وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَٰفِرِينَ	২৪। অনন্তর যদি তোমরা তা করতে না পার এবং তোমরা তা কখনও করতে পারবেনা, তাহলে তোমরা সেই জাহান্নামের ভয় কর যার খোরাক মনুষ্য ও প্রস্তর খন্ড - যা অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

নাবী ও নাবুওয়াত সত্য

তাওহীদের পর এখন নাবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। কাফিরদেরকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে ঃ 'আমি যে পবিত্র কুরআন আমার বিশিষ্ট বান্দা মুহাম্মাদের উপর অবতীর্ণ করেছি তাকে যদি তোমরা আমার বাণী বলে বিশ্বাস না কর তাহলে তোমরা ও তোমাদের সাহায্যকারীরা সব মিলে পূর্ণ কুরআন তো নয়, বরং শুধুমাত্র ওর একটি সূরার মত সূরা আনয়ন কর। তোমরা তো তা করতে কখনও সক্ষম হবেনা, তাহলে ওটি যে আল্লাহর কালাম এতে সন্দেহ করছ কেন?' ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, شُهَدَاءَ এর ভাবার্থ হচ্ছে সাহায্যকারী। (তাবারী ১/৩৭৬) আবূ মালিক (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে অংশীদার, যারা তাদেরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করত। তাহলে ভাবার্থ হল এই ঃ 'যাদেরকে তোমরা পূজনীয়রূপে স্বীকার করছ তাদেরকেও ডাক এবং তাদের সাহায্য ও সহযোগিতায় হলেও ওটির মত একটি সূরা রচনা কর।' (ইব্ন আবী হাতিম ১/৮৪)

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, তোমরা তোমাদের শাসনকর্তা এবং বাকপটু ও বাগ্মীদের নিকট হতেও সাহায্য নিয়ে নাও। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৮৫)

একটি চ্যালেঞ্জ

কুরআনুল হাকীমের এই মুজিযার প্রকাশ এবং এই রীতির বাণী কয়েক স্থানে আছে। সূরা কাসাসে আছে ঃ

قُلْ فَأْتُوا۟ بِكِتَـٰبٍ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَآ أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ

বল ঃ তোমরা সত্যবাদী হলে আল্লাহর নিকট হতে এক কিতাব আনয়ন কর, যে পথ নির্দেশ এতদুভয় (কুরআন ও তাওরাত) হতে উৎকৃষ্টতর হবে, আমি সেই কিতাব অনুসরণ করব। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৪৯) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

قُل لَّئِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِمِثْلِ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِۦ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

বল ঃ যদি এই কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জিন সমবেত হয় এবং তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তারা এর অনুরূপ কুরআন আনয়ন করতে পারবেনা। (সূরা ইসরাহ, ১৭ ঃ ৮৮) অন্য এক সূরায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا۟ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِۦ مُفْتَرَيَـٰتٍ وَٱدْعُوا۟ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ

তাহলে কি তারা বলে যে, ওটা সে নিজেই রচনা করেছে? তুমি বলে দাও ঃ তাহলে তোমরাও ওর অনুরূপ রচিত দশটি সূরা আনয়ন কর এবং (নিজ সাহায্যার্থে) যে সমস্ত গাইরুল্লাহকে ডাকতে পার ডেকে আন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১৩) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَمَا كَانَ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَـٰكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَـٰبِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ. أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِۦ وَٱدْعُوا۟ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ

আর এই কুরআন কল্পনা প্রসূত নয় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে, এটা তো সেই কিতাবের সত্যতা প্রমাণকারী যা এর পূর্বে (নাযিল) হয়েছে, এবং আবশ্যকীয় বিধানসমূহের বিশদ বর্ণনাকারী, (এবং) এতে কোন সন্দেহ নেই (এটি) বিশ্বের রবের পক্ষ হতে (নাযিল) হয়েছে। তারা কি এরূপ বলে যে, এটি তার (নাবীর) স্বরচিত? তুমি বলে দাও ঃ তাহলে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরা আনয়ন কর এবং গাইরুল্লাহ হতে যাকে ইচ্ছা ডেকে নাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৩৭-৩৮) এ সমস্ত আয়াত তো মাক্কা মুকার্‌রামায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং মাক্কাবাসীকে এর মুকাবিলায় অসমর্থ সাব্যস্ত করে মাদীনায়ও এ বিষয়ের পুনরাবৃত্তি হয়েছে, যেমন উপরের আয়াত।

مِّثْلِهٖ এর ‘ه’ সর্বনামটিকে কেহ কেহ কুরআনের দিকে ফিরিয়েছেন। অর্থাৎ এর (কুরআনের) মত কোন একটি সূরা রচনা কর। কেহ কেহ সর্বনামটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে ফিরিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁর মত কোন নিরক্ষর লোক এরূপ হতেই পারেনা যে, লিখা-পড়া কিছু না জেনেও এমন বাণী রচনা করতে পারে যার মত বাণী কারও দ্বারা রচিত হতে পারেনা। কিন্তু প্রথম মতটিই সঠিক।

মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), ইব্‌ন উমার (রাঃ), ইব্‌ন মাসউদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং অধিকাংশ চিন্তাবিদের এটাই মত। ইমাম ইব্‌ন জারীর তাবারী (রহঃ), যামাখ্‌শারী (রহঃ) এবং ইমাম রাযীও (রহঃ) এই মত পছন্দ করেছেন। এটিকে প্রাধান্য দেয়ার কয়েকটি কারণ রয়েছে। প্রথমটি এই যে, এতে সবারই প্রতি চ্যালেঞ্চ রয়েছে। একত্রিত করেও এবং পৃথক পৃথক করেও, সে নিরক্ষরই হোক বা আহলে কিতাব ও শিক্ষিত লোকই হোক, এতে এই মুজিযার পূর্ণতা রয়েছে এবং শুধুমাত্র অশিক্ষিত লোকদেরকে অপারগ করা অপেক্ষা এতে বেশি গুরুত্ব এসেছে। আবার দশটি সূরা আনতে বলা এবং ওটা আনতে না পারার ভবিষ্যদ্বাণী করাও এটাই প্রমাণ করছে যে, এর ভাবার্থ কুরআনই হবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিত্ব নয়। সুতরাং এই সাধারণ ঘোষণা, যা বার বার করা হয়েছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে এই ভবিষ্যদ্বাণীও করা হয়েছে যে, এরা এর উপর সক্ষম নয়। এ ঘোষণা একবার মাক্কায় করা হয়েছে এবং পরে মাদীনায়ও এর পুনরাবৃত্তি হয়েছে। বিশেষ করে ঐসব লোক, যাদের মাতৃভাষা আরাবী ছিল এবং নিজেদের বাকপটুতা ও বাগ্মীতার জন্য গর্ববোধ করত তারা সবাই এর মুকাবিলা করতে অসমর্থ হয়েছিল। তারা পূর্ণ কুরআনের উত্তর দিতে পারেনি।’ দশটি সূরাও নয়, এমনকি

একটি আয়াতেরও উত্তর দিতে সমর্থ হয়নি। সুতরাং পবিত্র কুরআনের একটি মুজিযা তো এই যে, তারা এর মত একটি ছোট সূরাও রচনা করতে পারেনি।

কুরআনুল হাকীমের দ্বিতীয় মুজিযা এই যে, তারা কখনও এর মত কিছুই রচনা করতে পারবেনা যদিও তারা সবাই একত্রিত হয় এবং কিয়ামাত পর্যন্ত চেষ্টা করে, আল্লাহ তা'আলার ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণিত হয়ে গেল। সেই যুগেও কারও সাহস হয়নি, তার পরে আজ পর্যন্তও হয়নি এবং কিয়ামাত পর্যন্তও কারও সাহস হবেনা। আর এটা হবেই বা কিরূপে? যেভাবে আল্লাহর সত্ত্বা অতুলনীয়, তাঁর বাণীও তদ্রূপ অতুলনীয়। যেহেতু কুরআন হচ্ছে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সৃষ্টি, তাই অন্যরা কিভাবে এরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে, যাদেরকে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন? যাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে তাদের বাক্য কি করে স্রষ্টার সমতুল্য হতে পারে?

কুরআনের মুজিযা

কুরআনুল কারীমকে এক নযর দেখলেই তার প্রকাশ্য ও গোপনীয়, শাব্দিক ও অর্থগত সব কিছু এমনভাবে প্রকাশ পায় যা সৃষ্টজীবের শক্তির বাইরে। স্বয়ং বিশ্বপ্রভু বলেন ঃ

الٓر ۚ كِتَٰبٌ أُحۡكِمَتۡ ءَايَٰتُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتۡ مِن لَّدُنۡ حَكِيمٍ خَبِيرٍ

এটি (কুরআন) এমন কিতাব যার আয়াতগুলি (প্রমাণাদি দ্বারা) মযবুত করা হয়েছে। অতঃপর বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে; প্রজ্ঞাময়ের (আল্লাহর) পক্ষ হতে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১)

সুতরাং শব্দ সংক্ষিপ্ত এবং অর্থ বিশ্লেষিত কিংবা শব্দ বিশ্লেষিত এবং অর্থ সংক্ষিপ্ত। কাজেই কুরআন স্বীয় শব্দ ও রচনায় অতুলনীয়, এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সারা দুনিয়া সম্পূর্ণরূপে অপারগ ও অসমর্থ। পূর্ব যুগের যেসব সংবাদ দুনিয়ার অজানা ছিল তা হুবহু এই পবিত্র কালামে বর্ণিত হয়েছে, আগামীতে যা ঘটবে তারও আলোচনা রয়েছে এবং অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এর মধ্যে সমস্ত ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সত্যই বলেন ঃ

وَتَمَّتۡ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدۡقًا وَعَدۡلًا

তোমার রবের বাণী সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১৫) এই পবিত্র কুরআন সমস্তটাই সত্য, সত্যবাদিতা, সুবিচার এবং হিদায়াতে ভরপুর।

কুরআন কাব্য নয়

পবিত্র কুরআনে কোন আজে বাজে কথা, ক্রীড়া-কৌতুক এবং মিথ্যা অপবাদ নেই যা সাধারণতঃ কবিদের কবিতায় পাওয়া যায়। বরং তাদের কবিতার কদর ও মূল্য ওরই উপর নির্ভর করে। বহুল প্রচলিত একটি প্রবাদ আছে যে, اَعْذَبُه اَكْذَبَه অর্থাৎ যা খুব বেশি মিথ্যা তা খুব বেশি সুস্বাদু। লম্বা চওড়া জোরালো প্রশংসামূলক কবিতাগুলিকে দেখা যায় যে, তা অতিরঞ্জিত ও মিথ্যা মিশ্রিত। ওতে থাকবে নারীদের প্রশংসা ও সৌন্দর্য বর্ণনা, ঘোড়া ও মদের প্রশংসা, কোন মানুষের অতিরিক্ত প্রশংসা, উষ্ট্রীসমূহের ভূষণ ও সাজ-সজ্জা, বীরত্বের অতিরঞ্জিত গীত, যুদ্ধের চালবাজী কিংবা ডর–ভয়ের কাল্পনিক দৃশ্য। এতে না আছে কোন দুনিয়ার উপকার, না আছে কোন দীনের উপকার। এতে শুধু কবির বাকপটুতা ও কথা-শিল্প প্রকাশ পায়। চরিত্রের উপরেও ওর কোন ভাল প্রভাব পড়েনা, আমলের উপরেওনা। সম্পূর্ণ কবিতার মধ্যে দু' একটি ভাল ছন্দ হয়ত পাওয়া যাবে, কিন্তু বাকী সবগুলোই আজে বাজে কথায় ভর্তি থাকে।

পক্ষান্তরে কুরআনুল হাকীমের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, ওর এক একটি শব্দ ভাষা-মাধুর্যে, দীন ও দুনিয়ার উপকারে এবং মঙ্গল ও কল্যাণে ভরপুর। আবার বাক্যের বিন্যাস ও সৌন্দর্য, শব্দের গাঁথুনী, রচনার গঠন শৈলী অর্থের সুস্পষ্টতা এবং বিষয়ের পবিত্রতা যেন সোনায় সোহাগা। এর খবরের আস্বাদন, এর বর্ণনাকৃত ঘটনাবলীর সরলতা মৃত সঞ্জীবনী, এর সংক্ষেপণ উচ্চ আদর্শ, এর বিশ্লেষণ মুজিযার প্রাণ। এর কোন কিছুর পুনরাবৃত্তি দ্বিগুণ স্বাদ দিয়ে থাকে। মনে হয় যেন খাঁটি মুক্তার বৃষ্টি বর্ষণ হচ্ছে। বার বার পড়লেও মনে বিরক্তি আসবেনা। স্বাদ গ্রহণ করতে থাকলে সব সময় নতুন স্বাদ পাওয়া যাবে। বিষয়বস্তু অনুধাবন করতে থাকলে শেষ হবেনা। এটা একমাত্র কুরআনুল হাকীমের বৈশিষ্ট্য। এর ভয় প্রদর্শন, ধমক এবং শাস্তির বর্ণনা মযবুত পাহাড়কেও নাড়িয়ে দেয়, মানুষের অন্তর তো কি ছার! এর অঙ্গীকার, সুসংবাদ, দান ও অনুগ্রহের বর্ণনা অন্তরের শুষ্ক কুঁড়ির মুখ খুলে দেয়। এটা ইচ্ছা ও আকাংখার প্রশমিত আবেগের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী এবং জান্নাত ও আরামের সুন্দর সুন্দর দৃশ্য চোখের সামনে উপস্থাপনকারী। এতে মন আনন্দিত হয় এবং চক্ষু খুলে যায়। এতে আগ্রহ উৎপাদক ঘোষণা হচ্ছে ঃ

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِىَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

কেহই জানেনা, তাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর কি কি প্রতিদান লুকায়িত রয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ। (সূরা সাজদাহ, ৩২ ঃ ১৭) আরও বলা হচ্ছে ঃ

وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُنُ ۖ وَأَنتُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ

সেখানে রয়েছে সবকিছু, অন্তর যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৭১)

أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ

তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, তিনি তোমাদেরকে স্থলে কোথাও ভূ-গর্ভস্থ করবেননা। (সূরা ইসরাহ, ১৭ ঃ ৬৮)

ءَأَمِنتُم مَّن فِى ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِىَ تَمُورُ. أَمْ أَمِنتُم مَّن فِى ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ

তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদেরকেসহ ভূমিকে ধ্বসিয়ে দিবেননা, আর ওটা আকস্মিকভাবে থরথর করে কাঁপতে থাকবে? অথবা তোমরা নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের উপর কংকরবর্ষী ঝঞ্ঝা প্রেরণ করবেননা? তখন তোমরা জানতে পারবে কি রূপ ছিল আমার সতর্ক বাণী! (সূরা মূল্‌ক, ৬৭ ঃ ১৬-১৭) আরও বলা হচ্ছে ঃ

فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنۢبِهِۦ

তাদের প্রত্যেককেই তাদের অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়েছিলাম। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৪০) উপদেশ দান রূপে বলা হয়েছে ঃ

أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَـٰهُمْ سِنِينَ. ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُوا۟ يُوعَدُونَ. مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يُمَتَّعُونَ

তুমি চিন্তা করে দেখ, যদি আমি তাদেরকে দীর্ঘকাল ভোগ-বিলাস করতে দিই। অতঃপর তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল তা তাদের নিকট এসে পড়ে তখন তাদের ভোগ-বিলাসের উপকরণ তাদের কোন কাজে আসবে কি? (সূরা শু‘আরা, ২৬ ঃ ২০৫-২০৭)

মোট কথা, এভাবে আল্লাহ কুরআনুল হাকীমে যখন যে বিষয় তুলে ধরেছেন তাকে পূর্ণতায় পৌঁছে দিয়েছেন। আর একে বিভিন্ন প্রকারের বাকপটুতা,

ভাষালংকার এবং নিপুণতা দ্বারা পরিপূর্ণ করেছেন। নির্দেশাবলী ও নিষেধাজ্ঞার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, প্রত্যেক নির্দেশের মধ্যে মঙ্গল, সততা, লাভ এবং পবিত্রতার সমাবেশ ঘটেছে, আর প্রত্যেক নিষেধাজ্ঞা পাপ, হীনতা, নোংরামী এবং ভ্রষ্টতা কর্তনকারী। ইব্ন মাসউদ (রাঃ) প্রভৃতি মনীষীগণ বলেছেন যে, যখন কুরআন মাজীদে يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا শুনতে পাও তখন তোমরা কান লাগিয়ে দাও, হয়ত কোন ভাল কাজের হুকুম দেয়া হবে, অথবা কোন মন্দ কাজ হতে নিষেধ করা হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

يَأۡمُرُهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَىٰهُمۡ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنۡهُمۡ إِصۡرَهُمۡ وَٱلۡأَغۡلَٰلَ ٱلَّتِي كَانَتۡ عَلَيۡهِمۡ

সে মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশ দেয় ও অন্যায় কাজ করতে নিষেধ করে, আর সে তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ বৈধ করে দেয় এবং অপবিত্র ও খারাপ বস্তুকে তাদের প্রতি অবৈধ করে, আর তাদের উপর চাপানো বোঝা ও বন্ধন হতে তাদেরকে মুক্ত করে। (সূরা আ‘রাফ, ৭ ঃ ১৫৭)

কুরআনুল হাকীমে আছে কিয়ামাতের বর্ণনা, তথাকার ভয়াবহ দৃশ্য, জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা, দয়া ও কষ্টের পূর্ণ বিবরণের সাথে সাথে আল্লাহর মনোনীত বান্দাগণের জন্য নানা প্রকার নি‘আমাতের বর্ণনা ও তাঁর শত্রুদের জন্য নানা প্রকার শাস্তির বর্ণনা। কোথাও বা আছে সুসংবাদ এবং কোথায়ও আছে ভয় প্রদর্শন। কোন স্থানে আছে সৎ কাজের প্রতি আগ্রহ উৎপাদন এবং কোন স্থানে আছে মন্দ কাজ হতে বাধা প্রদান। কোন জায়গায় আছে দুনিয়ার প্রতি উদাসীনতার শিক্ষা এবং কোন জায়গায় আছে আখিরাতের প্রতি আগ্রহের তাগিদ। এ সমুদয় আয়াতই মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শন করে এবং আল্লাহর পছন্দনীয় শারীয়াতের দিকে ঝুঁকিয়ে দেয়, অন্তরের কালিমা দূর করে, শাইতানী পথগুলো বন্ধ করে এবং মন্দ ক্রিয়া নষ্ট করে।

রাসূলকে (সাঃ) সর্বোচ্চ মুজিযা দেয়া হয়েছে ‘আল কুরআন’

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'প্রত্যেক নাবীকে (আঃ) এমন মুজিযা দেয়া হয়েছিল যা দেখে মানুষ তাদের উপর ঈমান এনেছিল, কিন্তু আমার মুজিযা আল্লাহর ওয়াহী অর্থাৎ পবিত্র কুরআন। অতএব আমি আশা করি যে, কিয়ামাতের দিন অন্যান্য নাবীগণের (আঃ) অপেক্ষা আমার অনুসারী বেশি হবে।' (ফাতহুল বারী ৮/৬১৯, মুসলিম ১/১৩৪) কেননা অন্যান্য নাবীগণের (আঃ) মুজিযা তাঁদের সঙ্গেই বিদায় নিয়েছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই মুজিযা কিয়ামাত পর্যন্ত জারী থাকবে। জনগণ ওটা দেখতে থাকবে এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে থাকবে। আল্লাহর জন্যই সমুদয় প্রশংসা।

কুরআনে বর্ণিত 'পাথর' কী

وَقُوْدُ এর অর্থ হচ্ছে জ্বালানী, যা দিয়ে আগুন জ্বালানো হয়। যেমন গাছের ডাল, কাঠ, খড়ি ইত্যাদি। কুরআনুল হাকীমে আছে ঃ

وَأَمَّا ٱلْقَـٰسِطُونَ فَكَانُوا۟ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا

সীমা লংঘনকারীতো জাহান্নামেরই ইন্ধন। (সূরা জিন,৭২ ঃ ১৫) অন্য স্থানে আছে ঃ

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَٰرِدُونَ. لَوْ كَانَ هَـٰٓؤُلَآءِ ءَالِهَةً مَّا وَرَدُوهَا ۖ وَكُلٌّ فِيهَا خَـٰلِدُونَ

তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদাত কর সেগুলিতো জাহান্নামের ইন্ধন; তোমরা সবাই তাতে প্রবেশ করবে। যদি তারা উপাস্য হত তাহলে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করতনা; তাদের সবাই তাতে স্থায়ী হবে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৯৮-৯৯)

এ থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, খুব সম্ভবতঃ জাহান্নামের আগুনের দাহ্য হবে মানুষ এবং পাথর। আবার এও হতে পারে যে, ওর দাহ্য হবে পাথর। কিন্তু এ দুই মতামতের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কারণ ও দু'টি একে অপরের পরিপূরক। 'তৈরী করে রাখা হয়েছে' এর অর্থ হল ওটা নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অস্বীকারকারীদের অবশ্যই স্পর্শ করবে। ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন, মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেছেন যে, ইকরিমাহ (রহঃ) অথবা সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা

করেন যে, ঐ শাস্তি নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে সেই সব অবিশ্বাসীদের জন্য যারা অন্যান্য অবিশ্বাসীদের অনুসরণ করেছে। (তাবারী ১/৩৮৩)

এখানে এর অর্থ হচ্ছে গন্ধকের পাথর যা অত্যন্ত কালো, বড় এবং দুর্গন্ধময়, যার আগুনে অত্যন্ত তেজ থাকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে নিরাপদে রাখুন।

কেহ কেহ বলেছেন যে, এটা হতে উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐ পাথরগুলো যেগুলোর ছবি ইত্যাদি বানানো হত, অতঃপর ঐগুলোকে পূঁজা করা হত। যেমন এক জায়গায় আছে ঃ

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ

তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদাত কর সেগুলিতো জাহান্নামের ইন্ধন। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৯৮)

জাহান্নাম কী এখনও বর্তমান?

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যে ব্যক্তি কুফরীর উপর রয়েছে তার জন্যও ঐ শাস্তি তৈরী আছে। এই আয়াত দ্বারা এই দলীল গ্রহণ করা হয়েছে যে, জাহান্নাম এখনও বিদ্যমান ও সৃষ্ট রয়েছে। কেননা أُعِدَّتْ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর দলীল স্বরূপ বহু হাদীসও রয়েছে। একটি সুদীর্ঘ হাদীসে আছে, জান্নাত ও জাহান্নামে তর্ক হল। (মুসলিম ৪/২১৮৬) অন্য হাদীসে রয়েছে ঃ

'জাহান্নাম আল্লাহ তা'আলার নিকট আরয করল ঃ হে আমার রাব্ব! আমার এক অংশ অন্য অংশকে গ্রাস করছে। সুতরাং তাকে শীতকালে একটি এবং গ্রীষ্মকালে একটি শ্বাস নেয়ার অনুমিত দেয়া হল।' (বুখারী ৫২৭, তিরমিযী ৭/৩১৭) তৃতীয় হাদীসে আছে, সাহাবীগণ (রাঃ) বলেন ঃ 'আমরা একদিন একটি বড় শব্দ শুনতে পাই। আমরা তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করি ঃ 'এটা কিসের শব্দ?' তিনি বলেন ঃ 'সত্তর বছর পূর্বে একটি পাথর জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, আজ সেখানে পৌঁছেছে।' (মুসলিম ৪/২১৮৪) চতুর্থ হাদীস এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্য গ্রহণের সালাত আদায় করা অবস্থায় জাহান্নামকে দেখেছিলেন। ৫ম হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিরাযের রাতে জাহান্নাম ও তার শাস্তি অবলোকন করেছিলেন। এরকমই আরও সহীহ মুতাওয়াতির হাদীস রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِۦ *যদি তোমরা তাতে সন্দিহান হও তাহলে তৎসদৃশ একটি "সূরা" আনয়ন কর।* এ বিষয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। আমর ইব্ন আস (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে প্রতিনিধি হিসাবে মুসাইলামা কায্যাবের নিকট উপস্থিত হলে সে তাকে জিজ্ঞেস করে ঃ 'তুমি তো মাক্কা থেকেই এসেছ, আচ্ছা বলত আজকাল কোন্ নতুন ওয়াহী অবতীর্ণ হয়েছে?' তিনি বললেন ঃ সম্প্রতি একটি সংক্ষিপ্ত সূরা অবতীর্ণ হয়েছে যা অত্যন্ত চারুবাক ও ভাষার সৌন্দর্য ও অলংকারে পরিপূর্ণ এবং খুবই ব্যাপক।' অতঃপর সূরা আল-আসর পড়ে শুনান। মুসাইলামা কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর ওর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বলে ঃ 'আমার উপরও এ রকমই একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে।' তিনি বলেন ঃ 'ঠিক আছে, শুনাও তো দেখি।' সে বলে ঃ

'ওহে জংলী বিড়াল! তোমার অস্তিত্ব তো দু'টি কান ও বক্ষ ছাড়া কিছুই নয়, বাকী তো তোমার সবই নগণ্য।' অতঃপর সে বলে ঃ বল হে আমর! কেমন হয়েছে? তিনি (আমর রাঃ) বলেন ঃ 'আমাকে জিজ্ঞেস করছ কি? তুমি তো ভাল করেই জান যে, তোমার এ সবই মিথ্যা তা আমি জানি। কোথায় এই বাজে কথা, আর কোথায় সেই জ্ঞান ও দর্শনপূর্ণ বাণী।'

২৫। এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করে তাদেরকে সুসংবাদ প্রদান কর যে, তাদের জন্য এমন জান্নাত রয়েছে যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে; যখনই সেখানে তাদেরকে খাবার হিসাবে ফলপুঞ্জ প্রদান করা হবে তখনই তারা বলবে ঃ আমাদের তো এটা পূর্বেই প্রদত্ত হয়েছিল, বস্তুতঃ তাদেরকে একই সদৃশ ফল প্রদান করা হবে, এবং তাদের	২৫. وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوا۟ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوا۟ هَـٰذَا ٱلَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَأُتُوا۟ بِهِۦ مُتَشَـٰبِهًا ۖ وَلَهُمْ فِيهَآ أَزْوَٰجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ

فِيهَا خَـٰلِدُونَ	**জন্য তন্মধ্যে শুদ্ধা সহধর্মিনীগণ রয়েছে, এবং তন্মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।**

মু'মিন ব্যক্তিদের প্রতিদান

কাফির ও ধর্মদ্রোহীদের শাস্তি ও লাঞ্ছনার বর্ণনা দেয়ার পর এখানে মু'মিন ও সৎলোকদের প্রতিদান, সাওয়াব ও সম্মানের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। কুরআনের مَثَانِى হওয়ার এটাও একটা অর্থ এবং সঠিক অর্থ এটাই যে, এতে প্রত্যেক বিষয় জোড়া জোড়া রয়েছে। এর বিস্তারিত বিবরণও উপযুক্ত জায়গায় দেয়া হবে। ভাবার্থ এই যে, ঈমানের সঙ্গে কুফরের এবং কুফরের সঙ্গে ঈমানের, সাওয়াবের সঙ্গে পাপের ও পাপের সঙ্গে সাওয়াবের বর্ণনা অবশ্যই আসে। যে জিনিসের বর্ণনা দেয়া হয় সঙ্গে সঙ্গে তার বিপরীত জিনিসেরও বর্ণনা দেয়া হয়। কোন জিনিসের বর্ণনা দিয়ে কোন জায়গায় তার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়। مُتَشَابِه এ রকমই।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণিত জান্নাতের তলদেশ দিয়ে নদী বয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে তার বৃক্ষরাজী ও অট্টালিকার নিম্নদেশ দিয়ে বয়ে যাওয়া। হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সেখানে নদী/ঝর্ণা প্রবাহিত হয়, কিন্তু গর্ত নেই। অন্য হাদীসে আছে যে, কাওসার নদীর দু'ধারে খাঁটি মুক্তার গম্বুজ আছে, তার মাটি হচ্ছে খাঁটি মৃগনাভি, তার কুচি পাথরগুলি হচ্ছে মণি-মুক্তা ও অতি মূল্যবান পাথর। আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করে যেন আমাদেরকে ঐ নি'আমাত দান করেন। তিনি বড়ই অনুগ্রহশীল ও দয়ালু। হাদীসে আছে ঃ

জান্নাতের নদীগুলি মুশ্‌কের পাহাড়ের নিম্নদেশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/৮৭)। মাশরুক ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রহঃ) হতেও এরূপ বর্ণিত আছে। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/৮৮)

জান্নাতের ফল-মূলের সাথে সাযুজ্য

জান্নাতবাসীদের এই কথা 'ইতোপূর্বে আমাদেরকে দেয়া হয়েছিল' এর ভাবার্থ এই যে, দুনিয়ায়ও তাদেরকে এই ফলগুলি দেয়া হয়েছিল। তাদের এটা বলার কারণ এই যে, বাহ্যিক আকারে এটি সম্পূর্ণ সাদৃশ্যপূর্ণ হবে।

ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন কাসীর (রহঃ) বলেন যে, জান্নাতের ঘাস হচ্ছে জাফরান এবং পাহাড়গুলো হচ্ছে মুশকের। ছোট ছোট সুন্দর চেহারা পরিবর্তনহীন ছেলেরা ফল এনে হাযির করবে এবং তারা খাবে। আবার আনলে তারা বলবে ঃ ওটা এখনই তো খেলাম। তারা উত্তর দিবে ঃ জনাব! রং ও রূপ তো এক, কিন্তু স্বাদ পৃথক; খেয়ে দেখুন। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/৯০) খেয়েই তারা আরও সুস্বাদু অনুভব করবে। সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার এটাই অর্থ। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন ঃ দুনিয়ার ফলের সঙ্গে এবং নামে ও আকারে সাদৃশ্য থাকবে, কিন্তু স্বাদ হবে পৃথক। (তাবারী) ১/৩৯১)

জান্নাতের স্ত্রীগণ হবেন পুতঃ পবিত্র

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ এবং তাদের জন্য তন্মধ্যে শুদ্ধা সহধর্মিনীগণ রয়েছে। ইব্‌ন আবূ তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে তারা অশ্লীলতা ও অপবিত্রতা থেকে পবিত্র। (তাবারী ১/২৯৫) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ তা হল মাসিক, প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দেয়া, প্রস্রাব, বীর্য, থুথু এবং গর্ভ ধারণ থেকে পবিত্র। (তাবারী ১/৩৯৬) কাতাদাহ (রহঃ) বলেছেন, তা হল অশুচি এবং পাপ। তিনি অন্যত্র বর্ণনা করেছেন যে, তা হল মাসিক এবং গর্ভ ধারণ থেকে পবিত্র। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/৯১) 'আতা (রহঃ), হাসান (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ), আতিয়্যিআহ (রহঃ) এবং সুদ্দীও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/৯২)

'তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে' অর্থাৎ চূড়ান্ত ও স্থায়ী শান্তি একমাত্র ঈমানদার ব্যক্তিই লাভ করবে, তারা মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করবেনা এবং অফুরন্ত নি'আমাত লাভ করবে যা কখনো নিঃশেষ হবেনা কিংবা ছিনিয়ে নেয়া হবেনা। আমরাও আল্লাহর কাছে এরূপ নি'আমাতের প্রার্থনা করছি, তিনিতো অত্যন্ত অনুগ্রহকারী, দয়ালু ও মহানুভব।

২৬। নিশ্চয়ই আল্লাহ মশা অথবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করতে লজ্জাবোধ করেননা। সুতরাং যারা ঈমান এনেছে তারা তো বিশ্বাস	٢٦. إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِۦٓ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا

فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَـٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِۦ كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِۦ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِۦٓ إِلَّا ٱلْفَـٰسِقِينَ

করবে যে, এ উপমা তাদের রবের পক্ষ হতে খুবই স্থানোপযোগী হয়েছে, আর যারা কাফির সর্বাবস্থায় তারা এটাই বলবে যে, এ সব নগণ্য বস্তুর উপমা দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্যই বা কি? তিনি এর দ্বারা অনেককে বিপথগামী করে থাকেন এবং এর দ্বারা অনেককে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন, আর এর দ্বারা তিনি শুধু ফাসিকদেরকেই বিপথগামী করে থাকেন।

٢٧. ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مِيثَـٰقِهِۦ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ

২৭। যারা আল্লাহর সঙ্গে দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে এবং ঐ সব সম্বন্ধ ছিন্ন করে যা অবিচ্ছিন্ন রাখতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন এবং যারা ভূপৃষ্ঠে বিবাদ সৃষ্টি করে তারাই পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) এবং অন্য কয়েকজন সাহাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন উপরের তিনটি আয়াতে মুনাফিকদের দু'টি দৃষ্টান্ত বর্ণিত হল অর্থাৎ আগুন ও পানি, তখন তারা বলতে লাগল যে, এরকম ছোট ছোট দৃষ্টান্ত আল্লাহ তা'আলা কখনও বর্ণনা করেননা। তার প্রতিবাদে আল্লাহ

তা'আলা এই আয়াত দু'টি অবতীর্ণ করেন। (তাবারী ১/৩৯৮) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, যখন কুরআনুল হাকীমে মাকড়সা ও মাছির দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয় তখন মুশরিকরা বলতে থাকে যে, কুরআনের মত আল্লাহর কিতাবে এরকম নিকৃষ্ট প্রাণীর বর্ণনা দেয়ার কি প্রয়োজন? তাদের এ কথার উত্তরে আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয় এবং বলা হয় যে, সত্যের বর্ণনা দিতে আল্লাহ আদৌ লজ্জাবোধ করেননা, তা কমই হোক বা বেশীই হোক। (তাবারী ১/৩৯৯)

পৃথিবীর জীবন যাপনের সাথে তুলনামূলক আলোচনা

রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) বলেন যে, এটা একটা মযবুত দৃষ্টান্ত যা দুনিয়ার দৃষ্টান্তরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। মশা ক্ষুধার্ত থাকা পর্যন্ত জীবিত থাকে এবং মোটা তাজা হলেই মারা যায়। এ রকমই এ লোকেরাও যখন ইহলৌকিক সুখ সম্ভোগ প্রাণভরে ভোগ করে তখনই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পাকড়াও করেন। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এক জায়গায় বলেন ঃ

فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِۦ فَتَحۡنَا عَلَيۡهِمۡ أَبۡوَٰبَ كُلِّ شَيۡءٍ

অতঃপর তাদেরকে যা কিছু উপদেশ ও নাসীহাত করা হয়েছিল তা যখন তারা ভুলে গেল তখন আমি সুখ শান্তির জন্য প্রতিটি বস্তুর দরজা উন্মুক্ত করে দিলাম। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৪৪) (তাবারী ১/৩৯৮) ইব্ন জারীর (রহঃ) এবং আদী ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) এইরূপ বর্ণনা করেছেন। সহীহ মুসলিমে আছে ঃ

যদি কোন মুসলিমের পায়ে কাঁটা ফুঁড়ে অথবা এর চেয়েও বেশি কিছু হয় তাহলে তার জন্যও তার মর্যাদা বেড়ে যায় এবং পাপ মোচন হয়। (মুসলিম ৪/১৯৯১) এ হাদীসেও فَمَافَوْقَهَا শব্দটি আছে। ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, যেমন এ ছোট-বড় জিনিসগুলি সৃষ্টি করতে আল্লাহ তা'আলা লজ্জাবোধ করেননা, তেমনই ওগুলিকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ বর্ণনা করতেও তাঁর কোন দ্বিধা ও সংকোচ নেই। কুরআনুল হাকীমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এক জায়গায় বলেন ঃ হে লোকসকল! একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হচ্ছে, তোমরা কান লাগিয়ে শোন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُۥٓۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخۡلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ ٱجۡتَمَعُواْ لَهُۥۖ وَإِن يَسۡلُبۡهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيۡـًٔا لَّا يَسۡتَنقِذُوهُ مِنۡهُۚ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلۡمَطۡلُوبُ

তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা তো কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবেনা, এ উদ্দেশে তারা সবাই একত্রিত হলেও; এবং মাছি যদি তাদের নিকট হতে কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় ওটাও তারা ওর নিকট হতে উদ্ধার করতে পারবেনা; পূজারী ও পূজিত কতই না দুর্বল! (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৭৩) অন্য স্থানে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا ۖ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتِ ۖ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ

আল্লাহর পরিবর্তে যারা অপরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করে তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সা, যে নিজের জন্য ঘর তৈরী করে; এবং ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতম, যদি তারা জানত। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৪১) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَآءِ. تُؤْتِيٓ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ. يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّٰلِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ

তুমি কি লক্ষ্য করনা আল্লাহ কিভাবে উপমা দিয়ে থাকেন? সৎ বাক্যের তুলনা উৎকৃষ্ট বৃক্ষ যার মূল সুদৃঢ় এবং যার প্রশাখা উর্ধ্বে বিস্তৃত, যা প্রত্যেক মওসুমে ফল দান করে তার রবের অনুমতিক্রমে, এবং আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে। কু-বাক্যের তুলনা এক মন্দ বৃক্ষ যার মূল ভূ-পৃষ্ঠ হতে বিচ্ছিন্ন, যার কোন স্থায়িত্ব নেই। যারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী তাদেরকে ইহজীবনে ও পরজীবনে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন এবং যারা যালিম, আল্লাহ তাদেরকে বিভ্রান্তিতে রাখবেন; আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ২৪-২৭) অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা সেই ক্রীতদাসের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন ঃ

ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ

আল্লাহ উপমা দিচ্ছেন অপরের অধিকারভুক্ত এক দাসের, যে কোন কিছুর উপর শক্তি রাখেনা। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৭৫) তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَآ أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَىٰهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ۖ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ

আল্লাহ আরও উপমা দিচ্ছেন দু' ব্যক্তির; ওদের একজন মূক, কোন কিছুরই শক্তি রাখেনা এবং সে তার মালিকের জন্য বোঝা স্বরূপ; তাকে যেখানেই পাঠানো হোক না কেন সে ভাল কিছুই করে আসতে পারেনা; সে কি সমান হবে ঐ ব্যক্তির মত যে ন্যায়ের নির্দেশ দেয়? (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৭৬) অন্য জায়গায় ইরশাদ হচ্ছে ঃ

ضَرَبَ لَكُم مَّثَلاً مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۖ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُم مِّن شُرَكَآءَ فِى مَا رَزَقْنَـٰكُمْ

(আল্লাহ) তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন ঃ তোমাদেরকে আমি যে রিয্ক দিয়েছি তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের কেহ কি তাতে তোমাদের সমান অংশীদার? (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২৮)

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ মু'মিনগণ এ কথায় বিশ্বাসী যে, তারা ছোট-বড় যে বিষয়েরই সম্মুখীন হয় তা আল্লাহর তরফ থেকেই হয়ে থাকে এবং আল্লাহ তা'আলা বিশ্বাসীদের সুপথ প্রদর্শন করেন। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৯৩)

সুদ্দী (রহঃ) তার তাফসীরে বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) এবং অন্যান্য সাহাবীগণ (রাঃ) বলেছেন যে, 'এভাবে সে অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে' এর অর্থ হল মুনাফিক। আল্লাহ মু'মিনদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন এবং আয়াত অস্বীকারকারী পথভ্রষ্টদের পথভ্রষ্টতা আরও বাড়িয়ে দেন, যদিও তারা জানে যে, আল্লাহর আয়াত সত্য। ইহাই হল আল্লাহর বিপথে চালিত করা। (তাবারী ১/৪০৮)

اَنَّه এর ضَمِيْرটির مَرْجَعْ হচ্ছে مِثَال অর্থাৎ মু'মিন এ দৃষ্টান্তকে আল্লাহর পক্ষ হতে সত্য মনে করে, আর কাফিরেরা কথা বানিয়ে থাকে। যেমন সূরা মুদ্দাসসিরে আছে ঃ 'এবং জাহান্নামের কর্মচারী আমি শুধু ফেরেস্তাদেরকেই নিযুক্ত করেছি, আর আমি তাদের সংখ্যা শুধু এরূপ রেখেছি যা কাফিরদের বিভ্রান্তির উপকরণ হয়, এজন্য যে, কিতাবীগণ যেন বিশ্বস্ত হয় এবং ঈমানদারদের ঈমান আরও বর্ধিত হয়, আর কিতাবীগণ ও মু'মিনগণ সন্দেহ না করে, আর যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা এবং কাফিরেরা যেন বলে যে, এ বিস্ময়কর উপমা দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্য কি? এরূপেই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করে থাকেন, আর যাকে ইচ্ছা হিদায়াত করে থাকেন; আর তোমার প্রভুর সৈন্যবাহিনীকে তিনি ছাড়া কেহই জানেনা, আর এটা শুধু মানুষের উপদেশের জন্য।' এখানেও হিদায়াত ও গুমরাহীর বর্ণনা রয়েছে। সাহাবীগণ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এর দ্বারা মুনাফিক পথভ্রষ্ট হয় এবং মু'মিন সুপথ প্রাপ্ত হয়। মুনাফিকরা ভ্রান্তির মধ্যে বেড়েই চলে, কেননা এ দৃষ্টান্ত যে সত্য তা জানা সত্ত্বেও তারা একে অবিশ্বাস করে, আর মু'মিন এটা বিশ্বাস করে ঈমান আরও বাড়িয়ে নেয়।

فَاسِقِيْنَ এর ভাবার্থ হচ্ছে 'মুনাফিক'। কেহ কেহ এর অর্থ নিয়েছেন 'কাফির'–যারা জেনে শুনে অস্বীকার করে। সা'দ (রাঃ) বলেন যে, এর দ্বারা খারেজীদেরকে বুঝান হয়েছে।

যে ব্যক্তি আনুগত্য হতে বেরিয়ে যায়, আরাবী পরিভাষায় তাকে ফাসিক বলা হয়। খোলস সরিয়ে খেজুরের শীষ বের হলে আরাবেরা فَسَقَتْ বলে থাকে। ইঁদুর গর্ত থেকে বেরিয়ে ক্ষতি সাধন করতে থাকে বলে ওকেও فُوَاسِقَة বলা হয়। অন্য হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'পাঁচটি প্রাণী 'ফাসিক'। কা'বা ঘরের মধ্যে এবং ওর বাইরে এদেরকে হত্যা করা হবে। এগুলো হচ্ছে ঃ ১। কাক, ২। চিল, ৩। বিচ্ছু, ৪। ইঁদুর এবং ৫। কালো কুকুর। (ফাতহুল বারী ৬/৪০৮, মুসলিম ২/৮৫৬) সুতরাং কাফির এবং প্রত্যেক অবাধ্যই ফাসিকের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু কাফিরদের ফাসিকী সবচেয়ে জঘন্য এবং সবচেয়ে খারাপ। আর এ আয়াতে ফাসিকের ভাবার্থ হচ্ছে কাফির। আল্লাহই সবচেয়ে বেশি জানেন।

এর বড় দলীল এই যে, পরে তাদের দোষ বর্ণনা করা হয়েছে। তা হচ্ছে আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, তাঁর নির্দেশ অমান্য করা, যমীনে ঝগড়া-বিবাদ করা, আর কাফিরেরাই এসব দোষে জড়িত রয়েছে, মু'মিনদের বিশেষণতো এর সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে থাকে। যেমন বর্ণিত হয়েছে ঃ

أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰٓ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَٰبِ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَٰقَ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوٓءَ ٱلْحِسَابِ

তোমার রাব্ব হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যে ব্যক্তি সত্য বলে জানে সে, আর অন্ধ কি সমান? উপদেশ গ্রহণ করে শুধু বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিরাই। যারা আল্লাহকে দেয়া অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেনা, আর আল্লাহ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ করেছেন যারা তা অক্ষুণ্ন রাখে, ভয় করে তাদের রাব্বকে এবং ভয় করে কঠোর হিসাবকে। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ১৯-২১) একটু পরেই বলা হয়েছে ঃ

وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مِيثَٰقِهِۦ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ ۙ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ ٱلدَّارِ

যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের জন্য আছে অভিসম্পাত এবং আছে মন্দ আবাস। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ২৫) অঙ্গীকার হচ্ছে ওটাই যা তাওরাতে তাদের কাছে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল যে, তারা ওর সমস্ত কথা মেনে চলবে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য স্বীকার করবে, তাঁর নাবুওয়াতের প্রতি বিশ্বাস করবে এবং তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা সত্য মনে করবে। আর অঙ্গীকার ভঙ্গ করা এই যে, জেনে-শুনে তারা তাঁর নাবুওয়াত ও আনুগত্য অস্বীকার করেছে এবং অঙ্গীকার সত্ত্বেও ওকে গোপন করেছে, আর পার্থিব স্বার্থের কারণে ওর উল্টা করেছে।

কেহ কেহ বলেন যে, এর ভাবার্থে কোন নির্দিষ্ট দলকে বুঝায়না, বরং সমস্ত কাফির, মুশরিক ও মুনাফিককে বুঝায়। অঙ্গীকারের ভাবার্থ এই যে, আল্লাহর

একাত্মবাদ এবং তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াতকে স্বীকার করা, যার প্রমাণে প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী ও বড় বড় মুজিযা বিদ্যমান রয়েছে। আর ওটা ভেঙ্গে দেয়ার অর্থ হচ্ছে তাওহীদ ও সুন্নাত হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং অস্বীকার করা। এই কথাটিই বেশি মযবুত ও যুক্তিসঙ্গত। ইমাম যামাখ্‌শারীর (রহঃ) মতামতও এদিকেই। তিনি বলেন যে, অঙ্গীকারের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর একাত্মবাদে বিশ্বাস করা, যা মানবীয় প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেছিলেন ঃ ‘আমি কি তোমাদের প্রভু নই?’ তখন সবাই উত্তর দিয়েছিল ঃ ‘হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আপনি আমাদের প্রভু।’ অতঃপর যেসব কিতাব দেয়া হয়েছে তাতেও অঙ্গীকার করানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ ‘তোমরা আমার অঙ্গীকার পূরা কর, আমিও তোমাদের অঙ্গীকার পূরা করব।’ কেহ কেহ বলেন যে, অঙ্গীকারের ভাবার্থ হচ্ছে সেই অঙ্গীকার যা আত্মাসমূহের নিকট হতে নেয়া হয়েছিল, যখন তাদেরকে আদমের (আঃ) পৃষ্ঠদেশ হতে বের করা হয়েছিল। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ ‘তোমাদের প্রভু যখন আদমের (আঃ) সন্তানদের নিকট অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, আমিই তোমাদের প্রভু এবং তারা সবাই স্বীকার করেছিল।’ আর একে ভেঙ্গে দেয়ার অর্থ হচ্ছে একে ছেড়ে দেয়া। এ সমুদয় কথা তাফসীর ইব্‌ন জারীরে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

মুনাফিকের লক্ষণ

আবুল আলীয়া (রহঃ) বলেন ঃ ‘আল্লাহর অঙ্গীকার ভেঙ্গে দেয়া যা মুনাফিকদের কাজ ছিল, তা হচ্ছে এই ছয়টি অভ্যাস ঃ (১) কথা বলার সময় মিথ্যা বলা, (২) প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা, (৩) গচ্ছিত বস্তু আত্মসাৎ করা, (৪) আল্লাহর অঙ্গীকার দৃঢ় করণের পর তা ভঙ্গ করা (৫) যা অবিচ্ছিন্ন রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা বিচ্ছিন্ন করা এবং (৬) পৃথিবীতে বিবাদের সৃষ্টি করা। তাদের এই ছয়টি অভ্যাস তখনই প্রকাশ পায় যখন তারা জয়যুক্ত হয়। আর যখন তারা পরাজিত হয় তখন তারা প্রথম তিনটি কাজ করে থাকে।’ সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, কুরআনের আদেশ ও নিষেধাবলী পড়া, সত্য বলে জানা, অতঃপর না মানাও ছিল অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। আল্লাহ যা মিলিত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন–এর ভাবার্থ হচ্ছে আত্মীয়তার বন্ধন অবিচ্ছিন্ন রাখা এবং আত্মীয়দের হক আদায় করা ইত্যাদি। যেমন কুরআন মাজীদে এক জায়গায় আছে ঃ

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوٓا۟ أَرْحَامَكُمْ

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ২২) (তাবারী ১/৪১৬) ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) একেই প্রাধান্য দিয়েছেন। আবার এটাও বলা হয়েছে যে, আয়াতটি সাধারণ। যা মিলিত রাখার ও আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তা তারা ছিন্ন করেছিল এবং আদায় করেনি। خَاسِرُوْنَ এর অর্থ হচ্ছে আখিরাতে যারা ক্ষতিগ্রস্ত। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ “তাদের উপর হবে লা'নত এবং তাদের পরিণাম হবে খারাপ।”

‘ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া’ কী

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, কুরআন মাজীদে মুসলিম ছাড়া অন্যদেরকে যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত বলা হয়েছে সেখানে ভাবার্থ হবে কাফির এবং যেখানে মুসলিমকে ক্ষতিগ্রস্ত বলা হয়েছে সেখানে অর্থ হবে পাপী। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أُوْلَـٰٓئِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ ٱلدَّارِ

তাদের জন্য আছে অভিসম্পাত এবং আছে মন্দ আবাস। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ২৫)

خَاسِرُوْنَ শব্দটি خَاسِرٌ এর বহুবচন। জনগণ প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে এবং দুনিয়ার মোহে পড়ে আল্লাহর রাহমাত হতে সরে গেছে বলে তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত বলা হয়েছে। মুনাফিক ও কাফির ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির মতই। যখন আল্লাহর দয়া/অনুগ্রহের খুবই প্রয়োজন হবে অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন। সেই দিন এরা আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত থাকবে।

২৮। কিরূপে তোমরা আল্লাহকে অবিশ্বাস করছ? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন? অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে সঞ্জীবিত করেছেন, পুনরায় তিনি তোমাদেরকে নির্জীব করবেন। অবশেষে তোমাদেরকে তাঁরই দিকে	٢٨. كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَٰتًا فَأَحْيَـٰكُمْ ۖ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ

প্রত্যাগমন করতে হবে।	تُرۡجَعُونَ

আল্লাহর অস্তিত্ব সম্বন্ধে দলীলসমূহ

আল্লাহ তা'আলা বিদ্যমান রয়েছেন, তিনি ব্যাপক ক্ষমতবান এবং তিনিই সৃষ্টিকর্তা ইত্যাদি প্রমাণ করার পর এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'কেমন করে তোমরা আল্লাহর অস্তিত্বকে অবিশ্বাস করছ? অথচ তোমাদেরকে অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বে আনয়নকারী তো একমাত্র তিনিই।' যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَمۡ خُلِقُواْ مِنۡ غَيۡرِ شَيۡءٍ أَمۡ هُمُ ٱلۡخَـٰلِقُونَ. أَمۡ خَلَقُواْ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَۚ بَل لَّا يُوقِنُونَ

তারা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? না কি তারা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? বরং তারা তো অবিশ্বাসী। (সূরা তূর, ৫২ ঃ ৩৫-৩৬) অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে ঃ

هَلۡ أَتَىٰ عَلَى ٱلۡإِنسَـٰنِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهۡرِ لَمۡ يَكُن شَيۡـًٔا مَّذۡكُورًا

কাল-প্রবাহ মানুষের উপর এক সময় অতিবাহিত হয়েছে যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিলনা। (সূরা ইনসান/দাহ্র, ৭৬ ঃ ১) এ ধরনের আরও বহু আয়াত রয়েছে। কুরআনুম মাজীদে বলা হয়েছে ঃ

قَالُواْ رَبَّنَآ أَمَتَّنَا ٱثۡنَتَيۡنِ وَأَحۡيَيۡتَنَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَٱعۡتَرَفۡنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلۡ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ

তারা বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আপনি আমাদেরকে প্রাণহীন অবস্থায় দুইবার রেখেছেন এবং দুইবার আমাদেরকে প্রাণ দিয়েছেন। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ১১)

আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ এবং এই আয়াতের ভাবার্থ একই যে, তোমরা তোমাদের পিতার পৃষ্ঠে মৃত ছিলে। অর্থাৎ কিছুই ছিলনা। তিনিই তোমাদেরকে জীবিত করেছেন, আবার তোমাদেরকে মৃত করবেন। অর্থাৎ মৃত্যু একদিন অবশ্যই আসবে। আবার তিনি তোমাদেরকে কাবর হতে উঠাবেন। এভাবেই মরণ দু'বার এবং জীবন দু'বার।

২৯। পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর তিনি আকাশের প্রতি মনঃসংযোগ করেন, অতঃপর সপ্ত আকাশ সুবিন্যস্ত করেন এবং তিনি সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।	٢٩. هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَـٰوَٰتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ

আল্লাহর ক্ষমতা সম্বন্ধে দলীল

পূর্বের আয়াতে মহান আল্লাহ ঐ দলীলসমূহ বর্ণনা করেছেন যা স্বয়ং মানুষের মধ্যে রয়েছে। এখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এই পবিত্র আয়াতে ঐ দলীলসমূহের বর্ণনা দিচ্ছেন যা দৈনন্দিন মানুষের চোখের সামনে ভাসছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, প্রত্যেক জিনিস সম্বন্ধে তাঁর জানা আছে। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ

যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেননা? (সূরা মূল্‌ক, ৬৭ ঃ ১৪)

সৃষ্টির সূচনা

এ আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে সূরা ফুচ্ছিলাতে (হা মীম সাজদাহ)। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِى يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُۥٓ أَندَادًا ۚ ذَٰلِكَ رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَٰسِىَ مِن فَوْقِهَا وَبَـٰرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقْوَٰتَهَا فِىٓ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَآءً لِّلسَّآئِلِينَ. ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَآ أَتَيْنَا طَآئِعِينَ. فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَـٰوَاتٍ فِى

يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا ۚ وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَٰبِيحَ وَحِفْظًا ۚ

ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ

বল ঃ তোমরা কি তাকে অস্বীকার করবেই যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দুই দিনে এবং তোমরা তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে চাও? তিনি তো জগতসমূহের রাব্ব। তিনি স্থাপন করেছেন অটল পর্বতমালা ভূপৃষ্ঠে এবং তাতে রেখেছেন কল্যাণ এবং চার দিনে ব্যবস্থা করেছেন খাদ্যের - সমভাবে, যাঞ্চাকারীদের জন্য। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিল ধূম্রপুঞ্জ বিশেষ। অতঃপর তিনি ওটাকে এবং পৃথিবীকে বললেন ঃ তোমরা উভয়ে এসো স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বলল ঃ আমরা এলাম অনুগত হয়ে। অতঃপর তিনি আকাশমন্ডলীকে দুই দিনে সপ্তাকাশে পরিণত করলেন এবং প্রত্যেক আকাশে উহার বিধান ব্যক্ত করলেন এবং আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং করলাম সুরক্ষিত। এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ৯-১২)

এ আয়াত দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, মহান আল্লাহ প্রথমে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সাতটি আকাশ নির্মাণ করেছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি, অট্টালিকা নির্মাণের এটাই নিয়ম যে, প্রথমে নির্মাণ করা হয় নীচের অংশ এবং পরে উপরের অংশ। মুফাস্সিরগণ এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা ইনশাআল্লাহ এখনই আসছে। কিন্তু এটা বুঝে নেয়া উচিত যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্য স্থানে বলেন ঃ

ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَآءُ ۚ بَنَىٰهَا. رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّىٰهَا. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا

وَأَخْرَجَ ضُحَىٰهَا. وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَىٰهَآ. أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَىٰهَا.

وَٱلْجِبَالَ أَرْسَىٰهَا. مَتَٰعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَٰمِكُمْ

তোমাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, নাকি আকাশ সৃষ্টি? তিনিই এটা নির্মাণ করেছেন। তিনি এটাকে সুউচ্চ ও সুবিন্যস্ত করেছেন। এবং তিনি ওর রাতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন এবং ওর জ্যোতি বিনির্গত করেছেন। এবং পৃথিবীকে এরপর বিস্তৃত করেছেন। তিনি ওটা হতে বহির্গত করেছেন ওর পানি ও তৃণ, আর পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন; এ সবই তোমাদের ও তোমাদের জন্তুগুলির ভোগের জন্য। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ২৭-৩৩) এ আয়াতে আল্লাহ বলেন যে, তিনি আকাশের পরে যমীন সৃষ্টি করেছেন।'

কেহ কেহ বলেছেন যে, পরবর্তী আয়াতটিতে আসমানের সৃষ্টির পরে যমীন বিছিয়ে দেয়া ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে, সৃষ্টি করা নয়। তাহলে ঠিক আছে যে, প্রথমে যমীন সৃষ্টি করেছেন, পরে আসমান। অতঃপর যমীনকে ঠিকভাবে সাজিয়েছেন। এতে আয়াত দু'টি পরস্পর বিরোধী আর থাকলনা। এ দোষ হতে মহান আল্লাহর কালাম সম্পূর্ণ মুক্ত।

আসমানের পূর্বে পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছে

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً *পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন* - এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, আকাশ সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবী সৃষ্টি করেন। ওর থেকে ধূম্রের সৃষ্টি। ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ), ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং আরও কয়েকজন সাহাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলার আরশ পানির উপরে ছিল। এর পূর্বে তিনি কোন কিছু সৃষ্টি করেননি। অতঃপর যখন তিনি অন্যান্য জিনিস সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন তখন তিনি পানি হতে ধূম্র বের করেন এবং সেই ধূম্র উপরে উঠে যায়। তা হতে তিনি আকাশ সৃষ্টি করেন। তারপর পানি শুকিয়ে যায় এবং ওকে তিনি যমীনে পরিণত করেন। এবং পরে পৃথক পৃথকভাবে সাতটি যমীন সৃষ্টি করেন। যমীন কাঁপতে থাকলে আল্লাহ তার উপর পাহাড় স্থাপন করেন, তখন তা থেমে যায়। আল্লাহ তা'আলার এ কথার অর্থ এটাই ঃ 'আমি ভূ-পৃষ্ঠে পর্বতমালা স্থাপন করেছি, যেন তা তাদেরকে নিয়ে টলমল করতে না পারে। পাহাড়, যমীনে উৎপাদিত শস্য এবং যমীনের প্রত্যেকটি জিনিস মঙ্গল ও বুধ এই দু'দিনে সৃষ্টি করেন। এরই বর্ণনা পূর্বে বর্ণিত আয়াতটিতে রয়েছে। অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে ঃ

ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِىَ دُخَانٌ

অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিল ধূম্রপুঞ্জ বিশেষ। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ১১) এরপর বলা হয়েছে ঃ

ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ *অতঃপর তিনি আকাশের প্রতি মনঃসংযোগ করেন, অতঃপর সপ্ত আকাশ সুবিন্যস্ত করেন।* অর্থাৎ এক একটি আকাশের উপর আর একটি আকাশ এবং এক একটি যমীনের নীচে যমীন সৃষ্টি করে মোট সাতটি আকাশ ও সাতটি যমীন সৃষ্টি করেন।

আকাশে তিনি মালাইকাকে সৃষ্টি করেন, যার জ্ঞান তিনি ছাড়া আর কারও নেই। দুনিয়ার আকাশকে তারকারাজি দ্বারা সুশোভিত করেন এবং ওগুলিকে শাইতান হতে নিরাপত্তা লাভের মাধ্যম বানিয়ে দেন। এসব সৃষ্টি করার পর বিশ্বপ্রভু আরশের উপর অধিষ্ঠিত হন। এ আয়াত ঐ আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যা সূরা সাজদায় (৪১ ঃ ১১) বর্ণিত হয়েছে।

জগত সৃষ্টির মোট সময়

তাফসীর ইব্ন জারীরে রয়েছে ঃ আবদুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (রাঃ) বলেন যে, রোববার হতে মাখলূকের সৃষ্টিকাজ আরম্ভ হয়। দু'দিনে সৃষ্টি করা হয় যমীন, দু'দিনে যমীনের সমস্ত জিনিস এবং দু'দিনে আসমান সৃষ্টি করা হয়। শুক্রবারের শেষাংশে আসমানের নির্মাণ কাজ শেষ হয়। ঐ সময়েই আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করা হয় এবং ঐ সময়েই কিয়ামাত সংঘটিত হবে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, মহান আল্লাহ পৃথিবীকে আকাশের পূর্বে সৃষ্টি করেছেন। ওটা হতে যে ধোঁয়া উপরের দিকে উঠেছে তা হতে আকাশ নির্মাণ করেন যা একটির উপর আর একটি এভাবে সাতটি এবং যমীনও একটির নীচে আরেকটি এভাবে সাতটি। এ আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবে জানা যাচ্ছে যে, পৃথিবীকে আকাশের পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন সূরা সাজদাহয় রয়েছে। আলেমগণ এ বিষয়ে একমত। সহীহ বুখারীতে আছে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন যে, যমীন তো আকাশসমূহের পূর্বে সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু বিছানো হয়েছে পরে। (ফাতহুল বারী ৮/৪১৭) সাধারণ আলেমদেরও উত্তর এটাই। অতীতের এবং বর্তমানের অনেক তাফসীরকারক একই রকম বর্ণনা করেছেন যা সূরা নাযি'আত এর তাফসীরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে 'দুহা' শব্দটিরও বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَىٰهَآ. أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَىٰهَا. وَٱلْجِبَالَ أَرْسَىٰهَا

এবং পৃথিবীকে এরপর বিস্তৃত করেছেন। তিনি ওটা হতে বহির্গত করেছেন ওর পানি ও তৃণ, আর পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ৩০-৩২)

কুরআন মাজীদে دَحَىٰهَا শব্দটি আছে এবং এর পরে পানি, চারা, পাহাড় ইত্যাদির বর্ণনা আছে। এ শব্দটির ব্যাখ্যা যেন নিম্নরূপ ঃ মহান আল্লাহ যে যে

জিনিসের বৃদ্ধির ক্ষমতা এই যমীনে রেখেছিলেন, ঐ সবকে প্রকাশ করে দিলেন এবং এর ফলে বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন শ্রেণীর উৎপাদন বেরিয়ে এলো। এভাবেই আকাশেও স্থির ও গতিশীল তারকারাজি ইত্যাদি নির্মাণ করলেন। আল্লাহই অধিক জ্ঞাতা।

৩০। এবং যখন তোমার রাব্ব মালাইকাকে বললেন ঃ নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করব; তারা বলল ঃ আপনি কি যমীনে এমন কেহকে সৃষ্টি করবেন যারা তন্মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত করবে? এবং আমরাই তো আপনার গুণগান করছি এবং আপনারই পবিত্রতা বর্ণনা করে থাকি। তিনি বললেন ঃ তোমরা যা অবগত নও নিশ্চয়ই আমি তা জ্ঞাত আছি।	٣٠. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

আদম-সন্তান বংশ পরম্পরায় পৃথিবীতে বসবাস করছে

মহান আল্লাহর এই অনুগ্রহের কথা চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, তিনি আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করার পূর্বে মালাইকার মধ্যে ওর আলোচনা করেন, যার বর্ণনা এ আয়াতে রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ যেন নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন যে, হে মুহাম্মাদ! তুমি মানব সৃষ্টির ঘটনাটি স্মরণ কর এবং তোমার উম্মাতকে জানিয়ে দাও।

خَلِيْفَةٌ শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে যুগের পর যুগ ধরে পরস্পর স্থলাভিষিক্ত হওয়া। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ ٱلْأَرْضِ

আর তিনি এমন, যিনি তোমাদেরকে দুনিয়ার প্রতিনিধি করেছেন। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১৬৫) অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ

এবং তোমাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন? (সূরা নামল, ২৭ ঃ ৬২)

وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَٰٓئِكَةً فِى ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ

আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের মধ্য হতে মালাইকা/ফেরেশতা সৃষ্টি করতে পারতাম, যারা পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী হত। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৬০) অন্যত্র আল্লাহ বলেন ঃ

فَخَلَفَ مِنۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ

অতঃপর তাদের অযোগ্য উত্তরসুরীরা একের পর এক তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়। (সূরা আ‘রাফ, ৭ ঃ ১৬৯) একটি অপ্রচলিত পঠনে خَلِيْفَةَ খালাইফাহ্ও পড়া হয়েছে। কোন কোন মুফাস্সির বলেন যে, খালীফা শব্দ দ্বারা শুধুমাত্র আদমকে (আঃ) বুঝানো হয়েছে। কিন্তু এটা বিবেচনার বিষয়। ‘তাফসীর রাযী’ প্রভৃতি কিতাবে এই মতভেদ বর্ণনা করা হয়েছে। বাহ্যতঃ জানা যাচ্ছে যে, ভাবার্থ এটা নয়। এর প্রমাণ তো মালাইকার নিম্নের উক্তিটি ঃ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء *আপনি কি যমীনে এমন কেহকে সৃষ্টি করবেন যারা তন্মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করবে।* এটা স্পষ্ট কথা যে, তারা এটা আদমের (আঃ) সন্তানদের সম্পর্কে বলেছিলেন, খাস করে তাঁর সম্পর্কে নয়।

মালাইকা এটা কি করে জেনেছিলেন সেটা অন্য কথা। হয়ত মানব প্রকৃতির চাহিদা লক্ষ্য করেই তাঁরা এটা বলেছিলেন। কেননা এটা বলে দেয়া হয়েছিল যে, তাদেরকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হবে। কিংবা হয়ত ‘খলীফা’ শব্দের ভাবার্থ জেনেই তারা এটা বুঝেছিলেন যে, মানুষ হবে ন্যায় অন্যায়ের ফাইসালাকারী, অনাচারকে প্রতিহতকারী। এবং অবৈধ ও পাপের কাজে বাধাদানকারী। অথবা তারা যমীনের প্রথম সৃষ্টজীবকে দেখেছিলেন বলেই মানুষকেও তাদের মাপকাঠিতে ফেলেছিলেন। এটা মনে রাখা দরকার যে, মালাইকার এই আরয প্রতিবাদমূলক ছিলনা বা তাঁরা যে এটা বানী আদমের প্রতি হিংসার বশবর্তী হয়ে বলেছিলেন তাও নয়। মালাইকার মর্যাদা সম্পর্কে কুরআনে ঘোষণা হয়েছে ঃ ‘যে কথা বলার

তাদের অনুমতি নেই, তাতে তারা মুখ খুলেনা।' (এটাও স্পষ্ট কথা যে, মালাইকার স্বভাব হিংসা হতে পবিত্র) বরং সঠিক ভাবার্থ এই যে তাদের এ প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র এর হিকমাত জানার ও এর রহস্য প্রকাশ করার, যা তাদের বোধশক্তির উর্ধ্বে ছিল। আল্লাহ তো জানতেনই যে, এ শ্রেষ্ঠ জীব বিবাদ ও ঝগড়াটে হবে। কাজেই ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'এ রকম মাখলূক সৃষ্টি করার মধ্যে বিশ্বপ্রভুর কি নিপুণতা রয়েছে? যদি ইবাদাতেরই উদ্দেশে হয় তাহলে ইবাদাত তো আমরাই করছি। আমাদের মুখেই তো সদা তাঁর তাস্‌বীহ ও প্রশংসাগীত উচ্চারিত হচ্ছে এবং আমরা ঝগড়া বিবাদ ইত্যাদি হতেও পবিত্র। তথাপি এরূপ বিবাদী মাখলূক সৃষ্টি করার মধ্যে কি যৌক্তিকতা রয়েছে?'

মহান আল্লাহ তাদের এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, তারা দুনিয়ায় ঝগড়া-বিবাদ, কাটাকাটি, মারামারি ইত্যাদি করবে এই জ্ঞান তাঁর আছে। তথাপি তাদেরকে সৃষ্টি করার মধ্যে যে নিপুণতা ও দূরদর্শিতা রয়েছে তা একমাত্র তিনিই জানেন। তিনি জানেন যে, তাদের মধ্যে নাবী রাসূল; সত্যবাদী, শহীদ, সত্যের উপাসক, ওয়ালী, সৎ, আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী, আলেম, আল্লাহভীরু, প্রভৃতি মহা-মানবদের জন্ম লাভ ঘটবে, যারা তাঁর নির্দেশাবলী যথারীতি মান্য করবে এবং তারা তাঁর বার্তাবাহকদের ডাকে সাড়া দিবে।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আছে যে, দিনের মালাইকা সুবহি সাদিকের সময় আসেন এবং আসরের সময় চলে যান। সে সময় রাতের মালাইকা আগমন করেন, তারা আবার সকালে চলে যান। আগমনকারীগণ যখন আগমন করেন তখন অন্যেরা চলে যান। অতএব তারা ফাজর ও আসরে জনগণকে পেয়ে থাকেন এবং মহান আল্লাহর দরবারে তাঁর প্রশ্নের উত্তরে দুই দলই এ কথা বলেন ঃ 'আমরা যাবার সময় আপনার বান্দাদেরকে সালাতে পেয়ে ছিলাম এবং আসার সময়ও তাদেরকে সালাতে ছেড়ে এসেছি।' (ফাতহুল বারী ১৩/৪২৬) এটাই হল মানব সৃষ্টির যৌক্তিকতা যার সম্বন্ধে মহান আল্লাহ মালাইকাকে বলেছিলেন ঃ 'নিশ্চয় আমি যা জানি তোমরা তা জাননা।' ঐ মালাইকাকে তা দেখার জন্যও পাঠানো হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'দিনের আমলগুলি রাতের পূর্বে এবং রাতের আমলগুলি দিনের পূর্বে আল্লাহর নিকট উঠে যায়।' (মুসলিম ১৭৯) মোট কথা, মানব সৃষ্টির মধ্যে যে ব্যাপক দূরদর্শিতা নিহিত ছিল সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন যে, এটা তাদের 'আমরাই তো আপনার তাস্‌বীহ পাঠ করি' এ কথার উত্তরে বলা হয়েছে যে,

আল্লাহই সব জানেন অর্থাৎ মালাইকা নিজেদের দলের সবাইকে সমান মনে করে থাকে, অথচ প্রকৃতপক্ষে তা নয়। কেননা তাদের মধ্যে ইবলিসও একজন।

খালীফা/প্রতিনিধি নিয়োগ করার বাধ্য-বাধকতা

ইমাম কুরতবী (রহঃ) প্রভৃতি মনীষীগণ এই আয়াত হতে দলীল গ্রহণ করেছেন যে, খলীফা নির্ধারণ করা ওয়াজিব। তিনি মতবিরোধের মীমাংসা করবেন, ঝগড়া বিবাদ মিটিয়ে দিবেন, অত্যাচারী হতে অত্যাচারিত ব্যক্তির প্রতিশোধ নিবেন, 'হুদুদ' কায়েম করবেন, অন্যায় ও পাপের কাজ হতে জনগণকে বিরত রাখবেন ইত্যাদি বড় বড় কাজগুলি যার সমাধান ইমাম ছাড়া হতে পারেনা। এসব কাজ ওয়াজিব এবং এগুলি ইমাম ছাড়া সম্পন্ন হতে পারেনা, আর যা ছাড়া কোন ওয়াজিব সম্পন্ন হয়না ওটাও ওয়াজিব। সুতরাং খালীফা নির্ধারণ করা ওয়াজিব সাব্যস্ত হল।

ইমামতি হয়ত বা কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট শব্দের দ্বারা লাভ করা যাবে। যেমন আহলে সুন্নাতের একটি জামা'আতের আবূ বাকর সিদ্দীক (রাঃ) সম্পর্কে ধারণা এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খিলাফাতের জন্য তাঁর নাম নিয়েছিলেন। কিংবা কুরআন ও হাদীসে ওর দিকে ইঙ্গিত আছে। যেমন আহলে সুন্নাতেরই অপর একটি দলের প্রথম খালীফার ব্যাপারে ধারণা এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইঙ্গিতে খিলাফাতের জন্য তাঁর নাম উল্লেখ করেছিলেন। অথবা হয়ত একজন খলীফা তাঁর পরবর্তী খলীফার নাম বলে যাবেন। যেমন আবূ বাকর (রাঃ) উমারকে (রাঃ) তাঁর স্থলবর্তী করে গিয়েছিলেন। কিংবা তিনি হয়ত সৎলোকদের একটি কমিটি গঠন করে খলীফা নির্বাচনের দায়িত্বভার তাদের উপর অর্পণ করে যাবেন যেমন উমার (রাঃ) এরূপ করেছিলেন। অথবা আহলে হিল্লওয়াল আক্দ (অর্থাৎ প্রভাবশালী সেনাপতিগণ, আলেমগণ, সৎলোকগণ ইত্যাদি) একত্রিতভাবে তার হাতে বাইআত করবেন, তাদের কেহ কেহ বাইআত করে নিলে অধিকাংশের মতে তাকে মেনে নেয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে।

ইমাম হওয়ার জন্য পুরুষ লোক হওয়া, আযাদ হওয়া, বালিগ হওয়া, বিবেক সম্পন্ন হওয়া, মুসলিম হওয়া, সুবিচারক হওয়া, ধর্ম বিষয়ে অভিজ্ঞ হওয়া, যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী হওয়া, সাধারণ অভিমত সম্পর্কে অভিজ্ঞ হওয়া এবং কুরাইশী হওয়া ওয়াজিব।

তবে হ্যাঁ, হাশিমী হওয়া ও দোষমুক্ত হওয়া শর্ত নয়। গালী রাফেযী এ শর্ত দু'টি আরোপ করে থাকে। ইমাম যদি ফাসিক হয়ে যায় তাহলে তাকে পদচ্যুত করা উচিত কিনা এ বিষয়ে মতভেদ আছে। সঠিক মত এই যে, তাকে পদচ্যুত করা হবেনা। কেননা হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যে পর্যন্ত না তোমরা এমন খোলাখুলি কুফরী লক্ষ্য কর যার কুফরী হওয়ার প্রকাশ্য দলীল আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদের নিকট বিদ্যমান থাকে।' (বুখারী ৭০৫৬, তাবারী ১/৪৭৭) অনুরূপভাবে ইমাম নিজেই পদত্যাগ করতে পারে কিনা সে বিষয়েও মতবিরোধ রয়েছে। হাসান ইব্ন আলী (রাঃ) নিজে নিজেই পদত্যাগ করেছিলেন এবং ইমামের দায়িত্ব মু'আবিয়াকে (রাঃ) অর্পণ করেছিলেন। কিন্তু এটা ওজরের কারণে ছিল এবং যার জন্য তার প্রশংসা করা হয়েছে। ভূ-পৃষ্ঠে একাধিক ইমাম একই সময়ে হতে পারেনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যখন তোমাদের মধ্যে কোন কাজ সম্মিলিতভাবে হতে যাচ্ছে এমন সময় কেহ যদি বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে তাহলে তাকে হত্যা কর, সে যে কেহই হোক না কেন।' (মুসলিম ৩/১৪৭০) জমহুরের এটাই মাযহাব এবং বহু বিজ্ঞজনও এর উপর ইজমা নকল করেছেন, যাদের মধ্যে ইমামুল হারামাইনও (রহঃ) একজন।

৩১। এবং তিনি আদমকে সমস্ত নাম শিক্ষা দিলেন, অনন্তর তৎসমূদয় মালাইকার সামনে উপস্থাপিত করলেন, অতঃপর বললেন ঃ যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে আমাকে এ সব বস্তুর নামসমূহ বর্ণনা কর।	٣١. وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنۢبِـُٔونِى بِأَسْمَآءِ هَٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ
৩২। তারা বলেছিল ঃ আপনি পরম পবিত্র! আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তদ্ব্যতীত আমাদের	٣٢. قَالُوا۟ سُبْحَٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ

ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡحَكِيمُ	কোনই জ্ঞান নেই, নিশ্চয়ই আপনি মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।
٣٣. قَالَ يَـٰٓـَٔادَمُ أَنۢبِئۡهُم بِأَسۡمَآئِهِمۡۖ فَلَمَّآ أَنۢبَأَهُم بِأَسۡمَآئِهِمۡ قَالَ أَلَمۡ أَقُل لَّكُمۡ إِنِّيٓ أَعۡلَمُ غَيۡبَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَأَعۡلَمُ مَا تُبۡدُونَ وَمَا كُنتُمۡ تَكۡتُمُونَ	৩৩। তিনি বলেছিলেন ঃ হে আদম! তুমি তাদেরকে ঐ সকলের নামসমূহ বর্ণনা কর; অতঃপর যখন সে তাদেরকে ঐগুলির নামসমূহ বলেছিল তখন তিনি বলেছিলেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, নিশ্চয়ই আমি আসমান ও যমীনের অদৃশ্য বিষয় অবগত আছি এবং তোমরা যা প্রকাশ কর ও যা গোপন কর আমি তাও পরিজ্ঞাত আছি?

মালাইকার উপরে আদমের (আঃ) সম্মান

এখানে এ কথারই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ তা‘আলা একটা বিশেষ জ্ঞানে আদমকে (আঃ) মালাইকার উপর মর্যাদা দান করেছেন।

এটা মালাইকার আদমকে (আঃ) সাজদাহ করার পরের ঘটনা। কিন্ত তাঁকে সৃষ্টি করার মধ্যে মহান আল্লাহর যে হিকমাত নিহিত ছিল এবং যা মালাইকা জানতেননা, তার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হওয়ার কারণে এ ঘটনাকেই পূর্বে বর্ণনা করেছেন এবং মালাইকার সাজদাহ করার ঘটনা, যা পূর্বে ঘটেছিল তা পরে বর্ণনা করেছেন, যেন খলীফা সৃষ্টি করার যৌক্তিকতা ও নিপুণতা প্রকাশ পায় এবং জানা যায় যে, আদমের (আঃ) মর্যাদা ও সম্মান লাভ হয়েছে এমন এক বিদ্যার কারণে যে বিদ্যা মালাইকার নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন যে, তিনি আদমকে (আঃ) সমুদয় বস্তুর নাম শিখিয়ে দেন, অর্থাৎ তাঁর সন্তানদের নাম, সমস্ত জীব জন্তুর নাম, যমীন, আসমান, পাহাড় পর্বত, নৌ-স্থল, ঘোড়া, গাধা, বরতন, পশু-পাখী, মালাক/ফেরেশতা ও তারকারাজি ইত্যাদি সমুদয় ছোট বড় জিনিসের নাম। (তাবারী ১/৪৫৮)

আল্লাহ তা'আলা আদমকে (আঃ) সমস্ত জিনিসের নামই শিখিয়েছিলেন। প্রজাতিগত নাম, গুণগত নাম এবং ক্রিয়াগত নামও শিখিয়েছিলেন। ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) এবং ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আসীম ইব্‌ন কুরাইব (রহঃ) সা'দ ইব্‌ন মা'বাদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইব্‌ন আব্বাসকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা হল ঃ আল্লাহ কি তাকে (আদম আঃ) বিভিন্ন পাত্রের কথা শিখিয়েছিলেন? তিনি উত্তরে বললেন ঃ হ্যাঁ, এমনকি কিভাবে বায়ু ত্যাগ করতে হবে। (তাবারী ১/৪৭৫)

একটি সুদীর্ঘ হাদীস

এ আয়াতের তাফসীরে ইমাম বুখারী (রহঃ) এ হাদীসটি এনেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'কিয়ামাতের দিন ঈমানদারগণ একত্রিত হয়ে বলবে, 'আমরা যদি কোন একজনকে সুপারিশকারীরূপে আল্লাহর নিকট পাঠাতাম তাহলে কতই না ভাল হত।' সুতরাং তারা সবাই মিলে আদমের (আঃ) নিকট আসবে এবং তাঁকে বলবে, 'আপনি আমাদের সবারই পিতা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আপনাকে স্বহস্তে সৃষ্টি করেছেন, স্বীয় মালাইকার দ্বারা আপনাকে সাজদাহ করিয়েছেন, আপনাকে সব জিনিসের নাম শিখিয়েছেন। সুতরাং আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করুন যেন আমরা আমাদের এই স্থানে শান্তি লাভ করতে পারি।' এ কথা শুনে তিনি উত্তরে বলবেন ঃ 'আমার এ যোগ্যতা নেই।' তাঁর স্বীয় পাপের কথা স্মরণ হয়ে যাবে, সুতরাং তিনি লজ্জিত হবেন। তিনি বলবেন ঃ 'তোমরা নূহের (আঃ) কাছে যাও। তিনি প্রথম রাসূল যাঁকে আল্লাহ পৃথিবীবাসীর নিকট পাঠিয়েছিলেন।' তারা এ উত্তর শুনে নূহের (আঃ) নিকট আসবে। তিনিও এ উত্তরই দিবেন এবং আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বীয় পুত্রের জন্য প্রার্থনার কথা স্মরণ করে তিনি লজ্জিত হবেন এবং বলবেন ঃ 'তোমরা রাহমানের (আল্লাহর) বন্ধু ইবরাহীমের (আঃ) নিকট যাও।' তারা সবাই তাঁর কাছে আসবে, কিন্তু এখানেও ঐ উত্তরই পাবে। তিনি বলবেন ঃ 'তোমরা মূসার (আঃ) কাছে যাও, তাঁর সাথে আল্লাহ তা'আলা কথা বলেছিলেন এবং তাঁকে তাওরাত দান করেছিলেন।' এ কথা শুনে সবাই মূসার (আঃ) নিকট আসবে এবং তাঁর নিকট এ প্রার্থনাই জানাবে। কিন্তু এখানেও একই উত্তর পাবে। প্রতিশোধ গ্রহণ ছাড়াই একটি লোককে মেরে ফেলার কথা তাঁর স্মরণ হবে এবং তিনি লজ্জাবোধ করবেন ও বলবেন ঃ 'তোমরা ঈসার (আঃ) কাছে যাও। তিনি আল্লাহর বান্দা, তাঁর রাসূল, তাঁর কালেমা এবং তাঁর রূহ্।' এরা সবাই এখানে

আসবে, কিন্তু এখানেও ঐ উত্তরই পাবে। তিনি বলবেন ঃ 'তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট যাও। তাঁর পূর্বের ও পরের সমস্ত পাপ মার্জনা করা হয়েছে।' তারা সবাই আমার নিকট আসবে। আমি অগ্রসর হব। আমার প্রভুকে দেখা মাত্রই আমি সাজদাহয় পড়ে যাব। যে পর্যন্ত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে মঞ্জুর না হবে ততক্ষণ আমি সাজদাহয় পড়েই থাকব। অতঃপর আল্লাহ বলবেন ঃ 'মাথা উঠাও, যাঞ্চা কর দেয়া হবে; বল, শোনা হবে এবং সুপারিশ কর, গ্রহণ করা হবে।' তখন আমি আমার মাথা উত্তোলন করব এবং আল্লাহর প্রশংসা করব যা তিনি আমাকে ঐ সময়েই শিখিয়ে দিবেন। অতঃপর আমি সুপারিশ করব। আমার জন্য সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হবে। তাদেরকে আমি জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে পুনরায় তাঁর নিকট ফিরে আসব। আবার আমার রাব্বকে দেখে এ রকমই সাজদাহয় পড়ে যাব। পুনরায় সুপারিশ করব। আমার জন্য সীমা নির্ধারিত হবে। তাদেরকেও জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে তৃতীয়বার আসব। আবার চতুর্থবার আসব। শেষ পর্যন্ত জাহান্নামে শুধুমাত্র ওরাই থাকবে যাদেরকে কুরআন মাজীদ বন্দী রেখেছে এবং যাদের জন্য জাহান্নামে চির অবস্থান ওয়াজিব হয়ে গেছে (অর্থাৎ মুশরিক ও কাফির)।' সহীহ মুসলিম, সুনান নাসাঈ, সুনান ইব্ন মাজাহ ইত্যাদি গ্রন্থে শাফা'আতের এই হাদীসটি বিদ্যমান রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/১০, মুসলিম ১/১৮১, নাসাঈ ৬/২৮৪, ৩৬৪; ইব্ন মাজাহ ২/১৪৪২)

এখানে এই হাদীসটি আনার উদ্দেশ্য এই যে, এই হাদীসটিতে এ কথাটিও আছে ঃ লোকেরা আদমকে (আঃ) বলবে 'আল্লাহ আপনাকে সব জিনিষের নাম শিখিয়েছেন।' অতঃপর ঐ জিনিষগুলি মালাইকার সামনে পেশ করেন এবং তাদেরকে বলেন, 'তোমরা যদি তোমাদের এ কথায় সত্যবাদী হও যে, সমস্ত মাখলূক অপেক্ষা তোমরাই বেশি জ্ঞানী বা এ কথাই সঠিক যে, যমীনে আল্লাহ খলীফা বানাবেননা তাহলে এসব জিনিসের নাম বল। এটাও বর্ণিত আছে যে, যদি তোমরা এ কথায় সত্যবাদী হও যে, 'বানী আদম বিবাদ বিসম্বাদ ও রক্তারক্তি করবে' তাহলে এ গুলোর নাম বল। কিন্তু প্রথমটিই বেশি সঠিক মত। যেন এতে এ ধমক রয়েছে যে, আচ্ছা! তোমরা যে বলছ 'যমীনে খলীফা হওয়ার যোগ্য আমরাই, মানুষ নয়,' যদি তোমরা এতে সত্যবাদী হও তাহলে যেসব জিনিষ তোমাদের সামনে বিদ্যমান রয়েছে সেগুলির নাম বলতো? আর যদি তোমরা তা বলতে না পার তাহলে তোমাদের এটা বুঝে নেয়া উচিত যে, যা

তোমাদের সামনে বিদ্যমান রয়েছে সেগুলির নামইতো তোমরা বলতে পারলেনা, তাহলে ভবিষ্যতে আগত জিনিষের জ্ঞান তোমাদের কিরূপে হতে পারে?

মালাইকা ইহা শোনা মাত্রই আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করতে এবং তাদের জ্ঞানের স্বল্পতা বর্ণনা করতে আরম্ভ করে বললেন যে, হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে যতটুকু শিখিয়েছেন, আমরা ততটুকুই জানি। সমস্ত জিনিসকে পরিবেষ্টনকারী জ্ঞান তো একমাত্র আপনারই আছে। আপনিই সমুদয় জিনিসের সংবাদ রাখেন। আপনার সমুদয় আদেশ-নিষেধ হিকমাতে পরিপূর্ণ। যাকে কিছু শিখিয়ে দেন তাও হিকমাত এবং যাকে শিক্ষা হতে বঞ্চিত রাখেন তাও হিকমাত। আপনি মহা প্রজ্ঞাময় ও ন্যায় বিচারক।

'সুবহানাল্লাহ' এর অর্থ

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, 'সুবহানাল্লাহ' এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর পবিত্রতা, অর্থাৎ তিনি সমস্ত অশ্লীলতা থেকে পবিত্র। উমার (রাঃ) একদা আলী (রাঃ) এবং তাঁর পাশে উপবিষ্ট অন্য কয়েকজন সাহাবীকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ 'আমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তো জানি, কিন্তু 'সুবহানাল্লাহ' কি কালেমা?' আলী (রাঃ) উত্তরে বলেন ঃ 'এ কালেমাটি মহান আল্লাহ নিজের জন্য পছন্দ করেন এবং এতে তিনি খুব খুশি হন, আর এটা বলা তাঁর নিকট খুবই প্রিয়।' মাইমুন ইব্ন মাহরান (রহঃ) বলেন যে, ওতে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব এবং সমস্ত অশ্লীলতা হতে পবিত্র হওয়ার বর্ণনা রয়েছে।

আদমের (আঃ) জ্ঞানের পরিচয় প্রদান

আল্লাহ তা'আলা বলেন, قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ *হে আদম! তুমি তাদেরকে ঐ সকলের নামসমূহ বর্ণনা কর; অতঃপর যখন সে তাদেরকে ঐগুলির নামসমূহ বলেছিল তখন তিনি বলেছিলেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, নিশ্চয়ই আমি আসমান ও যমীনের অদৃশ্য বিষয় অবগত আছি এবং তোমরা যা প্রকাশ কর ও যা গোপন কর আমি তাও পরিজ্ঞাত আছি?*

আদম (আঃ) এভাবে নাম বলেছেন ঃ আপনার নাম জিবরাইল (আঃ), আপনার নাম মিকাঈল (আঃ), আপনার নাম ইসরাফীল (আঃ) এমন কি তাঁকে চিল, কাক ইত্যাদি সব কিছুর নাম জিজ্ঞেস করা হলে তিনি সবই বলে দেন। (ইব্ন আবী হাতিম ১/১১৮, ১১৯) মালাইকা যখন আদমের (আঃ) মর্যাদার কথা বুঝতে পারলেন তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদেরকে বললেন ঃ 'দেখ, আমি তোমাদেরকে পূর্বেই বলেছিলাম যে, আমি প্রত্যেক প্রকাশ্য ও গোপনীয় বিষয় জানি।' যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى

তুমি যদি উচ্চ কণ্ঠে বল, তিনি তো যা গুপ্ত ও অব্যক্ত সবই জানেন। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৭) আরেক জায়গায় আছে ঃ

أَلَّا يَسْجُدُوا۟ لِلَّهِ ٱلَّذِى يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ

তারা নিবৃত্ত রয়েছে আল্লাহকে সাজদাহ করা হতে, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর লুকায়িত বস্তুকে প্রকাশ করেন, এবং যিনি জানেন যা তোমরা গোপন কর এবং যা তোমরা প্রকাশ কর। আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। তিনি মহাআরশের অধিপতি। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ২৫-২৬)

আরও বলা হয়েছে ঃ তোমরা যা প্রকাশ কর এবং যা গোপন রাখ আমি তা জানি। ভাবার্থ এই যে, ইবলীসের অন্তরে যে ফখর ও অহংকার লুকায়িত ছিল আল্লাহ তা জানতেন। আর মালাইকা যা বলেছিলেন তাতো ছিল প্রকাশ্য কথা। তাহলে আল্লাহ তা'আলা যে বললেন ঃ 'তোমরা যা প্রকাশ কর এবং যা গোপন রাখ, আমি সবই জানি' এর অর্থ দাঁড়ালো এই যে, মালাইকা যা প্রকাশ করেছিলেন তা আল্লাহ জানেন এবং ইবলীস তার অন্তরে যা গোপন রেখেছিল সেটাও তিনি জানতেন। (তাবারী ১/৪৯৮) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) এবং আরও কয়েকজন সাহাবী (রাঃ) ও সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ) এবং সাওরীরও (রহঃ) এটাই অভিমত। ইব্ন জারীরও (রহঃ) এটাকে পছন্দ করেছেন। আবুল আলীয়া (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহ্‌র (রহঃ) কথা এই যে, মালাইকার গোপনীয় কথা ছিল ঃ যে মাখলূকই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সৃষ্টি করুন না কেন, আমরাই তাদের চেয়ে বেশি জ্ঞানী ও মর্যাদাবান

হব।’ কিন্তু পরে এটা প্রমাণিত হয়ে গেল এবং তারাও জানতে পারলেন যে, জ্ঞান ও মর্যাদা দু’টিতেই আদম (আঃ) তাদের উপর প্রাধান্য লাভ করেছেন।

৩৪। এবং যখন আমি মালাইকাকে বলেছিলাম যে, তোমরা আদমকে সাজদাহ কর, তখন ইবলিস ব্যতীত সকলে সাজদাহ করেছিল; সে অগ্রাহ্য করল ও অহংকার করল এবং কাফিরদের অন্ত ভুক্ত হয়ে গেল।	٣٤. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ

মালাইকার সাজদাহ দ্বারা আদমকে (আঃ) মর্যাদা দান

আল্লাহ তা‘আলা আদমের (আঃ) এই বড় মর্যাদার কথা বর্ণনা করে মানুষের উপর তাঁর বড় অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করেছেন এবং তাদেরকে আদমের (আঃ) সামনে মালাইকাকে সাজদাহ করার নির্দেশ দেয়ার সংবাদ দিয়েছেন। আদমের (আঃ) সম্মানে আল্লাহ তা‘আলা মালাইকাকে সাজদাহ করতে বললে ইবলিস/শাইতান ছাড়া সবাই সাজদাহ করে। সে ছিল জীন জাতির অন্তর্ভুক্ত।

إِلَّآ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِۦٓ

সে জিনদের একজন, সে তার রবের আদেশ অমান্য করল। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৫০)

এর প্রমাণ স্বরূপ বহু হাদীসও রয়েছে। একটি তো শাফা‘য়াতের হাদীস যা একটু আগেই বর্ণিত হল। একটি হাদীসে আছে যে, মূসা (আঃ) আল্লাহ তা‘আলার নিকট প্রার্থনা জানিয়ে বলেন ঃ ‘আমাকে আদমের (আঃ) সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দিন যিনি নিজেও জান্নাত হতে বের হয়েছিলেন এবং আমাদেরকেও বের করেছিলেন।’ দুই নাবী একত্রিত হলে মূসা (আঃ) তাঁকে বলেন ঃ ‘আপনি কি সেই আদম (আঃ) যাকে আল্লাহ স্বহস্তে সৃষ্টি করেছেন, স্বীয় রূহ তাঁর মধ্যে ফুঁকেছেন এবং তাঁর সামনে মালাইকাকে সাজদাহ করিয়েছেন।’ (আবূ দাঊদ ৫/২৮) পূর্ণ হাদীস ইনশাআল্লাহ অতি সত্বরই বর্ণিত হবে।

আদমকে (আঃ) সাজদাহ করতে বলা হয়েছিল, যদিও তিনি মালাক/ফেরেশতা ছিলেননা

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ইবলীস মালাইকার একটি গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল যাদেরকে জীন বলা হয়। তারা অগ্নিশিখা হতে সৃষ্ট ছিল।

হাকিম (রহঃ) তার 'মুসতাদরাক' গ্রন্থে এরূপ বহু বর্ণনা এনেছেন এবং ওগুলির সনদকে বুখারীর (রহঃ) শর্তের উপর সহীহ বলেছেন। ভাবার্থ এই যে, যখন আল্লাহ তা'আলা মালাইকাকে বললেন ঃ 'তোমরা আদমকে (আঃ) সাজদাহ কর।' ইবলীসও এই সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেননা যদিও সে তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা, কিন্তু সে তাদের মতই ছিল এবং তাদের মতই কাজ করত। সুতরাং সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত সেও ছিল। আর এজন্যই অমান্য করার শাস্তি তাকে ভোগ করতে হয়েছে। এর ব্যাখ্যা ইনশাআল্লাহ كَانَ مِنَ الْجِنِّ এর তাফসীরে আসবে।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, সে অবাধ্যতার পূর্বে যে মালাইকার মধ্যে ছিল, তার নাম আযাযীল। ভূ-পৃষ্ঠে ছিল তার বাসস্থান। বিদ্যা ও জ্ঞানে সে খুব বড় ছিল। এ জন্যই তার মস্তিষ্ক অহংকারে ভরপুর ছিল। তার ও তার দলের সম্পর্ক ছিল জীনদের সঙ্গে। (তাবারী ১/৫০২)

আল্লাহরই জন্য ছিল আনুগত্য, আদমকে (আঃ) সাজদাহ করার মাধ্যমে

সাজদাহ করার নির্দেশ পালন ছিল আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার ও আদমের (আঃ) প্রতি সম্মান প্রদর্শন। আল্লাহ তা'আলা আদমকে (আঃ) সম্মানিত করেছিলেন এবং মালাইকাকে আদমকে (আঃ) তাঁর সামনে সাজদাহ করতে আদেশ করেন। (তাবারী ১/৫১২) কেহ কেহ বলেন যে, এই সাজদাহ ছিল অভিনন্দন, শান্তি স্থাপন এবং সম্মান প্রদর্শনমূলক। যেমন নাবী ইউসুফের (আঃ) ব্যাপারে রয়েছে যে, তিনি তার পিতাকে সিংহাসনে বসিয়ে দেন এবং সবাই সাজদাহয় পড়ে যায়। তখন ইউসুফ (আঃ) বলেন ঃ

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُۥ سُجَّدًا ۖ وَقَالَ يَـٰٓأَبَتِ هَـٰذَا تَأْوِيلُ
رُءْيَـٰىَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّى حَقًّا

হে পিতা! এটাই আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা যা আমার রাব্ব সত্যরূপে দেখিয়েছেন। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০০) পূর্ববর্তী উম্মাতদের জন্য সাজদাহ বৈধ ছিল, কিন্তু আমাদের ধর্মে এটা রহিত হয়ে গেছে। মু'আয (রাঃ) বলেন ঃ 'আমি সিরিয়াবাসীকে তাদের নেতৃবর্গ এবং আলেমদের সামনে সাজদাহ করতে দেখেছিলাম। অতএব আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলি ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি সাজদাহ পাবার বেশি হকদার।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

আমি যদি কোন মানুষকে কোন মানুষের সামনে সাজদাহ করার অনুমতি দিতে পারতাম তাহলে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম যে, সে যেন তার স্বামীকে সাজদাহ করে। কেননা তার উপর তার (স্বামীর) শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। (তিরমিযী ১১০৯, মাজমাউয যাওয়ায়িদ ৪/৩১০)

আল রাযীও (রহঃ) এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহর দুশমন ইবলিসের আদমকে (আঃ) হিংসা করার কারণ ছিল আদমকে (আঃ) আল্লাহর মর্যাদা প্রদান। ইবলিস বলেছিল ঃ আমি আগুন থেকে সৃষ্টি, আর আদমকে তৈরী করা হয়েছে মাটি থেকে। অতএব ইবলিসের প্রথম ভুল ছিল তার ঔদ্ধত্যতা, যে কারণে আল্লাহর শত্রু ইবলিস আদমকে (আঃ) সাজদাহ করতে অস্বীকার করেছিল। আমরা লক্ষ্য করলে পরবর্তী হাদীসে দেখতে পাব। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এই অহংকারের পাপই ছিল সর্বপ্রথম পাপ যা আদমকে (আঃ) সাজদাহ করা হতে ইবলীসকে বিরত রেখেছিল। (ইব্ন আবী হাতিম ১/১২৩) বিশুদ্ধ হাদীসে আছে ঃ

যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবেনা। (মুসলিম ১/৯৩) এই অহংকার, কুফর এবং অবাধ্যতার কারণেই ইবলীসের গলদেশে অভিসম্পাতের গলাবন্ধ লেগে গেছে এবং মহান আল্লাহর রাহমাত হতে নিরাশ হয়ে তাঁর দরবার হতে বিতাড়িত হয়েছে।

৩৫। এবং আমি বললাম ঃ হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে অবস্থান কর এবং তা হতে যা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার কর; কিন্তু ঐ বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়োনা, তাহলে	٣٥. وَقُلْنَا يَٰٓـَٔادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا

حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَـٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ	তোমরা অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।
٣٦. فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَـٰنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا ٱهْبِطُوا۟ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ وَلَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَـٰعٌ إِلَىٰ حِينٍ	৩৬। অনন্তর শাইতান তাদের উভয়কে তথা হতে বিচ্যুত করল, অতঃপর তারা উভয়ে যেখানে ছিল তথা হতে তাদেরকে বর্হিগত করল; এবং আমি বললাম ঃ তোমরা নীচে নেমে যাও, তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু; এবং পৃথিবীতেই রয়েছে তোমাদের জন্য এক নির্দিষ্ট কালের অবস্থিতি ও ভোগ সম্পদ।

আদমকে (আঃ) পুনরায় সম্মানিত করা হয়

আদমের (আঃ) এটি অনন্য মর্যাদা ও সম্মানের বর্ণনা। মালাইকাকে দ্বারা সাজদাহ করানোর পর আল্লাহ তা'আলা তাঁদের স্বামী-স্ত্রীকে জান্নাতে স্থান দিলেন এবং সব জিনিসের উপর অধিকার দিয়ে দিলেন। তাফসীর ইব্ন মিরদুওয়াই এর হাদীসে রয়েছে যে, আবূ যার (রাঃ) একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আদম (আঃ) কি নাবী ছিলেন?' তিনি বলেন ঃ 'তিনি নাবীও ছিলেন এবং রাসূলও ছিলেন। এমন কি আল্লাহ তা'আলা তাঁর সামনে কথাবার্তা বলেছেন এবং তাঁকে বলেছেন, 'তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে অবস্থান কর।'

আদমের (আঃ) জান্নাতে প্রবেশের পূর্বেই হাওয়াকে (আঃ) সৃষ্টি করা হয়

কুরআনুল হাকীমের বাকরীতি দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, জান্নাতে অবস্থানের পূর্বে হাওয়াকে (আঃ) সৃষ্টি করা হয়েছিল। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে,

আহলে কিতাব ইত্যাদি আলেমগণ হতে ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) বর্ণনা অনুসারে জানা যাচ্ছে যে, ইবলীসকে ধমক ও ভীতি প্রদর্শনের পর আদমের (আঃ) জ্ঞান প্রকাশ করে তাঁর উপর তন্দ্রা চাপিয়ে দেন। অতঃপর তাঁর বাম পাঁজর হতে হাওয়াকে (আঃ) সৃষ্টি করেন। চোখ খোলামাত্র আদম (আঃ) তাঁকে দেখতে পান এবং রক্ত ও গোশতের কারণে অন্তরে তাঁর প্রতি প্রেম ও ভালবাসার সৃষ্টি হয়। অতঃপর বিশ্বপ্রভু উভয়কে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন এবং জান্নাতে বাস করার নির্দেশ দেন। আল্লাহ বলেন ঃ *আমি বললাম ঃ হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে অবস্থান কর এবং তা হতে যা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার কর; কিন্তু ঐ বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়োনা, তাহলে তোমরা অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।* (তাবারী ১/৫১৪)

আল্লাহ আদমকে (আঃ) পরীক্ষা করলেন

আল্লাহ তা'আলা আদমকে (আঃ) বলেন ঃ 'হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতের মধ্যে সুখে স্বাচ্ছন্দে অবস্থান কর এবং মনে যা ইচ্ছা তা খাও ও পান কর, আর এই বৃক্ষের নিকট যেওনা।''

এই বিশেষ বৃক্ষ হতে নিষেধ করা একটা পরীক্ষা ছিল। কেহ কেহ বলেন যে, এটা আঙ্গুর গাছ ছিল। আবার কেহ বলেন যে, এটা ছিল গমের গাছ। কেহ বলেছেন শীষ, কেহ বলেছেন খেজুর এবং কেহ কেহ ডুমুরও বলেছেন। ঐ গাছের ফল খেয়ে মানবীয় প্রয়োজন (পায়খানা-প্রস্রাব) দেখা দিত এবং ওটা জান্নাতের যোগ্য নয়। কেহ কেহ বলেন যে, ঐ গাছের ফল খেয়ে মালাইকা চিরজীবন লাভ করতেন। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, ওটা কোন একটি গাছ ছিল যা থেকে খেতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিষেধ করেছিলেন। ওটা যে কোন নির্দিষ্ট গাছ ছিল তা কুরআন কারীম বা কোন সহীহ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়না। তাছাড়া এ ব্যাপারে মুফাস্সিরগণের মধ্যে খুবই মতভেদ রয়েছে। এটা জানলেও আমাদের কোন লাভ নেই এবং না জানলেও কোন ক্ষতি নেই। সুতরাং এ জন্য মাথা ঘামানোর প্রয়োজনই বা কি? মহান আল্লাহই এটা খুব ভাল জানেন। (তাবারী ১/৫২০) ইমাম রাযীও (রহঃ) এই ফাইসালাই দিয়েছেন। এবং সঠিক কথাও এটাই বটে।

عَنْهَا এর هَا সর্বনামটি কেহ কেহ جَنَّت এর দিকে ফিরিয়েছেন, আবার কেহ কেহ شَجَرَ এর দিকে ফিরিয়েছেন। একটি কিরা'আতে فَاَزَلَّهُمَا এরূপও রয়েছে। তবে অর্থ হবে ঃ 'শাইতান তাদের দু'জনকে জান্নাত হতে পৃথক করে দেয়।' আর

দ্বিতীয়টির অর্থ হবে ঃ ‘ঐ গাছের কারণেই শাইতান তাদের দু’জনকে ভুলিয়ে দেয়।’ عَنْ শব্দটি سَبَب এর কারণেও এসে থাকে। যেমন يُؤْفَكُ عَنْهُ এর মধ্যে এসেছে। ঐ অবাধ্যতার কারণে তাঁদের জান্নাতী পোশাক, সেই পবিত্র স্থান, ঐ উত্তম আহার্য ইত্যাদি সব কিছুই ছিনিয়ে নেয়া হয় এবং তাদের বলা হয় ঃ ‘এখন পৃথিবীতেই তোমাদের আহার্য ইত্যাদি রয়েছে। কিয়ামাত পর্যন্ত তোমরা সেখানেই পড়ে থাকবে এবং সেখানে উপকার লাভ করবে।’

আদম (আঃ) ছিলেন অনেক লম্বা

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) উবাই ইব্ন কা‘ব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা‘আলা আদমকে (আঃ) অনেক লম্বা করে সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর চুল ছিল ঝাকরা ঘন যেন খেঁজুর গাছের ছড়ানো শাখা। আদম (আঃ) যখন নিষিদ্ধ গাছ থেকে আহার করলেন তখন তাঁর শরীর বস্ত্রমুক্ত হয়ে যায় এবং শরীরের আবৃত অংশ দৃষ্টিগোচর হয়ে পড়ে। তিনি তা লক্ষ্য করে জান্নাতের দিকে দৌড়াতে শুরু করেন। কিন্তু তাঁর চুল একটি গাছের সাথে আটকে যায়। তিনি তা থেকে মুক্ত হতে চেষ্টা করেন। তখন আল্লাহ আর-রাহমান তাঁকে ডাক দিয়ে বলেন ঃ ওহে আদম! তুমি কি আমার থেকে পালিয়ে যাচ্ছ? আর-রাহমানের (আল্লাহ) বাণী শুনে আদম (আঃ) বললেন ঃ হে আমার রাব্ব! তা নয়, বরং আমি লজ্জিত। (ইব্ন আবী হাতিম ১/১২৯)

আদম (আঃ) মাত্র এক ঘন্টা জান্নাতে ছিলেন

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আদম (আঃ) আসরের পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জান্নাতে ছিলেন। (হাকিম ২/৫৪২) ইব্ন আবী হাতিমও (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ তা‘আলা আদমকে (আঃ) পৃথিবীতে প্রেরণ করেন মাক্কা এবং তায়েফের মধ্যবর্তী স্থান ‘দাহনা’ নামক জায়গায়। (ইব্ন আবী হাতিম ১/১৩১) হাসান বাসরী (রহঃ) বলেছেন ঃ আদমকে (আঃ) প্রেরণ করা হয়েছিল ভারতে এবং তাঁর স্ত্রী হাওয়াকে (আঃ) প্রেরণ করা হয়েছিল জিদ্দা নগরীতে। ইবলিসকে পাঠানো হয়েছিল ‘দাস্তামিসান’ নামক স্থানে যা বাসরা থেকে কয়েক মাইল দূরে। এ ছাড়া সাপকে পাঠানো হয়েছিল ‘আসবাহানে’। (ইব্ন আবী হাতিম ১/১৩২)

Contents

সহীহ মুসলিম ও নাসাঈতে আছে যে, সমস্ত দিনের মধ্যে সর্বোত্তম দিন হচ্ছে শুক্রবার। ঐ দিনই আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করা হয়, ঐ দিনই জান্নাতে প্রবেশ করানো হয় এবং ঐ দিনই জান্নাত হতে বের করে দেয়া হয়। (মুসলিম ২/৫৮৫, নাসাঈ ৩/৯০)

একটি সন্দেহের নিরসন

যদি কেহ প্রশ্ন করেন যে, আদম (আঃ) যখন আসমানী জান্নাতে ছিলেন, তখন শাইতান আল্লাহর দরবার হতে বিতাড়িত হয়েছিল। তাহলে আবার সেখানে কিভাবে পৌঁছল? এর প্রথম উত্তর তো এই হবে যে, ঐ জান্নাত যমীনে ছিলনা। এ ছাড়া অধিকাংশ আলেমের মতামত এই যে, সম্মানিত অবস্থায়ও শাইতানের জান্নাতে প্রবেশ করায় নিষেধ ছিল। কিন্তু কখনও কখনও সে চুরি করে জান্নাতে প্রবেশ করত, যেহেতু তাওরাতে আছে যে, সে সাপের মুখে আড়াল করে বসে জান্নাতে গিয়েছিল। এও একটি উত্তর যে, সে জান্নাতে যায়নি, বরং চলতি পথে জান্নাতের বাহির থেকেই কুমন্ত্রণা দিয়েছিল। আবার জামাখশারী (রহঃ) বলেন যে, যমীনে থেকেই সে তাঁর অন্তরে কুমন্ত্রণা দিয়েছিল। কুরতুবী (রহঃ) এখানে সর্প সম্পর্কীয় এবং তাকে মেরে ফেলার হুকুমের হাদীসগুলিও এনেছেন, যা খুবই উত্তম ও উপকারী হয়েছে।

৩৭। অতঃপর আদম স্বীয় রাব্ব হতে কতিপয় বাণী শিক্ষা লাভ করল, আল্লাহ তখন তার প্রতি কৃপা দৃষ্টি দিলেন; নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, করুণাময়!	٣٧. فَتَلَقَّىٰٓ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِۦ كَلِمَـٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ

আদম (আঃ) অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান

যে কথাগুলি আদম (আঃ) শিখেছিলেন তা কুরআন মাজীদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। তা হচ্ছে ঃ

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ

তারা বলল ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ব। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ২৩) অধিকাংশ লোকের এটাই অভিমত।

মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আবুল আলীয়া (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কাব আল কারাজী (রহঃ), খালিদ ইব্ন মাদান (রহঃ), 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলামও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (ইব্ন আবী হাতিম ১/১৩৬, তাবারী ১/৫৪৩, ৫৪৬)

ইমাম সুদ্দী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বলেন, আদম (আঃ) বললেন ঃ হে আমার রাব্ব! আপনিই কি আমাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেননি? আল্লাহ বলেন ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ আপনি কি আমার ভিতর রূহ ফুঁকে দেননি? তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ। তিনি (আদম (আঃ)) বললেন ঃ যখন আমি হাঁচি দিই তখন কি আপনি বলেননি যে, তোমার আল্লাহ তোমার প্রতি সদয় হউন? আপনার রাহমাত কি আপনার ক্রোধের উপর অগ্রগামী নয়? উত্তরে আল্লাহ বলেন ঃ হ্যাঁ। আদম (আঃ) বললেন ঃ এবং আপনি আমার ভাগ্যে এরূপ খারাপ কাজ লিপিবদ্ধ করেছিলেন? বলা হল ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ যদি আমি অনুতপ্ত হই তাহলে আপনি কি আমাকে জান্নাতে ফেরত নিবেন? আল্লাহ বললেন ঃ হ্যাঁ। (তাবারী ১/৫৪৩) আল আউফী (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), সাঈদ ইব্ন মা'বাদ (রহঃ) এবং ইব্ন আব্বাসও (রাঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১/৫৪২) ইব্ন যুবাইর (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে এবং ইব্ন যুবাইর (রহঃ) হতে হাকিম (রহঃ) তার মুস্তাদরাক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। (হাদীস নং ২/৫৪৫) হাকিম (রহঃ) বলেন যে, এর বর্ণনাধারা সহীহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ যে অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ বলেন ঃ

أَلَمْ يَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِۦ

তারা কি এটা অবগত নয় যে, আল্লাহই নিজ বান্দাদের তাওবাহ কবূল করেন? (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১০৪) অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ

এবং যে কেহ দুস্কর্ম করে অথবা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১১০) অন্যত্র আছে ঃ

وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا

যে ব্যক্তি তাওবাহ করে ও সৎ কাজ করে। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৭১) এসব আয়াতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের তাওবাহ কবূল করে থাকেন। ঐ রকমই এখানেও রয়েছে যে, সেই আল্লাহ তাওবাহকারীদের তাওবাহ কবূলকারী এবং অত্যন্ত দয়ালু। আল্লাহ তা'আলার করুণা ও দয়া এত সাধারণ ও ব্যাপক যে, তিনি তাঁর পাপী বান্দাদেরকেও স্বীয় রাহমাতের দরজা হতে ফিরিয়ে দেননা। সত্যিই তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তিনি বান্দাদের অনুতাপ গ্রহণকারী এবং পরম দয়ালু।

৩৮। আমি বললাম ঃ তোমরা সবাই এখান থেকে নীচে নেমে যাও; অনন্তর আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট যে উপদেশ উপস্থিত হবে - যারা আমার সেই উপদেশ অনুসরণ করবে বস্তুতঃ তাদের কোনই ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবেনা।	٣٨. قُلْنَا ٱهْبِطُوا۟ مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
৩৯। আর যারা অবিশ্বাস করবে এবং আমার নিদর্শনসমূহে অসত্যারোপ করবে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী - তন্মধ্যে তারা সদা অবস্থান করবে।	٣٩. وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَآ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ

জগতের চিত্র

জান্নাত হতে বের করার সময় আদম (আঃ), হাওয়া (আঃ) ও অভিশপ্ত ইবলীসকে যে সংবাদ দেয়া হয়েছিল তারই বর্ণনা হচ্ছে যে, জগতে কিতাবাদি ও নাবী রাসূলগণকে পাঠান হবে, অলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশ করা হবে, দলীল প্রমাণাদি বর্ণিত হবে, সত্যপথ প্রকাশ করে দেয়া হবে। (ইব্ন আবী হাতিম ১/১৩৯) সূরা তা-হা'য় এটাই বলা হয়েছে ঃ

قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ

তিনি (আল্লাহ) বললেন ঃ তোমরা উভয়ে একই সঙ্গে জান্নাত হতে নেমে যাও, তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু; পরে আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সৎ পথের নির্দেশ এলে, যে আমার পথ অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবেনা ও দুঃখ কষ্ট পাবেনা। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১২৩) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, সে কখনো বিপথগামী হবেনা এবং পরকালেও ক্ষতিগ্রস্ত হবেনা। (তাবারী ১৮/৩৮৯) নিম্নের আয়াতটি এ কথারই প্রমাণ বহন করে ঃ

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ أَعْمَىٰ

যে আমার স্মরণে বিমুখ তার জীবন যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামাত দিবসে উত্থিত করব অন্ধ অবস্থায়। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১২৪)

৪০। হে ইসরাঈলী বংশধর! আমি তোমাদেরকে যে সুখ সম্পদ দান করেছি তা স্মরণ কর এবং আমার অঙ্গীকার পূর্ণ কর - আমিও তোমাদের প্রতি কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করব এবং তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর।	٤٠. يَـٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتِىَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا۟ بِعَهْدِىٓ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّـٰىَ فَٱرْهَبُونِ
৪১। এবং আমি যা অবতীর্ণ করেছি তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, ইহা কুরআন। তোমাদের কাছে যা আছে উহারই সত্যতা প্রনয়নকারী এবং এতে তোমরাই প্রথম অবিশ্বাসী	٤١. وَءَامِنُوا۟ بِمَآ أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓا۟ أَوَّلَ كَافِرٍۭ بِهِۦ ۖ وَلَا

হয়োনা এবং আমার আয়াতের পরিবর্তে সামান্য মূল্য গ্রহণ করনা এবং তোমরা বরং আমাকেই ভয় কর।	تَشۡتَرُواْ بِـَٔايَٰتِي ثَمَنٗا قَلِيلٗا وَإِيَّٰيَ فَٱتَّقُونِ

বানী ইসরাঈলকে ইসলামের দিকে আহ্বান

আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাঈলকে ইসলাম কবূল করতে আদেশ করেছেন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুসরণ করতে বলেছেন। বানী ইসরাঈলীদের নাবী ইয়াকূবের (আঃ) বাণী স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, যিনি তার অনুসারীদেরকে বলেছিলেন ঃ ওহে ধর্মভীরুগণ যারা আল্লাহকে মান্য করছ! তোমরা তোমাদের পূর্ব-পুরুষদের মত সত্য ধর্মকে অনুসরণ কর। যেমন বলা হয়ে থাকে ঃ হে অমুক ধার্মিক ব্যক্তির সন্তান! ইহা কর অথবা উহা কর, অথবা হে সাহসী ব্যক্তির সন্তান! জিহাদে অংশ নিয়ে জীবন-পণ যুদ্ধ কর, অথবা হে অমুক জ্ঞানী ব্যক্তির সন্তান! জ্ঞানের অন্বেষন কর। অনুরূপ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ذُرِّيَّةَ مَنۡ حَمَلۡنَا مَعَ نُوحٍۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَبۡدٗا شَكُورٗا

তোমরাই তো তাদের বংশধর যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম, সে তো ছিল পরম কৃতজ্ঞ দাস। (সূরা ইসরাহ, ১৭ ঃ ৩)

ইয়াকূবের (আঃ) নাম ছিল ইসরাঈল

আবূ দাঊদ তায়ালেসী (রহঃ) ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) বরাতে বর্ণনা করেছেন, ইয়াহুদীদের একটি দল রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমরা কি জান যে, ইয়াকূবের (আঃ) অপর নাম ছিল ইসরাঈল? তারা বলল ঃ আল্লাহ স্বাক্ষী! (তায়ালেসী ৩৫৬) অবশ্যই আমরা জানি। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হে আল্লাহ! তুমি স্বাক্ষী থেক। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, ইসরাঈল অর্থ হচ্ছে আল্লাহর দাস বা বান্দা। (তাবারী ১/৫৫৩)

বানী ইসরাঈলকে আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে

তাদেরকে ঐ সব অনুগ্রহের কথা স্মরণ করানো হচ্ছে যা ব্যাপক ক্ষমতার বড় বড় নিদর্শন ছিল। যেমন পাথর হতে ঝর্ণা/নদী প্রবাহিত করা, 'মান্না' ও 'সালওয়া' অবতরণ করা, ফির'আউনের দলবল হতে রক্ষা করা। (তাবারী ১/৫৫৬) আবুল আলীয়া (রহঃ) বানী ইসরাঈলের মধ্য হতেই বিভিন্ন রাসূল প্রেরণ, তাদের জন্য ধর্মীয় পুস্তক অবতরণ ও রাজ্য শাসনের কথাও উল্লেখ করেছেন। (তাবারী ১/৫৫৬) আবুল আলীয়া (রহঃ) আরও বলেন ঃ আল্লাহর অনুগ্রহের কথা বলার অর্থ হচ্ছে তাদের মাঝে নাবী ও রাসূল হিসাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করা এবং কুরআন অবতরণ করা। এ ব্যাপারে মূসা (আঃ) বানী ইসরাঈলকে যেমনটি বলেছিলেন ঃ

يَـٰقَوْمِ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَىٰكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَـٰلَمِينَ

হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতি আল্লাহর নি'আমাতকে স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে বহু নাবী সৃষ্টি করলেন, রাজ্যাধিপতি করলেন এবং তোমাদেরকে এমন বস্তুসমূহ দান করলেন যা বিশ্ববাসীদের মধ্যে কেহকেও দান করেননি। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ২০)

আল্লাহর সাথে বানী ইসরাঈলের ওয়াদার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَأَوْفُوا۟ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ 'আমার অঙ্গীকার পূরা কর' অর্থাৎ তোমাদের কাছে যে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, যখন মুহাম্মাদ আগমন করবেন এবং তাঁর উপর আমার কিতাব অবতীর্ণ হবে তখন তোমরা তাঁর উপর ও কিতাবের উপর ঈমান আনবে। তিনি তোমাদের বোঝা হালকা করবেন, তোমাদের শৃংখল ভেঙ্গে দিবেন এবং গলাবন্ধ দূরে নিক্ষেপ করবেন। অর্থাৎ তোমরা আমার সাথে কৃত ওয়াদার কথা স্মরণ কর যে, তোমাদের কাছে যখন আমার রাসূল আগমন করবে তখন তাঁকে মান্য করবে এবং আমিও তোমাদেরকে

তা প্রদান করব যার প্রতিশ্রুতি আমি তোমাদেরকে দিয়েছি। তোমাদের কারণে তোমাদের প্রতি যে আযাব আপতিত হয়েছে আমি তা দূর করে দিব। (তাবারী ১/৫৫৫, ৫৫৭) হাসান বাসরী (রহঃ) আরও বলেন ঃ আল্লাহর সাথে বানী ইসরাঈলীদের সাথে যে চুক্তির কথা বলা হয়েছে তা নিম্নের আয়াত থেকে জানা যায়। (তাবারী ১/১০৯)

وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثْنَىْ عَشَرَ نَقِيبًا ۖ
وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّى مَعَكُمْ ۖ لَئِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكَوٰةَ وَءَامَنتُم
بِرُسُلِى وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ
سَيِّـَٔاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ

আর আল্লাহ বানী ইসরাঈলের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, আমি তাদের মধ্য হতে বারো জন দলপতি নিযুক্ত করেছিলাম; এবং আল্লাহ বলেছিলেন ঃ আমি তোমাদের সাথে রয়েছি, যদি তোমরা সালাত সুপ্রতিষ্ঠিত কর ও যাকাত দিতে থাক এবং আমার রাসূলদের উপর ঈমান আন ও তাদেরকে সাহায্য কর এবং আল্লাহকে উত্তমরূপে কর্জ দিতে থাক; তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের পাপগুলি তোমাদের থেকে মুছে দিব এবং অবশ্যই তোমাদেরকে এমন উদ্যানসমূহে দাখিল করব যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে, অতঃপর যে ব্যক্তি এরপরও কুফরী করবে, নিশ্চয়ই সে সোজা পথ থেকে দূরে সরে পড়ল। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১২)

ইমাম রাযী (রহঃ) স্বীয় তাফসীরে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বড় বড় নাবীগণের ভবিষ্যদ্বানী উদ্ধৃত করেছেন। এও বর্ণিত আছে যে, বান্দার অঙ্গীকারের অর্থ হচ্ছে ইসলামকে মান্য করা এবং তার উপর আমল করা। (তাবারী ১/৫৫৮) আর আল্লাহর অঙ্গীকার পূরা করার অর্থ হচ্ছে, তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে জান্নাত দান করা। 'আমাকেই ভয় কর' এর অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে বলছেন যে, তাঁর বান্দাদের তাঁকে ভয় করা উচিত। কেননা যদি তারা তাঁকে ভয় না করে তাহলে তাদের উপরও এমন শাস্তি এসে পড়বে যে শাস্তি তাদের পূর্ববর্তীদের উপর এসেছিল। (ইব্ন আবী হাতিম ১/১৪৪)

বর্ণনা রীতি কি চমৎকার যে, উৎসাহ প্রদানের পরই ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে। উৎসাহ ও ভয় প্রদর্শন একত্রিত করে সত্য গ্রহণ ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়া সাল্লামের অনুসরণের প্রতি আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। কুরআন মাজীদ হতে উপদেশ গ্রহণ করতে, তাতে বর্ণিত নির্দেশাবলী পালন করতে এবং নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। এ জন্যই এর পরেই আল্লাহ তাদেরকে বলছেন যে, তারা যেন সেই কুরআনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে যা তাদের নিজস্ব কিতাবেরও সত্যতা স্বীকার করে। এটা এনেছেন এমন নাবী যিনি নিরক্ষর আরাবী, সুসংবাদ প্রদানকারী, ভয় প্রদর্শনকারী, আলোকময় প্রদীপ সদৃশ, যাঁর নাম মুহাম্মাদ, যিনি তাওরাত ও ইঞ্জীলকে সত্য প্রতিপন্নকারী এবং যিনি সত্যের বিস্তার সাধনকারী। তাওরাত ও ইঞ্জীলেও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্ণনা ছিল বলে তাঁর আগমনই ছিল তাওরাত ও ইঞ্জীলের সত্যতার প্রমাণ। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/১৪৫) আর এ জন্যই তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, তিনি তাদের কিতাবের সত্যতার প্রমাণরূপে আগমন করেছেন। সুতরাং তাদের অবগতি সত্ত্বেও যেন তারা তাঁকে প্রথম অস্বীকার না করে বসে। কেহ কেহ বলেন যে, بِهٖ এর ه সর্বনামটি কুরআনের দিকে ফিরেছে। কেননা পূর্বে بِمَا اَنْزَلْتُ এসেছে। প্রকৃতপক্ষে দু'টি মতই সঠিক। কেননা কুরআনকে মান্য করার অর্থ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মান্য করা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতা স্বীকার করে নেয়া। اَوَّلَ كَافِرٍ এর ভাবার্থ হচ্ছে বানী ইসরাঈলের প্রথম কাফির। কারণ কুরাইশ বংশীয় কাফিররাও তো কুফরী ও অস্বীকার করেছিল। কিন্তু বানী ইসরাঈলের কুফরী ছিল আহলে কিতাবের প্রথম দলের কুফরী। এ জন্যই তাদেরকে প্রথম কাফির বলা হয়েছে। তাদের সেই অবগতি ছিল যা অন্যদের ছিলনা। 'আমার আয়াতসমূহের পরিবর্তে তুচ্ছ বিনিময় গ্রহণ করনা। এর ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, বানী ইসরাঈল যেন আল্লাহর আয়াতসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতা স্বীকার ত্যাগ না করে। এর বিনিময়ে যদি সারা দুনিয়াও তারা পেয়ে যায় তথাপি আখিরাতের তুলনায় ওটা অতি তুচ্ছ ও নগণ্য। আর এটা স্বয়ং তাদের কিতাবেও বিদ্যমান রয়েছে।

হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে বিদ্যা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, তা যদি কেহ দুনিয়া লাভের উদ্দেশে শিক্ষা করে তাহলে সে কিয়ামাতের দিন জান্নাতের সুগন্ধি পর্যন্ত পাবেনা।' (আবূ দাঊদ) নির্ধারণ না করে ধর্মীয় বিদ্যা শিক্ষা দেয়ার মজুরী নেয়া বৈধ। শিক্ষক যেন স্বচ্ছলভাবে জীবন যাপন করতে পারেন এবং স্বীয় প্রয়োজনাদি

পূরা করতে পারেন সেজন্য বাইতুল মাল হতে গ্রহণ করাও তাঁর জন্য বৈধ। যদি বাইতুল মাল হতে কিছুই পাওয়া না যায় এবং বিদ্যা শিক্ষা দেয়ার কারণে শিক্ষক অন্য কাজ করারও সুযোগ না পান তাহলে তার জন্য বেতন নির্ধারণ করাও বৈধ। ইমাম মালিক (রহঃ), ইমাম শাফিঈ (রহঃ), ইমাম আহমাদ (রহঃ) এবং অধিকাংশ উলামার এটাই অভিমত।

সহীহ বুখারীর ঐ হাদীসটিও এর দলীল যা আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নির্ধারণ করে মজুরী নিয়েছেন এবং একটি সাপে কাটা রোগীর উপর কুরআন পড়ে ফুঁক দিয়েছেন। এ ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বর্ণনা করা হলে তিনি বলেন ঃ 'যার উপরে তোমরা বিনিময় গ্রহণ করে থাক তার সবচেয়ে বেশি হকদার হচ্ছে আল্লাহর কিতাব।'

শুধুমাত্র আল্লাহকেই ভয় করার অর্থ এই যে, আল্লাহর রাহমাতের আশায় তাঁর ইবাদাত ও আনুগত্যে অটুট থাকতে হবে এবং তাঁর শাস্তির ভয়ে তাঁর অবাধ্যতা ত্যাগ করতে হবে। এই দুই অবস্থায়ই স্বীয় রবের পক্ষ হতে সে একটি জ্যোতির উপর থাকে। (ইব্ন আবী হাতিম ১/১৪৭) মোট কথা, তাদেরকে ভয় দেখানো হচ্ছে যে, তারা যেন দুনিয়ার লোভে তাদের কিতাবে উল্লিখিত নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াতের সত্যতা গোপন না করে এবং দুনিয়ার শাসন ক্ষমতার মোহে পড়ে বিরুদ্ধাচরণ না করে, বরং রাব্বকে ভয় করে সত্যকে প্রকাশ করতে থাকে।

৪২। এবং তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করনা এবং জেনে শুনে সত্য গোপন করনা।	٤٢. وَلَا تَلْبِسُوا۟ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَـٰطِلِ وَتَكْتُمُوا۟ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ
৪৩। আর তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠিত কর ও যাকাত প্রদান কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।	٤٣. وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ

সত্যকে আড়াল করা কিংবা সত্যকে পরিবর্তন করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা

ইয়াহুদীদেরকে এ বদ অভ্যাসের জন্য তিরস্কার করা হচ্ছে যে, তারা জানা সত্ত্বেও কখনও সত্য ও মিথ্যাকে মিশ্রিত করত, আবার কখনও সত্যকে গোপন করত এবং মিথ্যাকে প্রকাশ করত। তাদেরকে এ কুঅভ্যাস ত্যাগ করতে বলা হচ্ছে এবং উপদেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারা যেন সত্যকে প্রকাশ করে ও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে। আর তারা যেন ন্যায় ও অন্যায়, সত্য ও মিথ্যাকে মিশ্রিত না করে, আল্লাহর বান্দাদের মঙ্গল কামনা করে, ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের বিদ'আতকে ইসলামের শিক্ষার সঙ্গে মিশ্রিত না করে। (তাবারী ১/৫৬৯) আর তারা তাদের কিতাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী পাচ্ছে তা যেন সর্বসাধারণের মধ্যে প্রকাশ করতে কার্পণ্য না করে।

অতঃপর তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারা যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সালাত আদায় করে, যাকাত প্রদান করে, তাঁর উম্মাতের সাথে রুকু' ও সাজদায় অংশগ্রহণ করতে থাকে, তাদের সাথে মিলেমিশে থাকে এবং তারা নিজেরাও যেন তাঁরই উম্মাত হয়ে যায়। আনুগত্য ও অন্তরঙ্গতাকেও যাকাত বলা হয়।

'রুকূকারীদের সাথে রুকু কর' এর অর্থ এই যে, তারা যেন ভাল কাজে মু'মিনদের সাথে অংশগ্রহণ করে। আর ঐ কাজগুলির মধ্যে সালাতই হল সর্বোত্তম। এ আয়াত দ্বারা অধিকাংশ আলিম জামা'আতের সাথে সালাত ফারয হওয়ার দলীল গ্রহণ করেছেন। এখানে ইমাম কুরতবী (রহঃ) জামা'আত সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।

৪৪। তোমরা কি লোকদেরকে সৎ কাজে আদেশ করছ এবং তোমাদের নিজেদের সম্বন্ধে বিস্মৃত হচ্ছ? অথচ তোমরা গ্রন্থ পাঠ কর; তাহলে কি তোমরা হৃদয়ঙ্গম করছনা?	٤٤. أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَـٰبَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

অন্যকে উপদেশ দিয়ে নিজে তা না করার জন্য তিরস্কার

আল্লাহ তা‘আলা লোকদেরকে আচরণের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, যারা ভাল কাজের আদেশ করেন তাদের উচিত প্রথমেই নিজেরা তা বাস্তবায়ন করে উদাহরণ সৃষ্টি করা। (তাবারী ২/৮) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এর ভাবার্থ হল ‘অথচ তোমরা নিজেরা তা কার্যকর করতে ভুলে যাও’। কিতাবীদেরকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে, যারা অন্যকে ভাল কাজের আদেশ করে থাকে, অথচ নিজেরা তা পালন করেনা। তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে, এটা জানা সত্ত্বেও যে কিতাবীরা এ কাজ করছে এটা বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপারই বটে। তাই তাদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারা অপরকে যেমন আল্লাহভীতি ও পবিত্রতার কথা শিক্ষা দিচ্ছে, তাদের নিজেদেরও তার উপর আমল করা উচিত। অপরকে সালাত-সিয়ামের নির্দেশ দেয়া, অথচ নিজে পালন না করা বড়ই লজ্জার কথা। জনগণকে বলার পূর্বে মানুষের উচিত নিজে আমলকারী হওয়া। অর্থ এও হচ্ছে যে, তারা অন্যদেরকে তো তাদের কিতাবকে অস্বীকার করতে নিষেধ করছে অথচ আল্লাহর নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অস্বীকার করে নিজেরাই তাদের কিতাবকে অস্বীকার করছে। ভাবার্থ এও হতে পারে যে, তারা অন্যদেরকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বলছে, অথচ ইহলৌকিক ভয়ের কারণে তারা নিজেরাই ইসলাম কবূল করছেনা।

একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য

এখানে এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, ভাল কাজের নির্দেশ দেয়ার জন্য আহলে কিতাবদেরকে তিরস্কার করা হয়নি, বরং তারা নিজেরা পালন না করার জন্য তিরস্কৃত হয়েছে। ভাল কথা বলা তো ভালই, বরং এটা তো ওয়াজিব, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নিজেরও তার প্রতি ‘আমল করা উচিত। যেমন শু‘আইব (আঃ) বলেছেন ঃ

وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَىٰكُمْ عَنْهُ ۚ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَٰحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِىٓ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

আর আমি এটা চাইনা যে, আমি তোমাদের বিপরীত সেই সব কাজ করি যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করছি; আমি তো সংশোধন করে দিতে চাচ্ছি, যে পর্যন্ত আমার সাধ্যে হয়, আর আমার যা কিছু প্রচেষ্টা তা শুধু আল্লাহরই সাহায্যে

হয়ে থাকে; আমি তাঁরই উপর ভরসা রাখি এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করি। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৮৮) সুতরাং ভাল কাজ করতে বলা ওয়াজিব এবং নিজে করাও ওয়াজিব। একটি না করলে অন্যটিও ব্যর্থ হয়ে যাবে তা নয়। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেমদের মত এটাই। যদিও কতকগুলো লোকের অভিমত এই যে, যারা নিজেরা খারাপ কাজ করে তারা যেন অপরকে ভাল কাজের কথা না বলে। কিন্তু এটা সঠিক কথা নয়।

আমলহীন উপদেশদাতার শাস্তি

মুসনাদ আহমাদে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মিরাজের রাতে আমি দেখেছি যে, কতকগুলো লোকের ওষ্ঠ আগুনের কাঁচি দ্বারা কাটা হচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, এরা কারা? তখন আমাকে বলা হল যে, এরা আপনার উম্মাতের বক্তা, উপদেশ দাতা ও আলেম। এরা মানুষকে ভাল কথা শিক্ষা দিত কিন্তু নিজে আমল করতনা, জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও বুঝতনা।' অন্য হাদীসে আছে যে, তাদের জিহ্বা ও ওষ্ঠ উভয়ই কাটা হচ্ছিল। হাদীসটি বিশুদ্ধ। ইব্ন হিব্বান (রহঃ), আদী ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ), ইব্ন মিরদুওয়াই (রহঃ) প্রমুখ মনীষীদের লিখিত কিতাবের মধ্যে এটা বিদ্যমান আছে।

আবূ অ'য়েল (রহঃ) বলেন যে, একদা উসামাকে (রাঃ) বলা হয় ঃ 'আপনি উসমানকে (রাঃ) কেন কিছু বলেননা?' তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'আপনাদেরকে শুনিয়ে বললেই কি শুধু বলা হবে? আমি তো গোপনে তাঁকে সব সময়েই বলে আসছি। কিন্তু আমি কোন কথা ছড়াতে চাইনা। আল্লাহর শপথ! আমি কোন লোককে সর্বোত্তম বলবনা, যদিও সে আমার খুব নিকটেরও হয়। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ

কিয়ামাতের দিন একটি লোককে আনা হবে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তার নাড়ীভূঁড়ি বেরিয়ে আসবে এবং সে তার চারদিকে ঘুরতে থাকবে। অন্যান্য জাহান্নামবাসীরা তাকে জিজ্ঞেস করবে ঃ 'জনাব আপনি তো আমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ করতেন এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করতেন, আপনার এ অবস্থা কেন?' সে বলবে ঃ 'আফসোস! আমি তোমাদেরকে বলতাম, কিন্তু নিজে আমল করতামনা। আমি তোমাদেরকে বিরত রাখতাম কিন্তু নিজে বিরত থাকতামনা। (ফাতহুল বারী ৬/৩৮১, মুসলিম ৪/২২৯১, আহমাদ ৫/২০৫)

একটি ঘটনার বর্ণনা

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'এক স্থানে তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ তোমরা জনগণকে ভাল কাজের আদেশ করছ, আর নিজেদের সম্বন্ধে বেখবর রয়েছ। ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) বলেন ঃ তিনটি সূরার আয়াতের কারণে আমি লোকদেরকে উপদেশ দেয়ার ব্যাপারে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ি। তা হল আলোচ্য এ আয়াতটি এবং নিম্নের দু'টি সূরার আয়াতসমূহ।

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفۡعَلُونَ. كَبُرَ مَقۡتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفۡعَلُونَ

হে মু'মিনগণ! তোমরা যা করনা তা তোমরা কেন বল? তোমরা যা করনা তোমাদের তা বলা আল্লাহর দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক। (সূরা সাফফ, ৬১ ঃ ২-৩) (কুরতুবী ১/৩৬৭) আল্লাহর নিকট এটা খুব অসন্তুষ্টির কারণ যে, তোমরা যা বলবে তা নিজেরা করবেনা।' অন্য আয়াতে শু'আইবের (আঃ) কথা ঃ

وَمَآ أُرِيدُ أَنۡ أُخَالِفَكُمۡ إِلَىٰ مَآ أَنۡهَىٰكُمۡ عَنۡهُۚ إِنۡ أُرِيدُ إِلَّا ٱلۡإِصۡلَـٰحَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُۚ وَمَا تَوۡفِيقِىٓ إِلَّا بِٱللَّهِۚ عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُ وَإِلَيۡهِ أُنِيبُ

আর আমি এটা চাইনা যে, আমি তোমাদের বিপরীত সেই সব কাজ করি যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করছি; আমি তো সংশোধন করে দিতে চাচ্ছি, যে পর্যন্ত আমার সাধ্যে হয়, আর আমার যা কিছু প্রচেষ্টা তা শুধু আল্লাহরই সাহায্যে হয়ে থাকে; আমি তাঁরই উপর ভরসা রাখি এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করি। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৮৮) আচ্ছা বলতো! তুমি কি এই তিনটি আয়াত হতে নির্ভয় হয়ে রয়েছ? সে বলে ঃ 'না।' তিনি বলেন ঃ 'তুমি স্বীয় নাফ্স হতেই আরম্ভ কর।'

৪৫। এবং তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও; অবশ্যই ওটা কঠিন, কিন্তু বিনীতদের পক্ষে নয় -	٤٥. وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلۡخَـٰشِعِينَ
৪৬। যারা ধারণা করে যে, নিশ্চয়ই তারা তাদের রবের	٤٦. ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَـٰقُواْ

সাথে সম্মিলিত হবে এবং তারা তাঁরই দিকে প্রতিগমন করবে।	رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য লাভ হবে

এ আয়াতে মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতের কাজে ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে।

আল্লাহর বান্দাদেরকে কর্তব্য পালন করতে এবং সালাত আদায় করতে বলা হয়েছে। সিয়াম পালন করাও হচ্ছে ধৈর্য ধারণ করা। এ জন্যই রামাযান মাসকে ধৈর্যের মাস বলা হয়েছে। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/১৫৪) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'সিয়াম অর্ধেক ধৈর্য।' ধৈর্যের ভাবার্থ পাপের কাজ হতে বিরত থাকাও বটে। এ আয়াতে যদি ধৈর্যের ভাবার্থ এটাই হয়ে থাকে তাহলে মন্দ কাজ হতে বিরত থাকা ও সাওয়াবের কাজ করা এ দু'টিরই বর্ণনা হয়ে গেছে। সাওয়াবের কার্যসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে সালাত। উমার (রাঃ) বলেন ঃ 'ধৈর্য দু'প্রকার। (১) বিপদের সময় ধৈর্য ও (২) পাপের কাজ হতে বিরত থাকার ব্যাপারে ধৈর্য। দ্বিতীয় ধৈর্য প্রথম ধৈর্য হতে উত্তম।' সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) বলেন ঃ 'প্রত্যেক জিনিস আল্লাহর পক্ষ হতে হয়ে থাকে মানুষের এটা স্বীকার করা, সাওয়াব প্রার্থনা করা এবং বিপদের প্রতিদানের ভাণ্ডার আল্লাহর নিকট আছে এ মনে করার নাম ধৈর্য।' আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে ধৈর্যধারণ করলেও আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করা হয়। সাওয়াবের কাজে সালাত দ্বারা বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায়। কুরআন মাজীদে ঘোষিত হয়েছে ঃ

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ

তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব আবৃত্তি কর এবং সালাত প্রতিষ্ঠিত কর। নিশ্চয়ই সালাত বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে। আল্লাহর স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৪৫) হুযাইফা (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই কোন কঠিন ও চিন্তাযুক্ত কাজের সম্মুখীন হতেন তখনই তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন। সম্ভবতঃ এখানে সর্বনাম প্রয়োগ করা

হয়েছে উপদেশ দানের উদ্দেশে, ধৈর্য এবং সালাতের মাধ্যমে, যেমনটি উল্লেখ পাওয়া যায় একই আয়াতে। অনুরূপ, কুরূন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحًا وَلَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلصَّـٰبِرُونَ

আর যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছিল তারা বলল ঃ ধিক্ তোমাদেরকে! যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তাদের জন্য আল্লাহর পুরস্কার শ্রেষ্ঠ এবং ধৈর্যশীল ব্যতীত এটা কেহ পাবেনা। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৮০) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ۚ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُۥ عَدَٰوَةٌ كَأَنَّهُۥ وَلِىٌّ حَمِيمٌ. وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ

ভাল কাজ এবং মন্দ কাজ সমান হতে পারেনা। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। এই গুণের অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকেই যারা ধৈর্যশীল, এই গুণের অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকেই যারা মহাভাগ্যবান। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ৩৪-৩৫)

খন্দকের যুদ্ধে রাতের বেলায় হুযাইফা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হলে তাঁকে সালাত আদায় করতে দেখতে পান। অন্যত্র আলী (রাঃ) বলেন ঃ 'বদর যুদ্ধের রাতে আমরা সবাই শুইয়ে গেছি, আর জেগে দেখি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারা রাত সালাত আদায়ে রত রয়েছেন। সকাল পর্যন্ত তিনি সালাত ও প্রার্থনায় ছিলেন।'

وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ *এবং তারা তাঁরই দিকে প্রতিগমন করবে।* অর্থাৎ তাদের বিষয় সম্পূর্ণই আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল, তিনি তাঁর বান্দার ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। যেহেতু তারা জানে যে, তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে এবং তাদেরকে চেনা যাবে সেহেতু আল্লাহর নির্ধারিত আমলসমূহ পালন করা এবং নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকা সহজ।

আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) সফরে তাঁর ভাই কাসামের (রাঃ) মৃত্যু সংবাদ পেয়ে إِنَّا لِلّٰه وَإِنَّــا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৫৬) পাঠ করে পথের এক ধারে সরে গিয়ে উটকে বসিয়ে দেন এবং সালাত শুরু করেন। দীর্ঘক্ষণ সালাত আদায় করার পর সওয়ারীর নিকট আসেন এবং এই আয়াত দু'টি পাঠ করতে থাকেন। মোট কথা, ধৈর্য ও সালাত এ দু'টি দ্বারা আল্লাহর করুণা লাভ করা যায়।

وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا

পাপীরা আগুন অবলোকন করে আশংকা করবে যেন ওরা ওতেই পতিত হবে, বস্তুতঃ ওটা হতে ওরা পরিত্রাণ পাবেনা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৫৩)

একটি সহীহ হাদীসে আছে যে, কিয়ামাতের দিন এক পাপীকে আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ 'আমি কি তোমাকে স্ত্রী ও সন্তানাদি দেইনি? তোমার প্রতি কি নানা প্রকারের অনুগ্রহ করিনি, ঘোড়া ও উটকে কি তোমার অধীনস্থ করিনি? তোমাকে কি শান্তি, আরাম, আহার্য ও পানীয় দেইনি?' সে বলবে, 'হ্যাঁ, হে প্রভু! এ সব কিছুই ছিল।' তখন আল্লাহ বলবেন ঃ 'তাহলে তোমার কি এই জ্ঞান ও বিশ্বাস ছিলনা যে, তোমাকে আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে?' সে বলবে ঃ 'হ্যাঁ, হে প্রভু! এর প্রতি আমার বিশ্বাস ছিল।' আল্লাহ বলবেন ঃ 'তুমি যেমন আমাকে ভুলে গিয়েছিলে তেমনই আমিও তোমাকে ভুলে গেলাম।' (মুসলিম ৪/২২৭৯) এর আরও বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা ইনশাআল্লাহ نَسُواْ اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ (৯ ঃ ৬৭) এর তাফসীরে আসবে।

৪৭। হে বানী ইসরাঈল! আমি তোমাদেরকে যে সুখ সম্পদ দান করেছি তা স্মরণ কর এবং নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে সমগ্র পৃথিবীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।	٤٧. يَـٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتِىَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَـٰلَمِينَ

বানী ইসরাঈলকে অসংখ্য নি‘আমাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে

বানী ইসরাঈলের বাপ-দাদার উপর মহান আল্লাহ যে নি‘আমাত দান করেছিলেন তারই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তাদের মধ্যে রাসূল এসেছেন, তাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে এবং তাদের যুগের অন্যান্য লোকের উপর তাদেরকে মর্যাদা দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَـٰهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى ٱلْعَـٰلَمِينَ

আমি জেনে শুনেই তাদেরকে বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম। (সূরা দুখান, ৪৪ ঃ ৩২) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ يَـٰقَوْمِ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَىٰكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَـٰلَمِينَ

আর যখন মূসা স্বীয় সম্প্রদায়কে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতি আল্লাহর নি’আমাতকে স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে বহু নাবী সৃষ্টি করলেন, রাজ্যাধিপতি করলেন এবং তোমাদেরকে এমন বস্তুসমূহ দান করলেন যা বিশ্ববাসীদের মধ্যে কেহকেও দান করেননি। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ২০) সমস্ত লোকের উপর মর্যাদা লাভের অর্থ হচ্ছে সর্বযুগের সমস্ত লোকের উপর। কেননা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাত নিশ্চিতরূপে তাদের চেয়ে উত্তম। এ উম্মাত সম্বন্ধে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ‘তোমরা উত্তম সম্প্রদায়, যে সম্প্রদায়কে জনমণ্ডলীর জন্য প্রকাশ করা হয়েছে.. ..।

আবুল আলীয়া (রহঃ) বলেন ঃ অন্য জাতির উপর অগ্রাধিকার দিয়ে আল্লাহ তাদের প্রতি রাজত্ব, নাবী/রাসূল এবং কিতাব নাযিল করেছিলেন। প্রতিটি যুগেই ছিল এক একটি জাতি। (তাবারী ২/২৪) মুজাহিদ (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইসমাঈল ইব্ন আবী খালিদও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (ইব্ন আবী হাতিম ১/১৫৮)

মুহাম্মাদের (সাঃ) উম্মাত বানী ইসরাঈলের চেয়ে উত্তম

আয়াতের মর্ম এভাবেই অনুধাবন করতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা উম্মাতে মুহাম্মাদীকে অন্যান্য উম্মাত থেকে মর্যাদা প্রদান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَـٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم

তোমরাই সর্বোত্তম উম্মাত, মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে, তোমরা সৎ কাজে আদেশ করবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে; আর যদি গ্রন্থপ্রাপ্তরা বিশ্বাস স্থাপন করত তাহলে অবশ্যই তাদের জন্য মঙ্গল হত; তাদের মধ্যে কেহ কেহ মু'মিন এবং তাদের অধিকাংশই দুস্কার্যকারী। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১১০)

মুসনাদ এবং অন্যান্য সুনান গ্রন্থে মুয়াবীয়া ইব্ন হাইদাহ আল কুসাইবী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা (মুসলিমরা) হলে সত্তর তম জাতি। কিন্তু আল্লাহর কাছে তোমরা সর্বোত্তম এবং সম্মানিত। (আহমাদ ৫/৩, তিরমিযী ৮/৩৫২, ইব্ন মাজাহ ২/১৪৩৩) এ বিষয়ে আরও অনেক হাদীস রয়েছে যা সূরা আলে ইমরানের ১১০ আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে।

৪৮। এবং তোমরা সেই দিনের ভয় কর, যে দিন এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি হতে কিছুমাত্র উপকৃত হবেনা এবং কোন ব্যক্তি হতে কোন সুপারিশও গৃহীত হবেনা, কোন ব্যক্তি হতে কোন বিনিময়ও গ্রহণ করা হবেনা এবং তাদেরকে সাহায্য করাও হবেনা।	٤٨. وَٱتَّقُوا۟ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَـٰعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

শাস্তি দানের ভয় প্রদর্শন

وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً নি'আমাতসমূহের বর্ণনার পর এখন শাস্তি হতে ভয় দেখান হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যে, কেহ কারও কোন উপকার করবেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

কেহ কারও বোঝা বহন করবেনা। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১৮) অন্যত্র বলেন ঃ

لِكُلِّ ٱمْرِيٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ

সেদিন তাদের প্রত্যেকের হবে এমন গুরুতর অবস্থা যা তাকে সম্পূর্ণ রূপে ব্যস্ত রাখবে। (সূরা আ'বাসা, ৮০ ঃ ৩৭) অন্য স্থানে আছে ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخْشَوْاْ يَوْمًا لَّا يَجْزِى وَالِدٌ عَن وَلَدِهِۦ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِۦ شَيْـًٔا

হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের রাব্বকে ভয় কর এবং ভয় কর সেই দিনের যখন পিতা সন্তানের কোন উপকারে আসবেনা এবং সন্তানও কোন উপকারে আসবেনা তার পিতার। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ৩৩)

কাফিরদের ব্যাপারে কোন সুপারিশ, মুক্তিপণ কিংবা সাহায্য গ্রহণ করা হবেনা

বলা হয়েছে যে, না কোন কাফিরের জন্য কেহ সুপারিশ করবে, না তার সুপারিশ কবূল করা হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَٰعَةُ ٱلشَّٰفِعِينَ

ফলে সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন কাজে আসবেনা। (সূরা মুদ্‌দাস্‌সির, ৭৪ ঃ ৪৮) অন্য এক জায়গায় জাহান্নামবাসীদের এ উক্তি নকল করা হয়েছে ঃ

فَمَا لَنَا مِن شَٰفِعِينَ. وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ

পরিণামে আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই. কোন সুহৃদয় বন্ধুও নেই।' (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১০০-১০১)

আরও বলা হয়েছে, وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ তাদের থেকে মুক্তিপণও গ্রহণ করা হবেনা।' অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِهِۦٓ

নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করেছে ও অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে তাদের মুক্তির বিনিময়ে যদি পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণ দেয়া হয় তবুও কক্ষনো তা গ্রহণ করা হবেনা। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৯১) মহান আল্লাহ আরও বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُۥ مَعَهُۥ لِيَفْتَدُواْ بِهِۦ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

নিশ্চয়ই যারা কাফির, যদি তাদের কাছে বিশ্বের সমস্ত সম্পদও থাকে এবং ওর সাথে তৎপরিমান আরও থাকে, এবং এগুলোর বিনিময়ে কিয়ামাতের শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে চায়, তবুও এই সম্পদ তাদের থেকে কবূল করা হবেনা, আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৩৬)

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আরও বলেন ঃ

وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَآ

তারা দুনিয়ার সমস্ত কিছুর বিনিময় দিয়েও মুক্তি পেতে চাইলে সেই বিনিময় গ্রহণ করা হবেনা। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৭০) অন্যত্র বলেন ঃ

فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ۚ مَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ ۖ هِىَ مَوْلَىٰكُمْ

আজ তোমাদের নিকট হতে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবেনা এবং যারা কুফরী করেছিল তাদের নিকট হতেও নয়। জাহান্নামই তোমাদের আবাসস্থল, এটাই তোমাদের মাওলা (যোগ্য স্থান)! (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ১৫) ভাবার্থ এই যে, ঈমান ছাড়া শুধুমাত্র সুপারিশের উপর নির্ভর করলে তা কিয়ামাতের দিন কোন কাজে আসবেনা। তাদের মুক্তিপণ হিসাবে যদি পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণও প্রদান করা হয় তবুও তা গ্রহণ করা হবেনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَـٰعَةٌ

সেদিন সমাগত হওয়ার পূর্বে ব্যয় কর যেদিন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ নেই। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৫৪) তিনি আরও বলেন ঃ

لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَـٰلٌ

সেই দিন আসার পূর্বে যেদিন ক্রয়-বিক্রয় ও বন্ধুত্ব থাকবেনা। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৩১)

وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ 'তাদেরকে সাহায্য করা হবেনা' এর অর্থ এই যে, তার কোন সাহায্যকারী থাকবেনা, আত্মীয়তার বন্ধন কেটে যাবে, তার জন্য কারও অন্তরে দয়া থাকবেনা এবং তার নিজেরও কোন শক্তি থাকবেনা। কুরআন মাজীদের অন্যত্র আছে ঃ

وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ

তিনি আশ্রয় দেন এবং তাঁর পাকড়াও হতে আশ্রয়দাতা কেহ নেই। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৮৮) অন্যত্র বর্ণিত আছে ঃ

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُۥٓ أَحَدٌ. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُۥٓ أَحَدٌ

সেদিন তাঁর শাস্তির মত শাস্তি কেহ দিতে পারবেনা এবং তাঁর বন্ধনের মত বন্ধন কেহ করতে পারবেনা। (সূরা ফাজ্র, ৮৯ ঃ ২৫-২৬) অন্যত্র আরও বর্ণিত আছে ঃ

مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ. بَلْ هُمُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ

তোমাদের কি হল যে, তোমরা একে অপরের সাহায্য করছনা? বস্তুতঃ সেদিন তারা আত্মসমর্পন করবে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ২৫-২৬) অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِهَةًۢ ۖ بَلْ ضَلُّوا۟ عَنْهُمْ

তারা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে মা'বূদ রূপে গ্রহণ করেছিল তারা তাদেরকে সাহায্য করলনা কেন? বস্তুতঃ তাদের মা'বূদগুলি তাদের নিকট হতে অন্তর্হিত হয়ে পড়ল। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ২৮) ভাবার্থ এই যে, প্রমাণাদি নষ্ট হয়ে গেছে, ঘুষ প্রদানের সুযোগ বন্ধ হয়ে গেছে, সুপারিশও বন্ধ হয়েছে, পরস্পরের সাহায্য সহানুভূতি দূর হয়ে গেছে। আজ মুকদ্দামা চলে গেছে

সেই ন্যায় বিচারক, মহাপ্রতাপান্বিত সারা জাহানের মালিক আল্লাহর হাতে, যাঁর বিচারালয়ে সুপারিশকারীদের সুপারিশ এবং সাহায্যকারীদের সাহায্য কোন কাজে আসবেনা, বরং সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করতে হবে। তবে বান্দার প্রতি তাঁর পরম করুণা ও দয়া এই যে, তাদেরকে তাদের পাপের প্রতিদান ঠিক পাপের সমানুপাতেই দেয়া হবে, আর সাওয়াবের প্রতিদান দেয়া হবে কমপক্ষে দশগুণ বাড়িয়ে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআন মাজীদে এক জায়গায় বলেছেন ঃ

وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْـُٔولُونَ. مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ. بَلْ هُمُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ

তাদেরকে থামাও, কারণ তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে; তোমাদের কি হল যে, তোমরা একে অপরের সাহায্য করছনা? বস্তুতঃ সেদিন তারা আত্মসমর্পন করবে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ২৪-২৬) (তাবারী ২/৩৫)

৪৯। এবং যখন আমি তোমাদেরকে ফির'আউনের সম্প্রদায় হতে বিমুক্ত করেছিলাম - তারা তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করত, তোমাদের পুত্রদেরকে হত্যা করত এবং তোমাদের কন্যাদেরকে জীবিত রাখত এবং এতে তোমাদের রাব্ব হতে তোমাদের জন্য মহাপরীক্ষা ছিল।	٤٩. وَإِذْ نَجَّيْنَـٰكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِى ذَٰلِكُم بَلَآءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ
৫০। এবং যখন আমি তোমাদের জন্য সমুদ্রকে বিভক্ত করেছিলাম, অতঃপর তোমাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম ও ফির'আউনের স্বজন-দেরকে নিমজ্জিত করেছিলাম এবং তোমরা তা প্রত্যক্ষ করেছিলে।	٥٠. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَـٰكُمْ وَأَغْرَقْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ

ফির‘আউন ও তার সেনাবাহিনী হতে বানী ইসরাঈলকে রক্ষা করা হয়েছিল

এই আয়াতসমূহে মহান আল্লাহ ইয়াকূবের (আঃ) সন্তানদেরকে লক্ষ্য করে বলেন যে, আল্লাহর সেই অনুগ্রহের কথা তাদের স্মরণ করা উচিত যে, তিনি তাদেরকে ফির‘আউনের জঘন্যতম শাস্তি হতে রক্ষা করেছেন। অভিশপ্ত ফির‘আউন স্বপ্নে দেখেছিল যে, বাইতুল মুকাদ্দাসের দিক হতে এক আগুন জ্বলে উঠে মিসরের প্রত্যেক কিবতীর ঘরে প্রবেশ করেছে, কিন্তু তা বানী ইসরাঈলের ঘরে যায়নি। এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা ছিল এই যে, বানী ইসরাঈলের মধ্যে এমন একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করবে যার হাতে তার অহংকার চূর্ণ হয়ে যাবে এবং তার আল্লাহ দাবীর চরম শাস্তি তার হাতেই হবে। এ জন্যই সেই অভিশপ্ত ব্যক্তি চারদিকে এ নির্দেশ জারী করে দিল যে, বানী ইসরাঈলের ঘরে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, সরকারী লোক যাচাই করে দেখবে। যদি পুত্র সন্তান হয় তাহলে তৎক্ষণাৎ তাকে মেরে ফেলা হবে। আর যদি মেয়ে সন্তান হয় তাহলে তাকে ছেড়ে দেয়া হবে। আরও ঘোষণা করল যে, বানী ইসরাঈলের দ্বারা কঠিন ও ভারী কাজ করিয়ে নেয়া হবে এবং তাদের মাথার উপরে ভারী ভারী বোঝা চাপিয়ে দেয়া হবে। এখানে শাস্তির তাফসীর পুত্র সন্তান হত্যার দ্বারা করা হয়েছে। সূরা ইবরাহীমে একের সংযোগ অন্যের উপর করা হয়েছে। يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءكُمْ (১৪ ঃ ৬) এর পূর্ণ ব্যাখ্যা সূরা কাসাসের প্রথমে দেয়া হয়েছে।

يَسُومُونَكُمْ এর অর্থ হচ্ছে ‘লাগিয়ে দেয়া’ এবং ‘সর্বদা করতে থাকা’। অর্থাৎ তারা বরাবরই কষ্ট দিয়ে আসছিল, যেহেতু এই আয়াতের পূর্বে বলা হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর পুরস্কার রূপে দেয়া নি‘আমাতের কথা স্মরণ করে। এ জন্য ফির‘আউনীদের শাস্তিকে ব্যাখ্যা হিসাবে পুত্র সন্তান হত্যা দ্বারা বর্ণনা করেছেন। আর সূরা ইবরাহীমের প্রথমে (১৫ নং আয়াত) বলা হয়েছে যে, তারা যেন আল্লাহর নি‘আমাতকে স্মরণ করে। এ জন্য সেখানে সংযোগের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন যাতে নি‘আমাতের সংখ্যা বেশি হয়। অর্থাৎ বিভিন্ন শাস্তি হতে এবং পুত্র সন্তান হত্যা হতে তাদেরকে মূসার (আঃ) মাধ্যমে রক্ষা করেছিলেন।

মিসরের আমালীক কাফির বাদশাহদেরকে ফির‘আউন বলা হত। যেমন রোমের কাফির বাদশাহকে কাইসার। পারস্যে শাসকের উপাধি হল কিসরা,

ইয়ামানের রাজার উপাধি ছিল তুব্বা, আবিসিনিয়ার (ইথিওপিয়া) রাজার উপাধি ছিল নিগাস বা নাজাসী এবং ভারতের কাফির বাদশাহকে বলা হত বাতলীমুস।

ইব্ন জারীর (রহঃ) মন্তব্য করেছেন যে, এ আয়াতাংশের অর্থ হল, তোমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে ফির‘আউনের কবল থেকে রক্ষা করা ছিল তোমাদের রবের তরফ থেকে রাহমাত। (তাবারী ২/৪৮) আমরা বলতে চাই যে, কষ্ট প্রদানের মাধ্যমে তাদের পরীক্ষা করা দ্বারা তাদের প্রতি আল্লাহ রাহমাত করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً

আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করি। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৩৫)

وَبَلَوْنَـٰهُم بِٱلْحَسَنَـٰتِ وَٱلسَّيِّـَٔاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

আর আমি ভাল ও মন্দের মধ্যে নিপতিত করে তাদেরকে পরীক্ষা করে থাকি যাতে তারা আমার পথে ফিরে আসে। (সূরা আ‘রাফ, ৭ ঃ ১৬৮)

আশুরায় সিয়াম পালন করা প্রসঙ্গ

মুসনাদ আহমাদে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাদীনায় এসে যখন দেখলেন যে, ইয়াহুদীরা আশুরার সিয়াম পালন করছে, তখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ দিন তোমরা সিয়াম পালন কর কেন?’ তারা উত্তরে বলে ঃ ‘এ জন্য যে, এ কল্যাণময় দিনে বানী ইসরাঈল ফির‘আউনের হাত হতে মুক্তি পেয়েছিল এবং তাদের শত্রুরা ডুবে মরেছিল। তারই কৃতজ্ঞতা প্রকাশরূপে মূসা (আঃ) এ সিয়াম পালন করেছিলেন।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘তোমাদের অপেক্ষা মূসার (আঃ) ব্যাপারে আমিই বেশি হকদার।’ সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামও ঐ দিন সিয়াম পালন করেন এবং জনগণকে সিয়াম পালন করতে নির্দেশ দেন। (আহমাদ ১/২৯১, ফাতহুল বারী ৪/২৮৭, মুসলিম ২/৭৯৬, ইব্ন মাজাহ ১/৫৫৩, নাসাঈ ২/১৫৭)

৫১। এবং যখন আমি মূসার সঙ্গে চল্লিশ রাতের অঙ্গীকার করেছিলাম, অনন্তর তোমরা	٥١. وَإِذْ وَٰعَدْنَا مُوسَىٰٓ

أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنۢ بَعْدِهِۦ وَأَنتُمْ ظَـٰلِمُونَ	গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিলে এবং তোমরা ছিলে অত্যাচারী।
٥٢. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ	৫২। এর পরেও আমি তোমাদেরকে মার্জনা করেছিলাম - যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।
٥٣. وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ	৫৩। আর যখন আমি মূসাকে গ্রন্থ এবং সত্য ও মিথ্যার প্রভেদকারী নির্দেশ দিয়েছিলাম, যেন তোমরা সুপথ প্রাপ্ত হও -

বানী ইসরাঈলের গাভীর পূজা করা

এখানেও মহান আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, মূসা (আঃ) যখন চল্লিশ দিনের অঙ্গীকারে বানী ইসরাঈলের নিকট হতে তূর পাহাড়ে চলে যান তখন তারা বাছুর পূজা আরম্ভ করে দেয়। অতঃপর মূসা (আঃ) তাদের নিকট ফিরে এলে তারা এ শির্ক হতে তাওবাহ করে। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, এত বড় অপরাধের পরেও তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। এটা বানী ইসরাঈলের প্রতি তাঁর কম অনুগ্রহ নয়। কুরআন মাজীদে অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَقَطَّعْنَـٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أُمَمًا ۖ مِّنْهُمُ ٱلصَّـٰلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَٰلِكَ ۖ

وَبَلَوْنَـٰهُم بِٱلْحَسَنَـٰتِ وَٱلسَّيِّـَٔاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

যখন আমি মূসার সঙ্গে ত্রিশ রাতের ওয়াদা করেছিলাম এবং আরও দশ বাড়িয়ে পূরা চল্লিশ করেছিলাম। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৬৮) বলা হয় যে, এ ওয়াদার সময়কাল ছিল যিলকাদার পূরা মাস এবং যিলহাজ্জ মাসের দশ দিন। এটা ফির'আউনীদের হাত হতে মুক্তি পাওয়ার পরের ঘটনা। 'কিতাব' এর ভাবার্থ তাওরাত এবং ফুরকান প্রত্যেক ঐ জিনিসকে বলা হয় যা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে

এবং হিদায়াত ও গুমরাহীর মধ্যে পার্থক্য করে থাকে। এ কিতাবটিও উক্ত ঘটনার পরে পেয়েছিলেন, যেমন সূরা 'আরাফের এ ঘটনার বর্ণনা রীতি দ্বারা প্রকাশ পাচ্ছে। অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ مِنۢ بَعْدِ مَآ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَىٰ بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

আমি তো পূর্ববর্তী বহু মানব গোষ্ঠিকে বিনাশ করার পর মূসাকে দিয়েছিলাম কিতাব, মানব জাতির জন্য জ্ঞান-বর্তিকা, পথ নির্দেশ ও দয়া স্বরূপ, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৪৩)

৫৪। আর যখন মূসা স্বীয় সম্প্রদায়কে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! নিশ্চয়ই তোমরা গো-বৎসকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করে তোমাদের নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছ। অতএব তোমরা তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তোমরা তোমাদের নিজ নিজ প্রাণ বিসর্জন দাও, তোমাদের রবের নিকট এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর; অনন্তর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করলেন, নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, করুণাময়।	٥٤. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ يَٰقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓا۟ إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَٱقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ

তাওবাহ কবূল হওয়ার জন্য
বানী ইসরাঈলীদের একে অন্যকে হত্যা

এখানে তাদের তাওবাহর পন্থা বর্ণনা করা হচ্ছে। তারা বাছুরের পূজা করেছিল এবং তার প্রেম তাদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়েছিল। অতঃপর মূসার (আঃ)

বুঝানোর ফলে তাদের সম্বিৎ ফিরে আসে এবং তারা লজ্জিত হয় ও নিজেদের পথভ্রষ্টতার কথা স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ যখন তাদের হৃদয় বাছুরকে পূজা করার চিন্তা-ভাবনা করছিল তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَمَّا سُقِطَ فِىٓ أَيۡدِيهِمۡ وَرَأَوۡاْ أَنَّهُمۡ قَدۡ ضَلُّواْ قَالُواْ لَئِن لَّمۡ يَرۡحَمۡنَا رَبُّنَا وَيَغۡفِرۡ لَنَا

আর যখন তারা লজ্জিত হল এবং দেখল যে, (প্রকৃত পক্ষে) তারা বিভ্রান্ত হয়েছে, তখন তারা বলল ঃ আমাদের রাব্ব যদি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন তাহলে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৪৯) তখন তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, তাদের মধ্যে যারা বাছুর পূজা করেছে তাদেরকে যেন হত্যা করে ঐসব লোক যারা এতে যোগ দেয়নি। তারা তাই করে। সুতরাং আল্লাহ তাদের তাওবাহ কবূল করেন এবং হত্যাকারী ও নিহত সবাইকেই ক্ষমা করে দেন। এর পূর্ণ বর্ণনা ইনশাআল্লাহ সূরা তা-হা'য় আসবে। (নাসাঈ ৬/৪০৪, তাবারী ১৮/৩০৬, ইব্ন আবী হাতিম ১/১৬৮)

একটি বর্ণনায় আছে যে, মূসা (আঃ) তাদেরকে মহান আল্লাহর নির্দেশ শুনিয়ে দেন এবং যেসব লোক বাছুর পূজা করেছিল তাদেরকে বসিয়ে দেন এবং অন্যান্য লোক দাঁড়িয়ে গিয়ে তাদেরকে হত্যা করতে শুরু করে। আল্লাহ তা'আলার হুকুমে অন্ধকার ছেয়ে যায়। অতঃপর তাদেরকে বিরত রাখা হয়। তখন গণনা করে দেখা যায় যে, সত্তর হাজার লোককে হত্যা করা হয়েছে। তাদের মধ্যে যাদেরকে হত্যা করা হয় তারা ক্ষমা প্রাপ্ত হয় এবং যারা বেঁচে ছিল তাদেরকেও ক্ষমা করে দেয়া হয়। (তাবারী ২/৭৩)

৫৫। এবং যখন তোমরা বলেছিলে ঃ হে মূসা! আমরা আল্লাহকে প্রকাশ্যভাবে দর্শন না করা পর্যন্ত তোমাকে বিশ্বাস করবনা, তখন বজ্রপাত তোমাদেরকে আক্রমণ করেছিল এবং তোমরা তা প্রত্যক্ষ করেছিলে।	٥٥. وَإِذۡ قُلۡتُمۡ يَٰمُوسَىٰ لَن نُّؤۡمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهۡرَةً فَأَخَذَتۡكُمُ ٱلصَّٰعِقَةُ وَأَنتُمۡ تَنظُرُونَ

৫৬। অতঃপর তোমাদের মৃত্যুর পর আমি তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলাম, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।	٥٦. ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

বানী ইসরাঈলের যারা আল্লাহকে দেখতে চেয়েছিল তাদের প্রাণ হরণ এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা

মূসা (আঃ) যখন বানী ইসরাঈলের সত্তরজন লোককে সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর ওয়াদা অনুযায়ী তূর পাহাড়ে যান এবং ঐ লোকগুলি আল্লাহর কথা শুনতে পায়, তখন তারা মূসাকে (আঃ) বলে যে, তারা আল্লাহকে সামনে না দেখা পর্যন্ত ঈমান আনবেনা। (তাবারী ২/৮১) এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা বলার ফলে দেখতে দেখতেই তাদের উপর আকাশ হতে বিদ্যুতের গর্জনে এক ভয়াবহ উচ্চ শব্দ হয়, এর ফলে তারা সবাই মারা যায়। এদিকে মূসা (আঃ) বিলাপ করতে থাকেন এবং কেঁদে কেঁদে মহান আল্লাহর নিকট আরয করেন ঃ 'হে আল্লাহ! আমি বানী ইসরাঈলকে কি উত্তর দিব! এরা তো তাদের মধ্যে উত্তম ও নেতৃস্থানীয় লোক ছিল। হে প্রভু! আপনার এরূপ করার ইচ্ছা থাকলে ইতোপূর্বেই তাদেরকে ও আমাকে মেরে ফেলতেন। হে আল্লাহ! অজ্ঞ লোকদের অজ্ঞতার কারণে আমাকে ধরবেননা।

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা মূসাকে (আঃ) জানিয়ে দিলেন যে, ঐ সত্তর ব্যক্তিও তাদের মধ্যে ছিল যারা বাছুরের পূজা করেছিল। অতঃপর আল্লাহ সাথে সাথেই এক ব্যক্তির জীবন ফিরিয়ে দেন এ জন্য যে, অন্যান্যদের জীবন কিভাবে পুনরায় ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে তা যেন সে অবলোকন করতে পারে। (ইব্ন আবী হাতিম ১/১৭৩)

আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এ আয়াত সম্পর্কে মন্তব্য করেন ঃ আল্লাহর সাথে কথোপকথনের পর মূসা (আঃ) যে প্রস্তরখন্ডে তাওরাতের বাণী লিখিত হয়েছিল তা সাথে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি দেখতে পেলেন যে, তাঁর অনুসারীরা তাঁর অনুপস্থিতিতে বাছুরের পূজা করতে শুরু করেছে। এরপর তিনি আল্লাহর আদেশে তাদেরকে একে অপরকে হত্যা করতে নির্দেশ দেন। তারা তা পালনও করে এবং আল্লাহও তাদেরকে ক্ষমা করেন। তিনি তাদেরকে বলেন ঃ এ পাথরখন্ডগুলিতে রয়েছে আল্লাহর বাণী, যাতে তিনি বলে দিয়েছেন যে, তোমরা কি পালন করবে এবং কি বর্জন করবে। তারা বলল ঃ 'তুমি বলেছ বলেই কি এ কথাগুলি বিশ্বাস করব? আল্লাহর শপথ! আমরা কখনই

বিশ্বাস করবনা, যতক্ষণ না আল্লাহ নিজে এসে আমাদেরকে দেখা দেন এবং বলেন ঃ ইহা আমিই অবতীর্ণ করেছি এবং তোমরা ইহা মেনে চল। হে মূসা! তিনি যেমন তোমার সাথে কথা বলেছেন তদ্রূপ কেন তিনি আমাদের সাথে কথা বলছেননা?' অতঃপর আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ (রহঃ) পাঠ করেন ঃ আল্লাহকে প্রকাশ্যভাবে না দেখা পর্যন্ত আমরা তোমার কথায় ঈমান আনবইনা।

সুতরাং তাদের উপর গযব নিপতিত হল, এক বজ্র-নিনাদ তাদের উপর আপতিত হল। ফলে তারা সবাই মারা গেল। অতঃপর আল্লাহ সেই মৃত লোকদের আবার প্রাণ ফিরিয়ে দেন। এরপর আবদুর রাহমান (রহঃ) পাঠ করেন ঃ তোমাদের মৃত্যুর পর আমি তোমাদেরকে পুর্নজীবিত করেছিলাম যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। এরপর বলেন, মূসা (আঃ) তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা আল্লাহর এই কিতাব ধারণ কর। তারা বলল ঃ না, তা হবার নয়। মূসা (আঃ) বললেন ঃ তোমাদের কি হয়েছে? তারা উত্তরে বলল ঃ শাস্তি স্বরূপ আমাদেরকে তো মৃত্যু দেয়া হয়েছিল, এখন আমরা জীবন ফিরে পেয়েছি। তাদের অবাধ্যতার জন্য আল্লাহ কয়েকজন মালাইকা পাঠালেন যারা তাদের মাথার উপর পাহাড় তুলে ধরল। (তাবারী ২/৮৮)

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বানী ইসরাঈলরা পুর্নজীবন লাভ করার পরেও আল্লাহর তরফ থেকে প্রাপ্ত আদেশসমূহ পালন করা তাদের জন্য আবশ্যকীয় ছিল। অবশ্য মাওয়ার্দী (রহঃ) বলেন যে, এ বিষয়ে দু'টি মতামত রয়েছে। প্রথম মতামত এই যে, যেহেতু বানী ইসরাঈলরা মৃত্যু এবং জীবন দানের মুজিযা নিজেরাই অবলোকন করেছে, তাই তাদের আর আদেশ পালন করার দরকার নেই। দ্বিতীয় মতামত হচ্ছে তাদেরকেও আল্লাহর আয়াতসমূহে বিশ্বাস ও তা মেনে চলতে হবে যাতে অন্যান্য প্রাপ্ত বয়স্করাও তাদের দেখে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে পারে। কুরতুবী (রহঃ) বলেন যে, এটাই সঠিক কথা। তিনি বলেন যে, বানী ইসরাঈলের যে দলটি মুজিযা প্রত্যক্ষ করেছে তার ফলে তাদের বিশ্বাস ও আমল করা বাতিল হয়ে যায়না। কারণ তারাইতো ঐ ঘটনা ও বিপদের জন্য দায়ী ছিল। আল্লাহই ভাল জানেন।

৫৭। এবং আমি তোমাদের উপর মেঘমালার ছায়া দান করেছিলাম এবং তোমাদের	٥٧. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ

প্রতি ‘মান্না’ ও ‘সালওয়া’ অবতীর্ণ করেছিলাম; আমি তোমাদেরকে যে উপজীবিকা দান করেছি সেই পবিত্র জিনিস হতে আহার কর; এবং তারা আমার কোন অনিষ্ট করেনি, বরং তারা নিজেদের অনিষ্ট করেছিল।	وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَىٰ ۖ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا رَزَقْنَـٰكُمْ ۖ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَـٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

আল্লাহর নি‘আমাত স্বরূপ মেঘের ছায়া, মান্না ও সালওয়া দান

উপরে বর্ণিত হয়েছিল যে, আল্লাহ তাদেরকে অমুক অমুক বিপদ হতে রক্ষা করেছিলেন। এখানে বর্ণিত হচ্ছে যে, মহান আল্লাহ তাদেরকে অমুক অমুক সুখ সম্ভোগ দান করেছেন।

একটা সাদা রংয়ের মেঘ ছিল যা ‘তীহের’ মাঠে তাদের উপর ছায়া দান করেছিল যেমন ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত একটি সুদীর্ঘ হাদীসে রয়েছে। (নাসাঈ ৬/৪০৫) ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন উমার (রাঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), আবূ মুযলিজ (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) এটাই বলেছেন। (ইব্ন আবী হাতিম ১/১৭৪) হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) এ কথাই বলেন। ইব্ন জারীর এবং অন্যান্য লোক বলেন যে, এ মেঘ সাধারণ মেঘ হতে বেশি ঠাণ্ডা ও উত্তম ছিল। (তাবারী ২/৯১) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এটা ঐ মেঘ ছিল যার মধ্যে মহান আল্লাহ কিয়ামাতের দিন আগমন করবেন। আবূ হুযাইফার (রহঃ) এটাই উক্তি।

‘মান্না’ ও ‘সালওয়া’ এর বিবরণ

যে ‘মান্না’ তাদেরকে দেয়া হত তা গাছের উপর অবতারণ করা হত। তারা সকালে গিয়ে তা জমা করত এবং ইচ্ছা মত খেয়ে নিত। হাসান বাসরী (রহঃ) ও কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, শিলার মত ‘মান্না’ তাদের ঘরে নেমে আসত, যা দুধের চেয়ে সাদা ও মধু অপেক্ষা বেশি মিষ্টি ছিল। সুবহি সাদিক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত অবতারিত হতে থাকত। প্রত্যেক লোক তার বাড়ীর জন্য ঐ পরিমাণ নিয়ে

নিত যা ঐ দিনের জন্য যথেষ্ট হত। কেহ বেশি নিলে তা পচে যেত। শুক্রবারে তারা শুক্র ও শনি এ দু'দিনের জন্য গ্রহণ করত। কেননা শনিবার ছিল তাদের জন্য সাপ্তাহিক খুশির দিন। সে দিন তারা জীবিকা অন্বেষণ করতনা। রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) বলেন যে, 'মান্না' ছিল মধু জাতীয় জিনিস যা তারা পানি দিয়ে মিশিয়ে পান করত। ইমাম বুখারীর (রহঃ) হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

মান্না' ব্যাঙ-এর ছাতার অন্তর্গত এবং ওর পানি চক্ষু রোগের ঔষধ। (ফাতহুল বারী ৮/১৪, মুসলিম ৩/১৬১৯, তিরমিযী ৬/২৩৫, নাসাঈ ৪/৩৭০, ইব্ন মাজাহ ২/১১৪৩, আহমাদ ১/১৮৭) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান বলেছেন। জামে'উত তিরমিযীতে আছে ঃ

আজওয়াহ নামক মাদীনার এক প্রকার খেজুর হচ্ছে জান্নাতী খাদ্য ও বিষক্রিয়া নষ্টকারী এবং ব্যাঙের ছাতা 'মান্না' এর অন্তর্গত ও চক্ষুরোগে আরোগ্যদানকারী। (তিরমিযী ৬/২৩৩, ২৩৫)

'সালওয়া' এক প্রকার পাখী, চড়ুই পাখি হতে কিছু বড়, রং অনেকটা লাল। দক্ষিণা বায়ু প্রবাহিত হত এবং ঐ পাখিগুলিকে জমা করে দিত। বানী ইসরাঈল নিজেদের প্রয়োজন মত ওগুলি ধরত এবং যবাহ করে খেত। একদিন খেয়ে বেশি হলে তা পচে যেত। শুক্রবার তারা দুই দিনের জন্য জমা করত। কেননা শনিবার তাদের জন্য সাপ্তাহিক খুশির দিন ছিল। সেই দিন তারা ইবাদাতে মশগুল থাকত এবং ঐদিন শিকার করা তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। (ইব্ন আবী হাতিম ১/১৭৯) কোন কোন লোক বলেছেন যে, ঐ পাখিগুলি কবুতরের সমান ছিল। দৈর্ঘ ও প্রস্থে এক মাইল জায়গা ব্যাপী ঐ পাখিগুলি বর্শা পরিমাণ উঁচু স্তুপ হয়ে জমা হত। ঐ তীহের মাঠে ঐ দু'টি জিনিস তাদের খাদ্যরূপে প্রেরিত হত, যেখানে তারা তাদের নাবীকে বলেছিল ঃ 'এ জঙ্গলে আমাদের আহারের ব্যবস্থা কিরূপে হবে?' তখন তাদের উপর 'মান্না' ও 'সালওয়া' অবতারিত হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كُلُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ

তোমাদেরকে যা কিছু পবিত্র জীবিকা দান করা হয়েছে তা আহার কর। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৬০) এ আয়াতে অতি সহজ সরল ভাষায় আদেশ করা হয়েছে যে, যা হালাল তা থেকে যেন মানুষ তাদের আহার্য গ্রহণ করে। অতঃপর আল্লাহ বলেন, তারা আমার কোনই ক্ষতি করেনি, বরং নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অর্থাৎ তিনি যে হালাল আহার্য দিয়েছেন তা থেকে খাদ্য গ্রহণ এবং তাঁর ইবাদাত

করার আদেশ করলে লোকেরা তা পালন না করে নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যেমনটি অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

كُلُوا۟ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُوا۟ لَهُۥ

তোমরা তোমাদের রাব্ব প্রদত্ত রিয্ক ভোগ কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ১৫)

কিন্তু বানী ইসরাঈলরা অবাধ্য হল। তারা ঈমান আনলনা এবং নিজেদের প্রতি যুল্ম করল। তারা নিজেদের চোখে মুযিজা প্রত্যক্ষ করল এবং বিভিন্ন ঘটনার স্বাক্ষী হওয়া সত্ত্বেও ঈমান এনে ধন্য হতে পারলনা।

অন্যান্য নাবীর (আঃ) সহচর থেকে সাহাবীগণের (রাঃ) মর্যাদা

বানী ইসরাঈলের এ আচার-আচরণকে সামনে রেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের (রাঃ) অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, তাঁরা কঠিন কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়েও এবং সীমাহীন দুঃখ কষ্ট সহ্য করেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের উপর ও আল্লাহ তা‘আলার ইবাদাতের উপর অটল ছিলেন। না তারা মু‘জিযা দেখতে চেয়েছিলেন, না দুনিয়ার কোন আরাম চেয়েছিলেন। তাবূকের যুদ্ধে তারা ক্ষুধার জ্বালায় যখন কাতর হয়ে পড়েন, তখন যার কাছে যেটুকু খাবার ছিল সব জমা করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হাযির করে বলেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের এ খাবারে বারাকাতের জন্য প্রার্থনা করুন।’ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রার্থনা করেন। আল্লাহ তা‘আলা সে প্রার্থনা মঞ্জুর করে তাতে বারাকাত দান করেন। তারা খেয়ে পরিতৃপ্ত হন এবং খাবারের পাত্র ভর্তি করে নেন। পিপাসায় তাদের প্রাণ শুকিয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু‘আর বারাকাতে এক খণ্ড মেঘ এসে পানি বর্ষিয়ে দেয়। তারা নিজেরা পান করেন, পশুকে পান করান এবং মশক, কলস ইত্যাদি ভর্তি করে নেন। সুতরাং সাহাবীগণের এই অটলতা, দৃঢ়তাপূর্ণ আনুগত্য এবং খাঁটি একাত্মবাদীতা তাদেরকে মূসার (আঃ) সহচরদের উপর নিশ্চিতরূপে মর্যাদা দান করেছে।

৫৮। এবং যখন আমি বললাম ঃ তোমরা এই নগরে	٥٨. وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُوا۟ هَـٰذِهِ

ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُوا۟ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَٱدْخُلُوا۟ ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا۟ حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَـٰيَـٰكُمْ ۚ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ	**প্রবেশ কর, অতঃপর যা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার কর এবং সাজদাবনতভাবে দ্বারে প্রবেশ কর এবং তোমরা বল ঃ আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করছি, তাহলে আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব এবং অচিরেই সৎ কর্মশীলগণকে অধিকতর দান করব।**
٥٩. فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِى قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ	**৫৯। অনন্তর যারা অত্যাচার করেছিল তাদেরকে যা বলা হয়েছিল, তৎপরিবর্তে তারা সেই কথার পরিবর্তন করল, পরে অত্যাচারীরা যে দুস্কর্ম করেছিল তজ্জন্য আমি তাদের উপর আকাশ হতে শাস্তি অবতীর্ণ করেছিলাম।**

সাহায্য প্রাপ্তির পর ইয়াহুদরা কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে আল্লাহদ্রোহী হল

মূসা (আঃ) বানী ইসরাঈলকে নিয়ে মিসরে আসেন এবং তাদেরকে পবিত্র ভূমিতে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়, যা ছিল তাদের পৈত্রিক ভূমি। সেখানে তাদেরকে আমালুকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার নির্দেশ দেয়া হয়, তখন তারা কাপুরুষতা প্রদর্শন করে, যার শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে তীহের মাঠে নিক্ষেপ করা হয়। যেমন সূরা মায়িদায় বর্ণিত হয়েছে। قَرْيَة এর ভাবার্থ হচ্ছে বাইতুল মুকাদ্দাস। (ইব্ন আবী হাতিম ১/১৮১) সুদ্দী (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আবূ মুসলিম (রহঃ) প্রভৃতি মনীষীগণ এটাই বলেছেন। কুরআন মাজীদে রয়েছে যে, মূসা (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন ঃ

يَٰقَوْمِ ٱدْخُلُوا۟ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِى كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا۟

হে আমার সম্প্রদায়! এই পুণ্য ভূমিতে প্রবেশ কর যা আল্লাহ তোমাদের জন্য লিখে দিয়েছেন, আর পিছনের দিকে ফিরে যেওনা। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ২১) (আর রাযী ৩/৮২) কেহ কেহ বলেন যে, এর দ্বারা 'আরীহা' নামক জায়গাকে বুঝান হয়েছে। আবার কেহ কেহ মিসরের কথা বলেছেন। কিন্তু এর ভাবার্থ 'বাইতুল মুকাদ্দাস' হওয়াই সঠিক কথা। এটা 'তীহ্' হতে বের হওয়ার পরের ঘটনা। চল্লিশ বছর ধরে এভাবে উদ্ভ্রান্তের জীবন যাপন শেষে ইউসা ইব্‌ন নূনের (আঃ) নেতৃত্বে আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাঈলকে কোন এক শুক্রবার ঊষা লগ্নে পুন্যভূমি অধিকার করার আদেশ দেন। ঐ দিন সূর্যাস্তের সময়কাল কিছু বিলম্বিত করা হয় যাতে ঐ দিনই বিজয় লাভ সম্ভব হয়। শুক্রবার সন্ধ্যার সময় আল্লাহ তা'আলা স্থানটি মুসলিমদের দ্বারা বিজিত করান।

বিজয়ের পর কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নতশিরে উক্ত শহরে প্রবেশ করার নির্দেশ দেন। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) সাজদাহর অর্থ রুকু নিয়েছেন। (তাবারী ২/১১৩) বর্ণনাকারী বলেন যে, এখানে সাজদাহর অর্থ বিনয় ও নম্রতা। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর দরজাটি ছিল কিবলার দিকে। ওর নাম ছিল বাবুল হিত্তাহ্, যা ছিল জেরুযালেমে। ইমাম রাযী (রহঃ) এ কথাও বলেছেন যে, দরজার অর্থ হচ্ছে এখানে কিবলার দিক।

সাজদাহর পরিবর্তে তারা পার্শ্বদেশের ভরে প্রবেশ করতে থাকে। মাথা নত করার পরিবর্তে উঁচু করে। حِطَّةٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে ক্ষমা। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এতে পাপের স্বীকারোক্তি রয়েছে। হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঃ 'হে আল্লাহ! আমাদের ভুল ত্রুটিগুলো দূর করে দিন।'

অতঃপর তাদের সাথে ওয়াদা করা হচ্ছে যে, যদি তারা এটাই বলতে বলতে শহরে প্রবেশ করে এবং বিজয়ের সময়েও বিনয় প্রকাশ করে আল্লাহর নি'আমাত ও নিজেদের পাপের কথা স্বীকার করে এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহলে এটা তাঁর নিকট খুবই প্রিয় বলে তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। এর মধ্যেই এ নির্দেশ দেয়া হয় ঃ

إِذَا جَآءَ نَصۡرُ ٱللَّهِ وَٱلۡفَتۡحُ. وَرَأَيۡتَ ٱلنَّاسَ يَدۡخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفۡوَاجٗا. فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ وَٱسۡتَغۡفِرۡهُۚ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابَۢا.

যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে দেখবে, তখন তুমি তোমার রবের কৃতজ্ঞতা বাচক পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং তাঁর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা কর; তিনি তো সর্বাপেক্ষা অধিক অনুতাপ গ্রহণকারী। (সূরা নাস্‌র, ১১০ ঃ ১-৩) সহীহ্ বুখারীতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'বানী ইসরাঈলকে আদেশ করা হয়েছিল যে, তারা যেন মাথা নত করে শহরে প্রবেশ করে। কিন্তু তারা তাদের পিছন দিক বাঁকা করে এবং মাথাকে সোজা রেখে প্রবেশ করল। তাদেরকে বলা হয়েছিল ঃ তোমরা *'হিত্তা'* বল (অর্থাৎ আমাদের ভুল ভ্রান্তি হওয়ায় ক্ষমা করুন)। কিন্তু তারা এ আদেশকে অগ্রাহ্য করল এবং বলল *'হাব্বাতুন ফী সা'রাতিন'*। (ফাতহুল বারী ৮/১৪) ইহা ছিল তাদের চরম ঔদ্ধত্য ও অবাধ্যতার বহিঃপ্রকাশ। তাদের পাপ ও বিরোধীতার কারণে তারা আল্লাহর ক্রোধে নিপতিত হয় এবং শাস্তিপ্রাপ্ত হয়। একটি মারফূ' হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

মহামারী একটি শাস্তি। ওটা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর অবতীর্ণ করা হয়েছিল। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/১৮৬) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমরা শুনবে যে, অমুক জায়গায় মহামারী আছে তখন তোমরা সেখানে যেওনা। (ফাতহুল বারী ১০/১৮৯, মুসলিম ৪/১৭৩৯) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন ঃ বিপদাপদ, দুঃখ, রোগ ইত্যাদি শাস্তি স্বরূপ, যা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকেও দেয়া হয়েছিল। (তাবারী ২/১১৬)

৬০। এবং যখন মূসা স্বীয় সম্প্রদায়ের জন্য পানি প্রার্থনা করেছিল তখন আমি বলেছিলাম ঃ তুমি স্বীয় লাঠি দ্বারা প্রস্তরে আঘাত কর, অনন্তর তা হতে দ্বাদশ প্রস্রবন বিনিঃসৃত হল,	٦٠. وَإِذِ ٱسۡتَسۡقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوۡمِهِۦ فَقُلۡنَا ٱضۡرِب بِّعَصَاكَ ٱلۡحَجَرَۖ فَٱنفَجَرَتۡ مِنۡهُ ٱثۡنَتَا

عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ	**প্রত্যেকেই স্ব স্ব স্থান জেনে নিল, তোমরা আল্লাহর উপজীবিকা হতে আহার কর ও পান কর এবং পৃথিবীতে শান্তি ভঙ্গকারী রূপে বিচরণ করনা।**

বারটি গোত্রের জন্য বারটি ঝর্ণা দান

এখানে বানী ইসরাঈলকে আর একটি নি'আমাতের কথা স্মরণ করানো হচ্ছে যে, যখন তাদের নাবী মূসা (আঃ) তাদের জন্য মহান আল্লাহর নিকট পানির প্রার্থনা জানালেন, তখন আল্লাহ তা'আলা বারটি প্রস্রবণ সেই পাথর হতে বের করলেন যা তাদের সাথে থাকত এবং তাদের প্রত্যেক গোত্রের জন্য তিনি এক একটি ঝর্ণা প্রবাহিত করে দেন যা প্রত্যেক গোত্র জেনে নেয়। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদেরকে বলেন যে, তারা যেন 'মান্না' ও 'সালওয়া' খেতে থাকে এবং ঐ ঝর্ণার পানি পান করতে থাকে, আর বিনা পরিশ্রমে প্রাপ্ত ঐ আহার্য ও পানীয় খেয়ে ও পান করে যেন তারা তাঁর ইবাদাত করতে থাকে, আর তারা যেন তাঁর অবাধ্য হয়ে দুনিয়ার বুকে ফাসাদ সৃষ্টি না করে, নচেৎ সেই নি'আমাত তাদের নিকট হতে কেড়ে নেয়া হবে।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ওটা একটা চার কোণ বিশিষ্ট পাথর ছিল যা তাদের সাথেই থাকত। আল্লাহর নির্দেশক্রমে মূসা (আঃ) ওর উপর লাঠি দ্বারা আঘাত করলে চার কোণা হতে তিনটি করে বারোটি ঝর্ণা বেরিয়ে আসে। পাথরটি বলদের মাথার মত ছিল যা বলদের উপর চাপিয়ে দেয়া হত। তারা যেখানে যেখানে অবতরণ করত, ওটা নামিয়ে রাখত এবং লাঠির আঘাত করতেই ওটা হতে ঝর্ণা বেরিয়ে আসত। (তাবারী ২/১২০)

সূরা আ'রাফেও এ ঘটনা বর্ণিত আছে। কিন্তু ঐ সূরাটি 'মাক্কী' বলে সেখানে ওটির বর্ণনা নাম পুরুষের সর্বনাম দ্বারা করা হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলা যেসব অনুগ্রহ তাদের উপর করেছিলেন, স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে তিনি তার পুনরাবৃত্তি করেছেন।

আর এই সূরাটি 'মাদানী' বলে এখানে স্বয়ং তাদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। সূরা আ'রাফে فَانْبَجَسَتْ বলেছেন এবং এখানে فَانْفَجَرَتْ বলেছেন। কেননা সেখানে প্রথম জারী হওয়ার অর্থ এবং এখানে শেষ অবস্থার বর্ণনা রয়েছে। আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৬১। এবং যখন তোমরা বলেছিলে - হে মূসা! আমরা একইরূপ খাদ্যে ধৈর্য ধারণ করতে পারছিনা, অতএব তুমি আমাদের জন্য তোমার রবের নিকট প্রার্থনা কর যেন তিনি আমাদের জন্মভূমিতে যা উৎপন্ন হয় তা হতে ওর শাক-শব্জি, ওর কাঁকুড়, ওর গম, ওর মসুর এবং ওর পিয়াজ উৎপাদন করেন। সে বলেছিল ঃ যা উৎকৃষ্ট তোমরা কি তার সঙ্গে যা নিকৃষ্ট তার বিনিময় করতে চাও? কোন নগরে উপনীত হও, তোমাদের প্রার্থিত দ্রব্যগুলি অবশ্যই প্রাপ্ত হবে।	٦١. وَإِذْ قُلْتُمْ يَـٰمُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَٰحِدٍ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنۢ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِى هُوَ أَدْنَىٰ بِٱلَّذِى هُوَ خَيْرٌ ۚ ٱهْبِطُوا۟ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ ۗ

বানী ইসরাঈলরা মান্না, সালওয়ার পরিবর্তে নিকৃষ্ট খাদ্য পছন্দ করল

এখানে বানী ইসরাঈলের অধৈর্য এবং আল্লাহ তা'আলার নি'আমাতের অমর্যাদা করার কথা বর্ণিত হচ্ছে। তারা 'মান্না' ও সালওয়া'র মত পবিত্র আহার্যের উপরেও ধৈর্য ধারণ করতে পারেনি এবং তার পরিবর্তে নিকৃষ্ট বস্তুর জন্য প্রার্থনা জানায়। হাসান বাসরী (রহঃ) বানী ইসরাঈল সম্পর্কে বলেন ঃ আল্লাহ তাদেরকে যে খাদ্য প্রদান করেছিলেন তা খেতে খেতে তারা ক্লান্ত বোধ

করছিল এবং অধৈর্য হয়ে পড়েছিল। পূর্বে তারা চাষাবাদ করে যে ডাল, রসুন, পিঁয়াজ এবং অন্যান্য শব্জি উৎপাদন করে আহার করত সেই কথা মনে পড়েছিল। তাই তারা বলল ঃ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىَ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُواْ مِصْراً فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ *এবং যখন তোমরা বলেছিলে ঃ হে মূসা! আমরা একইরূপ খাদ্যে ধৈর্য ধারণ করতে পারছিনা, অতএব তুমি আমাদের জন্য তোমার রবের নিকট প্রার্থনা কর যেন তিনি আমাদের জন্মভূমিতে যা উৎপন্ন হয় তা হতে ওর শাক-শব্জি, ওর কাঁকুড়, ওর গম, ওর মসুর এবং ওর পিয়াজ উৎপাদন করেন। সে বলেছিল ঃ যা উৎকৃষ্ট তোমরা কি তার সঙ্গে যা নিকৃষ্ট তার বিনিময় করতে চাও? কোন নগরে উপনীত হও, তোমাদের প্রার্থিত দ্রব্যগুলি অবশ্যই প্রাপ্ত হবে।*

আল্লাহ প্রদত্ত বিনা পরিশ্রমে পাওয়া খাদ্য-সম্ভারের পরিবর্তে ইয়াহুদীরা নিকৃষ্ট খাদ্যের আকাঙ্খা করায় তাদেরকে ধিক্কার দেয়া হয়েছে। বিনা পরিশ্রমে খাঁটি সুস্বাদু খাদ্যসামগ্রী তারা পরিহার করতে চাইল।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মূসা (আঃ) তাদেরকে বলেন ঃ 'তোমরা কোন এক শহরে চলে যাও।' উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ) এবং ইব্ন মাসউদের (রাঃ) কিরা'আতে مِصْرَ (মিস্‌রা)ও আছে এবং এর তাফসীরে মিসর শহর বুঝানো হয়েছে। مِصْرًا শব্দটি দ্বারাও নির্দিষ্ট 'মিসর' শহর ভাবার্থ নেয়া যেতে পারে। مِصْر এর অর্থ সাধারণ শহর নেয়াই উত্তম। তাহলে ভাবার্থ দাঁড়াবে এই ঃ 'তোমরা যা চাচ্ছ তা খুব সহজ জিনিস। যে কোন শহরে গেলেই ওটা পেয়ে যাবে। দু'আরই বা প্রয়োজন কি? তাদের এ কথা শুধুমাত্র অহংকার ও অবাধ্যতা হিসাবে ছিল বলে তাদেরকে কোন উত্তর দেয়া হয়নি। আল্লাহই সবচেয়ে বেশি জানেন।

এবং তাদের উপর লাঞ্ছনা ও দারিদ্রতা নিপতিত হল	وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ

এবং তারা আল্লাহর কোপে পতিত হল এই হেতু যে, নিশ্চয়ই তারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহে অবিশ্বাস করত এবং অন্যায়ভাবে নাবীগণকে হত্যা করত; এই হেতু যে, তারা অবাধ্যাচরণ করেছিল ও তারা সীমা অতিক্রম করেছিল।	وَٱلۡمَسۡكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ كَانُواْ يَكۡفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَيَقۡتُلُونَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعۡتَدُونَ

বানী ইসরাঈলকে লাঞ্ছনা ও দারিদ্রতা গ্রাস করল

ভাবার্থ এই যে, তাদের উপর লাঞ্ছনা ও দারিদ্রতা চিরস্থায়ী করে দেয়া হয়। অপমান ও হীনতা তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। তাদের নিকট হতে জিযিয়া কর আদায় করা হয়। তারা মুসলিমদের পদানত হয়। তাদেরকে উপবাস করতে হয় এবং ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিতে হয়। তাদের উপর আল্লাহর ক্রোধ ও অভিশাপ বর্ষিত হয়। আল্লাহ তাদেরকে মুসলিমদের পদানত করেছেন। মাজুসী বা অগ্নি-উপাসকদেরকে যখন জিযিয়া কর দিতে হত তখন মুসলিমরা আর্বিভুত হন। (ইব্ন আবী হাতিম ১/১৯৫, ১৯৬) এ ছাড়া আবুল আলীয়া (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেছেন যে, এখানে 'লাঞ্ছনা' অর্থ দারিদ্রতা। (ইব্ন আবী হাতিম ১/১৯৬) আতিয়্যিয়াহ আল আউফি (রহঃ) বলেন, লাঞ্ছনা বলা হয়েছে জিযিয়া কর প্রদান করাকে। (ইব্ন আবী হাতিম ১/১৯৬) এ ছাড়া যাহ্হাক (রহঃ) এ আয়াতের বিশ্লেষণে বলেন ঃ তারা আল্লাহর ক্রোধ অর্জন করেছে। (তাবারী ২/১৩৮)

তাদের অহংকার, অবাধ্যতা, সত্য গ্রহণে অস্বীকৃতি, আল্লাহর আয়াতসমূহের প্রতি অবিশ্বাস এবং নাবীগণ ও তাঁদের অনুসারীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা ইত্যাদির কারণেই তাদের প্রতি এসব শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছিল। আল্লাহর আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করা এবং তাঁর নাবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার চেয়ে বড় অপরাধ আর কী হতে পারে?

‘তাকাব্বুর’ শব্দের অর্থ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, ‘তাকাব্বুরের’ অর্থ হচ্ছে সত্য গোপন করা এবং জনগণকে ঘৃণার চোখে দেখা। (মুসলিম ১/৯৩) ইমাম আহমাদ (রহঃ) ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাত দিবসে যাদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে তারা হল ঐ সকল ব্যক্তি যারা কোন রাসূলকে হত্যা করেছে অথবা কোন রাসূল তাদেরকে হত্যা করেছে, অন্যায় বিচারকারী শাসক এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকলঙ্গকারী। (আহমাদ ১/৪০৭) আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا۟ وَّكَانُوا۟ يَعْتَدُونَ বানী ইসরাঈলকে এভাবে শাস্তি দেয়ার আরও একটি কারণ ছিল এই যে, তারা ছিল অবাধ্য এবং সীমা লঙ্ঘনকারী। তাদেরকে যে বিষয়ে নিষেধ করা হত তা তারা মেনে চলতনা এবং যে বিষয়ে তাদের কাজের সীমা বলে দেয়া হত সেই বিষয়ে তারা কম-বেশি করত। আল্লাহই এ বিষয়ে ভাল জানেন।

মালিক ইব্‌ন মারারাহ্ রাহভী (রাঃ) একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আরয করেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি একজন সুশ্রী লোক। আমি চাইনা যে, কারও জুতার শুকতলাও আমার চেয়ে সুন্দর হয়। তাহলে কি এটাও অবাধ্যতা ও অহংকার হবে?’ তিনি বললেন ঃ ‘না, বরং অহংকার ও অবাধ্যতা হচ্ছে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা এবং জনগণকে ঘৃণা করা।’

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘কিয়ামাতের দিন যাদের সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হবে তারা হচ্ছে ওরাই যাদেরকে নাবী হত্যা করেছেন অথবা তারা নাবীকে হত্যা করেছে, পথভ্রষ্ট শাসক এবং চিত্র শিল্পী।’

৬২। নিশ্চয়ই মুসলিম, ইয়াহুদী, খৃষ্টান এবং সাবেঈন সম্প্রদায়, (এদের মধ্যে) যারা আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং ভাল কাজ করে, তাদের জন্য তাদের রবের	٦٢. إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلنَّصَـٰرَىٰ وَٱلصَّـٰبِـِٔينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ

নিকট পুরস্কার রয়েছে, তাদের কোন প্রকার ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবেনা।	وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَعَمِلَ صَـٰلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

সৎ আমলকারীগণের জন্য সব সময়েই রয়েছে উত্তম প্রতিদান

এ আয়াতে পূর্বে অবাধ্যদের শাস্তির বর্ণনা ছিল। এখানে তাদের মধ্যে যারা ভাল লোক তাদের প্রতিদানের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। নাবীগণের অনুসারীদের জন্য এ সু-সংবাদ কিয়ামাত পর্যন্ত রয়েছে যে, তারা ভবিষ্যতের ভয় হতে নির্ভয় এবং অতীতের হাতছাড়া হয়ে যাওয়া জিনিসের জন্য আফসোস করা হতে পবিত্র। অতএব যে নিরক্ষর নাবী ও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করবে সে প্রাপ্ত হবে অন্তহীন শান্তি এবং ভবিষ্যতের কোন আশংকার জন্য সে ভীত হবেনা, আর অতীতে কোন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার জন্য সে দুঃখিতও হবেনা। অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

মনে রেখ, আল্লাহর বন্ধুদের না কোন আশংকা আছে, আর না তারা বিষন্ন হবে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৬২) যে মালাইকা/ফেরেশতাগণ মুসলিমদের রূহ্ বের করার জন্য আগমন করেন তাঁদের কথা উদ্ধৃত করে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَـٰمُوا۟ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا۟ وَلَا تَحْزَنُوا۟ وَأَبْشِرُوا۟ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ

যারা বলে ঃ আমাদের রাব্ব আল্লাহ! অতঃপর অবিচল থাকে, তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় মালাইকা (ফেরেশতা) এবং বলে ঃ তোমার ভীত হয়োনা, চিন্তিত হয়োনা এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ৩০)

'মু'মিন' শব্দের অর্থ

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, এ আয়াতের পর আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি (৩ ঃ ৮৫) অবতীর্ণ করেন। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/১৯৮) ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা কোন ব্যক্তির আমল কবূল করবেননা যদি ঐ আমল রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ মত করা না হয়। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে অন্যান্য নাবীর উম্মাতরা তাদের নাবীর মতাদর্শ অনুযায়ী আমল করলে তা ছিল গ্রহণযোগ্য, কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের পর তাঁর পূর্ববর্তী নাবীগণের (আঃ) নির্দেশিত পথ ও আমল গ্রহণযোগ্য থাকলনা।

সালমান ফারাসী (রাঃ) বলেন ঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হওয়ার পূর্বে যেসব ধর্মপ্রাণ লোকের সাথে সাক্ষাৎ করি, তাদের সালাত, সিয়াম ইত্যাদির বর্ণনা দেই। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় (মুসনাদ ইব্‌ন আবী হাতিম)।' আর একটি বর্ণনায় আছে যে, সালমান ফারাসী (রাঃ) তাঁদের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন ঃ 'তারা সালাত আদায়কারী, সিয়াম পালনকারী ও ঈমানদার ছিল এবং আপনি যে প্রেরিত পুরুষ এর উপরও তাদের বিশ্বাস ছিল।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তারা জাহান্নামী।' এতে সালমান (রাঃ) দুঃখিত হলে তখন আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। কিন্তু এটা স্পষ্ট কথা যে, ইয়াহুদীদের মধ্যে ঈমানদার ঐ ব্যক্তি যে তাওরাতের উপর ঈমান আনে এবং তা অনুযায়ী কাজ করে, কিন্তু যখন ঈসা (আঃ) আগমন করেন তখন তাঁরও অনুসরণ করে এবং তাঁর নাবুওয়াতকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু তখনও যদি তাওরাতের উপর অটল থাকে এবং ঈসাকে (আঃ) অস্বীকার করে এবং তাঁর অনুসরণ না করে তাহলে সে বেদীন হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে, খৃষ্টানদের মধ্যে ঈমানদার ঐ ব্যক্তি যে ইঞ্জীলকে আল্লাহর কিতাব বলে বিশ্বাস করে, ঈসার (আঃ) শারীয়াত অনুযায়ী আমল করে এবং শেষ নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পেলে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে ও তাঁর নাবুওয়াতকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু তখনও যদি ইঞ্জীল ও ঈসার (আঃ) আনুগত্যের উপর স্থির থাকে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ না করে তাহলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। সুদ্দীও (রহঃ) এটাই বর্ণনা করেছেন। সাঈদ ইব্‌ন যুবাইরও (রহঃ) ইহাই বলেছেন। ভাবার্থ এই

যে, প্রত্যেক নাবীর অনুসারী, তাঁকে মান্যকারী হচ্ছেন ঈমানদার ও সৎলোক। সুতরাং সে আল্লাহ তা'আলার নিকট মুক্তি পেয়ে যাবে। কিন্তু তার জীবিতাবস্থায়ই যদি অন্য নাবী এসে যান এবং আগমনকারী নাবীকে সে অস্বীকার করে তাহলে সে কাফির। কুরআন মাজীদের অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ 'যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম অনুসন্ধান করে, তা কবূল করা হবেনা এবং আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। এই দু'টি আয়াতের মধ্যে আনুকূল্য এটাই। কোন ব্যক্তির কোন কাজ ও কোন পন্থা গ্রহণীয় নয় যে পর্যন্ত না শারীয়াতে মুহাম্মাদীর অনুসারী হয়। কিন্তু এটা সে সময় যে সময় তিনি প্রেরিত নাবী রূপে দুনিয়ায় এসে গেছেন। তাঁর পূর্বে যে নাবীর যুগ ছিল এবং যেসব লোক সে যুগে ছিল তাদের জন্য ঐ নাবীর অনুসরণ ও তাঁর শারীয়াতেরও অনুসরণ করা শর্ত।

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَـٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ

আর যে কেহ ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম অন্বেষণ করে তা কখনই তার নিকট হতে গৃহীত হবেনা এবং পরলোকে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৮৫)

'ইয়াহুদ' এর ইতিহাস

ইয়াহুদীরা হল মূসার (আঃ) অনুসারী। তাদের ধর্মীয় আইন-কানূন তাওরাতের বাণী অনুযায়ী করা হয়েছে বলে তারা দাবী করে থাকে। ইয়াহুদ শব্দের অর্থ অনুশোচনা বা অনুতপ্ত হওয়া, যেমনটি মূসা (আঃ) বলেছিলেন 'ইন্না হুদনা ইলাইকা' অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমরা তোমার কাছে অনুশোচনাকারী। এ থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, তাদেরকে এ জন্য ইয়াহুদ বলা হত যে, তারা ছিল অনুশোচনাকারী এবং একে অন্যের প্রতি দয়ার্দ্র।

আবার কেহ কেহ বলেন যে, তারা ইয়াহুদের সন্তান ছিল বলে তাদেরকে ইয়াহুদী বলা হয়েছে। ইয়াকূবের (আঃ) বড় ছেলের নাম ছিল ইয়াহুদ। একটি মত এও আছে যে, তারা তাওরাত পড়ার সময় নড়াচড়া করত বলে তাদেরকে ইয়াহুদ অর্থাৎ হরকতকারী বলা হয়েছে।

খৃষ্টানদের কেন 'নাসারা' বলা হয়

ঈসার (আঃ) নাবুওয়াতের যুগ এলে বানী ইসরাঈলের উপর তাঁর নাবুওয়াতকে বিশ্বাস করা এবং তাঁর অনুসারী হওয়া ওয়াজিব হয়ে যায় এবং তাদের নাম হয় 'নাসারা' অর্থাৎ সাহায্যকারী। কেননা তারা একে অপরের সাহায্য

করেছিল। তাদেরকে আনসারও বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ঈসার (আঃ) কথা উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে ঃ

مَنۡ أَنصَارِىٓ إِلَى ٱللَّهِۖ قَالَ ٱلۡحَوَارِيُّونَ نَحۡنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ

আল্লাহর পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে? হাওয়ারীগণ বলেছিল ঃ আমরাই তো আল্লাহর পথে সাহায্যকারী। (সূরা সাফফ, ৬১ ঃ ১৪) কেহ কেহ বলেন যে, এসব লোক যেখানে অবতরণ করে ঐ জায়গার নাম ছিল 'নাসেরাহ', এ জন্য তাদেরকে 'নাসারা' বলা হয়েছে। কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্ন জুরাইজের (রহঃ) এটাই মত। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী। نَصَارَى শব্দটি نَصْرَان শব্দের বহুবচন।

অতঃপর যখন শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ এসে গেল এবং তিনি সারা দুনিয়ার জন্য রাসূলরূপে প্রেরিত হলেন তখন তাদের সবারই উপর তাঁর সত্যতা স্বীকার ও তাঁর অনুসরণ ওয়াজিব হয়ে গেল। আর তাঁর উম্মাতের ঈমান বা বিশ্বাসের পরিপক্কতার কারণে তাদের নাম রাখা হয় মু'মিন এবং এ জন্যও যে, পূর্বের নাবীগণের প্রতি ও ভবিষ্যতের সমস্ত কথার প্রতিও তাদের ঈমান রয়েছে।

সাবেঈ দল

صَابِئْ এর একটি অর্থ তো হচ্ছে বেদীন ও ধর্মহীন। এটা আহলে কিতাবের একটি দলেরও নাম ছিল যারা 'যাবূর' পড়তো।

সুফিয়ান শাওরীর (রহঃ) মতে ইয়াহুদ ও মাজুস ধর্মের মিশ্রণেই ছিল এ মাযহাবটি। (আর রাযী ৩/৯৭) মুজাহিদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং ইব্ন আবী নাজীহর (রহঃ) এটাই ফাতওয়া। (তাবারী ২/১৪৬)

কুরতুবী (রহঃ) বলেন ঃ 'আমি যেটুকু জেনেছি তাতে বুঝেছি যে, সাবেঈরা আল্লাহর একাত্মবাদে বিশ্বাসী ছিল, কিন্তু তারকার ফলাফলের প্রতি এবং নক্ষত্রের প্রতিও তারা বিশ্বাসী ছিল। ইমাম রাযী (রহঃ) বলেন যে, তারা ছিল তারকা পূজারী। তারা কাসরানীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল যাদের নিকট ইবরাহীম (আঃ) প্রেরিত হয়েছিলেন। প্রকৃত অবস্থা তো আল্লাহ তা'আলাই জানেন। তবে বাহ্যতঃ এ মতটিই সঠিক বলে মনে হচ্ছে যে, এসব লোক ইয়াহুদী, খৃষ্টান, মাজুসী বা মুশরিক ছিলনা। বরং তারা স্বভাব ধর্মের উপর ছিল। তারা কোন বিশেষ

মাযহাবের অনুসারী ছিলনা। এই অর্থেই মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণকে (রাঃ) ‘সাবী’ বলত, অর্থাৎ তাঁরা সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করেছেন। কোন কোন আলেমের মত এই যে, ‘সাবী’ তারাই যাদের কাছে কোন নাবীর দা‘ওয়াত পৌঁছেনি। আল্লাহই সবচেয়ে বেশি জানেন।

৬৩। এবং যখন আমি তোমাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং তোমাদের উপর তূর পর্বত সমুচ্চ করেছিলাম যে, আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা দৃঢ় রূপে ধারণ কর এবং এতে যা আছে তা স্মরণ কর - সম্ভবতঃ তোমরা নিস্কৃতি পাবে।	٦٣. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَٰقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُوا۟ مَآ ءَاتَيْنَٰكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُوا۟ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
৬৪। এরপর পুনরায় তোমরা ফিরে গেলে। অতএব যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তাঁর করুণা না থাকত তাহলে অবশ্যই তোমরা বিনাশ প্রাপ্ত হতে।	٦٤. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۖ فَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَٰسِرِينَ

ইয়াহুদীদের কাছ থেকে যে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল

এ আয়াত দু’টিতে আল্লাহ তা‘আলা বানী ইসরাঈলকে আহাদ ও অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন ঃ ‘আমার ইবাদাত ও আমার নাবীর অনুসরণের অঙ্গীকার আমি তোমাদের কাছে নিয়েছিলাম এবং সেই অঙ্গীকার পূরা করার জন্য আমি তূর পাহাড়কে তোমাদের মাথার উপর সমুচ্চ করেছিলাম।’ যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَإِذْ نَتَقْنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُۥ ظُلَّةٌ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُۥ وَاقِعٌۢ بِهِمْ خُذُوا۟ مَآ ءَاتَيْنَٰكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُوا۟ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

যখন আমি বানী ইসরাঈলের উপর পাহাড়কে স্থাপন করি, ওটা ছিল কোন একটি ছায়ার ন্যায়, তারা তখন মনে করেছিল যে, ওটা তাদের উপর পড়ে যাবে। (আমি বলেছিলাম) তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা দৃঢ়ভাবে শক্ত হাতে ধারণ কর এবং ওতে যা রয়েছে তা স্মরণ রেখ। আশা করা যায় যে, তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হবে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৭১)

এখানে যে পাহাড়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা হল 'তূর' পাহাড়, যার বর্ণনা পাওয়া যায় সূরা আরাফে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), 'আতা (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), যাহ্‌হাক (রহঃ), রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ) এবং অন্যান্যদের তাফসীরে এরূপ জানা যায়। আর এটাই স্পষ্ট। ইব্‌ন অব্বাস (রাঃ) বলেন, 'তূর' ঐ পাহাড়কে বলা হয় যার উপর গাছ পালা জন্মে। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/২০৩) ফিতনার হাদীসে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তারা আনুগত্য স্বীকারে অসম্মত হলে পাহাড়টি তাদের মাথার উপর উঠিয়ে দেয়া হয় যেন তারা আনুগত্য স্বীকারে সম্মত হতে বাধ্য হয়। (নাসাঈ ৬/৩৯৬)

'যা আমি দিয়েছি' এর ভাবার্থ হচ্ছে 'তাওরাত'। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/২০৪) قُوَّةً এর অর্থ হচ্ছে 'শক্তি।' মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে তোমরা তাওরাতকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর। আবুল আলীয়া (রহঃ) এবং রাবী (রহঃ) বলেন, উহা পাঠ কর এবং আমল করার অঙ্গীকার কর। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/২০৫) আর 'এতে যা আছে তা স্মরণ কর অর্থাৎ তাওরাত পড়তে থাক। কিন্তু তারা এত বড় শক্ত অঙ্গীকারকেও গ্রাহ্য করলনা এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করল।

৬৫। এবং অবশ্যই তোমরা অবগত আছ যে, তোমাদের মধ্যে যারা শনিবারের ব্যাপারে সীমা লংঘন করেছিল আমি তাদেরকে বলেছিলাম যে, তোমরা অধম বানর হয়ে যাও।	٦٥. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا۟ مِنكُمْ فِى ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا۟ قِرَدَةً خَـٰسِـِٔينَ
৬৬। অনন্তর আমি এটা তাদের সমসাময়িক ও	٦٦. فَجَعَلْنَـٰهَا نَكَـٰلًا لِّمَا بَيْنَ

Contents

يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ	**তাদের পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত এবং ধর্মভীরুগণের জন্য উপদেশ স্বরূপ করেছিলাম।**

ইয়াহুদীদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং চেহারার পরিবর্তন

সূরা আ'রাফের ১৬৩ আয়াতে এ ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে এর তাফসীরও ইনশাআল্লাহ পূর্ণভাবে করা হবে। ঐলোকগুলো আইলা নামক গ্রামের অধিবাসী ছিল। শনিবার দিনের সম্মান করা তাদের উপর ফারয করা হয়েছিল। ঐ দিন শিকার করা তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। আর মহান আল্লাহর হুকুমে সেই দিনই নদীর তীরে মাছ খুব বেশি আসত। তারা একটা কৌশল অবলম্বন করত। একটা গর্ত খনন করে শনিবারে ওর মধ্যে জাল, রশি ও ঝোপ-ঝাড় ফেলে রাখত। শনিবার মাছসমূহ ঐ ফাঁদে পড়ত এবং রোববার রাতে তারা ওগুলি ধরে নিত। ঐ অপরাধের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের রূপ পাল্টে দেন। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যুবকেরা বানর হয়েছিল এবং বুড়োরা শূকর হয়েছিল। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/২১০) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, নারী পুরুষ সবাই লেজযুক্ত বানর হয়ে গিয়েছিল। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/২০৯) আকাশ থেকে বাণী হয় ঃ 'তোমরা সব বানর হয়ে যাও।' আর তেমনই সব বানর হয়ে যায়। যেসব লোক তাদেরকে ঐ কৌশল অবলম্বন করতে নিষেধ করেছিল তারা তখন তাদের নিকট এসে বলতে থাকে ঃ 'আমরা কি তোমাদেরকে পূর্বেই নিষেধ করিনি?' তখন তারা মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, অল্প সময়ের মধ্যে তারা সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের বংশ বৃদ্ধি হয়নি। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/২০৯) দুনিয়ায় কোন আকার পরিবর্তিত বিকৃত গোত্র তিন দিনের বেশি বাঁচেনি। এরাও তিন দিনের মধ্যেই ধ্বংস হয়ে যায়। নাক ঘসতে ঘসতে তারা সব মরে যায়। পানাহার ও বংশ বৃদ্ধি সবই বিদায় নেয়। যে বানরগুলো এখন আছে এবং তখনও ছিল, এরা তো জন্তু এবং এরা গতানুগতিকভাবেই সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যা চান এবং যেভাবে চান সেভাবেই সৃষ্টি করেন। (তাবারী ২/১৬৭) তিনি মহান, ক্ষমতাবান।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, শুক্রবারের মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করা তাদের উপর ফার্য করা হয়, কিন্তু তারা শুক্রবারের পরিবর্তে শনিবারকে পছন্দ করে। ঐ দিনের সম্মানার্থে তাদের জন্য ঐ দিন শিকার করা হারাম করা হয়। ওদিকে আল্লাহর পরীক্ষা হিসাবে ঐদিনই সমস্ত মাছ নদীর ধারে চলে আসত এবং লাফ-ঝাঁপ দিত। অন্য দিন ওগুলি দেখাই যেতনা। কিছু দিন পর্যন্ত তো ঐসব লোক নীরবই থাকে এবং শিকার করা হতে বিরত থাকে। একদিন ওদের মধ্যে এক লোক এই ফন্দি বের করে যে, শনিবার মাছ ধরে জালের মধ্যে আঁটকে দেয় এবং তীরের কোন জিনিসের সঙ্গে বেঁধে রাখে। এরপর রোববার দিন গিয়ে ওগুলি বের করে নেয় এবং বাড়ীতে এনে রান্না করে খায়। মাছের সুঘ্রান পেয়ে লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলে ঃ 'আমি তো আজ রোববার মাছ শিকার করেছি।' অবশেষে এ রহস্য প্রকাশ হয়ে যায়। লোকেরাও ঐ কৌশল পছন্দ করে এবং ঐভাবে তারাও মাছ শিকার করতে থাকে। কেহ কেহ নদীর তীরে গর্ত খনন করে। শনিবার মাছগুলি ঐ গর্তের ভিতরে জমা হলে তারা ওর মুখ বন্ধ করে দিত। রোববার ধরে নিত। তাদের মধ্যে যারা খাঁটি মু'মিন ছিল তারা তাদেরকে এ কাজে বাধা দিত এবং নিষেধ করত। কিন্তু তাদের উত্তর এই হত 'আমরা তো শনিবার শিকারই করিনা, শিকার করি আমরা রোববার।'

শিকারীরা ও নিষেধকারীদের ছাড়া আরও একটি দল সৃষ্টি হয়, যারা দুই দলকেই সন্তুষ্ট রাখত। তারা নিজেরা শিকার করত না বটে, কিন্তু যারা শিকার করত তাদেরকে নিষেধও করতনা। বরং নিষেধকারীগণকে বলত ঃ 'তোমরা এমন সম্প্রদায়কে উপদেশ কেন দিচ্ছ যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ধ্বংস করবেন কিংবা কঠিন শাস্তি দিবেন? তোমরা তো তোমাদের কতর্ব্য পালন করেছ যেহেতু তাদেরকে নিষেধ করেছ। তারা যখন মানছে না তখন তাদেরকে তাদের কাজের উপর ছেড়ে দাও।' তখন নিষেধকারীগণ উত্তর দিত ঃ 'প্রথমতঃ এ জন্য যে, আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট ওজর পেশ করতে পারব। দ্বিতীয়তঃ এ জন্যও যে, তারা হয়ত আজ না হলে কাল কিংবা কাল না হলে পরশু আমাদের কথা মানতে পারে এবং আল্লাহর কঠিন শাস্তি হতে মুক্তি পেয়ে যেতে পারে।' অবশেষে এই মু'মিন দলটি সেই কৌশলীদল হতে সম্পূর্ণ রূপে সম্পর্ক ছিন্ন করল এবং তাদের থেকে পৃথক হয়ে গেল। গ্রামের মধ্যস্থলে একটি প্রাচীর দিয়ে দিল। একটি দরজা দিয়ে এরা যাতায়াত করত এবং অপর দরজা দিয়ে ঐ ফাঁকিবাজেরা যাতায়াত করত। এভাবেই দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়। হঠাৎ এক বিস্ময়কর ঘটনা

ঘটে। একদা রাত্রি শেষে ভোর হয়েছে। মু'মিনরা সব জেগে উঠেছেন। কিন্তু এ পর্যন্ত ঐ ফন্দিবাজেরা তাদের দরজা খুলছেনা এবং কোন সাড়া শব্দও পাওয়া যাচ্ছেনা। মু'মিনরা বিস্মিত হলেন যে, ব্যাপার কি? অনেক বিলম্বের পরেও যখন তাদের কোন খোঁজ পাওয়া গেলনা তখন তারা প্রাচীরের উপরে উঠে গেল। সেখানে এক বিস্ময়কর দৃশ্য তারা অবলোকন করল। তারা দেখল যে, ঐ ফন্দিবাজেরা নারী ও শিশুসহ সবাই বানর হয়ে গেছে। তাদের ঘরগুলি রাতে যেমন বন্ধ ছিল ঐরূপ বন্ধই আছে, আর ভিতরের সমস্ত মানুষ বানরের আকার বিশিষ্ট হয়ে গেছে এবং ওদের লেজও গজিয়েছে। শিশুরা ছোট বানর, পুরুষেরা বড় বানর এবং নারীরা বানরীতে পরিণত হয়েছে। প্রত্যেককেই চেনা যাচ্ছে যে, এ অমুক লোক সে অমুক নারী এবং এ অমুক শিশু ইত্যাদি।

এতে যে শুধু মাছ শিকারকারীরাই ধ্বংস হয়েছিল তা নয়, বরং যারা তাদেরকে শুধু নিষেধ করেই চুপচাপ বসে থাকত এবং তাদের সাথে মেলা-মেশা বন্ধ করতনা তারাও ধ্বংস হয়েছিল। এ শাস্তি থেকে শুধুমাত্র তারাই মুক্তি পেয়েছিল যারা তাদেরকে নিষেধ করে তাদের থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হয়েছিল।

যে ইয়াহুদীদের বানর ও শুকরে রূপান্তরিত করা হয়েছিল তাদের বংশধর বর্তমানের বানর ও শুকর নয়

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْأَخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰٓ

ফলে আল্লাহ তাকে ধৃত করলেন আখিরাতের ও ইহকালের দন্ডের নিমিত্ত। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ২৫)

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْأَيَٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

আমি তো ধ্বংস করেছিলাম তোমাদের চতুস্পার্শ্ববর্তী জনপদসমূহ; আমি তাদেরকে বিভিন্নভাবে আমার নিদর্শনাবলী বিবৃত করেছিলাম, যাতে তারা ফিরে আসে সৎ পথে। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ২৭)

যাহ্হাক (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, বানী ইসরাঈলের পাপের শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে বানরে রূপান্তরিত করা হয়। তারা পৃথিবীতে মাত্র তিন দিন জীবিত ছিল, কারণ রূপান্তরিত কোন ব্যক্তি তিন দিনের বেশি বাঁচেনা। তারা আহার করতনা, পান করতনা এবং তারা কোন বংশধরও রেখে যায়নি। আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন, যাকে যেমনভাবে ইচ্ছা তেমনভাবে রূপান্তরিত

করেন। বানর, শুকর এবং অন্যান্য প্রাণী আল্লাহ তা'আলা ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন যা তাঁর কিতাব থেকে জানা যায়। (তাবারী ২/১৬৭)

পবিত্রতা লংঘন করার কারণে সাব্বাদবাসীদের জন্যও আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিলেন। অনুরূপভাবে আল্লাহ ফির'আউন সম্পর্কে বলেন ঃ

فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْأَخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰٓ

ফলে আল্লাহ তাকে ধৃত করলেন আখিরাতের ও ইহকালের দন্ডের নিমিত্ত। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ২৫) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ ঐ জনপদকে এর পার্শ্ববর্তী অন্যান্যদের জন্য উদাহরণ হিসাবে রেখে দিয়েছেন যাতে তারা এ থেকে শিক্ষা লাভ করে। তারা দেখুক যে, কেমন ছিল সেই শাস্তি! অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْأَيَٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

আমি তো ধ্বংস করেছিলাম তোমাদের চতুস্পার্শ্ববর্তী জনপদসমূহ; আমি তাদেরকে বিভিন্নভাবে আমার নিদর্শনাবলী বিবৃত করেছিলাম, যাতে তারা ফিরে আসে সৎ পথে। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ২৭)

অতএব আল্লাহর আযাবের নিদর্শন ও শিক্ষনীয় তাদের জন্যও যারা পরবর্তী সময়ে পৃথিবীতে আগমন করবে এবং কিতাবের মাধ্যমে ঘটনা জানতে পারবে। আয়াতের ভাবার্থ এও যে, গ্রামবাসী যে বিপর্যয় ও শাস্তির সম্মুখীন হয়েছিল তার কারণ ছিল আল্লাহর নিষেধাজ্ঞাকে অবজ্ঞা করা ও তাদের কপটতা। সুতরাং যাদের অন্তরে আল্লাহ-ভীতি রয়েছে তারা এ থেকে শিক্ষা লাভ করবে যাতে গ্রামবাসীদের প্রতি যে শাস্তি নেমে এসেছিল তা তাদের উপর পতিত না হয়। ইমাম আবূ আবদুল্লাহ ইব্ন বাত্তাহ (রহঃ) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তেমনটি করনা যা ইয়াহুদীরা করেছিল। আল্লাহ তাদেরকে যা নির্দেশ করেছিলেন তা তারা অমান্য করেছে ফন্দি করার মাধ্যমে। (ইরওয়া আল গালিল ৫/৩৭৫) এ হাদীসটি সম্পূর্ণ সহীহ, এর সমস্ত বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। আল্লাহই সবচেয়ে বেশি জানেন।

৬৭। এবং যখন মূসা নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিল ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন যে, তোমরা	٦٧. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا۟ بَقَرَةً

একটি গরু যবাহ কর। তারা বলেছিল ঃ তুমি কি আমাদেরকে উপহাস করছ? সে বলেছিল ঃ আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যেন আমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত না হই।	قَالُوٓاْ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَٰهِلِينَ

বানী ইসরাঈলের নিহত ব্যক্তি ও গাভীর ঘটনা

আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাঈলকে আর একটি নি'আমাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি একটি গরুর মাধ্যমে একটি নিহত লোককে জীবিত করেন এবং তার হত্যাকারীর পরিচয় দান করেন। এটি একটি অলৌকিক ঘটনাই বটে।

মুসনাদ ইব্ন আবী হাতিমে রয়েছে যে, বানী ইসরাঈলের মধ্যে এক ধনী বন্ধ্যা লোক ছিল, তার কোন ছেলে মেয়ে ছিলনা। তার উত্তরাধিকারী ছিল তার এক ভ্রাতুস্পুত্র। সত্বর উত্তরাধিকার প্রাপ্তির আশায় সে তার পিতৃব্যকে হত্যা করে এবং রাতে তাদের গ্রামের একটি লোকের দরজার উপরে রেখে আসে। সকালে গিয়ে ঐ লোকটির উপর হত্যার অপবাদ দেয়। অবশেষে উভয় দলের লোকদের মধ্যে মারামারি ও খুনাখুনি হওয়ার উপক্রম হয়। এমন সময় তাদের জ্ঞানী লোকেরা তাদেরকে বলেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল (মূসা (আঃ)) বিদ্যমান থাকতে তোমরা কেন একে অপরকে হত্যা করবে?' সুতরাং তারা মূসার (আঃ) নিকট এসে ঘটনাটি বর্ণনা করে। তিনি তাদেরকে বলেন ঃ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গরু যবাহ করার নির্দেশ দিচ্ছেন।' এ কথা শুনে তারা বলল ঃ 'আপনি কি আমাদেরকে উপহাস করছেন?' তিনি বলেন ঃ 'মূর্খদের ন্যায় কাজ করা হতে আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।' তারা যদি কোন একটি গরু যবাহ করত তাহলেই যথেষ্ট হত। কিন্তু তারা কাঠিন্য অবলম্বন করে, সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর তা কঠিন করে দেন।

অতঃপর তারা আল্লাহর বর্ণিত নির্ধারিত গরু একটি লোকের নিকট প্রাপ্ত হয়। একমাত্র তার নিকট ছাড়া ঐ রূপ গরু আর কারও কাছে ছিলনা। লোকটি বলে ঃ 'আল্লাহর শপথ! এই গরুর চামড়া পূর্ণ স্বর্ণের কম মূল্যে আমি এটা বিক্রি করবনা।' সুতরাং তারা ঐ মূল্যেই তা কিনে নেয় এবং যবাহ করে। তারপর তারা

ওর এক খণ্ড মাংস দ্বারা নিহত ব্যক্তির উপর আঘাত করে। তখন মৃত লোকটি দাঁড়িয়ে যায়। লোকগুলো তাকে জিজ্ঞেস করে ঃ তোমাকে কে হত্যা করেছে? সে বলে ঃ আমার এই ভ্রাতুস্পুত্র। এ কথা বলেই সে পুনরায় মরে যায়। সুতরাং ভ্রাতুস্পুত্রকে মৃত ব্যক্তির কোন মাল দেয়া হলনা। অতঃপর সাব্যস্ত হয়েছে যে, কোন ব্যক্তির সম্পদ লাভের অসৎ উদ্দেশে যদি কেহ তাকে হত্যা করে তাহলে মৃত ব্যক্তির সম্পদ থেকে ঐ হত্যাকারী কোন কিছুই প্রাপ্ত হবেনা। (ইব্ন আবী হাতিম ১/১১৪) ইব্ন জারীরও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬৮। তারা বলেছিল ঃ তুমি আমাদের জন্য তোমার রবের নিকট প্রার্থনা কর যে, তিনি আমাদেরকে যেন ওটা কি কি গুণ বিশিষ্ট হওয়া দরকার তা বলে দেন। সে বলেছিল ঃ তিনি বলেছেন যে, নিশ্চয়ই সেই গরু বয়ঃবৃদ্ধ নয় এবং শাবকও নয়, এ দু'য়ের মধ্যবর্তী; অতএব তোমরা যেরূপ আদিষ্ট হয়েছ তা করে ফেল।	٦٨. قَالُوا۟ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِىَ ۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌۢ بَيْنَ ذَٰلِكَ ۖ فَٱفْعَلُوا۟ مَا تُؤْمَرُونَ
৬৯। তারা বলেছিল ঃ তুমি আমাদের জন্য তোমার রবের নিকট প্রার্থনা কর যে, তিনি যেন ওর বর্ণ কিরূপ তা আমাদেরকে বলে দেন। সে বলেছিল ঃ তিনি বলেছেন যে, নিশ্চয়ই সেই গরুর বর্ণ গাঢ় পীত, ওটা দর্শকদেরকে আনন্দ দান করে।	٦٩. قَالُوا۟ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّـٰظِرِينَ
৭০। তারা বলেছিল ঃ তুমি আমাদের জন্য তোমার রবের	٧٠. قَالُوا۟ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن

لَّنَا مَا هِىَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَـٰبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّآ إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهْتَدُونَ	নিকট প্রার্থনা কর যে, তিনি যেন ওটা কিরূপ তা আমাদের জন্য বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই আমাদের নিকট সকল গরুই সমতুল্য এবং আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমরা সুপথগামী হব।
٧١. قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا ۚ قَالُوا۟ ٱلْـَٔـٰنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ ۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا۟ يَفْعَلُونَ	৭১। সে বলেছিল ঃ নিশ্চয়ই তিনি বলেছেন যে, অবশ্যই সেই গরু সুস্থকায়, নিখুঁত, ওটা চাষাবাদের কাজে লাগানো হয়নি এবং ক্ষেতে পানি সেচনেও নিযুক্ত হয়নি। তারা বলেছিল ঃ এক্ষণে তুমি সত্য এনেছ, অতঃপর তারা ওটা যবাহ করল যা তাদের করার ইচ্ছা ছিলনা।

গাভীর ব্যাপারে ইয়াহুদীদের একগুয়েমীর জন্য আল্লাহ তাদের কাজকে কঠিন করে দেন

এখানে আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাঈলের অবাধ্যতা, দুষ্টামি ও আল্লাহর নির্দেশের ব্যাপারে তাদের খুঁটিনাটি প্রশ্নের বর্ণনা দিচ্ছেন। তাদের উচিত ছিল হুকুম পাওয়া মাত্রই তার উপর আমল করা। কিন্তু তা না করে তারা বার বার প্রশ্ন করতে থাকে। ইব্‌ন জুরাইয (রহঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'নির্দেশ পাওয়া মাত্রই যদি তারা যে কোন গরু যবাহ করত তাহলে তাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তারা ক্রমাগত প্রশ্ন করতে থাকে এবং তার ফলে কাজে কাঠিন্য বৃদ্ধি পায়। এমন কি যদি তারা 'ইনশাআল্লাহ' না বলত তাহলে কখনও এ কাঠিন্য দূর হতনা এবং ওটা তাদের কাছে প্রকাশিত হতনা।'

তাদের প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা হয় যে, ওটা বৃদ্ধও নয় বা একেবারে কম বয়সেরও নয়, বরং মধ্যম বয়সের। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), আবুল আলীয়া (রহঃ),

সুদ্দী (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), আতীয়া আল আউফী (রহঃ), ‘আতা আল খুরাসানী (রহঃ), ওয়াহাব ইব্‌ন মুনাব্বীহ (রহঃ), যাহ্‌হাক (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/২১৬) যাহ্‌হাক (রহঃ) বলেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, ঐ গাভীটি না ছিল অধিক বয়স্কা, আর না অল্প বয়স্কা। বরং ওটি ছিল ঐ বয়সের যখন উহা থাকে সর্বোচ্চ শক্তিশালী ও কর্মক্ষম। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/২১৭)

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে ওর রং বর্ণনা করা হয় যে, ওটা হলদে রংয়ের সুদৃশ্য একটি গরু। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) গরুটির রং হলদে বলেছেন। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/২২১)

ওয়াহাব ইব্‌ন মুনাব্বীহ (রহঃ) বলেন ঃ ‘ওর রং এত গাঢ় ছিল যে, মনে হত যেন ওটা থেকে সূর্যের কিরণ উত্থিত হচ্ছে।’ (তাবারী ২/২০২) তাওরাতে ওর রং লাল বর্ণনা করা হয়েছে। সম্ভবতঃ যিনি ওকে আরাবীতে অনুবাদ করেছেন তিনিই ভুল করেছেন। আল্লাহই সবচেয়ে বেশি জানেন।

এখন গরুটির বিশেষণ বর্ণনা করা হচ্ছে যে, ওটা জমি চাষাবাদ করা অথবা পানি সেচের কাজে ব্যবহৃত হয়নি। ওর শরীরে কোন দাগ নেই। ওটা একই রংয়ের, অন্য কোন রংয়ের মিশ্রণ মোটেই নেই। ওটা সুস্থ ও সবল। এখন অনিচ্ছাকৃতভাবে তারা ওর কুরবানী দিতে এগিয়ে গেল। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন যে, তারা ওটা যবাহ করবে বলে মনে হচ্ছিলনা। (তাবারী ২/২১৯) বরং যবাহ না করার জন্যই তারা টালবাহানা করছিল। এ ছাড়া উবাইদাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ওয়াহাব ইব্‌ন মুনাব্বীহ (রহঃ), আবুল আলীয়া (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) বলেন ঃ ইয়াহুদীরা ঐ গরুটিকে অনেক মূল্য দিয়ে ক্রয় করেছিল। (তাবারী ২/২২১) অবশ্য এর বিপরীতে ভিন্ন ভিন্ন মতামতও রয়েছে।

৭২। এবং যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করার পর তদ্বিষয়ে বিরোধ করছিলে এবং তোমরা যা গোপন করছিলে আল্লাহ তার প্রকাশক হলেন।	٧٢. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَٱدَّٰرَٰٔتُمْ فِيهَا ۖ وَٱللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ
৭৩। অতঃপর আমি বলেছিলাম ঃ ওর এক খন্ড	٧٣. فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ

দ্বারা তাকে আঘাত কর, এই রূপে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং স্বীয় নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করেন যাতে তোমরা হৃদয়ঙ্গম কর।	كَذَٰلِكَ يُحْيِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ ءَايَـٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

নিহত ব্যক্তিকে পুনরায় জীবন দান

সহীহ বুখারীতে اَلدَّارَءْتُمْ এর অর্থ করা হয়েছে 'তোমরা মতভেদ করলে।' (ফাতহুল বারী ৬/৫০৬) মুজাহিদ (রহঃ) 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) প্রভৃতি মনীষীগণ হতেও এটাই বর্ণিত আছে। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/২২৯) মুসীব ইব্‌ন রাফে (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সাতটি ঘরের মধ্যে লুকিয়েও কোন কাজ করে, আল্লাহ তার সাওয়াব প্রকাশ করে দিবেন। এ রকমই যদি কোন লোক সাতটি ঘরের মধ্যে ঢুকেও কোন খারাপ কাজ করে, আল্লাহ ওটাও প্রকাশ করে দিবেন। অতঃপর وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ এই আয়াতটি পাঠ করেন। এখানে ঐ চাচা ভাতিজারই ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে, যে কারণে গরু যবাহ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। বলা হচ্ছে যে, ওর কোন অংশ নিয়ে মৃত ব্যক্তির দেহে আঘাত কর, যদি বলা হয় যে ঐ অংশটি কোন অংশ ছিল তাহলে বলা হবে যে, ওর বর্ণনা না কুরআন মাজীদে আছে, আর না কোন সহীহ হাদীসে আছে। এটা জানায় না কোন উপকার আছে, আর না জানায় না কোন ক্ষতি আছে। যে জিনিসের কোন বর্ণনা নেই তার পিছনে না লেগে থাকার মধ্যেই শান্তি ও নিরাপত্তা রয়েছে।

কিন্তু আমাদের মঙ্গল ওতেই আছে যে, আল্লাহ তা'আলা যা গুপ্ত রেখেছেন আমরাও যেন তা গুপ্ত রাখি। ঐ অংশ দ্বারা স্পর্শ করা মাত্রই সে জীবিত হয়ে ওঠে এবং আল্লাহ তা'আলা সেই ঝগড়ার ফাইসালা ওর দ্বারাই করেন, আর কিয়ামাতের দিন মৃতরা যে জীবিত হয়ে উঠবে তার দলীলও এতেই করেন। এ সূরার মধ্যে পাঁচ জায়গায় মৃত্যুর পর জীবিত হওয়ার বর্ণনা রয়েছে। প্রথম হচ্ছে নিম্নের আয়াতটি ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৫৬) দ্বিতীয় আলোচ্য ঘটনায়, তৃতীয় ঐ লোকদের ঘটনায় যারা হাজার হাজার সংখ্যায় বের হয়েছিল এবং একটি বিধ্বস্ত পল্লী তারা অতিক্রম করেছিল। চতুর্থ ইবরাহীমের (আঃ) চারটি পাখীকে মেরে ফেলার পর জীবিত হওয়ার মধ্যে এবং পঞ্চম হচ্ছে

যমীনের মরে যাওয়ার পর বৃষ্টির সাহায্যে পুনর্জীবন দান করাকে মরণ ও জীবনের সঙ্গে তুলনা করার মধ্যে।

আবূ দাঊদ তায়ালেসীর (রহঃ) একটি হাদীসে আছে যে, আবূ রাজীন আকিলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কিভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করবেন?' তিনি বলেন ঃ 'তুমি কোন দিন বৃক্ষলতাহীন প্রান্তরের মধ্য দিয়ে চলেছ কি?' তিনি বলেন ঃ 'হ্যাঁ।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আবার কখনও ওকে সবুজ ও সতেজ দেখেছ কি?' তিনি বলেন, 'হ্যাঁ'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'এভাবেই মৃত্যুর পর জীবন লাভ ঘটবে।' কুরআন মাজীদের অন্য এক জায়গায় রয়েছে ঃ

وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَـٰهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّـٰتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَـٰبٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ. لِيَأْكُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ

তাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত ধরিত্রী, যাকে আমি সঞ্জীবিত করি এবং যা হতে উৎপন্ন করি শস্য, যা তারা আহার করে। তাতে আমি সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের উদ্যান এবং উৎসারিত করি প্রস্রবন, যাতে তারা আহার করতে পারে এর ফলমূল হতে, অথচ তাদের হস্ত ওটা সৃষ্টি করেনি। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেনা? (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৩৩-৩৫)

৭৪। অনন্তর তোমাদের হৃদয় প্রস্তরের ন্যায় কঠিন, বরং কঠিনতর হল এবং নিশ্চয়ই প্রস্তর হতেও প্রস্রবন নির্গত হয় এবং নিশ্চয়ই ওগুলির মধ্যে কোন কোনটি বিদীর্ণ হয়, অতঃপর তা হতে পানি নির্গত হয় এবং নিশ্চয়ই ঐগুলির মধ্যে কোনটি	٧٤. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِىَ كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَـٰرُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ ۚ وَإِنَّ

مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَـٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ	**আল্লাহর ভয়ে পতিত হয় এবং তোমরা যা করছ তৎপ্রতি আল্লাহ অমনোযোগী নন।**

ইয়াহুদীদের কঠোরতা

এ আয়াতে বানী ইসরাঈলকে বলা হচ্ছে যে, এত বড় বড় মুজিযা এবং আল্লাহর ব্যাপক ক্ষমতার নিদর্শনাবলী দেখার পরেও কিভাবে এত তাড়াতাড়ি তাদের অন্তর পাথরের মত শক্ত হয়ে গেল? এ জন্যই মু'মিনগণকে এরকম শক্তমনা হতে নিষেধ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে ঃ

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَـٰسِقُونَ

যারা ঈমান আনে তাদের হৃদয় ভক্তি-বিগলিত হওয়ার সময় কি আসেনি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে? এবং পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের মত যেন তারা না হয়, বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে পড়েছিল। তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ১৬)

আল-আউফি (রহঃ) তার তাফসীরে বর্ণনা করেছেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ মৃত ব্যক্তিটিকে গরুর গোস্তের টুকরা দ্বারা আঘাত করা হলে সে উঠে দাঁড়িয়ে যায় এবং জীবিত অবস্থায় সে যতখানি সুস্থ-সবল ছিল তারচেয়েও তাকে সতেজ মনে হয়েছিল। তাকে জিজ্ঞেস করা হল ঃ তোমাকে কে হত্যা করেছিল? সে উত্তরে বলল ঃ আমার ভাইয়ের ছেলে আমাকে হত্যা করেছে। এরপর সে আবার মারা যায়। লোকটি আবার মারা যাবার পর তার ভাইয়ের ছেলে বলল ঃ আল্লাহর শপথ! আমি তাকে হত্যা করিনি। এভাবে সে সত্যকে অস্বীকার করল, যদিও সবাই এ কথা জেনে গেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْد ذَلك فَهِيَ كَالْحجَارَة أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً *অতঃপর তোমাদের হৃদয় প্রস্তরের ন্যায় কঠিন, বরং কঠিনতর।* (তাবারী ২/২৩৪)

কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর বানী ইসরাঈলের অন্তর পাথরের চেয়েও শক্ত হয়ে গিয়েছিল। কেননা পাথর হতেও তো ঝরণা প্রবাহিত হয়। কোন কোন পাথর ফেটে যায় এবং তা হতে পানি বের হয়, যদিও তা প্রবাহিত হওয়ার যোগ্য নয়। কোন কোন পাথর আল্লাহর ভয়ে উপর হতে নীচে গড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ঐ লোকদের অন্তর নাসীহাত বা উপদেশে কখনও নরম হয়না। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ আয়াতের ভাবার্থ হল এমন কিছু পাথর রয়েছে যা তোমাদের হৃদয়ের চেয়ে কোমল। তারা সত্যকে স্বীকার করে যে সত্যের প্রতি তোমাদেরকে আহ্বান করা হয়েছে। (ইব্ন আবী হাতিম ১/২৩৩)

কঠিন বস্তু/পাথরের মধ্যে বোধশক্তি আছে

উপরের বর্ণনা থেকে এটাও জানা যাচ্ছে যে, পাথরের মধ্যেও জ্ঞান-বিবেক আছে। কুরআন মাজীদের অন্য স্থানে আছে ঃ ‘সাত আসমান ও যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থলে যা কিছু আছে সবাই আল্লাহর তাসবীহ্ পাঠ করে ও প্রশংসা করে। যেমন তিনি বলেন ঃ

إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا

আমি তো আসমান, যমীন ও পবর্তমালার প্রতি এই আমানাত অর্পণ করেছিলাম, তারা এটা বহন করতে অস্বীকার করল এবং ওতে শংকিত হল। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৭২)

تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَـٰوَٰتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ

সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং ওদের অর্ন্তবর্তী সব কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করে। (সূরা ইসরাহ, ১৭ ঃ ৪৪) উপরের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, সমস্ত জিনিস আল্লাহর তাসবীহ্ বর্ণনা করে। অন্যস্থানে রয়েছে ঃ

وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ

তারকা ও বৃক্ষ উভয়ে (আল্লাহকে) সাজদাহ করে। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ৬)

أَوَلَمْ يَرَوْا۟ إِلَىٰ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَىْءٍ يَتَفَيَّؤُا۟ ظِلَـٰلُهُۥ

তারা কি লক্ষ্য করেনা আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর প্রতি, যার ছায়া ডানে ও বামে ঢলে পড়ে আল্লাহর প্রতি সাজদাহবনত হয়? (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৪৮) অন্যত্র আছে ঃ

قَالَتَآ أَتَيْنَا طَآئِعِينَ

তারা (যমীন ও আসমান) বলল ঃ আমরা এলাম অনুগত হয়ে। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ১১)

لَوْ أَنزَلْنَا هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلٍ

আমি যদি এই কুরআন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম। (সূরা হাশর, ৫৯ ঃ ২১) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُوٓاْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ

(জাহান্নামীরা) তাদের ত্বককে জিজ্ঞেস করবে ঃ তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ কেন? উত্তরে তারা বলবে ঃ আল্লাহ আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ২১) একটি বিশুদ্ধ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহুদ পাহাড় সম্পর্কে বলেন ঃ

এ পাহাড়টি আমাদেরকে ভালবাসে এবং আমরাও একে ভালবাসি। (ফাতহুল বারী ৬/৯৮) আর একটি হাদীসে আছে, যে খেজুর গাছের কাণ্ডের উপর হেলান দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুৎবা দিতেন, যখন মিম্বর তৈরী হয় ও কাণ্ডটিকে সরিয়ে ফেলা হয় তখন কাণ্ডটি অঝোরে কাঁদতে থাকে। সহীহ মুসলিমে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'আমি মাক্কার ঐ পাথরকে চিনি যা আমার নাবুওয়াতের পূর্বে আমাকে সালাম করত।' (মুসলিম ৩/১৭৮২) 'হাজরে আসওয়াদ' সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ

'যে ওকে সত্যের সঙ্গে চুম্বন করবে, কিয়ামাতের দিন ওটা তার ঈমানের সাক্ষ্য প্রদান করবে।' (আহমাদ ১/২৬৬) এ ধরনের বহু আয়াত ও হাদীস রয়েছে যদ্দারা এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এসব জিনিসের মধ্যে বিবেক ও অনুভূতি আছে এবং ওগুলি প্রকৃত অর্থেই আছে, রূপক অর্থে নয়।

أَوْ শব্দটি সম্পর্কে কুরতুবী (রহঃ) এবং ইমাম রাযী (রহঃ) বলেন যে, এটা ইচ্ছার স্বাধীনতার জন্য এসেছে। কারও কারও মতে এটার ভাবার্থ এই যে, কতক অন্তর পাথরের মত শক্ত এবং কতক অন্তর তার চেয়েও বেশি শক্ত। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে বেশি জানেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا تُطِعۡ مِنۡهُمۡ ءَاثِمًا أَوۡ كَفُورًا

কোনো পাপী অথবা কাফিরের আনুগত্য করনা। (সূরা ইনসান/দাহ্‌র, ৭৬ ঃ ২৪)

عُذۡرًا أَوۡ نُذۡرًا

অনুশোচনা স্বরূপ অথবা সতর্কতা স্বরূপ। (সূরা মুরসালাত, ৭৭ ঃ ৬) অন্যান্য জ্ঞানীগণ বলেন যে, এখানে 'অথবা' শব্দটি 'বরং' হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব এখানে অর্থ হবে, তোমাদের হৃদয় পাথরের মত শক্ত, বরং ওর চেয়েও শক্ত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِذَا فَرِيقٌ مِّنۡهُمۡ يَخۡشَوۡنَ ٱلنَّاسَ كَخَشۡيَةِ ٱللَّهِ أَوۡ أَشَدَّ خَشۡيَةً

তাদের একদল আল্লাহকে যেরূপ ভয় করবে তদ্রুপ মানুষকে ভয় করে, বরং তদপেক্ষাও অধিক। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৭৭)

وَأَرۡسَلۡنَٰهُ إِلَىٰ مِاْئَةِ أَلۡفٍ أَوۡ يَزِيدُونَ

তাকে আমি লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ১৪৭)

فَكَانَ قَابَ قَوۡسَيۡنِ أَوۡ أَدۡنَىٰ

ফলে তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল, অথবা তারও কম। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ৯) কারও কারও মতে এর ভাবার্থ এই যে, তাদের হৃদয় পাথরের মত কিংবা কঠোরতায় তার চেয়েও বেশী। (তাবারী ২/২৩৬) ইহা নিম্নের আয়াতেরও অনুরূপ ঃ

مَثَلُهُمۡ كَمَثَلِ ٱلَّذِى ٱسۡتَوۡقَدَ نَارًا

এদের অবস্থা ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করল। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৭)

أَوۡ كَصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ

অথবা আকাশ হতে বারি বর্ষণের ন্যায়। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৯)

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَعۡمَٰلُهُمۡ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ

যারা কুফরী করে, তাদের আমলসমূহ মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ। (সূরা নূর, ২৪ ঃ ৩৯) এর পরের আয়াতেও অনুরূপ বলা হয়েছে ঃ

أَوْ كَظُلُمَـٰتٍ فِى بَحْرٍ لُّجِّىٍّ

অথবা (কাফিরদের কাজ) প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের ন্যায়। (সূরা নূর, ২৪ ঃ ৪০)

৭৫। তোমরা কি আশা কর যে, তোমাদের কথায় তারা ঈমান আনবে? অথচ তাদের মধ্যে এমন কতক লোক গত হয়েছে যারা আল্লাহর কালাম শুনত, অতঃপর উহা বুঝার পর উহাকে বিকৃত করত, অথচ তারা জানত।	٧٥. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا۟ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَـٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُۥ مِنۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
৭৬। যখন তারা মু'মিনদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে ঃ আমরা ঈমান এনেছি; আর যখন তাদের কেহ কারও (ইয়াহুদীর) নিকট গোপনে যায় তখন তারা বলে ঃ তোমরা কি মুসলিমদেরকে এমন কথা বলে দাও যা আল্লাহ তোমাদের নিকট প্রকাশ করেছেন? পরিণামে তারা তোমাদেরকে তর্কে পরাজিত করবে (এই বলে) যে, এ বিষয়টি রবের নিকট	٧٦. وَإِذَا لَقُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوٓا۟ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوكُم بِهِۦ عِندَ رَبِّكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

হতে তোমাদের কিতাবে রয়েছে, তোমরা কি বুঝনা?	
৭৭। তারা কি জানেনা যে, তারা যা গোপন রাখে এবং যা প্রকাশ করে, আল্লাহ সবই জানেন?	٧٧. أَوَلَا يَعۡلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعۡلِنُونَ

রাসূলের (সাঃ) জীবদ্দশায় ইয়াহুদীদের ঈমান ছিলনা

এই পথভ্রষ্ট ইয়াহুদ সম্প্রদায়ের ঈমানের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ও সাহাবীগণকে (রাঃ) নিরাশ করে দিচ্ছেন যে, এসব লোক যখন এত বড় বড় নিদর্শন দেখেও তাদের অন্তরকে শক্ত করে ফেলেছে এবং আল্লাহর কালাম শুনে বুঝার পরেও ওকে পরিবর্তন করে ফেলেছে তখন তোমরা তাদের কাছে আর কিসের আশা করতে পার? ঠিক এরকমই আয়াত অন্য জায়গায় আছে ঃ

فَبِمَا نَقۡضِهِم مِّيثَٰقَهُمۡ لَعَنَّٰهُمۡ وَجَعَلۡنَا قُلُوبَهُمۡ قَٰسِيَةٗۖ يُحَرِّفُونَ ٱلۡكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِۦ

বস্তুতঃ শুধু তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের দরুণই আমি তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ হতে দূর করে দিলাম এবং অন্তরকে কঠোর করে দিয়েছি। তারা কালামকে (তাওরাত) ওর স্থানসমূহ হতে পরিবর্তন করে দেয়। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১৩)

আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ এরা হল ইয়াহুদী সম্প্রদায় যারা আল্লাহর আদেশ শোনার পর জেনে শুনে তা পরিবর্তন করত অথবা নতুন কিছু যোগ করত। (ইব্ন আবী হাতিম ১/২৩৬) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ তারা তাদের গ্রন্থে পরিবর্তন করত এবং কিছু কিছু গোপন রাখত, এরা ছিল তাদের ধর্মীয় আলেম সম্প্রদায়। (তাবারী ২/২৪৫) ইব্ন ওয়াহাব (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন জায়িদ (রহঃ) মন্তব্য করেছেন ঃ 'তারা আল্লাহ প্রদত্ত ধর্মীয় গ্রন্থ তাওরাতের পরিবর্তন করেছে যেমন হালালকে হারাম সাব্যস্ত করেছে এবং হারামকে হালাল করেছে এবং সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য বলে প্রচার করেছে। যখন কোন ব্যক্তি সঠিক মীমাংসার জন্য ঘুষসহ আগমন করত তখন তারা আল্লাহ প্রদত্ত কিতাব অনুযায়ী ফাইসালা করত। কিন্তু যখন কোন ব্যক্তি

অন্যায় দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করতে আসত তখন তারা আল্লাহর কিতাবকে বাদ দিয়ে বানোয়াট কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে ফাতওয়া দিত যে, সে সঠিক কাজই করেছে। যখন এমন কোন ব্যক্তি আসত যে সত্যের অনুসন্ধানকারী নয় এবং ঘুষও প্রদান করতনা তখন তাকে আল্লাহর কিতাব থেকে সঠিক কথা বলে ফাতওয়া দিত। এ কারণে আল্লাহ তাদের উদ্দেশে বলেন ঃ *তোমরা কি লোকদেরকে সৎ কাজে আদেশ করছ এবং তোমাদের নিজেদের সম্বন্ধে বিস্মৃত হচ্ছ? অথচ তোমরা গ্রন্থ পাঠ কর; তাহলে কি তোমরা হৃদয়ঙ্গম করছনা?* (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৪৪) (তাবারী ২/২৪৬)

রাসূলকে (সাঃ) সত্য নাবী জানা সত্ত্বেও ইয়াহুদীরা তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ এর ব্যাখ্যায় মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, ইয়াহুদীরা বিশ্বাস করত যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল, কিন্তু তিনি শুধু আরাবদের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। (তাবারী ২/২৫০) তারা মুসলিমদের সাথে মিলিত হয়ে বলত ঃ ‘তোমাদের নাবী সত্য। তিনি সত্যই আল্লাহর রাসূল।’ কিন্তু যখন তারা পরস্পরে বসত তখন একে অপরকে বলত ঃ ‘তোমরা মুসলিমদেরকে এসব বললে তারা তোমাদেরকেও তাদের ধর্মে টেনে নিবে এবং আল্লাহর কাছেও তোমাদেরকে লা-জবাব করে দিবে। তোমরাতো আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা করতে যে, তিনি যেন তোমাদের মাঝে সেই নাবীকে প্রেরণ করেন। কিন্তু তাঁকেতো তোমাদের পরিবর্তে আরাবদের মাঝে প্রেরণ করেছেন।’ তাদেরকে এর উত্তর দিতে গিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন, أَوَلاَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ এই নির্বোধদের কি এতটুকুও জ্ঞান নেই যে, আল্লাহ তাদের প্রকাশ্য ও গোপনীয় সব কথাই জানেন?

মহান আল্লাহ তাদের এই গোপন কথা মু’মিনদেরকে জানিয়ে দেন। তারা মুসলিমদের কাছে এসে ইসলাম ও ঈমানের কথা প্রকাশ করলে তাঁরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করতেন ঃ ‘তোমাদের কিতাবে কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুভাগমন ইত্যাদির কথা নেই?’ তারা স্বীকার করত। অতঃপর যখন তারা তাদের বড়দের কাছে যেত তখন ঐ বড়রা তাদেরকে ধমক দিয়ে বলত ঃ ‘তোমরা

কি নিজেদের কথা মুসলিমদেরকে বলে তোমাদের অস্ত্র তাদেরকে দিয়ে দিতে চাও?' মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বানু কুরাইযার উপর আক্রমণের দিন ইয়াহুদীদের দুর্গের পাদদেশে দাঁড়িয়ে বলেন ঃ 'ও বানর, শূকর ও শাইতানের পূজারীদের ভ্রাতৃমণ্ডলী!' তখন তারা পরস্পর বলাবলি করতে থাকে ঃ 'তিনি আমাদের ভিতরের কথা কি করে জানলেন। খবরদার! তোমাদের পরস্পরের সংবাদ তাদেরকে দিও না, নচেৎ ওটা আল্লাহর সামনে দলীল হয়ে যাবে।' (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/২৪০) তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'তোমরা গোপন করলেও আমার কাছে কোন কথা গোপন থাকেনা।'

৭৮। এবং তাদের মধ্যে অনেক অশিক্ষিত লোক আছে যারা প্রবৃত্তি ব্যতীত কোন গ্রন্থ অবগত নয় এবং তারা শুধু কল্পনাসমূহ রচনা করে থাকে।	٧٨. وَمِنۡهُمۡ أُمِّيُّونَ لَا يَعۡلَمُونَ ٱلۡكِتَٰبَ إِلَّآ أَمَانِيَّ وَإِنۡ هُمۡ إِلَّا يَظُنُّونَ
৭৯। তাদের জন্য আক্ষেপ যারা স্বহস্তে পুস্তক রচনা করে, যারা বলে যে, এটা আল্লাহর নিকট হতে সমাগত! এর দ্বারা তারা সামান্য মূল্য অর্জন করছে, তাদের হস্ত যা লিপিবদ্ধ করেছে তজ্জন্য তাদের প্রতি আক্ষেপ! এবং তারা যা উপার্জন করছে তজ্জন্যও তাদের প্রতি আক্ষেপ!	٧٩. فَوَيۡلٞ لِّلَّذِينَ يَكۡتُبُونَ ٱلۡكِتَٰبَ بِأَيۡدِيهِمۡ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنۡ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشۡتَرُواْ بِهِۦ ثَمَنٗا قَلِيلٗاۖ فَوَيۡلٞ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتۡ أَيۡدِيهِمۡ وَوَيۡلٞ لَّهُم مِّمَّا يَكۡسِبُونَ

‘উম্মী’ শব্দের অর্থ

أُمِّىْ শব্দের অর্থ হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে ভালভাবে লিখতে জানেনা। أُمِّيُّوْنَ ওর বহু বচন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি বিশেষণ হচ্ছে أُمِّىْ, কেননা তিনি ভাল লিখতে জানতেননা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَمَا كُنتَ تَتْلُوا۟ مِن قَبْلِهِۦ مِن كِتَـٰبٍ وَلَا تَخُطُّهُۥ بِيَمِينِكَ ۖ إِذًا لَّٱرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ

তুমি তো এর পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করনি এবং স্বহস্তে কোন দিন কিতাব লিখনি যে, মিথ্যাচারীরা সন্দেহ পোষণ করবে। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৪৮) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

‘আমি তো একজন ‘উম্মী’ ও নিরক্ষর লোক, আমি লিখতেও জানিনা এবং হিসাবও বুঝিনা, মাস কখনও এরকম হয় এবং কখনও ও রকম হয়।’ (ফাতহুল বারী ৪/১৫১) প্রথমবারে তিনি তাঁর দু’হাতের সমস্ত আঙ্গুল তিনবার নীচের দিকে ঝুঁকিয়ে দেন অর্থাৎ ত্রিশ দিনে এবং দ্বিতীয় বারে দু’বার দু’হাতের সমস্ত অঙ্গুলি ঝুঁকান এবং তৃতীয়বার এক হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি বৃত্ত করে রাখেন, অর্থাৎ উনত্রিশ দিনে। ভাবার্থ এই যে, আমাদের ইবাদাত এবং ওর সময় হিসাব নিকাশের উপর নির্ভর করেনা। কুরআন মাজীদের এক স্থানে আছে ঃ

هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ

তিনিই উম্মীদের মধ্যে তাদের একজনকে পাঠিয়েছেন রাসূল রূপে। (সূরা জুমুআ’হ, ৬২ ঃ ২)

ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, اَمَنِىَّ–এর অর্থ হচ্ছে মিথ্যা আশা ও মন ভুলানো কথা। (তাবারী ২/২৬১)

তারা শুধু ধারণার উপরই রয়েছে, অর্থাৎ তারা প্রকৃত ব্যাপার অবগত নয়; বরং নিরর্থক ধারণা করে থাকে। অতঃপর ইয়াহুদীদের অন্য এক শ্রেণীর লোকের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যারা লিখা পড়া জানতো ও জনগণকে ভ্রান্ত পথের দিকে আহ্বান করত, আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলত এবং শিষ্যদের নিকট হতে টাকা পয়সা আদায় করার উদ্দেশে ভুল পন্থা অবলম্বন করত।

Contents

সত্যত্যাগী ইয়াহুদীদের জন্য দুর্ভোগ

وَيْلٌ –এর অর্থ হচ্ছে 'দুর্ভাগ্য' ও 'ক্ষতি'–এটা জাহান্নামের একটি গর্তের নামও বটে, যার আগুনের তাপ এত প্রচণ্ড যে, ওর ভিতর পাহাড় নিক্ষেপ করলেও তা গলে যাবে।

ইয়াহুদীরা তাওরাতের মধ্যে পরিবর্তন করেছিল। তাওরাতে উল্লেখ করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম তা হতে মুছে ফেলেছিল। এ জন্য তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ নাযিল হয়েছিল। আল্লাহ বলেন ঃ 'যা তারা হাত দ্বারা লিখেছে এবং যা কিছু উপার্জন করেছে তজ্জন্য তাদের সর্বনাশ হবে।' 'অয়েল' এর অর্থ কঠিন শাস্তি, ভীষণ ক্ষতি, ধ্বংস, দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদিও হয়ে থাকে।

এখানে ইয়াহুদী আলেমদেরকে নিন্দা করা হচ্ছে যে, তারা নিজেদের কথাকে আল্লাহর কালাম বলত এবং নিজেদের লোককে সন্তুষ্ট করে দুনিয়া কামাই করত। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলতেন ঃ 'তোমরা কিতাবীদেরকে কোন কিছু জিজ্ঞেস কর কেন? তোমাদের কাছে তো নব প্রেরিত আল্লাহর কিতাবই বিদ্যমান আছে। কিতাবীরা তো আল্লাহর কিতাবের মধ্যে পরিবর্তন করে ফেলেছে। নিজেদের হস্তলিখিত কথাকেই আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ লাগিয়ে তা ছড়িয়ে দিয়েছে। কাজেই তোমাদের নিজস্ব কিতাব বাদ দিয়ে তাদের পরিবর্তিত কিতাবের কি প্রয়োজন? বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, তারা তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করছেনা, কিন্তু তোমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করছ।' (ইব্ন আবী হাতিম ১/২৪৫, ফাতহুল বারী ৫/২৪৪, ১৩/৩৪৫, ৫৫৫)

'অল্প মূল্যে'র অর্থ হচ্ছে আখিরাতের তুলনায় বর্তমান দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন এবং এর সাথের নি'আমাত। (ইব্ন আবী হাতিম ১/২৪৭) অর্থাৎ ওর বিনিময়ে সারা দুনিয়া পেলেও আখিরাতের তুলনায় এটা অতি নগণ্য জিনিস। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ তারা যে এভাবে নিজেদের কথাকে আল্লাহর কথা বলে জনগণের কাছ থেকে স্বীকৃতি নিচ্ছে এবং ওর বিনিময়ে দুনিয়া কামাই করছে, এর ফলে তাদের সর্বনাশ হবে। (তাবারী ২/২৭৩)

৮০। এবং তারা বলে ঃ নির্ধারিত দিনসমূহ ব্যতীত আগুন আমাদেরকে স্পর্শ	٨٠. وَقَالُوا۟ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ

إِلَّآ أَيَّامًا مَّعۡدُودَةً ۚ قُلۡ أَتَّخَذۡتُمۡ عِندَ ٱللَّهِ عَهۡدًا فَلَن يُخۡلِفَ ٱللَّهُ عَهۡدَهُۥٓ ۖ أَمۡ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ	**করবেনা। তুমি বল ঃ তোমরা কি আল্লাহর নিকট হতে অঙ্গীকার নিয়েছ যে, পরে আল্লাহ কখনই স্বীয় অঙ্গীকারের অন্যথা করবেননা? অথবা আল্লাহ সম্বন্ধে যা জানোনা তোমরা তা'ই বলছ?**

ইয়াহুদীদের অলীক কল্পনা যে, তারা মাত্র কয়েক দিন জাহান্নামের আযাব ভোগ করবে

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ইয়াহুদীরা বলত ঃ 'পৃথিবীর মোট সময়কাল হচ্ছে সাত হাজার বছর। প্রতি হাজার বছরের পরিবর্তে আমাদের একদিন শাস্তি হবে। তাহলে আমাদেরকে মাত্র সাত দিন জাহান্নামে থাকতে হবে।' তাদের এ কথাকে খণ্ডন করতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। কারও কারও মতে তারা চল্লিশ দিন জাহান্নামে থাকবে বলে ধারণা করত। (তাবারী ২/২৭৬) কেননা তাদের পূর্বপুরুষরা চল্লিশ দিন পর্যন্ত বাছুরের পূজা করেছিল। কারও কারও মতে তাদের এই ধারণা হওয়ার কারণ ছিল এই যে, তাওরাতে আছে ঃ 'জাহান্নামের দুই তীরের 'যাক্‌কুম' নামক বৃক্ষ পর্যন্ত চল্লিশ দিনের পথ'। তাই তারা বলত যে, এ সময়ের পরে শাস্তি উঠে যাবে।

এ ছাড়া হাফিয আবূ বাকর ইব্‌ন মারদুয়াহ (রহঃ) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ খাইবার যুদ্ধে বিজয় লাভ করার পর ইয়াহুদীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিষ মিশ্রিত একটি আস্ত ভেড়ার রোষ্ট উপহার হিসাবে পাঠায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ করলেন ঃ এ এলাকায় যে ইয়াহুদীরা রয়েছে তাদের সকলকে সমবেত কর। ইয়াহুদীরা উপস্থিত হলে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের পিতা কে? তারা উত্তরে বলল ঃ অমুক, অমুক, অমুক। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমরা মিথ্যা বলছ, তোমাদের পিতা অমুক, অমুক এবং অমুক। তখন তারা বলল ঃ আপনি ঠিকই বলেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আচ্ছা বলত, এবার যদি আমি তোমাদেরকে কোন কিছু সম্পর্কে জিজ্ঞেস

করি তাহলে সঠিক উত্তর দিবে কি? তারা উত্তরে বলল ঃ হ্যাঁ আবুল কাসেম! আমরা যদি মিথ্যা বলি তাহলে আপনি তো আমাদের পিতাদের নাম মিথ্যা বলার মত সত্য ঘটনা বুঝতেই পারবেন। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রশ্ন করলেন ঃ বল তো জাহান্নামের অধিবাসী কারা? তারা উত্তরে বলল ঃ আমরা কিছু দিন জাহান্নামে অবস্থান করব এবং এরপর আপনার উম্মাত আমাদের স্থলাভিষিক্ত হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমাদের ধ্বংস হোক এবং তোমরা অপমানিত হও! আল্লাহর শপথ! আমরা কখনো তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হবনা। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আমি যদি আর একটি প্রশ্ন করি তাহলে তোমরা সঠিক উত্তর দিবে কি? তারা বলল ঃ হ্যাঁ আবুল কাসেম! তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ তোমরা কি এই ভেড়ার গোস্তে বিষ মিশিয়েছ? তারা বলল ঃ হ্যাঁ। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন ঃ কোন্ উদ্দেশে তোমরা এটা করেছ? তারা বলল ঃ আমরা জানতে চাচ্ছিলাম যে, আপনি যদি মিথ্যা নাবীর দাবীদার হন তাহলে আমরা যেন আপনার কাছ থেকে পরিত্রান পাই, আর আপনি যদি সত্য নাবী হন তাহলে বিষ আপনার কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা। (আহমাদ ২/৪৫১, ফাতহুল বারী ৬/৩১৪, নাসাঈ ৬/৪১৩, দালায়িলুল নাবুওয়াহ ৪/২৫৬)

৮১। হ্যাঁ, যারা অনিষ্ট অর্জন করেছে এবং স্বীয় পাপের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েছে তারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তারা সদা অবস্থান করবে।	٨١. بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَـٰطَتْ بِهِۦ خَطِيٓـَٔتُهُۥ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ
৮২। এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎ কাজ করছে তারাই জান্নাতবাসী, তন্মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।	٨٢. وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ

ভাবার্থ এই যে, যার কর্ম সবই মন্দ, যার মধ্যে সাওয়াবের লেশ মাত্র নেই সে জাহান্নামী, পক্ষান্তরে যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান এনেছে এবং সুন্নাহ্ অনুযায়ী কাজ করেছে সে জান্নাতবাসী। যেমন অন্যস্থানে আছে ঃ

لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَآ أَمَانِيِّ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ ۗ مَن يَعْمَلْ سُوٓءًا يُجْزَ بِهِۦ وَلَا يَجِدْ لَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

না তোমাদের বৃথা আশায় কাজ হবে, আর না আহলে কিতাবের বৃথা আশায়; যে অসৎ কাজ করবে সে তার প্রতিফল পাবে এবং সে আল্লাহর পরিবর্তে কেহকে বন্ধু অথবা সাহায্যকারী প্রাপ্ত হবেনা। পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে যারা সৎ কাজ করে এবং সে বিশ্বাসীও হয়, তাহলে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তারা খর্জুর দানার কণা পরিমাণও অত্যাচারিত হবেনা। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১২৩-১২৪)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এখানে মন্দ কাজের অর্থ কুফরী। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ), আবূ অয়েল (রহঃ), আবূল 'আলীয়া (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) কাতাদাহ (রহঃ) এবং রাবী 'বিন আনাস (রহঃ) প্রভৃতি মনীষীগণ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيـــئَتُهُ এর অর্থ করেছেন, শির্ক তাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। (ইব্ন আবী হাতিম ১/২৫২) রাবী' ইব্ন খুশাইয়াম (রহঃ) এর মতে এর দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যে পাপের অবস্থায়ই মারা যায় এবং তাওবাহ করার সুযোগ লাভ করেনা। সুদ্দী (রহঃ) এবং আবূ রাজিনও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (ইব্ন আবী হাতিম ১/২৫৩) আবুল আলীয়া (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং রাবী ইব্ন আনাসও (রহঃ) বলেছেন যে, এখানে বড় পাপ অর্থাৎ কাবীরা গুনাহর কথা বলা হয়েছে, যা স্তুপীকৃত হয়ে অন্তরের অবস্থা খারাপ করে দেয়। (ইব্ন আবী হাতিম ১/২৫৩) প্রতিটি বর্ণনাই আসলে একই অর্থ বহন করে। আল্লাহ তা'আলাই উত্তম জ্ঞানের অধিকারী।

ছোট ছোট পাপ আস্তে আস্তে বড় ও ধ্বংসাত্মক কাজে প্রবৃত্ত করে

মুসনাদ আহমাদে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমরা পাপকে ছোট মনে করনা, এগুলো জমা হয়ে মানুষের ধ্বংসের কারণ হবে। তোমরা কি দেখনা যে, কতকগুলো লোক একটি করে খড়ি নিয়ে এলে খড়ির একটি স্তুপ হয়ে যায়। অতঃপর ওতে আগুন ধরিয়ে দিলে ওটা বড় বড় জিনিসকে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়? (আহমাদ ১/২০৪) অতঃপর ঈমানদারগণের বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, তোমাদের মধ্যে যারা কুফরীর মুকাবিলায় ঈমান আনে এবং অসৎ কাজের মুকাবিলায় সৎকাজ করে, তাদের জন্য চিরস্থায়ী আরাম ও শান্তি। তারা শান্তিদায়ক জান্নাতে চিরকাল অবস্থান করবে। আল্লাহ প্রদত্ত শান্তি ও শাস্তি উভয়ই চিরস্থায়ী।

৮৩। আর যখন আমি বানী ইসরাঈল হতে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আর কারও ইবাদাত করবেনা এবং মাতাপিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে ও আত্মীয়দের, পিতৃহীনদের ও মিসকীনদের সঙ্গেও (সদ্ব্যবহার করবে), আর তোমরা লোকের সাথে উত্তমভাবে কথা বলবে এবং সালাত প্রতিষ্ঠিত করবে ও যাকাত প্রদান করবে; অতঃপর তোমাদের মধ্য হতে অল্প সংখ্যক ব্যতীত তোমরা সকলেই বিমুখ হয়েছিলে, যেহেতু তোমরা ছিলে অগ্রাহ্যকারী।	٨٣. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَقُولُوا۟ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ

আল্লাহ বানী ইসরাঈলের নিকট হতে যে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন

বানী ইসরাঈলের উপর যে নির্দেশাবলী রয়েছে এবং তাদের নিকট হতে যে প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে এখানে তারই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে এবং তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের আলোচনা করা হচ্ছে। তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর একাত্মবাদ মেনে নেয় এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদাত না করে। শুধুমাত্র বানী ইসরাঈলই নয়, বরং সমস্ত মাখলূকের প্রতি এ নির্দেশ রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ

আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি এই অহী ব্যতীত যে, আমি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২৫) তিনি আরও বলেন ঃ

وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَ

আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৩৬) সবচেয়ে বড় হক আল্লাহ তা'আলারই, এবং তাঁর যতগুলি হক আছে তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে এই যে, তাঁরই ইবাদাত করতে হবে এবং তিনি ছাড়া আর কারও ইবাদাত করা যাবেনা।

আল্লাহ তা'আলার হকের পর এখন বান্দাদের হকের কথা বলা হচ্ছে। বান্দাদের মধ্যে মা-বাবার হক সবচেয়ে বড় বলে প্রথমে উহারই বর্ণনা দেয়া হয়েছে। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَنِ ٱشۡكُرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيۡكَ إِلَيَّ ٱلۡمَصِيرُ

সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার মাতাপিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ১৪) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًا

তোমার রাব্ব নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করবেনা এবং মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। (সূরা ইসরাহ, ১৭ ঃ ২৩)

وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ

আত্মীয়-স্বজনকে দিবে তার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও পর্যটককেও (মুসাফিরকেও)। (সূরা ইসরাহ, ১৭ ঃ ২৬) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আছে ঃ

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সর্বোত্তম আমল কোন্‌টি? তিনি বলেন ঃ যথা সময়ে সালাত আদায় করা। জিজ্ঞেস করেন ঃ তারপর কোন্‌টি? তিনি বলেন ঃ মা-বাবার খিদমাত করা। জিজ্ঞেস করেন ঃ এরপর কোন্‌টি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহর পথে জিহাদ করা। (ফাতহুল বারী ৬/৫, মুসলিম ১/৮৯)

আর একটি সহীহ হাদীসে আছে, একটি লোক জিজ্ঞেস করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি কার সাথে সৎ ব্যবহার করব?' তিনি বলেন ঃ 'তোমার মায়ের সঙ্গে।' লোকটি জিজ্ঞেস করেন ঃ 'তারপর কার সঙ্গে?' তিনি বলেন ঃ 'তোমার মায়ের সঙ্গে।' আবার জিজ্ঞেস করেন ঃ 'তারপর কার সঙ্গে?' তিনি বলেন ঃ 'তোমার বাবার সঙ্গে এবং তারপরে অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে।' সূরা নিসার নিম্ন আয়াতের তাফসীরে এর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

وَٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰنًا

এবং তোমরা আল্লাহরই ইবাদাত কর এবং তাঁর সাথে কোন বিষয়ে অংশী স্থাপন করনা; এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৩৬)

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ এর ভাবার্থ হচ্ছে তোমরা ভাল কাজের আদেশ কর ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখ। আর সহনশীলতা, ক্ষমা করার নীতি গ্রহণ কর। এটাই উত্তম চরিত্র যা গ্রহণ করা উচিত। (ইব্ন আবী হাতিম ১/২৫৮) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

কোন ভাল জিনিসকে ঘৃণা করনা, কিছু করতে না পারলেও অন্ততঃ তোমার ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাৎ কর। (আহমাদ ৫/১৭৩ মুসলিম ৪/২০২৬, তিরমিযী ৫/৫২৬)। সুতরাং আল্লাহ প্রথমে তাঁর ইবাদাতের নির্দেশ দেন, অতঃপর পিতা মাতার খিদমাত করা, আত্মীয় স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকীনদের প্রতি সুনজর দেয়া এবং জনসাধারণের সাথে উত্তমভাবে কথা বলা ইত্যাদির নির্দেশ দেন। এরপর কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েরও আলোচনা করেন। যেমন

বলেন ঃ 'সালাত আদায় কর, যাকাত দাও।' তারপর এ সংবাদ দেন যে, তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং অল্প লোক ছাড়া তাদের অধিকাংশই অবাধ্য হয়ে যায়। এ উম্মাতকেও এই নির্দেশই দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـًٔا ۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَـٰنًا وَبِذِى ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَـٰمَىٰ وَٱلۡمَسَـٰكِينِ وَٱلۡجَارِ ذِى ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡجَارِ ٱلۡجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلۡجَنۢبِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَـٰنُكُمۡ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخۡتَالاً فَخُورًا

'এবং তোমরা আল্লাহরই ইবাদাত কর এবং তাঁর সাথে কোন বিষয়ে অংশী স্থাপন করনা; এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, দরিদ্র, সম্পর্কবিহীন প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সহচর ও পথিক এবং তোমাদের দাস-দাসীদের সাথেও সদ্ব্যবহার কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারী আত্মাভিমানীকে ভালবাসেননা। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৩৬)

এই উম্মাত অন্যান্য উম্মাতের তুলনায় এ সব নির্দেশ মানার ব্যাপারে এবং এর উপর আমল করার ব্যাপারে অনেক বেশি দৃঢ় প্রমাণিত হয়েছে।

৮৪। এবং আমি যখন তোমাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম যে, পরস্পর শোণিতপাত করবেনা এবং স্বীয় বাসস্থান হতে আপন ব্যক্তিদেরকে বহিস্কার করবেনা; অতঃপর তোমরা স্বীকৃত হয়েছিলে এবং তোমরাই ওর সাক্ষী ছিলে।	٨٤. وَإِذۡ أَخَذۡنَا مِيثَـٰقَكُمۡ لَا تَسۡفِكُونَ دِمَآءَكُمۡ وَلَا تُخۡرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَـٰرِكُمۡ ثُمَّ أَقۡرَرۡتُمۡ وَأَنتُمۡ تَشۡهَدُونَ
৮৫। অনন্তর সেই তোমরাই পরস্পর খুনাখুনি করছ এবং তোমরা তোমাদের মধ্য হতে এক	٨٥. ثُمَّ أَنتُمۡ هَـٰٓؤُلَآءِ تَقۡتُلُونَ أَنفُسَكُمۡ وَتُخۡرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم

مِّن دِيَٰرِهِمۡ تَظَٰهَرُونَ عَلَيۡهِم
بِٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ وَإِن يَأۡتُوكُمۡ
أُسَٰرَىٰ تُفَٰدُوهُمۡ وَهُوَ مُحَرَّمٌ
عَلَيۡكُمۡ إِخۡرَاجُهُمۡۚ أَفَتُؤۡمِنُونَ
بِبَعۡضِ ٱلۡكِتَٰبِ وَتَكۡفُرُونَ
بِبَعۡضٖۚ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفۡعَلُ
ذَٰلِكَ مِنكُمۡ إِلَّا خِزۡيٞ فِي
ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ
يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلۡعَذَابِۗ وَمَا ٱللَّهُ
بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُونَ

দলকে তাদের গৃহ হতে বহিস্কার করে দিচ্ছ, তাদের প্রতি শত্রুতা বশতঃ অসৎ উদ্দেশে পরস্পরের বিরুদ্ধে সাহায্য করছ এবং তারা বন্দী হয়ে তোমাদের নিকট আনীত হলে তোমরা তাদেরকে বিনিময় প্রদান কর, অথচ তাদেরকে বহিস্কার করা তোমাদের জন্য অবৈধ, তাহলে কি তোমরা গ্রন্থের কিছু অংশ বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশ অবিশ্বাস কর? তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে তাদের পার্থিব জীবনে দুর্গতি ব্যতীত কিছুই নেই এবং উত্থান দিনে তারা কঠোর শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে এবং তোমরা যা করছ, তদ্বিষয়ে আল্লাহ অমনোযোগী নন।

٨٦. أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُاْ
ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا بِٱلۡأٓخِرَةِۖ فَلَا
يُخَفَّفُ عَنۡهُمُ ٱلۡعَذَابُ وَلَا هُمۡ

৮৬। এরাই আখিরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করেছে, অতএব তাদের দন্ড লঘু করা হবেনা এবং তারা সাহায্য প্রাপ্তও হবেনা।

	يُنصَرُونَ

মাদীনার দু'টি বিখ্যাত গোত্রের শান্তি চুক্তি এবং তা ভঙ্গ করা

মাদীনার আনসারগণের দু'টি গোত্র ছিল ঃ (১) আউস ও (২) খাযরায। ইসলামের পূর্বে এই গোত্রদ্বয়ের মধ্যে কখনও কোন মিল ছিলনা। পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই থাকত। মাদীনার ইয়াহুদীদের তিনটি গোত্র ছিল ঃ (১) বানূ কাইনুকা, (২) বানু নাযীর এবং (৩) বানূ কুরাইযা। বানূ কাইনুকা ও বানূ নাযীর খাযরাজের পক্ষপাতী ছিল এবং তারা বন্ধুতে পরিণত হয়েছিল। আর বানূ কুরাইযার বন্ধুত্ব ছিল আউসের সঙ্গে। আউস ও খাযরাযের মধ্যে যখন যুদ্ধ শুরু হত তখন ইয়াহুদীদের তিনটি দল নিজ নিজ মিত্রের সঙ্গে যোগ দিয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত। দুই পক্ষের ইয়াহুদী স্বয়ং তাদেরই হাতে মারাও যেত এবং সুযোগ পেলে একে অপরের ঘর বাড়ী ধ্বংস করত এবং দেশ থেকে তাড়িয়েও দিত। ধন-মালও দখল করে নিত। অতঃপর যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেলে পরাজিত দলের ইয়াহুদী বন্দীদেরকে ইয়াহুদীরা মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে নিত এবং বলত ঃ 'আমাদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ আছে যে, আমাদের মধ্যে যদি কেহ বন্দী হয় তাহলে আমরা যেন তাদেরকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে নেই। তারই উত্তরে মহান আল্লাহ তাদেরকে বলছেন ঃ 'এর কারণ কি এই যে, আমার এ হুকুম মানছ? কিন্তু আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম তোমরা পরস্পর কাটাকাটি করনা, একে অপরকে বাড়ী হতে বের করে দিওনা, তা মানছনা কেন? এক হুকুমের উপর ঈমান আনা এবং অন্য হুকুমকে অমান্য করা, এটা আবার কোন ঈমানদারী?' আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ নিজেদের রক্ত প্রবাহিত করনা, নিজেদের লোককে তাদের বাড়ী হতে বের করে দিওনা। কেননা তোমরা এক মাযহাবের লোক এবং সবাই এক আত্মার মত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

সমস্ত মু'মিন পরস্পর বন্ধুত্ব, দয়া ও সাহায্য-সহানুভূতি করার ব্যাপারে একটি শরীরের মত। কোন একটি অঙ্গের ব্যথায় সমস্ত শরীর অস্থির হয়ে থাকে, শরীরে জ্বর চলে আসে এবং রাতে নিদ্রা হারিয়ে যায়। (মুসলিম ৪/১৯৯৯) এরকমই একজন সাধারণ মুসলিমের বিপদে সারা বিশ্ব জাহানের মুসলিমদের অস্থির হওয়া উচিত।

আব্দ খায়ের (রাঃ) বলেন ঃ 'আমরা সালমান ইব্ন রাবীর (রাঃ) নেতৃত্বে 'লালজারে' জিহাদ করছিলাম। ওটা অবরোধের পর আমরা ঐ শহরটি দখল

করি। ওর মধ্যে কিছু বন্দীও ছিল। এদের মধ্যে একটি ক্রীতদাসীকে আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রাঃ) সাতশ' তে কিনে নেন। *'রাসূল জালুতের'* নিকট পৌঁছে আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রাঃ) এক ইয়াহুদীর নিকট গমন করেন এবং তাকে বলেন ঃ 'দাসীটি তোমার ধর্মের নারী। আমি একে সাতশ'র বিনিময়ে কিনেছি। এখন তুমি তাকে কিনে আযাদ করে দাও।' সে বলে ঃ 'খুব ভাল কথা, আমি চৌদ্দশ' দিচ্ছি।' তিনি বলেন ঃ 'আমি চার হাজারের কমে একে বিক্রি করবনা।' তখন সে বলে ঃ 'তাহলে আমার কেনার প্রয়োজন নেই।' তিনি বলেন ঃ 'একে ক্রয় কর, নতুবা তোমার ধর্ম চলে যাবে। তাওরাতে লিখিত আছে, বানী ইসরাঈলের কোন একটি লোকও যদি বন্দী হয় তাহলে তাকে কিনে আযাদ করে দাও। সে যদি বন্দী অবস্থায় তোমাদের নিকট আসে তাহলে মুক্তিপণ দিয়ে তাকে ছাড়িয়ে নাও এবং বাস্তুহারা করনা। এখন হয় তাওরাতকে মেনে তাকে ক্রয় কর, আর না হয় তাওরাতকে অস্বীকার কর।' সে বুঝে নেয় এবং বলে ঃ 'তুমি কি আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম?' তিনি বলেন ঃ 'হ্যাঁ'। সুতরাং সে চার হাজার নিয়ে আসে। তিনি দু'হাজার তাকে ফেরত দেন।

মোট কথা, কুরআনুম মাজীদের এ আয়াতটিতে ইয়াহুদীদেরকে নিন্দা করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর নির্দেশাবলী জানা সত্ত্বেও তাকে পৃষ্ঠের পিছনে নিক্ষেপ করেছে। আমানাতদারী ও ঈমানদারী তাদের মধ্যে লোপ পেয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী, তাঁর নির্দেশাবলী, তাঁর জন্মস্থান, তাঁর হিজরাতের স্থান ইত্যাদি সব কিছুই তাদের কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু এ সবকিছুই তারা গোপন করে রেখেছে। শুধু এটুকুই নয়, বরং তারা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছে। এ কারণেই তাদের উপর ইহলৌকিক লাঞ্ছনা এসেছে এবং পরকালেও তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী কঠিন শাস্তি।

৮৭। এবং অবশ্যই আমি মূসাকে কিতাব প্রদান করেছি ও তৎপরে ক্রমান্বয়ে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি, এবং আমি মারইয়াম নন্দন ঈসাকে নিদর্শনসমূহ প্রদান করেছিলাম এবং পবিত্র আত্মাযোগে তাকে শক্তি সম্পন্ন করেছিলাম; কিন্তু	٨٧. وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَـٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنۢ بَعْدِهِۦ بِٱلرُّسُلِ ۖ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَـٰتِ وَأَيَّدْنَـٰهُ بِرُوحِ

ٱلْقُدُسِ ۗ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌۢ بِمَا لَا تَهْوَىٰٓ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ	**পরে যখন তোমাদের নিকট কোন রাসূল - তোমাদের প্রবৃত্তি যা ইচ্ছা করতনা তা নিয়ে উপস্থিত হল তখন তোমরা অহংকার করলে, অবশেষে এক দলকে মিথ্যাবাদী বললে এবং একদলকে হত্যা করলে।**

বানী ইসরাঈলের অবাধ্যতা এবং নাবীদের হত্যা করা

এখানে বানী ইসরাঈলের অবাধ্যতা, অহংকার এবং প্রবৃত্তি পূজার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। তারা তাওরাতের পরিবর্তন সাধন করল, মূসার (আঃ) পরে তাঁর শারীয়াত নিয়ে অন্য যে সব নাবী (আঃ) এলেন তাঁদের তারা বিরোধিতা করল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّآ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا۟ لِلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلرَّبَّـٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا۟ مِن كِتَـٰبِ ٱللَّهِ وَكَانُوا۟ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ

আমি তাওরাত নাযিল করেছিলাম, যাতে হিদায়াত ছিল এবং (আনুষ্ঠানিক বিধানাবলীর) আলো ছিল, আল্লাহর অনুগত নাবীগণ তদনুযায়ী ইয়াহুদীদেরকে আদেশ করত আর আল্লাহওয়ালাগণ এবং আলিমগণও। কারণ এই যে, তাদেরকে এই কিতাবুল্লাহর সংরক্ষণের আদেশ দেয়া হয়েছিল। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৪৪) সুদ্দী (রহঃ) বলেন, আবূ মালিক (রহঃ) বলেছেন যে, قَفَّيْنَا 'কাফফাইনা' শব্দের অর্থ হল সাফল্য লাভ। (ইব্ন আবী হাতিম ১/২৬৮) অন্যান্যরা বলেছেন 'অনুসরণ'। উভয় অর্থই যথার্থ বা যুক্তিগ্রাহ্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا

অতঃপর আমি একের পর এক আমার রাসূল প্রেরণ করেছি। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৪৪)

মোট কথা, ক্রমান্বয়ে নাবীগণ (আঃ) বানী ইসরাঈলের মধ্যে আসতে থাকেন এবং ঈসা (আঃ) পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়। ঈসাকে (আঃ) ইঞ্জিল প্রদান করা হয়। এর মধ্যে কতকগুলি নির্দেশ তাওরাতের বিপরীতও ছিল। এ জন্যই তাঁকে নতুন নতুন মুজিযাও দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহর হুকুমে মৃতকে জীবিত করা, মাটি দ্বারা পাখী তৈরী করে ওর মধ্যে ফুঁ দিয়ে আল্লাহর হুকুমে তাকে উড়িয়ে দেয়া, আল্লাহর হুকুমে কুষ্ঠ রোগীকে ভাল করে দেয়া, তাঁর হুকুমে কতকগুলি ভবিষ্যতের সংবাদ প্রদান করা ইত্যাদি। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/২৬৮) অতঃপর মহান আল্লাহ ঈসাকে (আঃ) সহায়তার জন্য 'রূহুল কুদুস' অর্থাৎ জিবরাঈলকে (আঃ) নিযুক্ত করেন। অথচ বানী ইসরাঈলরা তার প্রতি বেশি বিরুদ্ধাচরণ ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছে এবং তাওরাতে যে ঈসার (আঃ) সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে তা অস্বীকার করেছে। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ۚ وَجِئْتُكُم بِـَٔايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ

(আমি এসেছি) তোমাদের জন্য যা অবৈধ হয়েছে তার কতিপয় তোমাদের জন্য বৈধ করতে, আর তোমাদের রবের নিকট হতে তোমাদের জন্য নিদর্শন নিয়ে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৫০)

অথচ বানী ইসরাঈলরা বিভিন্ন নাবীর (আঃ) সাথে অসদাচরণ ও দুর্ব্যবহার করেছে, তাদেরকে অস্বীকার করেছে এবং কেহ কেহকে হত্যা করেছে। এসব কিছুই ঘটেছিল এ জন্য যে বানী ইসরাঈলরা যা আশা করত অথবা বিশ্বাস করত তার বিপরীত কথাই নাবীগণের দা'ওয়াতের বিষয় ছিল। তাওরাতের যে সমস্ত বিষয় বানী ইসরাঈলরা পরিবর্তন করেছিল ঐ সমস্ত বিষয় নাবীগণ পুর্নবহাল করতে চাইলে তা তাদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। ফলে নাবীগণকে মেনে নেয়া তাদের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই তারা নাবীগণকে অস্বীকার করে এবং হত্যা করে। আল্লাহ বলেন ঃ *কিন্তু পরে যখন তোমাদের নিকট কোন রাসূল - তোমাদের প্রবৃত্তি যা ইচ্ছা করতনা তা নিয়ে উপস্থিত হল তখন তোমরা অহংকার করলে, অবশেষে এক দলকে মিথ্যাবাদী বললে এবং একদলকে হত্যা করলে।* (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৮৭)

জিবরাঈলের (আঃ) অপর নাম রূহুল কুদুস

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রাঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (রহঃ), ইসমাঈল ইব্ন খালিদ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), আতিয়্যা আল আউফী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) প্রভৃতি মনীষীবর্গের এটাই অভিমত যে, রূহুল কুদুসের ভাবার্থ হচ্ছে জিবরাঈল (আঃ)। (ইব্ন আবী হাতিম ১/২৭০) কুরআন মাজীদের এক স্থানে আছে ঃ

نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ. عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ

জিবরাঈল এটা নিয়ে অবতরণ করেছে তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পার। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১৯৩-১৯৪)

সহীহ বুখারীতে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসসান কবির (রাঃ) জন্য মাসজিদে একটি মিম্বর রাখেন। তিনি মুশরিকদের ব্যাঙ্গ কবিতার উত্তর দিতেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জন্য প্রার্থনা করতেন ঃ 'হে আল্লাহ! আপনি রূহুল কুদুস দ্বারা হাস্সানকে (রাঃ) সাহায্য করুন। সে আপনার নাবীর পক্ষ থেকে উত্তর দিচ্ছে। (ফাতহুল বারী ১০/৫৬২, আবূ দাঊদ ৫/২৭৯, তিরমিযী ৮/১৩৭)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উমার ফারূকের (রাঃ) খিলাফাত আমলে একদা হাস্সান (রাঃ) মাসজিদে নববীতে কবিতা পাঠ করছিলেন। উমার (রাঃ) তাঁর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তিনি বলেন ঃ 'আমি তো ঐ সময়েও এখানে এ কবিতাগুলো পাঠ করতাম, যখন এখানে আপনার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি বিদ্যমান থাকতেন।' অতঃপর তিনি আবূ হুরাইরাহকে (রাঃ) লক্ষ্য করে বলেন ঃ 'হে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ)! আল্লাহর শপথ করে বলুনতো, আপনি কি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেননি? 'হাস্সান (রাঃ) মুশরিকদের কবিতার উত্তর দিয়ে থাকে, হে আল্লাহ! রূহুল কুদুস দ্বারা তাকে সাহায্য করুন?' আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) তখন বলেন ঃ 'আল্লাহর শপথ! আমি শুনেছি।'

ইব্ন হিব্বানের (রহঃ) গ্রন্থে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ রুহুল কুদুস (জিবরাঈল (আঃ)) আমাকে জানালেন ঃ কোন লোকই স্বীয় আহার্য ও জীবন পূরা করা ছাড়া মারা যায়না। আল্লাহকে তোমরা ভয় কর এবং দুনিয়া কামানোর ব্যাপারে দীনের প্রতি লক্ষ্য রেখ।' (আস সুন্নাহ ১৪/৩০৪)

এই আয়াতের ‘রূহুল কুদুস’ দ্বারা সাহায্য করার বর্ণনার সাথে সাথে কিতাব, হিকমাত, তাওরাত ও ইঞ্জিল শিখানোরও বর্ণনা রয়েছে। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, ওটা এক জিনিস এবং ওগুলি অন্য জিনিস। রচনা রীতিও এটার অনুকূলে রয়েছে। ‘কুদুস’ এর ভাবার্থ হচ্ছে মুকাদ্দাস, যেমন حَاتِم جُوْد এবং رَجُلِ صَادِقْ এর মধ্যে। رُوْحُ الْقُدُسِ ও رُوْحٌ مِّنْهُ বলার মধ্যে নৈকট্য ও মাহাত্মের একটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাচ্ছে। এটা এ জন্যও বলা হয়েছে।

ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) হত্যা করতে চেয়েছিল

যামাখশারী (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহর এ কথা বলা উদ্দেশ্য নয় যে, ‘তারা হত্যা করেছিল’। কারণ ইয়াহুদীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও হত্যা করতে চেষ্টা করেছিল। তারা বিষ প্রয়োগ করে ও যাদুর মাধ্যমে হত্যার চেষ্টা করে। অসুস্থ হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মৃত্যুশয্যায় তখন তিনি বলেন ঃ খাইবারের যুদ্ধের সময় তারা (ইয়াহুদীরা) আমাকে যে খাদ্য খেতে দিয়েছিল (বিষ মিশ্রিত খাসীর গোস্ত) তার প্রতিক্রিয়া আমি এখনও উপলব্ধি করছি, এখনতো হৃদপিন্ডের মূল ধমনীর রক্তপ্রবাহ বন্ধ হওয়ার পথে। (ইব্ন আবী হাতিম ৩/১২৩৯, ফাতহুল বারী ৭/৭৩৭)

৮৮। এবং তারা বলে, আমাদের হৃদয় আবৃত; এবং তাদের অবিশ্বাসের জন্য আল্লাহ তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন - যেহেতু তারা অতি অল্পই বিশ্বাস করে।	٨٨. وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفٌۢ بَل لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ

ঈমান না আনার কারণে ইয়াহুদীদের অন্তর মোহরাচ্ছাদিত

ইয়াহুদীরা এ কথাও বলত, وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ তাদের অন্তরের উপর আচ্ছাদন রয়েছে। (তাবারী ২/৩২৬) মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ বলেন ঃ ইবন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতটি এমনভাবে পাঠ করতেন যে, তাতে এর অর্থ হত ঃ আমাদের অন্তর জ্ঞানে পরিপূর্ণ রয়েছে, সুতরাং হে মুহাম্মাদ! এখন

আর আপনার কাছ থেকে কোন জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। (ইব্ন আবী হাতিম ১/২৭৪) উত্তরে তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, এটা নয়, বরং তাদের অন্তরের উপর আল্লাহর লা'নতের মোহর লেগে গেছে। তাদের ঈমান লাভের সৌভাগ্যই হয়না। غُلْفٌ শব্দটিকে غُلُوْفٌ ও পড়া হয়েছে। অর্থাৎ 'ইলমের বরতন।' কুরআনুল হাকীমের অন্য জায়গায় আছে ঃ

وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِيٓ أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدۡعُونَآ إِلَيۡهِ

তারা বলে ঃ তুমি যার প্রতি আমাদেরকে আহ্বান করছ সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণ আচ্ছাদিত। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ৫) এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ বরং তাদের অবিশ্বাসের জন্য আল্লাহ তাদের অভিসম্পাত করেছেন, যেহেতু তারা খুব কমই বিশ্বাস করে। অর্থাৎ তারা যে দাবী করছে তা সত্য নয়। বরং তাদের হৃদয় অভিশপ্ত এবং তা তালাবদ্ধ হয়ে গেছে। সূরা নিসায় তিনি যেমনটি উল্লেখ করেছেন ঃ

وَقَوۡلِهِمۡ قُلُوبُنَا غُلۡفُۢۚ بَلۡ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيۡهَا بِكُفۡرِهِمۡ فَلَا يُؤۡمِنُونَ إِلَّا قَلِيلٗا

এবং 'তাদের স্ব স্ব অন্তরসমূহ আচ্ছাদিত" এই উক্তি করার জন্য; হ্যাঁ, তাদের অবিশ্বাস হেতু আল্লাহ ওদের অন্তরে মোহর এঁটে দিয়েছেন, এ কারণে তারা অল্প সংখ্যক ব্যতীত বিশ্বাস করেনা। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৫৫)

কোন কোন বিজ্ঞজন বলেছেন যে, এ আয়াতে ধারণা পাওয়া যায় যে, তাদের অল্প সংখ্যক বিশ্বাস করত অথবা খুব অল্পই বিশ্বাস করত। যেমন কিয়ামাত দিবস, বিচারের পর পুরস্কার কিংবা শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে মূসার (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী। কিন্তু এ সত্যেও তাদের বিশ্বাসের জন্য তারা কোন ফায়দা প্রাপ্ত হবেনা, যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বাণী নিয়ে এসেছেন তা অস্বীকার করেছে। কিছু আলেম বলেন যে, ইয়াহুদীরা আসলে কোন কিছুতেই বিশ্বাসী ছিলনা, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ *তারা বিশ্বাসী (ঈমানদার) নয়।* (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৮৮)

অল্প ঈমান রাখার একটি অর্থ তো এই যে, তাদের মধ্যে খুব অল্প লোকই ঈমানদার ছিল। আর দ্বিতীয় অর্থ এটাও হয় যে, তাদের ঈমান খুবই অল্প। অর্থাৎ যারা মূসার (আঃ) উপর ঈমান এনেছে তারা কিয়ামাত, সাওয়াব, শাস্তি ইত্যাদির উপর ঈমান রাখে, তাওরাতকে আল্লাহর কিতাব বলে মেনে থাকে। কিন্তু শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান এনে তাদের ঈমানকে পূর্ণ করেনা, বরং তাঁর সঙ্গে কুফরী করে ঐ অল্প ঈমানকেও নষ্ট করে থাকে।

তৃতীয় অর্থ এই যে, তারা সরাসরি বেঈমান। কেননা আরাবী ভাষায় এরূপ স্থলে সম্পূর্ণ না হওয়ার অবস্থায়ও এ রকম শব্দ আনা হয়ে থাকে। যেমন 'আমি এরকম লোক খুব কমই দেখেছি, অর্থাৎ মোটেই দেখিনি। আল্লাহই সবচেয়ে বেশি জানেন।

৮৯। এবং যখন আল্লাহর সন্নিধান হতে তাদের নিকট যা আছে তার সত্যতা প্রতিপাদক গ্রন্থ উপস্থিত হল এবং যা পূর্ব হতেই তারা কাফিরদের নিকট বর্ণনা করত; অতঃপর যখন তাদের নিকট সেই পরিচিত কিতাব এল তখন তারা তাকে অস্বীকার করল। সুতরাং এরূপ কাফিরদের উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক।	٨٩. وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتَٰبٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا۟ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُوا۟ كَفَرُوا۟ بِهِۦ ۚ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ

রাসূলের (সাঃ) আগমনের পর ইয়াহুদীরা অবিশ্বাস করল, যদিও তারা তাঁর অপেক্ষায় ছিল

যখন ইয়াহুদী ও আরাবের মুশরিকদের মধ্যে যুদ্ধ বাধতো তখন ইয়াহুদীরা কাফিরদেরকে বলত ঃ 'অতি সত্তরই একজন বড় নাবী আল্লাহর সত্য কিতাবসহ আবির্ভূত হবেন। আমরা তাঁর অনুসারী হয়ে তোমাদেরকে এমনভাবে হত্যা করব যে, তোমাদের নাম ও নিশানা দুনিয়ার বুক থেকে মুছে যাবে।' তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করে 'হে আল্লাহ! আপনি অতি সত্তরই ঐ নাবীকে পাঠিয়ে দিন যাঁর গুণাবলী আমরা তাওরাতে পাচ্ছি, যাতে আমরা তাঁর উপর ঈমান এনে তাঁর সঙ্গ লাভ করে আমাদের বাহু মযবুত করে আপনার শত্রুদের উপর প্রতিশোধ নিতে পারি।' তারা কাফিরদেরকে বলত যে, ঐ নাবীর আগমনের সময় খুবই নিকটবর্তী হয়েছে। এ ছাড়া মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের

পূর্বে ইয়াহুদীরা তাদের গোত্রে নাবীর আগমনের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করত, যাতে তাদের শত্রু আউস ও খাযরাজ গোত্রের উপর প্রাধান্য লাভ করতে পারে। আল্লাহ যখন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরাবে প্রেরণ করেন তখন ইয়াহুদীরা তাঁকে অস্বীকার করল এবং তাঁর ব্যাপারে যে গুণাগুণ বর্ণনা করত তাও অস্বীকার করল। মুআয ইব্‌ন জাবল (রাঃ) এবং বানু সালামা গোত্রের বিশর ইব্‌ন বা'রা ইব্‌ন মারুর (রাঃ) বলেন ঃ ওহে ইয়াহুদীরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং ইসলাম কবূল কর, আমরা যখন অবিশ্বাসী ছিলাম তখন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে যেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন হয় এবং আমাদের কাছেও তা বর্ণনা করতে। বানী নাযর থেকে সালাম ইব্‌ন মুশকিম উত্তরে বলে ঃ তিনি যা নিয়ে এসেছেন আমরা তা স্বীকার করিনা। আমরা যার কথা তোমাদেরকে বলতাম তিনি সেই নাবী নন। অতঃপর আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করেন। (তাবারী ২/৩৩৩)

একদা মুআ'য ইব্‌ন জাবাল (রাঃ), বিশর ইব্‌ন বা'রা (রাঃ) এবং দাঊদ ইব্‌ন সালমাহ (রাঃ) মাদীনার ঐ ইয়াহুদীদেরকে বলেই ফেলেন ঃ 'তোমরাই তো আমাদের শির্‌কের অবস্থায় আমাদের সামনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াতের আলোচনা করতে; বরং আমাদেরকে ভয়ও দেখাতে, তাঁর যে গুণাবলী তোমরা বর্ণনা করতে তা সবই তাঁর মধ্যে রয়েছে। তাহলে এখন স্বয়ং তোমরাই ঈমান আনছ না কেন? তাঁর সঙ্গী হচ্ছ না কেন?' আবুল আলীয়া (রহঃ) হতেও বর্ণিত ঃ ইয়াহুদীরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করত যে, তিনি যেন নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের গোত্রে প্রেরণ করেন যাতে আরাবের অন্যান্য মুশরিকদের মুকাবিলায় বিজয় লাভ করতে পারে। তারা বলত ঃ হে আল্লাহ! তাওরাতে আমরা যে নাবীর কথা জানতে পেরেছি তাকে তুমি আমাদের সম্প্রদায়ে প্রেরণ কর যাতে আমরা তাঁকেসহ যুদ্ধ করে অবিশ্বাসীদের হত্যা করতে পারি।

৯০। যার বিনিময়ে তারা নিজেদের বিক্রি করেছে তা খুবই মন্দ, যেহেতু তারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা অস্বীকার করেছে - এই হঠকারিতার জন্য যে, আল্লাহ	٩٠. بِئْسَمَا ٱشْتَرَوْا۟ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا۟ بِمَآ أَنزَلَ

ٱللَّهُ بَغۡيًا أَن يُنَزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦۖ فَبَآءُو بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍۚ وَلِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ	**স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ অবতারণ করেন। অতএব তারা ক্রোধের উপর ক্রোধ অর্জন করেছে। এবং কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।**

অভিশাপের উপর অভিশাপ

ভাবার্থ এই যে, ঐ ইয়াহুদীরা, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতা স্বীকারের পরিবর্তে তাঁকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনার পরিবর্তে কুফরী করে, তাঁকে সাহায্য করার পরিবর্তে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ ও শত্রুতা করে; আর এর কারণে তারা নিজেদেরকে আল্লাহর যে রোষানলে নিক্ষেপ করেছে তা অত্যন্ত জঘন্য জিনিস, যা তারা উত্তম জিনিসের পরিবর্তে গ্রহণ করেছে। ওর কারণ শুধুমাত্র হিংসা বিদ্বেষ, অহংকার ও অবাধ্যতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মধ্য হতে না হয়ে আরাবদের মধ্য হতে হয়েছিলেন বলেই তারা তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অথচ আল্লাহর উপরে পরম বিচারক আর কেহ নেই। রিসালাতের হকদার কে তা তিনি ভালভাবেই জানেন। তিনি তাঁর দান ও অনুগ্রহ স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকেই দিয়ে থাকেন। সুতরাং এক তো তাওরাতের নির্দেশাবলী মান্য না করার কারণে তাদের উপর আল্লাহর গযব ছিলই, এখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অস্বীকার করার কারণে তাদের উপর দ্বিতীয় গযব নেমে আসে।

তারা হিংসা-বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াতকে অস্বীকার করেছিল এবং এ হিংসা বিদ্বেষের প্রকৃত কারণ তাদের অংহকার। এ জন্যই তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করা হয়েছিল, যেন পাপের পূর্ণ প্রতিদান হয়ে যায়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِي سَيَدۡخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

কিন্তু যারা অহংকারে আমার ইবাদাতে বিমুখ তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৬০) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

কিয়ামাতের দিন অহংকারী লোকদেরকে মানুষের আকারে পিঁপড়ার ন্যায় উঠানো হবে, তাদেরকে সবাই দলিত মথিত করে চলে যাবে এবং তাদেরকে জাহান্নামের 'বূস' নামক কয়েদখানার মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে, যে স্থানের আগুন অন্য আগুন অপেক্ষা অধিক তাপ বিশিষ্ট হবে। আর তাদেরকে জাহান্নামের রক্ত, পুঁজ ইত্যাদি পান করানো হবে। (আহমাদ ২/১৭৯)

৯১। এবং যখন তাদেরকে বলা হয় - আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা বিশ্বাস কর তখন তারা বলে ঃ যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আমরা তা'ই বিশ্বাস করি এবং তা ছাড়া যা রয়েছে তা অবিশ্বাস করি; অথচ এ গ্রন্থটি সত্য, তাদের কাছে যা আছে এটা তারই সত্যতার প্রতিপাদক। তুমি বল ঃ যদি তোমরা বিশ্বাসীই ছিলে তাহলে ইতোপূর্বে কেন আল্লাহর নাবীগণকে হত্যা করেছিলে?	٩١. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا۟ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا۟ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُۥ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۗ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنۢبِيَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ
৯২। এবং নিশ্চয়ই মূসা উজ্জ্বল নিদর্শনাবলীসহ তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়েছিল; অনন্তর তোমরা গো-বৎসকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করেছিলে, যেহেতু তোমরা অত্যাচারী ছিলে।	٩٢. وَلَقَدْ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَٰتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنۢ بَعْدِهِۦ وَأَنتُمْ ظَٰلِمُونَ

ইসলাম কবূল না করেও ইয়াহুদরা ঈমানদার বলে মিথ্যা দাবী করে

যখন তাদেরকে কুরআনুল হাকীমের উপর ও শেষ নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনতে বলা হয় তখন তারা বলে, ‘তাওরাতের উপর ঈমান আনাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।’ আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, তারা তাদের এ কথায় মিথ্যাবাদী। কুরআন কারীম তো পূর্বের সমস্ত কিতাবের সত্যতা প্রতিপাদনকারী। আর স্বয়ং তাদের কিতাবেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতা বিদ্যমান রয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে আছে ঃ

ٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَـٰهُمُ ٱلۡكِتَـٰبَ يَعۡرِفُونَهُۥ كَمَا يَعۡرِفُونَ أَبۡنَآءَهُمۡ

যাদেরকে আমি কিতাব প্রদান করেছি তারা তাকে এরূপভাবে চিনে, যেমন চিনে তারা আপন সন্তানদেরকে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৪৬) সুতরাং তাঁকে অস্বীকার করার ফলে তাওরাত ও ইঞ্জীলের উপরও তাদের ঈমান রইলনা। এ দলীল কায়েম করার পর অন্যভাবে দলীল কায়েম করা হচ্ছে যে, তারা যদি তাদের কথায় সত্যবাদী হয় তাহলে যে সব নাবী নতুন কোন শারীয়াত ও কিতাব না এনে পূর্ব নাবীদেরই অনুসারী হয়ে তাঁদের নিকট এসেছিলেন, তারা তাঁদেরকে হত্যা করেছিল কেন, যদিও তোমরা তাদেরকে নাবী বলে জানতে? তারাতো নাবীদেরকে শুধুমাত্র হিংসা ও অহমিকার জন্য অন্যায়ভাবে হত্যা করত। অতএব তারাতো শুধু লোভ-লালসা, ভ্রান্ত ধারনা এবং অলীক কল্পনার অনুসরণ করছে।

অতঃপর বলা হচ্ছে যে, মূসা (আঃ) হতে তো তারা বড় বড় মুজিযা প্রকাশ পেতে দেখেছে, যেমন তুফান/প্লাবন, ফড়িং, উকুন, ব্যাঙ, রক্ত ইত্যাদি তাঁর বদ দু‘আর কারণে প্রকাশ পেয়েছে। তাছাড়া লাঠির সাপ হওয়া, হাত উজ্জ্বল চন্দ্রের ন্যায় হওয়া, নদীর দুই ভাগ হওয়া, মেঘের ছায়া দান করা, ‘মান্না ও সালওয়া’ অবতারিত হওয়া এবং পাথর হতে ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়া ইত্যাদি বড় বড় অলৌকিক ঘটনাবলী, যা মুসার (আঃ) নাবুওয়াতের ও আল্লাহর একাত্মবাদের জ্বলন্ত প্রমাণ ছিল এবং ওগুলি তারা স্বচক্ষে দেখেছিল। অথচ মূসার (আঃ) তূর পাহাড়ে গমনের পর পরই তারা বাছুরকে তাদের উপাস্য বানিয়ে নেয়।

وَٱتَّخَذَ قَوۡمُ مُوسَىٰ مِنۢ بَعۡدِهِۦ مِنۡ حُلِيِّهِمۡ عِجۡلًا جَسَدًا لَّهُۥ خُوَارٌ

আর মূসার চলে যাবার পর অলংকার দ্বারা একটি বাছুরের (মত) পুতুল তৈরী করল, ওটা হতে গরুর মত শব্দ বের হত। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৪৮) তাহলে তাওরাতের উপর এবং মূসার (আঃ) উপর তাদের ঈমান থাকল কোথায়?

পরে তাদের মনে এ অনুভূতি হয়েছিল, যেমন আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَلَمَّا سُقِطَ فِىٓ أَيۡدِيهِمۡ وَرَأَوۡاْ أَنَّهُمۡ قَدۡ ضَلُّواْ قَالُواْ لَئِن لَّمۡ يَرۡحَمۡنَا رَبُّنَا وَيَغۡفِرۡ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَـٰسِرِينَ

আর যখন তারা লজ্জিত হল এবং দেখল যে, (প্রকৃত পক্ষে) তারা বিভ্রান্ত হয়েছে, তখন তারা বলল ঃ আমাদের রাব্ব যদি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন তাহলে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৪৯)

৯৩. وَإِذۡ أَخَذۡنَا مِيثَـٰقَكُمۡ وَرَفَعۡنَا فَوۡقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآ ءَاتَيۡنَـٰكُم بِقُوَّةٍ وَٱسۡمَعُواْ ۖ قَالُواْ سَمِعۡنَا وَعَصَيۡنَا وَأُشۡرِبُواْ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلۡعِجۡلَ بِكُفۡرِهِمۡ ۚ قُلۡ بِئۡسَمَا يَأۡمُرُكُم بِهِۦٓ إِيمَـٰنُكُمۡ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ

৯৩। এবং যখন আমি তোমাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং তোমাদের উপর তূর পর্বত সমুচ্চ করেছিলাম এবং বলেছিলাম যে, আমি যা প্রদান করলাম তা দৃঢ়রূপে ধারণ কর এবং শ্রবণ কর। তারা বলেছিল, আমরা শুনলাম ও অগ্রাহ্য করলাম, এবং তাদের অবিশ্বাসের নিমিত্ত তাদের অন্তরসমূহে গো-বৎস প্রিয়তা সিঞ্চিত হয়েছিল। তুমি বল ঃ যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তাহলে তোমাদের বিশ্বাস যা কিছু আদেশ করছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়।

বানী ইসরাঈলের অবাধ্যতার কারণে তাদের মাথার উপর পাহাড় তুলে ধরা হয়

মহান আল্লাহ বানী ইসরাঈলের পাপ, বিরোধিতা, অবাধ্যতা এবং সত্য হতে ফিরে যাওয়ার বর্ণনা দিচ্ছেন। তূর পাহাড়কে যখন তারা তাদের মাথার উপর দেখল তখন সব কিছু স্বীকার করে নিল। কিন্তু যখনই পাহাড় সরে গেল তখনই তারা অস্বীকার করে বসল। এর তাফসীর পূর্বেই করা হয়েছে। বাছুরের প্রেম তাদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যায়। যেমন হাদীসে রয়েছে ঃ ‘কোন জিনিসের ভালবাসা মানুষকে অন্ধ-বধির করে দেয়।’ (আবদুর রায্যাক ১/৫২)

আবুল আলীয়া (রহঃ) এবং রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (ইব্ন আবী হাতিম ১/২৮৩) বলা হয়েছে যে, তোমাদের যে কাজটি সবচেয়ে জঘন্যতম তা হল আল্লাহর আয়াতসমূহ এবং তাঁর রাসূলকে তোমরা পূর্বেও এবং এখনও অস্বীকার করছ। তোমরা রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও অস্বীকার করছ যা হচ্ছে নিকৃষ্টতম ও জঘন্যতম পাপের কাজ। তোমাদের প্রতি যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মানবতার কল্যাণের জন্য পাঠানো হয়েছে তাকেও তোমরা অস্বীকার করছ। তোমরা কিভাবে দাবী করছ যে, তোমরা ঈমান এনেছ, অথচ তোমরা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করছ, আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করছ এবং বাছুরের পূজা করছ?

৯৪। তুমি বল ঃ যদি অপর ব্যক্তিগণ অপেক্ষা তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট বিশেষ পারলৌকিক আলয় থাকে তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।	٩٤. قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْءَاخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا۟ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ
৯৫। এবং তাদের হস্তসমূহ পূর্বে যা প্রেরণ করেছে তজ্জন্য তারা কখনই তা	٩٥. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًۢا بِمَا

قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلظَّـٰلِمِينَ	কামনা করবেনা এবং আল্লাহ অত্যাচারীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত আছেন।
٩٦. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوٰةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ ۚ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِۦ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ	৯৬। এবং নিশ্চয়ই তুমি তাদেরকে অন্যান্য লোক এবং অংশীবাদীদের অপেক্ষাও অধিকতর আয়ু-আকাংখী পাবে; তাদের মধ্যে প্রত্যেকে কামনা করে যেন তাকে হাজার বছর আয়ু দেয়া হয়, এবং ঐরূপ আয়ু প্রাপ্তিও তাদেরকে শাস্তি হতে মুক্ত করতে পারবেনা এবং তারা যা করছে আল্লাহ তার পরিদর্শক।

ইয়াহুদীদের আহ্বান করে বলতে বলা হয়, আল্লাহ যেন মিথ্যাবাদীকে ধ্বংস করেন

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ সব ইয়াহুদীদেরকে বলেন ঃ ‘তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় এসো, আমরা ও তোমরা মিলিত হয়ে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন আমাদের দুই দলের মধ্যে যারা মিথ্যাবাদী তাদেরকে ধ্বংস করেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ভবিষ্যদ্বাণী হয় যে, তারা কখনও এতে সম্মত হবেনা। আর হলও তাই। তারা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় এলনা। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/২৮৪) কারণ তারা অন্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ও কুরআন মাজীদকে সত্য বলে জানত। যদি তারা এ ঘোষণা অনুযায়ী মুকাবিলায় আসত তাহলে তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যেত এবং দুনিয়ার বুকে একটি ইয়াহুদীও অবশিষ্ট থাকতনা। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/২৮৪) এ ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓا۟ إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا۟ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُۥٓ أَبَدًۢا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلظَّـٰلِمِينَ. قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُۥ مُلَـٰقِيكُمْ ۖ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَـٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

বল ঃ হে ইয়াহুদীরা! যদি তোমরা মনে কর যে, তোমরাই আল্লাহর বন্ধু, অন্য কোন মানবগোষ্ঠি নয়; তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। কিন্তু তারা তাদের হস্ত যা অগ্রে প্রেরণ করেছে তার কারণে কখনো মৃত্যু কামনা করবেনা। আল্লাহ যালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত। বল ঃ তোমরা যে মৃত্যু হতে পলায়ন কর সেই মৃত্যুর সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ হবেই। অতঃপর তোমরা উপস্থিত হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহর নিকট এবং তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে যা তোমরা করতে। (সূরা জুমুআ'হ, ৬২ ঃ ৬-৮) একটি মারফূ' হাদীসেও রয়েছে ঃ

যদি ইয়াহুদীরা মুকাবিলায় আসত এবং মিথ্যাবাদীদের জন্য মৃত্যুর প্রার্থনা জানাত তাহলে তারা সবাই মরে যেত এবং নিজ নিজ জায়গা তারা জাহান্নামে দেখে নিত এবং তারা যদি মুবাহালার জন্য প্রস্তুত হত তাহলে তারা ফিরে গিয়ে তাদের পরিবারবর্গের এবং ধনসম্পদের নাম নিশানাও দেখতে পেতনা। (তাবারী ২/৩৬২) তাদের দাবী ছিল ঃ

نَحْنُ أَبْنَـٰٓؤُا۟ ٱللَّهِ وَأَحِبَّـٰٓؤُهُۥ

আমরা আল্লাহর পুত্র ও তাঁর প্রিয়। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১৮) তারা আরও বলত ঃ

لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَـٰرَىٰ

ইয়াহুদী অথবা খৃষ্টান ছাড়া কেহ কখনও জান্নাতে প্রবেশ করবেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১১১) এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে (ইয়াহুদীদেরকে) বলেন ঃ 'এসো এর ফয়সালা আমরা এভাবে করি যে, আমরা দু'টি দল মাঠে বেরিয়ে যাই। অতঃপর আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানাই যে, তিনি যেন আমাদের মধ্যকার মিথ্যাবাদী দলকে ধ্বংস করে দেন।'

কিন্তু ইয়াহুদী দলটির নিজেদের মিথ্যাবাদীতা সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাস ছিল বলে তারা এর জন্য প্রস্তুত হলনা। সুতরাং তাদের মিথ্যা প্রকাশ পেয়ে গেল।

অনুরূপভাবে নাজরানের খৃষ্টানরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে। বহু তর্ক বিতর্কের পর তাদেরকেও বলা হয় ঃ

فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا۟ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَـٰذِبِينَ

এসো, আমরা আমাদের সন্তানগণ ও তোমাদের সন্তানগণকে, আমাদের নারীগণ ও তোমাদের নারীগণকে এবং স্বয়ং আমাদের ও স্বয়ং তোমাদেরকে আহ্বান করি - অতঃপর প্রার্থনা করি যে, অসত্যবাদীদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত হোক। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৬১) কিন্তু তারা পরস্পর বলতে থাকে ঃ 'আল্লাহর শপথ! এ নাবীর সঙ্গে কখনও মুকাবিলা করনা, নতুবা এখনই ধ্বংস হয়ে যাবে।' সুতরাং তারা মুকাবিলা হতে বিরত হয় এবং জিযিয়া কর দিতে রাযী হয়ে সন্ধি করে নেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবূ উবাইদাহ ইব্ন জাররাহ্কে (রাঃ) আমীর করে তাদের সাথে পাঠিয়ে দেন। এভাবেই আরাবের মুশরিকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ مَن كَانَ فِى ٱلضَّلَـٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ ٱلرَّحْمَـٰنُ مَدًّا

বল ঃ যারা বিভ্রান্তিতে আছে, দয়াময় তাদেরকে প্রচুর অবকাশ দিবেন। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৭৫) এর পূর্ণ ব্যাখ্যা এ আয়াতের তাফসীরে ইনশাআল্লাহ বর্ণিত হবে।

এখানে মুবাহালার অর্থ 'আশা করা।' কারণ প্রতিটি নির্দোষ ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আশা করে যে, আল্লাহ যেন তার বিরোধী লোকটিকে ধ্বংস করেন যে অনর্থক বিবাদ করছে। বিশেষ করে কোন ব্যক্তি যখন এরূপ ধারনা করে যে, সে সত্যের উপর আছে তখন সে মুবাহালা করবে। এ ছাড়া অন্যায়কারীদের মৃত্যু কামনা করাও মুবাহালা। কারণ অন্যায়কারী/অবিশ্বাসীদের কাছে পার্থিব জীবনের মূল্য সর্বাধিক, যেহেতু তারা জানে যে, তাদের অন্যায়ের শাস্তি স্বরূপ পরকালে কঠোর আযাব ভোগ করতে হবে, তাই তারা কখনো মৃত্যু কামনা করবেনা।

কাফিরেরা চায় যে, তাদেরকে দীর্ঘ জীবন দান করা হোক

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, মুনাফিকদের ইহলৌকিক জীবনের লালসা কাফিরদের চেয়েও বেশি থাকে। এই ইয়াহুদীরা তো এক হাজার বছরের আয়ু চায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِه مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ এক হাজার বছরের আয়ুও তাদেরকে শাস্তি হতে মুক্তি দিতে পারবেনা। কাফিরেরা তো পরকালকে বিশ্বাসই করেনা, কাজেই তাদের মরণের ভয় কম; কিন্তু ইয়াহুদীদের ওর প্রতি বিশ্বাস ছিল, আবার তারা খারাপ কাজও করত। এ জন্যই তারা মৃত্যুকে অত্যন্ত ভয় করত। কিন্তু ইবলীসের সমান বয়স পেলেই কি হবে? শাস্তি হতে তো বাঁচতে পারবেনা। (তাবারী ২/৩৭৬) وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের কাজ হতে বে-খবর নন। সকল বান্দার ভাল মন্দ কাজের তিনি খবর রাখেন এবং প্রত্যেকের কর্ম অনুপাতেই প্রতিদান দিবেন।

৯৭। তুমি বল ঃ যে ব্যক্তি জিবরাঈলের সাথে শত্রুতা রাখে এ জন্য যে, সে আল্লাহর হুকুমে এই কুরআনকে তোমার অন্তঃকরণ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছে, যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যতা প্রমাণ করছে এবং মু'মিনদের সুসংবাদ দিচ্ছে -	٩٧. قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُۥ نَزَّلَهُۥ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ
৯৮। যে ব্যক্তি আল্লাহর, তাঁর মালাইকার, তাঁর রাসূলগণের, জিবরাঈলের এবং মিকাঈলের শত্রু, নিশ্চয়ই আল্লাহ এরূপ কাফিরদের শত্রু।	٩٨. مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَىٰلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَٰفِرِينَ

ইয়াহুদীরা জিবরাঈলের (আঃ) শত্রু

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (রহঃ) বলেন ঃ 'মুফাস্‌সিরগণ এতে একমত যে, যখন ইয়াহুদীরা জিবরাঈলকে (আঃ) তাদের শত্রু এবং মীকাঈলকে (আঃ) তাদের বন্ধু বলেছিল তখন তাদের এ কথার উত্তরে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ২/৩৭৭) কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, নাবুওয়াতের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে তাদের যে কথোপকথন হয়েছিল তার মধ্যে তারা এ কথা বলেছিল।

সহীহ বুখারীর একটি বর্ণনায় আছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাদীনায় আগমন করেন সেই সময় আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রাঃ) স্বীয় বাগানে অবস্থান করছিলেন এবং তিনি ইয়াহুদী ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন সংবাদ শুনেই তিনি তাঁর নিকট উপস্থিত হন এবং বলেন ঃ 'জনাব, আমি আপনাকে তিনটি প্রশ্ন করছি যার উত্তর নাবী ছাড়া কেহই জানেনা। বলুন, কিয়ামাতের প্রথম লক্ষণ কি? জান্নাতবাসীদের প্রথম খাবার কি? এবং কোন্‌ জিনিস সন্তানকে কখনও মায়ের দিকে আকৃষ্ট করে এবং কখনও বাপের দিকে?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'এ তিনটি প্রশ্নের উত্তর এখনই জিবরাঈল (আঃ) আমাকে বলে গেলেন।' আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম বলেন ঃ 'জিবরাঈল তো আমাদের শত্রু।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতটি পাঠ করেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ 'কিয়ামাতের প্রথম লক্ষণ এই যে, এক আগুন বের হবে যা জনগণকে পূর্ব দিক হতে পশ্চিম দিকে নিয়ে একত্রিত করবে। জান্নাতবাসীদের প্রথম খাবার হবে মাছের কলিজা। যখন স্বামীর বীর্য স্ত্রীর বীর্যের উপর প্রাধান্য লাভ করে তখন পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, আর যখন স্ত্রীর বীর্য স্বামীর বীর্যের উপর প্রাধান্য লাভ করে তখন কন্যা সন্তানের জন্ম হয়।'

এ উত্তর শুনেই আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রাঃ) মুসলিম হয়ে যান এবং পাঠ করেন ঃ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কেহ উপাস্য নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল।'

অতঃপর তিনি বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ইয়াহুদীরা খুবই নির্বোধ ও অস্থির প্রকৃতির লোক। আপনি তাদেরকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করার পূর্বেই যদি তারা আমার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ জেনে নেয় তাহলে তারা আমার সম্বন্ধে খারাপ মন্তব্য করবে (সুতরাং আপনি তাদেরকে প্রথমে জিজ্ঞাসাবাদ করুন)।' অতঃপর ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

সাল্লামের নিকট আগমন করলে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম কেমন লোক?' তারা বলে ঃ তিনি আমাদের মধ্যে উত্তম লোক ও উত্তম লোকের ছেলে, তিনি আমাদের নেতা ও নেতার ছেলে।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'তিনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন তাহলে তোমাদের মত কি?' তারা বলে ঃ 'আল্লাহ তাঁকে ওটা হতে রক্ষা করুন!' অতঃপর আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রাঃ) বের হয়ে আসেন (তিনি এতক্ষণ আড়ালে ছিলেন) এবং পাঠ করেন ঃ 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কেহ উপাস্য নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রাসূল।' তখনই তারা বলে উঠে ঃ 'সে আমাদের মধ্যে খারাপ লোক এবং খারাপ লোকের ছেলে, সে অত্যন্ত নিম্ন স্তরের লোক।' আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রাঃ) তখন বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি এই ভয়ই করেছিলাম।' (ফাতহুল বারী ৭/৩১৯, ৮/১৫) একমাত্র ইমাম বুখারী (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনাকারীদের ক্রমধারাসহ বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) ও মুসলিম (রহঃ) আনাস (রাঃ) হতে আরও একটি সূত্রে বর্ণনা করেছেন। (বুখারী ৩৩২৯, ৩৯১১, ৩৯৩৮; মুসলিম ৩১৫)

কেহ কেহ বলেন, اِيْل শব্দের অর্থ 'দাস' এবং এর পূর্বের শব্দগুলি হচ্ছে আল্লাহর নাম। যেমন আরাবী ভাষায় عَبْدُ اللّٰه، عَبْدُ ارَّحْمَنْ، عَبْدُ الْمَلِك، عَبْدُ الْقُدُّوْسِ، عَبْدُ اسَّلاَمِ، عَبْدُ الْكَافِىْ، عَبْدُ الْجَلِيْلِ ইত্যাদি। عَبْد শব্দটি সব জায়গায় একই থাকছে এবং আল্লাহর নাম পরিবর্তিত হচ্ছে। এরকমই اِيْل প্রত্যেক স্থলে ঠিক আছে, আর আল্লাহর উত্তম নামগুলি পরিবর্তিত হচ্ছে। আরাবী ভাষা ছাড়া অন্যান্য ভাষায় مُضَاف اَلَيْه পূর্বে এবং مُضَاف পরে এসে থাকে। এ নিয়ম এখানেও রয়েছে। যেমন ঃ جِبْرَائِيْل، مِيْكَائِيْل، اِسْرَافِيْل، عَزْرَائِيْل ইত্যাদি।

কোন মালাককে অন্য মালাইকার উপর অগ্রাধিকার দেয়া, কোন নাবীকে অন্য নাবীগণের উপর অগ্রাধিকার দেয়ার মতই ঈমান না আনার পর্যায়ভুক্ত

আয়াতটির ভাবার্থ এই যে, জিবরাঈল (আঃ) আল্লাহ তা'আলার একজন বিশ্বস্ত মালাক/ফেরেশতা। আল্লাহর নির্দেশক্রমে তিনি তাঁর বাণী নাবীগণের

(আঃ) নিকট পৌঁছানোর কাজে নিযুক্ত ছিলেন। মালাইকার মধ্যে তিনি আল্লাহর বার্তাবাহক। কোন একজন রাসূলের প্রতি শত্রুতা পোষণকারী সমস্ত রাসূলের প্রতি শত্রুতা পোষণকারী। যেমন একজন রাসূলের উপর ঈমান আনলেই সব রাসূলের উপর ঈমান আনা হয়, অনুরূপভাবে একজন রাসূলকে অস্বীকার করা মানেই সব রাসূলকেই অস্বীকার করা। যারা কোন কোন রাসূলকে অস্বীকার করে থাকে, স্বয়ং আল্লাহই তাদেরকে কাফির বলেছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا۟ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ

নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করতে ইচ্ছা করে এবং বলে, আমরা কতিপয়কে বিশ্বাস করি ও কতিপয়কে অবিশ্বাস করি। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৫০) এ সব আয়াতে ঐ ব্যক্তিকে স্পষ্টভাবে কাফির বলা হয়েছে, যে কোন একজন নাবীকে অমান্য করে থাকে। এরকমই জিবরাঈলের (আঃ) শত্রুও আল্লাহর শত্রু। কেননা তিনি স্বেচ্ছায় আসেননা। কুরআনুল হাকীমে ঘোষিত হচ্ছে ঃ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ

আমরা আপনার রবের আদেশ ব্যতীত অবতরণ করিনা। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৬৪) অন্যত্র আছে ঃ

وَإِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ. نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ. عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ

নিশ্চয়ই ইহা (আল কুরআন) জগতসমূহের রাব্ব হতে অবতারিত। জিবরাঈল এটা নিয়ে অবতরণ করেছে তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পার। (সূরা শু‘আরা, ২৬ ঃ ১৯২-১৯৪) সহীহ বুখারীর ‘হাদীসে কুদুসী’তে আছে ঃ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ আমার বন্ধুদের প্রতি শত্রুতা পোষণকারী আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকারী। (ফাতহুল বারী ১১/৩৪৮) কুরআনুল হাকীমের এটিও একটি বিশেষত্ব যে, এটি পূর্ববর্তী সমস্ত আসমানী কিতাবের সত্যতা স্বীকার করে এবং ঈমানদারগণের জন্য এটি হিদায়াত স্বরূপ, আর তাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে থাকে। আল্লাহ বলেন ঃ

وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

আমি অবতীর্ণ করি কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য সুচিকিৎসা ও দয়া। (সূরা ইসরাহ, ১৭ ঃ ৮২) রাসূলগণের মধ্যে মানুষ রাসূল ও মালাক/ফেরেশতা রাসূল সবাই জড়িত রয়েছেন। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

ٱللَّهُ يَصۡطَفِي مِنَ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلٗا وَمِنَ ٱلنَّاسِ

আল্লাহ মালাইকা/ফেরেশতাদের মধ্য হতে মনোনীত করেন বাণীবাহক এবং মানুষের মধ্য হতেও। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৭৫) জিবরাঈল (আঃ) ও মীকাঈল (আঃ) মালাইকারই অন্তর্ভুক্ত। তথাপি বিশেষভাবে তাঁদের নাম নেয়ার কারণ হচ্ছে যেন এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, যে জিবরাঈলের (আঃ) শত্রু সে মীকাঈলেরও (আঃ) শত্রু, এমনকি আল্লাহরও শত্রু।

মাঝে মাঝে মীকাঈলও (আঃ) নাবীগণের (আঃ) কাছে এসেছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রথম প্রথম এসেছিলেন। কিন্তু ঐ কাজে নিযুক্ত রয়েছেন জিবরাঈল (আঃ)। যেমন মীকাঈল (আঃ) নিযুক্ত রয়েছেন গাছপালা উৎপাদন ও বৃষ্টি বর্ষণ ইত্যাদি কাজে। আর ইসরাফীল (আঃ) নিযুক্ত রয়েছেন শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়ার কাজে।

একটি বিশুদ্ধ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুম থেকে জেগে নিম্নের দু'আটি পাঠ করতেন ঃ

اَللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَإِسْرَافِيْلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ. فِيْمَا كَانُوا فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ. اِهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ. فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ. إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ.

হে আল্লাহ, হে জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের রাব্ব! হে আকাশ ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা এবং প্রকাশ্য ও গোপনীয় বিষয়সমূহের জ্ঞাতা! আপনার বান্দাদের মতভেদের ফাইসালা আপনিই করে থাকেন। হে আল্লাহ! মতভেদপূর্ণ বিষয়ে আপনার হুকুমে আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন। আপনি যাকে চান তাকে সরল-সঠিক পথ দেখিয়ে থাকেন। (মুসলিম ১/৫৩৪)

এরূপ বলা হচ্ছে ঃ 'যে আল্লাহর বন্ধুর সঙ্গে শত্রুতা করল সে আল্লাহর সঙ্গে শত্রুতা করল এবং যে আল্লাহর শত্রু, আল্লাহও তার শত্রু। আর স্বয়ং আল্লাহ যার শত্রু তার কুফরী ও ধ্বংসের মধ্যে কোন সন্দেহ থাকতে পারে কি? সহীহ

বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ ‘আমার বন্ধুর সাথে শত্রুতাকারীর বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ ঘোষণা করছি।’ (ফাতহুল বারী ১১/৩৪৮)

৯৯। এবং নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ অবতরণ করেছি এবং দুস্কর্মকারী ব্যতীত কেহই তা অবিশ্বাস করবেনা।	٩٩. وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَٰتٍۭ بَيِّنَٰتٍ ۖ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ إِلَّا ٱلْفَٰسِقُونَ
১০০। কি আশ্চর্য! যখন তারা কোন অঙ্গীকারে আবদ্ধ হল তখনই তাদের একদল তা ভঙ্গ করল। বরং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করেনা।	١٠٠. أَوَكُلَّمَا عَٰهَدُوا۟ عَهْدًا نَّبَذَهُۥ فَرِيقٌ مِّنْهُم ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
১০১। এবং যখন আল্লাহর নিকট হতে, তাদের নিকট যা আছে তার সত্য প্রত্যয়নকারী রাসূল তাদের নিকট আগমন করল, তখন যাদেরকে গ্রন্থ প্রদান করা হয়েছে তাদের একদল আল্লাহর গ্রন্থকে নিজেদের পশ্চাদভাগে নিক্ষেপ করল, যেন তারা কিছুই জানেনা।	١٠١. وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ كِتَٰبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
১০২। এবং সুলাইমানের রাজত্বকালে শাইতানরা যা আবৃত্তি করত, তারা ওরই অনুসরণ করছে, এবং	١٠٢. وَٱتَّبَعُوا۟ مَا تَتْلُوا۟ ٱلشَّيَٰطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَٰنَ ۖ

وَمَا كَفَرَ سُلَيۡمَـٰنُ وَلَـٰكِنَّ
ٱلشَّيَـٰطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ
ٱلنَّاسَ ٱلسِّحۡرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى
ٱلۡمَلَكَيۡنِ بِبَابِلَ هَـٰرُوتَ
وَمَـٰرُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنۡ أَحَدٍ
حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحۡنُ فِتۡنَةٌ فَلَا
تَكۡفُرۡ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنۡهُمَا مَا
يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَيۡنَ ٱلۡمَرۡءِ
وَزَوۡجِهِۦ ۚ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ
مِنۡ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ
مَا يَضُرُّهُمۡ وَلَا يَنفَعُهُمۡ ۚ وَلَقَدۡ
عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشۡتَرَىٰهُ مَا لَهُۥ فِي
ٱلۡأَخِرَةِ مِنۡ خَلَـٰقٍ ۚ وَلَبِئۡسَ
مَا شَرَوۡاْ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمۡ ۚ لَوۡ

সুলাইমান অবিশ্বাসী হয়নি - কিন্তু শাইতানরাই অবিশ্বাস করেছিল। তারা লোকদেরকে যাদু বিদ্যা এবং যা বাবেল শহরে হারূত-মারূত মালাক/ফেরেশতাদ্বয়ের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল তা শিক্ষা দিত, এবং তারা উভয়ে কেহকেও ওটা এ কথা না বলে শিক্ষা দিতনা যে, ‘আমরা পরীক্ষাধীন ছাড়া কিছুই নই, অতএব তোমরা কুফরী করনা’। অনন্তর তারা যাতে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটিত হয় তা তাদের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করত। কিন্তু তারা আল্লাহর আদেশ ব্যতীত তদ্বারা কারও অনিষ্ট করতে পারতনা, কিন্তু তারা ওটাই শিক্ষা করছে যাতে তাদের ক্ষতি হয় এবং তাদের কোন উপকার সাধিত না হয়; এবং নিশ্চয়ই তারা জ্ঞাত আছে - যে কেহ ওটা ক্রয় করেছে তার জন্য আখিরাতে সুখ লাভ নেই এবং তার বিনিময়ে তারা যে আত্মবিক্রয় করেছে তা নিকৃষ্ট - যদি তারা তা জানত!

كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ	
١٠٣. وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ ۖ لَّوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ	**১০৩। এবং যদি তারা সত্য সত্যই বিশ্বাস করত ও ধর্মভীরু হত তাহলে আল্লাহর নিকট হতে কল্যাণ লাভ করত - যদি তারা এটা বুঝত।**

নাবী মুহাম্মাদের (সাঃ) রিসালাত প্রাপ্তির প্রমাণ

বলা হচ্ছে, 'হে মুহাম্মাদ! আমি এমন এমন নিদর্শনাবলী তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি যা তোমার নাবুওয়াতের জন্য প্রকাশ্য দলীল। ইয়াহুদীদের বিশেষ জ্ঞান ভাণ্ডার তাওরাতের গোপনীয় কথা, তাদের পরিবর্তনকৃত আহ্কাম ইত্যাদি সব কিছুই আমি এই অলৌকিক কিতাব কুরআন মাজীদে বর্ণনা করেছি। ওটা শুনে প্রত্যেক জীবিত অন্তর তোমার নাবুওয়াতের সত্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। তবে ইয়াহুদীরা যে হিংসা-বিদ্বেষ বশতঃ মানছেনা ওটা অন্য কথা। নতুবা প্রত্যেক লোকই এটা বুঝতে পারে যে, একজন নিরক্ষর লোক কখনও এরকম পবিত্র অলংকার ও নিপুণতাপূর্ণ কথা বানাতে পারেনা।'

ইয়াহুদীদের নিকট শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বীকার করার উপর অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল তা তারা অস্বীকার করেছিল বলে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করা, এটা তো ইয়াহুদীদের চিরাচরিত অভ্যাস, বরং তাদের অধিকাংশের অন্তরই তো ঈমান শূন্য।

ইয়াহুদীরা তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছিল

যখন বলা হল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যখন ইয়াহুদীদেরকে তাদের প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেন তখন এই আয়াতের উত্তরে ইয়াহুদী পণ্ডিত ও নেতা মালিক ইব্ন আস-সাঈফ বলে ঃ আল্লাহর শপথ! মুহাম্মাদ সম্পর্কে আল্লাহর সাথে আমাদের কোন প্রতিশ্রুতি ছিলনা এবং তিনি আমাদের কাছ থেকে কোন ওয়াদাও গ্রহণ করেননি। তার এই বক্তব্যের জবাবে আল্লাহ তা'আলা এ

আয়াতে বলেন, যখনই তারা কোন অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয় তখনই তাদের একদল তা ভঙ্গ করে। (তাবারী ২/৪০০)

نَبَذَ এর অর্থ হচ্ছে 'ফেলে দেয়া।' ইয়াহুদীরা আল্লাহর কিতাবকে এবং তাঁর অঙ্গীকারকে এমনভাবে ছেড়ে দিয়েছিল যে, যেন তারা তা ফেলেই দিয়েছিল। এ জন্যই তাদের নিন্দার ব্যাপারে এ শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, যখন তাদের একটি দল কিতাবের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে ওকে এমনভাবে ছেড়ে দেয় যে, সে যেন জানেইনা। তাওরাতের মাধ্যমে তারা তাঁর মুকাবিলা করতে সক্ষম হয়নি। কেননা ওটা তো তাঁর সত্যতা প্রমাণকারী। সুতরাং ওটাকে তারা পরিত্যাগ করে অন্য কিতাব গ্রহণ করে ওর পিছনে লেগে যায়। আল্লাহর কিতাবকে তারা এমনভাবে ছেড়ে দেয়, যেন তারা ওর সম্বন্ধে কিছু জানতইনা। (তাবারী ২/২০৪) প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে তারা আল্লাহর কিতাবকে তাদের পৃষ্ঠের পিছনে নিক্ষেপ করে।

সুলাইমানের (আঃ) সময়েও যাদু ছিল

'সুলাইমানের (আঃ) রাজত্বকালে শাইতানরা যা আবৃত্তি করত, তারা ওরই অনুসরণ করছে' এর বর্ণনায় জানা যায় ঃ সুলাইমানের (আঃ) রাজত্বকালের পূর্বে শাইতানরা আকাশে উঠে যেত এবং পৃথিবীতে কার কখন মৃত্যু হবে, কোন্ ঘটনা সংঘটিত হবে ইত্যাদি অজানা গোপনীয় ব্যাপারে যখন মালাইকা আলাপ করত শাইতান তা তাদের কাছ থেকে চুরি করে শুনে নিত। পরে শাইতান ঐ বিষয় গনকদের কাছে বলে দিত এবং গনকরা আবার লোকদের কাছে বলে বেড়াত। লোকেরাও গনকদের কথা সত্য বলে মেনে নিত ও বিশ্বাস করত। গনকরা যখন শাইতানদের বিশ্বাস করত তখন শাইতানরা সত্য ঘটনার সাথে আরও নানা মিথ্যা কথা যোগ করে গনকদের কাছে বলত, এমন কি একটি সত্যের সাথে সত্তরটি মিথ্যা যোগ করত। লোকেরা এসব কথা তাদের বইয়ে লিপিবদ্ধ করতে থাকে। পরবর্তীতে বানী ইসরাঈলরা বলতে শুরু করে যে, জিনেরা গাইবের খবর জানে। সুলাইমান (আঃ) নাবুওয়াত প্রাপ্ত হওয়ার পর ঐ সমস্ত বই সংগ্রহ করে একটি বাক্সে ভর্তি করে তাঁর সিংহাসনের নিচে মাটিতে পুঁতে রাখেন। যদি কোন শাইতান ঐ বাক্সের কাছে যেতে চেষ্টা করত তাহলে সে পুড়ে মৃত্যু বরণ করত। সুলাইমান (আঃ) বলতেন ঃ আমি যেন কারও কাছ থেকে না শুনি যে, জিন/শাইতানরা গাইবের খবর জানে; যে বলবে তার শিরচ্ছেদ করা হবে। সুলাইমানের (আঃ) মৃত্যুর পর এবং যে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ সুলাইমানের (আঃ) সঠিক

বাণী জানত তাদেরও মৃত্যুর পর নতুন এক প্রজন্মের আবির্ভাব হয়। জিন শাইতান মানুষের বেশ ধারণ করে বানী ইসরাঈলের কাছে এসে বলল ঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ধন-ভান্ডারের কথা জানাবনা যা প্রাপ্ত হয়ে কাজে লাগালে কখনো নিঃশেষ হবেনা? তারা বলল ঃ অবশ্যই বলবে! জিন শাইতান বলল ঃ সুলাইমানের (আঃ) সিংহাসনের নীচ দিকটি খনন কর। সে তাদেরকে সুলাইমানের (আঃ) সিংহাসনের জায়গাটি দেখিয়ে দিল। তারা বলল ঃ তুমিও আমাদের সাথে চল। সে বলল ঃ না, বরং তোমাদের জন্য আমি এখানে অপেক্ষা করব, খনন করে তোমরা যদি ধন-ভান্ডার না পাও তখন আমাকে হত্যা কর। তারা মাটি খনন করে পুঁতে রাখা বইগুলি খুঁজে পেল। শাইতান তাদেরকে বলল ঃ এই বইগুলিতে যা লিখা আছে তা দিয়ে সুলাইমান (আঃ) মানুষ, জিন ও পাখিদের নিয়ন্ত্রণ করতেন। এরপর লোকদের মাঝে এ কথা প্রচার লাভ করে যে, সুলাইমান (আঃ) যাদু জানতেন। বানী ইসরাঈলরা ঐ বইগুলি অনুসরণ করতে শুরু করল। নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পর ইয়াহুদীরা ঐ বইগুলির উপর ভিত্তি করে তাঁর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَـٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ *তারা ওরই অনুসরণ করছে, এবং সুলাইমান অবিশ্বাসী হয়নি।* (তাবারী ২/৪০৫)

হারূত-মারূতের ঘটনা

বলা হয়েছে ঃ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ *তারা লোকদেরকে যাদু বিদ্যা এবং যা বাবেল শহরে হারূত-মারূত মালাক/ফেরেশতাদ্বয়ের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল তা শিক্ষা দিত, এবং তারা উভয়ে কেহকেও ওটা এ কথা না বলে শিক্ষা দিতনা যে, 'আমরা পরীক্ষাধীন ছাড়া কিছুই নই, অতএব তোমরা কুফরী করনা'। অনন্তর তারা যাতে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটিত হয় তা তাদের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করত।*

এ ঘটনার ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে। ইমাম কুরতুবী বর্ণনা করেন যে, ঐ দুই মালাইকার প্রতি যে কোন কিছুই অবতীর্ণ হয়নি সেই কথা এ

আয়াতটি থেকে প্রমাণিত হয়। এ বিষয়ে প্রমাণস্বরূপ তিনি কুরআনের এ আয়াতাংশটি উল্লেখ করেন, 'সুলাইমান অবিশ্বাসী (কাফির) ছিলনা'। এ বাক্যটি উভয়ের বেলায় প্রযোজ্য। কারণ অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ وَلَـٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ 'কিন্তু শাইতানরা অবিশ্বাস করেছিল, তারা লোকদেরকে যাদু শিক্ষা দিত এবং বেবীলনে হারূত-মারূত এই দুই মালাইকার উপর যা অবতীর্ণ হয়েছিল তা শিক্ষা দিত।

ইয়াহুদীরা দাবী করত যে, জিবরাঈল (আঃ) ও মিকাঈল (আঃ) মালাকদ্বয় হারূত ও মারূত এই দুই মালাকের নিকট যাদু নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ তাদের মিথ্যা দাবী খন্ডন করেন। (কুরতুবী ২/৫০)

ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) আল-আউফী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এ আয়াতের ভাবার্থে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ যাদু অবতীর্ণ করে পাঠাননি। (তাবারী ২/৪১৯)

ইমাম ইব্ন জারীর (রহ) বলেন, রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা দুই মালাককে যাদুসহ প্রেরণ করেননি। ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ এর এটাই সঠিক ব্যাখ্যা।

ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) আরও বলেন যে, وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ এ আয়াতের ব্যাখ্যা হবে ঃ সুলাইমান (আঃ) অবিশ্বাসী ছিলেননা এবং আল্লাহও যাদুসহ হারূত ও মারূত নামের দুই মালাককে/ফেরেশতাকে সুলাইমানের (আঃ) কাছে প্রেরণ করেননি। বরং কাফির শাইতান বেবীলনের হারূত ও মারূতকে যাদু শিক্ষা দিত এবং বলত যে, জিবরাঈল (আঃ) ও মিকাঈল (আঃ) ওটা শিক্ষা দিয়েছেন। অভিশপ্ত ইয়াহুদী যাদুকরেরাও এই দাবী করত যে, দাউদের (আঃ) পুত্র সুলাইমানকে (আঃ) জিবরাঈল (আঃ) ও মিকাঈলের (আঃ) মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা যাদু শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু তাদের এই মিথ্যা দাবী খন্ডন করে তাঁর নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে দিলেন যে, যাদুসহ জিবরাঈল (আঃ) ও মিকাঈল (আঃ) মালাক/ফেরেশতাদ্বয়কে প্রেরণ করা হয়নি।

আল্লাহ তা'আলা সুলাইমানকেও (আঃ) যাদু চর্চার অপবাদ থেকে মুক্ত করেন যে অপবাদে বলা হয়ে থাকে যে, 'আল্লাহ তা'আলা সুলাইমানকে (আঃ) মালাকের

মাধ্যমে যে যাদু শিক্ষা দিয়েছেন ঐ যাদুই অভিশপ্ত শাইতান বেবীলনের দুই লোকের মাধ্যমে শিক্ষা দিত যাদের নাম ছিল হারূত ও মারূত'। অতএব জানা গেল যে, 'যাদু শিক্ষা দেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা দু'জন মালাক পাঠিয়েছেন' বলে যা বলা হয়ে থাকে তাও সত্য নয়। যে যাদু দুই লোকের দ্বারা বেবীলনের লোকদেরকে শাইতান শিক্ষা দিত ঐ লোক দু'টির নাম ছিল হারূত ও মারূত। অতএব বুঝা গেল যে, হারূত এবং মারূত ছিল দু'জন সাধারণ লোক; তারা জিবরাঈল (আঃ), মিকাঈল (আঃ) কিংবা অন্য কোন মালাক ছিলেননা। (তাবারী ২/৪১৯)

সালফে সালেহীনদের অনেকে বলেন যে, হারূত ও মারূত উভয়ে মালাক/ফেরেশতা ছিলেন এবং তারা পৃথিবীতে অবতরণ করার পর আয়াতের বর্ণনা অনুযায়ী তাদের যা করার তা করেন। মালাইকা যে ভুল ভ্রান্তি থেকে মুক্ত এই মতামতের পিছনে তাদের যুক্তি দেয়া যেতে পারে এই যে, আল্লাহ তা'আলাও জানতেন যে, এই দুই মালাক কি করবেন যেমন তিনি জানতেন অন্যান্য মালাইকা আদমকে (আঃ) সাজদাহ করার সময় ইবলিসের আচরণ কিরূপ হবে। আল্লাহ তা'আলা ইবলিসকে মালাইকার অন্তর্ভুক্ত করে আয়াত নাযিল করেন ঃ

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ

স্মরণ কর, যখন আমি মালাইকাকে বললাম ঃ আদমের প্রতি সাজদাহ কর, তখন ইবলীস ছাড়া সবাই সাজদাহ করল; সে অমান্য করল। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১১৬)

বলা হয়েছে, হারূত ও মারূত বলতেন ঃ 'আমরা পরীক্ষাধীন ছাড়া কিছু নই, অতএব তোমরা কুফরী করনা।' যা হোক, হারূত এবং মারূত যে অপরাধ করেছেন বলে বলা হয় তা ছিল অভিশপ্ত শাইতানের তুলনায় খুবই ছোট। কুরতুবী বলেন, আলী (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইব্ন উমার (রাঃ), কাব আল আহবার (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং আল কালবী (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (কুরতুবী ২/৫১)

যাদু শিক্ষা করা কুফরী

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ কিন্তু তারা উভয়ে এ কথা না বলে শিক্ষা দিতনা, 'আমরা পরীক্ষাধীন ছাড়া কিছু নই, অতএব তোমরা কুফরী করনা।

আবূ জাফর আর-রাযী (রহঃ) রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) থেকে, তিনি কায়েস ইব্ন আব্বাদ (রহঃ) থেকে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, 'যখন

কোন লোক ঐ মালাকদ্বয়ের কাছে যাদু শেখার জন্য যেত তখন তারা তাকে নিরুৎসাহিত করত এবং বলত ঃ আমরাতো পরীক্ষাধীন আছি, অতএব তোমরা কুফরীতে পতিত হয়োনা। তারা জানত যে, কোন্ কাজটি ভাল এবং কোন্ কাজটি মন্দ এবং কি কাজ করলে ঈমানদার হওয়া যায় ও কোন্ কাজ করলে মানুষ কুফরীতে পতিত হয়। এরপরও যখন কোন মানুষ যাদু শেখার জন্য তাদের কাছে যেত তখন তারা বলত, তোমরা অমুক অমুক জায়গায় যাও। সেখানে যাওয়ার পর শাইতান তার সাথে দেখা করত এবং যাদু শিক্ষা দিত। যখন কোন ব্যক্তি যাদু শিক্ষা করত তখন তার ঈমানের নূর অপসারিত হত এবং তা আকাশে ভেসে বেড়াতে দেখতে পেত। তখন সে বলত ঃ হায় আমার কপাল! আমিতো অভিশপ্ত হয়ে গেলাম! এখন আমার কি হবে? (ইব্ন আবী হাতিম ১/৩১২) এ আয়াতের তাফসীরে হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা ঐ মালাকদ্বয়কে যাদুসহ দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন পরীক্ষা হিসাবে যে, কে তাতে উত্তীর্ণ হয়। আল্লাহ তাদের কাছ থেকে এ ওয়াদা নিয়েছিলেন যে, যাদু শিক্ষা দেয়ার পূর্বে তারা প্রথমেই বলে নিবে 'আমরা তোমাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ, অতএব তোমরা কুফরীতে পতিত হয়োনা।' (ইব্ন আবী হাতিম ১/৩১০) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তাদের কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, লোকদের কাছে এ কথা না বলে তারা যাদু শিক্ষা দিবেনা ঃ আমরা পরীক্ষাধীন, অতএব কুফরী করনা। (তাবারী ২/৪৪৩)

এ ছাড়া সুদ্দী (রহঃ) বলেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি ঐ মালাকের কাছে যেত তখন তারা উপদেশ দিত ঃ তোমরা কুফরী করনা, আমরাতো পরীক্ষাধীন। যদি ঐ লোক তাদের উপদেশ মানতে রাযী না হত তাহলে তাকে বলা হত ঃ ঐ ছাইয়ের স্তূপের কাছে যাও এবং তাতে প্রস্রাব কর। ওর উপর প্রস্রাব করা হলে ওর আলো অর্থাৎ ঐ লোকটির ঈমান চলে যেত এবং আলো (ঈমান) বিচ্ছুরিত হতে হতে আকাশে মিলিয়ে যেত। অতঃপর কালো ধোয়া জাতীয় কিছু পৃথিবীতে নেমে এসে তার কানের ভিতর এবং শরীরের অন্যান্য অংশে প্রবেশ করত। ঐ কালো ধোয়ার মত জিনিস হল আল্লাহর ক্রোধ। এ সমস্ত ঘটনা মালাকদ্বয়কে জানানোর পর তারা যাদু শিক্ষা দিত। তাই আল্লাহ বলেন, 'তারা উভয়ে কেহকেও ওটা শিক্ষা দিতনা এটা না বলে যে, আমরা পরীক্ষাধীন ছাড়া কিছু নই, অতএব তোমরা কুফরী করনা।' (তাবারী ২/৪৪৩)

হাজ্জাজ (রহঃ) থেকে সুনাইদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন যুরাইয (রহঃ) এই আয়াতের বিশ্লেষণে বলেন ঃ বেঈমান ছাড়া কেহ যাদু শিক্ষা করেনা।

‘ফিতনাহ’ হল পরীক্ষা এবং পছন্দ করার স্বাধীনতা। (তাবারী ২/৪৪৩) যাদু শিক্ষা করাকে যারা কুফরী করা বলে থাকেন তারা এ আয়াতের আলোকেই বলেন। তারা ঐ হাদীসেরও উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন যা আবূ বাকর আল-বাজ্জার (রহঃ) আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন ঃ ‘যে ব্যক্তি কোন ভবিষ্যত বক্তা কিংবা যাদুকরের কাছে গেল এবং সে যা বলল তা বিশ্বাস করল, সে যেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা অস্বীকার করল।’ (কাশাফ আল-আসতার ২/৪৪৩)

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো হয় যাদুর মাধ্যমে

অতঃপর বলা হচ্ছে যে, মানুষ হারূত ও মারূতের কাছে গিয়ে যাদু বিদ্যা শিক্ষা করত। ফলে তারা খারাপ কাজ করত এবং স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে যেত। সহীহ মুসলিমে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

শাইতান তার সিংহাসনটি পানির উপর রাখে। অতঃপর মানুষকে বিপথে চালানোর জন্য সে তার সেনাবাহিনীকে পাঠিয়ে দেয়। সে’ই তার নিকট সবচেয়ে সম্মানিত যে হাঙ্গামা সৃষ্টির কাজে সবচেয়ে বেশি এগিয়ে যায়। এরা ফিরে এসে নিজেদের জঘন্যতম কার্যাবলীর বর্ণনা দেয়। কেহ বলে ঃ ‘আমি অমুককে এভাবে পথভ্রষ্ট করেছি।’ কেহ বলে ঃ ‘আমি অমুক ব্যক্তিকে এ পাপকাজ করিয়েছি।’ শাইতান তাদেরকে বলে ঃ ‘তোমরা কিছুই করনি। এতো সাধারণ কাজ।’ অবশেষে একজন এসে বলে ঃ ‘আমি একটি লোক ও তার স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বাঁধিয়ে দিয়েছি, এমনকি তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে গেছে।’ শাইতান তখন তার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বলে ঃ ‘হ্যাঁ, তুমি উত্তম কাজ করেছ।’ (মুসলিম ৪/২১৬৭)

যাদুকরও তার যাদুর দ্বারা ঐ কাজই করে থাকে, যার ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদের সৃষ্টি হয়। যেমন তার কাছে স্ত্রীর আকৃতি খারাপ মনে হবে কিংবা তার স্বভাব চরিত্রকে সে ঘৃণা করবে অথবা অন্তরে শত্রুতার ভাব জেগে যাবে ইত্যাদি। আস্তে আস্তে এসব বৃদ্ধি পাবে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটবে।

আল্লাহর নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ট ঘটনা ঘটবেই

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ যাদু দ্বারা আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোন ক্ষতি সাধিত হয়না। অর্থাৎ ক্ষতি সাধন করা তাদের ক্ষমতার মধ্যেই নেই। আল্লাহর ভাগ্য লিখন অনুযায়ী তার ক্ষতিও

হতে পারে, আবার তাঁর ইচ্ছা হলে যাদু নিষ্ক্রিয়ও হতে পারে। ভাবার্থ এও হতে পারে যে, যাদু শুধুমাত্র ঐ ব্যক্তিরই ক্ষতি করে থাকে, যে ওটা লাভ করে ওর মধ্যে প্রবেশ করে।

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ তারা এমন জিনিস শিক্ষা করে যা তাদের জন্য শুধুই ক্ষতিকারক, যার মধ্যে মোটেই উপকার নেই। ঐ ইয়াহুদীরা জানে যে, وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ যারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য ছেড়ে যাদুর পিছনে লেগে থাকে তাদের জন্য আখিরাতের কোনই অংশ নেই। তাদের না আছে আল্লাহর কাছে কোন সম্মান, আর না তাদেরকে ধর্মভীরু মনে করা হয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, যদি তাদের এ মন্দ কাজের অনুভূতি হত এবং ঈমান এনে আল্লাহভীরুতা অবলম্বন করত তাহলে ওটা নিঃসন্দেহে তাদের জন্য মঙ্গলজনক ছিল। কিন্তু এরা অজ্ঞান ও নির্বোধ। অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا وَلَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلصَّٰبِرُونَ

যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছিল তারা বলল ঃ ধিক্ তোমাদেরকে! 'যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তাদের জন্য আল্লাহর পুরস্কার শ্রেষ্ঠ এবং ধৈর্যশীল ব্যতীত এটা কেহ পাবেনা। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৮০)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) ও পূর্ব যুগীয় মনীষীদের একটি দল যাদু বিদ্যা শিক্ষার্থীকে কাফির বলেছেন। বাজালাহ ইব্ন উবাইদ (রহঃ) বলেন ঃ 'উমার (রাঃ) তাঁর এক নির্দেশ নামায় লিখেছিলেন ঃ 'যাদুকর পুরুষ বা স্ত্রীকে তোমরা হত্যা কর।' এ নির্দেশ অনুযায়ী আমরা তিনজন যাদুকরের গর্দান উড়িয়েছি।' সহীহ বুখারীতে আছে যে, উম্মুল মু'মিনীন হাফসার (রাঃ) উপর তাঁর দাসী যাদু করেছিল বলে তাকে হত্যা করা হয়। সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব (রহঃ) যাদুকরের দ্বারা যাদু উঠিয়ে নিতে অনুমতি দিয়েছেন, যেমন সহীহ বুখারীতে রয়েছে।

১০৪। হে মু'মিনগণ! তোমরা 'রা'য়েনা' বলনা,	١٠٤. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا

বরং 'উনযুরনা' বল এবং শুনে নাও - অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।	تَقُولُواْ رَٰعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرۡنَا وَٱسۡمَعُواْ ۗ وَلِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ
১০৫। আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কাফির (অর্থাৎ ইয়াহুদী ও নাসারা) এবং মুশরিকরা মোটেই পছন্দ করেনা যে, তোমাদের রবের পক্ষ হতে তোমাদের উপর কোন কল্যাণ বর্ষিত হোক, আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তাঁর করুণার জন্য নির্দিষ্ট করে নেন এবং আল্লাহ মহা করুণাময়।	١٠٥. مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ وَلَا ٱلۡمُشۡرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ خَيۡرٍ مِّن رَّبِّكُمۡ ۗ وَٱللَّهُ يَخۡتَصُّ بِرَحۡمَتِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ

বক্তব্য পেশ করার আদব

আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে তাঁর মু'মিন বান্দাগণকে কাফিরদের কথা-বার্তা এবং তাদের কাজের সাদৃশ্য হতে বিরত রাখছেন। ইয়াহুদীরা কতকগুলো শব্দ জিহ্বা বাঁকা করে বলত এবং ওটা দ্বারা খারাপ অর্থ নিত। যখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলতেন ঃ 'আমার কথা শোন।' তখন তারা বলত ঃ رَاعِنَا অর্থাৎ বিদ্রুপ। যেমন অন্য স্থানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 'ইয়াহুদীদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা কথাকে প্রকৃত শব্দ হতে সরিয়ে দেয় এবং বলে আমরা শুনি, কিন্তু মানিনা। তারা ধর্মকে বিদ্রূপ করার জন্য জিহ্বাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে رَاعِنَا বলে। যদি তারা বলত ঃ আমরা শুনলাম এবং মানলাম, আমাদের

কথা শুনুন এবং আমাদের প্রতি মনোযোগ দিন তাহলে এটাই তাদের জন্য উত্তম ও উচিত হত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের কুফরীর কারণে তাদেরকে স্বীয় রাহমাত হতে দূরে নিক্ষেপ করেছেন, তাদের মধ্যে ঈমান খুব কমই রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِۦ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَٰعِنَا لَيًّۢا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِى ٱلدِّينِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا۟ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَـٰكِن لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا

ইয়াহুদীদের মধ্যে কেহ কেহ যথাস্থান হতে বাক্যাবলী পরিবর্তিত করে এবং বলে ঃ আমরা শ্রবণ করলাম ও অগ্রহ্য করলাম; এবং বলে, শোন - না শোনার মত; এবং তারা স্বীয় জিহ্বা বিকৃত করে ও ধর্মের প্রতি দোষারোপ করে বলে 'রাইনা'; এবং যদি তারা বলত, 'আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম; এবং আমাদেরকে বুঝার শক্তি দাও' তাহলে এটা তাদের পক্ষে উত্তম ও সঠিক হত; কিন্তু আল্লাহ তাদের অবিশ্বাস হেতু তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন; অতএব অল্প সংখ্যক ব্যতীত তারা বিশ্বাস করেনা। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪৬)

হাদীসসমূহে এটাও এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'এরা যখন সালাম করত তখন বলত *'আসসামু আলাইকুম'*। আর *'সামুন'* শব্দের অর্থ হচ্ছে মৃত্যু। সুতরাং তোমরা তার উত্তরে বল *'ওয়া আলাইকুম'*। তাদের ব্যাপারে আমাদের দু'আ কবূল হবে কিন্তু আমাদের ব্যাপারে তাদের দু'আ কবূল হবেনা।' মোট কথা, কথা ও কাজে তাদের সাথে সাদৃশ্য নিষিদ্ধ। মুসনাদ আহমাদের হাদীসে ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

আমি কিয়ামাতের নিকটবর্তী সময়ে তরবারীর সঙ্গে প্রেরিত হয়েছি। আল্লাহ তা'আলা আমার আহার্য আমার বর্শার ছায়ার নীচে রেখেছেন এবং লাঞ্ছনা ও হীনতা ঐ ব্যক্তির জন্য, যে আমার নির্দেশের উল্টা করে। আর যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের (অমুসলিমের) সঙ্গে সাদৃশ্য আনয়ন করে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। (আহমাদ ২/৫০, আবূ দাঊদ ৪/৩১৪)

এই আয়াত ও হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হল যে, কাফিরদের কথা, কাজ, পোশাক, ঈদ ও ইবাদাতের সাথে সাদৃশ্য স্থাপন করা চরমভাবে নিষিদ্ধ। শারীয়াতে ওর ওপর শাস্তির ধমক রয়েছে এবং চরমভাবে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে।

رَاعِنَا এর অর্থ হচ্ছে 'আমাদের দিকে কান লাগিয়ে দাও।' মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ 'এর অর্থ হচ্ছে 'বিপরীত।' অর্থাৎ 'বিপরীত' এ কথা বলনা।' মুজাহিদ (রহঃ) হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে, 'আপনি আমাদের কথা শুনুন এবং আমরা আপনার কথা শুনি।' আনসারগণও (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এ কথাই বলতে আরম্ভ করেছিলেন, যা থেকে আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে নিষেধ করেছেন। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, رَاعِنَا বলা হয় বিদ্রুপ ও উপহাসকে। অর্থাৎ 'তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথাকে ও ইসলামকে বিদ্রূপ করনা।

সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, রিফাআ' ইব্ন ইয়াযীদ নামক ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে কথা বলার সময় *'গাইর মুসমা'ইন'* এ কথাটি বলত। মুসলিমরা এ কথাটি সম্মানজনক মনে করে এটাই নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে আরম্ভ করেন। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এটা নিষেধ করেন। যেমন সূরা নিসার মধ্যেও আছে। ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা এ কথাটিকে খারাপ জেনেছেন এবং মুসলিমদেরকে এটা ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

আহলে কিতাব ও কাফিরেরা মুসলিমদের সাথে চরম শত্রুতা পোষণ করে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ

এখানে আল্লাহ তা'আলা বহু ঈশ্বরবাদী ও আহলে কিতাবীদের ঘোর শত্রুতার কথা মু'মিনদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন এবং সাবধান করছেন যে, তারা যেন ঐ সমস্ত কাফিরদের অনুসরণ না করে এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব না করে। কারণ তারা কখনো মুসলিমদের কল্যাণ চায়না।

আল্লাহ তা'আলা মন্দ অন্তর বিশিষ্ট লোকদের হিংসা ও বিদ্বেষ সম্পর্কে মুসলিমদেরকে বলছেন যে, তারা যে একজন পূর্ণাঙ্গ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ শারীয়াত লাভ করেছে এ জন্য ওরা জ্বলে পুড়ে মরছে। ওদের এটা জানা উচিত যে, এটাতো আল্লাহ বারী তা'আলার অনুগ্রহ। তিনি যাকে চান তার উপরই অনুগ্রহ বর্ষণ করে থাকেন। তিনি বড়ই অনুগ্রহশীল।

১০৬। আমি কোন আয়াতের হুকুম রহিত করলে কিংবা আয়াতটিকে বিস্মৃত করিয়ে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তদনুরূপ আয়াত আনয়ন করি; তুমি কি জাননা যে, আল্লাহ সর্ব বিষয়ের উপরই ক্ষমতাবান?	١٠٦. مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ
১০৭। তুমি কি জাননা যে, আকাশ ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহরই এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধুও নেই এবং কোন সাহায্যকারীও নেই?	١٠٧. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ

'নাস্খ' এর মূল তত্ত্ব

আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, 'নাসখ্' এর অর্থ হচ্ছে পরিবর্তন। (তাবারী ২/৪৭৩) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে সরিয়ে দেয়া, যা লিখার সময় (কখনও) অবশিষ্ট থাকে, কিন্তু হুকুম পরিবর্তন হয়ে যায়। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৩২১) ইব্ন মাসউদের (রাঃ) ছাত্র আবুল আলীয়া (রহঃ) এবং মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব আল কারাযীও (রহঃ) এ রকমই বর্ণনা করেছেন। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৩২২) যাহ্হাক (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ভুলিয়ে দেয়া। 'আতা (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ ছেড়ে দেয়া। সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ মুছে ফেলা। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৩২২)

ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা আয়াতের হুকুম পরিবর্তন করে থাকেন। হালালকে হারাম, হারামকে হালাল, জায়িযকে নাজায়িয এবং নাজায়িযকে জায়িয ইত্যাদি নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা, বাধা ও অনুমতি এবং বৈধ ও অবৈধ কাজে 'নাসখ্' হয়ে থাকে। তবে যে সংবাদ দেয়া হয়েছে বা যে ঘটনাবলী বর্ণনা করা হয়েছে তাতে রদবদল এবং নাসিখ্ ও মানসূখ হয়না। 'নাসখ্' এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে নকল করা। যেমন একটি পুস্তক থেকে আর একটি পুস্তক নকল করা হয়। এরকমই এখানেও যেহেতু একটি নির্দেশের পরিবর্তে আর একটি নির্দেশ দেয়া হয় এ জন্য একে নাসখ্ বলে, ওটা নির্দেশের পরিবর্তন অথবা শব্দেরই পরিবর্তন হোক।

'নাসখ্' এর মূলতত্ত্বের উপর মূলনীতির আলেমগণের অভিমত

এ জিজ্ঞাস্য বিষয়ে ধর্মীয় মূলনীতির আলেমগণের ব্যাখ্যা বিভিন্ন রূপ হলেও অর্থ হিসাবে সবগুলি প্রায় একই। 'নাসখ্' এর অর্থ হচ্ছে, কোন শরঈ নির্দেশ পরবর্তী দলীলের ভিত্তিতে সরে যাওয়া। কখনও সহজের পরিবর্তে কঠিন এবং কখনও কঠিনের পরিবর্তে সহজ হয়, আবার কখনও বা কোন পরিবর্তনই হয়না। তাবারানীর (রহঃ) হাদীস গ্রন্থে একটি হাদীস আছে যে, দুই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হতে একটি সূরা মুখস্থ করেছিলেন। সূরাটি তারা পড়তেই থাকেন। একদা রাতের সালাতে সূরাটি তারা পড়ার ইচ্ছা করেন কিন্তু কোনক্রমেই স্মরণ করতে পারেননা। হতবুদ্ধি হয়ে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হন এবং ঘটনাটি বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাদেরকে বলেন ঃ 'এটা মানসূখ হয়ে গেছে এবং এর পরিবর্তে উত্তম দেয়া হয়েছে। তোমাদের অন্ত র হতে ওটা বের করে নেয়া হয়েছে। দুঃখ করনা, নিশ্চিন্ত থাক।'

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এর তাফসীরে বর্ণনা করেন ঃ 'অর্থাৎ আমি ওকে ছেড়ে দেই, মানসূখ করিনা।' ইব্ন মাসঊদের (রাঃ) ছাত্র বলেন ঃ 'অর্থাৎ আমি ওর শব্দ ঠিক রেখে হুকুম পরিবর্তন করে দেই।' আব্দ ইব্ন উমাইর (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং 'আতা (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে 'অর্থাৎ আমি ওকে পিছনে সরিয়ে দেই।' 'আতিয়া আল আউফী (রহঃ) বলেন ঃ 'অর্থাৎ মানসূখ করিনা।' সুদ্দী (রহঃ) এবং রাবী ইব্ন আনাসও (রহঃ) এটাই বলেন। যাহ্হাক (রহঃ) বলেন ঃ 'অর্থাৎ নাসিখকে মানসূখের পিছনে রাখি।' আবুল আলীয়া (রহঃ) বলেন ঃ 'অর্থাৎ

আমার নিকট ওটা টেনে নেই।’ উমার (রাঃ) খুৎবায় نَنْسَاهَا পড়েছেন এবং ওর অর্থ ‘পিছনে হওয়া’ বর্ণনা করেছেন। نُنْسِهَا পড়লে ওর ভাবার্থ হবে ‘আমি ওটা ভুলিয়ে দেই।’ আল্লাহ তা‘আলা যে হুকুম উঠিয়ে নিতে ইচ্ছা করতেন ওটি নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভুলিয়ে দিতেন।

সা‘দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) نُنْسِهَا পড়তেন। এতে তাকে কাসিম ইব্ন আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন যে, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব (রহঃ) তো একে نَنْسَاهَا পড়তেন। তখন তিনি বলেন যে, সাঈদের (রহঃ) উপর কিংবা তার বংশের উপর কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ হয়নি। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰٓ

অচিরেই আমি তোমাকে পাঠ করাবো, ফলে তুমি বিস্মৃত হবেনা। (সূরা আ’লা, ৮৭ ঃ ৬) তিনি আরও বলেন ঃ

وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ

যদি ভুলে যাও তাহলে তোমার রাব্বকে স্মরণ কর। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ২৪)

উমারের (রাঃ) ঘোষণা রয়েছে ঃ ‘আলী (রাঃ) উত্তম ফাইসালাকারী এবং উবাই (রাঃ) সবচেয়ে বেশি কুরআনের পাঠক। আমরা উবাইর (রাঃ) কথা ছেড়ে দেই। কেননা তিনি বলেন, ‘আমি যা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে শুনেছি তা ছাড়বনা, অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ ‘আমি যা মানসূখ করি বা ভুলিয়ে দেই, তা হতে উত্তম বা তারই মত আনয়ন করি।’ (বুখারী, আহমাদ)

‘তা হতে উত্তম হয়’ অর্থাৎ বান্দাদের জন্য সহজ ও তাদের আরাম হিসাবে, কিংবা ‘তারই মত হয়’। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলার দূরদর্শিতা তার পরেরটাতেই রয়েছে।

আল্লাহ তাঁর আয়াতের পরিবর্তন করেন, যদিও ইয়াহুদীরা তা অবিশ্বাস করে

আল্লাহ বলেন ঃ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ সৃষ্টজীবের পরিবর্তনকারী এবং সৃষ্টি ও হুকুমের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। তিনি যাকে

যেভাবে চান সেভাবেই গঠন করেন। তিনি যাকে চান ভাগ্যবান করেন এবং যাকে চান হতভাগ্য করেন। যাকে চান সুস্থতা দান করেন এবং যাকে চান রোগাক্রান্ত করেন। যাকে চান ক্ষমতা প্রদান করেন এবং যাকে চান দুর্ভাগা করেন। বান্দাদের মধ্যে তিনি যে হুকুম জারী করতে চান তাই জারী করেন। যা চান হারাম করেন, যা চান হালাল করেন, যা চান অনুমতি দেন এবং যা চান নিষেধ করেন। তিনি ব্যাপক বিচারপতি। তিনি যা চান সেই আহকামই জারী করেন, তাঁর হুকুম কেহ অগ্রাহ্য করতে পারেনা। তিনি যা চান তাই করেন। কেহই তাঁকে বাধা দান করতে পারেনা। তিনি বান্দাদেরকে পরীক্ষা করেন এবং দেখেন যে, তারা নাবী ও রাসূলদের কিরূপ অনুসারী হয়। তিনি কোন যৌক্তিকতার কারণে নির্দেশ দেন, আর কোন যৌক্তিকতার কারণে ঐ হুকুমকেই সরিয়ে দেন। তখন পরীক্ষা হয়ে যায়। ভাল লোকেরা তখনও আনুগত্যে প্রস্তুত ছিল এবং এখনও আছে। কিন্তু যাদের অন্তর খারাপ তারা সমালোচনা শুরু করে দেয় এবং নাক মুখ ঘুরিয়ে থাকে। অথচ সমস্ত সৃষ্টজীবের সৃষ্টিকর্তার সমস্ত কথাই মেনে নেয়া উচিত এবং সর্বাবস্থায়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করা উচিত। তিনি যা বলেন তা সত্য জেনে পালন করা এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকা কর্তব্য।

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদীদের মিথ্যা দাবী খন্ডন করে মুসলিমদের সুখবর দিচ্ছেন যে, অভিশপ্ত ইয়াহুদীরা সত্যের উপর নেই। ভাল-মন্দ উভয় বিষয় আল্লাহ তা'আলার অধীন, তারা দাবী করত যে, তাদের উপর অবতীর্ণ কিতাবের বাণীর কোন পরিবর্তন হবেনা। ইহা ছিল তাদের মূর্খতা ও অহমিকার কারণে।

ইমাম আবূ জাফর ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে ঃ হে মুহম্মাদ! তুমি কি জান যে, নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের একচ্ছত্র মালিক একমাত্র আমি? তাদের ব্যাপারে যে কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার মালিকও আমিই। আমি যা ইচ্ছা তা বাতিল করি, পরিবর্তন করি অথবা সংশোধন করি; আমার আদেশের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করার কেহ নেই।

এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হলেও প্রকৃত পক্ষে এটা ইয়াহুদীদের কথার প্রতিবাদেই বলা হয়েছে। তারা ইঞ্জীল ও কুরআনকে মানতনা। কারণ এই যে, এ দু'টির মধ্যে তাওরাতের কতকগুলি হুকুম পরিবর্তন করা হয়েছে। আর এই একই কারণে তারা এই নাবীগণকেও স্বীকার করতনা। এটা শুধু অবাধ্যতা ও অহংকারই বটে। নচেৎ বিবেক হিসাবে তা 'নাসখ্' অসম্ভব নয়। কেননা মহান আল্লাহ স্বীয় কাজে

সর্বাধিকারী। তিনি যা চান ও যখন চান সৃষ্টি করে থাকেন। যা চান, যেভাবে চান সেভাবে রাখেন। এভাবেই যা চান এবং যখন চান হুকুম করেন। এটা স্পষ্ট কথা যে, তাঁর হুকুমের উপর কারও হুকুম হতে পারেনা। (তাবারী ২/৪৮৮)

আদমের (আঃ) সন্তানেরা পরস্পর ভাই বোন হত। কিন্তু তাদের মধ্যে বিয়ে বৈধ ছিল। অতঃপর পরবর্তী যুগে এটা হারাম করে দেয়া হয়েছে। নূহ (আঃ) যখন নৌকায় উঠেন তখন সমুদয় প্রাণীর গোশত বৈধ রাখা হয়। কিন্তু পরে কতকগুলোর গোশত অবৈধ ঘোষণা করা হয়। দুই বোনকে এক সঙ্গে বিয়ে করা ইসরাঈল (আঃ) এবং তাঁর সন্তানদের জন্য বৈধ ছিল। অতঃপর তাওরাতে এবং তার পরও অবৈধ করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীমকে (আঃ) তাঁর পুত্র ইসমাঈলকে (আঃ) কুরবানী করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু কুরবানীর পূর্বেই এই হুকুম মানসূখ করে দেয়া হয়। বানী ইসরাঈলকে হুকুম দেয়া হয়েছিল যে, যারা বাছুর পূজা করেছিল তাদেরকে যেন তারা হত্যা করে; অথচ অনেক বাকি থাকতেই এ হুকুম উঠিয়ে নেয়া হয়। এ রকম আরও বহু ঘটনা বিদ্যমান রয়েছে। আর স্বয়ং ইয়াহুদীরাও ওটা স্বীকার করে।

এ ছাড়া আরও উদাহরণ রয়েছে যে, ইয়াহুদীরা যে সমস্ত বিষয় বিশ্বাস করত (তাওরাতের মাধ্যমে) সে সব সংঘটিত হওয়ার পর তারা তা অগ্রাহ্য করেছে। ইহাতো স্পষ্ট জানা কথা যে, তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ তাওরাতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন এবং তাঁকে অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর অর্থ হল এই যে, আমাদের নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যদি তারা অনুসরণ না করে এবং তাঁর প্রচারিত ধর্মের আইন কানূন মেনে না চলে তাহলে তাদের কোন ভাল কাজই আল্লাহ কবূল করবেননা। তাওরাতের পরিবর্তে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভিন্ন কিতাব কুরআনুল কারীমসহ প্রেরণ করা হয়েছে, যা সকলের জন্য আমল করার সর্বশেষ কিতাব।

১০৮। তোমরা কি চাও যে, তোমাদের রাসূলের নিকট আবেদন করবে যেমন ইতোপূর্বে মূসার নিকট (হঠকারিতা বশতঃ এইরূপ বহু নিরর্থক) আবেদন করা হয়েছিল? আর যে ব্যক্তি ঈমানের পরিবর্তে কুফরী অবলম্বন করে, নিশ্চয়ই সে	١٠٨. أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْـَٔلُوا۟ رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ۗ وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَـٰنِ فَقَدْ ضَلَّ

সঠিক পথ হতে দূরে সরে পড়ে।	سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ

অধিক জিজ্ঞাসাবাদ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা

এ পবিত্র আয়াতে মহান আল্লাহ ঈমানদারগণকে কোন ঘটনা ঘটার পূর্বে তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বাজে প্রশ্ন করতে নিষেধ করেছেন। এ অধিক প্রশ্নের অভ্যাস খুবই জঘন্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسۡـَٔلُواْ عَنۡ أَشۡيَآءَ إِن تُبۡدَ لَكُمۡ تَسُؤۡكُمۡ وَإِن تَسۡـَٔلُواْ عَنۡهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلۡقُرۡءَانُ تُبۡدَ لَكُمۡ

হে মু'মিনগণ! তোমরা এমন সব বিষয় জিজ্ঞেস করনা, যদি তা তোমাদের নিকট প্রকাশ করে দেয়া হয় তাহলে তোমাদের খারাপ লাগবে, আর যদি তোমরা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় উক্ত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস কর তাহলে তোমাদের জন্য প্রকাশ করে দেয়া হবে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১০১) কোন জিনিস ঘটে যাওয়ার পূর্বে ওটা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলে এ ভয় রয়েছে যে, প্রশ্ন করার দরুন না জানি ওটা হারাম হয়ে যায়। সহীহ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

মুসলিমদের মধ্যে সবচেয়ে বড় অপরাধী ঐ ব্যক্তি, যে এমন জিনিস সম্পর্কে প্রশ্ন করে যা হারাম ছিলনা, কিন্তু তার প্রশ্নের কারণে তা হারাম হয়ে যায়। (ফাতহুল বারী ৩/৩৯৮, মুসলিম ৩/১৩৪১)

এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একদা কেহ জিজ্ঞেস করে যে, যদি কোন লোক তার স্ত্রীর কাছে অপর কোন লোককে পায় তাহলে সে কি করবে? যদি জনগণকে সংবাদ দেয় তাহলে তো বড় লজ্জার কথা হবে, আর যদি চুপ থাকে তাহলে ওটাও নির্লজ্জের মত কাজ হবে। এ প্রশ্ন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের খুবই খারাপ মনে হল। ঘটনাক্রমে ঐ লোকটিরই এ ঘটনা ঘটে গেল এবং লি'আনের হুকুম নাযিল হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাজে কথা, সম্পদ নষ্ট করা এবং বেশি প্রশ্ন করা হতে নিষেধ করেছেন। সহীহ মুসলিমে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

আমি যতক্ষণ কিছু না বলি ততক্ষণ তোমরাও কিছুই আমাকে জিজ্ঞেস করনা। তোমাদের পূর্ববর্তী লোককে এই বদঅভ্যাসই ধ্বংস করে দিয়েছে। তারা খুব

বেশি প্রশ্ন করত এবং তাদের নাবীগণের সাথে তর্ক-বিতর্ক করত। আমি যদি তোমাদেরকে কিছু নির্দেশ দেই তাহলে সাধ্যানুসারে তা পালন কর। (মুসলিম ২/৯৭৫) এ কথা তিনি ঐ সময় বলেছিলেন যখন তিনি জনগণকে বলেছিলেন ঃ 'তোমাদের উপর আল্লাহ তা'আলা হাজ্জ ফার্‌য করেছেন।' তখন কেহ বলেছিল ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! প্রতি বছরই কি? তিনি নীরব হয়ে গিয়েছিলেন। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করেছিল; কিন্তু তিনি কোন উত্তর দেননি। সে তৃতীয় বার এ প্রশ্নই করলে তিনি বলেছিলেন ঃ

'প্রতি বছর নয়; কিন্তু যদি আমি 'হ্যাঁ' বলতাম তাহলে ওটা প্রতি বছরই ফার্‌য হয়ে যেত। অতঃপর তোমরা ওটা পালন করতে পারতেনা।' (মুসলিম ২/৯৭৫)

আনাস (রাঃ) বলেন ঃ 'যখন থেকে আমাদেরকে প্রশ্ন করা হতে বিরত রাখা হয় তখন থেকে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোন প্রশ্ন করতে খুবই ভয় করতাম। আমরা ইচ্ছা করতাম যে, কোন গ্রাম্য অশিক্ষিত বেদুঈন জিজ্ঞেস করলে আমরা শুনতে পেতাম।'(মুসলিম ১/৪১)

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বলেন, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী মুহাম্মাদ (রহঃ) তাকে বলেন যে, ইকরিমাহ (রহঃ) অথবা সাঈদ (রহঃ) বলেছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, রাফী ইব্‌ন হুরাইমালা অথবা ওয়াহাব ইব্‌ন যায়িদ বলেছিল ঃ হে মুহাম্মাদ! আকাশ থেকে আমাদের জন্য কিতাব নিয়ে আসুন যা আমরা পাঠ করব, অথবা আমাদের জন্য নদীসমূহ প্রবাহিত করুন। তাহলেই আমরা আপনার কথা শুনব এবং আপনার অনুসরণ করব। তাদের এ অন্যায় আব্দারে আল্লাহ সুবহানাহু ধমক দিয়ে বলেন ঃ তোমরা কি তোমাদের রাসূলের কাছে ঐ রূপ আবেদন করবে যেরূপ ইতোপূর্বে মূসার কাছে করা হয়েছিল? (তাবারী ২/৪৯০) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দা'ওয়াতের কাজকে অহেতুক কঠিন করার প্রয়াসকে নাকচ করে দেয়া হয়। কারণ ওগুলো হল ঈমান না আনার পিছনে বাহানা তৈরী করা যেমনটি করা হয়েছিল মূসার (আঃ) সাথে।

যে ঈমানের পরিবর্তে কুফরীকে এবং সহজের পরিবর্তে কঠিনকে গ্রহণ করে নেয়, সে সরল পথ থেকে সরে গিয়ে মূর্খতা ও ভ্রান্তির পথে পড়ে যায়। অনুরূপভাবে বিনা প্রয়োজনে যারা প্রশ্ন করে তাদের অবস্থাও তাই। কুরআনুল হাকীমে এক জায়গায় আছে ঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا۟ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ.
جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۖ وَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ

তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনা যারা আল্লাহর অনুগ্রহের বদলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তাদের সম্প্রদায়কে নামিয়ে আনে ধ্বংসের আলয় জাহান্নামে, যার মধ্যে তারা প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট ঐ আবাসস্থল!' (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ২৮-২৯)

আবুল আলীয়া (রহঃ) বলেন যে, তারা আরামের পরিবর্তে কষ্টকে গ্রহণ করে নিয়েছে। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৩৩০)

১০৯। কিতাবীদের অনেকে তাদের প্রতি সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর তারা তাদের অন্তর্হিত বিদ্বেষ বশতঃ তোমাদেরকে বিশ্বাস স্থাপনের পরে অবিশ্বাসী করতে ইচ্ছা করে; কিন্তু যে পর্যন্ত আল্লাহ স্বয়ং আদেশ আনয়ন না করেন সে পর্যন্ত তোমরা ক্ষমা কর ও উপেক্ষা করতে থাক; নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান।	١٠٩. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعْدِ إِيمَـٰنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ ۖ فَٱعْفُوا۟ وَٱصْفَحُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ
১১০। আর তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠিত কর ও যাকাত প্রদান কর; এবং তোমরা স্ব স্ব জীবনের জন্য যে সৎকাজ অগ্রে প্রেরণ করেছ তা আল্লাহর নিকট প্রাপ্ত হবে; তোমরা যা করছ নিশ্চয়ই আল্লাহ তার পরিদর্শক।	١١٠. وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

আহলে কিতাবীদের অনুসরণ করা যাবেনা

এখানে আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাবদেরকে অনুসরণ করার ব্যাপারে সতর্ক করে দিচ্ছেন। কারণ তারা প্রকাশ্যে এবং গোপনে মুসলিমদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করছে এবং ঘৃণা করছে। যখন তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর অনুসরণকারীদের মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হয় তখন তাদেরকে হিংসা করছে। আল্লাহ তাঁর অনুগত বান্দাদেরকে বলছেন যে, তারা যেন আহলে কিতাবদেরকে ক্ষমার চোখে দেখে এবং ধৈর্য ধারন করে যতক্ষণ না তাদের জন্য আল্লাহর সাহায্য নেমে আসে এবং বিজয় লাভ করে। আল্লাহ আরও আদেশ করছেন সালাত আদায় করতে, যাকাত প্রদান করতে এবং উত্তম আমল করতে।

ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন মালিক (রহঃ) বলেন যে, কা'ব ইব্‌ন আশরাফ নামক এক ইয়াহুদী কবি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সালামের খুবই সমালোচনা করত। এ কারণেই তাকে উদ্দেশ্য করে وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/৩৩১) যাহহাক (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যদিও ইয়াহুদীদের কিতাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতার প্রমাণ বিদ্যমান ছিল এবং সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী সম্বন্ধে সম্যক অবগত ছিল ও তাঁকে ভালভাবেই চিনত, আবার যদিও সে এও স্বচক্ষে দেখছিল যে, কুরআন মাজীদ তাদের কিতাবের সত্যতা প্রমাণ করছে এবং এও লক্ষ্য করছিল যে, একজন নিরক্ষর লোক এ কিতাব পাঠ করছেন, যা সরাসরি মুজিযা তথাপি তিনি যে আরাবে প্রেরিত হয়েছিলেন শুধুমাত্র এ কারণেই হিংসার বশবর্তী হয়ে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরআনকে অস্বীকার করেছিল এবং জনগণকে পথভ্রষ্ট করতে আরম্ভ করেছিল। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/৩৩৫) সেই সময় গভীর পরিণামদর্শিতার ভিত্তিতে মহান আল্লাহ মুসলিমদেরকে নির্দেশ দেন যে, তারা যেন ঐ সব ইয়াহুদীকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে এবং আল্লাহ তা'আলার ফাইসালার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓا۟ أَذًى كَثِيرًا

তোমাদের পূর্বে যাদেরকে গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছে ও যারা অংশী স্থাপন করেছে তাদের নিকট হতে তোমাদেরকে বহু দুঃখজনক বাক্য শুনতে হবে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৮৬)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ অতঃপর অন্য আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং তার ফলে পূর্বের নির্দেশ উঠে যায়। এখন তাদেরকে প্রতিশোধ গ্রহণ ও আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে।

فَٱقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ

অতঃপর মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৫)

قَـٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ

যে সব আহলে কিতাব আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখেনা এবং কিয়ামাত দিনের প্রতিও না। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ২৯) অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَهُمْ صَـٰغِرُونَ

যে পর্যন্ত না তারা অধীনতা স্বীকার করে। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ২৯)

উসামা ইব্ন যায়িদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবীগণ কাফির ও আহলে কিতাবীদেরকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতেন। অতঃপর আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দেন। ফলে কুরাইশদের যে সমস্ত শক্তিশালী নেতা ও যোদ্ধা ছিল তাদের মধ্য থেকে আল্লাহর তরফ থেকে যাদের ধ্বংস হওয়া নির্ধারিত ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেনাবাহিনীর হাতে তারা নিহত হয়। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৩৩৩)

আর বদর প্রান্তরে যে প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাতেই মুশরিকরা ভীষণভাবে পরাজিত হয় এবং তাদের বড় বড় নেতৃবৃন্দের মৃতদেহে মাইদান পূর্ণ হয়ে যায়।

সৎ কাজের আদেশ দানে উৎসাহ প্রদান

وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللّهِ

এখন মু'মিনদেরকে উৎসাহ দেয়া হচ্ছে যে, যদি তারা সালাত, সিয়াম ইত্যাদি ইবাদাত সঠিকভাবে পালন করে তাহলে তাদের পরকালের শাস্তির

রক্ষাকবচ ছাড়াও দুনিয়ায়ও মুশরিক ও কাফিরদের উপর জয়যুক্ত হওয়ার কারণ হয়ে যাবে। দুনিয়ায় এ আমল না করার কারণে পরকালের দুরাবস্থার কথা জানিয়ে অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّٰلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ۖ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ ٱلدَّارِ

যেদিন যালিমদের কোন ওযর আপত্তি কোন কাজে আসবেনা, তাদের জন্য রয়েছে লা'নত এবং নিকৃষ্ট আবাস। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৫২)

এরপর মু'মিনদেরকে বলা হচ্ছে, إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ তাদের ভাল কাজের প্রতিদান উভয় জগতেই দেয়া হবে। তাঁর নিকট ছোট, বড়, প্রকাশ্য, গোপনীয়, ভাল ও মন্দ কোন কাজই গোপন থাকেনা। মু'মিনদেরকে তাঁর আনুগত্যের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য এবং তাঁর অবাধ্যতা হতে রক্ষার জন্যই মহান আল্লাহ এটা বলেছেন।

১১১। এবং তারা বলে ঃ ইয়াহুদী বা খৃষ্টান ছাড়া আর কেহই জান্নাতে প্রবেশ করবেনা; এটা তাদের মিথ্যা আশা। তুমি বল ঃ যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর।	١١١. وَقَالُوا۟ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَٰرَىٰ ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ
১১২। অবশ্য যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর নিকট সমর্পন করেছে এবং সৎকর্মশীল হয়েছে, ফলতঃ তার জন্য তার রবের নিকট প্রতিদান রয়েছে এবং তাদের জন্য কোন আশংকা নেই ও	١١٢. بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُۥٓ أَجْرُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

Contents

تَحْزَنُونَ	তারা চিন্তিত হবেনা।
١١٣. وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَـٰرَىٰ عَلَىٰ شَىْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَـٰرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَىْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِتَـٰبَ ۗ كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ فِيمَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ	১১৩। আর ইয়াহুদীরা বলে ঃ খৃষ্টানরা কোন বিষয়ের উপর নেই; এবং খৃষ্টানরা বলে, ইয়াহুদীরাও কোন বিষয়ের উপর নেই - অথচ তারা গ্রন্থ পাঠ করে। এরূপ যারা জানেনা, তারাও ওদের কথার অনুরূপ কথা বলে থাকে; অতএব যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করেছিল, উত্থান দিনে আল্লাহ তাদের মধ্যে তদ্বিষয়ে ফাইসালা করে দিবেন।

ইয়াহুদীদের প্রতারণা, আমিত্ব এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাদের ব্যাপারে ভীষণ সতর্ক বাণী

এখানে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের অহংকার ও আত্মম্ভরিতার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কেহকেও কিছুই মনে করতনা এবং স্পষ্টভাবে বলত যে, তারা ছাড়া অন্য কেহ জান্নাতে যাবেনা। সূরা মায়িদায় তাদের নিম্নরূপ একটা উক্তিও বর্ণিত হয়েছে ঃ

نَحْنُ أَبْنَـٰٓؤُا۟ ٱللَّهِ وَأَحِبَّـٰٓؤُهُۥ

আমরা আল্লাহর পুত্র ও তাঁর প্রিয়পাত্র। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১৮) তাদের এ কথার উত্তরে ইরশাদ হচ্ছে ঃ 'তাহলে কিয়ামাতের দিন তোমাদের উপর শাস্তি হবে কেন?' অনুরূপভাবে ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের উক্তি নিম্নরূপও ছিল ঃ 'আমরা কয়েকটা দিন জাহান্নামে অবস্থান করব।' তাদের এ কথার উত্তরে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ তাদের এই দাবীও দলীলবিহীন। এভাবেই এখানেও তিনি তাদের একটা দাবী খণ্ডন করে বলেন ঃ 'দলীল উপস্থিত কর দেখি?' তাদের অপারগতা সাব্যস্ত করে পুনরায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 'হ্যাঁ, যে কেহই আল্লাহ তা'আলার অনুগত হয়ে ইখলাসের সাথে সৎকার্যাবলী সম্পাদন করে, সে পূর্ণভাবে তার প্রতিদান লাভ করবে।' যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

فَإِنْ حَآجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ

তারা যদি তোমার সাথে কলহ করে তাহলে তুমি বল ঃ আমি ও আমার অনুসারীগণ আল্লাহর উদ্দেশে আত্মসমর্পণ করেছি। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ২০)

মোট কথা, দু'টি শর্তের উপর প্রত্যেক আমল গ্রহণযোগ্য। তা হল অন্তরের বিশুদ্ধতা ও সুন্নাতের অনুসরন। শুধুমাত্র বিশুদ্ধ অন্তঃকরণই আমলকে গ্রহণযোগ্য করতে পারেনা যে পর্যন্ত না সে সুন্নাতের প্রতি অনুগত থাকে। হাদীসে উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি এমন কাজ করে যার উপর আমার নির্দেশ নেই তা গ্রহণীয় নয়।' (মুসলিম ৩/১৩৪৪) সুতরাং 'সংসার ত্যাগ' কাজটি বিশুদ্ধ অন্তরের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও তা সুন্নাতের উল্টা বলে গ্রহণীয় নয়। তদ্রূপ আমল সম্পর্কে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا۟ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَـٰهُ هَبَآءً مَّنثُورًا

আমি তাদের কৃতকর্মগুলি বিবেচনা করব, অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২৩) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَعْمَـٰلُهُمْ كَسَرَابٍۭ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْـَٔانُ مَآءً حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَهُۥ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا

যারা কুফরী করে, তাদের আমলসমূহ মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ; পিপাসার্ত যাকে পানি মনে করে থাকে, কিন্তু সে ওর নিকট উপস্থিত হলে দেখবে ওটা কিছু নয়। (সূরা নূর, ২৪ ঃ ৩৯) অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَـٰشِعَةٌ. عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ. تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً. تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ

সেদিন বহু মুখমন্ডল অবনত হবে; কর্মক্লান্ত পরিশ্রান্তভাবে; তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে; তাদেরকে উত্তপ্ত প্রস্রবণ হতে পান করানো হবে। (সূরা গাশিয়াহ, ৮৮ ঃ ২-৫)

এটাও স্মরণীয় বিষয় যে, বাহ্যতঃ কোন কাজ সুন্নাতের অনুরূপ হলেও ঐ আমলে অন্তরের বিশুদ্ধতা এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য না থাকার কারণে উক্ত আমলও প্রত্যাখ্যাত হয়ে যাবে। কপট ও মুনাফিকদের অবস্থাও এরূপই। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ يُخَـٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَـٰدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓا۟ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُوا۟ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করে এবং তিনিও তাদেরকে ঐ প্রতারণা প্রত্যার্পণ করছেন; এবং যখন তারা সালাতের জন্য দন্ডায়মান হয় তখন লোকদেরকে দেখানোর জন্য অলসভরে দন্ডায়মান হয়ে থাকে এবং আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৪২) তিনি আরো বলেন ঃ

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ. وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ

সুতরাং পরিতাপ সেই সালাত আদায়কারীদের জন্য যারা তাদের সালাতে অমনোযোগী, যারা লোক দেখানোর জন্যে ওটা করে এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোট খাট সাহায্য দানে বিরত থাকে। (সূরা মাউ'ন, ১০৭ ঃ ৪-৭) অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَمَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَـٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًا.

সুতরাং যে তার রবের সাক্ষাত কামনা করে সে যেন সৎ কাজ করে এবং তার রবের ইবাদাতে কেহকেও শরীক না করে। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ১১০) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ 'তাদেরকে তাদের রাব্ব পূর্ণ প্রতিদান দিবেন এবং ভয় ও সন্ত্রাস হতে রক্ষা করবেন। পরকালে তাদের কোন ভয় নেই এবং দুনিয়া ত্যাগ করতে তাদের কোন দুঃখ নেই।'

অহংকার ও বিদ্বেষ বশে ইয়াহুদ ও খৃষ্টানরা একে অপরের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ আর وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ইয়াহুদীরা বলে ঃ খৃষ্টানরা কোন বিষয়ের উপর নেই; এবং খৃষ্টানরা বলে, ইয়াহুদীরাও কোন বিষয়ের উপর নেই - অথচ তারা গ্রন্থ পাঠ করে। নাজরানের খৃষ্টান প্রতিনিধিরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে তখন ইয়াহুদী পণ্ডিতেরাও আসে। অতঃপর তারা একদল অপর দলকে পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করে। রাফী ইব্ন হুরাইমালা বলে ঃ তোমরাতো কোন কিছুরই অনুসরণ করনা। সে ঈসাকে (আঃ) এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ ইঞ্জিলকেও অস্বীকার করে। তখন নাজরান থেকে আগত খৃষ্টান লোকটি ইয়াহুদীকে বলল ঃ বরং তোমরাই কোন কিছুকে অনুসরণ করছনা। সেও ইয়াহুদী লোকটির মত মূসাকে (আঃ) অস্বীকার করল এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কিতাব তাওরাতকেও অস্বীকার করল। তখন আল্লাহ সুবহানাহু এই আয়াত নাযিল করেন। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৩৩৯)

আল্লাহ তা‘আলা এখানে পরিস্কারভাবে জানিয়ে দিলেন যে, তারা তাদের কিতাবে উভয়ে উভয়ের কিতাব ও নাবী সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও একে অপরকে অস্বীকার করে। ইয়াহুদীরা ঈসাকে (আঃ) অস্বীকার করছে, অথচ তাদের কিতাব তাওরাতে মূসার (আঃ) যবানে ঈসার (আঃ) আগমন এবং তাঁকে স্বীকৃতি দানের আদেশ করা হয়েছে। এছাড়া তাদের কিতাব ‘গসপেল’ এ মূসা (আঃ) যে নাবী ছিলেন এবং তাঁর প্রতি যে আল্লাহর তরফ থেকে তাওরাত নাযিল করা হয়েছিল সেই কথার সাক্ষ্য রয়েছে। তথাপি তারা একে অপরকে অস্বীকার করছে। অথচ উভয় দলই আহলে কিতাব। তাওরাতের মধ্যে ইঞ্জীলের এবং ইঞ্জীলের মধ্যে তাওরাতের সত্যতার প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং তাদের এসব কথা একেবারেই বাজে ও ভিত্তিহীন।

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ ‘আল্লাহ তাদের মতবিরোধের ফাইসালা কিয়ামাতের দিন করবেন, যেদিন কোন অত্যাচার ও বল প্রয়োগ থাকবেনা।’ এরশাদ হচ্ছে ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلصَّـٰبِـِٔينَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ

যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইয়াহুদী হয়েছে, যারা সাবিয়ী, খৃষ্টান, অগ্নিপূজক এবং যারা মুশরিক - কিয়ামাত দিবসে আল্লাহ তাদের মধ্যে ফাইসালা করে দিবেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের উপর সাক্ষী। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ১৭)

অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ

বল ঃ আমাদের রাব্ব আমাদেরকে একত্রিত করবেন, অতঃপর তিনি আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে ফাইসালা করে দিবেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ফাইসালাকারী, সর্বজ্ঞ। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ২৬)

১১৪। এবং যে আল্লাহর মাসজিদসমূহের মধ্যে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে নিষেধ করছে এবং তা উজাড় করতে চেষ্টা করছে সে অপেক্ষা কে অধিক অত্যাচারী? তাদের পক্ষে উপযুক্ত নয় যে, তারা শংকিত হওয়া ব্যতীত তন্মধ্যে প্রবেশ করে; তাদের জন্য ইহলোকে দুর্গতি এবং পরলোকে কঠোর শাস্তি রয়েছে।	١١٤. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَـٰجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ وَسَعَىٰ فِى خَرَابِهَآ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَآ إِلَّا خَآئِفِينَ ۚ لَهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا خِزْىٌ وَلَهُمْ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

এ আয়াতের তাফসীরে দু’টি উক্তি রয়েছে। প্রথম উক্তি এই যে, এর দ্বারা খৃষ্টানকে বুঝানো হয়েছে। দ্বিতীয় উক্তিতে ভাবার্থ হচ্ছে মুশরিক। খৃষ্টানরাও

বাইতুল মুকাদ্দাসের মাসজিদে অপবিত্র জিনিস নিক্ষেপ করত এবং জনগণকে তার ভিতর সালাত আদায় করতে বাধা প্রদান করত। বাখতে নসর যখন বাইতুল মুকাদ্দাস ধ্বংস করার জন্য আক্রমণ চালায় তখন খৃষ্টানরা তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল এবং তাকে সর্বপ্রকার সাহায্য করেছিল।

সবচেয়ে বড় অন্যায় হল লোকদেরকে মাসজিদে আসায় বাঁধা দেয়া অথবা তাড়িয়ে দেয়া

হুদাইবিয়ার সন্ধির বছর মুশরিকরাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কা’বা ঘরে যেতে বাধা দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তাঁকে ‘যি তাওয়া’ নামক স্থানে কুরবানী করতে হয়েছিল। অতঃপর তিনি মুশরিকদের সাথে এক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেন। তিনি বলেন ঃ এর পূর্বে কেহ অন্য কেহকে পবিত্র কা’বা ঘরে প্রবেশ করতে বাধা দেয়নি। যদি কেহ তার পিতা কিংবা ভাইয়ের হত্যাকারীকে দেখতে পেত তবুও কা’বা ঘরে প্রবেশ করতে বাধা দিতনা। মুশরিকরা বলল ঃ যারা আমাদের পিতা-ভাইদের বদরের যুদ্ধে হত্যা করেছে তাদের কেহকে কা’বা ঘরে প্রবেশ করতে দেয়া হবেনা, যতক্ষণ আমাদের একজনও বেঁচে থাকবে। তখন আল্লাহ তা‘আলা وَسَعَى فِي خَرَابِهَا এ আয়াত নাযিল করেন। (তাবারী ২/৫২১)

وَسَعَى فِي خَرَابِهَا বলা হয়েছে, যারা আল্লাহর ঘর মাসজিদ রক্ষণাবেক্ষণ করে তাদেরকে মাসজিদে প্রবেশ করতে কিংবা আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ করতে অথবা হাজ্জ পালন করতে যারা বাঁধা দেয় তাদেরকে মুকাবিলা কর প্রাণপণ যুদ্ধ করে। ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কুরাইশরা মাসজিদুল হারামে সালাত আদায় করতে বাঁধা দিয়েছিল, এ কারণে আল্লাহ তা‘আলা وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ এ আয়াতটি নাযিল করেন। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৩৪১)

বাইতুল্লাহর বিধ্বস্ত হওয়ার বর্ণনাক্রমিক তালিকা

ইমাম ইব্ন জারীরের (রহঃ) ‘মাক্কার মুশরিকেরা বাইতুল্লাহর বিধ্বস্তির চেষ্টা করেনি’ এই উক্তির উত্তর এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও

তাঁর সহচরবৃন্দকে (রাঃ) মাক্কা হতে বিতাড়িত করা এবং পবিত্র কা'বা ঘরে মূর্তি স্থাপন করার চেয়ে বড় ধ্বংস আর কি হতে পারে? স্বয়ং কুরআনে ঘোষিত হচ্ছে ঃ

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوٓاْ أَوْلِيَآءَهُۥٓ ۚ إِنْ أَوْلِيَآؤُهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

কিন্তু তাদের কি বলার আছে যে জন্য আল্লাহ তাদের শাস্তি দিবেননা, যখন তারা মাসজিদুল হারামের পথ রোধ করছে, অথচ তারা মাসজিদুল হারামের তত্ত্বাবধায়ক নয়? আল্লাহভীরু লোকেরাই উহার তত্ত্বাবধায়ক, কিন্তু তাদের অধিকাংশ এটা অবগত নয়। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৩৪) অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'এসব লোক মাসজিদুল হারাম হতে বাধা দিয়ে থাকে।' অন্যত্র বলেন ঃ

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ شَٰهِدِينَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِ ۚ أُوْلَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ وَفِى ٱلنَّارِ هُمْ خَٰلِدُونَ. إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ فَعَسَىٰٓ أُوْلَٰٓئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ

মুশরিকরা যখন নিজেরাই নিজেদের কুফরী স্বীকার করে তখন তারা আল্লাহর মাসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে এমন তো হতে পারেনা। তারা এমন যাদের সমস্ত কাজ ব্যর্থ; এবং তারা জাহান্নামে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। আল্লাহর মাসজিদগুলি সংরক্ষণ করা তাদেরই কাজ, যারা আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামাত দিনের প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং সালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ছাড়া কেহকেও ভয় করেনা। এরাই সঠিক পথ প্রাপ্ত। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১৭-১৮) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْىَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُۥ ۚ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنَٰتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَـُٔوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ لِّيُدْخِلَ ٱللَّهُ فِى رَحْمَتِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

তারাই তো কুফরী করেছিল এবং নিবৃত্ত করেছিল তোমাদেরকে মাসজিদুল হারাম হতে এবং বাধা দিয়েছিল কুরবানীর জন্য আবদ্ধ পশুগুলিকে যথাস্থানে পৌঁছতে। তোমাদের যুদ্ধের আদেশ দেয়া হত, যদি না থাকত এমন কতকগুলি মু'মিন নর ও নারী যাদেরকে তোমরা জাননা, তাদেরকে তোমরা পদদলিত করতে অজ্ঞাতসারে। ফলে তাদের কারণে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে। যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়নি এ জন্য যে, তিনি যাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহ দান করবেন, যদি তারা পৃথক হত, আমি তাদের মধ্যস্থিত কাফিরদেরকে মর্মন্তদ শাস্তি দিতাম। (সূরা ফাত্হ, ৪৮ ঃ ২৫) সুতরাং ঐ সব মুসলিমকে যখন মাসজিদসমূহে প্রবেশ করা হতে বিরত রাখা হয়েছে, যাদের দ্বারা মাসজিদসমূহ আবাদ হয়ে থাকে, তখন মাসজিদগুলি ধ্বংস করতে আর বাকি রাখলো কি? মাসজিদের আবাদ শুধুমাত্র বাহ্যিক রং ও চাকচিক্যের দ্বারা হয়না; বরং ওর মধ্যে আল্লাহ তা'আলার যিক্র হওয়া, শারীয়াতের কার্যাবলী চালু থাকা, শির্ক ও বাহ্যিক ময়লা হতে পবিত্র রাখাই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে মাসজিদকে আবাদ করা।

ইসলাম প্রতিষ্ঠিত থাকবেই

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, أُوْلَـــئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ মাসজিদের মধ্যে নির্ভীকভাবে প্রবেশ করা মুশরিকদের জন্য মোটেই শোভা পায়না। ভাবার্থ এই যে, 'হে মুসলিমগণ! তোমরা মুশরিকদেরকে নির্ভীক চিত্তে আল্লাহর ঘরে (কা'বা ঘরে) প্রবেশ করতে দিবেনা, আমি যখন তোমাদেরকে তাদের উপর জয়যুক্ত করব তখন তোমাদেরকে এ কাজই করতে হবে।' অতঃপর মাক্কা বিজয়ের পরবর্তী বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেন ঃ 'এ বছরের পরে যেন কোনও মুশরিক হাজ্জ করতে না আসে এবং কেহই যেন নগ্ন হয়ে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ না করে। যে সব লোকের মধ্যে সন্ধির সময়কাল নির্ধারিত হয়েছে তা ঠিকই থাকবে।' (ফাতহুল বারী ৩/৫৬৫) প্রকৃতপক্ষে এই নির্দেশ নিম্নের এই আয়াতেরই সত্যতা প্রমাণ করছে ও তার উপর আমল করছে ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـٰذَا

হে মু'মিনগণ! মুশরিকরা হচ্ছে একেবারেই অপবিত্র, অতএব তারা যেন এ বছরের পর মাসজিদুল হারামের নিকটেও আসতে না পারে। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ২৮) এর ভাবার্থ এও হতে পারে ঃ এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি অতি সত্বরই মু'মিনদেরকে মুশরিকদের উপর জয়যুক্ত করবেন এবং তার ফলে এই মুশরিকরা মাসজিদের দিকে মুখ করতেও থর থর করে কাঁপতে থাকবে, আর হলও তাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিমদেরকে উপদেশ দেন যে, আরাব উপদ্বীপে দু'টি ধর্ম থাকতে পারেনা এবং ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে তথা হতে বের করে দেয়া হবে। এই উম্মাতের ঐ মহান ব্যক্তিগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঐ উপদেশ কার্যে পরিণত করে দেখিয়ে দেন। এর দ্বারা মাসজিদসমূহের মর্যাদাও সাব্যস্ত হল। বিশেষ করে ঐ স্থানের মাসজিদের মর্যাদা সাব্যস্ত হল যেখানে দানব ও মানব সবারই জন্য মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাবীরূপে প্রেরিত হয়েছিলেন।

ঐ কাফিরদের উপর দুনিয়ার লাঞ্ছনা ও অপমানও এসে গেল এবং যেমন তারা মুসলিমদেরকে বাধা দিয়েছিল ও দেশ হতে বিতাড়িত করেছিল, ঠিক তেমনই তাদের উপর পূর্ণ প্রতিশোধ নেয়া হল। তাদেরকেও বাধা দেয়া হল, আর পরকালের শাস্তি তো অবশিষ্ট থাকলই।

দুনিয়ার অপমানের অর্থ হচ্ছে ইমাম মাহদীর (আঃ) যুগের অপমান এবং মুসলিমদেরকে জিযিয়া কর দিতে বাধ্য হওয়ার অপমানও বটে। হাদীসে একটি দু'আ এসেছে ঃ

اَللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ

'হে আল্লাহ! আমাদের সমস্ত কাজের পরিণাম ভাল করুন এবং আমাদেরকে দুনিয়ার অপমান ও আখিরাতের শাস্তি হতে মুক্তি দান করুন।' (আহমাদ ৪/১৮১, হাসান)

১১৫। আল্লাহরই জন্য পূর্ব ও পশ্চিম; অতএব তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও সে দিকেই আল্লাহর দিক; কেননা আল্লাহ	١١٥. وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا۟ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ ۚ

Contents

(সর্বদিক) পরিবেষ্টনকারী, পূর্ণ জ্ঞানবান।	إِنَّ ٱللَّهَ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

কিবলাহ নির্ধারণ

এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এবং তাঁর সাহাবীবর্গকে (রাঃ) সান্ত্বনা দেয়া হচ্ছে, যাঁদেরকে মাক্কা থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে ও তাঁর মাসজিদে প্রবেশ করা হতে বিরত রাখা হয়েছে। মাক্কায় অবস্থান কালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতেন। তখন কা’বা ঘর তাদের মাঝখানে থাকত। মাদীনায় আগমনের পর ১৬/১৭ মাস পর্যন্ত বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করেই তাঁরা সালাত আদায় করেন। কিন্তু পরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা কা’বা ঘরের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করার নির্দেশ দেন। এর পর এই আয়াতটি নাযিল হয়।

কুরআন মাজীদে সর্বপ্রথম রহিতকৃত (মানসূখ) হুকুম

ইমাম আবূ আবীদ কাসিম ইব্ন সালাম (রহঃ) স্বীয় পুস্তক ‘নাসিখ ওয়াল মানসূখ’ এর মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, কুরআন মাজীদের মধ্যে সর্বপ্রথম মানসূখ হুকুম হচ্ছে এই কিবলাহই অর্থাৎ উপরোক্ত আয়াতটিই। এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতে থাকেন। অতঃপর নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ঃ

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ

এবং তুমি যেখান হতেই বের হবে, তোমার মুখ পবিত্রতম মাসজিদের দিকে প্রত্যাবর্তিত কর। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৪৯) তখন তিনি বাইতুল্লাহর দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতে শুরু করেন। মাদীনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতে থাকলে ইয়াহুদীরা খুবই খুশি হয়। যা হোক, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনের একান্ত ইচ্ছা ছিল ইবরাহীমের (আঃ) কিবলাহর (কা’বা ঘর) দিকে মুখ করে সালাত আদায় করা। এ জন্য তিনি মাঝে মাঝে আকাশের দিকে তাকাতেন এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেন। তখন আল্লাহ নাযিল করেন, *নিশ্চয়ই আমি*

আকাশের দিকে তোমার মুখমন্ডল উত্তোলন অবলোকন করেছি। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৪৪)

যখন এই হুকুম মানসূখ হয়ে তাঁর আকাংখা ও প্রার্থনা অনুযায়ী বাইতুল্লাহর দিকে মুখ করে সালাত আদায় করার জন্য আদিষ্ট হন তখন ঐ ইয়াহুদীরাই তাঁকে বিদ্রুপ করে বলতে থাকে যে, কিবলাহ পরিবর্তিত হল কেন? তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ ইয়াহুদীদেরকে যেন বলা হচ্ছে যে, এ প্রতিবাদ কেন? যে দিকে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ হবে সে দিকেই ফিরে যেতে হবে। কারণ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে ইকরিমাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ 'তোমরা যে দিকে মুখ ফিরাও সেই দিকেই আল্লাহর মুখমন্ডল রয়েছে' এর অর্থ হল আল্লাহর অবস্থান পূর্ব ও পশ্চিম সব জায়গায়ই রয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল তুমি যে দিকেই থাকনা কেন, তুমি কিবলাহর (কা'বার) দিকে মুখ ফিরাও। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৩৪৫)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে এও বর্ণিত আছে যে, এর অর্থ হচ্ছে 'পূর্ব ও পশ্চিম যেখানেই থাক না কেন, কা'বার দিকে মুখ কর।' কয়েকজন মনীষীর বর্ণনা আছে যে, এ আয়াতটি কা'বার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করার নির্দেশ দেয়ার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং ভাবার্থ এই যে, পূর্ব ও পশ্চিম যে দিকেই চাও মুখ ফিরিয়ে নাও যখন সফরে থাক অথবা ভয়ে কিংবা যুদ্ধ অবস্থায় থাক, সব দিকই আল্লাহ তা'আলার এবং সব দিকেই তিনি বিদ্যমান রয়েছেন। (তাবারী ২/৫৩০) আল্লাহ তা'আলা হতে কোন জায়গা শূন্য নেই। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا۟

তারা এতদপেক্ষা কম হোক বা বেশি হোক, তারা যেখানেই থাকুকনা কেন তিনি তাদের সাথে আছেন। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ ঃ ৭)

ইব্ন উমারের (রাঃ) উষ্ট্রীর মুখ যে দিকেই থাকত তিনি সেই দিকেই ফিরে সালাত আদায় করে নিতেন এবং বলতেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়ম এটাই ছিল। فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا۟ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ এ আয়াতের ভাবার্থ এটাও হতে পারে।' (তাবারী ২/৫৩০) আয়াতের উল্লেখ ছাড়াই এ হাদীসটি সহীহ মুসলিম, জামে'উত তিরমিযী, সুনান নাসাঈ, মুসনাদ ইব্ন আবী হাতিম,

মুসতাদরাক হাকিম ইত্যাদি কিতাবেও বর্ণিত আছে। (হাদীস নং ১/৪৮৬, ৮/২৯২, ১/২৪৪, ১/৩৪৪, ২/২৬৬) সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, ইব্ন উমারকে (রাঃ) যখন ভয়ের সময়ের সালাত আদায় করা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হত তখন ভয়ের সালাতের বর্ণনা করতেন এবং বলতেন ঃ 'এর চেয়েও বেশি ভয় হলে পায়ে চলা অবস্থায় এবং আরোহণের অবস্থায় দাঁড়িয়ে/বসে সালাত আদায় করে নিও, মুখ কিবলার দিকে হোক, আর নাই হোক।' (ফাতহুল বারী ৮/৪৬)

এও বর্ণিত হয়েছে যে, অন্ধকার রাতে কিংবা আকাশ যখন মেঘে ঢাকা থাকে এবং কিবলার দিক নির্ণয় করা সম্ভব হয়না সেই সময়ের জন্য এ আয়াতটি প্রযোজ্য। তখন ভুল করে কিবলার পরিবর্তে যে দিক ফিরেই সালাত আদায় করা হোকনা কেন সালাত আদায় করা হয়ে যাবে।

মাদীনাবাসীদের কিবলাহ হল পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে

তাফসীর ইব্ন মিরদুওয়াইয়ে একটি হাদীস রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মাদীনা, সিরিয়া এবং ইরাকবাসীদের কিবলাহ হচ্ছে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী স্থান। এ বর্ণনাটি জামে'উত তিরমিযীতেও অন্য শব্দের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। (আল উকাইলী ৪/৩০৯, তিরমিযী ২/৩১৭, ইব্ন মাজাহ ১/৩২৩)

ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, إِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ এ আয়াতের ভাবার্থ এটাও হতে পারে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেন বলছেন ঃ 'প্রার্থনা জানানোর সময় তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল যে দিকেই করবে সে দিকেই আমাকে পাবে এবং আমি তোমাদের প্রার্থনা কবূল করব।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি পরিবেষ্টনকারী ও পূর্ণ জ্ঞানবান, যাঁর দান, দয়া এবং অনুগ্রহ সমস্ত সৃষ্টজীবকে ঘিরে রেখেছে, তিনি সমস্ত কিছু জানেনও বটে। কোন ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম জিনিসও তাঁর জ্ঞানের বাইরে নেই।' (তাবারী ২/৫৩৭)

১১৬। এবং তারা বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি পরম পবিত্র! বরং যা কিছু আসমানে ও ভূমন্ডলে রয়েছে তা তাঁরই জন্য; সবই	١١٦. وَقَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا ۗ سُبۡحَـٰنَهُۥ ۖ بَل لَّهُۥ مَا فِي

ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ كُلٌّ لَّهُۥ قَـٰنِتُونَ	**তাঁর আজ্ঞাধীন।**
١١٧. بَدِيعُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَإِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ	**১১৭। তিনি গগণ ও ভূবনের সৃষ্টিকর্তা এবং যখন তিনি কোন কাজ সম্পাদন করতে ইচ্ছা করেন তখন তার জন্য শুধুমাত্র 'হও' বলেন, আর তাতেই তা হয়ে যায়।**

'মহান আল্লাহর সন্তান-সন্ততি রয়েছে' এ দাবীর খন্ডন

এ আয়াত দ্বারা এবং এর পরবর্তী আয়াতগুলি দ্বারা খৃষ্টান, ইয়াহুদী ও মুশরিকদের কথাকে বাতিল করা হয়েছে যারা আল্লাহ তা'আলার সন্তান সাব্যস্ত করেছিল। তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, আকাশ, পৃথিবী ইত্যাদি সমুদয়ের তিনি মালিক তো বটেই, ওগুলির সৃষ্টিকর্তা, আহার দাতা, তাদের ভাগ্য নির্ধারণকারী, তাদেরকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীন আনয়নকারী, তাদের মধ্যে পরিবর্তনকারী একমাত্র তিনিই। তাহলে তাঁর সৃষ্টজীবের মধ্যে কেহ কেহ তাঁর সন্তান কিরূপে হতে পারে? ঈসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার পুত্র হতে পারেননা, যেমন ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা ধারণা করত। মালাইকাও আল্লাহ তা'আলার কন্যা হতে পারেননা, যেমন আরাবের মুশরিকরা মনে করত। কেননা পরস্পর সমান সম্বন্ধযুক্ত দু'টি বস্তু থেকে সন্তান হতে পারে; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তো তুলনাবিহীন। মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বে তাঁর সমকক্ষ কেহই নেই। তিনিই তো আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, সুতরাং তাঁর সন্তান হবে কি রূপে? তাঁর কোন সহধর্মিনীও নেই। তিনি বলেন ঃ

بَدِيعُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُۥ صَـٰحِبَةٌ ۖ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ

তিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা; তাঁর সন্তান হবে কি করে? অথচ তাঁর জীবন সঙ্গিনীই কেহ নেই। তিনিই প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেকটি জিনিস

সম্পর্কে তাঁর ভাল রূপে জ্ঞান রয়েছে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১০১) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَقَالُوا۟ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَلَدًا. لَّقَدْ جِئْتُمْ شَيْـًٔا إِدًّا. تَكَادُ ٱلسَّمَـٰوَٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا. أَن دَعَوْا۟ لِلرَّحْمَـٰنِ وَلَدًا. وَمَا يَنۢبَغِى لِلرَّحْمَـٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا. إِن كُلُّ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّآ ءَاتِى ٱلرَّحْمَـٰنِ عَبْدًا. لَّقَدْ أَحْصَىٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا. وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ فَرْدًا

তারা বলে ঃ দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন। তোমরা তো এক বীভৎস কথার অবতারণা করেছ। এতে যেন আকাশসমূহ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খন্ড বিখন্ড হবে এবং পর্বতসমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে, যেহেতু তারা দয়াময়ের উপর সন্তান আরোপ করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভন নয়। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে এমন কেহ নেই যে দয়াময়ের নিকট উপস্থিত হবেনা বান্দা রূপে। তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করেছেন এবং কিয়ামাত দিবসে তাদের সকলেই তাঁর নিকট আসবে একাকী অবস্থায়। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৮৮-৯৫) সুতরাং দাস সন্তান হতে পারেনা। মনিব ও সন্তান এ দু'টি বিপরীতমুখী ও পরস্পর বিরোধী। অন্য স্থানে একটি পূর্ণ সূরায় আল্লাহ তা'আলা একে নাকচ করে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন ঃ

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ. ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٤) وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ.

বল ঃ তিনিই আল্লাহ একক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারও সন্তান নন, এবং তাঁর সমতুল্য কেহই নেই। (সূরা ইখলাস, ১১২ ঃ১-৪) এই আয়াতসমূহে এবং এরকম আরও বহু আয়াতে সেই বিশ্ব প্রভু স্বীয় পবিত্রতা বর্ণনা করেছেন, তিনি যে তুলনাহীন ও নযীরবিহীন এবং অংশীদারবিহীন তা সাব্যস্ত করেছেন, আর মুশরিকদের এ জঘন্য বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। তিনি তো সবারই সৃষ্টিকর্তা ও সবারই প্রভু। সুতরাং তাঁর সন্তান-সন্ততি ও ছেলে-মেয়ে হবে কিভাবে?

সূরা বাকারাহর এ আয়াতের তাফসীরে সহীহ বুখারীর একটি হাদীস-ই কুদুসীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

'আদম সন্তান আমাকে মিথ্যা প্রতিপাদন করে, অথচ এটা তাদের জন্য উচিত ছিলনা, তারা আমাকে গালি দেয়, তাদের জন্য এটা শোভনীয় ছিলনা। তাদের মিথ্যা প্রতিপাদন তো এটাই যে, তাদের ধারণায় আমি তাদেরকে মেরে ফেলার পর পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম নই; এবং তাদের গালি দেয়া এই যে, তারা আমার সন্তান গ্রহণ করা সাব্যস্ত করে, অথচ আমার স্ত্রী ও সন্তান হওয়া থেকে আমি সম্পূর্ণ পবিত্র ও তা হতে বহু উর্ধ্বে।' (ফাতহুল বারী ৮/১৮) এই হাদীসটিই অন্য সনদে এবং অন্যান্য কিতাবেও শব্দের বিভিন্নতার সাথে বর্ণিত হয়েছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের অন্য এক হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'মন্দ কথা শ্রবণ করে বেশি ধৈর্য ধারণকারী আল্লাহ তা'আলা অপেক্ষা আর কেহ নেই। মানুষ তাঁর সন্তান সাব্যস্ত করছে, অথচ তিনি তাদেরকে আহার্য দিচ্ছেন এবং নিরাপদে রাখছেন।' (ফাতহুল বারী ১৩/৩৭২, মুসলিম ৪/২১৬০)

সবকিছু আল্লাহর আয়ত্বাধীন

উপরে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে ঃ 'প্রত্যেক জিনিসই তাঁর অনুগত, তাঁকে খাঁটি অন্তরে মেনে থাকে, কিয়ামাতের দিন সব কিছুই তাঁর সামনে হাত জোড় করে দাঁড়াবে, দুনিয়ার সবাই তাঁর উপাসনায় রত আছে। যাকে তিনি বলেন 'এ রকম হও', 'এভাবে নির্মিত হও' তা ঐ রকমই হয়ে যায় এবং ঐভাবেই নির্মিত হয়। এরকমই প্রত্যেকে তাঁর সামনে বিনীত ও বাধ্য। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ কাফিরদের ইচ্ছা না থাকলেও তাদের ছায়া আল্লাহ তা'আলার সামনে ঝুঁকেই থাকে। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৩৪৮) মুজাহিদ (রহঃ) আরও বর্ণনা করেছেন, যা ইব্ন জারীরও (রহঃ) সমর্থন করেছেন যে, আসলে এখানে সবই সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ কুনূত হল অনুগত হওয়া এবং আল্লাহর বাধ্য হওয়া। কুনূত দুই ধরনের, আইনগত এবং পূর্ব নির্ধারিত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَـٰلُهُم بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْآصَالِ

আল্লাহর প্রতি সাজদাবনত হয় আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এবং তাদের ছায়াগুলিও সকাল-সন্ধ্যায়। (সূরা রা‘দ, ১৩ ঃ ১৫)

পূর্বে আকাশ ও পৃথিবীর কোন নমুনা ছিলনা

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন, **كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ** পূর্বে আকাশ ও পৃথিবীর কোন নমুনা ছিলনা, প্রথম বারই তিনি এই দুই এর সৃষ্টিকর্তা। **بِدْعَةٌ** এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ‘নতুন সৃষ্টি করা।’ হাদীসে রয়েছে ঃ

‘প্রত্যেক নব-সৃষ্টি হচ্ছে বিদ‘আত এবং প্রত্যেক বিদ‘আতই পথভ্রষ্টতা।’ (মুসলিম ২/৫৯২) এতো হল শারীয়াতের পরিভাষায় বিদ‘আত। কখনও কখনও **بِدْعَةٌ** শব্দের প্রয়োগ শুধুমাত্র আভিধানিক অর্থেই হয়ে থাকে। তখন শারীয়াতের ‘বিদ‘আত’ বুঝায়না। উমার (রাঃ) জনগণকে তারাবীহ সালাতে সকলকে এক জামা‘আতে একত্রিত করে বলেন ঃ ‘এটা ভাল বিদ‘আত।’

বিদ‘আত পন্থীদেরকে ‘বিদ‘আতী’ বলার কারণও এই যে, তারাও আল্লাহ তা‘আলার দীনের মধ্যে ঐ কাজ বা নিয়ম আবিষ্কার করে যা তার পূর্বে শারীয়াতের মধ্যে ছিলনা। অনুরূপভাবে কোন নতুন কথা উদ্ভাবনকারীকে আরাবের লোকেরা **مُبْدِعٌ** বলে থাকে।

ইমাম ইব্ন জারীরের (রহঃ) মতে উপরোক্ত আয়াতের ভাবার্থ এই যে, মহান আল্লাহ সন্তান হতে পবিত্র। তিনি আসমান ও যমীনের সমস্ত কিছুর মালিক। প্রত্যেক জিনিসই তাঁর একাত্মবাদের সাক্ষ্য বহন করে। সব কিছুই তাঁর অনুগত। সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা, নির্মাতা, স্থাপিত, মূল ও নমুনা ছাড়াই ঐ সবকিছু অস্তিত্বে আনয়নকারী একমাত্র সেই বিশ্বপ্রভু আল্লাহ তা‘আলাই, স্বয়ং ঈসাও (আঃ) এর সাক্ষী ও বর্ণনাকারী, যদিও কেহ কেহ তাঁকে আল্লাহর পুত্র বলে মনে করে। যে প্রভু এসব জিনিস বিনা মূলে ও নমুনায় সৃষ্টি করেছেন তিনিই ঈসাকে (আঃ) পিতা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। (তাবারী ২/৫৫০) সেই আল্লাহর ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তি এতো বেশি যে, তিনি যে জিনিসকে যে প্রকারের সৃষ্টি ও নির্মাণ করতে চান তাকে বলেন– ‘এভাবে হও এবং এরকম হও’ আর তেমনই সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা অন্যত্র বলেন ঃ

إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ

তাঁর ব্যাপার তো শুধু এই যে, যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন বলেন 'হও', ফলে তা হয়ে যায়। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৮২) অন্য জায়গায় বলেন ঃ

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدْنَـٰهُ أَن نَّقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ

আমি কোন কিছু ইচ্ছা করলে সেই বিষয়ে আমার কথা শুধু এই যে, আমি বলি 'হও,' ফলে তা হয়ে যায়। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৪০) অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ

আমার আদেশ তো একটি কথায় নিস্পন্ন, চোখের পলকের মত। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ৫০)

উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, ঈসাকেও (আঃ) আল্লাহ তা'আলা كُنْ শব্দের দ্বারাই সৃষ্টি করেছেন। এক জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন ঃ

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ ۖ خَلَقَهُۥ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ

নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের অনুরূপ; তিনি তাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করলেন, অতঃপর বললেন হও, ফলতঃ তাতেই হয়ে গেল। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৫৯)

১১৮। এবং মূর্খেরা বলে ঃ আল্লাহ আমাদের সাথে কেন কথা বলেননা, অথবা কেন আমাদের জন্য কোন নিদর্শন উপস্থিত হয়না? এদের পূর্বে যারা ছিল তারাও এদের অনুরূপ কথা বলত; তাদের সবারই অন্তর পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ; নিশ্চয়ই আমি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য	١١٨. وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَةٌ ۗ كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ۘ تَشَـٰبَهَتْ قُلُوبُهُمْ ۗ قَدْ بَيَّنَّا ٱلْأَيَـٰتِ لِقَوْمٍ

يُوقِنُونَ	**উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি।**

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাফে‘ ইব্ন হুরাইমালা নামক একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে ঃ ‘হে মুহাম্মাদ! আপনি যদি সত্যই আল্লাহর রাসূল হন তাহলে আল্লাহ তা‘আলা স্বয়ং আমাদেরকে বলেন না কেন? তাহলে স্বয়ং আমরা তাঁর কথা শুনতে পাই।’ তখন وَقَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ لَوْلاَ يُكَلِّمُنَا اللّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৩৫২) আবুল আলীয়া (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, আসলে এ আয়াতটি ছিল মুশরিকদের উদ্দেশ্য করে। এদের পূর্বে যারা ছিল তারাও অনুরূপ কথা বলত। তিনি বলেন যে, তারা হল ইয়াহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৩৫৩) আরাব মুশরিকরা আগেও যে কথা বলে আসছিল তা আল্লাহর ভাষায় এভাবে বলা হয়েছে ঃ

وَإِذَا جَآءَتۡهُمۡ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُّؤۡمِنَ حَتَّىٰ نُؤۡتَىٰ مِثۡلَ مَآ أُوتِىَ رُسُلُ ٱللَّهِ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ حَيۡثُ يَجۡعَلُ رِسَالَتَهُۥ ۗ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجۡرَمُواْ صَغَارٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدُۢ بِمَا كَانُواْ يَمۡكُرُونَ

তাদের সামনে যখন কোন নিদর্শন আসে তখন তারা বলে ঃ আল্লাহর রাসূলদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছিল, আমাদের অনুরূপ জিনিস না দেয়া পর্যন্ত আমরা ঈমান আনবনা, রিসালাতের দায়িত্ব কার উপর অর্পণ করবেন তা আল্লাহ ভালভাবেই জানেন, এই অপরাধী লোকেরা অতি সত্বরই তাদের ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার জন্য আল্লাহর নিকট লাঞ্ছনা ও কঠিন শাস্তি প্রাপ্ত হবে। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১২৪) অন্যত্র বলেছেন ঃ

قُلۡ سُبۡحَانَ رَبِّى هَلۡ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولاً

বল ঃ পবিত্র আমার মহান রাব্ব! আমি তো শুধু একজন মানুষ, একজন রাসূল। (সূরা ইসরাহ, ১৭ ঃ ৯৩) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرۡجُونَ لِقَآءَنَا لَوۡلَآ أُنزِلَ عَلَيۡنَا ٱلۡمَلَـٰٓئِكَةُ أَوۡ نَرَىٰ رَبَّنَا

যারা আমার সাক্ষাৎ কামনা করেনা তারা বলে ঃ আমাদের নিকট মালাইকা/ফেরেশতা অবতীর্ণ করা হয়না কেন? অথবা আমরা আমাদের রাব্বকে প্রত্যক্ষ করিনা কেন? (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২১) অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে ঃ

بَلۡ يُرِيدُ كُلُّ ٱمۡرِيٍٕ مِّنۡهُمۡ أَن يُؤۡتَىٰ صُحُفًا مُّنَشَّرَةً

বস্তুতঃ তাদের প্রত্যেকেই কামনা করে যে, তাকে একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ দেয়া হোক। (সূরা মুদ্দাস্সির, ৭৪ ঃ ৫২) এ সব আয়াত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করছে যে, আরাবের মুশরিকরা শুধুমাত্র অহংকার ও অবাধ্যতার বশবর্তী হয়েই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসব জিনিস চেয়েছিল। এভাবে এ দাবীও মুশরিকদেরই ছিল। তাদের পূর্বে আহলে কিতাবও এরকম বাজে প্রার্থনা জানিয়েছিল। যেমন ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يَسۡـَٔلُكَ أَهۡلُ ٱلۡكِتَـٰبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيۡهِمۡ كِتَـٰبًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِۚ فَقَدۡ سَأَلُواْ مُوسَىٰٓ أَكۡبَرَ مِن ذَٰلِكَ فَقَالُوٓاْ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهۡرَةً

আহলে কিতাব তোমার নিকট আবেদন জানায় যে, তুমি তাদের প্রতি আকাশ হতে কোন গ্রন্থ নাযিল কর, উপরন্তু তারা মূসার নিকট এটা অপেক্ষাও বৃহত্তর দাবী করেছিল। তারা বলেছিল, আল্লাহকে প্রকাশ্যভাবে প্রদর্শন কর। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৫৩) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَإِذۡ قُلۡتُمۡ يَـٰمُوسَىٰ لَن نُّؤۡمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهۡرَةً

এবং যখন তোমরা বলেছিলে ঃ হে মূসা! আমরা আল্লাহকে প্রকাশ্যভাবে দর্শন না করা পর্যন্ত তোমাকে বিশ্বাস করবনা (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৫৫)

كَذَٰلِكَ مَآ أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرٌ أَوۡ مَجۡنُونٌ. أَتَوَاصَوۡاْ بِهِۦ

এভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের নিকট যখনই কোন রাসূল এসেছে, তারা বলেছে ঃ তুমি তো এক যাদুকর, না হয় উন্মাদ! তারা কি একে অপরকে এই মন্ত্রনাই দিয়ে এসেছে? (সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৫২-৫৩)

তারপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ قَدْ بَيَّنَّا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ‘আমি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্য নিদর্শনাবলী বর্ণনা করেছি যেগুলি দ্বারা রাসূলের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। ঈমান আনয়নের জন্য এই নিদর্শনগুলিই যথেষ্ট। তবে যাদের অন্তরের উপর মোহর লাগানো রয়েছে তাদের জন্য কোন আয়াতই ফলদায়ক হবেনা। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ

নিঃসন্দেহে, যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তারা কখনো ঈমান আনবেনা, যদিও তাদের নিকট সমস্ত প্রমাণ পৌঁছে যায়, যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৬-৯৭)

১১৯। নিশ্চয়ই আমি তোমাকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শক রূপে প্রেরণ করেছি এবং তুমি জাহান্নামবাসীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবেনা।	١١٩. إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۖ وَلَا تُسْـَٔلُ عَنْ أَصْحَٰبِ ٱلْجَحِيمِ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ‘(হে নাবী)! জাহান্নামবাসী কাফিরদের সম্বন্ধে তুমি জিজ্ঞাসিত হবেনা। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَٰغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ

তোমার কর্তব্য তো শুধু প্রচার করা; আর হিসাব-নিকাশ তো আমার কাজ। (সূরা রা‘দ, ১৩ ঃ ৪০) আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন ঃ

فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ. لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ

অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাক, তুমি তো একজন উপদেশ দাতা মাত্র। তুমি তাদের কর্মনিয়ন্ত্রক নও। (সূরা গাশিয়াহ, ৮৮ ঃ ২১-২২) অন্যত্র আল্লাহ বলেন ঃ

نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ۖ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ ۖ فَذَكِّرْ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ.

তারা যা বলে তা আমি জানি, তুমি তাদের উপর জবরদস্তকারী নও। সুতরাং যে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাকে উপদেশ দান কর কুরআনের সাহায্যে। (সূরা কাফ, ৫০ ঃ ৪৫)

তাওরাতে রাসূল (সাঃ) সম্পর্কে বর্ণনা

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন ‘আসকে (রাঃ) ‘আতা ইব্ন ইয়াসার (রহঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ ‘তাওরাতের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী ও প্রশংসা কি রয়েছে?’ তখন তিনি বলেন ঃ ‘হ্যাঁ! তাঁর যে গুণাবলী কুরআন মাজীদে রয়েছে, ঐগুলিই তাওরাতেও রয়েছে। তাওরাতে আছে ঃ ‘হে নাবী! আমি তোমাকে সাক্ষী, সুসংবাদ দাতা, ভয় প্রদর্শক এবং মুর্খদের রক্ষক করে পাঠিয়েছি। তুমি আমার বান্দা ও রাসূল। আমি তোমার নাম ‘মুতাওয়াক্কিল’ (ভরসাকারী) রেখেছি। তুমি কর্কশভাষীও নও, তোমার হৃদয় কঠোরও নয়। তুমি দুশ্চরিত্রও নও। তুমি বাজারে গঞ্জে গণ্ডগোল সৃষ্টিকারীও নও। তিনি মন্দের বিনিময়ে মন্দ করেননা, বরং ক্ষমা করে থাকেন। আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে দুনিয়া হতে উঠাবেননা যে পর্যন্ত তিনি বক্র ধর্মকে তাঁর দ্বারা সরল সোজা না করেন, মানুষ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে স্বীকার করে না নেয়, অন্ধ চক্ষু খুলে না যায়, তাদের বধির কর্ণ শুনতে না থাকে এবং মরিচা ধরা অন্তর পরিষ্কার হয়ে না যায়।’ (আহমাদ ২/১৭৪, ফাতহুল বারী ৪/৪০২)

১২০। এবং ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা - তুমি তাদের ধর্ম অনুসরণ না করা পর্যন্ত তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেনা; তুমি বল ঃ আল্লাহর প্রদর্শিত পথই সুপথ; এবং জ্ঞান প্রাপ্তির পর তুমি যদি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ কর তাহলে আল্লাহ হতে তোমার জন্য	١٢٠. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم

Contents

কোনই অভিভাবক ও সাহায্যকারী নেই।	بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ
১২১। আমি তাদেরকে যে ধর্মগ্রন্থ দান করেছি তা যারা সঠিকভাবে সত্য বুঝে পাঠ করে তারাই এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী, এবং যে কেহ এটা অবিশ্বাস করে ফলতঃ তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।	١٢١. ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ يَتْلُونَهُۥ حَقَّ تِلَاوَتِهِۦٓ أُو۟لَـٰٓئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِهِۦ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ

রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) সান্ত্বনা প্রদান

উপরোক্ত আয়াতের ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তা‘আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছেন ঃ ‘হে নাবী! এ সব ইয়াহুদী ও নাসারা কখনও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেনা। সুতরাং তুমিও তাদের পরিত্যাগ কর এবং তোমার প্রভুর সন্তুষ্টির অন্বেষণে লেগে থাক। তাদের প্রতি রিসালাতের দা‘ওয়াত পৌঁছে দাও। সত্য ধর্ম ওটাই যা আল্লাহ তা‘আলা তোমাকে প্রদান করেছেন। ওটাকে আঁকড়ে ধর।’

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ ‘আমার উম্মাতের একটি দল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে অন্যদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে থাকবে এবং বিজয় লাভ করবে। অবশেষে কিয়ামাত সংঘটিত হবে।’ (মুসলিম ১৯২৪, ইব্ন আবী হাতিম ১/৩৫৫) অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, ‘হে নাবী! কখনও তুমি তাদের সন্তুষ্টির জন্য ও তাদের সাথে সন্ধির উদ্দেশে স্বীয় ধর্মকে দুর্বল করে দিওনা, তাদের দিকে ঝুঁকে পড়না এবং তাদেরকে মেনে নিওনা।’

এ আয়াতে ঐ সমস্ত মুসলিমদেরকে সাবধান করে দেয়া হচ্ছে যে, কুরআন ও হাদীস থেকে শিক্ষা লাভ করার পরও তারা যেন ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের কোন

মতাদর্শ কিংবা পথ অনুসরণ না করে। আল্লাহ যেন আমাদেরকে ঐ সকল কাজ থেকে বিরত থাকার শক্তি সামর্থ্য দান করেন। যদিও আয়াতটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে নাযিল হয়েছে তথাপি এ আদেশ সমগ্র মুসলিম উম্মাহর জন্য প্রযোজ্য।

‘সঠিক তিলাওয়াত’ এর অর্থ

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন, الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ *আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা সঠিকভাবে বুঝার মত করে পাঠ করে।* কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বুঝানো হয়েছে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহচরবৃন্দকে (রাঃ) বুঝানো হয়েছে। উমার (রাঃ) বলেন যে, সঠিকভাবে পাঠ করার অর্থ হচ্ছে জান্নাতের বর্ণনার সময় জান্নাতের প্রার্থনা এবং জাহান্নামের বর্ণনার সময় জাহান্নাম হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, স্পষ্ট আয়াতগুলির উপর আমল করা ও অস্পষ্ট আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনা এবং কঠিন বিষয়গুলি আলেমদের কাছে পেশ করাই হচ্ছে তিলাওয়াতের হক আদায় করা। (তাবারী ২/৫৬৭) আবূ মালিক (রহঃ) থেকে সুদ্দী (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, ১২১ নং আয়াতটিতে ঐ লোকদের কথা বলা হয়েছে যারা হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম বলে মানে এবং তারা কিতাবের কোন অংশ পরিবর্তন করেনা। (তাবারী ২/৫৬৭) উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) বলেন, তারা হল ঐ লোক যাদের সামনে যখন আল্লাহর দয়া ও করুণার আয়াত পাঠ করা হয় তখন তারা আল্লাহর কাছে ইহা কামনা করে এবং যখন কোন শাস্তির আয়াত পাঠ করা হয় তখন তারা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। (কুরতুবী ২/৯৫)

উমারের (রাঃ) তাফসীর অনুসারে এটাও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন রাহমাতের বর্ণনাযুক্ত কোন আয়াত পাঠ করতেন তখন থেমে গিয়ে আল্লাহ তা‘আলার নিকট রাহমাত চাইতেন, আর যখন কোন শাস্তির আয়াত পাঠ করতেন তখন থেমে গিয়ে তাঁর নিকট তা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। (ইব্ন মাজাহ ৪২৯) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ أُوْلَـــئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে ঃ হে মুহাম্মাদ! আহলে কিতাবের যারা তাদের প্রতি

নাযিল করা কিতাবে বিশ্বাস করে তারা তোমার প্রতি আমি যে কুরআন নাযিল করেছি তাও বিশ্বাস করবে। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا۟ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا۟ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم

আর যদি তারা তাওরাত ও ইন্‌জীলের এবং যে কিতাব (অর্থাৎ কুরআন) তাদের রবের পক্ষ হতে তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, ওর থেকে যথারীতি 'আমলকারী হত তাহলে তারা উপর (অর্থাৎ আকাশ) হতে এবং নিম্ন (অর্থাৎ যমীন) হতে প্রাচুর্যের সাথে আহার পেত। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৬৬) আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অন্যত্র বলেন ঃ

قُلْ يَـٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَىْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا۟ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ

তুমি বলে দাও ঃ হে আহলে কিতাব! তোমরা কোনো পথেই প্রতিষ্ঠিত নও যে পর্যন্ত না তাওরাত, ইঞ্জীল এবং যে কিতাব (অর্থাৎ কুরআন) তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে তার উপর আমল কর। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৬৮) অর্থাৎ তোমাদের অবশ্য কর্তব্য এই যে, তোমরা তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআনুল হাকীমের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে, ওগুলির মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবগুলিকেই সত্য বলে বিশ্বাস করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলীর বর্ণনা, তাঁর অনুসরণের নির্দেশ এবং তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য করার বর্ণনা ইত্যাদি সব কিছুই ঐ সব কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে। এক জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِىَّ ٱلْأُمِّىَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ

যারা সেই নিরক্ষর রাসূলের অনুসরণ করে চলে, যার কথা তারা তাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জীল কিতাবে লিখিত পায়। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৫৭) আর এক স্থানে তিনি বলেন ঃ

قُلْ ءَامِنُواْ بِهِۦٓ أَوْ لَا تُؤْمِنُوٓاْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِۦٓ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا. وَيَقُولُونَ سُبْحَـٰنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً

তোমরা বিশ্বাস কর অথবা না কর, যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দান করা হয়েছে তাদের সামনে যখন আবৃত্তি করা হয়, তারা বিনয়ের সাথে কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে। এবং বলে ঃ আমাদের রাব্ব পবিত্র, মহান! আমাদের রবের প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয়েই থাকে। (সূরা ইসরাহ, ১৭ ঃ ১০৭-১০৮) অন্যত্র ঘোষিত হয়েছে ঃ

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِهِۦ هُم بِهِۦ يُؤْمِنُونَ. وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِهِۦٓ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِۦ مُسْلِمِينَ. أُوْلَـٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ يُنفِقُونَ

এর পূর্বে আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম তারা এতে বিশ্বাস করে। যখন তাদের নিকট এটি আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বলে ঃ আমরা এতে ঈমান আনি, এটা আমাদের রাব্ব হতে আগত সত্য। আমরা তো পূর্বেও আত্মসমর্পনকারী ছিলাম। তাদেরকে দু'বার পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে; কারণ তারা ধৈর্যশীল এবং তারা ভাল দ্বারা মন্দের মুকাবিলা করে এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা হতে তারা ব্যয় করে। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৫২-৫৪) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْأُمِّيِّـۧنَ ءَأَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَدَواْ ۖ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَـٰغُ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِٱلْعِبَادِ

এবং যাদেরকে গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছে ও যারা নিরক্ষর তাদেরকে বল ঃ তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছ? অতঃপর যদি তারা অত্মসমর্পণ করে তাহলে নিশ্চয়ই তারা সুপথ পেয়ে যাবে, আর যদি ফিরে যায় তাহলে তোমার উপর দায়িত্ব হচ্ছে

প্রচার করা মাত্র এবং আল্লাহ বান্দাদের প্রতি লক্ষ্যকারী। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ২০) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন যে, একে অমান্যকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَمَن يَكۡفُرۡ بِهِۦ مِنَ ٱلۡأَحۡزَابِ فَٱلنَّارُ مَوۡعِدُهُۥ

আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে ব্যক্তি ইহা (কুরআন) অমান্য করবে, জাহান্নাম হবে তার প্রতিশ্রুত স্থান। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১৭) সহীহ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! এই উম্মাতের মধ্যে যে কেহ ইয়াহুদীই হোক অথবা খৃষ্টানই হোক, আমার কথা শোনার পরেও যদি আমার উপর ঈমান না আনে তাহলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।' (মুসলিম ১/১৩৪)

১২২। হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদেরকে যে সুখ সম্পদ দান করেছি এবং আমি পৃথিবীর উপর তোমাদেরকে যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি - তোমরা তা স্মরণ কর।	١٢٢. يَـٰبَنِىٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتِىَ ٱلَّتِىٓ أَنۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ وَأَنِّى فَضَّلۡتُكُمۡ عَلَى ٱلۡعَـٰلَمِينَ
১২৩। আর তোমরা ঐ দিনের ভয় কর যেদিন একজন অন্যজন হতে কিছুমাত্র উপকৃত হবেনা এবং কারও নিকট হতে বিনিময় গৃহীত হবেনা, কারও সুপারিশ ফলপ্রদ হবেনা এবং তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবেনা।	١٢٣. وَٱتَّقُواْ يَوۡمًا لَّا تَجۡزِى نَفۡسٌ عَن نَّفۡسٍ شَيۡـًٔا وَلَا يُقۡبَلُ مِنۡهَا عَدۡلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَـٰعَةٌ وَلَا هُمۡ يُنصَرُونَ

এরূপ আয়াত পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে এবং এর বিস্তারিত ব্যাখ্যাও দেয়া হয়েছে। এখানে শুধুমাত্র গুরুত্ব আরোপের জন্যই বর্ণিত হয়েছে। তাদেরকে সেই নিরক্ষর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের উৎসাহ দেয়া হয়েছে, যার গুণাবলীর বিবরণ তারা তাদের কিতাবে পেয়েছে। তাঁর নাম ও

কার্যাবলীর বর্ণনাও তাতে রয়েছে। এমনকি তাঁর উম্মাতের বর্ণনাও তাতে বিদ্যমান আছে। সুতরাং তাদেরকে তা গোপন করা হতে এবং অন্যান্য নি'আমাতের কথা ভুলে যাওয়া হতে ভয় প্রদর্শন করা হচ্ছে। তাদেরকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক নি'আমাতসমূহ বর্ণনা করতে বলা হচ্ছে এবং আরাবের বংশ পরম্পরায় যিনি তাদের চাচাতো ভাই হচ্ছেন, তাঁকে যে শেষ নাবী করে পাঠান হয়েছে, এজন্য তারা যেন তাঁর প্রতি হিংসা পোষণ করে তাঁকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন না করে এবং তাঁর বিরোধিতা না করে, তাদেরকে এরই উপদেশ দেয়া হচ্ছে।

১২৪। এবং যখন তোমার রাব্ব ইবরাহীমকে কতিপয় বাক্য দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন, পরে সে তা পূর্ণ করেছিল; তিনি বলেছিলেন ঃ নিশ্চয়ই আমি তোমাকে মানবমন্ডলীর নেতা করব। সে বলেছিল ঃ আমার বংশধরগণ হতেও। তিনি বলেছিলেন ঃ আমার অঙ্গীকার অত্যাচারীদের প্রতি প্রযোজ্য হবেনা।	١٢٤. وَإِذِ ٱبْتَلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمَـٰتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِى ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّـٰلِمِينَ

ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন একজন মহান নেতা

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার বন্ধু ইবরাহীমের (আঃ) শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হচ্ছে, যিনি তাওহীদের ব্যাপারে পৃথিবীর ইমাম পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। যিনি বহু কষ্ট ও বিপদাপদ সহ্য করে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালনে অটলতা ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ 'হে নাবী! যেসব মুশরিক ও আহলে কিতাব ইবরাহীমের ধর্মের উপর থাকার দাবী করছে তাদেরকে ইবরাহীম কর্তৃক আল্লাহর আদেশ পালন ও তাঁর প্রতি আনুগত্যের ঘটনাবলী শুনিয়ে দাও, তাহলে তারা বুঝতে পারবে যে, একমুখী ধর্ম ও ইবরাহীমের আদর্শের উপর কারা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে; তারা নাকি তুমি ও তোমার সহচরবৃন্দ?' কুরআন মাজীদের মধ্যে এক জায়গায় ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَإِبْرَٰهِيمَ ٱلَّذِى وَفَّىٰٓ

এবং ইবরাহীমের কিতাবে, যে পালন করেছিল তার দায়িত্ব। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ৩৭) অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ. شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ ۚ ٱجْتَبَىٰهُ وَهَدَىٰهُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ. وَءَاتَيْنَٰهُ فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَإِنَّهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ. ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিল এক উম্মাত আল্লাহর অনুগত, একনিষ্ঠ এবং সে ছিলনা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত। সে ছিল আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ; আল্লাহ তাকে মনোনীত করেছিলেন এবং তাকে পরিচালিত করেছিলেন সরল পথে। আমি তাকে দুনিয়ায় দিয়েছিলাম মঙ্গল এবং আখিরাতেও নিশ্চয়ই সে সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম। এখন আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, তুমি একনিষ্ঠ ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর; এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১২০-১২৩)

قُلْ إِنَّنِى هَدَىٰنِى رَبِّىٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

তুমি বল ঃ নিঃসন্দেহে আমার রাব্ব আমাকে সঠিক ও নির্ভুল পথে পরিচালিত করেছেন, ওটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দীন এবং ইবরাহীমের অবলম্বিত আদর্শ যা সে ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে গ্রহণ করেছিল। আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৬১) কুরআনুল হাকীমের অন্য স্থানে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

مَا كَانَ إِبْرَٰهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ. إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَٰهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا ٱلنَّبِىُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ وَلِىُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ

ইবরাহীম ইয়াহুদী ছিলনা এবং খৃষ্টানও ছিলনা, বরং সে সুদৃঢ় মুসলিম ছিল এবং সে মুশরিকদের (অংশীবাদী) অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। নিঃসন্দেহে ঐ সব লোক ইবরাহীমের নিকটতম যারা তার অনুসরণ করেছে এবং এই নাবী এবং (তাঁর সাথের) মু'মিনগণ; এবং আল্লাহ বিশ্বাসীগণের অভিভাবক। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৬৭-৬৮) اِبْتِلاَءٌ শব্দটির অর্থ হচ্ছে আয্মায়েশ বা পরীক্ষা।

ইবরাহীমের (আঃ) পরীক্ষা, كَلِمَاتٌ শব্দের তাফসীর এবং পরীক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর কৃতকার্যতার সংবাদ

كَلِمَات শব্দের অর্থ হচ্ছে 'শারীয়াত' 'আদেশ' 'নিষেধ' ইত্যাদি। كَلِمَات শব্দের ভাবার্থ كَلِمَات تَقْدِيْرِيَة ও হয়। যেমন মারইয়াম (আঃ) সম্বন্ধে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَـٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِۦ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَـٰنِتِينَ.

এবং সে তার রবের বাণী ও তাঁর কিতাবসমূহ সত্য বলে গ্রহণ করেছিল; সে ছিল অনুগতদের একজন। (সূরা তাহ্রীম, ৬৬ ঃ ১২) আবার كَلِمَات এর ভাবার্থ كَلِمَات شَرْعِيَة ও হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً

তোমার রবের 'আদেশ' সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১৫) এই كَلِمَاة গুলি হয়ত বা সত্য সংবাদ, অথবা সুবিচার সন্ধান। মোট কথা, এই বাক্যগুলি পূরা করার প্রতিদান স্বরূপ ইবরাহীম (আঃ) ইমামতির পদ লাভ করেন।

কোন্ কথাগুলি দ্বারা ইবরাহীম (আঃ) পরীক্ষিত হয়েছিলেন

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ইবরাহীমকে (আঃ) কিভাবে পরীক্ষা করেছিলেন সেই বিষয়ে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) বরাতেও কয়েকটি বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন আবদুর রায্যাক (রহঃ) ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) বরাতে বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীমকে (আঃ) ধর্মীয় আমল (হাজ্জ) দ্বারা পরীক্ষা করেছেন। (তাবারী ৩/১৩) আবূ ইসহাকও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

(তাবারী ৩/১৩) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ 'স্মরণ কর, যখন ইবরাহীমের রাব্ব কয়েকটি বাক্য দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন' এর অর্থ হল আল্লাহ তাঁকে *তাহারাত* (পবিত্রতা, উযূ) দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন। পাঁচটি শরীরের উপরের অংশের এবং পাঁচটি শরীরের নিচের অংশের। উপরের অংশগুলি হল মোচ কাটা, চুল কাটা, কুলি করা, নাকে পানি দিয়ে তা ফেলে দেয়া এবং মিসওয়াক করা। আর নিচের অংশগুলি হল নখ কাটা, নাভীর নিচের অংশের লোম কাটা, খাতনা করা, বগলের লোম তুলে ফেলা এবং শৌচক্রিয়া সম্পাদন করা। (মুসনাদ আবদুর রায্যাক ১/৫৭) ইব্ন আবী হাতিম বলেন যে, একই বর্ণনা করেছেন সাঈদ ইব্ন মুসাইয়িব (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), শা'বি (রহঃ), নাখঈ (রহঃ), আবূ সালেহ (রহঃ), আবূ জাল্দ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৩৫৯)

সহীহ মুসলিমে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'দশটি কাজ হচ্ছে প্রাকৃতিক ও ধর্মের মূল ঃ (১) গোঁফ ছাঁটা, (২) শ্মশ্রু লম্বা করা, (৩) মিসওয়াক করা, (৪) নাকে পানি দেয়া, (৫) নখ কাটা (৬) আঙ্গুলের মাঝখানের অংশগুলি ধৌত করা, (৭) বগলের লোম উঠিয়ে ফেলা, (৮) নাভির নীচের লোম কেটে ফেলা, (৯) শৌচ ক্রিয়া সম্পাদন করা; বর্ণনাকারী বলেন ঃ 'দশমটি আমি ভুলে গেছি। (১০) সম্ভবতঃ তা কুলি করা হবে।' (মুসলিম ১/২২৩) সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'পাঁচটি কাজ প্রকৃতির অন্তর্গত। (১) খাৎনা করা, (২) নাভির নীচের লোম উঠিয়ে ফেলা, (৩) গোঁফ ছোট করা, (৪) নখ কাটা এবং (৫) বগলের লোম উঠিয়ে ফেলা।' (ফাতহুল বারী ১০/৩৪৭, মুসলিম ১/২২২)

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ ইবরাহীমের (আঃ) كَلِمَات এর মধ্যে তাঁর স্বীয় গোত্র হতে পৃথক হওয়া, তদানীন্তন বাদশাহ্ হতে নির্ভয় হয়ে থাকা ও তাবলীগ করা, অতঃপর আল্লাহর পথে চলতে গিয়ে যে বিপদ এসেছে তাতে ধৈর্য ধারণ করা, তারপর দেশ ও ঘর-বাড়ী আল্লাহ তা'আলার পথে ছেড়ে দিয়ে হিজরাত করা, অতিথির সেবা করা, ধন সম্পদের বিপদাপদ সহ্য করা এমনকি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে নিজের জীবন ও ছেলেকে আল্লাহ তা'আলার পথে কুরবানী করা। আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দা ইবরাহীম (আঃ) এই সমুদয় নির্দেশই পালন করেছিলেন। সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজির দ্বারাও তাঁর পরীক্ষা নেয়া হয়েছিল। ইমামতি, আল্লাহ

তা'আলার ঘর নির্মাণের নির্দেশ, হাজ্জের নির্দেশাবলী, মাকামে ইবরাহীম, বাইতুল্লাহয় অবস্থানকারীদের আহার্য এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর ধর্মের উপর প্রেরণ ইত্যাদির মাধ্যমেও তাঁর পরীক্ষা নেয়া হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীমকে (আঃ) বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করার পর এবার এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখিন করেন। আল্লাহ তাঁকে বলেন ঃ

أَسْلِمْ ۖ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

তুমি আনুগত্য স্বীকার কর; সে বলেছিল, আমি বিশ্বজগতের রবের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৩১)

অন্যায় দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়না

ইবরাহীম (আঃ) তাঁর ইমামতির সুসংবাদ শোনা মাত্রই তাঁর সন্তানদের জন্য এই প্রার্থনা জানান এবং তা গৃহীতও হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বলা হয় যে, তাঁর সন্তানদের মধ্যে অনেকে অবাধ্য হবে, তাদের উপর তাঁর অঙ্গীকার পৌঁছবেনা এবং তাদেরকে ইমাম করা হবেনা। সূরা 'আনকাবূতে এ আয়াতের ভাবার্থ পরিষ্কার হয়েছে। ইবরাহীমের (আঃ) এ প্রার্থনা গৃহীত হয়। সেখানে রয়েছে ঃ

وَجَعَلْنَا فِى ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَٰبَ

এবং তার বংশধরদের জন্য স্থির করলাম নাবুওয়াত ও কিতাব। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ২৭)

ইবরাহীমের (আঃ) পরে যত রাসূল (আঃ) এসেছেন সবাই তাঁর বংশধর ছিলেন এবং যত আসমানী কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে সবই তাঁর সন্তানদের উপরই হয়েছে। এখানে এও সংবাদ দেয়া হচ্ছে যে, তাঁর সন্তানদের মধ্যে অনেকে অত্যাচারীও হবে।

ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন, এ আয়াত থেকে জানা যাচ্ছে যে, অত্যাচারীকে ইমাম নিযুক্ত করা যাবেনা। ইব্ন খুওয়াইয মান্দাদ আল মালিকী (রহঃ) বলেন যে, অত্যাচারী ব্যক্তি খলীফা, বিচারক, মুফতী, সাক্ষী এবং বর্ণনাকারী হতে পারেনা।

১২৫। এবং যখন আমি কা'বা গৃহকে মানব জাতির জন্য সুরক্ষিত স্থান ও পুণ্যধাম	١٢٥. وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً

لِّلنَّاسِ وَأَمۡنًا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبۡرَٰهِـۧمَ مُصَلًّى ۖ	**করেছিলাম, এবং মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের জায়গা নির্ধারণ করেছিলাম।**

আল্লাহর ঘরের (কা'বা ঘর) মর্যাদা

ওটা প্রথম আল্লাহর ঘর ঃ مَثَابَةً এর ভাবার্থ হচ্ছে বার বার আগমন করা। হাজ্জ পালন করে বাড়ী ফিরে গেলেও অন্তর তার সাথে লেগেই থাকে। প্রত্যেক জায়গা হতে লোক দলে দলে এ ঘরের দিকে এসে থাকে। এটাই একত্রিত হবার স্থান, অর্থাৎ সবারই মিলন কেন্দ্র। এটি নিরাপদ জায়গা। এখানে অস্ত্র-শস্ত্র উত্তোলন করা হয়না। অজ্ঞতার যুগেও এর আশে-পাশে লুটতরাজ হত বটে; কিন্তু এখানে নিরাপত্তা বিরাজ করত। কেহকে কেহ গালিও দিতনা। এ স্থান সদা বারাকাতময় ও মর্যাদাপূর্ণ রয়েছে। সৎ আত্মাগুলি সদা এর দিকে উৎসুক নেত্রে চেয়ে থাকে। প্রতি বছর পরিদর্শন করলেও এর প্রতি লোকের আগ্রহ থেকেই যায়। এটি ইবরাহীমের (আঃ) প্রার্থনারই ফল। তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানিয়েছিলেন ঃ

فَٱجۡعَلۡ أَفۡـِٔدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهۡوِىٓ إِلَيۡهِمۡ

সুতরাং আপনি কিছু লোকের অন্তর ওদের প্রতি অনুরাগী করে দিন। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৩৭) এখানে কেহ তার ভাইয়ের হত্যাকারীকে দেখলেও নীরব থাকে। সূরা মায়িদায় রয়েছে যে, এটি মানুষের অবস্থান স্থল। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, মানুষ যদি হাজ্জ করা ছেড়ে দেয় তাহলে আকাশকে পৃথিবীর উপর নিক্ষেপ করা হবে। এ ঘরের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করলে এর প্রথম নির্মাতা ইবরাহীমের (আঃ) কথা স্মরণ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذۡ بَوَّأۡنَا لِإِبۡرَٰهِيمَ مَكَانَ ٱلۡبَيۡتِ أَن لَّا تُشۡرِكۡ بِى شَيۡـًٔا

আর স্মরণ কর, যখন আমি ইবরাহীমের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম সেই গৃহের স্থান। তখন বলেছিলাম ঃ আমার সাথে কোন শরীক স্থির করনা। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ২৬)

মাকামে ইবরাহীম

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَـٰلَمِينَ. فِيهِ ءَايَـٰتٌۢ بَيِّنَـٰتٌ مَّقَامُ إِبْرَٰهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا

নিশ্চয়ই সর্ব প্রথম গৃহ, যা মানবমন্ডলীর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা ঐ ঘর যা বাক্কায় (মাক্কায়) অবিস্থত; ওটি সৌভাগ্যযুক্ত এবং সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য পথ প্রদর্শক। তার মধ্যে প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ বিদ্যমান রয়েছে, মাকামে ইবরাহীম উক্ত নিদর্শনসমূহের অন্যতম। আর যে ওর মধ্যে প্রবেশ করে সে নিরাপত্তা প্রাপ্ত হয়। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৯৬-৯৭)

মাকামে ইবরাহীম বলতে সম্পূর্ণ বাইতুল্লাহকেও বুঝায় বা ইবরাহীমের (আঃ) বিশিষ্ট স্থানও বুঝায়। আবার হাজ্জের সমুদয় করণীয় কাজের স্থানকেও বুঝায়। যেমন আরাফাহ, মাশ'আরে হারাম, মিনা, পাথর নিক্ষেপ, সাফা-মারওয়ার তাওয়াফ ইত্যাদি। মাকামে ইবরাহীম প্রকৃতপক্ষে ঐ পাথরটি যার উপরে দাঁড়িয়ে ইবরাহীম (আঃ) কা'বা ঘর নির্মাণ করতেন। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৩৭১) সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, উহা হল ঐ পাথর যার উপর দাঁড়িয়ে ইবরাহীম (আঃ) তার মাথা ধৌত করতেন এবং তাঁর স্ত্রী পায়ে পানি ঢেলে দিতেন। (তাবারী ৩/৩৫) জাবিরের (রাঃ) একটি সুদীর্ঘ হাদীসে রয়েছে যে, যখন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তওয়াফ করেন তখন উমার (রাঃ) মাকামে ইবরাহীমের (আঃ) দিকে ইঙ্গিত করে বলেন 'এটাই কি আমাদের পিতা ইবরাহীমের (আঃ) মাকাম?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'হ্যাঁ'। তিনি বলেন ঃ 'তাহলে আমরা এটাকে কিবলাহ বানিয়ে নেই না কেন?' তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ইব্ন আবী হাতিম) অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, উমারের (রাঃ) প্রশ্নের অল্প দিন পরেই এ নির্দেশ অবতীর্ণ হয়। অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, মাক্কা বিজয়ের দিন মাকামে ইবরাহীমের (আঃ) পাথরের দিকে ইঙ্গিত করে উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এটাই কি মাকামে ইবরাহীম? তিনি বললেন ঃ 'হ্যাঁ' এটাই।' উমার (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমরা কি একে সালাতের স্থান হিসাবে নির্ধারণ করব? তখন আল্লাহ তা'আলা নাযলি করেন ঃ وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى (ইব্ন আবী হাতিম ১/৩৭০)

সহীহ বুখারীতে আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) বলেন ঃ 'তিনটি বিষয়ে আমি আমার রবের আনুকূল্য পেয়েছি, অথবা বলেন ঃ তিনটি বিষয়ে আমার রাব্ব আমার আনুকূল্য করেছেন অর্থাৎ আল্লাহ যা চেয়েছিলেন তাই তার (উমার (রাঃ) মুখ দিয়ে বের হয়েছিল। উমার (রাঃ) বলেন ঃ 'আমি বললাম যে, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থান করে নিতাম! তখন এই আয়াতটি (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১২৫) অবতীর্ণ হয়। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল! সৎ ও অসৎ সবাই আপনার নিকট এসে থাকে, সুতরাং আপনি যদি মু'মিনদের জননীগণকে [নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিনীগণকে] পর্দার নির্দেশ দিতেন! তখন পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হয়। যখন আমি অবগত হই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কোনও কোনও স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন, আমি তখন তাঁদের নিকট গিয়ে বলি– যদি আপনারা বিরত না হন [রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুঃখ দেয়া হতে] তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আপনাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী প্রদান করবেন। তখন মহান আল্লাহ নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ

عَسَىٰ رَبُّهُۥٓ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُۥٓ أَزْوَٰجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ

যদি নাবী তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করে তাহলে তার রাব্ব সম্ভবতঃ তাকে দিবেন তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্ত্রী যারা হবে আত্মসমর্পনকারিণী। (সূরা তাহ্রীম, ৬৬ ঃ ৫)

ইব্ন জারীর (রহঃ) যাবির (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ কালো পাথরে চুমু দেয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'বা ঘরের চারিদিকে তিনবার দ্রুত প্রদক্ষিণ করেন এবং চারবার আস্তে ধীরে প্রদক্ষিণ করেন। অতঃপর তিনি মাকামে ইবরাহীমের কাছে গিয়ে দুই রাকআত সালাত আদায় করেন। (তাবারী ৩/৩৬) এটি একটি দীর্ঘ হাদীস যা ইমাম মুসলিম (রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। (হাদীস নং ২/৯২০) অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে, ইব্ন উমার (রাঃ) বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সালাম কা'বা ঘরের চারিদিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করলেন এবং মাকামা ইবরাহীমের পিছনে দুই রাক'আত সালাত আদায় করলেন। (ফাতহুল বারী ৩/৫৮৬)

এ হাদীসসমূহ থেকে জানা যাচ্ছে যে, মাকামে ইবরাহীমের ভাবার্থ ঐ পাথরটি যার উপর দাঁড়িয়ে ইবরাহীম (আঃ) কা'বা ঘর নির্মাণ করতেন। ইসমাঈল (আঃ) তাঁকে পাথর এনে দিতেন এবং তিনি কা'বা ঘরের ভিত্তি স্থাপন করে যেতেন।

যেখানে প্রাচীর উঁচু করার প্রয়োজন হত সেখানে পাথরটি সরিয়ে নিয়ে যেতেন। এভাবে কা'বার প্রাচীর গাঁথার কাজ সমাপ্ত করেন। এর পূর্ণ বিবরণ ইনশাআল্লাহ ইবরাহীমের (আঃ) ঘটনায় আসবে। ঐ পাথরে ইবরাহীমের (আঃ) পদদ্বয়ের চিহ্ন পরিস্ফুট হয়েছিল। আরাবের অজ্ঞতার যুগের লোকেরা তা জানত। আবূ তালিব তাঁর প্রশংসামূলক কবিতায় বলেছিলেন ঃ

'ঐ পাথরের উপর ইবরাহীমের (আঃ) পদদ্বয়ের চিহ্ন নতুন হয়ে রয়েছে, পদদ্বয় জুতাশূন্য ছিল।'

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) বলেন ঃ 'আমি মাকামে ইবরাহীমের উপর ইবরাহীম খলীলুল্লাহর (আঃ) পায়ের আঙ্গুল ও পায়ের পাতার চিহ্ন দেখেছিলাম। অতঃপর জনগণের স্পর্শের কারণে তা মুছে গেছে।'

এই মাকামে ইবরাহীম পূর্বে কা'বার প্রাচীরের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। কা'বার দরজার দিকে 'হাজরে আসওয়াদ'এর পাশে দরজা দিয়ে যেতে ডান দিকে একটি স্থায়ী জায়গায় বিদ্যমান ছিল যা আজও লোকের জানা আছে। ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ) হয়তবা ওটাকে এখানেই রেখেছিলেন কিংবা বাইতুল্লাহ বানানো অবস্থায় শেষ অংশ হয়ত এটাই নির্মাণ করে থাকবেন এবং পাথরটি এখানেই থেকে গেছে। উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) স্বীয় খিলাফাতের যুগে ওটিকে পিছনে সরিয়ে দেন। উমার (রাঃ) হলেন ঐ দুই ব্যক্তির একজন যার সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন ঃ আমার মৃত্যুর পর তোমরা দুই ব্যক্তির অনুসরণ করবে। তারা হল আবূ বাকর (রাঃ) এবং উমার (রাঃ)। (তিরমিযী ৫৬৯)

উমার (রাঃ) হলেন ঐ ব্যক্তি যার ইচ্ছার প্রতিফলন হিসাবে কুরআনে মাকামে ইবরাহীমের পিছনে সালাত আদায় করার আদেশ দেয়া হয়েছে। এ কারণে উমারের (রাঃ) এ কাজকে কোন সাহাবীই বাধা প্রদান করেননি।

আবদুর রায্যাক (রহঃ) ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) থেকে এবং তিনি 'আতা (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) মাকামে ইবরাহীমকে পিছনে সরিয়ে নিয়ে আসেন। আবদুর রায্যাক (রহঃ) আরও বলেন, মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেন ঃ উমার (রাঃ) হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি মাকামে ইবরাহীমকে পিছনে সরিয়ে নেন, তা এখন যেখানে অবস্থিত আছে সেখানে। হাফিয আবূ বাকর (রহঃ), আহমাদ (রহঃ) ইব্ন আলী ইব্ন হুসাইন আল বাইহাকী (রহঃ) আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবূ

বাকরের (রাঃ) সময়ে মাকামে ইবরাহীম ছিল কা'বার ডান দিকে। উমার (রাঃ) তার খিলাফাত আমলে বর্তমান জায়গায় তা স্থানান্তরিত করেন। এ হাদীসের বর্ণনার ধারাবাহিকতা সহীহ।

وَعَهِدْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعَـٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ	এবং আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলের নিকট অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী ও ই'তিকাফকারী এবং রুকূ ও সাজদাহকারীদের জন্য পবিত্র রেখ।
١٢٦. وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَـٰذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَٱرْزُقْ أَهْلَهُۥ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ ۖ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُۥ قَلِيلًا ثُمَّ ۖ أَضْطَرُّهُۥٓ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ	১২৬। যখন ইবরাহীম বলল ঃ হে আমার রাব্ব! এ স্থানকে আপনি নিরাপত্তাময় শহরে পরিণত করুন এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদেরকে উপজীবিকার জন্য ফল-শষ্য প্রদান করুন। (আল্লাহ) বলেন ঃ যারা কুফরী করে তাদেরকে আমি অল্প কিছু দিন জীবনোপভোগ করতে দিব, অতঃপর তাদেরকে অগ্নির শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব, ঐ গন্তব্য স্থান নিকৃষ্টতম।
١٢٧. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَٰهِـۧمُ	১২৭। যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কা'বার ভিত্তি

ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَـٰعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ	স্থাপন করল (তখন বলল) হে আমাদের রাব্ব! আমাদের পক্ষ হতে এটি গ্রহণ করুন, নিশ্চয়ই আপনি শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।
١٢٨. رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ	১২৮। হে আমাদের রাব্ব! আমাদের উভয়কে আপনার অনুগত করুন, এবং আমাদের বংশধরদের মধ্য হতেও আপনার অনুগত এক দল লোক সৃষ্টি করুন, আর আমাদেরকে হাজ্জের আহকাম বলে দিন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন, নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল, করুণাময়।

আল্লাহর ঘর পরিস্কার রাখার নির্দেশ

এখানে عَهْدٌ এর অর্থ হচ্ছে নির্দেশ। অর্থাৎ 'আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে নির্দেশ দিয়েছি।' 'পবিত্র রেখ' অর্থাৎ কা'বা ঘরকে ময়লা এবং জঘন্য জিনিস হতে পবিত্র রেখ। عَهْدٌ এর تَعْدِيَة যদি اِلٰى দ্বারা হয় তাহলে অর্থ দাঁড়াবে 'আমি ওয়াহী অবতীর্ণ করেছি এবং প্রথমেই বলে দিয়েছি যে, তোমরা উভয়ে 'বাইতুল্লাহকে মূর্তী/প্রতিমা থেকে পবিত্র রাখবে, সেখানে আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদাত হতে দিবেনা, বাজে কাজ, অপ্রয়োজনীয় ও মিথ্যা কথা, শির্‌ক, কুফরী, হাসি-রহস্য ইত্যাদি হতে ওকে রক্ষা করবে।' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মুশরিকদেরকে জানিয়ে দেয়া যে, 'বাইতুল্লাহ' তো খাস করে আল্লাহ তা'আলার ইবাদাতের জন্যই নির্মিত হয়েছে। ওর মধ্যে অন্যদের পূজা করা এবং খাঁটি আল্লাহর ইবাদাতকারীদেরকে ঐ ঘরে ইবাদাত করা হতে বিরত রাখা সরাসরি

অন্যায় ও অবিচারপূর্ণ কাজ। এ জন্যই কুরআন মাজীদে অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'এরূপ অত্যাচারীদেরকে আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাবো।' এভাবে মুশরিকদের দাবীকে স্পষ্টভাবে খণ্ডন করার সাথে সাথে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের দাবীও খণ্ডন করা হয়ে গেল। কুরআন মাজীদের অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে ঃ

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْآصَالِ

সেই সব গৃহ, যাকে মর্যাদায় সমুন্নত করতে এবং যাতে তাঁর নাম স্মরণ করতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করে। (সূরা নূর, ২৪ ঃ ৩৬)

মাসজিদকে পবিত্র রাখা এবং অশ্লীলতা ও অপবিত্রতা থেকে পরিস্কার রাখার ব্যাপারে বিভিন্ন হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে, যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মাসজিদ এ জন্যই তৈরী করা হয়, যে কারণে ইহা তৈরী করতে (ইবাদাতের জন্য) বলা হয়েছে।' (মুসলিম ১/৩৯৭)

মাক্কা হল পবিত্রতম স্থান

ইমাম আবূ জাফর ইব্ন জারীর আত-তাবারী (রহঃ) বলেন যে, যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'ইবরাহীম (আঃ) মাক্কাকে হারাম বানিয়েছিলেন। আমি মাদীনাকে হারাম করলাম। এর শিকার খাওয়া হবেনা, এখানকার বৃক্ষ কর্তন করা হবেনা, এখানে অস্ত্র-শস্ত্র উত্তোলন করা নিষেধ।' (তাবারী ৩/৪৭, মুসলিম ২/৯৯২, নাসাঈ ৩/৪৮৭)

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কা বিজয়ের দিন বলেছেন ঃ

'যখন হতে আল্লাহ তা'আলা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেন তখন থেকেই এই শহরকে মর্যাদাপূর্ণরূপে বানিয়েছেন। এখন কিয়ামাত পর্যন্ত এর মর্যাদা অক্ষুণ্নই থাকবে। এখানে যুদ্ধ বিগ্রহ কারও জন্য বৈধ নয়। আমার জন্যও শুধুমাত্র আজকের দিনে কিছুক্ষণের জন্য বৈধ ছিল। এর অবৈধতা রয়েই গেল। জেনে রেখ, এর কাঁটা কাটা যাবেনা, এর শিকার তাড়া করা যাবেনা, এখানে কারও পতিত হারানো জিনিস উঠিয়ে নেয়া যাবেনা, কিন্তু যে ওটা (মালিকের নিকট)

পৌঁছে দিবে তার জন্য জায়িয। এর ঘাস কেটে নেয়া হবেনা। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি এ হাদীসটি খুৎবায় বর্ণনা করেছিলেন এবং আব্বাসের (রাঃ) প্রশ্নের কারণে তিনি 'ইয্খার' নামক ঘাস কাটার অনুমতি দিয়েছিলেন। (ফাতহুল বারী ৪/৫৬, মুসলিম ২/৯৮৬)

আমর ইব্ন সাঈদ (রাঃ) যখন মাক্কার দিকে সেনাবাহিনী প্রেরণ করছিলেন সেই সময় ইব্ন শুরাইহ্ আদভী (রাঃ) তাঁকে বলেন ঃ "হে আমীর! মাক্কা বিজয়ের দিন অতি প্রত্যুষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে খুৎবা দেন তা আমি নিজ কানে শুনেছি, মনে রেখেছি এবং সেই সময় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বচক্ষে দেখেছি, আল্লাহ তা'আলার প্রশংসার পর তিনি বলেন ঃ

'আল্লাহ তা'আলাই মাক্কাকে হারাম করেছেন, মানুষ করেনি। কোন মু'মিনের জন্য এখানে রক্ত প্রবাহিত করা এবং বৃক্ষাদি কেটে নেয়া বৈধ নয়। যদি কেহ আমার এই যুদ্ধকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করতে চায় তাহলে তাকে বলবে যে, আমার জন্য শুধুমাত্র আজকের দিন এই মুহূর্তের জন্যই যুদ্ধ বৈধ ছিল। অতঃপর পুনরায় এ শহরের মর্যাদা ফিরে এসেছে যেমন কাল ছিল। সাবধান! তোমরা যারা উপস্থিত রয়েছ, তাদের নিকট অবশ্যই এ সংবাদ পৌঁছে দিবে যারা আজ এ জনসমাবেশে নেই।' কিন্তু আমার এ হাদীসটি শুনে তিনি পরিষ্কারভাবে উত্তর দেন ঃ 'আমি তোমার চেয়ে এ হাদীসটি বেশি জানি। 'মাক্কাতুল হারাম' অবাধ্য রক্ত পিপাসুকে এবং ধ্বংসকারীকে রক্ষা করেনা।" (ফাতহুল বারী ৪/৫০, মুসলিম ২/৯৮৭) কেহ যেন এ দু'টি হাদীসকে পরস্পর বিরোধী মনে না করেন। এ দু'টির মধ্যে সাদৃশ্য এভাবে হবে যে, মাক্কা প্রথম দিন হতেই মর্যাদাপূর্ণ তো ছিলই, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীমের (আঃ) মাধ্যমে এর (মাক্কার) সম্মান ও মর্যাদার কথা প্রচার করেন। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো তখন হতেই রাসূল ছিলেন যখন আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করার জন্য খামির প্রস্তুত হয়েছিল; বরং সেই সময় হতেই তাঁর নাম শেষ নাবী রূপে লিখিত ছিল। কিন্তু তথাপিও ইবরাহীম (আঃ) তাঁর নাবুওয়াতের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানিয়ে বলেছিলেন ঃ

رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ

হে আমাদের রাব্ব! তাদেরই মধ্য হতে এমন একজন রাসূল প্রেরণ করুন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১২৯) এ প্রার্থনা আল্লাহ কবূল করেন এবং তাকদীরে লিখিত ঐ কথা প্রকাশিত হয়। একটি হাদীসে রয়েছে যে, জনগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ 'আপনার নাবুওয়াতের সূত্রের কথা কিছু আলোচনা করুন।' তখন তিনি বলেন ঃ

'আমার পিতা ইবরাহীমের (আঃ) প্রার্থনা, আমার সম্বন্ধে ঈসার (আঃ) সুসংবাদ দান এবং আমার মা স্বপ্নে দেখেন যে, তার মধ্য হতে যেন একটি আলো বেরিয়ে সিরিয়ার প্রাসাদগুলিকে আলোকিত করে দিল এবং তা দৃষ্টিগোচর হতে থাকল।' (আহমাদ ৫/২৬২)

ইবরাহীম (আঃ) মাক্কাকে নিরাপত্তা ও উত্তম রিয্কের শহরের জন্য দু'আ করেছিলেন

ইবরাহীম (আঃ) প্রার্থনা করেছেন ঃ

رَبِّ ٱجْعَلْ هَـٰذَا بَلَدًا ءَامِنًا

হে আমার রাব্ব! এ স্থানকে আপনি নিরাপত্তাময় শহরে পরিণত করুন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১২৬) অর্থাৎ এখানে অবস্থানকারীদেরকে ভীতিশূন্য রাখুন। আল্লাহ তা'আলা তা কবূল করেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا

আর যে ওর মধ্যে প্রবেশ করে সে নিরাপত্তা প্রাপ্ত হয়। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৯৭) অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ

তারা কি দেখেনা যে, আমি হারাম নিরাপদ স্থান করেছি, অথচ এর চতুস্পার্শে যে সব মানুষ আছে তাদের উপর হামলা করা হয়। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৬৭) এ প্রকারের আরও বহু আয়াত রয়েছে এবং এ সম্পর্কীয় বহু হাদীসও বর্ণিত হয়েছে যে, মাক্কায় যুদ্ধ বিগ্রহ হারাম। যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ 'মাক্কায় অস্ত্র-শস্ত্র বহন করাও কারও জন্য বৈধ নয়।' (মুসলিম ২/৯৮৯) তাঁর এ প্রার্থনা কা'বা ঘর নির্মাণের পূর্বে ছিল। এ জন্যই বলেন ঃ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَـٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا

হে আমার রাব্ব! এই শহরকে নিরাপদ করুন। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৩৫) সূরা ইবরাহীমে এ প্রার্থনাই এভাবে রয়েছে ঃ رَبِّ اجْعَلْ هَـٰذَا بَلَدًا آمِنًا (সূরা

বাকারাহ, ২ ঃ ১২৬) সম্ভবতঃ এটি দ্বিতীয় বারের প্রার্থনা ছিল, যখন বাইতুল্লাহ প্রতিষ্ঠিত হয় ও মাক্কা শহর হয়ে যায় এবং ইসহাক (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন, যিনি ইসমাঈলের (আঃ) চেয়ে তের বছরের ছোট ছিলেন। এ জন্যই এ প্রার্থনার শেষে তাঁর জন্ম লাভের জন্যও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ইবরাহীম (আঃ) তাঁর দু'আর শেষে বলেন ঃ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى وَهَبَ لِى عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَـٰعِيلَ وَإِسْحَـٰقَ ۚ إِنَّ رَبِّى لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য যিনি আমাকে আমার বার্ধক্যে ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করেছেন; আমার রাব্ব অবশ্যই প্রার্থনা শুনে থাকেন। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৩৯)

ইবরাহীম (আঃ) যখন তাঁর সন্তানদের জন্য ইমামতির প্রার্থনা জানালেন এবং অত্যাচারীদের বঞ্চিত হওয়ার ঘোষণা শুনলেন ও বুঝতে পারলেন যে, তাঁর পরে আগমনকারীদের মধ্যে অনেকে অবাধ্যও হবে।

তখন তিনি ভয়ে শুধুমাত্র মু'মিনদের জন্যই আহার্যের প্রার্থনা জানালেন ঃ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জানিয়ে দিলেন যে, قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ তিনি ইহলৌকিক সুখ সম্ভোগ কাফিরদেরকেও দিবেন। যেমন অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

كُلًّا نُّمِدُّ هَـٰٓؤُلَآءِ وَهَـٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا

তোমার রাব্ব তাঁর দান দ্বারা এদেরকে এবং ওদেরকে সাহায্য করেন এবং তোমার রবের দান অবারিত। (সূরা ইসরাহ, ১৭ ঃ ২০) অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. مَتَـٰعٌ فِى ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ

তুমি বল ঃ যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করে তারা সফলকাম হবেনা। এটা দুনিয়ার সামান্য আয়েশ আরাম মাত্র, অতঃপর আমারই দিকে তাদের ফিরে আসতে হবে, তখন আমি তাদেরকে তাদের কুফরীর বিনিময়ে কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাবো। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৬৯-৭০) অন্যস্থানে বলেন ঃ

وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُۥٓ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ. نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ

কেহ কুফরী করলে তার কুফরী যেন তোমাকে ক্লিষ্ট না করে। আমারই নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তাদেরকে অবহিত করব তারা যা করত। অন্তরে যা রয়েছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ ভোগ করতে দিব স্বল্পকালের জন্য। অতঃপর তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ২৩-২৪) অন্যস্থানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْلَآ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِٱلرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَٰبًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِـُٔونَ. وَزُخْرُفًا ۚ وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْـَٔاخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ

সত্য প্রত্যাখ্যানে মানুষ এক মতাবলম্বী হয়ে পড়বে, এই আশংকা না থাকলে দয়াময় আল্লাহকে যারা অস্বীকার করে তাদেরকে আমি দিতাম তাদের গৃহের জন্য রৌপ্য নির্মিত ছাদ ও সিড়ি যাতে তারা আরোহণ করে। এবং তাদের গৃহের জন্য দিতাম রৌপ্য নির্মিত দরজা, বিশ্রামের জন্য পালঙ্ক যাতে তারা হেলান দিয়ে বসত। এবং স্বর্ণের নির্মিতও। আর এই সবই তো শুধু পার্থিব জীবনের ভোগ সম্ভার। মুত্তাকীদের জন্য তোমার রবের নিকট রয়েছে আখিরাতের কল্যাণ। (৪৩ ঃ ৩৩-৩৫) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

ثُمَّ أَضْطَرُّهُۥٓ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ

অতঃপর তাদেরকে অগ্নির শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব, ঐ গন্তব্য স্থান নিকৃষ্টতম। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১২৬) এর ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা

তাদেরকে দেখছেন এবং অবকাশ দিচ্ছেন, অতঃপর তিনি তাদেরকে কঠিনভাবে পাকড়াও করবেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ ٱلْمَصِيرُ

এবং আমি অবকাশ দিয়েছি কত জনপদকে যখন তারা ছিল অত্যাচারী; অতঃপর তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৪৮) সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে ঃ

‘কষ্টদায়ক কথা শুনে আল্লাহ অপেক্ষা বেশি ধৈর্য ধারণকারী আর কেহই নেই। তারা তাঁর সন্তান সাব্যস্ত করছে, অথচ তিনি তাদেরকে আহার্যও দিচ্ছেন এবং নিরাপত্তাও দান করেছেন। (ফাতহুল বারী ১৩/৩৭২, মুসলিম ৪/২১৬০) অন্য সহীহ হাদীসেও রয়েছে যে, আল্লাহ তা‘আলা অত্যাচারীকে ঢিল দেন, অতঃপর হঠাৎ তাদেরকে ধরে ফেলেন এবং আর কখনো রেহাই দেননা। (ফাতহুল বারী ৮/২০৫) এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَٰلِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُۥٓ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

এরূপই তিনি কোন জনপদের অধিবাসীদের পাকড়াও করেন যখন তারা অত্যাচার করে; নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও হচ্ছে অত্যন্ত যন্ত্রনাদায়ক, কঠোর। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১০২)

কা’বা ঘর তৈরী এবং ইবরাহীমের (আঃ) আন্তরিক প্রার্থনা

ইবরাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ) শুভ কাজ শুরু করেন এবং তা গৃহীত হয় কি না এ ভয়ও তাঁদের রয়েছে। এ জন্যই তাঁরা মহান আল্লাহর নিকট এটি কবূল করার প্রার্থনা জানাচ্ছেন ঃ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ অহাব ইব্ন ওয়ার্দ (রহঃ) এ আয়াতটি পাঠ করে খুব ক্রন্দন করতেন এবং বলতেন ঃ ‘হে আল্লাহ তা‘আলার প্রিয় বন্ধু এবং নাবী ইবরাহীম (আঃ)! আল্লাহর কাজ তাঁর হুকুমেই করেছেন, তাঁর হুকুমেই তাঁর ঘর নির্মাণ করছেন, তথাপি ভয় করছেন যে, না জানি আল্লাহর নিকট এটি না মঞ্জুর হয়।’ (ইব্ন আবী হাতিম ১/৩৮৪) মহান আল্লাহ মু‘মিনদের অবস্থা এরকমই বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآ ءَاتَوا۟ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ

এই বিশ্বাসে তাদের যা দান করার তা দান করে। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৬০) সহীহ হাদীসে রয়েছে, যা আয়িশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, অতি সত্বরই তা যথা স্থানে আসছে।

ইমাম বুখারী (রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ ইসমাঈল (আঃ) এবং তাঁর মাকে সাথে নিয়ে চলতে চলতে ইবরাহীম (আঃ) এমন এক জায়গায় একটি গাছের কাছে পৌঁছেন যে গাছের নিচে অবস্থিত ছিল যমযম কূপ এবং উপরের দিকে ছিল কা'বা ঘরের অবস্থান। তখন ইসমাঈল (আঃ) এতই ছোট ছিলেন যে, তাঁকে তাঁর মা'কেই দেখাশোনা করতে হত। মাক্কায় তখন কোন জনবসতি ছিলনা এবং পানিরও কোন ব্যবস্থা ছিলনা। একটি ব্যাগে সামান্য কিছু খেজুর এবং একটি পানির পাত্রে সামান্য পরিমান পানিসহ ইবরাহীম (আঃ) তাদেরকে সেখানে রেখে চলে আসেন। ইবরাহীম (আঃ) যখন চলে আসছিলেন তখন ইসমাঈলের (আঃ) মা তাঁর পিছু পিছু আসেন এবং জিজ্ঞেস করেন ঃ হে ইবরাহীম! আপনি আমাদেরকে এই বিরানভূমিতে কার কাছে রেখে চলে যাচ্ছেন, যেখানে কোন লোকবসতি নেই? তিনি এ প্রশ্নটি বার বারই করছিলেন। কিন্তু ইবরাহীম (আঃ) কোন উত্তরই দিচ্ছিলেননা। ইসমাঈলের (আঃ) মা তাকে প্রশ্ন করলেন ঃ আল্লাহ কি আপনাকে এরূপ করতে বলেছেন? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন ঃ তাহলে এতে আমি খুশি, কারণ আল্লাহ আমাদেরকে ত্যাগ করবেননা। এরপর ইবরাহীম (আঃ) ওখান থেকে চলে আসেন। কিছু দূর পথ অতিক্রম করার পর যখন তাদেরকে আর দেখা যাচ্ছিলনা তখন 'সানাইয়াহ' নামক স্থানে পৌঁছে কা'বার দিকে ফিরে দুই হাত তুলে আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন ঃ

رَّبَّنَآ إِنِّىٓ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِى بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ

হে আমাদের রাব্ব! আমি আমার বংশধরদের কতককে বসবাস করালাম অনুর্বর উপত্যকায় আপনার পবিত্র গৃহের নিকট। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৩৭)

ইসমাঈলের (আঃ) মা অতঃপর শিশু ইসমাঈলের (আঃ) কাছে ফিরে আসেন, পানি পান করেন এবং ছেলের পরিচর্যা করতে থাকেন। এক সময় তাদের সাথে থাকা পানি ফুরিয়ে যায় এবং তারা তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েন। মা তার ছেলের দিকে তাকিয়ে তাঁর তৃষ্ণার কথা বুঝতে পারলেন। তিনি তাঁকে রেখে একটু দূরে সরে গেলেন। কারণ তিনি ছেলের তৃষ্ণার কষ্ট সহ্য করতে পারছিলেননা। তিনি

যেখানে অবস্থান করছিলেন তার কাছেই একটি পাহাড় দেখতে পেলেন যার নাম ছিল 'সাফা'। তিনি ওর উপর আরোহন করলেন এবং কেহকে দেখতে পাওয়ার আশায় এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন। কিন্তু সব আশা বৃথা! অতঃপর তিনি ঐ পাহাড় থেকে নেমে, কাপড় উঁচিয়ে যেমনটি কোন লোক পরিশ্রান্ত হয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌঁড়ায়, তেমনি দৌঁড়ে গিয়ে 'মারওয়া' পাহাড়ে আরোহন করেন। ওখানেও কেহকে খুঁজে পেতে ব্যর্থ হলেন। এভাবে তিনি দুই পাহাড়ের মাঝে সাতবার দৌঁড়ালেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এ জন্যই হাজ্জ কিংবা উমরাহ করার সময় লোকদেরকে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝে সাতবার দৌঁড়াতে হয়।

যখন ইসমাঈলের (আঃ) মা মারওয়া পৌঁছেন তখন তিনি যেন কারও আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি নিজে নিজে হিস্স ধ্বনি করলেন। তিনি আবার আওয়াজ শুনতে চেষ্টা করলেন এবং পুনরায় শব্দ শোনার পর বললেন ঃ আমি আপনার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি, আপনার কাছে কি কোন খাদ্য আছে? তিনি দেখতে পেলেন যে, যে স্থানটিতে বর্তমান যমযম কূপ অবস্থিত সেখানে মালাইকা/ফেরেস্তা তার পায়ের গোড়ালি দ্বারা (অথবা পাখা দ্বারা) মাটি খুঁড়ছেন এবং ঐ স্থান থেকে ফোয়ারা হয়ে পানি বের হয়ে আসছে। ইসমাঈলের (আঃ) মা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হলেন এবং তিনিও মাটি খুঁড়ে তার দুই হাত দিয়ে পানি রাখার পাত্রে পানি ভর্তি করতে শুরু করেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ইসমাঈলের (আঃ) মায়ের প্রতি আল্লাহ রাহম করুন! তিনি যদি পানি-প্রবাহ বন্ধ করার জন্য কূপের চারিদিকে বাঁধ না দিতেন তাহলে যমযমের পানি-প্রবাহে সমস্ত পৃথিবী সায়লাব হয়ে যেত। ইসমাঈলের (আঃ) মা পেট ভরে যমযমের পানি পান করেন এবং এতে তার বুকের দুধও বৃদ্ধি পেল যা পান করে তার ছেলেও তৃষ্ণা মেটালেন। মালাক/ফেরেস্তা তাকে বললেন ঃ আপনি ভয় পাবেননা, এই বালক এবং তাঁর পিতা উভয়ে মিলে এখানে আল্লাহর ঘর তৈরী করবেন। আল্লাহর নাম স্মরণকারীকে আল্লাহ কখনো পরিত্যাগ করেননা। ঐ সময় ঘরের উচ্চতা ছিল সমতল ভূমির সমান। পানির প্রবাহ এর ডান ও বাম দিকের উচ্চতা পর্যন্ত উঠত।

জনহীন উপত্যকায় 'জারহাম' গোত্রের আগমন

কিছুদিন পর ঘটনাক্রমে 'জারহাম' গোত্রের লোক 'কিদার' পথে যাচ্ছিল। তারা কা'বা ঘরের নিম্নাংশে অবতরণ করে। কিছু পানিচর পাখির প্রতি তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় তারা পরস্পর বলাবলি করে ঃ 'এটি পানির পাখি এবং

এখানে পানি ছিলনা আমরা কয়েকবার এখান দিয়ে যাতায়াত করেছি। এটাতো শুষ্ক জঙ্গল ও জনহীন প্রান্তর। এখানে পানি এলো কোথা থেকে?' প্রকৃত ঘটনা জানার জন্য তারা লোক পাঠিয়ে দেয়। তারা ফিরে এসে সংবাদ দেয় যে, সেখানে বহু পানি রয়েছে। তখন তারা সবাই চলে আসে এবং ইসমাঈলের (আঃ) মায়ের নিকট আরয করে ঃ 'আপনি অনুমতি দিলে আমরাও এখানে অবস্থান করি। এটা পানির জায়গা।' তিনি বলেন ঃ 'হ্যাঁ, ঠিক আছে। আপনারা স্বাচ্ছন্দে অবস্থান করুন। কিন্তু পানির উপর অধিকার আমারই থাকবে।' তারা তার প্রস্তাবে রাযী হলেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ইসমাঈলের (আঃ) মা তখন চাচ্ছিলেন যে, সেখানে লোক-বসতি গড়ে উঠুক যাতে তাদের সাথে নিয়ে একত্রে বাস করা যায়। এভাবে ঐ লোকজন বসবাস করতে শুরু করে এবং আস্তে আস্তে তাদের আত্মীয় স্বজনও তাদের সাথে এসে যোগ দিতে থাকে। অতঃপর ইসমাঈল (আঃ) বড় হয়ে যৌবন প্রাপ্ত হন এবং তাদের এক মেয়েকে বিয়ে করেন। তাদের কাছ থেকে তিনি আরাবী ভাষা শিখেন এবং তারাও ইসমাঈলের (আঃ) কথা মেনে চলতেন। ওখানেই ইসমাঈলের (আঃ) মা ইন্তেকাল করেন।

প্রিয় পুত্রের সাথে প্রথম সাক্ষাৎ

এক সময় ইবরাহীমের (আঃ) মনে তাঁর পোষ্যদের দেখার ইচ্ছা জাগে এবং মাক্কার উদ্দেশে রওয়ানা হন। তিনি যখন মাক্কা পৌঁছেন তখন তাঁর ছেলে ইসমাঈল (আঃ) বাড়ীতে ছিলেননা। তিনি তাঁর পুত্রবধুকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'সে কোথায় রয়েছে?' উত্তর আসে ঃ 'তিনি পানাহারের খোঁজে বেরিয়েছেন। অর্থাৎ শিকারে গেছেন।' তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ 'তোমাদের অবস্থা কি?' সে বলে ঃ 'অবস্থা খারাপ, বড়ই দারিদ্রতা ও সংকীর্ণতার মধ্যে দিন যাপন করছি।' তিনি বলেন ঃ 'তোমার স্বামী বাড়ী এলে তাকে আমার সালাম জানাবে এবং বলবে যে, সে যেন তার দরজার চৌকাঠ পরিবর্তন করে।' ইসমাঈল (আঃ) ফিরে এসে যেন কোন মানুষের আগমনের ইঙ্গিত পান। তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন, 'এখানে কোন লোকের আগমন ঘটেছিল কি?' স্ত্রী বলে ঃ 'হ্যাঁ, এরূপ এরূপ আকৃতির একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ এসেছিলেন। তিনি আপনার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে আমি বলি যে, তিনি শিকারের সন্ধানে বেরিয়েছেন। তার পরে জিজ্ঞেস করেন, 'দিন যাপন কিভাবে হচ্ছে?' আমি বলি যে, আমরা অত্যন্ত সংকীর্ণ ও কঠিন অবস্থায় দিন যাপন করছি।' ইসমাঈল (আঃ) বলেন ঃ 'আমাকে কিছু বলতে বলেছেন কি?' স্ত্রী বলে ঃ 'হ্যাঁ, তিনি বলেছেন, যখন তোমার স্বামী আসবে তখন তাকে বলবে, সে

যেন তার দরজার চৌকাঠ পরিবর্তন করে।' ইসমাঈল (আঃ) তখন বললেন ঃ 'হে আমার সহধর্মিনী! জেনে রেখ যে, উনি আমার পিতা। তিনি যা বলে গেছেন তার ভাবার্থ এই যে, (যেহেতু তুমি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছ) আমি যেন তোমাকে পৃথক করে দেই। যাও, আমি তোমাকে তালাক দিলাম।' তাকে তালাক দিয়ে তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন।

দ্বিতীয় বার সাক্ষাতের চেষ্টা

কিছুদিন পর ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে পুনরায় এখানে আসেন। ঘটনাক্রমে এবারও ইসমাঈলের (আঃ) সাথে সাক্ষাৎ হয়নি। পুত্রবধূকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারেন যে, তিনি তাদের জন্য আহার্যের অনুসন্ধানে বেরিয়েছেন। পুত্রবধূ বলে ঃ 'আপনি বসুন যা কিছু হাযির রয়েছে তাই আহার করুন।' তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ 'বলতো! তোমাদের দিন যাপন কিভাবে হচ্ছে এবং তোমাদের অবস্থা কিরূপ?' উত্তর আসে ঃ 'আলহামদু লিল্লাহ! আমরা ভালই আছি এবং আল্লাহর অনুগ্রহে সুখে-স্বচ্ছন্দে আমাদের দিন যাপন হচ্ছে। এ জন্য আমরা মহান আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।' ইবরাহীম (আঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ 'তোমাদের আহার্য কি?' উত্তর আসে ঃ 'গোশত।' জিজ্ঞেস করেন ঃ 'তোমরা পান কর কি?' উত্তর হয় ঃ 'পানি।' তিনি প্রার্থনা করেন, 'হে প্রভু! আপনি তাদের গোশ্‌ত ও পানিতে বারাকাত দিন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'যদি শস্য তাদের নিকট থাকত এবং তারা এটা বলত তাহলে ইবরাহীম (আঃ) তাদের জন্য শস্যেরও বারাকাত চাইতেন। এখন এই প্রার্থনার বারাকাতে মাক্কাবাসী শুধুমাত্র গোশত ও পানির উপরেই দিন যাপন করতে পারে, অন্য লোক পারেনা।' ইবরাহীম (আঃ) বলেন ঃ 'আচ্ছা, আমি যাচ্ছি, তোমার স্বামীকে আমার সালাম জানাবে এবং বলবে যে, সে যেন তার চৌকাঠ ঠিক রাখে।' এর পরে ইসমাঈল (আঃ) এসে সমস্ত সংবাদ অবগত হন। তিনি বলেন ঃ 'তিনি ছিলেন আমার সম্মানিত পিতা। আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে, আমি যেন তোমাকে পৃথক না করি।

কা'বা ঘর নির্মাণ

আবার কিছু দিন পর ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ তা'আলার অনুমতি লাভ করে এখানে আসেন। ইসমাঈল (আঃ) যম্‌যম্‌ কূপের পাশে একটি পাহাড়ের উপর তীর সোজা করছিলেন। এমতাবস্থায় ইবরাহীম (আঃ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। ইসমাঈল (আঃ) পিতাকে দেখা মাত্রই তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। পিতা-পুত্রের

মিলন হলে ইবরাহীম (আঃ) বলেন ঃ 'হে ইসমাঈল! আমার প্রতি আল্লাহ তা'আলার একটি নির্দেশ হয়েছে।' তিনি বলেন ঃ 'যে নির্দেশ হয়েছে তা পালন করুন বাবা।' তিনি বলেন ঃ 'হে আমার প্রিয় পুত্র! তোমাকেও আমার সাথে থাকতে হবে।' তিনি আরয করেন ঃ 'আমি হাযির আছি বাবা!' তিনি বলেন ঃ 'এ স্থানে আল্লাহ তা'আলার একটি ঘর নির্মাণ করতে হবে।' তিনি বলেন ঃ 'খুব ভাল কথা, বাবা!, এরপর পিতা ও পুত্র মিলে বাইতুল্লাহর ভিত্তি স্থাপন করেন এবং উঁচু করতে আরম্ভ করেন। ইসমাঈল (আঃ) পাথর এনে দিতেন এবং ইবরাহীম (আঃ) তা দিয়ে দেয়াল গাঁথতে থাকেন। দেয়াল কিছুটা উঁচু হলে ইসমাঈল (আঃ) এই পাথরটি (অর্থাৎ মাকামে ইবরাহীমের পাথরটি) নিয়ে আসেন। ঐ উঁচু পাথরের উপর দাঁড়িয়ে ইবরাহীম (আঃ) কা'বা ঘরের পাথর গাঁথতেন এবং পিতা-পুত্র উভয়ে এই দু'আ করতেন ঃ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ হে রাব্ব! আপনি আমাদের এই খিদমাত কবূল করুন, আপনি শ্রবণকারী ও দর্শনকারী। (ফাতহুল বারী ৬/৪৫৬)

কা'বা ঘর নতুন করে নির্মাণ

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার (রহঃ) তার গ্রন্থে বর্ণনা করেন ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াতের পাঁচ বছর পূর্বে কুরাইশরা নতুনভাবে কা'বা ঘর নির্মাণ করেছিল। এই নির্মাণ কাজে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অংশ নিয়েছিলেন। যখন তাঁর বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ বছর, সেই সময় কুরাইশরা কা'বা ঘরকে নতুনভাবে নির্মাণ করার ইচ্ছা করে। কারণ ছিল এই যে, এর দেয়াল ছিল খুব ছোট এবং ছাদও ছিলনা। দ্বিতীয়তঃ, বাইতুল্লাহর ধনাগার চুরি হয়ে গিয়েছিল, যা ঐ ঘরের মধ্যে একটি গভীর গর্তে রক্ষিত ছিল। এই চোরাই মাল 'খাযায়েমা' গোত্রীয় বানী মালীহ্ ইব্ন আমরের ক্রীতদাস 'দুয়ায়েক' নামক ব্যক্তির নিকট পাওয়া গিয়েছিল। যা হোক, এই চুরির অপরাধে দুয়ায়েকের হাত কেটে দেয়া হয়। কিছু লোক দাবী করেন যে, যারা ঐ ধনভান্ডার চুরি করেছিল তারা তা 'দুয়ায়েক' এর কাছে রেখে গিয়েছিল।

তাছাড়া এই ঘর নির্মাণের ব্যাপারে তারা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা বিরাট সুযোগ লাভ করেছিল। তা এই যে, রোম রাজ্যের বণিকদের একটি নৌকা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে জিদ্দায় এসে নোঙ্গর করে। ঐ নৌকায় বহু মূল্যবান কাঠ বোঝাই করা ছিল। এই কাঠগুলি কা'বা ঘরের ছাদের কাজে লাগতে পারে

এই চিন্তা করে কুরাইশরা ঐ কাঠগুলি কিনে নেয় এবং কিবতী গোত্রের একজন ছুতারকে কা'বার ছাদ নির্মাণের দায়িত্ব অর্পণ করে।

সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'হে আয়িশা! যদি তোমার সম্প্রদায়ের অজ্ঞতার যুগ নিকটে না হত তাহলে আমি অবশ্যই কা'বার ধনাগারকে আল্লাহর পথে দান করে দিতাম, দরজাকে ভূমির সাথে লাগিয়ে দিতাম এবং 'হাতীম'কে বাইতুল্লাহর মধ্যে ভরে দিতাম।'

কা'বা ঘর নির্মাণের প্রস্তুতি চলছিল বটে, কিন্তু বাইতুল্লাহকে ভেঙ্গে দিতে তারা ভয় পাচ্ছিল। সর্বপ্রথম ইব্‌ন অহাব নামক এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে কা'বা ঘরের একটি পাথর নামিয়ে নেয়, কিন্তু পাথরটি তার হাত হতে উড়ে গিয়ে পুনরায় স্বস্থানে বসে যায়। সে সমস্ত কুরাইশকে সম্বোধন করে বলে ঃ 'শুনে রেখ! আল্লাহর ঘর নির্মাণ কাজে সবাই যেন নিজ নিজ উত্তম ও পবিত্র মালই খরচ করে। এতে ব্যভিচার দ্বারা উপার্জিত সম্পদ, সুদের টাকা এবং অত্যাচারের মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ কাজে লাগানো যাবেনা।' ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, এ পরামর্শ দিয়েছিল ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মাখযুম নামক ব্যক্তি। (ইব্‌ন হিশাম ১/২০৪) ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) এও উল্লেখ করেন যে, কুরাইশরা কা'বা ঘরকে পুনরায় নির্মাণ করার জন্য তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগল, তাদের এক এক গোত্র কা'বা ঘরের এক এক অংশ নির্মাণ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হল।

এরপর বাইতুল্লাহ নির্মাণের জন্য এর বিভিন্ন অংশ গোত্রসমূহের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয় ঠিকই, কিন্তু কা'বা ঘর ভাঙ্গার জন্য প্রথমে আঘাত করতে কেহই সাহস করছিলনা। অবশেষে ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা বলে ঃ 'আমিই আরম্ভ করছি।' এ বলে সে কোদাল নিয়ে উপরে উঠে যায় এবং বলে 'হে আল্লাহ! আপনি খুবই ভাল জানেন যে, আমাদের ইচ্ছা খারাপ নয়, আমরা আপনার ঘর ধ্বংস করতে চাইনা, বরং ওটিকে উন্নত করার চিন্তায়ই আছি।' এ কথা বলে সে দু'টি স্তম্ভের দু'ধারের কিছু অংশ ভেঙ্গে দেয়। অতঃপর কুরাইশরা বলে ঃ 'আপাততঃ এ কাজ রেখে দাও, রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করি। যদি এ ব্যক্তির উপর কোন শাস্তি নেমে আসে তাহলে তো এ পাথর ঐ স্থানেই রেখে দেয়া হবে এবং আমাদেরকে একাজ হতে বিরত থাকতে হবে। আর যদি কোন শাস্তি না আসে তাহলে বুঝে নিতে হবে যে, এটা ভেঙ্গে দেয়া আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টির কারণ নয়। সুতরাং আগামীকাল আমরা সবাই মিলে এ কাজ শুরু করব।' অতঃপর সকাল হয় এবং সবদিক দিয়েই মঙ্গল পরিলক্ষিত হয়। তখন সবাই এসে বাইতুল্লাহর পূর্ব ইমারত ভেঙ্গে দেয়।' অবশেষে তারা পূর্ব ভিত্তি অর্থাৎ ইবরাহীমের (আঃ) ভিত্তি পর্যন্ত

পৌঁছে যায়। এখানে সবুজ বর্ণের পাথর ছিল এবং যেন একটির সঙ্গে অপরটির সংযোগ ছিল। একটি লোক দু'টি পাথরকে পৃথক করার উদ্দেশে ওতে এত জোরে কোদাল চালায় যে, ওটি আন্দোলিত হওয়ার সাথে সাথে সমস্ত মাক্কা ভূমি আন্দোলিত হয়ে উঠে। তখন জনগণ বুঝতে পারে যে, পাথরগুলিকে পৃথক করে ওর স্থানে অন্য পাথর লাগানো আল্লাহ তা'আলার নিকট গৃহীত নয়। কাজেই ওটা তাদের শক্তির বাইরের কাজ। সুতরাং তারা ঐ কাজ থেকে বিরত থাকে এবং ঐ পাথরগুলিকে ঐভাবেই রেখে দেয়। (ইব্ন হিসাম ১/২০৭)

কালো পাথর স্থাপন করা নিয়ে বিরোধ

অবশেষে তারা 'হাজরে আসওয়াদ' রাখার স্থান পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এখন প্রত্যেক গোত্রই এই মর্যাদায় অংশ নিতে চায়। সুতরাং তারা পরস্পরে ঝগড়া বিবাদ করতে থাকে, এমনকি যুদ্ধ বাধার উপক্রম হয়। 'বানু আবদুদ্দার' এবং 'বানু আদী' রক্তপূর্ণ একটি পাত্রে হাত ডুবিয়ে শপথ করে বলে ঃ 'আমরা সবাই মারা যাব এটাও ভাল, তথাপি 'হাজরে আসওয়াদ' কেহকেও রাখতে দিবনা।' এভাবেই চার পাঁচ দিন কেটে যায়। অতঃপর কুরাইশরা পরস্পর পরামর্শের জন্য মাসজিদে একত্রিত হয়। আবূ উমাইয়া ইব্ন মুগীরা ছিল কুরাইশদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বয়স্ক ও জ্ঞানী ব্যক্তি। সে সকলকে সম্বোধন করে বলে, 'হে জনমণ্ডলী! তোমরা কোন একজনকে সালিশ নির্বাচিত কর এবং সে যা ফয়সালা করে তাই মেনে নাও। সালিশ নির্বাচনের ব্যাপারেও মতবিরোধ সৃষ্টি হতে পারে, সুতরাং তোমরা এক কাজ কর। আগামীকাল ফাজরে সর্বপ্রথম যে মাসজিদুল কা'বায় প্রবেশ করবে সেই আমাদের সালিশদার নির্বাচিত হবে।' এ প্রস্তাব সবাই সমর্থন করে। সর্বপ্রথম কে প্রবেশ করে এটি দেখার জন্য সবাই অপেক্ষমান থাকে।

পরদিন সর্বপ্রথম যিনি মাসজিদুল কা'বায় আগমন করেন তিনি হলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁকে দেখা মাত্রই এসব লোক খুশি হয়ে যায় এবং বলে ঃ 'তাঁর মধ্যস্থতা আমরা মেনে নিতে রাযী আছি। ইনি তো আমীন! ইনি তো মুহাম্মাদ! অতঃপর তারা সবাই তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে। তিনি বলেন ঃ 'আপনারা একটি বড় ও মোটা চাদর নিয়ে আসুন।' তারা তা নিয়ে আসে। তিনি 'হাজরে আসওয়াদ' উঠিয়ে এনে স্বহস্তে ঐ চাদরে রেখে দেন এবং বলেন ঃ 'প্রত্যেক গোত্রের নেতা এসে এই চাদরের কোণা ধরুন এবং এভাবেই আপনারা সবাই 'হাজরে আসওয়াদ' উঠানোর কাজে শরীক হয়ে যান।' এ কথা শুনে সমস্ত লোক আনন্দ প্রকাশ করে এবং সমস্ত গোত্রপ্রধানরা চাদরটি উত্তোলন করে। যখন ওটা রাখার স্থানে পৌঁছে

তখন আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওটি স্বহস্তে উঠিয়ে নিয়ে ওর স্থানে রেখে দেন। এভাবে সেই ঝগড়া-বিবাদ ও যুদ্ধ বিগ্রহ নিমিষেই মিটে যায়। আর এভাবেই মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে তাঁর ঘরে ঐ বারাকাতময় পাথরটি স্থাপন করিয়ে নেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ওয়াহী আসার পূর্বে কুরাইশরা তাঁকে 'আমীন' বলত। এরপর উপরের অংশ নির্মিত হয়। এভাবে মহান আল্লাহর ঘরের নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়।

রাসূলের (সাঃ) ইচ্ছা অনুযায়ী যুবাইর (রাঃ) কা'বা ঘর পুর্ননির্মাণ করেন

ঐতিহাসিক ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে কা'বা ঘর আঠারো হাত লম্বা ছিল। ইয়ামান দেশীয় 'কবা' পর্দা তার উপর চড়ান হত। পরে ওটির উপর চাদর আবৃত করা হয়। সর্বপ্রথম হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ তার উপর রেশমী পর্দা দ্বারা আবৃত করে। (ইব্ন হিশাম ১/২১১) কা'বা ঘরের ইমারত একই থাকে। আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইরের (রাঃ) খিলাফতের প্রাথমিক যুগে ষাট বছর পরে এখানে আগুন লেগে যায়। এর ফলে কা'বা ঘর পুড়ে যায়। এটা ছিল ইয়াযিদ ইব্ন মু'আবিয়ার রাজত্বের শেষ কাল এবং তখন ইব্ন যুবাইরকে (রাঃ) মাক্কায় অবরোধ করে রাখা হয়েছিল।

এই সময় মাক্কার খলীফা আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রাঃ) স্বীয় খালা আয়িশা সিদ্দিকার (রাঃ) নিকট যে হাদীসটি শুনেছিলেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনের কথা অনুযায়ী বাইতুল্লাহকে ভেঙ্গে ইবরাহীমের (আঃ) ভিত্তির উপর নির্মাণ করেন। 'হাতীম'কে ভিতরে নিয়ে নেন। পূর্ব ও পশ্চিমে দু'টি দরজা রাখেন। একটি ভিতরে আসার জন্য, অপরটি বেরিয়ে যাওয়ার জন্য। দরজা দু'টি মাটির সমান করে রাখেন। তাঁর শাসনামল পর্যন্ত কা'বা এরূপই থাকে। অবশেষে তিনি যালিম হাজ্জাজের হাতে শহীদ হন। তখন আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের নির্দেশক্রমে হাজ্জাজ কা'বা ঘরকে ভেঙ্গে পুনরায় পূর্বের মত করে নির্মাণ করে।

সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, 'আতা (রহঃ) বলেছেন ঃ ইয়াযিদ ইব্ন মু'আবিয়ার যুগে যখন সিরিয়াবাসী কা'বা ঘরের উপর আক্রমণ করে এবং যা হবার তা হয়ে যায়, সেই সময় আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রাঃ) বাইতুল্লাহকে এরূপ অবস্থাতেই রেখে দেন যেন হাজ্জের মৌসুমে জনগণ একত্রিত হয়ে সব কিছু

স্বচক্ষে দেখে। এরপরে আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রাঃ) জনগণের সঙ্গে পরামর্শ করেন এবং জানতে চান ঃ কা'বা ঘরকে সম্পূর্ণ ভেঙ্গে কি নতুনভাবে নির্মাণ করব, না কি ভাঙ্গা যা আছে তাকেই মেরামত করব? ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ 'এ বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাই, আপনি কা'বাঘরকে সেইভাবে পুর্ননির্মাণ করুন, মাক্কার লোকেরা মুসলিম হতে শুরু করার সময় কা'বাঘর যে অবস্থায় ছিল। কা'বাঘরের পাথরটিও ঐ অবস্থায় রেখে দিন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াতের সময় ওটা যে অবস্থায় ছিল এবং লোকেরা ইসলামে দীক্ষিত হচ্ছিল।' আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রাঃ) বলেন ঃ আপনাদের কারও ঘর যদি আগুনে পুড়ে যায় তাহলে নিশ্চয়ই সে উহা পুর্ননির্মাণ না করা পর্যন্ত সন্তুষ্ট থাকবেননা। তাহলে মহাসম্মানিত প্রভুর ঘর সম্পর্কে এরূপ মত পেশ করেন কেন? আচ্ছা তিন দিন পর্যন্ত আমি ইস্তেখারা (লক্ষণ দেখে শুভ বিচার) করব, তার পরে যা বুঝব তাই করব।' তিন দিন পরে তাঁর মত এই হল যে, অবশিষ্ট দেয়ালও ভেঙ্গে দেয়া হবে এবং সম্পূর্ণ নতুনভাবে নির্মাণ করা হবে। সুতরাং তিনি এই নির্দেশ দিয়ে দেন।

কিন্তু কা'বা ঘর ভাঙ্গতে কেহই সাহস করছিলনা। তারা ভয় করছিল যে, যে ব্যক্তি ভাঙ্গার জন্য অগ্রসর হবে তার উপর আল্লাহর শাস্তি অবতীর্ণ হবে। কিন্তু একজন সাহসী ব্যক্তি উপরে উঠে একটি পাথর ভেঙ্গে দেন। অন্যরা যখন দেখে যে, তার কোন ক্ষতি হলনা তখন তারা সবাই ভাঙ্গতে আরম্ভ করে এবং ভূমি পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করে দেয়। সে সময় আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রাঃ) চারদিকে স্তম্ভ দাঁড় করিয়ে দেন এবং ওর উপর পর্দা করে দেন। এবারে বাইতুল্লাহ নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয়। আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রাঃ) বলেন, 'আয়িশার (রাঃ) নিকট হতে আমি শুনেছি, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যদি লোকদের কুফরীর সময়টা নিকটে না হত এবং আমার নিকট নির্মাণের খরচ থাকত তাহলে আমি 'হাতীম' থেকে পাঁচ হাত পর্যন্ত বাইতুল্লাহর মধ্যে নিয়ে নিতাম এবং কা'বার দু'টি দরজা করতাম, একটা আসার দরজা এবং অপরটি বের হওয়ার দরজা।' আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রাঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন ঃ 'এখন আর জনগণের কুফরীর যুগ নিকটে নেই, তাদের ব্যাপারে ভয় দূর হয়ে গেছে এবং কোষাগারও পূর্ণ রয়েছে, আমার নিকট যথেষ্ট অর্থ রয়েছে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনোবাসনা পূর্ণ না করার

আমার আর কোন কারণ থাকতে পারেনা।’ সুতরাং তিনি পাঁচ হাত ‘হাতীম’ ভিতরে নিয়ে নেন। তখন ইবরাহীমের (আঃ) ভিত্তি প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং জনসাধারণ তা স্বচক্ষে দেখে নেয়। এরই উপর দেয়াল গাঁথা হয়। বাইতুল্লাহর দৈর্ঘ্য ছিল আঠারো হাত। তিনি মনে করেছিলেন যে, কা’বা ঘরটি খুবই ছোট, তাই তিনি কা’বার সম্মুখভাগ আরও দশ ফুট প্রশস্ত করেন এবং দু’টি দরজার ব্যবস্থা করেন। একটি ছিল প্রবেশ পথ এবং অপরটি বের হওয়ার পথ।

আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইরের (রাঃ) শাহাদাতের পর আবদুল মালিকের নিকট পত্র লিখে হাজ্জাজ তাঁর পরামর্শ চায় যে, এখন কি করা যায়? এটাও লিখে পাঠায় যে, ঠিক ইবরাহীমের (আঃ) ভিত্তির উপর যে কা’বা নির্মিত হয়েছে এটা মাক্কার সুবিচারকগণ স্বচক্ষে দেখেছেন।’ কিন্তু আবদুল মালিক উত্তর দেন ঃ ‘আমরা যুবাইরের (রাঃ) কাজটির সাথে একমত পোষণ করছিনা। দৈর্ঘ্য ঠিক রাখ, কিন্তু ‘হাতীম’কে কা‘বা ঘরের বাইরে রেখে দাও এবং দ্বিতীয় দরজাটি বন্ধ করে দাও।’ হাজ্জাজ আবদুল মালিকের এই নির্দেশক্রমে কা’বাকে ভেঙ্গে দিয়ে পূর্বের ভিত্তির উপরে নির্মাণ করে। (মুসলিম ২/৯৭০) ইমাম নাসাঈ (রহঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে হাদীসটি আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন সেখানে ঘটনাটির পূর্ণ বিবরণ দেয়া হয়নি। (হাদীস নং ৫/২১৮)

কিন্তু আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইরের (রাঃ) ভিত্তিকে ঠিক রাখাই সুন্নাতের পন্থা ছিল। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাসনাতো এই ছিল। কিন্তু সেই সময় তাঁর এই ভয় ছিল যে, মানুষ হয়ত খারাপ ধারণা করবে। কারণ তারা সবেমাত্র মুসলিম হয়েছে। কিন্তু আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান এ হাদীসটি জানতেননা। এ জন্যই তিনি ওটা ভাঙ্গিয়ে ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি হাদীসটি জানতে পারেন তখন তিনি দুঃখ করে বলেন ঃ ‘হায়! আমি যদি ওটিকে না ভেঙ্গে পূর্বাবস্থায়ই রেখে দিতাম!’

সহীহ মুসলিমের একটি হাদীসে রয়েছে যে, হারিস ইব্ন উবাইদুল্লাহ (রাঃ) যখন আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের খিলাফাতকালে তাঁর নিকট প্রতিনিধি রূপে গমন করেন তখন আবদুল মালিক তাঁকে বলেন ঃ ‘আমি ধারণা করি যে, আবূ হাবীব অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রাঃ) এ হাদীসটি (তাঁর খালা) আয়িশা (রাঃ) হতে শুনেননি।’ তখন হারিস ইব্ন উবাইদুল্লাহ (রাঃ) বলেন ঃ ‘অবশ্যই তিনি শুনেছেন।’ আয়িশা (রাঃ) হতে স্বয়ং আমিও শুনেছি।’ আবদুল মালিক তাঁকে জিজ্ঞেস করেন ঃ ‘কি শুনেছেন?’ তিনি বলেন ঃ ‘আমি শুনেছি, তিনি বলতেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ

'হে আয়িশা! তোমার 'কাওম' বাইতুল্লাহকে সংকীর্ণ করে দিয়েছে। যদি তোমার সম্প্রদায়ের শির্কের যুগ নিকটে না হত তাহলে নতুনভাবে আমি এর কমতি পূরণ করতাম। এসো, আমি তোমাকে এর প্রকৃত ভিত্তি দেখিয়ে দেই, হয়ত তোমার গোত্র আবার একে এর প্রকৃত ভিত্তির উপর নির্মাণ করতে পারে। অতঃপর তিনি আয়িশা সিদ্দিকাকে (রাঃ) প্রায় সাত হাত দেখিয়ে দেন এবং বলেন ঃ

'আমি এর দু'টি দরজা নির্মাণ করতাম, একটি আগমনের ও অপরটি প্রস্থানের; এবং দরজা দু'টি মাটির সমান করে রাখতাম। একটি রাখতাম পূর্বমুখী এবং অপরটি রাখতাম পশ্চিমমুখী। তুমি কি জান যে, তোমার 'কাওম' দরজাকে এত উঁচু করে রেখেছে কেন?' আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ 'না।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'শুধুমাত্র নিজেদের মর্যাদা প্রকাশের জন্য; যাকে চাবে প্রবেশ করতে দিবে এবং যাকে চাবেনা প্রবেশ করতে দিবেনা। যখন লোক ভিতরে যেতে চাইত তখন তারা তাকে উপর হতে ধাক্কা দিত, ফলে সে পড়ে যেত। আর যাকে তারা প্রবেশ করানোর ইচ্ছা করত তাকে হাত ধরে ভিতরে নিয়ে যেত।' আবদুল মালিক তখন বলেন ঃ 'হে হারিস! আপনি কি স্বয়ং এই হাদীসটি আয়িশা (রাঃ) হতে শুনেছেন?' তিনি বলেন ঃ 'হ্যাঁ' আমি স্বয়ং শুনেছি।' তখন আবদুল মালিক কিছুক্ষণ ধরে লাঠির উপর ভর দিয়ে চিন্তা করেন। অতঃপর বলেন ঃ 'যদি আমি এটি ঐ রকমই রেখে দিতাম! (মুসলিম ২/৯৭১)

কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে এক ইথিওপীয় দ্বারা কা'বা ঘর ধ্বংস হবে

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

কা'বাকে দু'টি ছোট পা (পায়ের গোছা) বিশিষ্ট একজন হাবশী ধ্বংস করবে।' (ফাতহুল বারী ৩/৫৩৮, মুসলিম ৪/২২৩২) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'আমি যেন তাকে দেখতে পাচ্ছি, সেই কৃষ্ণবর্ণের (হাবশী) এক একটি পাথরকে পৃথক পৃথক করে দিবে, ওর আবরণ নিয়ে যাবে এবং ওর অর্থ সম্পদও ছিনিয়ে নিবে। সে বাঁকা হাত-পা বিশিষ্ট ও টেকো মাথাওয়ালা হবে। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি যে, সে কোদাল মেরে মেরে টুক্রো টুকরো করতে রয়েছে।' (ফাতহুল বারী ৩/৫৩৮, আহমাদ ২/২২০) খুব সম্ভব এই দুঃখজনক ঘটনা ইয়াজুজ-মাজুজ বের হওয়ার পরে ঘটবে। সহীহ বুখারীতে একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘ইয়াজুজ-মাজুজ বের হওয়ার পরও তোমরা বাইতুল্লাহয় হাজ্জ ও উমরাহ করবে।’ (ফাতহুল বারী ৩/৫৩১)

ইবরাহীমের (আঃ) প্রার্থনা

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ইবরাহীম ও ইসমাঈল প্রার্থনা করেন ঃ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ *হে আমাদের রাব্ব! আমাদের উভয়কে আপনার অনুগত করুন, এবং আমাদের বংশধরদের মধ্য হতেও আপনার অনুগত এক দল লোক সৃষ্টি করুন, আর আমাদেরকে হাজ্জের আহ্কাম বলে দিন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন, নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল, করুণাময়।*

ইবরাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ) যে দু‘আ করেছিলেন ওর অনুরূপ দু‘আ আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে করতে শিখিয়েছেন ঃ

وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَٰجِنَا وَذُرِّيَّـٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

আর যারা প্রার্থনা করে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান করুন যারা আমাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য আদর্শ স্বরূপ করুন। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৭৪) এটাও আল্লাহ তা‘আলার প্রেমের দলীল যে, মানুষ কামনা করবে তার মৃত্যুর পরে তার সন্তানরাও যেন আল্লাহ তা‘আলার ইবাদাতে লিপ্ত থাকে। অন্য জায়গায় প্রার্থনার শব্দ রয়েছে ঃ

وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ

আমাকে ও আমার পুত্রদেরকে মূর্তি পূজা হতে দূরে রাখুন। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৩৫) রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

‘আদম সন্তান মারা যাওয়া মাত্র তার কার্যাবলী শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি কাজ অবশিষ্ট থাকে। (১) সাদাকাহ, (২) ইল্ম, যদ্বারা উপকার লাভ করা হয়, (৩) সৎ সন্তান, যারা প্রার্থনা করে।’ (মুসলিম ৩/১২৫৫)

‘মানাসিক’ কী

সাঈদ ইব্ন মানসুর (রহঃ) বলেন যে, আত্তাব ইব্ন বাশির (রহঃ) আমাদেরকে খাসিব (রহঃ) হতে, তিনি মুজাহিদ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম (আঃ) দু‘আয় বলেছিলেন ‘ওয়া আরিনা মানাসিকানা’ অর্থাৎ আমাদেরকে হাজ্জের নিয়ম-কানূন শিখিয়ে দিন। কা’বা ঘরের ইমারাত পূর্ণ হওয়ার পর জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে নিয়ে ‘সাফা’ পর্বতে আসেন, অতঃপর মারওয়া পর্বতে যান এবং বলেন যে, এগুলিই হচ্ছে আল্লাহর স্মৃতি নিদর্শন। অতঃপর তাঁকে মিনার দিকে নিয়ে যান। ‘আকাবাহ’র উপরে একটি গাছের পাশে শাইতানকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিবরাঈল (আঃ) ইবরাহীমকে (আঃ) বলেন ঃ ‘তাকবীর’ পাঠ করে তার উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করুন।’ ইবলিস ওখান হতে পালিয়ে গিয়ে ‘জামরা-ই-আকাবাহ’র পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। ওখানেও তিনি তাকে পাথর মারেন। অতঃপর কলুষ শাইতান নিরাশ হয়ে চলে যায়। হাজ্জের আহকামের মধ্যে সে কিছু গোলমাল সৃষ্টি করতে চেয়েছিল, কিন্তু সুযোগ পেলনা এবং সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে গেল। ওখান থেকে জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে ‘মাশ‘আরে হারাম’ নিয়ে যান। অতঃপর আরাফাহ মাইদানে পৌঁছে দেন। অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে তিনবার জিজ্ঞেস করেন ঃ ‘বলুন, বুঝেছেন?’ তিনি বললেন ঃ ‘হ্যাঁ’। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৩৮৭) অন্য বর্ণনায় শাইতানকে তিন জায়গায় পাথর মারার কথা বর্ণিত আছে। প্রত্যেক হাজী শাইতানকে সাতটি করে পাথর মারেন।

১২৯। হে আমাদের রাব্ব! সেই দলে তাদেরই মধ্য হতে এমন একজন রাসূল প্রেরণ করুন যিনি তাদেরকে আপনার নিদর্শনাবলী পাঠ করে শোনাবেন এবং তাদেরকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান শিক্ষা দান করবেন ও তাদেরকে পবিত্র করবেন। নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রান্ত, বিজ্ঞানময়।	١٢٩. رَبَّنَا وَٱبۡعَثۡ فِيهِمۡ رَسُولاً مِّنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَـٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَـٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَيُزَكِّيهِمۡ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ

সর্বশেষ নাবীর ব্যাপারে ইবরাহীমের (আঃ) প্রার্থনা

'হারাম' এলাকাবাসীর জন্য এটা আর একটি দু'আ যে তাঁর সন্তানদের মধ্য হতেই যেন একজন নাবী তাদের মধ্যে আগমন করেন। এ প্রার্থনাও গৃহীত হয়। মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমি তখন থেকেই শেষ নাবী যখন আদম (আঃ) মাটির আকারে ছিলেন। আমি তোমাদেরকে আমার প্রাথমিক কথার সংবাদ দিচ্ছি। আমি আমার পিতা ইবরাহীমের (আঃ) প্রার্থনা, ঈসার (আঃ) সুসংবাদ এবং আমার মায়ের স্বপ্ন।' নাবীগণের মায়েরা এরকমই স্বপ্ন দেখে থাকেন। আবূ উমামা (রাঃ) একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার নাবুওয়াতের সূচনা কিরূপে হয়?' তিনি বললেন ঃ

'আমার পিতা ইবরাহীমের (আঃ) প্রার্থনা, আমার সম্বন্ধে ঈসার (আঃ) সুসংবাদ দান। (আস সাহীফা ১৫৪৬ ও ১৯২৫) তিনি আরও বলেছেন ঃ আমার মা স্বপ্নে দেখেন যে, তার মধ্য হতে যেন একটি আলো বেরিয়ে সিরিয়ার প্রাসাদগুলিকে আলোকিত করে দিল এবং তা দৃষ্টিগোচর হতে থাকল।' (আহমাদ ৫/২৬২) তাঁর মায়ের এ স্বপ্নের কথাও পূর্ব হতেই আরাবে ছড়িয়ে ছিল। তারা বলত যে, আমেনার গর্ভে কোন একজন মহান ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করবেন। বানী ইসরাঈলের শেষ নাবী ঈসা রুহুল্লাহ (আঃ) বানী ইসরাঈলের মধ্যে খুৎবা দেয়ার সময় পরিষ্কারভাবে তাঁর নামও বলে দিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন ঃ

إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنۢ بَعْدِي ٱسْمُهُۥٓ أَحْمَدُ

আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল এবং আমার পূর্ব হতে তোমাদের নিকট যে তাওরাত রয়েছে আমি উহার সমর্থক এবং আমার পরে আহমাদ নামে যে রাসূল আসবেন আমি তাঁর সুসংবাদ দাতা। (সূরা সাফফ, ৬১ ঃ ৬) স্বপ্নের মধ্যে নূর দ্বারা সিরিয়ার প্রাসাদগুলি আলোকোজ্জ্বল হওয়া ঐ কথার দিকে ইঙ্গিত করছে যে, সেখানে দীন ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে। বরং বর্ণনাসমূহ দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, শেষ যামানায় সিরিয়া ইসলাম ও মুসলিমদের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হবে। সিরিয়ার প্রসিদ্ধ শহর দামেশকেই ঈসা (আঃ) 'মিনারের' উপর অবতীর্ণ হবেন। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'আমার উম্মাতের একটি দল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তাদের বিরুদ্ধবাদীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। অবশেষে আল্লাহ তা'আলার হুকুম এসে যাবে। (ফাতহুল বারী ৬/৭৩১, মুসলিম ২/১৫২৪) সহীহ বুখারীতে 'ওটা সিরিয়ায় হবে' এতটুকু বেশি আছে।

'কিতাব ওয়াল হিকমাহ' এর অর্থ

'কিতাব' এর অর্থ হচ্ছে 'কুরআন' এবং 'হিকমাত' এর ভাবার্থ হচ্ছে 'সুন্নাহ'। হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) এবং আবূ মালিক (রহঃ) প্রমুখও এ কথাই বলেছেন। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৩৯০) 'হিকমাত' দ্বারা ধর্ম বোধও বুঝানো হয়েছে। 'পবিত্র করা' অর্থাৎ আনুগত্য ও আন্তরিকতা শিক্ষা দেয়া, ভাল কাজ করানো, মন্দ কাজ হতে বিরত রাখা, আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করে তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করা, অবাধ্যতা হতে বিরত থেকে তাঁর অসন্তুষ্টি হতে বেঁচে থাকা। আল্লাহ 'আযীয' অর্থাৎ যাঁকে কোন জিনিস অসামর্থ্য করতে পারেনা, যিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর বিজয়ী। তিনি 'হাকিম' অর্থাৎ তাঁর কোন কথা ও কাজ বিজ্ঞান এবং নৈপুণ্য হতে শূন্য নয়। তিনি প্রত্যেক জিনিসকেই তার আপন স্থানে জ্ঞান, ইনসাফ ও ইল্মের সঙ্গে রেখেছেন।

১৩০। এবং যে নিজকে নির্বোধ করে তুলেছে সে ব্যতীত কে ইবরাহীমের ধর্ম হতে বিমুখ হবে? এবং নিশ্চয়ই আমি তাকে এই পৃথিবীতে মনোনীত করেছিলাম, নিশ্চয়ই সে সৎ কর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।	١٣٠. وَمَن يَرۡغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبۡرَٰهِـۧمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفۡسَهُۥۚ وَلَقَدِ ٱصۡطَفَيۡنَٰهُ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَإِنَّهُۥ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ
১৩১। যখন তার রাব্ব তাকে বলেছিলেন ঃ তুমি আনুগত্য স্বীকার কর; সে বলেছিল - আমি বিশ্বজগতের রবের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম।	ۖ ١٣١. إِذۡ قَالَ لَهُۥ رَبُّهُۥٓ أَسۡلِمۡ قَالَ أَسۡلَمۡتُ لِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ

১৩২। আর ইবরাহীম ও ইয়াকুব স্বীয় সন্তানদেরকে সদুপদেশ প্রদান করেছিল ঃ হে আমার বংশধরগণ! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য এই ধর্ম মনোনীত করেছেন, অতএব তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যু বরণ করনা।	١٣٢. وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبْرَٰهِـۧمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَـٰبَنِىَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

নির্বোধরাই ইবরাহীমের (আঃ) সরল পথ থেকে বিচ্যুত

এই আয়াতসমূহেও মুশরিকদের দাবী খণ্ডন করা হয়েছে। তারা নিজেদেরকে ইবরাহীমের (আঃ) ধর্মের অনুসারী বলে দাবী করত, অথচ তারা পূর্ণ মুশরিক ছিল। আর ইবরাহীম (আঃ) তো একাত্মবাদীদের ইমাম ছিলেন। তিনি তাওহীদকে শির্ক হতে পৃথককারী ছিলেন। সারা জীবনে চোখের পলক পরিমাণও আল্লাহ তা'আলার সাথে কেহকেও শরীক করেননি। বরং তিনি প্রত্যেক অংশীবাদীকে প্রত্যেক প্রকারের শির্ককে এবং কৃত্রিম মা'বূদকে অন্তরের সাথে ঘৃণা করতেন এবং তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। এ কারণেই তিনি স্বীয় সম্প্রদায় হতে পৃথক হয়ে যান, স্বদেশ ত্যাগ করেন, এমন কি পিতার বিরুদ্ধাচরণ করতেও দ্বিধাবোধ করেননি। তিনি পরিষ্কারভাবে বলে দেন ঃ

يَـٰقَوْمِ إِنِّى بَرِىٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. إِنِّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا ۖ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের শির্কের সাথে আমার আদৌ কোন সম্পর্ক নেই, আমি মুক্ত। আমার মুখমন্ডলকে আমি একনিষ্ঠভাবে সেই মহান সত্ত্বার দিকে ফিরাচ্ছি যিনি নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টি করেছেন, আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৭৮-৭৯) অন্যত্র ইবরাহীম (আঃ) স্পষ্ট ভাষায় তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন ঃ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦٓ إِنَّنِى بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِى فَإِنَّهُۥ سَيَهْدِينِ

স্মরণ কর, ইবরাহীম তার পিতা এবং সম্প্রদায়কে বলেছিল ঃ তোমরা যাদের পূজা কর তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক আছে শুধু তাঁরই সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাকে সৎ পথে পরিচালিত করবেন। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ২৬-২৭) অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥٓ أَنَّهُۥ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ لَأَوَّٰهٌ حَلِيمٌ

আর ইবরাহীমের নিজ পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা তো শুধু সেই ওয়াদার কারণে ছিল, যে ওয়াদা সে তার সাথে করেছিল। অতঃপর যখন তার নিকট এ বিষয় প্রকাশ পেল যে, সে (পিতা) আল্লাহর দুশমন, তখন সে তা হতে সম্পূর্ণ রূপে নির্লিপ্ত হয়ে গেল। বাস্তবিকই ইবরাহীম ছিল অতিশয় কোমল হৃদয়, সহনশীল। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১১৪) অন্যত্র রয়েছে ঃ

إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ. شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ ۚ ٱجْتَبَىٰهُ وَهَدَىٰهُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ. وَءَاتَيْنَٰهُ فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَإِنَّهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ

নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিল এক উম্মাত আল্লাহর অনুগত, একনিষ্ঠ এবং সে ছিলনা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত। সে ছিল আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ; আল্লাহ তাকে মনোনীত করেছিলেন এবং তাকে পরিচালিত করেছিলেন সরল পথে। আমি তাকে দুনিয়ায় দিয়েছিলাম মঙ্গল এবং আখিরাতেও নিশ্চয়ই সে সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১২০-১২২) এই আয়াতসমূহের ন্যায় এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, নিজেদের জীবনের উপর অত্যাচারকারী ও পথভ্রষ্ট ব্যক্তিরাই শুধু ইবরাহীমের (আঃ) ধর্মকে ত্যাগ করে থাকে। কেননা ইবরাহীমকে (আঃ) আল্লাহ তা'আলা হিদায়াতের জন্য মনোনীত করেছিলেন। এবং বাল্যকাল হতেই তাঁকে সত্য অনুধাবনের তাওফীক দান করেছিলেন। 'খালীল' এর ন্যায় সম্মানিত উপাধি একমাত্র তাঁকেই দান করেছিলেন। আখিরাতেও তিনি ভাগ্যবান লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। তাঁর পথ ও ধর্মকে ছেড়ে যারা ভ্রান্ত পথ ধারণ করে, তাদের মত নির্বোধ ও অত্যাচারী আর কে হতে পারে? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ *স্মরণ কর, যখন লুকমান উপদেশাচ্ছলে তার পুত্রকে বলেছিল ঃ হে বৎস! আল্লাহর সাথে কোন শরীক করনা। নিশ্চয়ই শির্ক চরম যুল্ম।*

إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

নিশ্চয়ই শির্ক চরম যুল্ম। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ১৩) আবুল আলিয়া (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াতে ইয়াহুদীদের দাবীকেও খণ্ডন করা হয়েছে যারা দীনের মধ্যে বিদ'আত সৃষ্টি করেছে এবং মিল্লাতে ইবরাহীম থেকে দূরে সরে গেছে। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৩৯২) যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

مَا كَانَ إِبْرَٰهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ. إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَٰهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا ٱلنَّبِىُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ وَلِىُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ

ইবরাহীম ইয়াহুদী ছিলনা এবং খৃষ্টানও ছিলনা, বরং সে সুদৃঢ় মুসলিম ছিল এবং সে মুশরিকদের (অংশীবাদী) অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। নিঃসন্দেহে ঐ সব লোক ইবরাহীমের নিকটতম যারা তার অনুসরণ করেছে এবং এই নাবী এবং (তাঁর সাথের) মু'মিনগণ; এবং আল্লাহ বিশ্বাসীগণের অভিভাবক। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৬৭-৬৮) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ *যখন তার প্রভু তাকে বলেছিলেন, আত্মসমর্পন কর, তখন সে বলেছিল আমি বিশ্ব জগতের রবের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম।* এই একাত্মবাদের মিল্লাতের উপদেশই ইবরাহীম (আঃ) ইয়াকূব (আঃ) তাদের সন্তানগণকে দিয়েছিল।' ইসলামের প্রতি তাঁদের প্রেম ও ভালবাসা কত বেশি ছিল যে, তাঁরা নিজেরা সারা জীবন তার উপর অটল ছিলেন এবং তাদের সন্তানদেরকেও তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার উপদেশ দিয়েছেন। অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَجَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً فِى عَقِبِهِۦ

এই ঘোষণাকে সে স্থায়ী বাণী রূপে রেখে গেছে তার পরবর্তীদের জন্য। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ২৮) কোন কোন মনীষী (وَيَعْقُوْبُ) এ রকমও পড়েছেন। তখন ওটার সংযোগ হবে بَنِيْه এর সঙ্গে। বলা হয় ঃ 'ইবরাহীম (আঃ) তার সন্তানদেরকে এবং সন্তানদের সন্তান ইয়াকূবকে (আঃ) ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার উপদেশ দিয়েছিলেন।' কুশাইরী (রহঃ) বলেন যে, ইয়াকূব (আঃ)

ইবরাহীমের (আঃ) মৃত্যুর পর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এ দাবী ভিত্তিহীন, এর উপর কোন বিশুদ্ধ দলীল নেই। বরং স্পষ্টতঃ জানা যাচ্ছে যে, ইবরাহীমের (আঃ) জীবদ্দশায়ই ইয়াকূব (আঃ) ইসহাকের (আঃ) ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। কেননা কুরআনুল হাকীমের আয়াতে রয়েছে ঃ

قَآبِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَـٰهَا بِإِسْحَـٰقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَـٰقَ يَعْقُوبَ

তখন আমি তাকে (ইবরাহীমের স্ত্রীকে) সুসংবাদ দিলাম ইসহাকের এবং ইসহাকের পর ইয়াকূবের। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৭১) তাহলে যদি ইয়াকূব (আঃ) ইবরাহীমের (আঃ) জীবদ্দশায় বিদ্যমান না থাকতেন তাহলে তাঁর নাম নেয়ার কোন প্রয়োজন থাকতনা। সূরা 'আনকাবূতেও রয়েছে ঃ

وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِى ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَـٰبَ

আমি ইবরাহীমকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকূব এবং তার বংশধরদের জন্য স্থির করলাম নাবুওয়াত ও কিতাব। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ২৭) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً

এবং আমি ইবরাহীমকে দান করেছিলাম ইসহাক এবং পুরস্কার স্বরূপ ইয়াকূব। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৭২) এই সব আয়াত দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, ইয়াকুব (আঃ) ইবরাহীমের (আঃ) জীবদ্দশায় বিদ্যমান ছিলেন।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবূ যার (রাঃ) হতে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন ঃ 'আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কোন মাসজিদটি সর্বপ্রথম নির্মিত হয়?' তিনি বলেন ঃ 'মাসজিদুল হারাম।' আমি বলি, 'তার পরে কোনটি?' তিনি বলেন ঃ 'বাইতুল মুকাদ্দাস।' আমি বলি, 'এ দু'টির মধ্যে সময়ের ব্যবধান কত?' তিনি বলেন ঃ 'চল্লিশ বছর।' (ফাতহুল বারী ৬/৪৬৯, মুসলিম ১/৩৭০)

বর্ণিত আছে যে, সুলাইমান (আঃ) ছিলেন বাইতুল মুকাদ্দাসের মেরামতকারী, তিনি ওর নির্মাতা ছিলেননা। এ রকমই ইয়াকূব (আঃ) উপদেশ দিয়েছিলেন, যেমন অতিসত্বরই এর আলোচনা আসছে।

আমৃত্যু তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে

এরপর বলা হয়েছে ঃ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ নাবীগণেরও (আঃ) অসিয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে এই ঃ 'তোমরা তোমাদের জীবদ্দশায় সৎ কর্মশীল হও এবং ওর উপরেই প্রতিষ্ঠিত থাক, যেন মৃত্যুও ওর উপরেই হয়।' সাধারণতঃ সে ইহলৌকিক জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং তার মৃত্যুও ওর উপরই হয়ে থাকে, এবং যার উপরে মৃত্যুবরণ করে ওর উপরেই কিয়ামাতের দিন তার উত্থান হবে। মহান আল্লাহর বিধান এই যে, যে ব্যক্তি ভাল কাজের ইচ্ছা পোষণ করে, তিনি তাকে সেই কাজের তাওফীক প্রদান করেন এবং ঐ কাজ তার জন্য সহজ করে দেয়া হয় ও তাকে ওরই উপর অটল রাখা হয়। আবার কেহ কেহ জাহান্নামের কাজ করতে করতে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, তার এবং জাহান্নামের মাঝে এক হাত কিংবা তারচেয়েও কম দূরত্ব থাকে। অতঃপর তার ভাগ্য তার উপর বিজয় লাভ করে। ফলে সে জান্নাতের কাজ করতে থাকে এবং অবশেষে জান্নাতে প্রবেশ করে। (ফাতহুল বারী ৬/১০৫) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ. وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ. فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْيُسْرَىٰ. وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ. وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ. فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْعُسْرَىٰ

সুতরাং কেহ দান করলে, সংযত হলে এবং সদ্বিষয়কে সত্যজ্ঞান করলে অচিরেই আমি তার জন্য সুগম করে দিব সহজ পথ। পক্ষান্তরে কেহ কার্পন্য করলে ও নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে, আর যা উত্তম তা অস্বীকার করলে অচিরেই তার জন্য আমি সুগম করে দিব কঠোর পরিণামের পথ। (সূরা লাইল, ৯২ ঃ ৫-১০)

১৩৩। যখন ইয়াকূবের মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন কি তোমরা উপস্থিত ছিলে, যখন সে নিজ পুত্রদেরকে বলেছিল ঃ আমার পরে তোমরা কোন্ জিনিসের ইবাদাত করবে? তারা	١٣٣. أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنۢ بَعْدِى

বলেছিল ঃ আমরা তোমার উপাস্যের এবং তোমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্য - সেই অদ্বিতীয় উপাস্যের ইবাদাত করব, এবং আমরা তাঁরই অনুগত থাকব।	قَالُواْ نَعۡبُدُ إِلَـٰهَكَ وَإِلَـٰهَ ءَابَآئِكَ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَـٰعِيلَ وَإِسۡحَـٰقَ إِلَـٰهًا وَٰحِدًا وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ
১৩৪। ওটি একটি দল ছিল, যা অতীত হয়ে গেছে; তারা যা অর্জন করেছিল তা তাদের জন্য এবং তোমরা যা অর্জন করেছ তা তোমাদের জন্য এবং তারা যা করে গেছে তজ্জন্য তোমরা জিজ্ঞাসিত হবেনা।	١٣٤. تِلۡكَ أُمَّةٌ قَدۡ خَلَتۡ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَلَكُم مَّا كَسَبۡتُمۡ ۖ وَلَا تُسۡـَٔلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ

ইয়াকূবের (আঃ) মৃত্যুর সময় নাসীহাত

আরাবের মুশরিকরা ছিল ইসমাঈলের (আঃ) বংশধর এবং বানী ইসরাঈলেরা কাফির ছিল এবং তারা ছিল ইয়াকূবের (আঃ) বংশধর। তাদের উপর প্রমাণ উপস্থিত করে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, ইয়াকূব (আঃ) অন্তিমকালে স্বীয় সন্তান-গণকে বলেছিলেন ঃ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَـــهَكَ وَإِلَـــهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ 'আমার পরে তোমরা কার 'ইবাদাত করবে?'

তারা সবাই উত্তরে বলেছিল ঃ 'আপনার ও আপনার মুরুব্বীগণের যিনি সত্য উপাস্য অর্থাৎ আল্লাহ, আমরা তাঁরই ইবাদাত করব।' ইয়াকূব (আঃ) ছিলেন ইসহাকের (আঃ) পুত্র এবং ইসহাক (আঃ) ছিলেন ইবরাহীমের (আঃ) পুত্র। ইসমাঈলের (আঃ) নাম বাপ দাদার আলোচনায় বহুল প্রচলন হিসাবে এসে গেছে। তিনি হচ্ছেন ইয়াকূবের (আঃ) চাচা। আরাবে এটা প্রচলিত আছে যে, তারা চাচাকে বাপ বলে থাকে। (কুরতুবী ২/১৩৮) এই আয়াতটিকে প্রমাণ রূপে দাঁড় করে দাদাকেও পিতার হুকুমে রেখে দাদার বিদ্যমানতায় মৃত ব্যক্তির ভ্রাতা

ও ভগ্নিকে উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত করা হয়েছে। আবূ বাকর সিদ্দীকীর (রাঃ) ফাইসালা এটাই। যেমন সহীহ বুখারীতে বিদ্যমান রয়েছে। (ফাতহুল বারী ১২/১৯) উম্মুল মু'মিনীন আয়িশার (রাঃ) মতামত এটাই। হাসান বাসরী (রহঃ), তাউস (রহঃ) এবং 'আতাও (রহঃ) এটাই'ই বলেন। উমার (রাঃ), উসমান (রাঃ), আলী (রাঃ), ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ), যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রাঃ) এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী একটি দলেরও একই অভিমত।

এ জিজ্ঞাস্য বিষয়কে পরিষ্কার করার জায়গা এটা নয় এবং তাফসীরের এটা আলোচ্য বিষয়ও নয়। ঐ সব ছেলেরা স্বীকার করে যে তারা একই উপাস্যের উপাসনা করবে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে অন্য কেহকেও শরীক করবেনা এবং তাঁর আনুগত্যে, তাঁর আদেশ পালনে এবং বিনয় ও নম্রতায় সদা নিমগ্ন থাকবে। যেমন অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

وَلَهُۥٓ أَسْلَمَ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

অথচ নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, ইচ্ছা ও অনিচ্ছাক্রমে সবাই তাঁর উদ্দেশে আত্মসমর্পণ করেছে এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৮৩) আহকামের ব্যাপারে পার্থক্য থাকলেও সমস্ত নাবীর ধর্ম এই ইসলামই ছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ

আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এই অহী ব্যতীত; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২৫) এ বিষয়ের আরও বহু আয়াত রয়েছে এবং বহু হাদীসও এসেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমরা বৈমাত্রেয় ভাই, আমাদের একই ধর্ম।' (আহমাদ ২/৩১৯) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ 'ওটা একটা দল ছিল যা অতীত হয়ে গেছে, তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে তোমাদের কোন উপকার হবেনা। তাদের কৃতকর্ম তাদের জন্য এবং তোমাদের কৃতকর্ম তোমাদের জন্য। তাদের কার্যাবলী সম্পর্কে

তোমরা জিজ্ঞাসিত হবেনা।' এ জন্যই হাদীসে এসেছে ঃ 'যার কাজ বিলম্বিত হবে তার বংশ তাকে ত্বরান্বিত করবেনা।' (মুসলিম ৪/২০৭৪) অর্থাৎ যে সৎকাজে বিলম্ব করবে তার বংশ মর্যাদা তার কোন উপকারে আসবেনা।

১৩৫। এবং তারা বলে যে, তোমরা ইয়াহুদী অথবা খৃষ্টান হও, তাহলেই সুপথ প্রাপ্ত হবে; তুমি বল ঃ বরং আমরা ইবরাহীমের সুদৃঢ় ধর্মে আছি এবং সে অংশীবাদীদের অন্ত ভুক্ত ছিলনা।	١٣٥. وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَـٰرَىٰ تَهْتَدُواْ ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِـۧمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

এক চক্ষু বিশিষ্ট আবদুল্লাহ ইব্ন সুরিয়া নামক একজন ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিল ঃ 'আমরাই সঠিক পথে রয়েছি। তোমরা আমাদের অনুসারী হও তাহলে তোমরাও সুপথ প্রাপ্ত হবে।' খৃষ্টানরাও অনুরূপ কথা বলে বেড়াত। সুতরাং ওদের উভয়ের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন ঃ وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُواْ তারা বলে, তোমরা ইয়াহুদী অথবা খৃষ্টান হলে সুপথ প্রাপ্ত হবে। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৩৯৭)

আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর অনুসারীরাইতো ইবরাহীমের (আঃ) সুদৃঢ় ধর্মের অনুসারী। مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন সঠিক ধর্মের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি ছিলেন আল্লাহর অকৃত্রিম প্রেমিক, বাইতুল্লাহর দিকে মনঃসংযোগকারী, সক্ষম থাকা অবস্থায় হাজ্জকে অবশ্য কর্তব্যরূপে মান্যকারী, আল্লাহর আনুগত্য স্বীকারকারী, সমস্ত রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী, 'আল্লাহ ছাড়া কেহই উপাস্য নেই' এ কথার সাক্ষ্যদানকারী এবং সমস্ত অবৈধ কাজ হতে দূরে অবস্থানকারী। বিভিন্ন মনীষী 'হানীফ' শব্দের এ সব অর্থ বর্ণনা করেছেন।

১৩৬। তোমরা বল ঃ আমরা আল্লাহর প্রতি এবং যা	١٣٦. قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ

أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِىَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِىَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ	আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, আর যা ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তদীয় বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যা মূসা ও ঈসাকে প্রদান করা হয়েছিল এবং অন্যান্য নাবীগণকে তাদের রাব্ব হতে যা প্রদত্ত হয়েছিল, তদসমুদয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করছি, তাদের মধ্যে কেহকেও আমরা প্রভেদ করিনা, এবং আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণকারী।

আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা এবং সমস্ত নাবীগণকে মুসলিমরা স্বীকার করে

আল্লাহ তা‘আলা মুসলিমদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, যা কিছু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর যেন তারা একনিষ্ঠভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং যা তাঁর পূর্ববর্তী নাবীগণের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল ঐগুলির উপরেও যেন সংক্ষিপ্তভাবে ঈমান আনে। ঐ পূর্ববর্তী নাবীগণের মধ্যে কারও কারও নামও নেয়া হয়েছে এবং অন্যান্য নাবীগণের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন। সাথে সাথে মহান আল্লাহ এ কথাও বলেছেন যে, তারা যেন নাবীগণের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি না করে। যে বা যারা তাদের কোন একজনকে অবিশ্বাস করে ঐসব লোক নিশ্চিত রূপেই কাফির। এদের সম্পর্কেই আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا۟ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا۟ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا. أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ حَقًّا

নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করতে ইচ্ছা করে এবং বলে, আমরা কতিপয়কে বিশ্বাস করি ও কতিপয়কে অবিশ্বাস করি এবং তারা এর মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করতে ইচ্ছা করে ওরাই প্রকৃত অবিশ্বাসী। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৫০-১৫১) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, কিতাবীরা তাওরাতকে ইবরাণী ভাষায় পাঠ করত এবং আরাবী ভাষায় ওর তাফসীর করে মুসলিমদেরকে শোনাতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'তোমরা আহলে কিতাবীদেরকে বিশ্বাস করনা এবং অবিশ্বাসও করনা, বরং বল যে, আমরা আল্লাহ তা'আলার উপর এবং তাঁর অবতারিত কিতাবসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করছি।' (ফাতহুল বারী ৮/২০) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাজরের দুই রাকআত সুন্নাত সালাতের প্রথম রাক'আতে **آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا** (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৩৬) এই আয়াতটি সম্পূর্ণ পড়তেন এবং দ্বিতীয় রাক'আতে **آمَنَّا بِاللّٰهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ** (৩ ঃ ৫২) এই আয়াতটি পড়তেন। (মুসলিম ১/৫০২, আবূ দাউদ ২/৪৬, নাসাঈ ৬/৩৩৯)

اَسْبَاطٌ ইয়াকূবের (আঃ) পুত্রগণকে বলা হত। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/৩৯৯) তাঁরা ছিলেন বারোজন। প্রত্যেকের বংশে বহু লোকের জন্ম হয়। বানী ইসমাঈলকে **قَبَاءِل** বলা হত এবং বানী ইসরাঈলকে **اَسْبَاطٌ** বলা হত। ইমাম যামাখশারী (রহঃ) 'তাফসীরে কাশ্‌শাফে' লিখেছেন যে, এরা ছিল ইয়াকূবের (আঃ) পৌত্র, যারা তাঁর বারোটি পুত্রের সন্তানাদি ছিল। বুখারীতে রয়েছে যে, **قَبَاءِل** এর ভাবার্থ হচ্ছে 'বানী ইসরাঈল।' তাদের মধ্যেও নাবী হয়েছিলেন, যাদের উপর ওয়াহী অবতীর্ণ হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা মূসার (আঃ) উক্তি নকল করেন যা তিনি বানী ইসরাঈলকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ

ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا

তোমাদের প্রতি আল্লাহর নি'আমাতকে স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে বহু নাবী সৃষ্টি করলেন, রাজ্যাধিপতি করলেন। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ২০) অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَطَّعْنَـٰهُمُ ٱثْنَتَىْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا

আমি বানী ইসরাঈলকে দ্বাদশ গোত্রে বিভক্ত করেছি। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৬০)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, দশজন নাবী ছাড়া সমস্ত নাবীই বানী ইসরাঈলের মধ্য হতে হয়েছেন। ঐ দশজন নাবী হচ্ছেন ঃ (১) নূহ (আঃ) (২) হুদ (আঃ) (৩) সালেহ্ (আঃ) (৪) শুয়াইব (আঃ) (৫) ইবরাহীম (আঃ) (৬) ইসহাক (আঃ) (৭) ইয়াকূব (আঃ) (৮) ইসমাঈল (আঃ) এবং (৯) মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। (* মূল তাফসীরে দশম নাবীর নাম উল্লেখ করা হয়নি)

কুরতুবী (রহঃ) বলেন যে, 'সিবত' হল একদল লোক অথবা গোত্র যারা একই বংশ থেকে উদ্ভূত। (হাদীস নং ২/১৪১) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ সুবহানাহু মু'মিনদেরকে আদেশ করছেন যে, তারা যেন তাঁর উপর ঈমান অটুট রাখে এবং তিনি যে কিতাব নাযিল করেছেন ও রাসূল প্রেরণ করেছেন তাদের উপরও ঈমান আনে। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৪০০) সুলাইমান ইব্ন হাবীব (রাঃ) বলেন ঃ আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে যে, আমরা যেন মূল তাওরাত ও ইঞ্জিলকে বিশ্বাস করি, কিন্তু তা যেন অনুসরণ না করি। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৪০০)

১৩৭। অতঃপর তোমরা যেরূপ বিশ্বাস স্থাপন করেছ, তারাও যদি তদ্রূপ বিশ্বাস স্থাপন করে তাহলে নিশ্চয়ই তারা সুপথ প্রাপ্ত হবে; এবং যদি তারা ফিরে যায় তাহলে তারা শুধু বিরুদ্ধাচরণেই ফিরে যাবে; অতএব অচিরেই আল্লাহ তাদের প্রতিকূলে তোমাকেই যথেষ্ট করবেন এবং তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।	١٣٧. فَإِنْ ءَامَنُوا۟ بِمِثْلِ مَآ ءَامَنتُم بِهِۦ فَقَدِ ٱهْتَدَوا۟ ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّمَا هُمْ فِى شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ ٱللَّهُ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ
১৩৮। আমরা আল্লাহরই রংয়ে রঞ্জিত, আল্লাহ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতম রঞ্জনকারী? এবং আমরা তাঁরই বান্দা।	١٣٨. صِبْغَةَ ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً ۖ وَنَحْنُ لَهُۥ عَـٰبِدُونَ

বলা হচ্ছে, ‘হে ঈমানদার সাহাবীগণ! এই সব কাফিরও যদি তোমাদের মত যাবতীয় কিতাব ও রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তাহলে তারাও সুপথ প্রাপ্ত হবে এবং মুক্তি পেয়ে যাবে। আর যদি দলীল ও প্রমাণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তারা ঈমান আনা হতে বিরত থাকে তাহলে নিশ্চিত রূপে তারা ন্যায় ও সত্যের উল্টা পথে রয়েছে। সেই সময় হে নাবী! তোমাকে তাদের উপর জয়যুক্ত করে আল্লাহ তা‘আলা তাদের জন্য তোমাকেই যথেষ্ট করবেন।’

১৩৯। তুমি বল ঃ তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে আমাদের সঙ্গে বিরোধ করছ? অথচ তিনিই আমাদের রাব্ব ও তোমাদের রাব্ব, এবং আমাদের জন্য আমাদের কার্যসমূহ এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কার্যসমূহ এবং আমরা তাঁরই প্রতি বিশ্বস্ত।	١٣٩. قُلْ أَتُحَآجُّونَنَا فِى ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَـٰلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَـٰلُكُمْ وَنَحْنُ لَهُۥ مُخْلِصُونَ
১৪০। তোমরা কি বলছ - ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তদীয় বংশধরগণ ইয়াহুদী ও খৃষ্টান ছিল? তুমি বল ঃ তোমরাই সঠিক জ্ঞানী না আল্লাহ এবং আল্লাহর নিকট হতে প্রাপ্ত সাক্ষ্য যে ব্যক্তি গোপন করছে সে অপেক্ষা কে বেশি অত্যাচারী? এবং তোমরা যা করছ তা হতে আল্লাহ অমনোযোগী নন।	١٤٠. أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُوا۟ هُودًا أَوْ نَصَـٰرَىٰ ۗ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ ۗ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَـٰدَةً عِندَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَـٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

Contents

১৪১। ওটা একটি জামা'আত ছিল যা বিগত হয়েছে; তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের জন্য এবং তোমরা যা অর্জন করেছ তা তোমাদের জন্য, এবং তারা যা করে গেছে তদ্বিষয়ে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবেনা।	١٤١. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْئَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

বিশ্বপ্রভু স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মুশরিকদের ঝগড়া বিদুরিত করতে নির্দেশ দিচ্ছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবীকে বলছেন ঃ 'হে নাবী! তুমি মুশরিকদেরকে বল ঃ 'হে মুশরিকের দল! তোমরা আমাদের সাথে আল্লাহ তা'আলার একাত্মবাদ, অকৃত্রিমতা, আনুগত্য ইত্যাদির ব্যাপারে বিবাদ করছ কেন? তিনি তো শুধু আমাদের প্রভু নন, বরং তোমাদেরও প্রভু। তিনি তো আমাদের ও তোমাদের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান এবং তিনি আমাদের সবারই ব্যবস্থাপক। আমাদের কাজের প্রতিদান আমাদেরকে দেয়া হবে। আমরা তোমাদের প্রতি এবং তোমাদের শির্কের প্রতি অসন্তুষ্ট।' কুরআন মাজীদের অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ

আর (এতদসত্ত্বেও) যদি তারা তোমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে থাকে তাহলে তুমি বলে দাও ঃ আমার কর্মফল আমি পাব, আর তোমাদের কর্মফল তোমরা পাবে। তোমরা তো আমার কৃতকর্মের জন্য দায়ী নও, আর আমিও তোমাদের কর্মের জন্য দায়ী নই। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৪১) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

فَإِنْ حَآجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ

অনন্তর যদি তারা তোমার সাথে কলহ করে তাহলে তুমি বল ঃ আমি ও আমার অনুসারীগণ আল্লাহর উদ্দেশে আত্মসমর্পণ করেছি। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ২০) ইবরাহীমও (আঃ) তাঁর গোত্রের লোককে এ কথাই বলেছিলেন ঃ

وَحَآجَّهُۥ قَوۡمُهُۥۚ قَالَ أَتُحَـٰٓجُّوٓنِّى فِى ٱللَّهِ

আর তার জাতির লোকেরা তার সাথে ঝগড়া করতে থাকলে সে তাদেরকে বলল ঃ তোমরা কি আল্লাহর ব্যাপারে আমার সাথে ঝগড়া করছ? (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৮০) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجَّ إِبۡرَٲهِـۧمَ فِى رَبِّهِۦٓ

তুমি কি তার প্রতি লক্ষ্য করনি যে ইবরাহীমের সাথে তার রাব্ব সম্বন্ধে বিতর্ক করেছিল? (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৫৮) সুতরাং এখানে ঐ বিবাদীদেরকে বলা হচ্ছে ঃ 'আমাদের কাজ আমাদের জন্য এবং তোমাদের কাজ তোমাদের জন্য। আমরা তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তোমাদের হতে পৃথক হয়ে গেলাম। আমরা একাগ্র চিত্তে আল্লাহর ইবাদাতে লিপ্ত হয়ে পড়ব।' অতঃপর ঐ সব লোকের দাবী খণ্ডন করা হচ্ছে যে, ইবরাহীম (আঃ) ইয়াহুদীও ছিলেননা এবং খৃষ্টানও ছিলেননা। অতএব হে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানের দল! তোমরা এসব কথা বানিয়ে বলছ কেন? বলা হচ্ছে যে, তোমাদের জ্ঞান কি আল্লাহ তা'আলার চেয়েও অধিক হয়ে গেল? আল্লাহ তা'আলা তো পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেন ঃ

مَا كَانَ إِبۡرَٲهِيمُ يَہُودِيًّا وَلَا نَصۡرَانِيًّا وَلَـٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسۡلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ

ইবরাহীম ইয়াহুদী ছিলনা এবং খৃষ্টানও ছিলনা, বরং সে সুদৃঢ় মুসলিম ছিল এবং সে মুশরিকদের (অংশীবাদী) অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৬৭) পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَـٰدَةً عِندَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ

এবং আল্লাহর নিকট হতে প্রাপ্ত সাক্ষ্য যে ব্যক্তি গোপন করছে সে অপেক্ষা কে বেশি অত্যাচারী? (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৪০)

আল্লাহ তা'আলার সাক্ষ্যকে গোপন করে তাদের বড় অত্যাচার করা ছিল এই যে, তাদের নিকট আল্লাহ তা'আলা যে কিতাব অবতীর্ণ করেছিলেন তা তারা পড়েছিল এবং জানতে পেরেছিল যে, ইসলামই প্রকৃত ধর্ম ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সত্য রাসূল। এটা জেনেও তারা তা গোপন করেছিল। ইবরাহীম (আঃ), ইসমাঈল (আঃ), ইসহাক (আঃ), ইয়াকূব (আঃ) প্রমুখ সবাই ইয়াহুদী ও খৃষ্টান ধর্ম হতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক ছিলেন। কিন্তু তারা তা স্বীকার করেনি। শুধু তাই নয়, বরং

এই কথাকেই তারা গোপন করেছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তাদের কাজ তাঁর নিকট গোপন নেই। তাঁর 'ইল্ম' সব জিনিসকেই ঘিরে রয়েছে। তিনি প্রত্যেক ভাল ও মন্দ কাজের পূর্ণ প্রতিদান দিবেন।

এই ধমক দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, ঐ সব মহামানব তো তাঁর নিকট পৌঁছে গেছে। এখন যদি তোমরা তাঁদের পদাংক অনুসরণ না কর তাহলে তোমরা তাঁদের বংশধর হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমাদের কোনই সম্মান নেই। আর তোমাদের অসৎ কাজের বোঝাও তাদেরকে বইতে হবেনা। তোমরা যখন এক নাবীকে অস্বীকার করছ তখন যেন সমস্ত নাবীকেই অস্বীকার করছ। বিশেষ করে তোমরা শেষ নাবী মুহাম্মাদের যুগে বাস করেও তাঁকে অস্বীকার করছ! যিনি হচ্ছেন সমস্ত নাবীর নেতা। যাঁকে সমস্ত দানব ও মানবের নিকট নাবী করে পাঠানো হয়েছে। সুতরাং তাঁর রিসালাতকে মেনে নেয়া প্রত্যেকের উপর বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে। তাঁর উপর ও অন্যান্য সমস্ত নাবীর উপরও আল্লাহ তা'আলার দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

প্রথম পারা সমাপ্ত।

১৪২। মানবমন্ডলীর মধ্যস্থিত নির্বোধেরা অচিরেই বলবে, কিসে তাদেরকে সেই কিবলা হতে প্রত্যাবৃত্ত করল যার দিকে তারা ছিল? তুমি বলে দাও ঃ পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই জন্য, তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন।	١٤٢. سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّىٰهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُوا۟ عَلَيْهَا ۚ قُل لِّلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ
১৪৩। এভাবে আমি তোমাদেরকে আদর্শ সম্প্রদায় করেছি - যেন তোমরা মানবগণের জন্য সাক্ষী হও এবং রাসূলও তোমাদের জন্য	١٤٣. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى

ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِى كُنتَ عَلَيْهَآ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَـٰنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ	**সাক্ষী হয়; এবং তুমি যে কিবলার দিকে ছিলে তা আমি এ জন্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যে, কে রাসূলের অনুসরণ করে, আর কে তা হতে স্বীয় পদদ্বয়ে পশ্চাতে ফিরে যায় আমি তা জেনে নিব এবং আল্লাহ যাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন তারা ছাড়া অপরের জন্য এটি অবশ্যই কঠোরতর; এবং আল্লাহ এরূপ নন যে, তোমাদের বিশ্বাস বিনষ্ট করেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি স্নেহশীল, করুণাময়।**

কিবলার পরিবর্তন ও সালাতের দিক নির্দেশনা

সহীহ বুখারীতে বারা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ষোল বা সতের মাস পর্যন্ত বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেছেন। কা'বা ঘর তাঁর কিবলাহ হোক এটাই তাঁর মনের বাসনা ছিল। হুকুম প্রাপ্তির পর তিনি ঐ দিকে মুখ করে প্রথম আসরের সালাত আদায় করেন। যেসব লোক তাঁর সাথে সালাত আদায় করেছিলেন তাঁদের মধ্যের একটি লোক মাসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানকার লোকেরা রুকুর অবস্থায় ছিলেন। ঐ লোকটি বলেন ঃ 'আল্লাহর শপথ! আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে মাক্কার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেছি।' এ কথা শুনামাত্রই ঐসব লোক ঐ অবস্থায়ই কা'বার দিকে মুখ করেন। কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশের পূর্বে যাঁরা মারা গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বহু লোক শহীদও হয়েছিলেন। তাঁদের সালাত সম্বন্ধে কি বলা যায় তা জনগণের জানা ছিলনা। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ

وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَـٰنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

এবং আল্লাহ এরূপ নন যে, তোমাদের বিশ্বাস বিনষ্ট করেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি স্নেহশীল, করুণাময়। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৪৩) (ফাতহুল বারী ৮/২০)

সহীহ মুসলিমে এই বর্ণনাটি অন্যভাবে রয়েছে। বারা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতেন এবং অধিকাংশ সময় আকাশের দিকে দৃষ্টি উঠিয়ে নির্দেশের অপেক্ষা করতেন। তখন নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং কা'বা ঘর কিবলাহ রূপে নির্ধারিত হয়।

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ

নিশ্চয়ই আমি আকাশের দিকে তোমার মুখমন্ডল উত্তোলন অবলোকন করেছি। তাই আমি তোমাকে ঐ কিবলাহমুখীই করাচ্ছি যা তুমি কামনা করছ। অতএব তুমি মাসজিদুল হারামের দিকে তোমার মুখমন্ডল ফিরিয়ে দাও। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৪৪) (মুসলিম, ১/৩৭৫)

এ সময় মুসলিমদের মধ্যে এক লোক বলেন ঃ 'কিবলাহ' পরিবর্তনের পূর্বে যাঁরা মারা গেছেন তাঁদের অবস্থা যদি আমরা জানতে পারতাম! সেই সময় আল্লাহ তা'আলা আয়াতটি অবতীর্ণ করেন ঃ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৪৩) আহলে কিতাবের মধ্যে কয়েকজন নির্বোধ এই কিবলাহ পরিবর্তনের উপর আপত্তি আরোপ করে। তখন আল্লাহ তা'আলা ঃ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। (কুরতুবী ৩/১৩৩) আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাদীনায় হিজরাত করার পর আল্লাহ তাঁকে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে দাঁড়ান।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মাদীনায় হিজরাত করেন তখন বাইতুল মুকাদ্দাসকে কিবলাহ করা তাঁর প্রতি নির্দেশ ছিল। এতে ইয়াহুদীরা খুবই খুশি হয়েছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবরাহীমের

(আঃ) কিবলাহকে পছন্দ করতেন। সুতরাং কিবলাহ পরিবর্তনের নির্দেশ দেয়া হলে ইয়াহুদীরা হিংসা বশতঃ বহু আপত্তি উত্থাপন করে। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ

قُل لِّلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ *পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ*। (তাবারী ৩/১৩৮) এ ব্যাপারে অনেক হাদীসও রয়েছে।

মোট কথা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কায় দুই 'রুকনের' মধ্যবর্তী সাখারা-ই বাইতুল মুকাদ্দাসকে সামনে রেখে সালাত আদায় করতেন। যখন তিনি মাদীনায় হিজরাত করেন তখন ঐ দু'টিকে একত্রিত করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সালাতে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করার নির্দেশ প্রদান করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কুরআনুল হাকীমের মাধ্যমে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, নাকি অন্য কিছুর মাধ্যমে দেয়া হয়েছিল এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। ইমাম বুখারী (রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থে লিখেছেন যে, কিবলাহ পরিবর্তনের খবর যখন প্রচার করা হয় তখন কিছু আনসার বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করছিলেন। এ খবর শোনার সাথে সাথে তারা কিবলাহ পরিবর্তন করে কা'বার দিকে ফিরে বাকী সালাত আদায় করেন। ঐ আনসারগণ ছিলেন বানু সালামা গোত্রের। (বুখারী ৩৯৯)

বুখারী ও মুসলিমে আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মানুষ 'কুবা' মাসজিদে ফাজরের সালাত আদায় করছিল, হঠাৎ কোন আগন্তুক বলে যে, রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর কুরআন মাজীদের মাধ্যমে হুকুম অবতীর্ণ হয়েছে এবং কা'বা ঘরের দিকে মুখ করার নির্দেশ হয়েছে। সুতরাং আমরাও সিরিয়ার দিক হতে মুখ সরিয়ে কা'বার দিকে মুখ করে নেই। (ফাতহুল বারী ৮/২৪, মুসলিম ১/৩৭৫) এ হাদীস দ্বারা এটাও জানা গেল যে, কোন 'নাসিখের' হুকুম তখনই অবশ্য পালনীয় হয়ে থাকে যখন তা জানা যায়, যদিও তা পূর্বেই বলবত হয়ে গেছে। কেননা এই মহোদয়গণকে আসর, মাগরিব ও এ'শার সালাত পুনরায় আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়নি।

এখন অন্যায় পন্থী এবং দুর্বল বিশ্বাসের অধিকারী ব্যক্তিরা বলতে আরম্ভ করে যে, কখনও একে এবং কখনও ওকে কিবলাহ্ বানানোর কারণটা কি? তাদেরকে উত্তর দেয়া হয় যে, হুকুম ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ

অতএব তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও সে দিকেই আল্লাহর দিক। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১১৫)

لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ

তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল পূর্ব বা পশ্চিম দিকে প্রত্যাবর্তিত করলেই তাতে পুণ্য নেই, বরং পুণ্য তার যে ব্যক্তি আল্লাহয় বিশ্বাস করে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৭৭)

এ আয়াতের মর্ম হচ্ছে, উত্তম আমল হলো আল্লাহর আদেশকে শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরা। অতঃপর তিনি আমাদেরকে যা কিছু করতে বলবেন তার মুকাবিলা করা। তিনি যদি প্রতিদিন নতুন নতুন জায়গায় নতুন কিছুর মুকাবিলা করতে বলেন তাহলে তা বিনা বাক্য ব্যয়ে সময় ক্ষেপণ না করে তৎক্ষণাত পালন করা। কারণ আমরা তাঁর বান্দা/দাস, আমাদের উপর তাঁরই কর্তৃত্ব, তিনি যা বলবেন তা পালন করাই আমাদের কর্তব্য। অবশ্যই আল্লাহ তাঁর বান্দার দিকে খেয়াল রাখেন এবং তাঁর বান্দা ও রাসূলের প্রতি তিনি অত্যন্ত দয়ালু। আল্লাহ তাঁর বন্ধু ইবরাহীমের (আঃ) কিবলাহর দিকে মুসলিমদের কিবলাহ নির্ধারণ করে সরল পথে পরিচালিত করেছেন। তিনি তাঁর বান্দাদেরকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ, পবিত্রতম ও সম্মানিত স্থান কা'বাকে কিবলাহ করার আদেশ দিয়ে মুসলিমদের সম্মানিত করেছেন। একটি মারফূ' 'হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'এ ব্যাপারে আমাদের উপর ইয়াহুদীদের খুবই হিংসা রয়েছে যে, আমাদেরকে জুমু'আর দিনের তাওফীক প্রদান করা হয়েছে এবং তারা তা থেকে ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। আর এর উপর যে, আমাদের কিবলাহ এইটি এবং তারা এর থেকে ভ্রান্তি র মধ্যে রয়েছে। আমাদের সজোরে 'আমীন' বলার উপরেও তাদের বড়ই হিংসা রয়েছে, যা আমরা ইমামের পিছনে বলে থাকি।' (আহমাদ ৬/১৩৪)

উম্মাতে মুহাম্মাদীর মর্যাদা

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, হে উম্মাতে মুহাম্মাদী! তোমাদেরকে এই পছন্দনীয় কিবলাহর দিকে ফিরানোর কারণ এই যে, তোমরা পছন্দনীয় উম্মাত। তোমরা কিয়ামাতের দিন অন্যান্য উম্মাতের উপর সাক্ষী স্বরূপ দাঁড়াবে।

কেননা তারা সবাই তোমাদের মর্যাদা স্বীকার করে। وَسَطٌ এর অর্থ এখানে ভাল ও উত্তম। যেমন বলা হয়ে থাকে যে, কুরাইশ বংশ হিসাবে وَسَطُ عَرَبٍ অর্থাৎ আরাবের মধ্যে উত্তম। এটাও বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় গোত্রের মধ্যে وَسَط ছিলেন অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত বংশ সম্পন্ন ছিলেন। صَلٰوةٌ وُسْطَى অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতম সালাত, যেটি আসরের সালাত, এটি সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সমস্ত উম্মাতের মধ্যে উম্মাতে মুহাম্মাদীই সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ বলে তাদেরকে পূর্ণাঙ্গ শারীয়াতও দেয়া হয়েছে, সম্পূর্ণ সরল ও সঠিক পথও দেয়া হয়েছে এবং অতি স্পষ্ট ধর্মও দেয়া হয়েছে। এ জন্যই মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন ঃ

هُوَ ٱجْتَبَىٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَٰهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّىٰكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِى هَـٰذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ

তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কঠোরতা আরোপ করেননি; এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত; তিনি পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম এবং এই কিতাবেও, যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ হয় এবং তোমরা সাক্ষী হও মানব জাতির জন্য। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৭৮) মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'কিয়ামাতের দিন নূহকে (আঃ) ডাকা হবে এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করা হবে ঃ 'তুমি কি আমার বার্তা আমার বান্দাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছিলে?' তিনি বলবেন ঃ 'হ্যাঁ প্রভু! আমি পৌঁছে দিয়েছি।' অতঃপর তাঁর উম্মাতকে ডাকা হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে ঃ 'নূহ কি তোমাদের নিকট আমার বাণী পৌঁছে দিয়েছিল?' তারা স্পষ্টভাবে অস্বীকার করবে এবং বলবে ঃ আমাদের নিকট কোন ভয় প্রদর্শক আসেননি। তখন নূহকে (আঃ) বলা হবে ঃ তোমার উম্মাত তো অস্বীকার করছে, সুতরাং তুমি সাক্ষী হাযির কর। তিনি বলবেন ঃ 'হ্যাঁ, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর উম্মাত আমার সাক্ষী'। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا *তোমাদেরকে আমি সত্যনিষ্ঠ জাতি করেছি।* রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘ওয়াসাত’ শব্দের অর্থ হচ্ছে আদল বা ন্যায়নীতি সম্পন্ন। নূহ (আঃ) যে তাঁর প্রতি প্রেরিত বাণী যথাযথ পৌঁছিয়েছেন তার সাক্ষী হিসাবে তোমাদেরকে ডাকা হবে এবং তোমাদের সাক্ষ্যকে আমি প্রত্যায়ন করব। (আহমাদ ৩/৩২, ফাতহুল বারী ৮/২১, তিরমিযী ৮/২৯৭, নাসাঈ ৬/২৯২, ইব্ন মাজাহ ২/১৪৩২) মুসনাদ আহমাদে আরও একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

‘কিয়ামাতের দিন কোন নাবী আসবেন তাঁর সাথে তাঁর উম্মাতের শুধুমাত্র দু’টি লোকই থাকবে কিংবা তার চেয়ে বেশী। তাঁর উম্মাতকে আহ্বান করা হবে এবং জিজ্ঞেস করা হবে ঃ ‘এই নাবী কি তোমাদের নিকট ধর্ম প্রচার করেছিলেন?’ তারা অস্বীকার করবে। নাবীকে তখন জিজ্ঞেস করা হবে ঃ তুমি ধর্ম প্রচার করেছিলে কি? তিনি বলবেন, ‘হ্যাঁ’। তাঁকে বলা হবে ঃ ‘তোমার সাক্ষী কে আছে?’ তিনি বলবেন, ‘মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর উম্মাত।’ অতঃপর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর উম্মাতকে ডাকা হবে। তাদেরকে এই প্রশ্নই করা হবে যে, এই নাবী প্রচার কাজ চালিয়ে ছিলেন কি? তারা বলবেন, ‘হ্যাঁ’। তখন তাদেরকে বলা হবে ঃ ‘তোমরা কি করে জানলে?’ তারা উত্তর দিবে ঃ আমাদের নিকট নাবী আগমন করেছিলেন এবং তিনিই আমাদেরকে জানিয়েছিলেন যে, নাবীগণ তাঁদের উম্মাতের নিকট প্রচার কাজ চালিয়েছিলেন। এটাই হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলার وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا এ কথার ভাবার্থ।’ (আহমাদ ৩/৫৮)

‘মুসনাদ আহমাদ’ হাদীস গ্রন্থে রয়েছে, আবুল আসওয়াদ (রহঃ) বলেন ঃ ‘আমি একবার মাদীনায় আগমন করি। এখানে রোগ ছড়িয়ে পড়ে। বহু লোক মারা যেতে থাকে। আমি উমার ইব্ন খাত্তাবের (রাঃ) পাশে বসেছিলাম। এমন সময় একটি জানাযা যেতে থাকে। জনগণ মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করতে আরম্ভ করে। উমার (রাঃ) বলেন ঃ ‘তার জন্য ওয়াজিব হয়ে গেল।’ ইতোমধ্যে আর একটি জানাযা বের হয়। লোকেরা তার দুর্নাম করতে শুরু করে।’ উমার (রাঃ) বলেন ঃ ‘তার জন্য ওয়াজিব হয়ে গেল’। আমি বলি ঃ হে আমিরুল মু’মিনীন! কি ওয়াজিব হয়ে গেল?’ তিনি বলেন ঃ ‘আমি ঐ কথাই বললাম যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

'চারজন লোক যে মুসলিমের ভাল কাজের সাক্ষ্য প্রদান করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।' আমরা বলি ঃ যদি তিন ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয়? তিনি বললেন ঃ 'তিন জন হলেও।' আমরা বললাম ঃ যদি দুই জনে সাক্ষ্য দেয়?' তিনি বললেন ঃ 'দুই জন হলেও।' অতঃপর আমরা আর একজনের ব্যাপারে প্রশ্ন করিনি। (আহমাদ ১/২১ ফাতহুল বারী ৩/২৭১, তিরমিযী ৪/১৬৬, নাসাঈ ৪/৫১)

কিবলা পরিবর্তনে গভীর বিচক্ষণতা

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'প্রথম কিবলাহ শুধুমাত্র পরীক্ষামূলক ছিল। অর্থাৎ প্রথমে বাইতুল মুকাদ্দাসকে কিবলাহ নির্ধারিত করে পরে কা'বা ঘরকে কিবলাহ রূপে নির্ধারণ করা শুধু এই জন্যই ছিল যে, এর দ্বারা সত্য অনুসারীর পরিচয় পাওয়া যায়। আর তাকেও চেনা যায় যে এর কারণে ধর্ম হতে ফিরে যায়। এটা বাস্তবিকই কঠিন কাজ ছিল, কিন্তু যাদের অন্তরে ঈমানের দৃঢ়তা রয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যানুসারী, যারা বিশ্বাস রাখে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেন তা সত্য, যাদের এই বিশ্বাস আছে যে, আল্লাহ তা'আলা যা চান তাই করেন, তিনি বান্দাদের উপর যে নির্দেশ দেয়ার ইচ্ছা করেন সেই নির্দেশই দিয়ে থাকেন এবং যে নির্দেশ উঠিয়ে নেয়ার ইচ্ছা করেন তা উঠিয়ে নেন, তাঁর প্রত্যেক কাজ নিপুণতায় পরিপূর্ণ, তাদের জন্য এই নির্দেশ পালন মোটেই কঠিন নয়। তবে যাদের অন্তর রোগাক্রান্ত তাদের কাছে কোন নতুন নির্দেশ এলেই তো তাদের নতুন ব্যথা জেগে উঠে। কুরআন মাজীদে অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَإِذَا مَآ أُنزِلَتۡ سُورَةٌ فَمِنۡهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمۡ زَادَتۡهُ هَـٰذِهِۦٓ إِيمَـٰنًا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتۡهُمۡ إِيمَـٰنًا وَهُمۡ يَسۡتَبۡشِرُونَ. وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتۡهُمۡ رِجۡسًا إِلَىٰ رِجۡسِهِمۡ

আর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ করা হয় তখন কেহ কেহ বলে, তোমাদের মধ্যে এই সূরা কার ঈমান বৃদ্ধি করল? অবশ্যই যে সব লোক ঈমান এনেছে, এই সূরা তাদের ঈমানকে বর্ধিত করেছে এবং তারাই আনন্দ লাভ করছে। কিন্তু যাদের অন্তরসমূহে রোগ রয়েছে, এই সূরা তাদের মধ্যে তাদের কলুষতার সাথে

আরও কলুষতা বর্ধিত করেছে, আর তাদের কুফরী অবস্থায়ই মৃত্যু হয়েছে। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১২৪-১২৫) আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَلَوْ جَعَلْنَـٰهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا۟ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَـٰتُهُۥٓ ۖ ءَا۬عْجَمِىٌّ وَعَرَبِىٌّ ۗ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هُدًى وَشِفَآءٌ ۖ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ

বল ঃ মু'মিনদের জন্য ইহা পথ নির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন হবে তাদের জন্য অন্ধত্ব। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ৪৪) অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّـٰلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

আমি অবতীর্ণ করি কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য সুচিকিৎসা ও দয়া, কিন্তু তা সীমা লংঘনকারীদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। (সূরা ইসরাহ, ১৭ ঃ ৮২) এটা সুবিদিত যে, যে সমস্ত সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের সাথে থেকে কোন দ্বিধা-সন্দেহ ছাড়াই সব আদেশকে পালন করেছেন তারাই ছিলেন অগ্রনায়ক। যেসব মুহাজির (রাঃ) ও আনসার (রাঃ) প্রথম দিকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন তাঁরা উভয় কিবলাহর দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেছেন।

ইমাম বুখারী (রহঃ), ইব্ন উমার (রাঃ) থেকে ২ ঃ ১৪৩ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন ঃ লোকেরা যখন 'কুবা' মাসজিদে ফাজরের সালাত আদায় করছিলেন তখন এক লোক সেখানে উপস্থিত হয়ে বলতে থাকেন ঃ কা'বাকে কিবলাহ করার আদেশ দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আয়াত নাযিল হয়েছে। অতএব তোমরা কা'বার দিকে মুখ ফিরাও। তখন তারা সবাই কা'বামুখী হলেন। (ফাতহুল বারী ৮/২২, মুসলিম ১/৩৭৫)

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এ বর্ণনার সাথে আরও যোগ করেন যে, ঐ সময় সাহাবীগণ রুকু অবস্থায় ছিলেন এবং এ খবর তাদের কানে পৌঁছার সাথে সাথে ঐ রুকু অবস্থায়ই তারা কিবলাহ পরিবর্তন করে কা'বামুখী হন। (তিরমিযী ৮/৩০০) ইমাম মুসলিম (রহঃ) এ বর্ণনাটি আনাস (রাঃ) হতে লিপিবদ্ধ করেছেন। (১/৩৭৫) এ বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি গভীর আনুগত্য এবং তাঁদের প্রতিটি আদেশ পালন করার জন্য তারা ছিলেন অত্যন্ত তৎপর। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি রাযী খুশি থাকুন। আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ *এবং আল্লাহ এরূপ নন যে, তোমাদের বিশ্বাস বিনষ্ট করেন।* অর্থাৎ ইতোপূর্বে তোমরা যে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে সালাত আদায় করেছ সেই জন্য তোমাদের ঐ আমল বিফলে যাবেনা। আবূ ইসহাক আশ শা'বি (রহঃ) বা'রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন ঃ লোকেরা জানতে চাইলেন, ইতোপূর্বে যারা বাইতুল মুকাদ্দাসকে কিবলাহ করে সালাত আদায় করেছেন এবং কা'বাকে কিবলাহ করে সালাত আদায় করার আদেশ প্রাপ্তির পূর্বেই মারা গেছেন তাদের ফাইসালা কি হবে? তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জানিয়ে দেন وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ইমাম তিরমিযীও (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে এটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এটিকে সহীহ বলেছেন। (ফাতহুল বারী ৮/২০, তিরমিযী ৮/৩০০)

উপরে বর্ণিত আয়াত ও হাদীস দ্বারা এটা জানা যাচ্ছে যে, নির্দেশ পাওয়া মাত্রই বিশ্বাসীরা সালাতের মধ্যেই তাঁরা কা'বার দিকে ফিরে গেছেন। মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা রুকুর অবস্থায় ছিলেন এবং ঐ অবস্থায়ই কা'বার দিকে ফিরে যান। এর দ্বারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি তাঁদের পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ পাচ্ছে। অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ *আল্লাহ তোমাদের ঈমান নষ্ট করবেননা।* অর্থাৎ তোমরা বাইতুল মুকাদ্দাসকে কিবলাহ করে যেসব সালাত আদায় করেছ, ওর সাওয়াব থেকে আমি তোমাদেরকে বঞ্চিত করবনা। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর দ্বারা বরং তাদের উচ্চ মানের ঈমানদারী সাব্যস্ত হয়েছে। তাদেরকে দুই কিবলাহর দিকে মুখ করে সালাত আদায় করার সাওয়াব দেয়া হবে। এর ভাবার্থ এটাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এবং তাঁর সাথে তোমাদের কিবলাহর দিকে মুখ করে ঘুরে যাওয়াকে নষ্ট করবেননা। এর পর বলা হচ্ছে ঃ

إِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ *নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি স্নেহশীল, দয়ালু।* সহীহ হাদীসে রয়েছে, একটি বন্দিনী মহিলার শিশু তার থেকে পৃথক হয়ে পড়ে। ঐ মহিলাটিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখেন যে, সে উন্মাদিনীর মত শিশুকে খুঁজতে রয়েছে। তাকে খুঁজে না পেয়ে সে বন্দীদের মধ্যে

যে শিশুকেই দেখতে পায় তাকেই জড়িয়ে ধরছে। অবশেষে সে তার শিশুকে পেয়ে যায়। ফলে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে এবং লাফিয়ে গিয়ে তাকে কোলে উঠিয়ে নেয়। অতঃপর তাকে বুকে জড়িয়ে আদর সোহাগ করতে থাকে এবং মুখে দুধ দেয়। এটা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে (রাঃ) বললেন ঃ

'আচ্ছা বলত এই মহিলাটি কি তার এই শিশুটিকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে?' তাঁরা বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কখনই না।' তিনি তখন বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! এই মা তার শিশুর উপর যতটা স্নেহশীল, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের উপর এর চেয়ে বহু গুণ বেশি স্নেহশীল ও দয়ালু।' (মুসলিম ৪/২১০৯)

১৪৪। নিশ্চয়ই আমি আকাশের দিকে তোমার মুখমন্ডল উত্তোলন অবলোকন করেছি। তাই আমি তোমাকে ঐ কিবলাহমুখীই করাচ্ছি যা তুমি কামনা করছ। অতএব তুমি মাসজিদুল হারামের দিকে তোমার মুখমন্ডল ফিরিয়ে দাও এবং তোমরা যেখানেই থাক তোমাদের আনন সে দিকেই প্রত্যাবর্তিত কর; এবং নিশ্চয়ই যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তারা অবশ্যই অবগত আছে যে, নিশ্চয়ই এটি তাদের রবের নিকট হতে প্রেরিত সত্য; এবং তারা যা করছে তদ্বিষয়ে আল্লাহ অমনোযোগী নন।	١٤٤. قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ ۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَـٰفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

কুরআনের আয়াতের প্রথম রহিতকরণ হয় কিবলাহ পরিবর্তনের দ্বারা

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, কুরআন মাজীদের মধ্যে প্রথম 'নাস্‌খ' হচ্ছে কিবলাহর হুকুম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাদীনায় হিজরাত করেন। এখানকার অধিকাংশ অধিবাসী ছিল ইয়াহুদী। আল্লাহ তাঁকে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে সালাত আদায় করার নির্দেশ দেন। ইয়াহুদীরা এতে খুবই খুশি হয়। তিনি কয়েক মাস পর্যন্ত ঐ দিকেই সালাত আদায় করেন। কিন্তু স্বয়ং তাঁর মনের বাসনা ছিল ইবরাহীমের (আঃ) কিবলাহ। তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানাতেন। প্রায়ই তিনি আকাশের দিকে চক্ষু উত্তোলন করতেন। অবশেষে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে ইয়াহুদীরা বলতে থাকে ঃ مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِّلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ *তিনি এই কিবলাহ হতে সরে গেলেন কেন?* (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/১০৩) এর উত্তরে বলা হয় যে, পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক একমাত্র আল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ

অতএব তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও সে দিকেই আল্লাহর চেহারা বিরাজমান। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১১৫) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ পূর্বের কিবলাহ ছিল পরীক্ষামূলক যে, কে রাসূলের অনুসরণ করে এবং কে পিছন ফিরে চলে যায়। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৪৩)

আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ) 'মাসজিদে হারামে' 'মীযাবে'র সামনে বসে এই পবিত্র আয়াতটি পাঠ করেন এবং বলেন ঃ 'মীযাব কা'বার দিকে রয়েছে। আবুল আলিয়া (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ) প্রমুখ মনীষীরও উক্তি এটাই। 'হারাম' কিবলাহ হচ্ছে সমগ্র পৃথিবীবাসীর। পূর্বেই থাক বা পশ্চিমেই থাক, সমস্ত উম্মাতের কিবলাহ এটাই।

কা’বা ঘরই কি কিবলাহ, নাকি ইহা একটি ইশারা

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ *তোমরা পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ যেখানেই থাকনা কেন, সালাতের সময় তোমরা কা’বার দিকে মুখ কর।*

ইমাম হাকিম বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে কা’বাকে ইশারা করে সালাত আদায় করতে বলা হয়েছে। (হাকিম ২/২৬৯) আবুল আলিয়া (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) এবং আরও অনেকের এটিই অভিমত। (ইব্ন আবী হাতিম ১/১০৭-১০৯) তবে সফরে সোয়ারীর উপর যে ব্যক্তি নফল সালাত আদায় করে সে সোয়ারী যে দিকেই যাবে সেই দিকেই মুখ করে নফল সালাত আদায় করবে। তার মনের গতি কা’বার দিকে থাকলেই যথেষ্ট হবে। এ রকমই যে ব্যক্তি যুদ্ধের মাঠে সালাত আদায় করে সে যেভাবে পারে এবং যে দিকে আদায় করা তার জন্য সুবিধাজনক সেই দিকে ফিরেই আদায় করবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি কিবলাহর দিক ঠিক করতে পারছেনা সে অনুমান করে যে দিকেই কিবলাহ হওয়ার ধারণা তার বেশি হবে সেই দিকে ফিরেই সে সালাত আদায় করবে। অতঃপর যদি প্রকৃত পক্ষেই তার সালাত কিবলাহর দিকে না হয় তবুও তার সালাত আদায় করা হয়ে যাবে এবং সে আল্লাহ তা‘আলার নিকট ক্ষমা পেয়ে যাবে।

ইয়াহুদীরা জানত যে, পরে কিবলাহ পরিবর্তিত হবে

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে যে, ইয়াহুদীরা কথা যতই বানিয়ে বলুক না কেন, তাদের মন বলে যে, কিবলাহর পরিবর্তন আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকেই হয়েছে এবং এটা সত্য। কেননা এটা স্বয়ং তাদের কিতাবেও রয়েছে। কিন্তু এরা একমাত্র কুফর, অবাধ্যতা, অহংকার এবং হিংসার বশবর্তী হয়েই এটা গোপন করছে। কিন্তু মহান আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম হতে উদাসীন নন।

১৪৫। এবং যাদেরকে গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছে তাদের নিকট যদি তুমি সমুদয় নিদর্শন আনয়ন কর তবুও তারা তোমার কিবলাহকে গ্রহণ করবেনা; এবং তুমিও তাদের	١٤٥. وَلَئِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُوا۟ قِبْلَتَكَ ۚ وَمَآ أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ

وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۚ وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ۙ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ	**কিবলাহ্ গ্রহণ করতে পারনা, আর তাদের কোন দলও অন্য দলের কিবলাহকে স্বীকার করেনি, এবং তোমার নিকট যে জ্ঞান এসেছে এর পরেও যদি তুমি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর তাহলে নিশ্চয়ই তুমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।**

ইয়াহুদীদের একগুয়েমী এবং অবাধ্যতা

এখানে ইয়াহুদীদের কুফর, অবাধ্যতা, বিরোধিতা এবং দুষ্টামির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্বন্ধে তাদের পূর্ণ অবগতি থাকা সত্ত্বেও এবং তাদের নিকট সর্বপ্রকারের দলীল পেশ করা সত্ত্বেও তারা সত্যের অনুসরণ করছেনা। অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ

নিঃসন্দেহে, যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তারা কখনো ঈমান আনবেনা, যদিও তাদের নিকট সমস্ত প্রমাণ পৌঁছে যায়, যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৬-৯৭) অতঃপর মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অটলতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, যেমন তারা অসত্যের উপর স্থির ও অটল রয়েছে, তারা সেখান হতে সরতে চাচ্ছেনা, তেমনি তাদেরও বুঝে নেয়া উচিত যে, তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও কখনও তাদের কথার উপরে আসতে পারেননা। তিনি তো তাঁরই আদেশের অনুসারী। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যা পছন্দ করেন তাই তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পালন করে থাকেন। তিনি কখনও তাদের মিথ্যা প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেননা। তাঁর দ্বারা এটা কখনও সম্ভব নয় যে, আল্লাহর নির্দেশ এসে যাওয়ার পর তাদের কিবলাহর দিকে মুখ করেন।

অতঃপর মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে প্রকৃতপক্ষে আলেমগণকেই যেন ধমক দিয়ে বলছেন যে, সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর কারও পিছনে লেগে থাকা এবং নিজের অথবা অন্যদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করা প্রকাশ্য অত্যাচারই বটে।

১৪৬। যাদেরকে আমি কিতাব প্রদান করেছি তারা তাকে এরূপভাবে চিনে, যেমন চিনে তারা আপন পুত্রদেরকে এবং নিশ্চয়ই তাদের এক দল জ্ঞাতসারে সত্যকে গোপন করছে।	١٤٦. ٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَـٰهُمُ ٱلۡكِتَـٰبَ يَعۡرِفُونَهُۥ كَمَا يَعۡرِفُونَ أَبۡنَآءَهُمۡ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنۡهُمۡ لَيَكۡتُمُونَ ٱلۡحَقَّ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ
১৪৭। এই বাস্তব সত্য তোমার রবের পক্ষ হতে; সুতরাং তুমি সংশয়ীদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা।	١٤٧. ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡمُمۡتَرِينَ

ইয়াহুদীরা রাসূলের (সাঃ) আগমন সত্য জানত, কিন্তু তারা গোপন রাখে

ইরশাদ হচ্ছে যে, আহলে কিতাবের আলেমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক বর্ণিত কথাগুলির সত্যতা সম্বন্ধে এমনই জ্ঞাত রয়েছে যেমন জ্ঞাত রয়েছে পিতা ছেলেদের সম্বন্ধে। এটা একটা দৃষ্টান্ত ছিল যা আরাবের লোকেরা পূর্ণ বিশ্বাসের সময় বলত। একটি হাদীসে রয়েছে ঃ একটি লোকের সঙ্গে ছোট একটি শিশু ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ

‘এটা কি তোমার ছেলে?’’ সে বলে ঃ ‘হ্যাঁ’, হে আল্লাহর রাসূল! আপনিও সাক্ষী থাকুন।’ তিনি বলেন ঃ ‘সেও তোমার উপর গোপন নেই এবং তুমিও তার উপর গোপন নও।’ (আহমাদ ৪/১৬৩)

কুরতুবী (রহঃ) বলেন যে, উমার (রাঃ) ইয়াহুদীদের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত আবদুল্লাহ ইব্ন সালামকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ ‘আপনি কি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমনই চিনেন, যেমন চিনেন আপনার সন্তানদেরকে?' তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'হ্যাঁ', বরং তার চেয়েও বেশি চিনি। কেননা আকাশের বিশ্বস্ত মালাক/ফেরেশতা পৃথিবীর একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ হন এবং তিনি তাঁর সঠিক পরিচয় বলে দিয়েছেন এবং আমিও তাকে চিনতে পেরেছি, যদিও তার মায়ের ব্যাপারে আমার কিছুই জানা নেই। (কুরতুবী ২/১৬৩)

অতঃপর আল্লাহ বলেন যে, ইয়াহুদীরা লোকদের কাছ থেকে সত্যকে গোপন করত, যদিও তারা তাদের ধর্মগ্রন্থে নাবী সম্পর্কে জানত। তারপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলিমদেরকে সত্যের উপর অটল ও স্থির থাকার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং তাদেরকে সতর্ক করছেন যে, তারা যেন সত্যের ব্যাপারে মোটেই সন্দেহ পোষণ না করে।

১৪৮। প্রত্যেকের জন্য এক একটি লক্ষ্যস্থল রয়েছে, ঐ দিকেই সে মুখমন্ডল প্রত্যাবর্তিত করে, অতএব তোমরা কল্যাণের দিকে ধাবিত হও; তোমরা যেখানেই থাকনা কেন, আল্লাহ তোমাদের সকলকেই একত্রিত করবেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান।	١٤٨. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ۖ فَٱسْتَبِقُوا۟ ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا۟ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

প্রত্যেক জাতিরই কিবলাহ রয়েছে

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ 'এর ভাবার্থ এই যে, প্রত্যেক জাতির এক একটি কিবলাহ রয়েছে, কিন্তু সত্য কিবলাহ ওটাই যার উপরে মুসলিমরা রয়েছে।' (তাবারী ৩/১৯৩) আবুল আলিয়া (রহঃ) বলেন ঃ 'ইয়াহুদীদেরও কিবলাহ রয়েছে, খৃষ্টানদেরও কিবলাহ রয়েছে এবং হে মুসলিমগণ! তোমাদেরও কিবলাহ রয়েছে, কিন্তু হিদায়াত বিশিষ্ট কিবলাহ ওটাই যার উপরে তোমরা (মুসলিমরা) রয়েছ।' মুজাহিদ (রহঃ) 'আতা (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও একই বর্ণনা করেছেন। (ইব্ন আবী হাতিম ১/১২১, ১২২)

মুজাহিদ (রহঃ) হতে এও বর্ণিত আছে যে, যেসব সম্প্রদায় কা'বাকে কিবলাহ রূপে মেনে নিয়েছে, সাওয়াবের কাজে তারা অগ্রগামী।

উল্লিখিত আয়াতটি নিম্নের আয়াতের সাথে মিল রয়েছে, যেমন ঃ

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۖ فَٱسْتَبِقُوا۟ ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا

তোমাদের প্রত্যেকের (সম্প্রদায়) জন্য আমি নির্দিষ্ট শারীয়াত এবং নির্দিষ্ট পন্থা নির্ধারণ করেছিলাম; আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তাহলে তোমাদের সকলকে একই উম্মাত করে দিতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি এ কারণে যে, যে ধর্ম তিনি তোমাদেরকে প্রদান করেছেন তাতে তোমাদের সকলকে পরীক্ষা করবেন, সুতরাং তোমরা কল্যাণকর বিষয়সমূহের দিকে ধাবিত হও; তোমাদের সকলকে আল্লাহরই সমীপে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৪৮) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'হে মানব মণ্ডলী! তোমাদের শরীর ছিন্ন ভিন্ন হলেও এবং তোমরা এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়লেও আল্লাহ তা'আলা তাঁর ব্যাপক ক্ষমতার বলে তোমাদের সকলকেই একদিন একত্রিত করবেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।

১৪৯। এবং তুমি যেখান হতেই বের হবে- তোমার মুখ পবিত্রতম মাসজিদের দিকে প্রত্যাবর্তিত কর এবং নিশ্চয়ই এটাই তোমার রবের নিকট হতে প্রেরিত সত্য এবং তোমরা যা করছ তদ্বিষয়ে আল্লাহ অমনোযোগী নন।	١٤٩. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَإِنَّهُۥ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
১৫০। আর তুমি যেখান হতেই নিষ্ক্রান্ত হও - তোমার মুখ পবিত্রতম মাসজিদের দিকে ফিরাও এবং যে যেখানে আছ তোমাদের মুখমন্ডল	١٥٠. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ

ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِى وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِى عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ	**তদ্দিকেই প্রত্যাবর্তিত কর যেন অত্যাচারীরা ব্যতীত অপরে তোমাদের সাথে বির্তক করতে না পারে। অতএব তোমরা তাদেরকে ভয় করনা, বরং আমাকেই ভয় কর যেন আমি তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ পূর্ণ করি, এবং যেন তোমরা সুপথ প্রাপ্ত হও।**

কিবলাহ পরিবর্তনের কথা তিনবার বলার কারণ

কিবলাহ পরিবর্তনের কথা বলে তিনবার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, সারা জগতের মুসলিমকে সালাতের সময় ‘মাসজিদে হারামে’র দিকে মুখ করতে হবে। তিনবার বলে এই হুকুমের প্রতি বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। কেননা এই পরিবর্তনের নির্দেশ এই প্রথমবারই ঘটেছে।

কেহ কেহ বলেন যে, তিনটি নির্দেশের সম্পর্ক পূর্ব ও পরের রচনার সঙ্গে রয়েছে। প্রথম নির্দেশের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রার্থনা ও তা কবূল হওয়ার বর্ণনা আছে। দ্বিতীয় নির্দেশের মধ্যে এই কথার বর্ণনা রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাহিদা আমাদের চাহিদারই অনুরূপ ছিল এবং সঠিক কাজও এটাই ছিল। তৃতীয় নির্দেশের মধ্যে ইয়াহুদীদের দলীলের উত্তর রয়েছে। কেননা তাদের গ্রন্থে প্রথম হতেই এটা বিদ্যমান ছিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিবলাহ হবে কা’বা ঘর। সুতরাং এই নির্দেশের ফলে ঐ ভবিষ্যদ্বাণীও সত্যে পরিণত হয়। সাথে সাথে ঐ মুশরিকদের যুক্তিও শেষ হয়ে যায়। কেননা তারা কা’বাকে বারাকাতময় ও মর্যাদাপূর্ণ মনে করত আর এখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনোযোগও ওরই দিকে হয়ে গেল। ইমাম রাযী (রহঃ) প্রভৃতি মনীষী এখানে এই হুকুমকে বার বার আনার হিকমাত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ ‘যেন তোমাদের উপর আহলে কিতাবের যুক্তি ও বিতর্কের কোন অবকাশ না থাকে।’ তারা জানত যে, এই উম্মাতের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কা’বার দিকে সালাত আদায় করা। যখন তারা এই বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে না পাবে তখন তাদের সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে। কিন্তু যখন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই কিবলাহর দিকে ফিরতে দেখলো তখন তাদের কোন প্রকারের সন্দেহ না থাকারই কথা।

পূর্বের কিবলাহ পরিবর্তনের বিচক্ষণতা

আর এটা একটা কারণ যে, যখন তারা মুসলিমদেরকে তাদের (ইয়াহুদীদের) কিবলাহর দিকে সালাত আদায় করতে দেখবে তখন তারা একটা অজুহাত দেখানোর সুযোগ পেয়ে যাবে। কিন্তু যখন মুসলিমরা ইবরাহীমের (আঃ) কিবলাহর দিকে সালাত আদায় করবে তখন সেই সুযোগ তাদের হাত ছাড়া হয়ে যাবে। আবুল আলিয়া (রহঃ) বলেন ঃ ইয়াহুদীদের এই যুক্তি ছিল যে, আজ মুসলিমরা আমাদের কিবলাহর দিকে ফিরেছে, কাল তারা আমাদের ধর্মও মেনে নিবে। কিন্তু যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশক্রমে প্রকৃত কিবলাহ গ্রহণ করলেন তখন তাদের আশার গুড়ে বালি পড়ে যায়।’

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, তাদের মধ্যে যারা ঝগড়াটে ও অত্যাচারী রয়েছে তারা ব্যতীত মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমালোচনা করে বলত যে, এই ব্যক্তি মিল্লাতে ইবরাহীমের (আঃ) দাবী করছেন অথচ তাঁর কিবলাহর দিকে সালাত আদায় করেননা। এখানে যেন তাদেরকেই উত্তর দেয়া হচ্ছে যে, এই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশের অনুসারী। তিনি স্বীয় পূর্ণ বিচক্ষণতা অনুসারে তাঁকে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করার নির্দেশ দেন, যা তিনি পালন করেন। অতঃপর তাঁকে ইবরাহীমের (আঃ) কিবলাহর দিকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন, যা তিনি সাগ্রহে পালন করেন। সুতরাং তিনি সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশাধীন। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা মুসলিমদেরকে লক্ষ্য করে বলেন যে, তারা যেন ঐসব অত্যাচারীর সন্দেহের মধ্যে পতিত না হয়। তারা যেন ঐ বিদ্রোহীদের বিদ্রোহকে ভয় না করে। তারা যেন ঐ যালিমদের অর্থহীন সমালোচনার প্রতি মোটেই দৃকপাত না করে। বরং তারা যেন একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাকেই ভয় করে। কিবলাহ পরিবর্তন করার মধ্যে এক মহৎ উদ্দেশ্য ছিল বাতিল পন্থীদের মুখ বন্ধ করা এবং আল্লাহ তা‘আলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমদের উপর তাঁর নি‘আমাত পূর্ণ করে দেয়া এবং কিবলাহর

মত তাদের শারীয়াতকেও পরিপূর্ণ করা। এর মধ্যে আর একটি রহস্য ছিল, যে কিবলাহ হতে পূর্ববর্তী উম্মাতেরা ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিল মুসলিমরা যাতে ওটা থেকে সরে না পড়ে। আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে এই কিবলাহ বিশেষভাবে দান করে সমস্ত উম্মাতের উপর তাদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সাব্যস্ত করেন।

১৫১। আমি তোমাদের মধ্য হতে এরূপ রাসূল প্রেরণ করেছি যে তোমাদের নিকট আমার নিদর্শনাবলী পাঠ করে এবং তোমাদেরকে পবিত্র করে, তোমাদেরকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেয় এবং তোমরা যা অবগত ছিলেনা তা শিক্ষা দান করে।	١٥١. كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَـٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ
১৫২। অতএব তোমরা আমাকেই স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকেই স্মরণ করব এবং তোমরা আমারই নিকট কৃতজ্ঞ হও এবং অবিশ্বাসী হয়োনা।	١٥٢. فَٱذْكُرُونِىٓ أَذْكُرْكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِى وَلَا تَكْفُرُونِ

রাসূল মুহাম্মাদকে (সাঃ) রিসালাত প্রদান মুসলিমদের জন্য আল্লাহর এক বিরাট নি'আমাত

এখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিরাট দানের বর্ণনা দিচ্ছেন। সেই দান হচ্ছে এই যে, তিনি আমাদের মধ্যে আমাদেরই শ্রেণীভুক্ত এমন একজন নাবী পাঠিয়েছেন যিনি আল্লাহ তা'আলার উজ্জ্বল গ্রন্থের নিদর্শনাবলী আমাদের সামনে পাঠ করে শোনাচ্ছেন, আমাদেরকে ঘৃণ্য অভ্যাস, আত্মার দুষ্টামি এবং বর্বরোচিত কাজ হতে বিরত রাখছেন। আর আমাদেরকে কুফরের অন্ধকার হতে বের করে ঈমানের আলোকের পথে নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি আমাদেরকে গ্রন্থ ও জ্ঞান বিজ্ঞান অর্থাৎ কুরআন ও হাদীস শিক্ষা দিচ্ছেন। তিনি আমাদের নিকট ঐ সব গুঢ় রহস্য

Contents

প্রকাশ করে দিচ্ছেন যা আজ পর্যন্ত আমাদের নিকট প্রকাশ পায়নি। সুতরাং তাঁরই কারণে ঐ সমুদয় লোক, যাদের উপর অজ্ঞতা ছেয়ে ছিল, বহু শতাব্দী যাদেরকে অন্ধকার ঘিরে রেখেছিল, যাদের উপর দীর্ঘ দিন ধরে মঙ্গলের ছায়া পর্যন্ত পড়েনি, তারাই বড় বড় আলেমে পরিণত হয়েছে। তারা জ্ঞানের গভীরতায়, পবিত্রতম হৃদয় এবং কথার সত্যতায় তুলনাবিহীন খ্যাতি অর্জন করেছেন। অন্য জায়গায় ইরশাদ হচ্ছে ঃ

لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ

নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাসীগণের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তিনি তাদের নিজেদেরই মধ্য হতে রাসূল প্রেরণ করেছেন, যে তাদের নিকট তাঁর নিদর্শনাবলী পাঠ করে ও তাদেরকে পবিত্র করে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৬৪) যারা রাসূল নামের এই নি‘আমাতকে যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদান করেনা তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা সমালোচনা করে বলেন ঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ

তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনা যারা আল্লাহর অনুগ্রহের বদলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তাদের সম্প্রদায়কে নামিয়ে আনে ধ্বংসের আলয়ে? (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ২৮) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এখানে ‘আল্লাহর নি‘আমাত’–এর ভাবার্থে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। (বুখারী ৩৯৭৭) এ জন্যই এই আয়াতের মধ্যেও আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নি‘আমাতের বর্ণনা দিয়ে মু’মিনদেরকে তাঁর স্মরণের ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ দিয়ে বলেন ঃ

فَٱذْكُرُونِىٓ أَذْكُرْكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِى وَلَا تَكْفُرُونِ

অতএব তোমরা আমাকেই স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকেই স্মরণ করব এবং তোমরা আমারই নিকট কৃতজ্ঞ হও এবং অবিশ্বাসী হয়োনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৫২) হাসান বাসরী (রহঃ) প্রভৃতি মনীষীর উক্তি এই যে, আল্লাহ যে বিধান দিয়েছেন তা যে স্মরণ করে আল্লাহও তাঁর প্রতিদানের ব্যাপারে তাকে স্মরণ করবেন। (ইব্ন আবী হাতিম ১/১৪১) তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীকে তিনি আরও বেশি দান করেন এবং তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞকে তিনি শাস্তি দিয়ে থাকেন।

একটি কুদুসী হাদীসে আছে যে, আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ ‘যে আমাকে তার অন্তরে স্মরণ করে, আমিও তাকে আমার অন্তরে স্মরণ করি এবং যে আমাকে কোন দলের মধ্যে স্মরণ করে, আমিও তাকে ওর চেয়ে উত্তম দলের মধ্যে স্মরণ করি।’ (ফাতহুল বারী ১৩/৩৯৫) মুসনাদ আহমাদে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

‘হে আদম সন্তান! যদি তুমি আমার দিকে কনিষ্ঠাঙ্গুলি পরিমান স্থান অগ্রসর হও তাহলে আমি তোমার দিকে এক হাত অগ্রসর হব। যদি তুমি আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হও তাহলে আমি তোমার দিকে দুই হাত অগ্রসর হব, আর যদি তুমি আমার দিকে হেঁটে হেঁটে আস তাহলে আমি তোমার দিকে দৌড়ে আসব। সহীহ বুখারীতেও এ হাদীসটি কাতাদাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত। (আহমাদ ৩/১৩৮, ফাতহুল বারী ১৩/৫২১) তিনি বলেন যে, আল্লাহ তা‘আলার দয়া এর চেয়েও অধিক নিকটে রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, অকৃতজ্ঞ হয়োনা। অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِى لَشَدِيدٌ

যখন তোমাদের রাব্ব ঘোষনা করেন ঃ তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক দিব, আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৭) ‘মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, ইমরান ইব্ন হুসাইন (রাঃ) একদা অতি মূল্যবান ‘হুল্লা’ অর্থাৎ লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করে আসেন, যা আমরা পূর্বে অথবা পরে কখনো পরিধান করতে দেখিনি, তিনি বলেন ঃ

‘যখন আল্লাহ তা‘আলা কেহকে কোন পুরস্কার দেন তখন তিনি ওর চিহ্ন তার নিকট দেখতে চান।’ (আহমাদ ৪/৪৩৮)

১৫৩। হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলগণের সাথে আছেন।	١٥٣. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ إِنَّ

	ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّـٰبِرِينَ
১৫৪। আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত বলনা, বরং তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা তা অবগত নও।	١٥٤. وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَن يُقْتَلُ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتٌۢ ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ وَلَـٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ

ধৈর্য ও সালাতের মর্যাদা

‘শোকরের’ পর ‘সাব্‌র’ বা ধৈর্যের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে এবং সাথে সাথেই সালাতের বর্ণনা দিয়ে এ সব সৎ কাজকে মুক্তি লাভের মাধ্যম করে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। এটা স্পষ্ট কথা যে, মানুষ যখন সুখে থাকে তখন সেটা হচ্ছে তার জন্য শোকরের সময়। হাদীসে রয়েছে ঃ

‘মু’মিনের অবস্থা কতই না উত্তম যে, প্রত্যেক কাজে তার জন্য মঙ্গলই নিহিত রয়েছে। সে শান্তি লাভ করলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং এর ফলে সে প্রতিদান পেয়ে থাকে। আর সে কষ্ট পেয়ে ধৈর্য ধারণ করে এবং এরও সে প্রতিদান পেয়ে থাকে। (মুসলিম ৪/২২৯২) এই আয়াতের মধ্যে এরও বর্ণনা রয়েছে যে, বিপদে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং সেই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার মাধ্যম ধৈর্য ও সালাত। যেমন এর পূর্বে বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَـٰشِعِينَ

তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং নিশ্চয়ই ওটা বিনয়ীদের ছাড়া অন্যদের উপর কঠিন কাজ। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৪৫)

يُوَفَّى ٱلصَّـٰبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

ধৈর্যশীলদেরকে অপরিমিত পুরস্কার দেয়া হবে। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ১০)

সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, ‘সাব্‌র’ এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলার দানকে স্বীকার করা, বিপদের প্রতিদান আল্লাহ তা‘আলার নিকট পাওয়ার বিশ্বাস রেখে তার জন্য সাওয়াবের প্রার্থনা করা, প্রত্যেক ভয়, উদ্বেগ এবং কাঠিন্যের স্থলে ধৈর্য ধারণ করা এবং সাওয়াবের আশায় ওর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা।

'সাব্‌র' তিন প্রকার। প্রথম সাব্‌র হচ্ছে নিষিদ্ধ ও পাপের কাজ ছেড়ে দেয়ার উপর 'সাব্‌র'। দ্বিতীয় হচ্ছে আনুগত্য ও সাওয়াবের কাজ করার উপর 'সাব্‌র'। এ 'সাব্‌র' প্রথম 'সাব্‌র' হতে বড়। আরও এক প্রকারের ধৈর্য আছে, তা হচ্ছে বিপদ ও দুঃখের সময় ধৈর্য। এটাও ওয়াজিব। যেমন অপরাধ ও পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করা ওয়াজিব।

আবদুর রাহমান (রহঃ) বলেন যে, জীবনের উপর কঠিন হলেও, স্বভাব বিরুদ্ধ হলেও এবং মনে না চাইলেও ধৈর্যের সাথে আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালন করা হচ্ছে এক ধরনের 'সাব্‌র।' দ্বিতীয় 'সাব্‌র' হচ্ছে প্রকৃতির ও মনের চাহিদা মোতাবেক হলেও আল্লাহর অসন্তুষ্টির কাজ হতে বিরত থাকা। যারা ধৈর্য ধারণ করার গুণাগুণ অর্জন করেছে তারা হবে ঐ লোকদের দলভুক্ত যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা অভিনন্দন জানাবেন (কিয়ামাত দিবসে)। (দেখুন সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৪৪) আল্লাহ আমাদেরকে সেই তাওফীক দান করুন। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/১৪৪)

শহীদগণের রয়েছে নি'আমাতপূর্ণ জীবন

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'আল্লাহর পথে শহীদ ব্যক্তিগণকে তোমরা মৃত বলনা। বরং তারা এমন জীবন লাভ করেছে যা তোমরা অনুধাবন করতে পারনা। তারা 'বারযাখী' জীবন (মৃত্যু ও কিয়ামাতের মধ্যবর্তী অবকাশ) লাভ করেছে এবং সেখানে তারা আহার্য পাচ্ছে। বর্ণিত আছে ঃ

'শহীদগণের আত্মাগুলি সবুজ রংয়ের পাখীসমূহের দেহের ভিতর রয়েছে এবং তারা জান্নাতের মধ্যে যথেচ্ছা ঘুরে বেড়ায়, অতঃপর তারা ঐসব প্রদীপের উপর এসে বসে যা 'আরশের নীচে ঝুলানো রয়েছে। তাদের প্রভু তাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'এখন তোমরা কি চাও?' তারা উত্তরে বলে ঃ 'হে আমাদের প্রভু! আপনি তো আমাদেরকে ঐসব জিনিস দিয়েছেন যা অন্য কেহকেও দেননি। সুতরাং এখন আর আমাদের কোন্ জিনিসের প্রয়োজন হবে?' তাদেরকে পুনরায় একই প্রশ্ন করা হয়। যখন তারা দেখে যে, অব্যাহতি হচ্ছেনা তখন তারা বলে ঃ 'হে আমাদের প্রভু! আমরা চাই যে, আপনি আমাদেরকে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিন। আমরা আপনার পথে আবার যুদ্ধ করে পুনরায় শাহাদাৎ বরণ করে আপনার নিকট ফিরে আসব। এর ফলে আমরা শাহাদাতের দ্বিগুণ মর্যাদা লাভ করব।' প্রবল প্রতাপান্বিত রাব্ব তখন বলেন ঃ 'এটা হতে পারেনা। আমি তো এটা লিখেই দিয়েছি যে, কেহই মৃত্যুর পর দুনিয়ায় আর ফিরে যাবেনা।' (মুসলিম ৩/১৫০২)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, আবদুর রাহমান ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন মালিক (রহঃ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মু'মিনের রূহ একটি পাখী যা জান্নাতের গাছে অবস্থান করে এবং কিয়ামাতের দিন সে নিজের দেহে ফিরে আসবে। (আহমাদ ৩/৪৫৫) এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, প্রত্যেক মু'মিনের আত্মা সেখানে জীবিত রয়েছে। কিন্তু শহীদগণের আত্মার এক বিশেষ সম্মান, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।

১৫৫। এবং নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা, ধন, প্রাণ এবং ফল-ফসলের দ্বারা পরীক্ষা করব; এবং ঐ সব ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ প্রদান কর -	١٥٥. وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ
১৫৬। যাদের উপর কোন বিপদ নিপতিত হলে তারা বলে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহরই জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।	١٥٦. ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا۟ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ
১৫৭। এদের উপর তাদের রবের পক্ষ হতে শান্তি ও করুনা বর্ষিত হবে এবং এরাই সুপথগামী।	١٥٧. أُو۟لَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ

মু'মিনগণ বিপদে ধৈর্য ধারণের জন্য প্রতিদান পেয়ে থাকেন

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি স্বীয় বান্দাগণকে অবশ্যই পরীক্ষা করে থাকেন। কখনও পরীক্ষা করেন উন্নতি ও মঙ্গলের দ্বারা, আবার কখনও পরীক্ষা করেন অবনতি ও অমঙ্গল দ্বারা। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ ٱلْمُجَٰهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَنَبْلُوَا۟ أَخْبَارَكُمْ

আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, যতক্ষণ না আমি জেনে নেই তোমাদের মধ্যে কে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীল এবং আমি তোমাদের কার্যাবলী পরীক্ষা করি। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ৩১) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

فَأَذَٰقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ

ফলে তাদের কৃতকর্মের কারণে আল্লাহ তাদেরকে আস্বাদ গ্রহণ করালেন ক্ষুধা ও ভীতির। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১১২) এ সবের ভাবার্থ এই যে, সামান্য ভয়-ভীতি, কিছু ক্ষুধা, কিছু ধন-মালের ঘাটতি, কিছু প্রাণের হ্রাস অর্থাৎ নিজের ও অপরের, আত্মীয়-স্বজনের এবং বন্ধু-বান্ধবের মৃত্যু, কখনও ফল এবং উৎপাদিত শস্যের ক্ষতি ইত্যাদি দ্বারা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে পরীক্ষা করেন। এতে ধৈর্যধারণকারীদের তিনি উত্তম প্রতিদান দেন এবং অসহিষ্ণু, তাড়াহুড়াকারী এবং নৈরাশ্যবাদীদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করেন। এ জন্যই তিনি বলেন ঃ

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

বিপদাপদে 'আমরা আল্লাহরই উপর নির্ভরশীল' বলায় উপকারিতা

এখন বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট ধৈর্যশীলদের যে মর্যাদা রয়েছে তারা কোন্ প্রকারের লোক? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, এরা তারাই যারা সংকীর্ণতা ও বিপদের সময় انَّ لله পড়ে থাকে এবং এই কথার দ্বারা নিজেদের মনকে সান্ত্বনা দেয় যে, ওটা আল্লাহ তা'আলারই অধিকারে রয়েছে। বান্দার এই উক্তির কারণে তার উপর মহান আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ অবতীর্ণ হয়, সে শাস্তি হতে মুক্তি লাভ করে এবং সুপথ প্রাপ্ত হয়।

আমীরুল মু'মিনীন উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) বলেন ঃ 'সম্মানের দু'টি জিনিস رَحْمَةٌ ও صَلَوٰتٌ এবং একটি মধ্যবর্তী জিনিস রয়েছে অর্থাৎ 'হিদায়াত' এগুলি

ধৈর্যশীলরা লাভ করে থাকে।' মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন ঃ 'একদা আমার স্বামী আবূ সালমা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে আমার নিকট আসেন এবং অত্যন্ত খুশি মনে বলেন ঃ

'আজ আমি এমন একটি হাদীস শুনেছি যা শুনে আমি খুবই খুশি হয়েছি'। ঐ হাদীসটি এই যে, যখন কোন মুসলিমের উপর কোন কষ্ট ও বিপদ পৌঁছে এবং সে নিম্নের দু'আটি পাঠ করে তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে অবশ্যই বিনিময় ও প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

اَللَّهُمَّ أَجِرْنِي فِيْ مُصِيْبَتِي وَأَخْلِفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا

'হে আল্লাহ! আমাকে মুসীবাতের সময় ধৈর্য ধরার শক্তি দাও এবং উহার পরিবর্তে উত্তম কিছু দান কর।

উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন ঃ 'আমি এই দু'আটি মুখস্থ করে নেই। অতঃপর আবূ সালমার (রাঃ) ইন্তেকাল হলে আমি إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পাঠ করি এবং এই দু'আটিও পড়ে নেই। কিন্তু আমার ধারণা হয় যে, আবূ সালমা (রাঃ) অপেক্ষা আর ভাল লোক আমি কাকে পাব? আমার 'ইদ্দাত' অতিক্রান্ত হলে একদিন আমি আমার একটি চামড়ায় রং করছিলাম।

এমন সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করেন এবং ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চান। আমি চামড়াটি রেখে হাত ধুইয়ে নেই এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঘরের ভিতরে আসার জন্য বলি। তাঁকে একটি নরম আসনে বসতে দেই। তিনি আমাকে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁকে আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এটাতো আমার জন্য বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার, কিন্তু প্রথমতঃ আমি একজন লজ্জাবতী নারী। না জানি হয়ত আপনার স্বভাবের উল্টা কোন কাজ আমার দ্বারা সংঘটিত হয়ে যায় এবং এ কারণে আল্লাহ তা'আলার নিকট আমার শাস্তিই হয় নাকি! দ্বিতীয়তঃ আমি একজন বয়স্কা নারী। তৃতীয়তঃ আমার ছেলে মেয়ে রয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'দেখ! আল্লাহ তা'আলা তোমার এই অনর্থক লজ্জা দূর করে দিবেন। আর বয়স আমারও তো কম নয় এবং তোমার ছেলে মেয়ে যেন আমারই ছেলে মেয়ে।' আমি এ কথা শুনে বললাম ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই।' অতঃপর আল্লাহর নাবীর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে যায় এবং এই দু'আর বারাকাতে আমার পূর্ব স্বামী অপেক্ষা উত্তম স্বামী অর্থাৎ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দান করেন। (আহমাদ ৪/২৭, মুসলিম ২/৬৩৩)

১৫৮। নিশ্চয়ই 'সাফা' ও 'মারওয়া' আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত। অতএব যে ব্যক্তি এই গৃহে 'হাজ্জ' অথবা 'উমরাহ' পালন' করে তার জন্য এতদুভয়ের প্রদক্ষিণ করা দোষণীয় নয়, এবং কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সৎ কাজ করলে আল্লাহ গুণগ্রাহী, সর্বজ্ঞাত।	١٥٨. إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

'এতে কোন দোষ নেই' বাক্যটির অর্থ

উরওয়া (রাঃ) আয়িশাকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ এ আয়াত দ্বারা এরূপ জানা যাচ্ছে যে, 'তাওয়াফ' না করায় কোন দোষ নেই? তিনি বলেন ঃ 'হে প্রিয় ভাগ্নে! তুমি সঠিক বুঝতে পারনি। তুমি যা বুঝেছ, ভাবার্থ তা হলে أَن لَّا يَطُوفَ بِهِمَا বলা হত। বরং এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার কারণ এই যে, 'মাশআল' নামক স্থানে 'মানাত' নামে একটি মূর্তি ছিল। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে মাদীনার আনসারেরা উহার পূজা করত এবং যে উহার উপাসনায় দাঁড়াত সে 'সাফা' ও 'মারওয়া' পাহাড়দ্বয়ের তাওয়াফকে দূষণীয় মনে করত। এখন ইসলাম গ্রহণের পর জনগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 'সাফা' ও 'মারওয়া' পাহাড়দ্বয়ের তাওয়াফের দোষ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا এই

আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং এতে বলা হয় যে, এই তাওয়াফে কোন দোষ নেই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'সাফা' ও 'মারওয়ায় তাওয়াফ করেন। এ জন্যই এটি সুন্নাত রূপে পরিগণিত হয়। এখন এই তাওয়াফকে ত্যাগ করা কারও জন্য উচিত নয়। (আহমাদ ৬/১৪৪) অন্য বর্ণনায় আছে, উরওয়া (রাঃ) পরবর্তী সময় আবূ বাকর ইব্ন আবদুর রাহমান ইব্ন হারিস ইব্ন হিসামকে (রহঃ) এই বর্ণনাটি বললে তিনি বলেন ঃ 'আমি তো এর পূর্বে এটি শ্রবণই করিনি। তবে আয়িশা (রাঃ) যাদের কথা উল্লেখ করেছেন তারা ছাড়া অন্যান্য বিদ্বান ব্যক্তিগণ বলেছেন যে, জাহিলিয়াত জামানায় আমরা সাফা মারওয়া তাওয়াফ করতাম। আনসারগণের অন্য এক দল (রাঃ) বলতেন ঃ 'আমাদের প্রতি বাইতুল্লাহকে তাওয়াফ করার নির্দেশ ছিল, 'সাফা ও 'মারওয়া'র তাওয়াফের নয়। সেই সময় إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আবূ বাকর ইব্ন আবদুর রাহমান (রহঃ) বলেছেন ঃ এই আয়াতটি উভয় দলের ব্যাপারেই অবতীর্ণ হওয়ারই সম্ভাবনা রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৩/৫৮১, মুসলিম ২/৯২৯)

আশ শাবী (রহঃ) বলেন ঃ 'ইসাফ' নামের মূর্তিটি ছিল 'সাফা' পাহাড়ের উপর এবং 'নায়েলা' নামের মূর্তিটি ছিল 'মারওয়া' পাহাড়ের উপর। মুশরিকরা ঐ দু'টোকে স্পর্শ করত ও চুমু দিত। ইসলামের আবির্ভাবের পর মুসলিমরা তাদের থেকে পৃথক হয়ে যায়। কিন্তু এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার ফলে এখানকার তাওয়াফ সাব্যস্ত হয়।

সাফা-মারওয়ায় দৌড়ানোয় নিগুঢ়তা (হিকমাত)

সহীহ মুসলিমে একটি সুদীর্ঘ হাদীস রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইতুল্লাহর তাওয়াফ সমাপ্ত করার পর 'হাজরে আসওয়াদ'কে চুম্বন করেন। অতঃপর তিনি 'বাবুস্ সাফা' দিয়ে বের হন। ঐ সময় তিনি إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ এ আয়াতটি পাঠ করেন। বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি বলেন ঃ 'আমিও ওটা থেকেই শুরু করব যা থেকে আল্লাহ তা'আলা শুরু করেছেন (অর্থাৎ সাফা পাহাড়ের বর্ণনা আগে শুরু করেছেন)।' (নাসাঈ ৫/২৩৯)

হাবীবা বিন্ত আবূ তাজবাহ (রাঃ) বলেন ঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি, তিনি 'সাফা' 'মারওয়া' তাওয়াফ করছিলেন। জনমণ্ডলী তাঁর আগে আগে ছিল এবং তিনি তাদের পিছনে ছিলেন। তিনি কিছুটা

দৌড়ে চলছিলেন এবং এ কারণে তাঁর লুঙ্গি তাঁর জানুর মধ্যে এদিক ওদিক হচ্ছিল। আর তিনি পবিত্র মুখে উচ্চারণ করছিলেন ঃ ‘হে জনমণ্ডলী! তোমরা দৌড়ে চল। আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের উপর দৌড়ানো লিখে দিয়েছেন।’ (আহমাদ ৬/৪২১) এ রকম অর্থেরই আরও একটি বর্ণনা রয়েছে। এই হাদীসটি ঐসব লোকের দলীল যারা ‘সাফা ও মারওয়া’ দৌড়কে হাজ্জের রুকন মনে করেন।

ইবরাহীমকে (আঃ) হাজ্জ পালন করার জন্য এটি শিক্ষা দেয়া হয়েছিল। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, এখানে হাজেরার (আঃ) সাত বার প্রদক্ষিণই হচ্ছে ‘সাফা’ ‘মারওয়া’য় দৌড়ানোর মূল উৎস। যখন ইবরাহীম (আঃ) তাঁকে তাঁর শিশুপুত্রসহ এখানে রেখে গিয়েছিলেন এবং তাঁর খাদ্য শেষ হয়ে গিয়েছিল ও শিশু ওষ্ঠাগত প্রাণ হয়ে পড়েছিল তখন হাজেরা (আঃ) অত্যন্ত উদ্বেগ এবং দুর্ভাবনার সাথে এই পবিত্র পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে স্বীয় অঞ্চল ছড়িয়ে দিয়ে মহান আল্লাহর নিকট ভিক্ষা চাচ্ছিলেন। অবশেষে মহান আল্লাহ তাঁর দুঃখ, চিন্তা, কষ্ট ও দুর্ভাবনা সব দূর করে দিয়েছিলেন। এখানে প্রদক্ষিণকারী হাজীগণেরও উচিত যে, তাঁরা যেন অত্যন্ত দারিদ্র ও বিনয়ের সাথে এখানে প্রদক্ষিণ করেন এবং মহান আল্লাহর নিকট নিজেদের অভাব, প্রয়োজন এবং অসহায়তার কথা পেশ করেন ও মনের সংস্কার এবং সুপথ প্রাপ্তির প্রার্থনা জানান, আর পাপ মোচনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তাঁদের দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত থাকা এবং অবাধ্যতার প্রতি ঘৃণা থাকা উচিত। তাঁদের কর্তব্য হবে এই যে, তাঁরা যেন স্থিরতা, সাওয়াব, মুক্তি এবং মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করেন ও আল্লাহ তা‘আলার নিকট আরয করেন যে, তিনি যেন তাঁদেরকে অন্যায় ও পাপরূপ সংকীর্ণ পথ হতে সরিয়ে উৎকর্ষতা, ক্ষমা এবং সাওয়াবের তাওফীক প্রদান করেন, যেমন তিনি হাজেরার (আঃ) অবস্থাকে এদিক হতে ওদিকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا *যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করে* অর্থাৎ সাতবার প্রদক্ষিণের স্থলে আটবার বা নয়বার প্রদক্ষিণ করে কিংবা নফল হাজ্জ এবং উমরাহর মধ্যে ‘সাফা-মারওয়া’র তাওয়াফ করে। আবার আল রাজী (রহঃ) প্রমুখ একে সাধারণ রেখেছেন অর্থাৎ প্রত্যেক সাওয়াবের কাজই অতিরিক্তভাবে করে। (আর রাজী ৪/১৪৬) এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

Contents

নিশ্চয়ই আল্লাহ বিন্দুমাত্রও অত্যাচার করেননা এবং যদি কেহ কোন সৎ কাজ করে তাহলে তিনি ওটা দ্বিগুণ করে দেন এবং স্বীয় পক্ষ হতে ওর মহান প্রতিদান প্রদান করেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪০)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অল্প কাজেই বড় সাওয়াব দান করেন এবং প্রতিদানের সঠিক পরিমাণ তাঁর জানা আছে। তিনি কারও সাওয়াব এতটুকুও কম করবেননা, আবার তিনি অণু পরিমাণ অত্যাচারও করবেননা। তবে তিনি সাওয়াবের প্রতিদান বৃদ্ধি করে থাকেন এবং নিজের নিকট হতে বিরাট প্রতিদান প্রদান করেন। সুতরাং 'হামদ' ও 'শোক্‌র' আল্লাহ তা'আলারই জন্য।

১৫৯। আমি যে সব উজ্জ্বল নিদর্শন ও পথ-নির্দেশ অবতীর্ণ করেছি, ঐগুলিকে সর্ব সাধারণের নিকট প্রকাশ করার পরও যারা ঐসব বিষয়কে গোপন করে, আল্লাহ তাদেরকে অভিসম্পাত করেন এবং অভিসম্পাতকারীরাও তাদেরকে অভিসম্পাত করে থাকে।	١٥٩. إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِى ٱلْكِتَٰبِ ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ
১৬০। কিন্তু যারা তাওবাহ করে ও সংশোধিত হয় এবং সত্য প্রকাশ করে, বস্তুতঃ আমি তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদানকারী, করুণাময়।	١٦٠. إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ وَأَصْلَحُوا۟ وَبَيَّنُوا۟ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ
১৬১। যারা অবিশ্বাস করেছে ও অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে, নিশ্চয়ই তাদের উপর আল্লাহর মালাক/ফেরেশতা এবং	١٦١. إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ كُفَّارٌ أُو۟لَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ

মানবকূলের সবারই অভিসম্পাত।	ٱللَّهِ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ
১৬২। তন্মধ্যে তারা সর্বদা অবস্থান করবে, তাদের শাস্তি প্রশমিত হবেনা এবং তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবেনা।	١٦٢. خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۖ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ

ঐ সমস্ত লোকের উপর আল্লাহর অভিশাপ, যারা ধর্মীয় আদেশ নিষেধ গোপন করে

এখানে ঐ সব লোককে ভীষণভাবে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যারা আল্লাহ তা'আলার কথাগুলি এবং শারীয়াতের বিষয়গুলি গোপন করত। কিতাবীরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশংসা বিষয়ক কথাগুলি গোপন রাখত। এ জন্যই এরশাদ হচ্ছে যে, সত্যকে গোপনকারীরা অভিশপ্ত। যেমন প্রত্যেক জিনিস ঐ আলেমের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে যিনি জনসাধারণের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার কথাগুলি প্রচার করেন। এমন কি পানির মাছ এবং আকাশের পাখিরাও তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। অনুরূপভাবে যারা সত্য কথা জেনে শুনে গোপন করে এবং বোকা ও বধির হওয়ার ভান করে তাদের প্রতি প্রত্যেক জিনিসই অভিশাপ দিয়ে থাকে। সহীহ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যে ব্যক্তি শারীয়াতের কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয় এবং সে তা গোপন করে, কিয়ামাতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো হবে।' (আহমাদ ২/৪৯৫) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন ঃ 'এই আয়াতটি না থাকলে আমি একটি হাদীসও বর্ণনা করতামনা। (ফাতহুল বারী ১/২৫৮) বারা ইব্ন আযিব (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ 'আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে একটি জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'কাবরের মধ্যে কাফিরের কপালে এত জোরে হাতুড়ী মারা হয় যে, মানব ও দানব ছাড়া সমস্ত প্রাণী ওর শব্দ শুনতে পায় এবং ওরা সবাই তার প্রতি অভিশাপ দেয়। 'অভিসম্পাতকারীরা তাদের প্রতি অভিসম্পাত করে থাকে, এ কথার অর্থ এটাই। অর্থাৎ সমস্ত প্রাণীর অভিশাপ তাদের উপর রয়েছে। 'আতা (রহঃ) বলেন

لَا عِنُوْنَ শব্দের ভাবার্থে সমুদয় জীবজন্তু এবং সমস্ত দানব ও মানবকে বুঝানো হয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, যে বছর ভূমি শুকিয়ে যায় এবং বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায় তখন চতুস্পদ জন্তুরা বলে ঃ 'এটা বানী আদমের পাপেরই ফল, আল্লাহ তা'আলা বানী আদমের পাপীদের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করুন।' (ইব্ন আবী হাতিম ১/১৭৪) কোন কোন মুফাস্সির বলেন যে, এর দ্বারা মালাক/ফেরেশতা এবং মু'মিনগণকে বুঝানো হয়েছে।

হাদীসে রয়েছে যে, আলেমের জন্য প্রত্যেক জিনিসই ক্ষমা প্রার্থনা করে। এমন কি সমুদ্রের মাছও (ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে), এই আয়াতে রয়েছে যে, যারা 'ইল্ম'-কে গোপন করে আল্লাহ তাদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করেন এবং মালাইকা, সমস্ত মানুষ ও প্রত্যেক অভিসম্পাতকারী অভিসম্পাত করে থাকে। অর্থাৎ প্রত্যেক বাকশক্তিহীন (জীব) অভিসম্পাত করে থাকে। সেটা ভাষার মাধ্যমেই হউক অথবা ইঙ্গিত দ্বারাই হউক। কিয়ামাত দিবসেও সমস্ত জিনিস তাকে অভিসম্পাত করতে থাকবে।

إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ এরপর আল্লাহ তা'আলা ঐ সব মানুষকে অভিশপ্তদের মধ্য হতে বের করে নেন যারা তাদের এই কাজ হতে বিরত হয় এবং সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত হয়। আর পূর্বে যা গোপন করেছিল এখন তা প্রকাশ করে দেয়। فَأُوْلَـــئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ সেই 'তাওবাহ' কবূলকারী দয়ালু আল্লাহ এইসব মানুষের তাওবাহ কবূল করেন। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, যে ব্যক্তি মানুষকে কুফর ও বিদ'আতের দিকে আহ্বান করে সেও যদি খাঁটি অন্তরে তাওবাহ করে তাহলে তার তাওবাহও গৃহীত হয়ে থাকে। কোন কোন বর্ণনা দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, পূর্বের উম্মাতদের মধ্যে যারা এ রকম বড় বড় পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ত তাদের তাওবাহ আল্লাহ তা'আলার দরবারে গৃহীত হতনা। কিন্তু নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাতের উপর আল্লাহ তা'আলার এটি বিশেষ মেহেরবানী এই যে, আল্লাহ তাঁর বান্দার তাওবাহ শোনেন ও কবূল করেন।

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. خَالِدِينَ فِيهَا

অতঃপর ঐসব লোকের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যারা কুফরী ও অন্যায় করেছে এবং তাওবাহ করা তাদের ভাগ্যে জুটেনি। এরা কুফরী অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেছে। সুতরাং এদের উপর বর্ষিত হয়েছে আল্লাহর, তাঁর মালাইকার এবং সমস্ত মানুষের

অভিসম্পাত। এই অভিশাপ তাদের উপর জারী থাকে এবং কিয়ামাত পর্যন্ত তাদের সঙ্গেই সংযুক্ত থাকবে। অবশেষে এই অভিশাপ তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে নিয়ে যাবে। তারা চিরকাল সেই শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ তাদের এই শাস্তি এতটুকুও হ্রাস করা হবেনা এবং কখনও তা বন্ধ করা হবেনা। বরং চিরকাল তাদের উপর ভীষণ শাস্তি হতেই থাকবে। আমরা করুণাময় আল্লাহর নিকট তাঁর এই শাস্তি হতে আশ্রয় চাচ্ছি।

অবিশ্বাসীদেরকে অভিশাপ দেয়া যাবে

আবুল আলিয়া (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, কিয়ামাতের দিন কাফিরকে থামিয়ে রাখা হবে। অতঃপর তার উপর আল্লাহ তা'আলা অভিসম্পাত করবেন এবং তারপরে মালাইকা/ফেরেশতাগণ ও মানুষ তাকে অভিশাপ দিবে। কাফিরদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণের ব্যাপারে কারও কোন মত বিরোধ নেই। উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) এবং তাঁর পরের সম্মানিত ইমামগণ সবাই 'কুনূত' প্রভৃতির মাধ্যমে কাফিরদের উপর অভিশাপ দিতেন। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট কাফিরের উপর অভিসম্পাত বর্ষণের ব্যাপারে উলামা-ই কিরামের একটি দল বলেন যে, এটা জায়েয় নয়। কেননা তার পরিণাম কারও জানা নেই। 'কুফরী অবস্থায় তার মৃত্যু হল' এ কথাটি এ আয়াতের মধ্যে জড়িয়ে দেয়া হয়েছে। কোন নির্দিষ্ট কাফিরকে অভিশাপ না দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার এই কথাটি দলীল রূপে পেশ করা যেতে পারে। আলেমদের অন্য একটি দলের মতে নির্দিষ্ট কাফিরের উপরও লান'ত বর্ষণ করা জায়িয। যেমন ধর্মশাস্ত্রবিদ আবূ বাকর ইব্ন আরাবী মালিকী (রহঃ) এই মত পোষণ করেন এবং এর দলীল রূপে তিনি একটি দুর্বল হাদীসও পেশ করেন। কোন নির্দিষ্ট কাফিরের উপর যে অভিসম্পাত বর্ষণ করা জায়িয নয় এর দলীল রূপে কেহ কেহ এই হাদীসটিও এনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট একটি লোককে বার বার মাতাল অবস্থায় আনা হয় এবং বার বারই তার উপরে 'হদ্দ' লাগানো হয়। এই সময় এক ব্যক্তি মন্তব্য করে ঃ 'তার উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক। কেননা সে বার বার মদ্যপান করছে।' এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন ঃ

'তার উপর লা'নত বর্ষণ করনা। কেননা সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে।' (মুসনাদ আবদুর রাযযাক ৭/৩৮১, বুখারী ৬৭৮০) এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ভালবাসা রাখেনা, তার উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করা জায়িয।

১৬৩। এবং তোমাদের ইলাহ একমাত্র আল্লাহ; সেই সর্বদাতা করুণাময় ব্যতীত অন্য কেহ উপাস্য নেই।	١٦٣. وَإِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ لَّآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَـٰنُ ٱلرَّحِيمُ

অর্থাৎ উপাস্য হওয়ার ব্যাপারে তিনি এক। তাঁর কোন অংশীদার নেই। তাঁর মত কেহই নেই। তিনি একক। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। তিনি ছাড়া উপাসনার যোগ্য আর কেহই নেই। তিনি দাতা ও দয়ালু। সূরা ফাতিহার প্রারম্ভে এর তাফসীর হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'আল্লাহ তা'আলার ইসমে আযম (বড় নাম) দু'টি আয়াতে রয়েছে। একটি এই আয়াতটি। দ্বিতীয়টি হচ্ছে নিম্নের এই আয়াতটি ঃ

الٓمٓ. ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ

আলিফ, লাম, মীম। আল্লাহ ছাড়া কোনই ইলাহ (উপাস্য) নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও নিত্য বিরাজমান। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১-২) (আবূ দাউদ ২/১৬৮) এরপর আল্লাহ তা'আলা একাত্মবাদের প্রমাণস্বরূপ ঘোষণা করছেন ঃ

১৬৪। নিশ্চয়ই নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টিতে, দিন ও রাতের পরিবর্তনে, নৌ-পথে জাহাজ-সমূহের চলাচলে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে। মৃত পৃথিবীকে সঞ্জীবিত করণে, তাতে নানাবিধ জীবজন্তু সঞ্চারিত করার জন্য আল্লাহ আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। বায়ুরাশির গতি পরিবর্তনে এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থ সঞ্চিত মেঘের সঞ্চারণে সত্যি সত্যিই	١٦٤. إِنَّ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَـٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِى تَجْرِى فِى ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَـٰحِ

জ্ঞানবান সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।	وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

তাওহীদের প্রমাণ

ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তা‘আলা বলেন, হে মানব জাতি! আমি যে একক উপাস্য তার একটি বড় প্রমাণ হচ্ছে এই আকাশ, যার উচ্চতা, সূক্ষ্মতা ও প্রশস্ততা তোমরা অবলোকন করছ এবং যার গতিহীন ও গতিশীল উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজী তোমাদের চোখের সামনে রয়েছে। আমার একাত্মবাদের দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে পৃথিবীর সৃষ্টি। এটা একটা ঘন মোটা বস্তু যা তোমাদের পায়ের নীচে বিছানো রয়েছে। যার উপরে রয়েছে উঁচু উঁচু শিখর বিশিষ্ট গগণচুম্বী পর্বতসমূহ। তাতে রয়েছে বড় বড় তরঙ্গযুক্ত সমুদ্র। আর যাতে রয়েছে বিভিন্ন প্রকারের সুন্দর সুন্দর লতা ও গুল্ম। যার মধ্যে নানা প্রকারের শস্য উৎপন্ন হয়ে থাকে। যার উপরে তোমরা অবস্থান করছ এবং নিজেদের ইচ্ছামত আরামদায়ক ঘর বাড়ী তৈরী করে সুখ শান্তিতে বসবাস করছ এবং যদ্বারা বহু প্রকারের উপকার লাভ করছ। আল্লাহর একাত্মবাদের আর একটি নিদর্শন হচ্ছে দিন রাতের আগমন ও প্রস্থান। রাত যাচ্ছে দিন আসছে, আবার দিন যাচ্ছে রাত আসছে। এ নিয়মের ব্যতিক্রম কখনও হচ্ছেনা। বরং প্রত্যেকটি আপন আপন নির্ধারিত নিয়মে চলছে। কোন সময় দিন বড় হয়, আবার কোন সময় রাত বড় হয়। কোন সময় দিনের কিছু অংশ রাতের মধ্যে যায় এবং কোন সময় রাতের কিছু অংশ দিনের মধ্যে চলে আসে।

لَا ٱلشَّمْسُ يَنۢبَغِى لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা; এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৪০)

يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِى ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِى ٱلَّيْلِ ۚ وَهُوَ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ

তিনিই রাতকে প্রবেশ করান দিনে এবং দিনকে প্রবেশ করান রাতে। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ৬)

তারপরে তোমরা নৌকাগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত কর যা তোমাদেরকে ও তোমাদের সম্পদ, আসবাবপত্র এবং বাণিজ্যিক দ্রব্যাদি নিয়ে সমুদ্রের মধ্যে এদিক ওদিক চলাচল করছে। এর মাধ্যমে এই দেশবাসী ঐ দেশবাসীর সাথে যোগাযোগ স্থাপন ও লেন দেন করতে পারে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পূর্ণাঙ্গ করুণা ও দয়ার মাধ্যমে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং এর ফলে মৃত ভূমিকে পুনর্জীবিত করেন, আর এর দ্বারা জমি কর্ষণের ব্যবস্থা দান করে ওর থেকে উৎপাদন করেন নানা প্রকারের শস্য।

وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلۡأَرۡضُ ٱلۡمَيۡتَةُ أَحۡيَيۡنَـٰهَا وَأَخۡرَجۡنَا مِنۡهَا حَبًّا فَمِنۡهُ يَأۡكُلُونَ

তাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত ধরিত্রী, যাকে আমি সঞ্জীবিত করি এবং যা হতে উৎপন্ন করি শস্য, যা তারা আহার করে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৩৩),

এরপর আল্লাহ ভূপৃষ্ঠে ছোট বড় বিভিন্ন প্রকারের প্রয়োজনীয় জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন, ওদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন, তাদেরকে আহার্য দিচ্ছেন, তাদের জন্য তৈরি করেছেন শোয়া, বসা এবং চলাচল করার জায়গা।

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزۡقُهَا وَيَعۡلَمُ مُسۡتَقَرَّهَا وَمُسۡتَوۡدَعَهَاۚ كُلٌّ فِي كِتَـٰبٍ مُّبِينٍ

আর ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যাদের রিয্ক আল্লাহর যিম্মায় না রয়েছে, আর তিনি প্রত্যেকের দীর্ঘ অবস্থানের স্থান এবং অল্প অবস্থানের স্থানকে জানেন, সবই কিতাবে মুবীনে (লাওহে মাহফূযে) রয়েছে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৬)

বায়ুকে তিনি চালিত করেছেন পূর্বে, পশ্চিমে, উত্তরে ও দক্ষিণে। কখনও ঠাণ্ডা, কখনও গরম এবং কখনও অল্প, কখনও বেশী। আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে মেঘমালাকে কাজে লাগিয়েছেন। ওগুলি এদিক হতে ওদিকে নিয়ে যাচ্ছেন, প্রয়োজনের সময় বর্ষণ করছেন। এগুলি সবই হচ্ছে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর ক্ষমতার নিদর্শনসমূহ, যদ্বারা জ্ঞানীরা স্বীয় প্রভুর অস্তিত্ব ও তাঁর একাত্মতা অনুধাবন করতে পারে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

إِنَّ فِي خَلۡقِ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَٱخۡتِلَـٰفِ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ لَأَيَـٰتٍ لِّأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَـٰبِ ٱلَّذِينَ يَذۡكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَـٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمۡ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي

خَلْقِ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَـٰذَا بَـٰطِلًا سُبْحَـٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ

নিশ্চয়ই নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টিতে এবং দিন ও রাতের পরিবর্তনে জ্ঞানবানদের জন্য স্পষ্ট নিদর্শনাবলী রয়েছে। যারা দন্ডায়মান, উপবেশন ও এলায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা-গবেষনা করে এবং বলে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আপনি এসব বৃথা সৃষ্টি করেননি; আপনিই পবিত্রতম! অতএব আমাদেরকে জাহান্নাম হতে রক্ষা করুন! (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৯০-১৯১)

১৬৫। এবং মানবমন্ডলীর মধ্যে এরূপ আছে - যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে সদৃশ স্থির করে, আল্লাহকে ভালবাসার ন্যায় তারা তাদেরকে ভালবাসে। এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে আল্লাহর প্রতি - তাদের প্রেম দৃঢ়তর এবং যারা অত্যাচার করেছে তারা যদি শাস্তি অবলোকন করত তাহলে দেখত, সমুদয় শক্তিই আল্লাহর এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।	١٦٥. وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ
১৬৬। যাদের অনুসরণ করা হয়েছে তারা যখন অনুসারীদেরকে প্রত্যাখ্যান করবে তখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে এবং তাদের	١٦٦. إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُوا۟ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا۟ وَرَأَوُا۟ ٱلْعَذَابَ

وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ	**সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।**
١٦٧. وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا۟ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا۟ مِنَّا ۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَٰلَهُمْ حَسَرَٰتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُم بِخَٰرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ	**১৬৭। অনুসরণকারীরা বলবে ঃ যদি আমরা ফিরে যেতে পারতাম তাহলে তারা যেরূপ আমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে আমরাও তদ্রূপ তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করতাম। এভাবে আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের পরিণাম দুঃখজনকভাবে প্রদর্শন করবেন এবং তারা অগ্নি হতে উদ্ধার পাবেনা।**

দুনিয়া এবং আখিরাতে মুশরিকদের অবস্থা

এই আয়াতসমূহে মুশরিকদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে। তারা আল্লাহ তা'আলার অংশীদার স্থাপন করে এবং অন্যদেরকে তাঁর সদৃশ স্থির করে। অতঃপর তাদের সাথে এমন আন্তরিক ভালবাসা স্থাপন করে যেমন ভালবাসা আল্লাহ তা'আলার সাথে হওয়া উচিত। কারণ তিনিই প্রকৃত উপাস্য এবং তিনি অংশীদার হতে সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ 'আমি জিজ্ঞেস করি ঃ হে আল্লাহর রাসূল! সবচেয়ে বড় পাপ কি?' তিনি বললেন ঃ

'আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে শির্ক করা, অথচ সৃষ্টি তিনি একাই করেছেন।' (ফাতহুল বারী ৮/৩, মুসলিম ১/৯০) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ঐসব লোককে শাস্তির সংবাদ দিচ্ছেন যারা শির্কের মাধ্যমে তাদের আত্মার উপর অত্যাচার করছে। যদি তারা শাস্তি অবলোকন করত তাহলে তাদের অবশ্যই বিশ্বাস হত যে, মহা ক্ষমতাবান তো একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই। সমস্ত জিনিস তাঁর অধীনস্থ এবং তাঁরই আজ্ঞাধীন। তাঁর শাস্তিও খুব কঠিন। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ 'সেই দিন তাঁর শাস্তির মত কেহ শাস্তিও দিতে পারবেনা এবং তাঁর পাকড়াও এর মত কেহ পাকড়াও করতে পারবেনা।'

দ্বিতীয় ভাবার্থ এও হতে পারে যে, যদি ঐ দৃশ্য সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান থাকত তাহলে কখনও তারা ‘শির্ক ও ‘কুফর’কে আঁকড়ে থাকতনা। দুনিয়ায় যাদেরকে তারা তাদের নেতা মনে করেছিল, কিয়ামাতের দিন ঐ নেতারা তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে। তারা বলবে ঃ

تَبَرَّأْنَآ إِلَيْكَ ۖ مَا كَانُوٓاْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ

আপনার সমীপে আমরা দায়িত্ব হতে অব্যাহতি চাচ্ছি। এরা আমাদের ইবাদাত করতনা। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৬৩)

মালাইকা/ফেরেশতাগণ বলবেন ঃ ‘হে আমাদের প্রভু! আমরা এদের প্রতি অসন্তুষ্ট। এরা আমাদের উপাসনা করতনা। হে আল্লাহ! আপনি পবিত্র এবং আপনিই আমাদের অভিভাবক। বরং এরা জিনদের উপাসনা করত। এদের অধিকাংশই ওদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী ছিল।’

سُبْحَـٰنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم ۖ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ ۖ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ

আপনি পবিত্র, মহান! আমাদের সম্পর্ক আপনারই সাথে, তাদের সাথে নয়, তারা তো পূজা করত জিনদের এবং তাদের অধিকাংশই ছিল তাদের প্রতি বিশ্বাসী। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৪১)

অনুরূপভাবে জিনরাও তাদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে এবং পরিষ্কারভাবে তাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং তাদের ইবাদাতকে অস্বীকার করবে।

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَـٰفِلُونَ. وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَـٰفِرِينَ

সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামাতের দিন পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিবেনা? এবং ওগুলি তাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিত নয়। যখন কিয়ামাত দিবসে মানুষকে একত্রিত করা হবে তখন ঐগুলি হবে তাদের শত্রু, ঐগুলি তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৫-৬) কুরআন মাজীদের মধ্যে অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لِّيَكُونُواْ لَهُمْ عِزًّا. كَلَّا ۚ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا

তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহকে মা'বূদ রূপে গ্রহণ করে এ জন্য যে, যাতে তারা তাদের সহায় হয়। কখনই নয়; তারা তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৮১-৮২) ইবরাহীম (আঃ) কাফিরদের প্রতি যে উক্তি করেছিলেন কুরআন মাজীদে তা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَـٰنًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّـٰصِرِينَ

তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে মূর্তিগুলিকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করেছ পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের খাতিরে; কিন্তু কিয়ামাত দিবসে তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং পরস্পরকে অভিসম্পাত দিবে। তোমাদের আবাস হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবেনা। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ২৫) এভাবেই অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّـٰلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَآ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ. قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوٓاْ أَنَحْنُ صَدَدْنَـٰكُمْ عَنِ ٱلْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُم ۖ بَلْ كُنتُم مُّجْرِمِينَ. وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَآ أَن نَّكْفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُۥٓ أَندَادًا ۚ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُاْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَـٰلَ فِىٓ أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ۚ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

হায়! তুমি যদি দেখতে! যালিমদেরকে যখন তাদের রবের সামনে দন্ডায়মান করা হবে তখন তারা পরস্পর বাদ প্রতিবাদ করতে থাকবে। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে ঃ তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মু'মিন হতাম। যারা ক্ষমতাদর্পী ছিল তারা যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তাদেরকে বলবে ঃ তোমাদের নিকট সৎ পথের দিশা আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে ওটা হতে নিবৃত্ত করেছিলাম? বস্তুতঃ তোমরাই তো ছিলে অপরাধী। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে ঃ প্রকৃত পক্ষে তোমরাই তো দিন-রাত চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে, আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহকে অমান্য করি এবং তাঁর শরীক স্থাপন করি। যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা অনুতাপ গোপন রাখবে এবং আমি কাফিরদের গলদেশে শৃংখল পরিয়ে দিব। তারা যা করত তারই প্রতিফল তাদেরকে দেয়া হবে। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৩১-৩৩) অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

وَقَالَ ٱلشَّيْطَٰنُ لَمَّا قُضِىَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِىَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَٰنٍ إِلَّآ أَن دَعَوْتُكُمْ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِى ۖ فَلَا تَلُومُونِى وَلُومُوٓا۟ أَنفُسَكُم ۖ مَّآ أَنَا۠ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أَنتُم بِمُصْرِخِىَّ ۖ إِنِّى كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ ۗ إِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

যখন সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে তখন শাইতান বলবে ঃ আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি, আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিনি; আমার তো তোমাদের উপর কোন আধিপত্য ছিলনা, আমি শুধু তোমাদেরকে আহ্বান করেছিলাম এবং তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে; সুতরাং তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ করনা, তোমরা তোমাদের প্রতিই দোষারোপ কর; আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নও; তোমরা যে পূর্বে আমাকে (আল্লাহর) শরীক করেছিলে তার সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই; যালিমদের জন্য তো বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছেই। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ২২) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, وَرَأَوُا۟

الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ তারা শাস্তি দেখে নিবে এবং সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, পালানোরও কোন জায়গা থাকবেনা এবং মুক্তিরও কোন পথ চোখে পড়বেনা। বন্ধুত্ব কেটে যাবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হবে। বিনা প্রমাণে যারা তাদের পরিচালকদের কথামত চলত, তাদের প্রতি বিশ্বাস রাখত এবং তাদের আনুগত্য স্বীকার করত, পূজা করত, তারা যখন তাদের পরিচালক ও নেতাদেরকে দেখবে যে, তারা তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেছে, তখন তারা অত্যন্ত দুঃখ ও নৈরাশ্যের সাথে বলবে ঃ

وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُواْ مِنَّا যদি আমরা পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারতাম তাহলে আমরাও ওদেরকে প্রত্যাখ্যান করতাম যেমন ওরা আমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং আমরা ওদের প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ করতামনা, ওদের কথা মানতামনা এবং ওদেরকে আল্লাহর অংশীদার সাব্যস্ত করতামনা। বরং খাঁটি অন্তরে এক আল্লাহর ইবাদাত করতাম। অথচ সত্যিই যদি ফিরিয়ে দেয়া হয় তবুও তারা পূর্বে যা করেছিল তাই করবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ

যদি তাদেরকে সাবেক পার্থিব জীবনে ফিরে যেতে দেয়া হয়, তবুও যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল তারা তা'ই করবে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ২৮) এ জন্যই বলা হয়েছে ঃ

وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَٰهُ هَبَآءً مَّنثُورًا

আমি তাদের কৃতকর্মগুলি বিবেচনা করব, অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২৩) অর্থাৎ তাদের ভাল কাজ যা কিছু ছিল সেগুলিও নষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ ۖ أَعْمَٰلُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِى يَوْمٍ عَاصِفٍ

যারা তাদের রাব্বকে অস্বীকার করে তাদের উপমা হল, তাদের কাজসমূহ ছাই সদৃশ যা ঝড়ের দিনে বাতাস প্রচন্ড বেগে উড়িয়ে নিয়ে যায়। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ১৮) অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَعۡمَٰلُهُمۡ كَسَرَابِۭ بِقِيعَةٖ يَحۡسَبُهُ ٱلظَّمۡـَٔانُ مَآءً

যারা কুফরী করে, তাদের আমলসমূহ মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ; পিপাসার্ত যাকে পানি মনে করে থাকে। (সূরা নূর, ২৪ ঃ ৩৯) তারপরে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তারা জাহান্নামের অগ্নি হতে উদ্ধার পাবেনা। বরং সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।

১৬৮। হে মানবমন্ডলী! পৃথিবীর মধ্যে যা বৈধ ও পবিত্র, তা হতে আহার কর এবং শাইতানের পদাঙ্ক অনুসরণ করনা, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।	١٦٨. يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ
১৬৯। সে এতদ্ব্যতীত তোমাদেরকে আদেশ করে শাইতানী ও অশ্লীল কাজ করতে এবং আল্লাহ সম্বন্ধে তোমরা যা জাননা তা বলতে।	١٦٩. إِنَّمَا يَأۡمُرُكُم بِٱلسُّوٓءِ وَٱلۡفَحۡشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ

হালাল খাওয়া এবং শাইতানের পদাঙ্ক অনুসরণ না করা

উপরে যেহেতু তাওহীদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, কাজেই এখানে এই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, সমস্ত সৃষ্ট জীবের আহারদাতাও তিনিই। তিনি বলেন ঃ 'তোমরা আমার এই অনুগ্রহের কথা ভুলে যেওনা যে, আমি তোমাদের জন্য উত্তম ও পবিত্র জিনিসগুলি বৈধ করেছি যা তোমাদের কাছে খুবই সুস্বাদু ও তৃপ্তি দানকারী। ঐ খাদ্য তোমাদের শরীর, স্বাস্থ্য এবং জ্ঞান বিবেকের কোন ক্ষতি করেনা। আমি তোমাদেরকে শাইতানের পদাংক অনুসরণ করতে নিষেধ করছি। কেহ কেহ যেমন শাইতানের পথে চলে কতকগুলি হালাল বস্তু তাদের উপর হারাম করে নিয়েছে, শাইতানের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে তোমাদের অবস্থাও তদ্রুপই হবে।

যেমনটি ঘটেছিল 'বাহীরা' (যে উটনীর দুধ শুধুমাত্র মূর্তির জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল এবং অন্যদের পান করা নিষিদ্ধ ছিল), অথবা 'সাইবা' (যে উটনীকে দেব-দেবীর নামে স্বাধীনভাবে চলাচলের জন্য ছেড়ে দেয়া হত এবং কোন বোঝা বহন করায় নিষেধাজ্ঞা ছিল) অথবা 'ওয়াসীলা' (ঐ উটনী যে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রসবকালে উটনী-বাচ্চা প্রসব করত তাকে দেব-দেবীর নামে ছেড়ে দেয়া হত) এবং অন্যান্য জাহিলিয়াতের কাজসমূহ পালন করার জন্য শাইতান তাদের কাছে অতি আকর্ষনীয় করে তুলে ধরত এবং তারাও আল্লাহর আদেশ অমান্য করে তা পালন করত। ইমাম মুসলিম আইয়াদ ইব্ন হিমার (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

'আমি যে ধন-সম্পদ আমার বান্দাদেরকে প্রদান করেছি তা তার জন্য বৈধ করেছি। আমি আমার বান্দাদের একাত্মবাদী রূপে সৃষ্টি করেছি, কিন্তু শাইতান তাদেরকে এই সুদৃঢ় ধর্ম হতে সরিয়ে ফেলেছে এবং আমার বৈধকৃত বস্তুকে তাদের উপর অবৈধ করে দিয়েছে।' (মুসলিম ৪/২১৯৭) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এই আয়াতটি পঠিত হলে সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) দাঁড়িয়ে বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য দু'আ করুন যেন আল্লাহ তা'আলা আমার প্রার্থনা কবূল করেন।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'হে সা'দ! পবিত্র জিনিস এবং হালাল খাদ্য আহার কর, তাহলেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করবেন। যে আল্লাহর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! যে হারাম গ্রাস মানুষ তার পেটের ভিতরে নিক্ষেপ করে, ওরই কুফল স্বরূপ চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার কোন ইবাদাত গৃহীত হয়না। হারাম আহার্যের দ্বারা শরীরের যে গোশত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তা জাহান্নামী।' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ ٱلشَّيْطَـٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُوا۟ حِزْبَهُۥ لِيَكُونُوا۟ مِنْ أَصْحَـٰبِ ٱلسَّعِيرِ

শাইতান তোমাদের শত্রু; সুতরাং তাকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ কর। সে তো তার দলবলকে আহ্বান করে শুধু এ জন্য যে, তারা যেন উত্তপ্ত জাহান্নামের সাথী হয়। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৬) অন্য এক জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِى وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّۢ ۚ بِئْسَ لِلظَّـٰلِمِينَ بَدَلًا

তাহলে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে (ইবলিস) ও তার বংশধরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করছ? তারা তো তোমাদের শত্রু; সীমা লংঘনকারীদের জন্য রয়েছে কত নিকৃষ্ট বদলা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৫০) এরপরে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

শাইতান তোমাদেরকে অসৎ কাজ করতে প্ররোচিত করে। যেমন ব্যভিচার করতে এবং আল্লাহ তা'আলা সম্বন্ধে এমন কথা বলতে প্ররোচিত করে যে সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই। সুতরাং প্রত্যেক কাফির ও বিদ'আতপন্থী এর অন্তর্ভুক্ত যারা অন্যায় কাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎ কাজে উৎসাহ প্রদান করে।

১৭০। এবং যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসরণ কর তখন তারা বলে ঃ বরং আমরা ওরই অনুসরণ করব যা আমাদের পিতৃ-পুরুষগণ হতে প্রাপ্ত হয়েছি; যদিও তাদের পিতৃ-পুরুষদের কোনই জ্ঞান ছিলনা এবং তারা সুপথগামীও ছিলনা।	١٧٠. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۗ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْـًٔا وَلَا يَهْتَدُونَ
১৭১। আর যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের দৃষ্টান্ত ওদের ন্যায় - যেমন কেহ আহ্বান করলে শুধু চীৎকার ও ধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই শুনেনা, তারা বধির, মুক, অন্ধ; কাজেই তারা বুঝতে পারেনা।	١٧١. وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ ٱلَّذِى يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً ۚ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

মুশরিকরা অন্য মুশরিকদেরই অনুসরণ করে

কাফির ও মুশরিকদেরকে যখন বলা হয় যে, তারা যেন আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ এবং নিজেদের ভ্রষ্টতা ও অজ্ঞতাকে পরিত্যাগ করে তখন তারা বলে যে, তারা তাদের বড়দের পথ ধরে রয়েছে। তাদের পিতৃপুরুষ যাদের পূজা অর্চনা করত তারাও তাদের উপাসনা করছে এবং করতে থাকবে। তাদের উত্তরেই কুরআন ঘোষণা করছে যে, তাদের পিতৃপুরুষদের কোন জ্ঞান ছিলনা এবং তারা সুপথগামী ছিলনা। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এই আয়াতটি ইয়াহুদীদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল যাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম দীন ইসলামের প্রতি আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু তারা উত্তরে বলেছিল ঃ আমরা বরং আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে যার উপর পেয়েছি তাতেই স্থির থাকব। (তাবারী ৩/৩০৫)

অবিশ্বাসীরা পশুর চেয়েও অধম

আল্লাহ তা'আলা অবিশ্বাসীদের উদাহরণ দিয়ে বলেন ঃ

لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ

যারা আখিরাতে বিশ্বাস করেনা তারা নিকৃষ্ট প্রকৃতির সদৃশ। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৬০)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), আবুল আলিয়া (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ) এবং রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) প্রমুখ তাদের দৃষ্টান্ত পেশ করে বলেছেন যে, মাঠে বিচরণকারী জন্তুগুলি যেমন রাখালের কথা সঠিকভাবে বুঝতে পারেনা, শুধুমাত্র শব্দই ওদের কানে পৌঁছে থাকে এবং ওরা কথার ভাল ও মন্দ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ রূপে অজ্ঞাত থাকে, এইসব লোকের অবস্থা ঠিক তদ্রুপ। (ইব্ন আবী হাতিম ১/২২৫, ২২৮) এই আয়াতের ভাবার্থ এও হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলাকে ছেড়ে এরা যাদের পূজা করে এবং তাদের প্রয়োজন ও মনস্কামনা পূর্ণ করার প্রার্থনা জানিয়ে থাকে তারা না এদের কথা শুনতে পায়, না জানতে পারে, আর না দেখতে পায়। তাদের মধ্যে না আছে জীবন, আর না আছে কোন অনুভূতি। কাফিরদের এই দলটি সত্য কথা শোনা হতে বধির, বলা হতে বোবা, সত্য পথে চলা হতে অন্ধ এবং সত্যের অনুধাবন হতেও এরা বহু দূরে রয়েছে। যেমন অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِى ٱلظُّلُمَـٰتِ ۗ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن
يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ

আর যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা মনে করে তারা অন্ধকারে নিমজ্জিত মুক ও বধির, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা হিদায়াতের সরল সহজ পথের সন্ধান দেন। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৩৯)

১৭২। হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! আমি তোমাদেরকে যা উপজীবিকা স্বরূপ দান করেছি সেই পবিত্র বস্তুসমূহ আহার কর এবং আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদাত করে থাক।	١٧٢. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا رَزَقْنَـٰكُمْ وَٱشْكُرُوا۟ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ
১৭৩। তিনি শুধু তোমাদের জন্য মৃত জীব, রক্ত, শুকরের মাংস এবং যা আল্লাহ ব্যতীত অপরের উদ্দেশে নিবেদিত - তদ্ব্যতীত অবৈধ করেননি; বস্তুতঃ যে ব্যক্তি নিরূপায়, কিন্তু সীমা লংঘনকারী নয়, তার জন্য পাপ নেই; এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।	١٧٣. إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

হালাল খাবার খাওয়া এবং হারাম খাদ্যের বিবরণ

এই আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাদেরকে নির্দেশ প্রদান পূর্বক বলেন, ‘তোমরা পবিত্র ও উত্তম দ্রব্য আহার কর এবং আমার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

কর।' হালাল খাদ্য দু'আ ও ইবাদাত গৃহীত হওয়ার কারণ এবং হারাম খাদ্য তা কবূল না হওয়ার কারণ। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'হে মানবমণ্ডলী! আল্লাহ পবিত্র এবং তিনি পবিত্র জিনিসই গ্রহণ করেন। তিনি নাবীগণকে ও মু'মিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁরা যেন পবিত্র জিনিস আহার করেন এবং সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করেন। (আহমাদ ৩/৩২৮) তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا۟ مِنَ ٱلطَّيِّبَـٰتِ وَٱعْمَلُوا۟ صَـٰلِحًا ۖ إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার কর ও সৎ কাজ কর; তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবগত। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৫১) অন্য জায়গায় বলেন ঃ 'হে মু'মিনগণ! আমি তোমাদেরকে যা উপজীবিকা স্বরূপ দান করেছি, সেই পবিত্র বস্তুসমূহ আহার কর এবং আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'এক লোক দীর্ঘ সফর করেছে, যার চুলগুলি বিক্ষিপ্ত এবং নিজেও ধূলাবালিতে জর্জরিত; সে তার দু'হাত তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলছে ঃ হে আমার রাব্ব! হে আমার রাব্ব! অথচ সে যে খাদ্য খায় তা হারাম, যা পান করে তা হারাম, সে যে পোশাক পরিধান করেছে তাও হারাম আয়ে অর্জিত অর্থ দ্বারা তৈরী, তার শরীর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে হারাম খাদ্য দ্বারা। সুতরাং কিভাবে তার প্রার্থনা কবূল হবে? (মুসলিম ২/৭০৩, তিরমিযী ৮/৩৩৩)

হালাল জিনিসের বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা হারাম জিনিসের বর্ণনা দিচ্ছেন। বলা হচ্ছে, যে হালাল প্রাণী আপনা আপনিই মরে গেছে এবং শারীয়াতের বিধান অনুসারে যবাহ করা হয়নি তা হারাম। হয় ওকে কেহ গলা টিপে মেরে ফেলুক, লাঠির আঘাতেই মরে যাক, কোথাও হতে পড়ে গিয়ে মারা যাক, অথবা অন্যান্য জন্তু তাকে শিংয়ের আঘাতে মেরে ফেলুক, এসবগুলোই মৃত এবং হারাম। কিন্তু পানির প্রাণীর ব্যাপারে এর ব্যতিক্রম রয়েছে। পানির প্রাণী নিজে নিজেই মরে গেলেও হালাল। এর পূর্ণ বর্ণনা أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৯৬) এই আয়াতের তাফসীরে দেয়া হবে ইনশাআল্লাহ। সাহাবীগণের (রাঃ) 'আম্বার' নামক পানির প্রাণীটি (হাঙ্গর) মৃত অবস্থায় প্রাপ্তি, তাঁদের তা আহার করা, পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এই সংবাদ পৌঁছে যাওয়া এবং তাঁর একে জায়িয বলা ইত্যাদি সব কিছুই হাদীসে রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৬/১৫২) অন্য একটি হাদীসে রয়েছে,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সমুদ্রের পানি হালাল এবং ওর মৃত প্রাণীও হালাল।' (মুয়াত্তা ১/২২, আবূ দাঊদ ১/৬৪, তিরমিযী ১/২২৪, আহমাদ ৫/৩৬৫, নাসাঈ ১/৫০, ইব্‌ন মাজাহ ১/১৩৬) আরও একটি হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'দুই মৃত ও দুই রক্ত হালাল। মাছ, ফড়িং, কলিজা ও প্লীহা।' (আহমাদ ২/৯৭, ইব্‌ন মাজাহ ২/১০৭৩, দারাকুতনী ৪/২৭২) 'সূরা মায়িদা'য় ইনশাআল্লাহ এর বিস্তারিত বিবরণ আসবে।

জিজ্ঞাস্য ঃ মৃত জন্তুর দুধ ও তার মধ্যস্থিত ডিম অপবিত্র। ইমাম শাফিঈর (রহঃ) এটাই অভিমত। কেননা ওগুলো মৃতেরই এক একটি অংশ বিশেষ। ইমাম মালিকের (রহঃ) একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, ওটা পবিত্র তো বটে; কিন্তু মৃতের সঙ্গে মিলিত হওয়ার ফলে অপবিত্র হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে মৃতের দাঁতও ঐ বিজ্ঞজনদের নিকট অপবিত্র। তবে তাতে মতভেদও রয়েছে। সাহাবীগণের (রাঃ) 'মাজুসদের ' পনীর ভক্ষণ এখানে প্রতিবাদ রূপে আসতে পারে; কিন্তু কুরতুবী (রহঃ) এর উত্তরে বলেছেন যে, দুধ খুবই কম হয়ে থাকে, আর এরূপ তরল জাতীয় কোন অপবিত্র জিনিস অল্প পরিমাণ যদি অধিক পরিমাণযুক্ত কোন পবিত্র জিনিসের মধ্যে পড়ে যায় তাহলে তাতে কোন দোষ নেই। (কুরতুবী ২/২২১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘি, পনীর এবং বন্য গাধা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেন ঃ

'হালাল ঐ জিনিস যা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কিতাবে হালাল করেছেন এবং হারাম ঐ জিনিস যা তিনি স্বীয় কিতাবে হারাম করেছেন, আর যেগুলির বর্ণনা নেই সেগুলি ক্ষমার্হ। (ইব্‌ন মাজাহ ২/১১১৭)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, শূকরের মাংসও হারাম। তা যবাহ করা হোক কিংবা নিজে নিজেই মরে যাক। শূকরের চর্বিরও এটাই নির্দেশ। কেননা ওর অধিকাংশ মাংসই চর্বিযুক্ত এবং চর্বি মাংসের সাথেই থাকে। অতএব মাংস যখন হারাম তখন চর্বিও হারাম। অতঃপর বলা হচ্ছে যে, যা আল্লাহ ছাড়া অপরের উদ্দেশে নিবেদিত ওটাও হারাম। অজ্ঞতার যুগে কাফিরেরা তাদের বাতিল উপাস্যদের নামে পশু যবাহ করত। আল্লাহ তা'আলা ওটাকে হারাম বলে ঘোষণা করেন। আয়িশাকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা হয় ঃ আযমী বা অনারাবরা তাদের ঈদে পশু যবাহ করে থাকে এবং তা হতে মুসলিমদের নিকটও হাদিয়া স্বরূপ যা কিছু পাঠিয়ে থাকে, তাদের দেয়া ঐ গোশ্‌ত খাওয়া যায় কি? তিনি বললেন ঃ 'ঐ দিনের সম্মানার্থে যে জীব যবাহ করা হয় তোমরা তা খেওনা। তবে তাদের গাছের ফল খেতে পার।' (কুরতুবী ২/২২৪)

বিশেষ অপারগ অবস্থায় নিষিদ্ধ ব্যবস্থা শিথিলযোগ্য

এর পরে অভাব ও প্রয়োজনের সময় যদি খাওয়ার জন্য অন্য কিছুই পাওয়া না যায় তাহলে আল্লাহ তা'আলা ঐ হারাম বস্তুগুলো খাওয়াও বৈধ করেছেন এবং বলেছেন, যে ব্যক্তি নিরুপায় হয়ে যাবে এবং অবাধ্য-উচ্ছৃংখল ও সীমা অতিক্রমকারী না হবে তার জন্য এই সব জিনিস খাওয়ায় কোন পাপ নেই। আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল, করুণাময়।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে, কেহ যদি ঔদ্ধত্য কিংবা অবাধ্যতার উদ্দেশে না করে শুধুমাত্র জীবন বাঁচানোর জন্য করতে বাধ্য হয় তা ভিন্ন কথা। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় ঃ যদি সে এটা না করে তাহলে তার দ্বারা ছিনতাই, রাহাযানী, প্রচলিত আইনের বিরোধীতা, শাসকের বিরোধীতা কিংবা এ ধরনের কোন কিছু হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তখন তার জন্য এ বিষয়টি শিথিলযোগ্য। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি তাকে দেয়া শিথিলতার সুযোগ নিয়ে আল্লাহর অবাধ্যতা করে সুযোগের অসদ্ব্যবহার করতেই থাকে তাহলে তার জন্য আর এটি বিবেচ্য বিষয় হবেনা, তা সে যদি সত্যি সত্যি অপারগ হয় তবুও। সাঈদ ইব্ন যুবাইরও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। সাঈদ (রহঃ) এবং মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) বলেছেন যে, অনিচ্ছাকৃত অবাধ্যতা হল এটা মনে করা যে, ইহা অনুমোদনযোগ্য। (ইব্ন আবী হাতিম ১/২৩৬) এ বিষয়ে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এখানে আয়াতের ভাবার্থে অনিচ্ছাকৃত অবাধ্যতা হল তা যে, ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও মৃত প্রাণীর মাংস আহার করতে বাধ্য হওয়া এবং এর পুনরাবৃত্তি না করা, তবে এগুলো পেট পুরে না খাওয়া।

জিজ্ঞাস্য ঃ একটি লোক ক্ষুধার জ্বালায় খুবই কাতর হয়ে পড়েছে। এমন সময় সে একটি মৃত জীব দেখতে পেয়েছে এবং তার সম্মুখে অপরের একটি হালাল বস্তুও রয়েছে। যেখানে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নতারও ভয় নেই এবং কোন কষ্টও নেই, এই অবস্থায় তাকে অপরের জিনিসটিই খেয়ে নিতে হবে, মৃত জীবটি খেতে হবেনা। ইব্ন মাজাহয় একটি হাদীস রয়েছে, আব্বাদ ইব্ন শারজাবীল আনাযী (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ 'এক বছর আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষ হয়। আমি মাদীনা গমন করি এবং একটি ক্ষেতে ঢুকে কিছু শিষ ভেঙ্গে নেই ও ছিলে খেতে আরম্ভ করি। আর কিছু শিষ চাদরে বেঁধে নিয়ে চলতে থাকি। ক্ষেতের মালিক দেখতে পেয়ে আমাকে ধরে ফেলে এবং মার-পিট করে আমার চাদর কেড়ে নেয়। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে তাঁকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ লোকটিকে বললেন ঃ

'না তুমি এই ক্ষুধার্তকে খেতে দিলে, না তার জন্য অন্য কোন চেষ্টা করলে, আর না তুমি তাকে বুঝালে বা শেখালে! এই বেচারা তো ক্ষুধার্ত ও মূর্খ ছিল। যাও, তার কাপড় তাকে ফিরিয়ে দাও এবং এক ওয়াসাক বা অর্ধওয়াসাক (এক ওয়াসাকে প্রায় ১৮০ কেজি) শস্য দিয়ে দাও।' (ইব্ন মাজাহ ২/৭৭০) আম্র ইব্ন শুয়াইব (রহঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তার দাদা শুনেছেন যে, গাছে লটকে থাকা খেজুর সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেন ঃ

'অভাবী লোক যদি ফসল থেকে কিছু খায়, কিন্তু বাড়ী নিয়ে না যায় তাহলে তার কোন অপরাধ নেই।' (তিরমিযী ৪/৫১০) মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) বলেন যে, فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ আয়াতের অর্থ হচ্ছে বিশেষ যরুরী অবস্থায় বাধ্য হয়ে যা আহার করা হয়। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন ঃ অবৈধ কোন কিছু খেলে আল্লাহ তা ক্ষমা করে দিতে পারেন, আর বাধ্য হয়ে হারাম কোন কিছু খাওয়াকে তিনি যে অনুমোদন দিয়েছেন তা হল তাঁর করুণা বা দয়া। (ইব্ন আবী হাতিম ১/২৪০) এও বর্ণিত আছে যে, তিন গ্রাসের চেয়ে যেন বেশি না খায়। মোট কথা, এই অবস্থায় আল্লাহর দয়া ও মেহেরবানীর কারণেই তার জন্য এই হারামকে হালাল করা হয়েছে। মাসরূক (রহঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিরুপায় হয়ে যায় অথচ হারাম জিনিস ভক্ষণ বা পান করেনা, অতঃপর মারা যায়, সে জাহান্নামী। (সুনান-ই কুবরা ৯/৩৫৭) এ থেকে জানা গেল যে, এরূপ অবস্থায় এরকম জিনিস খাওয়া অবশ্য কর্তব্য, শুধু যে খাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে তা নয়, বরং খেতে হবে।

১৭৪। আল্লাহ যা গ্রন্থে অবতীর্ণ করেছেন তা যারা গোপন করে ও তৎপরিবর্তে নগণ্য মূল্য গ্রহণ করে, নিশ্চয়ই তারা অগ্নি ছাড়া অন্য কিছু ভক্ষণ করেনা; এবং উত্থান দিনে আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেননা, তাদেরকে পবিত্র করবেননা এবং তাদের জন্য	١٧٤. إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡتُمُونَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَيَشۡتَرُونَ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًاۙ أُوْلَٰٓئِكَ مَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ

إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ	রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।
١٧٥. أُوْلَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُاْ ٱلضَّلَـٰلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ	১৭৫। ওরাই সুপথের বিনিময়ে কুপথ এবং ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি ক্রয় করেছে, অতঃপর জাহান্নামের আগুন কিরূপে সহ্য করবে?
١٧٦. ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ ۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ لَفِى شِقَاقٍۭ بَعِيدٍ	১৭৬। এ জন্যই আল্লাহ সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন এবং যারা গ্রন্থ সম্বন্ধে বিরোধ করে বাস্ত বিকই তারা বিরুদ্ধাচরণে সুদূরগামী।

আল্লাহর আয়াত গোপন করার জন্য ইয়াহুদীদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে

তাওরাতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী সম্পর্কিত যেসব আয়াত রয়েছে সেগুলি যেসব ইয়াহুদী তাদের কর্তৃত্ব চলে যাওয়ার ভয়ে গোপন করে এবং সাধারণ আরাবদের নিকট হতে হাদিয়া ও উপঢৌকন গ্রহণ করে এই নিকৃষ্ট দুনিয়ার বিনিময়ে তাদের আখিরাতকে খারাপ করে থাকে তাদেরকে এখানে ভয় দেখানো হয়েছে। যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াতের সত্যতার আয়াতগুলি, যা তাওরাতের মধ্যে বিদ্যমান

রয়েছে, জনগণের মধ্যে প্রকাশ পায় তাহলে তারা তাঁর আয়ত্তাধীনে এসে যাবে এবং তাদেরকে পরিত্যাগ করবে, এই ভয়ে তারা হিদায়াত ও মাগফিরাতকে ছেড়ে পথভ্রষ্টতা ও শাস্তির উপরেই সন্তুষ্ট হয়ে গেছে। তাদের দুষ্ট আলেমরা যে আয়াতগুলি গোপন করত সেগুলিও জনসাধারণের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ে। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অলৌকিক ঘটনাবলী এবং তাঁর নিষ্কলুষ চরিত্র মানুষকে তাঁর নাবুওয়াতের সত্যতা স্বীকারের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। হাত ছাড়া হয়ে যাবে এই ভয়ে যে দলটি হতে তারা আল্লাহর কালামকে গোপন রাখত শেষে ঐ দলটি তাদের হাত ছাড়া হয়েই যায়। ঐ দলের লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে এবং মুসলিম হয়ে যায়।

অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মিলিত হয়ে ঐ সত্য গোপনকারীদের প্রাণনাশ করতে থাকে এবং নিয়মিতভাবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। মহান আল্লাহ তাদের এই গোপনীয়তার কথা কুরআন মাজীদের বিভিন্ন জায়গায় বর্ণনা করেছেন। এখানেও বর্ণনা করেছেন ঃ

أُولَـــئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ আল্লাহর কথা গোপন করে তারা যে অর্থ উপার্জন করছে তা প্রকৃতপক্ষে আগুনের অঙ্গার দ্বারা তারা তাদের পেট পূর্ণ করছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَـٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

যারা অন্যায়ভাবে পিতৃহীনদের ধন সম্পত্তি গ্রাস করে, নিশ্চয়ই তা স্বীয় উদরে অগ্নি ব্যতীত কিছুই ভক্ষণ করেনা এবং সত্বরই তারা অগ্নি শিখায় প্রবেশ করবে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১০) সহীহ হাদীস রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

‘যে ব্যক্তি সোনা-চাঁদির পাত্রে পানাহার করে সে তার পেটের মধ্যে আগুন ভরে থাকে।’ (বুখারী ৫৬৩৪, মুসলিম ২০৬৫) অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ

وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ *কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা‘আলা তাদের সাথে কথা বলবেননা এবং তাদেরকে পবিত্র করবেননা, বরং তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির মধ্যে জড়িত থাকবে।* কেননা তাদের কৃতকর্মের কারণে আল্লাহ তা‘আলার ক্রোধ ও অভিশাপ তাদের উপরে বর্ষিত

হয়েছে এবং আজ তাদের উপর হতে আল্লাহর করুণা দৃষ্টি অপসারিত হয়েছে। তারা আজ আর প্রশংসার যোগ্য হয়ে নেই, বরং তারা শাস্তির যোগ্য হয়ে পড়েছে এবং তারা ওর মধ্যেই জড়িত থাকবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তিন প্রকার লোকের সাথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কথা বলবেননা, তাদের দিকে তাকাবেননা এবং তাদেরকে পবিত্র করবেননা, আর তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। (তারা হচ্ছে) বয়োঃবৃদ্ধ ব্যভিচারী, মিথ্যাবাদী শাসক ও অহংকারী ভিক্ষুক/ফাকীর।' (মুসলিম) এর পরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

أُولَـــئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُاْ الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى *তারা সুপথের বিনিময়ে ভ্রান্ত পথকে গ্রহণ করেছে*। তাদের উচিত ছিল তাওরাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্বন্ধে যেসব সংবাদ রয়েছে তা অজ্ঞদের নিকট পৌঁছে দেয়া। কিন্তু তার পরিবর্তে তারা ওগুলি গোপন করেছে এবং তারা নিজেরাও তাঁকে অস্বীকার করেছে ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। সুতরাং ওগুলি প্রকাশ করলে তারা যে নি'আমাত ও ক্ষমা প্রাপ্তির অধিকারী হত তার পরিবর্তে তারা কষ্ট ও শাস্তিকে গ্রহণ করে নিয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তাদেরকে এমন বেদনাদায়ক ও বিস্ময়কর শাস্তি দেয়া হবে যা দেখে অবলোকনকারীরা হতভম্ব হয়ে যাবে। আল্লাহর কাছে আমরা এসব বেদনাদায়ক শাস্তি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে যে, এরা আল্লাহ তা'আলার কথাকে খেল-তামাশা মনে করেছে এবং আল্লাহর যে কিতাব সত্য প্রকাশ করার জন্য ও অসত্য দূর করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছিল তারা তার বিরোধিতা করেছে, প্রকাশ করার কথাকে গোপন করেছে। আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে শত্রুতা করেছে এবং তাঁর গুণাবলী গোপন করেছে, এসব কারণেই তারা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হয়ে পড়েছে। বাস্তবিকই যারা এই কিতাবের ব্যাপারে বিরোধ সৃষ্টি করেছে তারা আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধাচরণে বহু দূর এগিয়ে গেছে।

১৭৭। তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল পূর্ব বা পশ্চিম দিকে প্রত্যাবর্তিত করলেই তাতে পুণ্য নেই, বরং পুণ্য তার যে ব্যক্তি আল্লাহ,	١٧٧. لَّيۡسَ ٱلۡبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ قِبَلَ ٱلۡمَشۡرِقِ وَٱلۡمَغۡرِبِ

وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَٰهَدُوا۟ ۖ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ	আখিরাত, মালাক/ ফেরেশতা, কিতাব ও নাবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁরই প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, দরিদ্র, পথিক ও ভিক্ষুকদেরকে এবং দাসত্ব মোচনের জন্য ধন-সম্পদ ব্যয় করে, আর সালাত প্রতিষ্ঠিত করে ও যাকাত প্রদান করে এবং অঙ্গীকার করলে তা পূরণ করে এবং যারা অভাবে ও ক্লেশে এবং যুদ্ধকালে ধৈর্যশীল তারাই সত্য পরায়ণ এবং তারাই ধর্মভীরু।

খাঁটি বিশ্বাস ও সঠিক পথের শিক্ষা

এই পবিত্র আয়াতে খাঁটি বিশ্বাস এবং সরল সঠিক পথের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। মু'মিনদেরকে প্রথমে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। পরে তাদেরকে কা'বার দিকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। এটা কিতাবীদের উপর এবং কিছু মু'মিনের কাছে কঠিন মনে হয়। সুতরাং মহান আল্লাহ এর নিপুণতা বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর নির্দেশ মেনে নেয়াই হচ্ছে মূল

উদ্দেশ্য। তিনি তাঁর বান্দাদেরকে যে দিকে মুখ করার নির্দেশ দিবেন সেদিকেই তাদেরকে মুখ করতে হবে। প্রকৃত ধর্মভীরুতা, প্রকৃত সাওয়াব এবং পূর্ণ ঈমান এটাই যে, দাস তার মনিবের সমুদয় আদেশ ও নিষেধ শিরোধার্য করে নিবে। যদি কেহ পূর্ব দিকে মুখ করে অথবা পশ্চিম দিকে ফিরে যায় এবং ওটা যদি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে না হয় তাহলে এর ফলে সে মু'মিন থাকবেনা। বরং প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার ঐ ব্যক্তি যার মধ্যে এই আয়াতে বর্ণিত গুণাবলী বিদ্যমান রয়েছে। কুরআন মাজীদে রয়েছে ঃ

لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَـٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ مِنكُمْ

আল্লাহর কাছে পৌঁছেনা ওগুলির গোশত এবং রক্ত, বরং পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৩৭)

পূর্ব ও পশ্চিমকে বিশিষ্ট করার কারণ হচ্ছে এই যে, ইয়াহুদীরা পশ্চিম দিকে এবং খৃষ্টানরা পূর্ব দিকে মুখ করত। সুতরাং উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, এটাতো শুধু ঈমানের বাক্য এবং প্রকৃত ঈমান হচ্ছে আমল। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ 'সাওয়াব এই যে, আনুগত্যের মূল অন্তরে সৃষ্টি হয়ে যায়। অবশ্য করণীয় কাজগুলি নিয়মানুবর্তিতার সাথে আদায় করা হয়।' সত্য কথা এই যে, যে ব্যক্তি এই আয়াতের উপর আমল করেছে সে পূর্ণভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং মন খুলে সে সাওয়াব সংগ্রহ করেছে। মহান আল্লাহর সত্ত্বার উপর তার ঈমান রয়েছে। সে জানে যে, প্রকৃত উপাস্য তিনিই। মালাইকার অস্তিত্ব এবং এরা যে আল্লাহর বাণী তাঁর বিশিষ্ট বান্দাদের নিকট পৌঁছে থাকেন এ কথা তারা বিশ্বাস করে। তারা সমস্ত আসমানী কিতাবের উপর বিশ্বাস রাখে এবং এটাও বিশ্বাস করে যে, পবিত্র কুরআন শেষ আসমানী কিতাব যা পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যতা প্রমাণ করে এবং ইহকাল ও পরকালের সুখ ও সৌভাগ্য যার সাথে জড়িত রয়েছে। অনুরূপভাবে প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত নাবীর উপরও তাদের ঈমান রয়েছে, বিশেষ করে আখিরী নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরেও তাদের পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। মাল ও সম্পদের প্রতি ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও তারা তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে। সহীহ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'উত্তম দান এই যে, তুমি এমন অবস্থায় দান করবে যখন তোমার স্বাস্থ্য ভাল থাকে ও মালের প্রতি তোমার ভালবাসা ও লোভ থাকে, তুমি ধনী হওয়ারও আশা রাখ এবং দরিদ্র হয়ে যাওয়ারও ভয় কর।' (ফাতহুল বারী ৩/৩৩৪, মুসলিম ২/৭১৬) কুরআন মাজীদেও আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا

তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে এবং বলে ঃ কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি, আমরা তোমাদের নিকট হতে প্রতিদান চাইনা, কৃতজ্ঞতাও নয়। (সূরা ইনসান/দাহ্র, ৭৬ ঃ ৮-৯) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ

তোমরা যা ভালবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনই কল্যাণ লাভ করতে পারবেনা। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৯২) অন্যস্থানে বলেন ঃ

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

আর তারা তাদেরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও। (সূরা হাশর, ৫৯ ঃ ৯) সুতরাং এরা বড় মর্যাদার অধিকারী। কেননা প্রথম প্রকারের লোকেরাতো তাদের ভালবাসা ও পছন্দনীয় জিনিস অন্যদেরকে দান করেছেন। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের লোকেরা এমন জিনিস অপরকে দিয়েছেন, যে জিনিসের তাঁরা নিজেরাই মুখাপেক্ষী ছিলেন। কিন্তু তারা নিজেদের প্রয়োজন অপেক্ষা অপরের প্রয়োজনকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। হাদীসে রয়েছে ঃ

‘মিসকীনকে দান করার সাওয়াব একগুণ এবং আত্মীয় (মিসকীনকে) দান করার সাওয়াব দ্বিগুণ। একটি দানের সাওয়াব এবং দ্বিতীয়টি আত্মীয়তার বন্ধন যুক্ত রাখার সাওয়াব। তোমাদের দান-খাইরাতের এরাই বেশি হকদার।’ (আহমাদ ৪/২১৪) কুরআন মাজীদে কয়েক জায়গায় তাদের সাথে সৎ ব্যবহারের নির্দেশ রয়েছে। ‘ইয়াতীম’ এর অর্থ হচ্ছে ঐ ছোট ছেলে যার পিতা মারা গেছে। তার অন্য কেহ উপার্জনকারী নেই। তার নিজের উপার্জন করারও ক্ষমতা নেই। হাদীসে রয়েছে যে, পূর্ণ বয়স্ক হওয়ার পর সে আর ইয়াতীম থাকেনা। মিসকীন ওরা যাদের নিকট এই পরিমাণ জিনিস নেই যা তাদের খাওয়া-পরা ও বসবাসের জন্য যথেষ্ট হতে পারে। তাদেরকেও দান করতে হবে যাতে তাদের প্রয়োজন মিটাতে পারে এবং তারা দারিদ্রতা, ক্ষুধা, সংকীর্ণতা এবং অবমাননাকর অবস্থা থেকে রক্ষা পেতে পারে। (মুসনাদ আবদুর রায্যাক) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'ঐ ব্যক্তি মিসকীন নয় যে ভিক্ষার জন্য ঘুরে বেড়ায় এবং দু'একটি খেজুর বা দু' এক গ্রাস খাবার দিয়ে তাকে বিদায় করা হয়, বরং মিসকীন ঐ ব্যক্তি যার কাছে এ পরিমাণ জিনিস নেই যদ্দারা তার সমস্ত কাজ চলতে পারে এবং সে তার অবস্থা এমনভাবে প্রকাশ করেনা যদ্দারা মানুষ তার অবস্থা জেনে তাকে কিছু দান করতে পারে।' (ফাতহুল বারী ৩/৩৯৯, মুসলিম ২/৭১৯) 'ইব্নস্ সাবীল' মুসাফিরকে বলা হয়। এখানে ঐ মুসাফিরকে বুঝানো হয়েছে যার নিকট সফরের বাকী পথ-খরচ নেই। তাকে এই পরিমাণ দেয়া হবে যেন সে অনায়াসে তার দেশে পৌঁছতে পারে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের কাজে সফরে বেরিয়েছে তাকেও যাতায়াতের খরচ দিতে হবে। অতিথিও এই নির্দেশেরই অন্তর্ভুক্ত।

আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) অতিথিকেও 'ইব্নস্ সাবীলের' অন্তর্ভুক্ত করেছেন। (ইব্ন আবী হাতিম ১/২৫৯) এছাড়া মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আবূ জাফর আল-বাকীর (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ), যুহরী (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) প্রমুখও অনুরূপ বলেছেন। (ইব্ন আবী হাতিম ১/২৬৪)

'সায়েলীন' ঐ সব লোকদেরকে বলা হয় যারা নিজেদের প্রয়োজন প্রকাশ করে মানুষের নিকট ভিক্ষা করে বেড়ায়। এদেরকেও সাদাকাহ ও যাকাত থেকে দিতে হবে। فِى الرِّقَابِ এর ভাবার্থ হচ্ছে ক্রীতদাসদেরকে দাসত্ব হতে মুক্ত করা। এরা ঐ ক্রীতদাস যাদেরকে তাদের মনিবেরা বলে দিয়েছে যে, যদি তারা তাদেরকে এত পরিমান অর্থ দিতে পারে তাহলে তারা মুক্ত হবে। এদেরকে সাহায্য করে মুক্ত করিয়ে নেয়া। এই প্রকারের এবং আরও অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের লোকদের পূর্ণ বর্ণনা اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ এই আয়াতের তাফসীরে ইনশাআল্লাহ করা হবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তারা সালাতকে সময়মত পূর্ণ রুকু, সাজদাহ, খুশু-খুযু (স্থিরতা) এবং বিনয়ের সাথে আদায় করে। অর্থাৎ যে নিয়মে আদায় করার নির্দেশ শারীয়াতে রয়েছে ঠিক সেই নিয়মেই আদায় করে। আর তারা যাকাতও প্রদান করে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, অঙ্গীকার করলে যারা সেই অঙ্গীকার পূর্ণকারী হয়। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلۡمِيثَـٰقَ

যারা আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেনা। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ২০) অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হচ্ছে মুনাফিকদের অভ্যাস। যেমন হাদীসে রয়েছে ঃ

'মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি (১) কথা বললে মিথ্যা বলে, (২) অঙ্গীকার করলে তা ভঙ্গ করে এবং (৩) তার নিকট কিছু গচ্ছিত রাখলে তা আত্মসাৎ করে।' (মুসলিম ১/৭৮) অন্য বর্ণনায় আরও বলা হয়েছে ঃ 'ঝগড়ার সময় গালি উচ্চারণ করে।' অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, যারা অভাবে ও ক্লেশে এবং যুদ্ধকালে ধৈর্যধারণকারী। ইব্ন মাসউদ (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ), আবুল আলীয়া (রহঃ), মুররাহ আল-হামদানী (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ), আবূ মালিক (রহঃ) প্রমুখ বলেছেন, এর অর্থ হল শত্রুর মুখোমুখী হওয়া অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্র। (ইব্ন আবী হাতিম ১/২৭০, ২৭১; তাবারী ৩/৩৫৫) এ সব কষ্ট ও বিপদের সময় ধৈর্য ধারণের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সাহায্য করুন। তাঁরই উপর আমরা নির্ভর করি। আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, এই সব গুণবিশিষ্ট মানুষই সত্যপরায়ণ ও খাঁটি ঈমানদার। তাদের ভিতর ও বাহির, কথা ও কাজ একই রূপ। আর তারা ধর্মভীরুও বটে। কেননা তারা সদা আনুগত্যের উপরেই রয়েছে এবং নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ হতে বহু দূরে সরে আছে।

১৭৮। হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! নিহতদের সম্বন্ধে তোমাদের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ বিধিবদ্ধ করা হল; স্বাধীনের পরিবর্তে স্বাধীন, দাসের পরিবর্তে দাস এবং নারীর পরিবর্তে নারী। কিন্তু যদি কেহ তার ভাই কর্তৃক কোন বিষয়ে ক্ষমা প্রাপ্ত হয় তাহলে যেন ন্যায় সঙ্গতভাবে পাওনা সাব্যস্ত করা হয় এবং সদ্ভাবে তা	١٧٨. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ

ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٌ ۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ	**পরিশোধ করে। এটা তোমাদের রবের পক্ষ হতে লঘু বিধান ও করুণা; অতঃপর যে কেহ সীমা লংঘন করবে তার জন্য যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।**
١٧٩. وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ	**১৭৯। হে জ্ঞানবান লোকেরা! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে, যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পার।**

‘সম-অধিকার’ আইন এবং এর তাৎপর্য

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘হে মুসলিমগণ! প্রতিশোধ গ্রহণের সময় ন্যায় পন্থা অবলম্বন করবে। স্বাধীন ব্যক্তির পরিবর্তে স্বাধীন ব্যক্তি, দাসের পরিবর্তে দাস এবং নারীর পরিবর্তে নারীকে হত্যা করবে। এ ব্যাপারে সীমালংঘন করবেনা। যেমন সীমা লংঘন করেছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা। তারা আল্লাহর নির্দেশ পরিবর্তন করে ফেলেছিল।’ এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ এই যে, অজ্ঞতার যুগে বানূ নাযীর ও বানূ কুরাইযা নামক ইয়াহুদীদের দু’টি সম্প্রদায়ের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে বানূ নাযীর জয়যুক্ত হয়। অতঃপর তাদের মধ্যে এই প্রথা চালু হয় যে, যখন বানূ নাযীরের কোন লোক বানূ কুরাইযার কোন লোককে হত্যা করত তখন প্রতিশোধ রূপে বানূ নাযীরের ঐ লোকটিকে হত্যা করা হতনা। বরং রক্তপণ হিসাবে তার নিকট হতে এক ওয়াসাক (প্রায় ১৮০ কেজি) খেজুর আদায় করা হত। আর যখন বানূ কুরাইযার কোন লোক বানূ নাযীরের কোন লোককে হত্যা করত তখন প্রতিশোধ রূপে তাকেও হত্যা করা হত এবং রক্তপণ গ্রহণ করা হলে দ্বিগুণ অর্থাৎ দুই ওয়াসাক খেজুর গ্রহণ করা হত। সুতরাং মহান আল্লাহ এই আয়াতের মাধ্যমে অজ্ঞতা যুগের ঐ জঘন্য প্রথাকে উঠিয়ে দিয়ে ন্যায় ও সমতা প্রতিষ্ঠিত করার নির্দেশ দেন।

যখনই কোন স্বাধীন ব্যক্তি কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করবে তখন তার পরিবর্তে তাকেও হত্যা করা হবে। এরূপভাবে এই নির্দেশ দাস ও দাসীর মধ্যেও চালু থাকবে। যে কেহই প্রাণ নাশের ইচ্ছায় অন্যকে হত্যা করবে, প্রতিশোধ রূপে তাকেও হত্যা করা হবে। হত্যা ছাড়া জখম বা কোন অঙ্গহানীরও একই নির্দেশ। 'স্বাধীনের পরিবর্তে স্বাধীন, দাসের পরিবর্তে দাস এবং নারীর পরিবর্তে নারী' আয়াতাংশ সূরা বাকারাহর ৪৫ নং আয়াত দ্বারা রহিত হওয়ার ব্যাপারে বেশির ভাগ আলেমের সিদ্ধান্ত হল এই যে, একজন মুশরিককে হত্যার পরিবর্তে হত্যাকারী মুসলিমকে হত্যা করা যাবেনা। ইমাম বুখারী (রহঃ) আলী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'কাফিরকে হত্যা করার জন্য মুসলিমকে (হত্যাকারী) হত্যা করা যাবেনা।' (বুখারী ১১১) এ ব্যাপারে কারও দ্বিমত পোষণ করার কিংবা এর বিপরীত বর্ণনার কোন সহীহ হাদীস পাওয়া যায়না। অবশ্য আবূ হানিফা উক্ত সূরা মায়িদার ৪৫ নং আয়াতের বাহ্যিক অর্থ অনুযায়ী এ মত পোষণ করতেন যে, কাফিরকে হত্যা করার জন্য হত্যাকারী মুসলিমকেও কতল করা যাবে।

চার ইমাম এবং জামহুর-ই উম্মাতের মতামত এই যে, কয়েকজন মিলে একজন মুসলিমকে হত্যা করলে তার পরিবর্তে তাদের সকলকেই হত্যা করা হবে। উমারের (রাঃ) যুগে সাতজন মিলে একটি লোককে হত্যা করে। তিনি সাতজনকেই হত্যা করার আদেশ দেন এবং বলেন ঃ যদি 'সুনআ' পল্লীর সমস্ত লোক এই হত্যায় অংশগ্রহণ করত তাহলে আমি প্রতিশোধ রূপে সকলকেই হত্যা করতাম।' কোন সাহাবীই তাঁর যুগে তাঁর এই ঘোষণার উল্টা করেননি। সুতরাং এ কথার উপর যেন 'ইজমা' হয়ে গেছে। কিন্তু ইমাম আহমাদ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, একজনের পরিবর্তে একটি দলকে হত্যা করা হবেনা, বরং একজনের পরিবর্তে একজনকেই হত্যা করা হবে। মুআয (রাঃ), ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান (রহঃ), যুহরী (রহঃ), ইব্ন সীরীন (রহঃ) এবং হাবীব ইব্ন আবী সাবিত (রহঃ) হতেও এই উক্তিটি বর্ণিত আছে। ইব্ন মুনযির (রহঃ) বলেন যে, এটাই সর্বাপেক্ষা সঠিক মত। অতঃপর বলা হয়েছে যে, নিহত ব্যক্তির কোন উত্তরাধিকারী যদি হত্যাকারীর কোন অংশ ক্ষমা করে দেয় তাহলে সেটা অন্য কথা। অর্থাৎ সে হয়ত হত্যার পরিবর্তে রক্তপণ স্বীকার করে কিংবা হয়ত তার অংশের রক্তপণ ছেড়ে দেয় এবং স্পষ্টভাবে ক্ষমা করে দেয়। যদি সে রক্তপণের উপর সম্মত হয়ে যায় তাহলে সে যেন হত্যাকারীর উপর জোর

জবরদস্তি না করে, বরং যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে তা আদায় করে। হত্যাকারীরও কর্তব্য এই যে, সে যেন তা সদ্ভাবে পরিশোধ করে, টাল-বাহানা না করে।

অতঃপর বলা হচ্ছে যে, ইচ্ছাপূর্বক হত্যায় রক্তপণ গ্রহণ, এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে লঘু বিধান ও করুণা। পূর্ববর্তী উম্মাতদের এই সুযোগ ছিলনা। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, বানী ইসরাঈলের উপর 'কিসাস' (হত্যার পরিবর্তে হত্যা) ফার্য ছিল। 'কিসাস' ক্ষমা করে রক্তপণ গ্রহণের অনুমতি তাদের জন্য ছিলনা। কিন্তু উম্মাতে মুহাম্মাদীর উপর আল্লাহ তা'আলার এটিও বড় অনুগ্রহ যে, রক্তপণ গ্রহণও তাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে। তাহলে এখানে তিনটি জিনিস হচ্ছে (১) 'কিসাস', (২) রক্তপণ ও (৩) ক্ষমা। পূর্ববর্তী উম্মাতদের মধ্যে শুধুমাত্র 'কিসাস' ও 'ক্ষমা' ছিল, কিন্তু 'দিয়্যাতের' বিধান ছিলনা। তাওরাতধারীদের জন্য শুধু কিসাস ও ক্ষমার বিধান ছিল এবং ইঞ্জীলধারীদের জন্য শুধু ক্ষমাই ছিল। তারপরে বলা হচ্ছে, যে ব্যক্তি রক্তপণ গ্রহণ বা মেনে নেয়ার পরেও বাড়াবাড়ি করে, তার জন্য রয়েছে কঠিন বেদনাদায়ক শাস্তি।

কিসাসের উপকারিতা এবং এর অপরিহার্যতা

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ **وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ** হে জ্ঞানীরা! তোমরা জেনে রেখ যে, *কিসাসে'র মধ্যে মানব গোষ্ঠীর অমরত্ব রয়েছে*। এর মধ্যে বড় দূরদর্শিতা রয়েছে। যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে যে, একজনের পরিবর্তে অপরজন নিহত হচ্ছে, সুতরাং দু'জন মারা যাচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যদি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখা যায় তাহলে জানা যাবে যে, এটা জীবনেরই কারণ। হত্যা করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির স্বয়ং এই ধারণা হবে যে, সে যাকে হত্যা করতে যাচ্ছে তাকে হত্যা করা উচিত হবেনা। নতুবা তাকেও নিহত হতে হবে। এই ভেবে সে হত্যার কাজ হতে বিরত থাকবে। তাহলে দু'ব্যক্তি মৃত্যু হতে বেঁচে যাচ্ছে। পূর্বের গ্রন্থসমূহের মধ্যেও তো আল্লাহ তা'আলা এই কথাটি বর্ণনা করেছিলেন যে, **اَلْقَتْلُ اَنْفَى الْقَتْلِ** অর্থাৎ হত্যা হত্যাকে বাধা দেয়, কিন্তু কুরআনুল হাকীমের মধ্যে অত্যন্ত বাকপটুতা ও ভাষালঙ্কারের সাথে এই বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ 'এটা তোমাদের বেঁচে থাকার কারণ। প্রথমতঃ তোমরা আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা থেকে রক্ষা পাবে। দ্বিতীয়তঃ না কেহ কেহকে হত্যা করবে, আর না সে নিহত হবে। সুতরাং পৃথিবীর বুকে সর্বত্র নিরাপত্তা ও শান্তি

বিরাজ করবে।’ تَقْوَىٰ হচ্ছে প্রত্যেক সাওয়াবের কাজ করা এবং প্রত্যেক পাপের কাজ ছেড়ে দেয়ার নাম।

১৮০। যখন তোমাদের কারও মৃত্যু নিকটবর্তী বলে মনে হয়, তখন সে যদি ধন সম্পত্তি রেখে যায় তাহলে মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য বৈধভাবে অসীয়ত করা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ হল, ধর্ম-ভীরুদের এটা অবশ্য করণীয়।	١٨٠. كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ
১৮১। অতঃপর যে ব্যক্তি শোনার পর তা পরিবর্তন করে, তাহলে এর পাপ তাদেরই হবে যারা একে পরিবর্তন করবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।	١٨١. فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ بَعْدَمَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّمَآ إِثْمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
১৮২। অনন্তর যদি কেহ অসীয়তকারীর পক্ষে পক্ষপাতিত্ব অথবা পাপের আশঙ্কা করে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তাতে তার পাপ নেই; নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।	١٨٢. فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

উত্তরাধিকারীদের জন্য অসিয়াত বাতিল করা হয়েছে

এই আয়াতে মা-বাবা ও আত্মীয় স্বজনের জন্য অসিয়াত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উত্তরাধিকার বিধানের পূর্বে এটা ওয়াজিব ছিল। সঠিক উক্তি এটাই। কিন্তু উত্তরাধিকারের নির্দেশাবলী এই অসিয়াতের হুকুমকে মানসূখ করে দিয়েছে। প্রত্যেক উত্তরাধিকারী তার জন্য নির্ধারিত অংশ অসিয়াত ছাড়াই নিয়ে নিবে। 'সুনান' ইত্যাদির মধ্যে আমর ইব্ন খারিজাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খুৎবার মধ্যে এ কথা বলতে শুনেছি ঃ

'আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক উত্তরাধিকারীর জন্য তার হক পৌঁছে দিয়েছেন। এখন উত্তরাধিকারীর জন্য কোন অসিয়াত নেই।' (তিরমিযী ৬/৩১৩, নাসাঈ ৬/২৪৭, ইব্ন মাজাহ ২/৯০৫) মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) সূরা বাকারাহ পাঠ করে إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলে বলেন ঃ 'এই আয়াতটি মানসূখ।' (হাকিম ২/২৭৩) তিনি এটাও বর্ণনা করেছেন যে, পূর্বে মা-বাবার সাথে অন্য কেহ উত্তরাধিকারী ছিলনা, অন্যদের জন্য শুধু অসিয়াত করা হত। অতঃপর উত্তরাধিকারের আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয় এবং সম্পদের এক তৃতীয়াংশ অসিয়াত করার স্বাধীনতা দেয়া হয়। এই আয়াতের হুকুম মানসূখকারী হচ্ছে নিম্নের আয়াতটি।

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

পুরুষদের জন্য মাতা-পিতা ও আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত বিষয়ে অংশ রয়েছে- অল্প বা অধিক, তা নির্দিষ্ট পরিমাণ। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৭)

ইব্ন উমার (রাঃ), আবূ মূসা (রাঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), 'আতা (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ), তাউস (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), শুরাইহ্ (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ) এবং যুহরী (রহঃ) এরা সবাই এই আয়াতটিকে মানসূখ বলেছেন। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৩০১-৩০৩, তাবারী ৩/৩৮৯, ৩৯১)

অসিয়াত তাদের জন্য যারা উত্তরাধিকারী আইনের আওতায় পড়েনা

কেহ কেহ বলেন যে, অসিয়াতের হুকুম উত্তরাধিকারীদের ব্যাপারে মানসূখ হয়েছে। কিন্তু যাদের 'মীরাস' নির্ধারিত নেই তাদের ব্যাপারে সাব্যস্ত রয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) মাসরূক (রহঃ), তাঊস (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ), মুসলিম ইব্ন ইয়াসার (রহঃ) এবং আ'লা ইব্ন যিয়াদ (রহঃ) এরও মাযহাব এটাই। আমি বলি যে, সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং মুকাতিল ইব্ন হিব্বানও (রহঃ) এ কথাই বলেন। ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যে ব্যক্তির নিকট কিছু জিনিস রয়েছে এবং সে অসিয়াত করতে ইচ্ছা করে তার জন্য উচিত নয় যে, সে অসিয়াত লিখে না দিয়ে দু'টি রাতও অতিবাহিত করে।' হাদীসটির বর্ণনাকারী ইব্ন উমার (রাঃ) বলেন ঃ 'এই নির্দেশ শোনার পর বিনা অসিয়াতে আমি একটি রাতও কাটাইনি।' (ফাতহুল বারী ৫/৪১৯, মুসলিম ৩/১২৪৯, ১২৫০) আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সৎ ব্যবহার করা এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ করা সম্বন্ধে বহু আয়াত এবং হাদীস এসেছে।

ন্যায়ানুগ অসিয়াত হওয়া উচিত

অসিয়াতের ব্যাপারে উত্তম পন্থা অবলম্বন করা উচিত, অন্যায় পন্থা অবলম্বন করা উচিত নয়। যেন উত্তরাধিকারীদের কোন ক্ষতি না হয়। মাত্রাধিক্য ও বাজে খরচ মোটেই শোভনীয় নয়। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, সা'দ (রাঃ) বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি একজন ধনী লোক এবং আমার উত্তরাধিকারিণী শুধুমাত্র একটি মেয়ে। সুতরাং আপনি আমাকে দুই-তৃতীয়াংশ সম্পদ অসিয়াত করার অনুমতি দিন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'না।' তিনি বললেন ঃ 'অর্ধেকের অনুমতি দিন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'না।' তিনি বলেন ঃ 'এক-তৃতীয়াংশের অনুমতি দিন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ অসিয়াত কর, তবে এটাও বেশী। তোমার উত্তরাধিকারিণীকে তুমি যে দরিদ্র ও অস্বচ্ছল অবস্থায় ছেড়ে যাবে এবং তারা অন্যের সামনে হাত পাতবে এর চেয়ে বরং তাদেরকে সম্পদশালী রূপে ছেড়ে যাওয়াই উত্তম।' (ফাতহুল বারী ৫/৭২৪, মুসলিম ৩/১২৫০) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, 'মানুষ যদি এক তৃতীয়াংশকে ছেড়ে

এক চতুর্থাংশের উপর আসত! কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক তৃতীয়াংশের অনুমতি প্রদান করে এটাও বলেছেন যে, এক-তৃতীয়াংশও বেশী।' (বুখারী ২৭৪৩) অতঃপর বলা হচ্ছে

فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ যে ব্যক্তি অসিয়াতকে পরিবর্তন করবে, তাতে কম-বেশি করবে কিংবা গোপন করবে, এর পাপের বোঝা সেই পরিবর্তনকারীকেই বইতে হবে। অসিয়াতকারীর প্রতিদান আল্লাহ তা'আলার নিকট সাব্যস্ত হয়েই গেছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অসিয়াতকারীর অসিয়াতের বিশুদ্ধতার কথাও জানেন এবং পরিবর্তনকারীর পরিবর্তনও জানেন। কোন কথা ও রহস্য তাঁর নিকট গোপন থাকেনা। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), আবুল আলিয়া (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) جَنَفٌ শব্দটির অর্থ করেছেন 'ভুল'। যেমন কোন উত্তরাধিকারীকে কোনও প্রকারে বেশি দেয়ার ব্যবস্থা করা। যেমন বলা হল যে, অমুক জিনিস অমুকের হাতে এত এত দামে বেচে দেয়া হোক ইত্যাদি। এটা ভুল বশতঃই হোক অথবা অত্যধিক ভালবাসার কারণে অনিচ্ছাকৃতই হোক কিংবা এই অপরাধের কারণে পরবর্তী সময়ে (আখিরাতে) শাস্তির কথা না জানার কারণেই হোক। এরূপ স্থলে অসিয়াতকারী যার নিকট অসিয়াতের কথা প্রকাশ করে গেল, সে যদি অসিয়াতকে রদবদল করে যেভাবে অসিয়াত করা উচিত সেইভাবে সম্পদের পুনঃ বন্টন করে দেয় তাহলে তাতে তার কোন পাপ হবেনা। অসিয়াতকে শারীয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী চালু করা উচিত, যেন মৃত ব্যক্তিও আল্লাহর শাস্তি হতে বাঁচতে পারে, হকদারগণও তাদের হক পেয়ে যায় এবং অসিয়াতও শারীয়াত অনুযায়ী সম্পন্ন হয়। এ অবস্থায় পরিবর্তনকারীর কোন পাপ হবেনা।'

সঠিকভাবে/ন্যায়ানুগ অসিয়াত করার উপকারিতা

মুসনাদ আবদুর রায্‌যাকে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'মানুষ সত্তর বছর পর্যন্ত ভাল লোকের কাজের মত কাজ করতে থাকে, কিন্তু অসিয়াতের ব্যাপারে অত্যাচার করে, কাজেই পরিণাম খারাপ কাজের উপর হওয়ায় সে জাহান্নামী হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মানুষ সত্তর বছর ধরে অসৎ কাজ

করতে থাকে কিন্তু অসিয়াতের ব্যাপারে ন্যায় ও ইনসাফ করে, কাজেই তার শেষ আমল ভাল হওয়ায় সে জান্নাতী হয়ে যায়।' অতঃপর আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, 'যদি তোমরা চাও তাহলে কুরআনুল হাকীমের এই আয়াতটি পাঠ করে নাও تِلْكَ حُدُودُ اللّٰه فَلاَ تَقْرَبُوهَا অর্থাৎ 'এটা আল্লাহর সীমারেখা, সুতরাং তোমরা তা অতিক্রম করনা। (মুসনাদ আবদুর রায্যাক ৯/৮৮)

১৮৩। হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ন্যায় তোমাদের উপরও সিয়ামকে অপরিহার্য কর্তব্য রূপে নির্ধারণ করা হল যেন তোমরা সংযমশীল হতে পার।	١٨٣. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ
১৮৪। ওটা নির্দিষ্ট কয়েক দিন। কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে কেহ পীড়িত কিংবা প্রবাসী হয় তার জন্য অপর কোন দিন হতে গণনা করবে, আর যারা ওতে অক্ষম তারা তৎপরিবর্তে একজন দরিদ্রকে আহার্য দান করবে। অতএব যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সৎ কাজ করে তার জন্য কল্যাণ এবং তোমরা যদি বুঝে থাক তাহলে সিয়াম পালনই তোমাদের জন্য কল্যাণকর।	١٨٤. أَيَّامًا مَّعۡدُودَٰتٍۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٌ طَعَامُ مِسۡكِينٍۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرًا فَهُوَ خَيۡرٌ لَّهُۥۚ وَأَن تَصُومُواْ خَيۡرٌ لَّكُمۡۖ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ

সিয়াম পালন করার আদেশ

আল্লাহ তা'আলা এই উম্মাতের ঈমানদারগণকে সম্বোধন করে বলেন যে, তারা যেন সিয়াম পালন করে। সিয়ামের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালনের খাঁটি নিয়াতে পানাহার ও স্ত্রী সহবাস হতে বিরত থাকা। এর উপকারিতা এই যে, এর ফলে মানবাত্মা পাপ ও কালিমা থেকে সম্পূর্ণ রূপে পরিষ্কার ও পবিত্র হয়ে যায়। এর সাথে সাথেই আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, এই সিয়ামের হুকুম শুধুমাত্র তাদের উপরেই হচ্ছেনা, বরং তাদের পূর্ববর্তী উম্মাতের প্রতিও সিয়ামের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। এই বর্ণনার উদ্দেশ্য এটাও যে, উম্মাতে মুহাম্মাদী যেন এই কর্তব্য পালনে পূর্বের উম্মাতদের পিছে না পড়ে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۖ فَٱسْتَبِقُوا۟ ٱلْخَيْرَٰتِ

তোমাদের প্রত্যেকের (সম্প্রদায়) জন্য আমি নির্দিষ্ট শারীয়াত এবং নির্দিষ্ট পন্থা নির্ধারণ করেছিলাম; আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তাহলে তোমাদের সকলকে একই উম্মাত করে দিতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি এ কারণে যে, যে ধর্ম তিনি তোমাদেরকে প্রদান করেছেন তাতে তোমাদের সকলকে পরীক্ষা করবেন, সুতরাং তোমরা কল্যাণকর বিষয়সমূহের দিকে ধাবিত হও। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৪৮) এই বর্ণনাই এখানেও করা হচ্ছে যে এই সিয়াম তোমাদের উপর ঐ রকমই ফার্য, যেমন ফার্য ছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। সিয়াম পালনের দ্বারা শরীরের পবিত্রতা লাভ হয় এবং শাইতানের পথে বাধার সৃষ্টি হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'হে যুবকবৃন্দ! তোমাদের মধ্যে যার বিয়ে করার সামর্থ্য রয়েছে সে বিয়ে করবে, আর যার সামর্থ্য নেই সে সিয়াম পালন করবে। এটা তার জন্য রক্ষা কবচ হবে। (ফাতহুল বারী ৯/৮, মুসলিম ২/১০১৮) অতঃপর সিয়ামের জন্য দিনের সংখ্যা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, এটি কয়েকটি দিন মাত্র যাতে কারও উপর বোঝা স্বরূপ না হয় এবং কেহ আদায়ে অসমর্থ হয়ে না পড়ে; বরং আগ্রহের সাথে তা পালন করে।

বিভিন্ন প্রকার সিয়ামের বর্ণনা

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, পূর্বে আশুরার সিয়াম পালন করা হত। যখন রামাযানের সিয়াম ফার্‌য করা হয় তখন আর আশুরার সিয়াম বাধ্যতামূলক থাকেনা; বরং যিনি ইচ্ছা করতেন পালন করতেন এবং যিনি চাইতেননা, পালন করতেননা। (ফাতহুল বারী ৮/২৬, মুসলিম ২/৭৯২)

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৮৪) এর ভাবার্থে মু'আয (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইচ্ছা করলে কেহ সিয়াম পালন করতেন আবার কেহ পালন করতেননা। বরং মিসকীনকে খাদ্য দান করতেন। সালমা ইব্‌ন আকও'য়া (রাঃ) হতে সহীহ বুখারীতে একটি বর্ণনা এসেছে যে, এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার সময় যে ব্যক্তি ইচ্ছা করত সিয়াম ছেড়ে দিয়ে 'ফিদইয়া' দিয়ে দিত। অতঃপর এর পরবর্তী আয়াত وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ অবতীর্ণ হয় এবং এটি 'মানসূখ' (রহিত) হয়ে যায়। (ফাতহুল বারী ৮/২৯) উমারও (রাঃ) এটিকে মানসূখ বলেছেন। আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন যে, এটা মানসূখ নয়, বরং এর ভাবার্থ হচ্ছে বৃদ্ধ পুরুষ বা বৃদ্ধা নারী, যারা সিয়াম পালন করার ক্ষমতা রাখেনা। (ফাতহুল বারী ৮/২৮)

অসুস্থ ও অক্ষম ব্যক্তির সিয়ামের পরিবর্তে ফিদইয়া প্রদান

ইব্‌ন আবী লাইলা (রহঃ) বলেন ঃ 'আমি 'আতার (রহঃ) নিকট রামাযান মাসে আগমন করি। আমি দেখতে পাই যে, তিনি খানা খাচ্ছেন। আমাকে দেখে তিনি বলেন ঃ 'ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) উক্তি আছে যে, এই আয়াতটি পূর্বের আয়াতটিকে মানসূখ করেনি, বরং এই হুকুম শুধুমাত্র শক্তিহীন, অচল বৃদ্ধদের জন্য রয়েছে।' (ফাতহুল বারী ৮/২৮) মোট কথা এই যে, যে ব্যক্তি নিজ আবাসে আছে এবং সুস্থ ও সবল অবস্থায় রয়েছে তার জন্য এই নির্দেশ নয়। বরং তাকে সিয়ামই পালন করতে হবে। তবে হ্যাঁ, খুবই বয়স্ক, বৃদ্ধ এবং দুর্বল লোক যাদের সিয়াম পালন করার ক্ষমতা নেই, তারা সিয়াম পালন করবেনা এবং তাদের উপর সিয়াম কাযাও যরুরী নয়। কারণ তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতির কোন সম্ভাবনা নেই, ফলে ভবিষ্যতেও তারা সিয়াম পালন করতে সক্ষম হবেনা। এমতাবস্থায় তাদেরকে প্রতিটি ছুটে যাওয়া সিয়ামের জন্য ফিদইয়া বা কাফফারা আদায় করতে হবে। ইহাই ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং বিভিন্ন আলেমের অভিমত, যাদের মধ্যে সালফে সালিহীনগণও রয়েছেন। (তাবারী ৩/৪৩১)

ইমাম বুখারীরও (রহঃ) এটাই পছন্দনীয় অভিমত। তিনি বলেন যে, খুব বেশি বয়স্ক বৃদ্ধ যার সিয়াম পালন করার শক্তি নেই সে 'ফিদইয়া'ই দিয়ে দিবে। যেমন আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) শেষ বয়সে অত্যন্ত বার্ধক্য অবস্থায় দু'বছর ধরে সিয়াম পালন করেননি এবং প্রতিটি সিয়ামের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে গোশ্ত-রুটি আহার করাতেন। (ফাতহুল বারী ৮/১৭৯)

'মুসনাদ আবূ ইয়ালা' গ্রন্থে রয়েছে যে, যখন আনাস (রাঃ) সিয়াম পালন করতে অসমর্থ হয়ে পড়েন তখন রুটি ও গোশত তৈরি করে ত্রিশ জন মিসকীনকে আহার করান। (আবূ ইয়ালা ৭/২০৪) অনুরূপভাবে গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মহিলারা যখন তাদের নিজেদের ও সন্তানদের জীবনের ভয় করবে এদের ব্যাপারেও বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে। কেহ কেহ বলেন যে, তারা সিয়াম পালন করবেনা, বরং 'ফিদইয়া' দিবে এবং যখন ভয় দূর হয়ে যাবে তখন সিয়ামের কাযা করে নিবে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, শুধু ফিদইয়া যথেষ্ট, কাযা করার প্রয়োজন নেই। কেহ কেহ আবার বলেন যে, সিয়ামই পালন করবে, 'ফিদইয়া' বা কাযা নয়।

১৮৫। রামাযান মাস, যে মাসে বিশ্বমানবের জন্য পথ প্রদর্শন এবং সু-পথের উজ্জ্বল নিদর্শন এবং হক ও বাতিলের প্রভেদকারী কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সেই মাসে (নিজ আবাসে) উপস্থিত থাকে সে যেন সিয়াম পালন করে এবং যে ব্যক্তি পীড়িত অথবা প্রবাসী, তার জন্য অপর কোন দিন হতে গণনা করবে; তোমাদের পক্ষে যা সহজসাধ্য আল্লাহ তা'ই ইচ্ছা করেন ও তোমাদের পক্ষে যা দুঃসাধ্য	١٨٥. شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ

ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ	তা ইচ্ছা করেননা এবং যেন তোমরা নির্ধারিত সংখ্যা পূরণ করে নিতে পার এবং তোমাদেরকে যে সুপথ দেখিয়েছেন তজ্জন্য তোমরা আল্লাহকে মহিমান্বিত কর এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

রামাযান মাসের মর্যাদা এবং এ মাসে কুরআন নাযিল হওয়া

এখানে রামাযান মাসের সম্মান ও মর্যাদার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, এই পবিত্র মাসেই কুরআনুল কারীম অবতীর্ণ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'ইবরাহীমের (আঃ) 'সহীফা' রামাযানের প্রথম রাতে, 'তাওরাত' ৬ তারিখে, 'ইঞ্জীল' ১৩ তারিখে এবং কুরআন কারীম ২৪ তারিখে অবতীর্ণ হয়। (আহমাদ ৪/১০৭) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أُنزِلَ فِيهِ এবং إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ এবং إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ الْقُرْآنُ এর ভাবার্থ এটাই। অর্থাৎ কুরআনুল কারীমকে একই সাথে প্রথম আকাশের উপরে রামাযান মাসের 'কাদরের' রাতে অবতীর্ণ করা হয় এবং ঐ রাতকে لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ অর্থাৎ বারাকাতময় রাতও বলা হয়।

পবিত্র কুরআনের মর্যাদা

কুরআনুম মাজীদের প্রশংসায় বলা হচ্ছে যে, এটি বিশ্ব মানবের জন্য পথ প্রদর্শক এবং এতে প্রকাশ্য ও উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী রয়েছে। ভাবুক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এর মাধ্যমে সঠিক পথে পৌঁছতে পারেন। এটা সত্য ও মিথ্যা, হারাম ও হালালের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টিকারী। সুপথ ও কুপথ এবং ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য আনয়নকারী।

রামযান মাসে সিয়াম পালন করা ফার্‌য

এই আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত হচ্ছে যে, রামাযানের চন্দ্র উদয়ের সময় যে ব্যক্তি বাড়ীতে অবস্থান করবে, মুসাফির হবেনা এবং সুস্থ ও সবল থাকবে, তাকে বাধ্যতামূলকভাবেই সিয়াম পালন করতে হবে। পূর্বে এদের জন্য সিয়াম ছেড়ে দেয়ার অনুমতি ছিল; কিন্তু এখন আর অনুমতি রইলনা। এটা বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা রুগ্ন ও মুসাফিরের জন্য সিয়াম ছেড়ে দেয়ার অনুমতির কথা বর্ণনা করেন। এদের জন্য বলা হচ্ছে যে, এরা এই সময় সিয়াম পালন করবেনা এবং পরে আদায় করে নিবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তির শারীরিক কোন কষ্ট রয়েছে যার ফলে তার পক্ষে সিয়াম পালন করা কষ্টকর হচ্ছে কিংবা সফরে রয়েছে সে সিয়াম ছেড়ে দিবে এবং এভাবে যে কয়টি সিয়াম ছুটে যাবে তা পরে আদায় করে নিবে। অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে যে, এরূপ অবস্থায় সিয়াম ছেড়ে দেয়ার অনুমতি দিয়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের প্রতি বড়ই করুণা প্রদর্শন করেছেন এবং ইসলামের নির্দেশাবলী সহজ করে দিয়ে তাঁর বান্দাদেরকে কষ্ট হতে রক্ষা করেছেন। ইমাম বুখারীর (রহঃ) একটি হাদীসে রয়েছে, যে ব্যক্তি বিশ্বাস রেখে ও সৎ নিয়্যাতে রামাযানের সিয়াম পালন করে তার পূর্বের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়।

সফরে সিয়াম পালন সম্পর্কিত কতিপয় বিধি-বিধান

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রামাযানুল মুবারক মাসে মাক্কা বিজয় অভিযানে সিয়াম পালন অবস্থায় রওয়ানা হন। 'কাদীদ' নামক স্থানে পৌঁছে সিয়াম ছেড়ে দেন এবং সাহাবীগণকেও সিয়াম ত্যাগ করার নির্দেশ দেন (ফাতহুল বারী ৩/২১৩, মুসলিম ২/৭৮৪)।

রামাযান মাসে সাহাবীগণ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সফরে বের হতেন। তাঁদের কেহ কেহ সিয়াম পালন করতেন আবার কেহ কেহ পালন করতেননা। এমতাবস্থায় সিয়াম পালনকারীগণ বে-সিয়াম পালনকারীগণের উপর এবং সিয়াম না পালনকারীগণ সিয়াম পালনকারীগণের উপর কোনরূপ দোষারোপ করতেননা। সুতরাং যদি সিয়াম ছেড়ে দেয়া ওয়াজিব হত তাহলে সিয়াম পালনকারীগণকে অবশ্যই সিয়াম পালন করতে নিষেধ করা হত। এমনকি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সফর অবস্থায় সিয়াম পালন করা সাব্যস্ত আছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, আবূ দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ 'রামাযানুল মুবারক মাসে কঠিন গরমের দিনে

আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এক সফরে ছিলাম। কঠিন গরমের কারণে আমরা মাথায় হাত রেখে রেখে চলছিলাম। আমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রাঃ) ছাড়া আর কেহই সিয়াম পালনকারী ছিলেননা। (ফাতহুল বারী ৩/২১৫, মুসলিম ২/৭৯০)

একটি দলের ধারণা এই যে, সিয়াম পালন না করাই উত্তম। কেননা এর দ্বারা 'রুখসাতের' (অবকাশের) উপর আমল করা হয়। অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, সফরে সিয়াম পালন করা সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেন ঃ

'যে ব্যক্তি সিয়াম ত্যাগ করে সে উত্তম কাজ করে এবং যে ত্যাগ করেনা তারও কোন পাপ নেই।' (মুসলিম ২/৭৯০) অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের যে অবকাশ দিয়েছেন তা তোমরা গ্রহণ কর।' (মুসলিম ২/৭৮৬)

তৃতীয় দলের উক্তি এই যে, সিয়াম পালন করা ও না করা দু'টিই সমান। তাঁদের দলীল হচ্ছে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত নিম্নের এই হাদীসটি ঃ হামযা ইব্ন আমর আসলামী (রাঃ) বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি প্রায়ই সিয়াম পালন করে থাকি। সুতরাং সফরেও কি আমার সিয়াম পালন করার অনুমতি রয়েছে?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

'ইচ্ছা হলে পালন কর, না হলে ছেড়ে দাও।' (ফাতহুল বারী ৪/২১১, মুসলিম ২/৭৮৯) কোন কোন লোকের উক্তি এই যে, যদি সিয়াম পালন করা কঠিন হয় তাহলে ছেড়ে দেয়াই উত্তম। যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি লোককে দেখেন যে, তাকে ছায়া করা হয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ 'ব্যাপার কি?' জনগণ বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! লোকটি সিয়াম পালনকারী'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ঃ

'সফরে সিয়াম পালন করা সাওয়াবের কাজ নয়। (ফাতহুল বারী ৪/২১৬, মুসলিম ২/৭৮৬) এটা স্মরণীয় বিষয় যে, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং সফর অবস্থায়ও সিয়াম ছেড়ে দেয়া মাকরূহ মনে করে, তার জন্য সিয়াম ছেড়ে দেয়া যরুরী এবং সিয়াম পালন করা হারাম।

কাযা সিয়ামসমূহ ক্রমাগত পালন করা কি যরুরী, নাকি পৃথক পৃথকভাবে পালন করায়ও কোন দোষ নেই? ক্রমাগত সিয়াম পালন করা ওয়াজিব নয়। এক সাথেও পালন করতে পারে, আবার পৃথক পৃথকভাবে অর্থাৎ মাঝে মাঝে ছেড়ে ছেড়েও সিয়াম পালন করতে পারে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মনীষীদেরও এই উক্তিই রয়েছে এবং দলীল প্রমাণাদি দ্বারা এটাই সাব্যস্ত হচ্ছে। রামাযান মাসে ক্রমাগতভাবে এ জন্যই (সিয়াম) পালন করতে হয় যে, ওটা সম্পূর্ণ সিয়ামেরই মাস। আর রামাযানের মাস শেষ হওয়ার পর ওটা শুধুমাত্র গণনা করে পূরা করতে হয়। তা যে কোন দিনই হতে পারে।

সহজ, কোন কিছু কঠিন করা নয়

একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'তোমরা সহজ কর, কঠিন করনা এবং সুখবর দাও, ঘৃণার উদ্রেক করনা।' (আহমাদ ৩/১৩১ ফাতহুল বারী ১০/৫৪১, মুসলিম ৩/১৩৫৯) অন্য হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু'আয (রাঃ) ও আবূ মূসাকে (রাঃ) ইয়ামান পাঠানোর সময় বলেন ঃ

'তোমরা (জনগণকে) সুসংবাদ প্রদান করবে, ঘৃণা করবেনা, পরস্পর এক মতের উপর থাকবে, মতভেদ সৃষ্টি করবেনা।'(ফাতহুল বারী ৭/৬৬০, মুসলিম ৩/১৫৮৭) সুনান ও মুসনাদসমূহে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমি সুদৃঢ় এবং নরম ও সহজ বিশিষ্ট ধর্ম নিয়ে প্রেরিত হয়েছি।' (আহমাদ ৫/২৬৬)

বর্ণিত আয়াতটির ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, রুগ্ন, মুসাফির প্রভৃতিকে অবকাশ দেয়া এবং তাদেরকে অপারগ মনে করার কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা তাঁর বান্দাদের প্রতি ওটাই যা তাদের জন্য সহজসাধ্য এবং তাদের পক্ষে যা দুঃসাধ্য তার ইচ্ছা আল্লাহ তা'আলা পোষণ করেননা। আর 'কাযার' নির্দেশ হচ্ছে গণনা পূরা করার জন্য। সুতরাং তাঁর বান্দাদের উচিত তাঁর এই দয়া, নি'আমাত এবং সুপথ প্রদর্শনের জন্য মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা।

ইবাদাত করতে হবে আল্লাহর যিক্র করার সাথে সাথে

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ তোমাদেরকে হিদায়াত দানের জন্য আল্লাহর মহানত্ম ঘোষনা কর। এর অর্থ হল ইবাদাত বা

সালাত আদায়ের পর তোমরা তাঁকে স্মরণ কর। একই ধরনের বাণী রয়েছে নিম্নের আয়াতটিতে ঃ

فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَٰسِكَكُمْ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَآءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا

অনন্তর যখন তোমরা তোমাদের (হাজ্জের) অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন করে ফেল তখন যেরূপ তোমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে স্মরণ করতে তদ্রুপ আল্লাহকে স্মরণ কর, বরং তদপেক্ষা দৃঢ়তরভাবে স্মরণ কর। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২০০) অন্য জায়গায় তিনি জুমু‘আর সালাত সম্বন্ধে বলেন ঃ

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হও। (সূরা জুমুআ’হ, ৬২ ঃ ১০) অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ. وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَٰرَ ٱلسُّجُودِ

এবং তোমার রবের প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে। তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর রাতের একাংশে এবং সালাতের পরেও। (সূরা কাফ, ৫০ ঃ ৩৯-৪০) এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণীয় পন্থা এই যে, প্রত্যেক ফার্‌য সালাতের পর আল্লাহ তা‘আলার হামদ, তাসবীহ এবং তাকবীর পাঠ করতে হবে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ ‘আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সালাতের সমাপ্তি শুধুমাত্র তাঁর ‘আল্লাহু আকবার’ ধ্বনির মাধ্যমেই জানতে পারতাম। (বুখারী ৮৪২) এই আয়াতটি এই বিষয়ের দলীল যে, ‘ঈদুল ফিতরেও তাকবীর পাঠ করা উচিত।

অতঃপর বলা হচ্ছে যে, যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও। অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশাবলী পালন করে তাঁর ফার্‌যগুলি আদায় করে, তাঁর নিষিদ্ধ কাজগুলি হতে

বিরত থেকে এবং তাঁর সীমারেখার হিফাযাত করে তোমরা তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে যাও।

১৮৬। এবং যখন আমার সেবকবৃন্দ (বান্দা) আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে তখন তাদেরকে বলে দাও ঃ নিশ্চয়ই আমি সন্নিকটবর্তী; কোন আহ্বানকারী যখনই আমাকে আহ্বান করে তখনই আমি তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে থাকি; সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমাকে বিশ্বাস করে - তাহলেই তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে।	١٨٦. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا۟ لِى وَلْيُؤْمِنُوا۟ بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রার্থনা শুনতে পান

আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ 'আমরা এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। আমরা প্রত্যেকে উঁচু স্থানে উঠার সময় এবং উপত্যকায় অবতরণের সময়ে উচ্চস্বরে তাকবীর ধ্বনি করতে করতে যাচ্ছিলাম। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট এসে বলেন ঃ

'হে জনমণ্ডলী! নিজেদের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর। তোমরা কোন কম শ্রবণকারী ও দূরে অবস্থানকারীকে ডাকছনা। যাঁকে তোমরা ডাকতে রয়েছ তিনি তোমাদের স্কন্ধ অপেক্ষাও নিকটে রয়েছেন। হে আবদুল্লাহ ইব্ন কায়েস! তোমাকে কি আমি জান্নাতের কোষাগারসমূহের সংবাদ দিবনা? তা হচ্ছে لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ الاَّ بِاللَّهِ এই কালেমাটি (আহমাদ ৪/৪০২, ফাতহুল বারী ২/৫০৯, মুসলিম ৪/২০৭৬) এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রহঃ) ও মুসলিমের হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ), তিরমিযী (রহঃ), নাসাঈ (রহঃ) এবং ইব্ন মাজাহও (রহঃ) অনুরূপ শব্দ প্রয়োগ করে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ (রহঃ) আনাসের (রাঃ) বরাবরে আরও বর্ণনা করেছেন

যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন ঃ আমার বান্দা আমার প্রতি যেরূপ ধারনা পোষণ করে আমি তদ্রূপ, যখন সে আমাকে ডাকে তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিই। (আহমাদ ৩/২১০)

আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রার্থনা কবূল করে থাকেন

আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যে বান্দা আল্লাহ তা'আলার নিকট এমন প্রার্থনা করে যার মধ্যে পাপও নেই এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নতাও নেই তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে তিনটি জিনিসের মধ্যে যে কোন একটি দান করে থাকেন। হয়ত বা তার প্রার্থনা তৎক্ষণাৎ কবূল করে নিয়ে তার প্রার্থিত উদ্দেশ্য পূরা করেন, কিংবা তা জমা করে রেখে দেন, এবং পরকালে দান করেন কিংবা ওরই কারণে এমন কোন বিপদ কাটিয়ে দেন যে বিপদ তার প্রতি আপতিত হত।' এ কথা শুনে জনসাধারণ বলল ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা যদি খুব বেশি বেশি করে প্রার্থনা করি?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলার নিকট খুবই বেশি রয়েছে। (আহমাদ ৩/১৮) উবাদাহ্ ইব্ন সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'ভূ-পৃষ্ঠের যে মুসলিম মহা সম্মানিত ও মর্যাদাবান আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানায় তা আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করে থাকেন, হয় সে তার প্রার্থিত উদ্দেশ্য লাভ করে অথবা ঐ রকমই তার কোন বিপদ কেটে যায় যে পর্যন্ত না কোন পাপের কাজে বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নতার কাজে সে প্রার্থনা করে।' (আহমাদ ৫/৩২৯, তিরমিযী ১০/২৪) বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যে পর্যন্ত কোন ব্যক্তি প্রার্থনায় তাড়াহুড়া না করে, তার প্রার্থনা অবশ্যই কবূল হয়। তাড়াতাড়ি করার অর্থ এই যে, সে বলতে আরম্ভ করে, 'আমি সদা প্রার্থনা করতে রয়েছি, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কবূল করছেননা (আহমাদ ২/৩৯৬, ফাতহুল বারী ১১/১৪৫, মুসলিম ৪/২০৯৫) সহীহ বুখারীর বর্ণনায় এটিও আছে যে, প্রতিদান স্বরূপ তাকে জান্নাত দান করা হয়।

ইমাম মুসলিম (রহঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদীস প্রসঙ্গে বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা ততক্ষণ পর্যন্ত কবূল করেন যতক্ষণ তার দু'আয় পাপজনিত কোন কথা মিশ্রিত না থাকে অথবা নাড়ির (রক্তের) সম্পর্ক ছিন্ন না করে অথবা দু'আর ব্যাপারে তাড়াহুড়া না করে। তাঁকে

জিজ্ঞেস করা হল ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাড়াহুড়া করা কি? তিনি বললেন ঃ ঐ ব্যক্তি বলে, আমি দু'আ করতেই রয়েছি, অথচ দু'আ কবূল হওয়ার কোন সুফল পাচ্ছিনা; এভাবে সে দু'আ করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং আস্তে আস্তে দু'আ করা পরিত্যাগ করে। (মুসলিম ৪/২০৯৬)

সহীহ মুসলিমে এও রয়েছে যে, কবূল না হওয়ার ধারণা করে নৈরাশ্যের সাথে সে প্রার্থনা করা পরিত্যাগ করে, এটাই হচ্ছে তাড়াহুড়া করা।

তিন ব্যক্তির প্রার্থনা ফিরিয়ে দেয়া হয়না

ইমাম আহমাদ (রহঃ) তার মুসনাদে এবং ইমাম তিরমিযী (রহঃ), নাসাঈ (রহঃ) এবং ইব্ন মাজাহ (রহঃ) তাদের সুনানে বর্ণনা করেছেন যে, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'তিন ব্যক্তির প্রার্থনা ফিরিয়ে দেয়া হয়না (১) ন্যায় পরায়ণ শাসক, (২) সিয়াম পালনকারী যতক্ষণ সিয়াম পালন করা অবস্থায় থাকে এবং (৩) নির্যাতিত ব্যক্তি। কিয়ামাত দিবসে আল্লাহ তাদেরকে উচ্চাসনের মর্যাদা দিবেন। তাদের বদ দু'আর কারণে আকাশের দরজাসমূহ খুলে যাবে এবং আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ আমার ইয্যাতের শপথ! কিছুকাল পরে হলেও আমি তোমাদের প্রার্থনা কবূল করব।' (আহমাদ ৩/৫৪৪, তিরমিযী ৭/২২৯, ইব্ন মাজাহ ১/৫৫৭)

১৮৭। রামাযানের রাতে আপন স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা করা তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে, তারা তোমাদের জন্য এবং তোমরা তাদের জন্য আবরণ, তোমরা যে নিজেদের ক্ষতি করছিলে আল্লাহ তা পরিজ্ঞাত আছেন, এ জন্য তিনি তোমাদের প্রতি প্রত্যাবৃত্ত হলেন এবং তোমাদের (ভার) লাঘব করে দিলেন; অতএব এক্ষণে তোমরা (রামাযানের রাতেও)	١٨٧. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَٱلْـَٔـٰنَ

بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَـٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَـٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ	তাদের সাথে মিলিত হও এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা লিপিবদ্ধ করেছেন তা অনুসন্ধান কর এবং প্রত্যুষে কালো সূতা হতে সাদা সূতা প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা আহার ও পান কর, অতঃপর রাত সমাগম পর্যন্ত তোমরা সিয়াম পূর্ণ কর; তোমরা মাসজিদে ই'তিকাফ করার সময় (তোমাদের স্ত্রীদের সাথে) মিলিত হবেনা; এটিই আল্লাহর সীমা। অতএব তোমরা উহার নিকটেও যাবেনা; এভাবে আল্লাহ মানবমন্ডলীর জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ বিবৃত করেন, যেন তারা সংযত হয়।

রামাযানের রাতে পানাহার ও স্ত্রী গমন করা যাবে

ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইফতারের পরে ইশা পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস বৈধ ছিল। আর যদি কেহ ওর পূর্বেই শুইয়ে যেত তাহলে নিদ্রা এলেই তার জন্য ঐসব হারাম হয়ে যেত। এর ফলে সাহাবীগণ (রাঃ) কষ্ট অনুভব করছিলেন। ফলে এই 'রুখসাতে'র আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয় এবং তারা সহজেই নির্দেশ পেয়ে যান। رَفَثٌ এর অর্থ এখানে 'স্ত্রী সহবাস'। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), 'আতা (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), তাউস (রহঃ), সালেম ইব্ন আবদুল্লাহ (রহঃ), আমর ইব্ন দীনার (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যুহরী (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ) এবং মুকাতিল ইব্ন হিব্বানও (রহঃ) এটাই

বলেছেন। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/৩৬৭-৩৭১) لِبَاسٌ এর ভাবার্থ হচ্ছে শান্তি ও নিরাপত্তা। রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ) এর অর্থ 'লেপ' নিয়েছেন। উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এত গাঢ় যার জন্য সিয়ামের রাতেও তাদেরকে মিলনের অনুমতি দেয়া হচ্ছে। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণের হাদীস ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যার মধ্যে এটা বর্ণিত হয়েছে যে, ইফতারের পূর্বে কেহ ঘুমিয়ে পড়ার পর রাতের মধ্যেই জেগে উঠলেও সে পানাহার এবং স্ত্রী-সহবাস করতে পারতনা। কারণ তখন এই নির্দেশই ছিল। অতঃপর মহান আল্লাহ এই আয়াত অবতীর্ণ করে আগের নির্দেশ উঠিয়ে নেন। এখন সিয়াম পালনকারী ব্যক্তি মাগরিব থেকে সুবহি সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস করতে পারবে। কায়েস ইব্‌ন সিরমা (রাঃ) সারাদিন জমিতে কাজ করে সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে ফিরে আসেন। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন, কিছু খাবার আছে কি? স্ত্রী বলেন ঃ 'কিছুই নেই। আমি যাচ্ছি এবং কোথাও হতে নিয়ে আসছি।' তিনি যান, আর এদিকে তাকে ঘুমে পেয়ে বসে। স্ত্রী ফিরে এসে তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে খুবই দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, এখন এই রাত এবং পরবর্তী সারাদিন কিভাবে কাটবে? অতঃপর দিনের অর্ধভাগ অতিবাহিত হলে কায়েস (রাঃ) ক্ষুধার জ্বালায় চেতনা হারিয়ে ফেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এর আলোচনা হয়। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং মুসলিমরা সন্তুষ্ট হয়ে যান। (তাবারী ৩/৪৯৫)

একটি বর্ণনায় এটাও রয়েছে, সাহাবীগণ (রাঃ) সারা রামাযানে স্ত্রীদের নিকট যেতেননা। কিন্তু কতক সাহাবী (রাঃ) ভুল করে বসতেন। ফলে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী ৮/৩০) আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ রামাযান মাসে মুসলিমগণ ইশা সালাত আদায় করার পর তারা আর স্ত্রী-গমন করতেননা এবং পরবর্তী রাত না আসা পর্যন্ত খাদ্যও খেতেননা। এমন কি উমার ইব্‌ন খাত্তাবসহ (রাঃ) কেহ কেহ তাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করেন এবং ইশা সালাত আদায় করার পর খাবারও খেয়ে ফেলেন। তারা এ বিষয়টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবহিত করেন। তখন আল্লাহ এ আয়াতটি নাযিল করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে আল আউফী (রহঃ) অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ৩/৪৯৬-৪৯৮) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ *অতএব আল্লাহ তোমাদের জন্য যা লিপিবদ্ধ করেছেন তা অনুসন্ধান কর।* এর ভাবার্থে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ), ইব্‌ন আব্বাস

(রাঃ), আনাস (রাঃ), শুরাহ আল কাযী (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), 'আতা (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), যাঈদ ইব্ন আসলাম (রহঃ), হাকাম ইব্ন উদবাহ (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেছেন যে, ইহা হল সন্তান-সন্ততি। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৩৭৭-৩৭৮, তাবারী ৩/৫০৬-৫০৭) কাতাদাহ (রহঃ) আরও বলেন যে, এর অর্থ হল আল্লাহ তোমাদের জন্য যা হালাল করেছেন তার জন্য অনুমতি চাওয়া। এসব উক্তির এভাবে সাদৃশ্য দান করা যেতে পারে যে, সাধারণভাবে ভাবার্থ সবগুলিই হবে। সহবাসের অনুমতির পর পানাহারের অনুমতি দেয়া হচ্ছে যে, সুবহি সাদিক পর্যন্ত এর অনুমতি রয়েছে।

সাহরী খাওয়ার শেষ সময়

আমরা ইতোপূর্বে বর্ণনা করেছি যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে রামাযান মাসে রাতের খাবার খাওয়া, পান করা এবং স্ত্রী-গমন করা হালাল করেছেন, যতক্ষণ না রাতের কালো আঁধার দূর হয়ে সুবহি সাদিকের আলো পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহ এভাবে বর্ণনা করেছেন, 'যতক্ষণ না সাদা সূতা থেকে কালো সূতা পার্থক্য করা যায়।' অতঃপর তিনি আরও পরিস্কার করে জানিয়ে দিলেন যে, উহা হল ঊষার লগ্ন। সহীহ বুখারীতে রয়েছে, সাহল ইব্ন সা'দ (রাঃ) বলেন ঃ 'পূর্বে مِنَ الْفَجْرِ শব্দটি অবতীর্ণ হয়নি। 'এবং প্রত্যুষে কালো সূতা হতে সাদা সূতা প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা আহার ও পান কর' আয়াত নাযিল হওয়ার পর কিছু লোক তাদের পায়ে সাদা ও কালো সূতা বেঁধে নেয় এবং যে পর্যন্ত না সাদা ও কালোর মধ্যে প্রভেদ করা যেত সে পর্যন্ত তারা পাহানার করত। অতঃপর ফাজ্র শব্দটি অবতীর্ণ হয়। ফলে জানা যায় যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে রাত ও দিন। (ফাতহুল বারী ৮/৩১) সহীহ বুখারীতে অন্য হাদীসে রয়েছে, আদী ইব্ন হাতিম (রাঃ) বলেন ঃ 'আমিও আমার বালিশের নীচে সাদা ও কালো দু'টি সূতা রেখেছিলাম এবং যে পর্যন্ত এই দুই রংয়ের মধ্যে পার্থক্য না করা যেত সেই পর্যন্ত পানাহার করতাম। সকালে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এটা বর্ণনা করি। তখন তিনি বলেন ঃ

'তোমার বালিশ তো খুব লম্বা চওড়া'। বরং তা হচ্ছে রাতের অন্ধকার এবং দিনের শুভ্রতা। (ফাতহুল বারী ৮/৩১)

সাহরী খাওয়ার নির্দেশ

ঊষা পর্যন্ত খাওয়া এবং পান করার অনুমতি দিয়ে আল্লাহ তা'আলা সাহরী খাওয়াকে উৎসাহিত করেছেন, অর্থাৎ এটি তাঁর পক্ষ থেকে একটি বিশেষ ছাড় বা অনুমোদন। আল্লাহ চান যে, তাঁর বান্দারা তাঁর অনুগ্রহ গ্রহণ করুক এবং নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করুক। বিভিন্ন সহীহ হাদীসে সাহরী খাওয়াকে উৎসাহিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'তোমরা সাহরী খাবে, তাতে বারাকাত রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৪/১৬৫, মুসলিম ২/৭৭০) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন ঃ

'আমাদের এবং আহলে কিতাবের মধ্যে পার্থক্যই সাহরী খাওয়া।' (মুসলিম ২/৭৭১) তিনি আরও বলেছেন ঃ

'সাহরী খাওয়ার মধ্যে বারাকাত রয়েছে। সুতরাং তোমরা ওটা পরিত্যাগ করনা। যদি কিছুই না থাকে তাহলে এক ঢোক পানিই যথেষ্ট। আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর মালাইকা সাহরী ভোজনকারীদের প্রতি করুণা বর্ষণ করেন।' (আহমাদ ৩/৪৪) এই প্রকারের আরও বহু হাদীস রয়েছে। সাহরী বিলম্বে খাওয়া উচিত, যেন সাহরীর খাওয়ার ক্ষণেক পরেই সুবহি সাদিক হয়ে যায়। আনাস (রাঃ) বলেন ঃ 'আমরা সাহ্‌রী খাওয়া মাত্রই সালাতে দাঁড়িয়ে যেতাম। আনাসকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, সাহরী খাওয়ার শেষ সময় ও ফাজরের আযানের শুরুর মাঝে কত সময়ের ব্যবধান থাকত। তিনি বলেন ঃ আযান ও সাহরীর মধ্যে শুধুমাত্র এটুকুই ব্যবধান থাকত যে, পঞ্চাশটি আয়াত পড়ে নেয়া যায়।' (ফাতহুল বারী ৪/১৬৪, মুসলিম ২/৭৭১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যে পর্যন্ত আমার উম্মাত ইফতারে তাড়াতাড়ি এবং সাহরীতে বিলম্ব করবে সে পর্যন্ত তারা মঙ্গলের মধ্যে থাকবে। (আহমাদ ৫/১৪৭)

হাদীস দ্বারা এটাও সাব্যস্ত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম রেখেছেন বারাকাতময় খাদ্য। মুসনাদ আহমাদ ইত্যাদি হাদীসে রয়েছে, হুযাইফা (রাঃ) বলেন ঃ 'আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সাহরী খেয়েছি এমন সময়ে যে, যেন সূর্য উদিতই হয়ে যাবে।' কিন্তু এই হাদীসের বর্ণনাকারী একজনই এবং তিনি হচ্ছেন আসেম ইব্‌ন আবূ নাজুদ। এর ভাবার্থ হচ্ছে দিন নিকটবর্তী হওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অধিকাংশ সাহাবীর (রাঃ) বিলম্বে সাহরী খাওয়া এবং শেষ সময় পর্যন্ত খেতে থাকা সাব্যস্ত আছে। যেমন আবূ বাকর (রাঃ), উমার (রাঃ), আলী (রাঃ), ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ), হুযাইফা (রাঃ), আবূ হুরাইরাহ (রাঃ), ইব্‌ন উমার (রাঃ), ইব্‌ন আব্বাস

(রাঃ) ও যায়িদ ইব্ন সাবিত (রাঃ)। তাবেঈদেরও একটি বিরাট দল হতে সুবহি সাদিক হয়ে যাওয়ার একেবারে নিকটবর্তী সময়েই সাহরী খাওয়া বর্ণিত আছে। যেমন মুহাম্মাদ ইব্ন আলী ইব্ন হুসাইন (রহঃ), আবূ মিযলাজ (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), আবূয্যুহা (রহঃ) ও আবূ ওয়াইল (রহঃ) প্রমুখ ইব্ন মাসউদের (রাঃ) ছাত্রগণ, ‘আতা (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), হাকিম ইব্ন উয়াইনা (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), উরওয়া ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আবুশ্ শা'শা (রহঃ) যাবির ইব্ন মামার ইব্ন রাশিদ (রহঃ), আ'মাশ (রহঃ) এবং যাবির ইব্ন রুশদেরও (রহঃ) এটাই মাযহাব। আল্লাহ তা‘আলা এদের সবারই উপর শান্তি বর্ষণ করুন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বিলালের (রাঃ) আযান শুনে তোমরা সাহরী খাওয়া হতে বিরত হবেনা। কেননা তিনি রাত থাকতেই আযান দিয়ে থাকেন। তোমরা খেতে ও পান করতে থাক যে পর্যন্ত না আবদুল্লাহ ইব্ন উম্মে মাকতুম আযান দেন। ফাজর প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি আযান দেননা।’ (ফাতহুল বারী ৪/১৬২, মুসলিম ২/৭৬৮) মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

‘ওটা ফাজর নয় যা আকাশের দিগন্তে লম্বভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ফাজর হল লাল রং বিশিষ্ট এবং দিগন্তে প্রকাশমান। (আহমাদ ৪/২৩) তিরমিযীতেও এই বর্ণনাটি রয়েছে। তাতে রয়েছে ঃ

‘সেই প্রথম ফাজরকে দেখে নাও যা প্রকাশিত হয়ে উপরের দিকে উঠে যায়। সেই সময় পানাহার থেকে বিরত হয়োনা, বরং খেতে ও পান করতেই থাক, যে পর্যন্ত না দিগন্তে লালিমা প্রকাশ পায়। (তিরমিযী ৩/৩৮৯)

‘যুনুব’ অবস্থায় সিয়াম পালন করা যাবে

জিজ্ঞাস্য ঃ যেহেতু আল্লাহ তা‘আলা সিয়াম পালনকারীর জন্য স্ত্রী সহবাস ও পানাহারের শেষ সময় সুবহি সাদিক নির্ধারণ করেছেন, কাজেই এর দ্বারা এই মাসআলার উপর দলীল গ্রহণ করা যেতে পারে যে, সকালে যে ব্যক্তি অপবিত্র অবস্থায় উঠল, অতঃপর গোসল করে তার সিয়াম পূরা করল, তার উপর কোন দোষ নেই। চার ইমাম এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিজ্ঞজনদের এটাই মাযহাব। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আয়িশা (রাঃ) এবং উম্মে সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে সহবাস করে সকালে অপবিত্র অবস্থায় উঠতেন, অতঃপর গোসল করতেন এবং সিয়াম পালন করতেন। তাঁর এই অপবিত্রতা স্বপ্নদোষের কারণে হতনা। উম্মে সালামাহর (রাঃ) বর্ণনায় রয়েছে

যে, এর পরে তিনি সিয়াম ছেড়েও দিতেননা এবং কাযাও করতেননা। (ফাতহুল বারী ৪/১৮২, মুসলিম ২/৭৮১)

সহীহ মুসলিমে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একটি লোক বলে ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ফাজরের সালাতের সময় হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমি অপবিত্র থাকি, আমি সিয়াম পালন করতে পারি কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন ঃ 'এরূপ ঘটনা স্বয়ং আমারও ঘটে থাকে এবং আমি সিয়াম পালন করে থাকি।' লোকটি বলে ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা তো আপনার মত নই। আপনার তো পূর্বের ও পরের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।' তখন তিনি বলেন ঃ

'আল্লাহর শপথ! আমি তো আশা রাখি যে, তোমাদের সবার অপেক্ষা আল্লাহ তা'আলাকে বেশি ভয় আমিই করি এবং তোমাদের সবার অপেক্ষা আল্লাহভীরুতার কথা আমিই বেশি জানি।' (মুসলিম ২/৭৮১)

সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করতে হবে

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'রাত্রি সমাগম পর্যন্ত তোমরা সিয়াম পূর্ণ কর।' এর দ্বারা সাব্যস্ত হচ্ছে যে, সূর্য অস্তমিত হওয়া মাত্রই ইফতার করা উচিত। আমীরুল মু'মিনীন উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যখন এদিক দিয়ে রাত্রি আগমন করে এবং ওদিক দিয়ে দিন বিদায় নেয় তখন যেন সিয়াম পালনকারী ইফতার করে।' (ফাতহুল বারী ৪/২৩১, মুসলিম ২/৭৭২) সাহল ইব্ন সা'দ সাঈদী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে পর্যন্ত মানুষ ইফতারে তাড়াতাড়ি করবে সে পর্যন্ত মঙ্গল থাকবে।' (ফাতহুল বারী ৪/২৩৪, মুসলিম ২/৭৭১) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'আমার নিকট ঐ বান্দাগণ সবচেয়ে প্রিয় যারা ইফতারে তাড়াতাড়ি করে।' (আহমাদ ২/২৩৭, তিরমিযী ৩/৩৮৬) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এই হাদীসটিকে 'হাসান গরীব' বলেছেন।

একাধিক্রমে সিয়াম পালন করা যাবেনা

তাফসীর আহমাদে অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, বাশীর ইব্ন খাসাসিয়্যাহর (রাঃ) সহধর্মিনী লাইলা (রাঃ) বলেন ঃ 'আমি ইফতার ছাড়াই দু'টি সিয়ামকে মিলিত করতে ইচ্ছা করি। তখন আমার স্বামী আমাকে নিষেধ করেন এবং

বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওটা করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন ঃ এটা খৃষ্টানদের কাজ। তোমরা তো ঐভাবেই সিয়াম পালন করবে যেভাবে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, (তা হচ্ছে এই যে,) তোমরা রাতে ইফতার করে নাও। এক সিয়ামকে অন্য সিয়ামের সাথে মিলানো নিষিদ্ধ হওয়া সম্বন্ধে আরও বহু হাদীস রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'তোমরা সিয়ামকে সিয়ামের সাথে মিলিত করনা।' তখন জনগণ বলে ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! স্বয়ং আপনি তো মিলিয়ে থাকেন।' তিনি বললেন ঃ 'আমি তোমাদের মত নই। আমি রাত্রি অতিবাহিত করি, আমার প্রভু আমাকে আহার করিয়ে ও পানি পান করিয়ে থাকেন।' কিন্তু কিছু লোক তবুও ঐ কাজ হতে বিরত হয়না। তখন তিনি তাদের সাথে দু'দিন ও দু'রাতের সিয়াম বরাবর রাখতে থাকেন। অতঃপর চাঁদ দেখা দেয়ায় তিনি বলেন ঃ 'যদি চাঁদ উদিত না হত তাহলে আমি এভাবেই সিয়ামকে মিলিয়ে যেতাম।' (আহমাদ ২/২৮১, ফাতহুল বারী ৪/২৩৮, মুসলিম ২/৭৭৪) ইফতার করা ছাড়াই এবং রাতে কিছু না খেয়েই অন্য সিয়ামের সাথে মিলিয়ে নেয়ার নিষিদ্ধতার ব্যাপারে সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আনাস (রাঃ), ইব্ন উমার (রাঃ) এবং আয়িশা (রাঃ) হতেও মারফু' হাদীসসমূহ বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং সাব্যস্ত হল যে, এটা উম্মাতের জন্য নিষিদ্ধ; কিন্তু তিনি স্বয়ং তাদের হতে বিশিষ্ট ছিলেন। তাঁর এর উপরে ক্ষমতা ছিল এবং এর উপরে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁকে সাহায্য করা হত। এটাও মনে রাখা উচিত যে, তিনি (নাবী সঃ) যে বলেছেন, 'আমার প্রভু আমাকে পানাহার করিয়ে থাকেন' এর ভাবার্থ প্রকৃত খাওয়ানো ও পান করানো নয়। কেননা এরূপ হলে তো এক সিয়ামের সাথে অন্য সিয়ামকে মিলানো হচ্ছেনা। কাজেই এটা শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক সাহায্য।

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিতে রয়েছে ঃ 'মিলিত করনা, যদি একান্তভাবে করতেই চাও তাহলে সাহরী পর্যন্ত কর।' জনগণ বলে ঃ 'আপনি তো মিলিয়ে থাকেন।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'আমি তোমাদের মত নই। আমাকে তো রাতেই আহারদাতা আহার করিয়ে থাকেন এবং পান করিয়ে থাকেন।' (ফাতহুল বারী ৪/৩৩৮)

আবুল আলিয়া (রহঃ) বলেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা দিনের সিয়াম ফার্য করে দিয়েছেন। এখন বাকি রইল রাত; তবে যে চায় খাবে এবং যার ইচ্ছা না হয় সে খাবেনা।'

ই'তিকাফ

ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) উক্তি এই যে, যে ব্যক্তি মাসজিদে ই'তিকাফে বসেছে, তা রামাযান মাসেই হোক অথবা অন্য কোন মাসেই হোক, ই'তিকাফ পূরা না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য দিন ও রাতে স্ত্রী সহবাস হারাম। (তাবারী ৩/৫৪০) যাহ্হাক (রহঃ) বলেন যে, পূর্বে মানুষ ই'তিকাফ অবস্থায়ও স্ত্রী সহবাস করত। ফলে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং মাসজিদে ই'তিকাফের জন্য অবস্থানের সময় এটা হারাম করে দেয়া হয়। মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) এ কথাই বলেন। সুতরাং আলেমগণের সর্বসম্মত ফাতওয়া এই যে, যদি ই'তিকাফকারী খুবই প্রয়োজন বশতঃ বাড়ী যায়, যেমন প্রস্রাব-পায়খানার জন্য বা খাদ্য খাবার জন্য, তাহলে ঐ কাজ শেষ করার পরেই তাকে মাসজিদে চলে আসতে হবে। সেখানে অবস্থান জায়িয নয়। স্ত্রীকে চুম্বন-আলিঙ্গন ইত্যাদিও বৈধ নয়। ই'তিকাফ ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন কাজে লিপ্ত হওয়াও জায়িয নয়। তবে হাঁটতে হাঁটতে যদি কিছু জিজ্ঞেস করে নেয় সেটা অন্য কথা। ই'তিকাফের আরও অনেক আহকাম রয়েছে। কতকগুলি আহকামের মধ্যে মতভেদও রয়েছে। এগুলি আমি আমার (লেখক ইব্ন কাসীরের) পৃথক পুস্তক *কিতাবুস সিয়াম* এর শেষে বর্ণনা করেছি। এ জন্য অধিকাংশ গ্রন্থকারও নিজ নিজ পুস্তকে সিয়ামের পর পরই ই'তিকাফের নির্দেশাবলীর বর্ণনা দিয়েছেন। এতে এ কথার দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, ই'তিকাফ সিয়াম অবস্থায় করা কিংবা রামাযানের শেষ ভাগে করা উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রামাযান মাসের শেষ দশ দিন ই'তিকাফ করতেন, যে পর্যন্ত না তিনি এই নশ্বর জগৎ হতে বিদায় গ্রহণ করেন। আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণনা পাওয়া যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরলোক গমনের পর তাঁর সহধর্মিণীগণ উম্মাহাতুল মু'মিনীন (রাঃ) ই'তিকাফ করতেন।' (ফাতহুল বারী ৪/৩১৮, মুসলিম ২/৮৩১)

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে যে, সুফিয়া বিন্তে হুয়াই (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ই'তিকাফের অবস্থায় তাঁর খিদমাতে উপস্থিত হতেন এবং কোন প্রয়োজনীয় কথা জিজ্ঞেস করার থাকলে তা জিজ্ঞেস করে চলে যেতেন। একদা রাতে যখন তিনি চলে যাচ্ছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বাড়ীতে পৌঁছে দেয়ার জন্য তাঁর সাথে সাথে যান। কেননা তাঁর বাড়ী মাসজিদে নাববী হতে দূরে অবস্থিত ছিল। পথে দু'জন আনসারী সাহাবীর (রাঃ) সাথে সাক্ষাৎ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামের সাথে তাঁর স্ত্রীকে দেখে তাঁরা লজ্জিত হন এবং দ্রুত পদক্ষেপে চলতে থাকেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

'তোমরা থাম এবং জেনে রেখ যে, ইনি আমার স্ত্রী সুফিয়া বিন্‌ত হুয়াই (রাঃ)।' তখন তারা বলেন ঃ 'সুবহানাল্লাহ (অর্থাৎ আমরা কি অন্য কোন ধারণা করতে পারি)!' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ঃ

'শাইতান মানুষের শিরায় শিরায় রক্তের ন্যায় চলাচল করে থাকে। আমার ধারণা হল যে, সে তোমাদের অন্তরে কোন কু-ধারণা সৃষ্টি করে দেয় কি না!' (ফাতহুল বারী ৪/৩২৬, মুসলিম ৪/১৭১২) ইমাম শাফিঈ (রহঃ) বলেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এই নিজস্ব ঘটনা হতে তাঁর উম্মাতবর্গকে শিক্ষা গ্রহণের ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, তারা যেন অপবাদের স্থান থেকে দূরে থাকে। নতুবা এটা অসম্ভব কথা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহান সাহাবীবর্গ তাঁর সম্বন্ধে কোন কু-ধারণা অন্তরে পোষণ করতে পারেন এবং এটাও অসম্ভব যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সম্বন্ধে এরূপ ধারণা রাখতে পারেন।

উল্লিখিত আয়াতে مُبَاشِرَتَ এর ভাবার্থ হচ্ছে স্ত্রীর সাথে মিলন এবং তার কারণসমূহ। যেমন চুম্বন, আলিঙ্গন ইত্যাদি। নচেৎ কোন জিনিস লেন-দেন ইত্যাদি সব কিছুই জায়িয। আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ই'তিকাফের অবস্থায় আমার দিকে মাথা নুইয়ে দিতেন এবং আমি তাঁর মাথার চুল আঁচড়ে দিতাম। অথচ আমি মাসিক বা ঋতুর অবস্থায় থাকতাম। তিনি মানবীয় প্রয়োজন পূরা করার উদ্দেশ্য ছাড়া বাড়ীতে আসতেননা।' (ফাতহুল বারী ৪/৩২০, মুসলিম ১/২৪৪) আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ 'ই'তিকাফ অবস্থায় আমি তো চলতে চলতেই বাড়ীর রুগীকে পরিদর্শন করে থাকি।' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'এই হচ্ছে আমার বর্ণনাকৃত কথা, ফার্‌যকৃত নির্দেশাবলী এবং নির্ধারিত সীমা। যেমন সিয়ামের নির্দেশাবলী ও তার জিজ্ঞাস্য বিষয়সমূহ, তার মধ্যে যা কিছু বৈধ এবং যা কিছু অবৈধ ইত্যাদি। মোট কথা, এই সব হচ্ছে আমার সীমারেখা। সাবধান! তোমরা তার নিকটেও যাবেনা এবং তা অতিক্রম করবেনা। কেহ কেহ বলেন যে, এই সীমা হচ্ছে ই'তিকাফ অবস্থায় স্ত্রী-মিলন হতে দূরে থাকা। আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) বলেন ঃ এই আয়াতগুলির মধ্যে চারটি নির্দেশকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে (অতঃপর তিনি পাঠ করেন) ঃ

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ

রমাযানের রাতে আপন স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা করা তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে।

ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ

অতঃপর রাত সমাগম পর্যন্ত তোমরা সিয়াম পূর্ণ কর।

كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَـٰتِهِۦ لِلنَّاسِ

এভাবে আল্লাহ মানবমন্ডলীর জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ বিবৃত করেন।

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

যেন তারা সংযত হয়।

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘যেভাবে আমি সিয়াম ও তার নির্দেশাবলী, তার জিজ্ঞাস্য বিষয়সমূহ এবং তার ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছি, অনুরূপভাবে অন্যান্য নির্দেশাবলীও আমি আমার বান্দা ও রাসূলের মাধ্যমে সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য বর্ণনা করেছি যেন তারা জানতে পারে যে, হিদায়াত কি এবং আনুগত্য কাকে বলে এবং এর ফলে যেন তারা আল্লাহভীরু হতে পারে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

هُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِۦٓ ءَايَـٰتٍۭ بَيِّنَـٰتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

তিনিই তাঁর বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেন, তোমাদেরকে অন্ধকার হতে আলোকে নিয়ে আসার জন্য; আল্লাহতো তোমাদের প্রতি করুণাময়, পরম দয়ালু। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ৯)

১৮৮। এবং তোমরা নিজেদের মধ্যে পরস্পরের ধন সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করনা এবং তা বিচারকের নিকট টোপ হিসাবে উপস্থাপন করনা যাতে	١٨٨. وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ

তোমরা জ্ঞাতসারে লোকের সম্পদের অংশ অন্যায়ভাবে উদরস্থ করতে পার।	بِٱلۡإِثۡمِ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ

ঘুষ নেয়া নিষেধ এবং ইহা জঘন্য অপরাধ (পাপ)

আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) থেকে বর্ণিত, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে যার নিকট অপরের ধন-সম্পদ রয়েছে এবং ঐ হকদার ব্যক্তির নিকট কোন প্রমাণ নেই। তখন ঐ লোকটি অস্বীকার করে বিচারকের নিকট গিয়ে নিজেকে নির্দোষ রূপে সাব্যস্ত করছে, অথচ সে জানে যে, ঐ দাবীদারের মাল তার নিকট রয়েছে। সুতরাং সে হারাম খাচ্ছে এবং নিজেকে পাপীদের অন্তর্ভুক্ত করেছে। (তাবারী ৩/৫৫০) মুজাহিদ (রহঃ) সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ), এবং আবদুর রাহমান ইব্‌ন জায়েদ ইব্‌ন আসলামও (রহঃ) এই কথাই বলেন যে, ঐ ব্যক্তি যে অত্যাচারী এটা সে নিজে জানা সত্ত্বেও তার মোটেই বিবাদ করা উচিত নয়। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/৩৯৩, ৩৯৪, তাবারী ৩/৫৫০/ ৫৫১)

কোন বিচারকের বিচারের ফলে নিষিদ্ধ বিষয় জায়িয হয়না

উম্মে সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমি একজন মানুষ। লোকেরা আমার নিকট বিবাদ নিয়ে উপস্থিত হয়। সম্ভবতঃ একজন অপরজন অপেক্ষা বেশি যুক্তিবাদী। তার যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে আমি হয়ত তারই স্বপক্ষে ফাইসালা করে থাকি (অথচ ফাইসালা প্রকৃত ঘটনার বিপরীত)। তবে জেনে রেখ, যে ব্যক্তির পক্ষে এরূপ ফাইসালা করার ফলে কোন মুসলিমের হক আমি তাকে দিয়ে দেই, ওটা হচ্ছে আগুনের টুকরা। সুতরাং সে যেন ওটা না নেয়।' (ফাতহুল বারী ১৩/১৯০, মুসলিম ৩/১৩৭৩) আমি বলি যে, এই আয়াত এবং এই হাদীস এই বিষয়ের উপর দলীল যে, বিচারকের বিচার কোন মামলার মূল শারীয়াতকে পরিবর্তন করেনা। প্রকৃত পক্ষে যা হারাম তা কাযীর ফাইসালায় হালাল হয়ে যায়না এবং যা হালাল তাও হারাম হয়না।

কাযী বা বিচারকের ফাইসালা শুধুমাত্র বাহ্যিকের উপর হয়ে থাকে, অভ্যন্তরে তা পূর্ণ হয়না। বিচারকের ফাইসালা যদি প্রকৃত ব্যাপারের সাথে মিলে যায় তাহলে তো ভালই। সাক্ষীর কারণে বিচার ভিন্নতর হলে বিচারক তো প্রতিদান পেয়ে যাবেন, কিন্তু ঐ মীমাংসার উপর ভিত্তি করে হককে না হক এবং না হককে হকে

পরিণতকারী সাক্ষ্যদানকারী আল্লাহ তা'আলার নিকট অপরাধী বলে বিবেচিত হবে এবং তার উপর ঐ শাস্তি আপতিত হবে। বলা হয়েছে ঃ

وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ *তোমরা নিজেদের দাবীর অসারতা জেনে শুনে জনগণের মাল ভক্ষণের উদ্দেশে মিথ্যা মোকদ্দমা সাজিয়ে এবং মিথ্যা সাক্ষী ঠিক করে অবৈধ পন্থার মাধ্যমে বিচারককে ভুল বুঝিয়ে নিজেদের দাবীকে সাব্যস্ত করনা।'*

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ 'হে জনমণ্ডলী! জেনে রেখ, বিচারকের মীমাংসা তোমার জন্য হারামকে হালাল এবং অন্যায়কে ন্যায় করতে পারেনা। কাযী তো নিজের বিবেকের মাধ্যমে সাক্ষীদের সাক্ষ্য অনুসারে বাহ্যিক অবস্থা দেখে বিচারের রায় দিয়ে থাকেন। তা ছাড়া তিনি তো মানুষ, সুতরাং তার দ্বারা ভুল হওয়াও সম্ভব এবং তার ভুল থেকে বেঁচে থাকাও সম্ভব। তাহলে জেনে নাও যে, বিচারকের ফাইসালা যদি সত্য ঘটনার উল্টা হয় তাহলে শুধুমাত্র বিচারকের মীমাংসা বলেই ওকে বৈধ মাল মনে করনা। এই বিবাদ থেকেই গেল। কিয়ামাতের দিন মহান আল্লাহ দু'জনকেই একত্রিত করবেন এবং অন্যায়কারীদের উপর হকদারদেরকে বিজয়ী করে তাদের হক অন্যায়কারীদের নিকট হতে আদায় করিয়ে দিবেন এবং দুনিয়ায় যে মীমাংসা করা হয়েছিল তার বিপরীত মীমাংসা করে তার সাওয়াবসমূহ হতে হকদারকে ওর বিনিময় দিয়ে দিবেন। (তাবারী ৩/৫৫০)

১৮৯। তারা তোমাকে নতুন চাঁদসমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে। তুমি বল ঃ এগুলি হচ্ছে সমগ্র মানব জাতির জন্য সময়সমূহ (মাসসমূহ) নির্ধারণ (গণনা বা হিসাব) করার মাধ্যম এবং হাজ্জের জন্য; আর (ঐ হাজ্জের চাঁদে) তোমরা যে পশ্চাৎ দিক দিয়ে গৃহে প্রবেশ কর এটি পুণ্যের কাজ নয়, বরং পুণ্যের কাজ হল যে ব্যক্তি	١٨٩. يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ

সংযমশীলতা অবলম্বন করল। এবং তোমরা গৃহসমূহে ওগুলির দরজা দিয়ে প্রবেশ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সুফল প্রাপ্ত হও।	ٱتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَٰبِهَا ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

প্রথম চাঁদ বা আল হেলাল

আল আউফী (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ লোকেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নতুন চাঁদ (হেলাল) সম্পর্কে জানতে চায়। তখন আল্লাহ তা'আলা يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ এ আয়াত নাযিল করেন এবং এতে বলা হয় যে, এর দ্বারা ইবাদাতের সময়কাল, মহিলাদের ইদ্দাতের এবং হাজ্জের সময় জানা যায়। (তাবারী ৩/৫৫৪) মুসলিমদের সিয়াম-ইফতারের সম্পর্কও এর সঙ্গে। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'আল্লাহ তা'আলা মানুষের সময় নিরূপণের জন্য চাঁদ তৈরী করেছেন। ওটা দেখে সিয়াম পালন কর, ওটা দেখে ঈদ পর্ব উদযাপন কর। যদি মেঘের কারণে চাঁদ দেখতে না পাও তাহলে পূর্ণ ত্রিশ দিন গণনা করে নাও।' (মুসনাদ আবদুর রাযযাক ৪/১৫৬) এই বর্ণনাটিকে ইমাম হাকিম (রহঃ) সঠিক বলেছেন। এই হাদীসটি অন্য সনদেও বর্ণিত হয়েছে। (হাকিম ১/৪২৩)

তাকওয়া সঠিক আমল করতে সাহায্য করে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْا الْبُيُوتَ من ظُهُورِهَا وَلَـــكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا *তোমরা যে পশ্চাৎ দিক দিয়ে গৃহে প্রবেশ কর এটি সাওয়াবের কাজ নয়, বরং সাওয়াবের কাজ হল যে ব্যক্তি সংযমশীলতা অবলম্বন করল। এবং তোমরা গৃহসমূহে ওগুলির দরজা দিয়ে প্রবেশ কর।* সহীহ বুখারীতে রয়েছে ঃ 'অজ্ঞতার যুগে প্রথা ছিল যে, মানুষ ইহরাম অবস্থায় থাকলে বাড়ীতে পিছন দিক দিয়ে প্রবেশ করত। ফলে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী ৮/৩১০)

আবূ দাঊদ তায়ালেসীর (রহঃ) হাদীস গ্রন্থেও এই বর্ণনাটি রয়েছে। মাদীনার আনসারগণের সাধারণ প্রথা এই ছিল যে, সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় তারা বাড়ীতে দরজা দিয়ে প্রবেশ করতনা। (হাদীস নং ৯৮) প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞতার যুগের কুরাইশরা নিজেদের জন্য এটাও একটা স্বাতন্ত্র্য স্থাপন করেছিল যে, তারা নিজেদের নাম 'হুমুস' রেখেছিল। ইহ্রাম অবস্থায় এরা সোজা পথে গৃহে প্রবেশ করতে পারত; কিন্তু বাকি লোকেরা এভাবে পারতনা। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ 'অজ্ঞতা যুগে বহু সম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রথা চালু ছিল যে, যখন তারা সফরের উদ্দেশে বের হত তখন যদি কোন কারণবশতঃ সফরকে অর্ধ সমাপ্ত অবস্থায় ছেড়ে ফিরে আসত তাহলে তারা দরজা দিয়ে গৃহে প্রবেশ করতনা, বরং পিছন দিক দিয়ে আসত। এই আয়াত দ্বারা তাদেরকে ঐ কুপ্রথা থেকে বিরত রাখা হয়েছে। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৪০১)

অতঃপর বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালন করা, তাঁর নিষিদ্ধ কার্যাবলী হতে বিরত থাকা, অন্তরে তাঁর ভয় রাখা, এগুলি প্রকৃতপক্ষে ঐ দিন কাজে আসবে যেদিন প্রত্যেকে আল্লাহ তা'আলার সামনে উপস্থিত হবে এবং তাদেরকে পূর্ণভাবে প্রতিদান ও শাস্তি দেয়া হবে।

১৯০। এবং যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তোমরাও তাদের সাথে আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর এবং সীমা অতিক্রম করনা; নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদেরকে ভালবাসেননা।	١٩٠. وَقَـٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَـٰتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓاْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ
১৯১। তাদেরকে যেখানেই পাও, হত্যা কর এবং তারা তোমাদেরকে যেখান হতে বহিস্কার করেছে তোমরাও তাদেরকে সেখান হতে বহিস্কার কর এবং হত্যা	١٩١. وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۚ وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ

অপেক্ষা অশান্তি (ফিতনা) গুরুতর এবং তোমরা তাদের সাথে পবিত্রতম মাসজিদের নিকট যুদ্ধ করনা, যে পর্যন্ত না তারা তোমাদের সাথে তন্মধ্যে যুদ্ধ করে; কিন্তু যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তাহলে তোমরাও তাদেরকে হত্যা কর; অবিশ্বাসীদের জন্য এটাই প্রতিফল।	مِنَ ٱلْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَـٰتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَـٰتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِن قَـٰتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَـٰفِرِينَ
১৯২। অতঃপর যদি নিবৃত্ত হয় তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।	١٩٢. فَإِنِ ٱنتَهَوْا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
১৯৩। অশান্তি দূর হয়ে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর; অতঃপর যদি তারা নিবৃত্ত হয় তাহলে অত্যাচারীদের উপর ব্যতীত শত্রুতা নেই।	١٩٣. وَقَـٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ ٱنتَهَوْا۟ فَلَا عُدْوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّـٰلِمِينَ

যারা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে এবং যেখানে পাওয়া যাবে সেখানেই তাদেরকে হত্যা করতে আদেশ করা হয়েছে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ *এবং যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তোমরাও তাদের সাথে আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর।* আবুল আলিয়া (রহঃ) বলেন যে, মাদীনায় জিহাদের হুকুম এটাই প্রথম

অবতীর্ণ হয়। এই আয়াতের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধুমাত্র ঐ লোকদের সাথে যুদ্ধ করতেন যারা তাঁর সাথে যুদ্ধ করত। যারা তাঁর সাথে যুদ্ধ করতনা তিনিও তাদের সাথে যুদ্ধ করতেননা। অবশেষে সূরা বারাআত অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ৩/৫৬১) আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) এ কথা পর্যন্ত বলেন যে, এই আয়াতটি রহিত। এটিকে রহিত করার আয়াত হচ্ছে নিম্নের আয়াতটি ঃ

فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ

অতঃপর যেখানে পাবে তাদেরকে হত্যা কর। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৫) কিন্তু এটি বিবেচ্য বিষয়। কেননা এটিতো শুধু মুসলিমদেরকে উৎসাহিত করা এবং তাদেরকে উত্তেজিত করা যে, তারা তাদের শত্রুদের সাথে জিহাদ করছে না কেন যারা তাদের ও তাদের ধর্মের প্রকাশ্য শত্রু? ঐ মুশরিকরা যেমন মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করছে তেমনি মুসলিমদেরও উচিত তাদের সাথে যুদ্ধ করা। যেমন অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَقَـٰتِلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَـٰتِلُونَكُمْ كَآفَّةً

আর মুশরিকদের বিরুদ্ধে সকলে একযোগে যুদ্ধ কর, যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সকলে একযোগে যুদ্ধ করে। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৩৬) এখানেও বলা হয়েছে ঃ 'তাদেরকে যেখানেই পাবে হত্যা কর এবং তাদেরকে সেখান হতে বের করে দাও যেখান হতে তারা তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে।' ভাবার্থ এই যে, হে মুসলিমগণ! তাদের উদ্দেশ্য যেমন তোমাদেরকে হত্যা করা ও নির্বাসন দেয়া তেমনি এর প্রতিশোধ হিসাবে তোমাদেরও এরূপ উদ্দেশ্য থাকা উচিত।

যুদ্ধে নিহতদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ না কাটা এবং যুদ্ধলব্ধ মালামাল থেকে চুরি না করার নির্দেশ

বলা হচ্ছে যে, সীমা অতিক্রমকারীদেরকে আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেননা। অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধাচরণ করনা। নাক, কান ইত্যাদি কেটো না, বিশ্বাসঘাতকতা ও চুরি করনা এবং শিশুদেরকে হত্যা করনা। ঐ বয়ঃবৃদ্ধদেরকেও হত্যা করনা যাদের যুদ্ধ করার যোগ্যতা নেই এবং যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনা। সংসার ত্যাগীদেরকেও হত্যা করনা। বিনা কারণে তাদের বৃক্ষাদি কেটে ফেলনা এবং তাদের জীব-জন্তুগুলো ধ্বংস করনা। ইব্‌ন

আব্বাস (রাঃ), উমার ইব্ন আবদুল আযীয (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) প্রমুখ মনীষীগণ এই আয়াতের তাফসীরে এ কথাই বলেছেন। সহীহ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিম সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন ঃ

'আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবে, বিশ্বাসঘাতকতা করবেনা, চুক্তি ভঙ্গ হতে বিরত থাকবে, নাক কান ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে নিবেনা, শিশুদেরকে ও সংসার বিরাগীদেরকে হত্যা করবেনা, আর যারা উপাসনা গৃহে পড়ে থাকে।' (মুসলিম ৩/১৩৫৭) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, একবার এক যুদ্ধে এক মহিলাকে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা অত্যন্ত খারাপ মনে করেন এবং মহিলা ও শিশুদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেন। (ফাতহুল বারী ৬/১৭২, মুসলিম ৩/১৩৬৪)

ফিতনা হত্যা অপেক্ষাও জঘন্য

আল্লাহ তা'আলা অত্যাচার ও সীমা অতিক্রমকে ভালবাসেননা এবং এই প্রকার লোকের প্রতি তিনি অসন্তুষ্ট হন। যেহেতু জিহাদের নির্দেশাবলীর মধ্যে বাহ্যত হত্যা ও রক্তারক্তি রয়েছে, এ জন্যই তিনি বলেন যে, এদিকে যদি খুনাখুনি ও কাটাকাটি হতে থাকে তাহলে ঐ দিকে রয়েছে শির্ক ও কুফর এবং সেই মালিকের পথ থেকে তাঁর সৃষ্টজীবকে বিরত রাখা এবং এটা হচ্ছে সরাসরি অশান্তি সৃষ্টি করা।

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ *হত্যা অপেক্ষা অশান্তি (ফিতনা) সৃষ্টি করা আরও গুরুতর।* এর অর্থ হল সাধারণ অবস্থায় যে সমস্ত পাপ কাজ করে কিংবা বাড়াবাড়ি করে তা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর খারাপ কাজ। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৪১২) আবুল আলীয়া (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ) এবং রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) বলেন যে, আলোচিত আয়াতে ফিতনা বলতে শির্ককে বুঝানো হয়েছে যা হত্যা অপেক্ষা আরও বেশি গুরুতর অপরাধ।

আত্মরক্ষার উদ্দেশ্য ছাড়া 'হারাম এলাকায়' যুদ্ধ করা নিষেধ

অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ 'আল্লাহ তা'আলার ঘরের মধ্যে তাদের সাথে যুদ্ধ করনা।' যেমন সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'এটি মর্যাদা সম্পন্ন শহর। আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে কিয়ামাত পর্যন্ত এটি সম্মানিত শহর হিসাবেই গণ্য হয়ে থাকবে। শুধু সামান্য সময়ের জন্য ওটিকে আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য হালাল করেছিলেন। কিন্তু এটি আজ এ সময়েও মহাসম্মানিতই রয়েছে। আর কিয়ামাত পর্যন্ত এর এই সম্মান অবশিষ্ট থাকবে। এর বৃক্ষরাজি কাটা হবেনা, এর কাঁটাসমূহ উপড়িয়ে ফেলা হবেনা। যদি কোন ব্যক্তি এর মধ্যে যুদ্ধকে বৈধ বলে এবং আমার যুদ্ধকে প্রমাণ রূপে গ্রহণ করে তাহলে তাকে বলে দিবে যে, আল্লাহ তা'আলা শুধুমাত্র তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন, কিন্তু তোমাদের জন্য কোন অনুমতি নেই।' (ফাতহুল বারী ৬/৩২৭, মুসলিম ২/৯৮৬-৯৮৭) তাঁর এই নির্দেশের ভাবার্থ হচ্ছে মাক্কা বিজয়ের দিন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেছিলেন ঃ যে ব্যক্তি তার দরজা বন্ধ করে দিবে সে নিরাপদ, যে মাসজিদে চলে যাবে সেও নিরাপদ, যে আবূ সুফিয়ানের গৃহে চলে যাবে সেও নিরাপদ। (আহমাদ ২/২৯২) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

তারা যদি এখানে (বাইতুল্লাহয়) তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তাহলে তোমাদেরকেও অনুমতি দেয়া হচ্ছে যে, তোমরাও তাদের সাথে যুদ্ধ কর, যাতে এ অত্যাচার দূর হয়। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদাইবিয়ায় স্বীয় সাহাবীগণের (রাঃ) নিকট যুদ্ধের বায়'আত গ্রহণ করেন, যখন কুরাইশরা এবং তাদের সঙ্গীরা সম্মিলিতভাবে মুসলিমদের উপর আক্রমণের ষড়যন্ত্র করেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি বৃক্ষের নীচে সাহাবীগণের (রাঃ) নিকট বাইয়াত নিয়েছিলেন। অতঃপর মহান আল্লাহ এই যুদ্ধ প্রতিহত করেন। এই নি'আমাতের বর্ণনা আল্লাহ তা'আলা নিম্নের এই আয়াতে দিয়েছেন ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنۢ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ

তিনি মাক্কা উপত্যকায় তাদের হাত তোমাদের হতে এবং তোমাদের হাত তাদের হতে নিবারিত করেছেন তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর। (সূরা ফাত্হ, ৪৮ ঃ ২৪) এবং বলা হয়েছে ঃ

وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنَٰتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَـُٔوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ لِّيُدْخِلَ ٱللَّهُ فِى رَحْمَتِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوا۟ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

তোমাদের যুদ্ধের আদেশ দেয়া হত, যদি না থাকত এমন কতকগুলি মু'মিন নর-নারী যাদেরকে তোমরা জাননা, তাদেরকে তোমরা পদদলিত করতে অজ্ঞাতসারে। ফলে তাদের কারণে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে। যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়নি এ জন্য যে, তিনি যাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহ দান করবেন, যদি তারা পৃথক হত, আমি তাদের মধ্যস্থিত কাফিরদেরকে মর্মন্তদ শাস্তি দিতাম। (সূরা ফাত্হ, ৪৮ ঃ ২৫) অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ

فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ যদি এই কাফিরেরা বাইতুল্লাহয় যুদ্ধ করা হতে বিরত থাকে এবং ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয় তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের পাপ ক্ষমা করে দিবেন। যদিও তারা মুসলিমদেরকে 'হারাম' এলাকায় হত্যা করেছে তবুও আল্লাহ তা'আলা এত বড় পাপকেও ক্ষমা করে দিবেন, যেহেতু তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

ফিতনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে

এর পরে নির্দেশ হচ্ছে, ঐ মুশরিকদের সাথে জিহাদ চালু রাখতে যাতে শির্কের অশান্তি দূর হয় এবং আল্লাহ তা'আলার দীন জয়যুক্ত হয়ে উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন হয় এবং সমস্ত ধর্মের উপর কর্তৃত্ব লাভ করে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), আবুল আলীয়া (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এ মত পোষণ করতেন যে, 'ফিতনাহ দূর না হওয়া পর্যন্ত তোমরা যুদ্ধ কর' এর অর্থ হল শির্ক। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৪১৫-৪১৬)

আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ এক ব্যক্তি বীরত্ব দেখানোর জন্য যুদ্ধ করে, এক ব্যক্তি গোত্রীয় মর্যাদা রক্ষার জন্য ও জিদের বশবর্তী হয়ে যুদ্ধ করে এবং এক ব্যক্তি শুধু মানুষকে দেখানোর জন্য জিহাদ করে, এদের মধ্যে আল্লাহর পথে জিহাদকারী কে? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

'আল্লাহ তা'আলার পথে জিহাদকারী শুধু ঐ ব্যক্তি যে, এ জন্যই যুদ্ধ করে যেন আল্লাহর কথা সুউচ্চ হয়।' (ফাতহুল বারী ১৩/৪৫০, মুসলিম ৩/১৫১৩) অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, আমি যেন মানুষের সাথে যুদ্ধ করতে থাকি যে পর্যন্ত না তারা *'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'* বলে। (ফাতহুল বারী ১/৫৯২, মুসলিম ১/৫৩) যখন তারা এটি বলবে তখন তারা ইসলামের হক ছাড়া তাদের রক্ত ও সম্পদ আমা হতে বাঁচিয়ে নিবে এবং তাদের (ভিতরের) হিসাব আল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে।' এর পরে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'যদি এই কাফিরেরা শির্ক ও কুফর হতে এবং তোমাদেরকে হত্যা করা হতে বিরত থাকে তাহলে তোমরা তাদের থেকে বিরত থাক। এরপর যে যুদ্ধ করবে সে অত্যাচারী হবে এবং অত্যাচারীদেরকে অত্যাচারের প্রতিদান দেয়া অবশ্য কর্তব্য। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, 'যে যুদ্ধ করে শুধু তার সাথেই যুদ্ধ করতে হবে' এই উক্তির ভাবার্থ এটাই। কিংবা ভাবার্থ এও হতে পারে যে, যদি তারা এসব কাজ হতে বিরত থাকে তাহলে তো তারা যুল্ম ও শির্ক থেকে বিরত থাকল। সুতরাং তাদের সাথে যুদ্ধ করার আর কোন কারণ নেই। এখানে عُدْوَانَ শব্দটি শক্তি প্রয়োগের অর্থে এসেছে। তবে এটা শক্তি প্রয়োগের প্রতিদ্বন্দ্বীতায় শক্তি প্রয়োগ। প্রকৃতপক্ষে এটা শক্তি প্রয়োগ নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

অতঃপর যে কেহ তোমাদের প্রতি অত্যাচার করে, তাহলে সে তোমাদের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করবে তোমরাও তার প্রতি সেরূপ অত্যাচার কর। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৯৪) অন্য জায়গায় আছে ঃ

وَجَزَٰٓؤُا۟ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا

মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ দ্বারা। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৪০) অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا۟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ

যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর তাহলে ঠিক ততখানি করবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১২৬) সুতরাং এই তিন জায়গায় বাড়াবাড়ি, অন্যায় এবং শাস্তির কথা বিনিময় হিসাবে বলা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে ওটা বাড়াবাড়ি, অন্যায় এবং শাস্তি নয়। ইকরিমাহ (রহঃ) এবং

কাতাদাহর (রহঃ) উক্তি এই যে, প্রকৃত অত্যাচারী ঐ ব্যক্তি যে *‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’* কালেমাকে অস্বীকার করে। (তাবারী ৩/৫৭৩) যখন আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইরের (রাঃ) উপর জনগণ আক্রমণ চালিয়েছিল সেই সময় দুই ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমারের (রাঃ) নিকট আগমন করে বলেন ঃ ‘মানুষতো কাটাকাটি মারামারি করতে রয়েছে। আপনি উমারের (রাঃ) পুত্র এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী। আপনি এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছেন না কেন?’ তিনি বলেন ঃ ‘জেনে রেখ যে, আল্লাহ তা‘আলা মুসলিম ভাইয়ের রক্ত হারাম করে দিয়েছেন।’ তারা বলেন ঃ ‘এই নির্দেশ কি আল্লাহ তা‘আলার নয় যে, তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাক যে পর্যন্ত অশান্তি অবশিষ্ট থাকে?’ তিনি উত্তরে বলেন ঃ ‘আমরা তো যুদ্ধ করতে থেকেছি, শেষ পর্যন্ত অশান্তি দূর হয়ে গেছে এবং আল্লাহ তা‘আলার পছন্দনীয় ধর্ম জয়যুক্ত হয়েছে। এখন তোমরা চাচ্ছ যে, তোমরা যুদ্ধ করতে থাকবে যেন আবার অশান্তি সৃষ্টি হয় এবং অন্যান্য ধর্মগুলি প্রকাশিত হয়ে পড়ে।’

অন্য একটি বর্ণনায় উসমান ইব্‌ন সালিহ (রহঃ) আরও অতিরিক্ত যোগ করে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি ইব্‌ন উমারের (রাঃ) কাছে এসে জিজ্ঞেস করেন ঃ হে আবূ আবদুর রাহমান! কি কারণে আপনি এক বছর হাজ্জ করছেন এবং অন্য বছর উমরাহ করছেন এবং কোন্ কারণে আপনি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকছেন, অথচ এসব বিষয় পালন করার জন্য আল্লাহ যে তাঁর বান্দাদেরকে উৎসাহিত করেছেন সেই বিষয়ে নিশ্চয়ই আপনি জ্ঞাত আছেন? উত্তরে তিনি বললেন ঃ হে আমার ভ্রাতুস্পুত্র! ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত (১) আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনা (২) প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা (৩) যাকাত প্রদান করা (৪) রামাযানে সিয়াম পালন করা এবং (৫) আল্লাহর ঘরে গিয়ে হাজ্জ পালন করা। তখন লোকটি বলল ঃ আপনি কি আল্লাহ তা‘আলার এ আদেশ শুনেননি ঃ

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ بَغَتْ
إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَـٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ

মু’মিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে; অতঃপর তাদের একদল অপর দলকে আক্রমণ করলে আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। (সূরা

হুজুরাত, ৪৯ ঃ ৯) এবং وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ *অশান্তি দূর হয়ে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর।* (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৯৩)

আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে আমরা এর উপর আমল করেছি। তখন ইসলাম দুর্বল ছিল এবং মুসলিমদের সংখ্যা অল্প ছিল। যে ইসলাম গ্রহণ করত তার উপর অশান্তি এসে পড়ত। তাকে হয় হত্যা করা হত, না হয় কঠিন শাস্তি দেয়া হত। অবশেষে এই পবিত্র ধর্ম বিস্তার লাভ করেছে এবং অনুসারীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে ও অশান্তি সম্পূর্ণরূপে দূর হয়েছে।' লোকটি তখন বলেন, 'আচ্ছা তাহলে বলুন যে, আলী (রাঃ) ও উসমান (রাঃ) সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি?' তিনি বলেন ঃ ' উসমানকে (রাঃ) তো আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করেছেন যদিও তোমরা এটা পছন্দ করনা। আর আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আপন চাচাতো ভাই ও জামাতা ছিলেন। অতঃপর আঙ্গুলের ইশারায় বলেন, এই হচ্ছে তাঁর বাড়ী যা তোমাদের সামনে রয়েছে।' (ফাতহুল বারী ৮/৩২)

১৯৪। নিষিদ্ধ মাসের পরিবর্তে নিষিদ্ধ মাস ও সমস্ত নিষিদ্ধ বিষয় পরস্পর সমান; অতঃপর যে কেহ তোমাদের প্রতি অত্যাচার করে, তাহলে সে তোমাদের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করবে তোমরাও তার প্রতি সেরূপ অত্যাচার কর এবং আল্লাহকে ভয় কর ও জেনে রেখ যে, আল্লাহ সংযমশীলদের সঙ্গী।	١٩٤. ٱلشَّهْرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَٰتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ

আত্মরক্ষা ছাড়া নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা যাবেনা

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), যাহ্হাক (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), মিকসাম (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) এবং 'আতা (রহঃ) বলেন ঃ ষষ্ঠ হিজরীর যিলকাদ মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণসহ (রাঃ) উমরাহ করার জন্য কা'বা ঘরের দিকে যাত্রা করেন। কিন্তু মুশরিকরা তাঁদেরকে 'হুদাইবিয়া' প্রান্তরে বাধা দিতে এগিয়ে আসে। অবশেষে এই শর্তের উপর তাদের সাথে সন্ধি হয় যে, তাঁরা পরের বছর আল্লাহর ঘরে প্রবেশ করে উমরাহ করবেন। পরের বছর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে আল্লাহর ঘরে (কা'বা) প্রবেশ করেন এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুশরিকরা যে খারাপ আচরণ করেছিল তার বদলা নেয়ার অনুমতি দিয়ে الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ এ আয়াতটি নাযিল করেন। (তাবারী ৩/৫৭৫-৫৭৭ ও ৫৭৯)

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, নিষিদ্ধ মাসসমূহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধ করতেননা। তবে যদি তাঁর উপর কেহ আক্রমণ করত তাহলে সেটা অন্য কথা। এমনকি যুদ্ধ করতে করতে নিষিদ্ধ মাস এসে পড়লে তিনি যুদ্ধ বন্ধ করে দিতেন। (আহমাদ ৩/৩৪৫) হুদাইবিয়ার প্রান্তরেও যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এ সংবাদ পৌঁছে যে, উসমানকে (রাঃ) মুশরিকরা শহীদ করেছে যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী নিয়ে মাক্কায় গিয়েছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চৌদ্দশ' সাহাবীর (রাঃ) নিকট একটি গাছের নীচে মুশরিকদের সাথে জিহাদ করার বাইয়াত গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি যখন জানতে পারেন যে, ওটা ভুল সংবাদ তখন তিনি তাঁর ইচ্ছা স্থগিত রাখেন।

অনুরূপভাবে 'হাওয়াযিন' গোত্রের সাথে হুনাইনের যুদ্ধ হতে যখন তিনি অবকাশ লাভ করেন তখন মুশরিকরা তায়েফে গিয়ে দুর্গের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে অবরোধ করেন। চল্লিশ দিন পর্যন্ত এই অবরোধ স্থায়ী হয়। অবশেষে কয়েকজন সাহাবীর (রাঃ) শাহাদাতের পর এই অবরোধ উঠিয়ে নেয়া হয় এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কার দিকে ফিরে যান। 'জিরানাহ' নামক স্থান হতে তিনি উমরাহর ইহরাম বাঁধেন। এখানে যুদ্ধলব্ধ দ্রব্য বন্টন করেন। তাঁর এই উমরাহ যিলকাদ মাসে সংঘটিত হয়। এটা ছিল হিজরী অষ্টম সনের ঘটনা। (ফাতহুল বারী ৩/৭০১, মুসলিম ২/৯১৬) অতঃপর বলা হচ্ছে যে, যারা তোমাদের প্রতি

অত্যাচার করে তোমরাও তাদের প্রতি ঐ পরিমাণই অত্যাচার কর। অর্থাৎ মুশরিকদের ব্যাপারেও ন্যায়ের প্রতি খেয়াল রেখ। এখানেও অত্যাচারের বিনিময় অত্যাচার দ্বারাই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেমন অন্যান্য জায়গায় শাস্তির বিনিময়কেও 'শাস্তি' শব্দের দ্বারাই ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং অন্যায়ের বিনিময়কে অন্যায় দ্বারাই বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ

যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর তাহলে ঠিক ততখানি করবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১২৬)

অতঃপর বলা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার কর ও তাঁকে ভয় কর এবং জেনে রেখ যে, এরূপ লোকের উপরই ইহকাল ও পরকালে আল্লাহ তা'আলার সহায়তা ও সাহায্য রয়েছে।

১৯৫। এবং তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় কর এবং স্বীয় হস্ত ধ্বংসের দিকে প্রসারিত করনা এবং কল্যাণ সাধন করতে থাক, নিশ্চয়ই আল্লাহ কল্যাণ সাধনকারীদের ভালবাসেন।	١٩٥. وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوٓاْ ۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার আদেশ

হুযাইফা (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলার পথে ব্যয়কারীদের সম্বন্ধে وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী ৮/৩৩) মনীষীগণও এই আয়াতের তাফসীরে এ কথাই বলেছেন। ইব্‌ন আবী হাতিমও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি মন্তব্য করেছেন যে, একই ধরনের বক্তব্য পেশ করেছেন ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), 'আতা (রহঃ), যাহ্‌হাক (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ)।

আয়াতের ‘ধ্বংসের দিকে হাত প্রসারিত করনা’ এর অর্থ হল পরিবার থেকে দূরে না থাকা, ধন-সম্পদ থেকে দূরে না থাকা এবং জিহাদ পরিত্যাগ করা। ইমাম তিরমিযী (রহঃ), নাসাঈ (রহঃ), আব্দ ইব্‌ন হুমাইদ তার তাফসীরে, ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ), ইব্‌ন জারীর (রহঃ), ইব্‌ন মারদুয়াহ (রহঃ), হাফিয আবূ ইয়ালা (রহঃ) তার মুসনাদে, ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ) এবং হাকিমও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তিরমিযী ৮/৩১১, নাসাঈ ৬/২৯৯, ইব্‌ন আবী হাতিম ১/৪২৪, তাবারী ৩/৫৯০, ইব্‌ন হিব্বান ৭/১০৫ এবং হাকিম ২/৭৭৫) তিরমিযী (রহঃ) এটিকে হাসান সহীহ গারীব বলেছেন। হাকিম (রহঃ) বলেন যে, দুই শায়খের (ইমাম বুখারী (রহঃ) ও মুসলিম(রহঃ)) শর্তাধীনে এটি সহীহ।

আবূ দাঊদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবূ ইমরান (রহঃ) বলেন ঃ আমরা কনষ্টানটিনোপলের যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলাম। ঐ সময় উকবাহ ইব্‌ন আমির (রাঃ) মিসরের সৈন্যদের যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন এবং ফাযালা ইব্‌ন উবাইদ (রাঃ) যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন সিরীয় সৈন্যবাহিনী। অতঃপর প্রচুর সংখ্যক রোমান (বাইজান্টাইন) সৈন্য নগরী ত্যাগ করে চলে গেলে আমরা তাদের মুকাবিলা করার জন্য দৃঢ় অবস্থান নেই। আমাদের মাঝের এক মুসলিম সৈন্য হঠাৎ করে তাদের বুহ্যের ভিতর ঢুকে পড়ে এবং তাদের রক্ষাবুহ্য তছনছ করে আবার আমাদের মাঝে ফিরে আসে। লোকেরা বলাবলি করতে লাগল ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর! এ লোকটিতো নিজকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। তখন আবূ আইউব (রাঃ) বলেন ঃ হে লোকসকল! তোমরা আল্লাহর আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করছ, এ আয়াততো আমাদের জন্য নাযিল হয়েছিল যখন আনসাররা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল এবং আল্লাহ তাঁর দীনকে জয়যুক্ত করছিলেন এবং মুসলিমদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তখন আমরা নিজেরা বলাবলি করছিলাম, ‘এখন আমাদের উচিত নিজ নিজ গৃহে ফিরে গিয়ে পরিবার ও ধন-সম্পত্তির দেখা-শোনা করা। আল্লাহ তখন এই আয়াত (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৯৫) নাযিল করেন। (আবূ দাঊদ ৩/২৭)

আবূ বাকর ইব্‌ন আইয়াশ (রহঃ) আবূ ইসহাক আস সুবাঈ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক লোক বারা ইব্‌ন আযীবকে (রাঃ) বলেন ঃ ‘আমি যদি একাকী শত্রু সারির মধ্যে ঢুকে পড়ি এবং সেখানে শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ি ও নিহত হই তাহলে কি এই আয়াত অনুসারে আমি নিজের জীবনকে নিজেই ধ্বংসকারীরূপে পরিগণিত হব?’ তিনি উত্তরে বলেন ঃ ‘না না; আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

فَقَـٰتِلۡ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفۡسَكَ

অতএব আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর; তোমার নিজের ছাড়া তোমার উপর অন্য কোন ভার অর্পণ করা হয়নি। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৮৪) বরং ঐ আয়াতটি তো তাদেরই ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল যারা আল্লাহ তা'আলার পথে খরচ করা হতে বিরত রয়েছিল। (তাফসীর ইব্ন মিরদুওয়াই)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন 'যুদ্ধের মধ্যে এইরূপ বীরত্ব দেখানো জীবনকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করা নয়, বরং আল্লাহর পথে মাল খরচ না করাই হচ্ছে ধ্বংসের মধ্যে পতিত হওয়া। আয়াতের মাধ্যমে (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৯৫) আদেশ করা হয়েছে যে, মুসলিমরা যেন আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ এবং তাঁর নৈকট্য লাভের উদ্দেশে জিহাদসহ সকল ধরনের কাজে তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। বিশেষ করে এ আয়াতটি নাযিলের উদ্দেশ্য হল জিহাদের জন্য ব্যয় করা এবং শত্রুদের মুকাবিলায় মুসলিমদের শক্তি যাতে বৃদ্ধি পায় সেই লক্ষ্যে সচেষ্ট থাকা। আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, যারা এ ব্যাপারে ব্যয় করা থেকে বিরত থাকবে তারা মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন হবে এবং তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়বে।

এর সাথে সাথে যাদের কাছে কিছু রয়েছে তাদেরকেও নির্দেশ দেয়া হচ্ছে ঃ তোমরা মানুষের হিতসাধন করতে থাক, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ভালবাসবেন। তোমরা সাওয়াবের প্রত্যেক কাজে খরচ করতে থাক। বিশেষ করে যুদ্ধের সময় আল্লাহর পথে খরচ করা হতে বিরত থেকনা, এটা প্রকৃতপক্ষে তোমাদেরই ধ্বংস টেনে আনবে। সুতরাং হিতসাধন করা হচ্ছে বড় রকমের আনুগত্য যার নির্দেশ এখানে দেয়া হচ্ছে যে, হিতসাধনকারীগণ আল্লাহ তা'আলার বন্ধু।

১৯৬। তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে হাজ্জ ও 'উমারাহ সম্পূর্ণ কর; কিন্তু তোমরা যদি বাধাপ্রাপ্ত হও তাহলে যা সহজ প্রাপ্র তাই উৎসর্গ কর এবং কুরবানীর জন্তুগুলি স্বস্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত তোমাদের মাথা মুন্ডন করনা। কিন্তু কেহ যদি তোমাদের মধ্যে পীড়িত হয়,	١٩٦. وَأَتِمُّوا۟ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ ۖ وَلَا تَحْلِقُوا۟ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْىُ مَحِلَّهُۥ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن

অথবা তার মাথা যন্ত্রনাগ্রস্ত হয় তাহলে সে সিয়াম কিংবা সাদাকাহ্ অথবা কুরবানী দ্বারা ওর বিনিময় করবে, অতঃপর যখন তোমরা শান্তিতে থাক তখন যে ব্যক্তি উমারাহ ও হাজ্জ একত্রে কামনা করে তাহলে যা সহজ প্রাপ্য তা'ই উৎসর্গ করবে। কিন্তু কেহ যদি তা প্রাপ্ত না হয় তাহলে হাজ্জের সময় তিন দিন এবং যখন তোমরা প্রত্যাবর্তিত হও তখন সাত দিন - এই পূর্ণ দশ দিন সিয়াম পালন করবে; এটা তারই জন্য, যার পরিজন পবিত্রতম মাসজিদে উপস্থিত না থাকে এবং আল্লাহকে ভয় কর ও জেনে রেখ যে, আল্লাহ্ কঠিন শাস্তিদাতা।	رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـٰثَةِ أَيَّامٍ فِى ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

উমরাহ্ ও হাজ্জ করার নির্দেশ

পূর্বে সিয়ামের বর্ণনা করা হয়েছিল, অতঃপর জিহাদের বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে হাজ্জের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, 'তোমরা হাজ্জ ও উমরাহকে পূর্ণ কর।' বাহ্যিক শব্দ দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, হাজ্জ ও উমরাহ শুরু করার পর সেগুলি পূর্ণ করা উচিত। সমস্ত আলেম এ বিষয়ে একমত যে, হাজ্জ ও উমরাহ আরম্ভ করার পর ওগুলি পূর্ণ করা অবশ্য কর্তব্য। আলী (রাঃ) বলেন 'পূর্ণ করার অর্থ এই যে, তোমরা নিজ নিজ বাড়ী হতে ইহরাম বাঁধবে।' সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) বলেন, এগুলি পূর্ণ করার অর্থ এই যে, তোমরা নিজ নিজ বাড়ী

হতে উমরাহ কিংবা হাজ্জ করার উদ্দেশে ইহরাম বাঁধবে এবং আল্লাহর ঘরের উমরাহ/হাজ্জ সম্পাদন করবে। (তাবারী ৪/৭) উত্তম হল, তোমাদের এই সফর হবে হাজ্জ ও উমরাহর উদ্দেশে। 'মীকাতে' (যেখান হতে ইহরাম বাঁধতে হয়) পৌঁছে উচ্চস্বরে 'লাব্বায়েক' পাঠ আরম্ভ করবে। তোমাদের অভিপ্রায় ব্যবসা বাণিজ্য বা অন্য কোন ইহলৌকিক কাজ সাধনের জন্য হবেনা। তোমরা হয়ত বেরিয়েছ নিজের কাজে। মাক্কার নিকটবর্তী হয়ে তোমাদের খেয়াল হল যে, এবার আমরা হাজ্জ ও উমরাহ পালন করে নেই। এভাবেও হাজ্জ ও উমরাহ আদায় করা হয়ে যাবে, কিন্তু পূর্ণ হবেনা। পূর্ণ করা এই যে, শুধুমাত্র এই উদ্দেশেই বাড়ী হতে বের হবে।'

আবদুর রায্যাক বর্ণনা করেন, যুহরী (রহঃ) বলেন, উমার (রাঃ) বলেছেন ঃ ওগুলি পূর্ণ করার অর্থ হচ্ছে ও দু'টি পৃথক পৃথকভাবে আদায় করা এবং উমরাহকে হাজ্জের মাসে আদায় না করা। কেননা কুরআন মাজীদে রয়েছে ঃ

ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَـٰتٌ

'হাজ্জের মাসগুলি নির্দিষ্ট।' (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৯৭)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, হাজ্জ ও উমরাহর ইহ্রাম বাঁধার পর ও দু'টি পূর্ণ না করেই ছেড়ে দেয়া জায়িয নয়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, হাজ্জ আ'রাফাহর' নাম এবং উমরাহ হচ্ছে তাওয়াফের নাম। আবদুল্লাহর (রাঃ) কিরা'আত হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ اِلَى الْبَيْتِ *তোমরা হাজ্জ ও উমরাহকে বাইতুল্লাহ পর্যন্ত পূর্ণ কর।* সুতরাং বাইতুল্লাহ পর্যন্ত গেলেই উমরাহ পূর্ণ হয়ে যায়। সাঈদ ইব্ন যুবাইরের (রহঃ) নিকট এটি আলোচিত হলে তিনি বলেন 'ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) কিরা'আতও এটাই ছিল।'

কেহ পথে বাধাপ্রাপ্ত হলে সেখানেই পশু কুরবানী করবে, মাথা মুন্ডন করবে এবং ইহরাম ত্যাগ করবে

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ যদি তোমরা পথে বাধাপ্রাপ্ত হও এবং হাজ্জ/উমরাহ করতে অসমর্থ হও। মাকহুল (রহঃ) বলেন ঃ 'পূর্ণ কর' এর অর্থ হল 'মীকাত' (যেখান হতে ইহরাম বাঁধতে হয়) হতে শুরু করা। মুফাস্সিরগণ বর্ণনা করেছেন যে, এই আয়াতটি হিজরী ষষ্ঠ

সনে হুদাইবিয়ার প্রান্তরে অবতীর্ণ হয়, যখন মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মাক্কা যেতে বাধা দিয়েছিল এবং ঐ সম্বন্ধেই পূর্ণ একটি সূরা আল ফাত্হ অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ (রাঃ) অনুমতি লাভ করেন যে, তাঁরা যেন সেখানেই তাঁদের কুরবানীর জন্তুগুলি যবাহ করেন। ফলে সত্তরটি উট যবাহ করা হয়, মাথা মুণ্ডন করা হয় এবং ইহরাম ত্যাগ করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ শুনে সাহাবীগণ (রাঃ) প্রথমে কিছুটা সংকোচবোধ করেন। তাঁরা অপেক্ষা করছিলেন যে, সম্ভবতঃ এই নির্দেশকে রহিতকারী কোন নির্দেশ অবতীর্ণ হবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং বাইরে এসে মাথা মুণ্ডন করেন, তাঁর দেখাদেখি সবাই এ কাজে অগ্রসর হন। কিছু লোক মাথা মুণ্ডন করেন এবং কিছু লোক চুল ছেঁটে ফেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

'মাথা মুণ্ডনকারীদের উপর আল্লাহ তা'আলা করুণা বর্ষণ করুন।' জনগণ বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যাঁরা চুল ছেঁটেছেন তাঁদের জন্যও প্রার্থনা করুন।' তিনি পুনরায় মুণ্ডনকারীদের জন্য প্রার্থনা করেন। তৃতীয়বার চুল ছোটকারীদের জন্যও তিনি প্রার্থনা করেন। (মুসলিম ২/৯৪৬) এক একটি উষ্ট্রিতে সাতজন করে লোক অংশীদার ছিলেন। সাহাবীগণের (রাঃ) মোট সংখ্যা ছিল চৌদ্দশ'। তাঁরা হুদাইবিয়া প্রান্তরে অবস্থান করেছিলেন যা 'হারাম' সীমা বহির্ভূত ছিল। তবে এটাও বর্ণিত আছে যে, ওটা 'হারাম' সীমান্তের মধ্যে অবস্থিত ছিল।

আলেমদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, যারা শত্রু কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হবে শুধু তাদের জন্যই কি এই নির্দেশ, নাকি যারা রোগের কারণে বাধ্য হয়ে পড়েছে তাদের জন্যও এই অনুমতি রয়েছে যে, তারা ঐ জায়গায়ই ইহরাম ত্যাগ করবে, মাথা মুণ্ডন করবে এবং কুরবানী করবে? ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) মতে তো শুধুমাত্র প্রথম প্রকারের লোকদের জন্যই এই অনুমতি রয়েছে। ইব্ন উমার (রাঃ), তাঊস (রহঃ), যুহরী (রহঃ) এবং যায়িদ ইব্ন আসলামও (রহঃ) এ কথাই বলেছেন। কিন্তু একটি মারফূ' হাদীসে রয়েছে যে, হাজ্জাজ ইব্ন আমর আল আনসারী (রাঃ) বলেন যে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ

'যে ব্যক্তির হাত-পা ভেঙ্গে গেছে কিংবা রুগ্ন হয়ে পড়েছে অথবা খোঁড়া হয়ে গেছে সে হালাল হয়ে গেছে। সে পরের বছর হাজ্জ করে নিবে। (আহমাদ

৩/৪৫০) হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন ঃ ‘আমি এটা ইব্ন আব্বাস (রাঃ) ও আবূ হুরাইরাহর (রাঃ) নিকটও বর্ণনা করেছি। তাঁরাও বলেছেন, ‘এটা সত্য।’ সুনান-ই আরবা‘আয়ও এ হাদীসটি রয়েছে। (আবূ দাঊদ ২/৪৩৪, তিরমিযী ৪/৮, নাসাঈ ৫/১৯৮, ইব্ন মাজাহ ২/১০২৮) ইব্ন মাসঊদ (রাঃ), ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আলকামা (রহঃ), সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (রহঃ), উরওয়া ইব্ন যুবাইর (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), ‘আতা (রহঃ) এবং মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে যে, রুগ্ন হয়ে পড়া এবং খোঁড়া হয়ে যাওয়াও এ রকমই ওজর। সুফইয়ান সাওরী (রহঃ) প্রত্যেক বিপদ ও কষ্টকেই এ রকমই ওজর বলে থাকেন। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৪৪৪-৪৪৫)

একটি হাদীসে রয়েছে যে, যুবাইর ইব্ন আবদুল্লাহর (রাঃ) কন্যা যুবাআহ্ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার হাজ্জ করার ইচ্ছা হয়, কিন্তু আমি অসুস্থ থাকি।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ‘হাজ্জে চলে যাও এবং শর্ত কর যে, (তোমার) ইহরাম সমাপনের ওটাই স্থান হবে যেখানে তুমি রোগের কারণে থেমে যেতে বাধ্য হবে। (ফাতহুল বারী ৯/৩৪, মুসলিম ২/৮৬৮) এই হাদীসের উপর ভিত্তি করেই কোন কোন আলেম বলেন যে, হাজ্জে শর্ত করা জায়িয। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যার যে পশু যবাহ করার ক্ষমতা রয়েছে সে তাই যবাহ করবে। যদি ধনী হয় তাহলে উট, যদি এর চেয়ে কম ক্ষমতাবান হয় তাহলে গরু, এর চেয়েও কম ক্ষমতা রাখলে ছাগল যবাহ করবে। (তাবারী ৪/৩০) হিশাম ইব্ন উরওয়াহও (রহঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, কুরবানীর পশু যবাহ করা নির্ভর করে ক্রয়-ক্ষমতার উপর। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৪৫২)

জ্ঞানের সমুদ্র কুরআনুল হাকীমের ব্যাখ্যাতা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিতৃব্য পুত্র আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ ‘যা সহজ প্রাপ্য হয় তাই কুরবানী করবে; তা উট, গরু, ছাগল, ভেড়া যা’ই হোকনা কেন।’ আয়িশা (রাঃ) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার কয়েকটি ভেড়া কুরবানী দিয়েছিলেন। (ফাতহুল বারী ৩/৬৩৯, মুসলিম ২/৯৫৮) অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ *যে পর্যন্ত কুরবানীর জন্তু তার স্বস্থানে না পৌঁছে সে পর্যন্ত তোমরা তোমাদের মাথা মুণ্ডন করনা।* এর সংযোগ وَاَتِمُّوا الْحَجَّ এর

সঙ্গে রয়েছে, فَاِنْ اُحْصِرْ تُمْ এর সঙ্গে নয়। ইব্‌ন জারিরের (রহঃ) এখানে ক্রুটি হয়ে গেছে। কারণ এই যে, হুদাইবিয়ায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ও তাঁর সহচরবৃন্দকে যখন মাসজিদুল হারামে যেতে বাধা প্রদান করা হয় তখন তাঁরা সবাই হারামের বাইরেই মাথা মুণ্ডন এবং কুরবানীও করেন। কিন্তু শান্তি ও নিরাপত্তার সময় এটা জায়িয নয়, যে পর্যন্ত না কুরবানীর প্রাণী যবাহর স্থানে পৌঁছে যায় এবং হাজীগণ তাঁদের হাজ্জ ও উমরাহর যাবতীয় কাজ হতে অবকাশ লাভ করেন, যদি তাঁরা একই সাথে উমরাহ ও হাজ্জ উভয়টির জন্য ইহরাম বেঁধে থাকেন। বর্ণিত আছে যে, হাফসা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সবাই তো ইহরাম ত্যাগ করেছে; কিন্তু আপনি যে ইহরাম অবস্থায়ই রয়েছেন?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ

'হ্যাঁ, আমি আমার মাথাকে আঠাযুক্ত করেছি এবং আমার কুরবানীর পশুর গলদেশে চিহ্ন ঝুলিয়ে দিয়েছি। সুতরাং যে পর্যন্ত না এটা যবাহ করার স্থানে পৌঁছে যায় সেই পর্যন্ত আমি ইহরাম ত্যাগ করবনা।' (ফাতহুল বারী ৩/৪৯৩, মুসলিম ২/৯০২)

ইহরাম অবস্থায় মাথা মুন্ডন করলে 'ফিদইয়া' দিতে হবে

এরপরে নির্দেশ হচ্ছে যে, রুগ্ন ও মাথার রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি 'ফিদইয়া' দিবে। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মা'কিল (রহঃ) বলেন ঃ 'আমি কুফার মাসজিদে কা'ব ইব্‌ন আজরার (রাঃ) পাশে বসে ছিলাম। তাঁকে আমি এই আয়াতটি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করি। তিনি বলেন, এই আয়াতটি আমারই সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয় এবং নির্দেশ হিসাবে এ রকম প্রত্যেক ওযরযুক্ত লোকের জন্যই প্রযোজ্য। 'আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, সেই সময় আমার মুখের উপর উকুন বয়ে চলছিল। আমাকে দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'তোমার অবস্থা যে এতদূর পর্যন্ত পৌঁছবে আমি তা ধারণাই করিনি। তুমি কি একটি ছাগী যবাহ করারও ক্ষমতা রাখনা?' আমি বললাম ঃ আমি তো দরিদ্র লোক। তিনি বললেন ঃ

'যাও মাথা মুণ্ডন কর এবং তিনটি সিয়াম পালন কর অথবা ছয় জন মিসকীনকে অর্ধ সা' (প্রায় দেড় কেজি) করে খাদ্য দিয়ে দাও।' (ফাতহুল বারী ৮/৩৪)

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, কা'ব ইব্‌ন উজরা (রাঃ) বলেন ঃ 'আমি হাঁড়ির নীচে জ্বাল দিচ্ছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

আমার নিকট আগমন করেন। সে সময় আমার মুখের উপর দিয়ে উকুন বয়ে চলছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে এ অবস্থায় দেখে জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমার মাথার উকুন কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ তোমার মাথার চুল কেটে ফেল এবং তিন দিন সিয়াম পালন কর অথবা ছয়জন গরীবকে খাদ্য প্রদান কর অথবা একটি পশু কুরবানী কর। এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী আইউব (রহঃ) মন্তব্য করেন, আমি মনে করতে পারছিনা যে, কোন্ বিষয়টি আগে বলা হয়েছে। (আহমাদ ৪/২৪১) তাফসীর ইব্ন মিরদুওয়াইয়ের বর্ণনায় রয়েছে, 'অতঃপর আমি মাথা মুণ্ডন করি ও একটি ছাগী কুরবানী দেই।'

পরম করুণাময় আল্লাহ এখানে যেহেতু অবকাশ দিতেই চান, এ জন্যই কুরআনে সর্বপ্রথম সিয়ামের বর্ণনা দিয়েছেন, যা সর্বাপেক্ষা সহজ। অতঃপর সাদাকাহর কথা বলেছেন এবং সবশেষে কুরবানীর বর্ণনা দিয়েছেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যেহেতু সর্বোত্তমের উপর আমল করার ইচ্ছা, তাই তিনি সর্বপ্রথম ছাগল কুরবানীর বর্ণনা দিয়েছেন, অতঃপর ছয় জন মিসকীনকে খাওয়ানোর কথা বলেছেন এবং সর্বশেষে তিনটি সিয়ামের উল্লেখ করেছেন। সুতরাং শৃংখলা হিসাবে দু'টিরই অবস্থান অতি চমৎকার।

তামাত্তু হাজ্জ

এরপরে ইরশাদ হচ্ছে ঃ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ যে ব্যক্তি হাজ্জে তামাত্তু করতে চায় সে কুরবানী করবে, তা সে হাজ্জ ও উমরাহর ইহরাম এক সাথে বাঁধুক অথবা প্রথমে উমরাহর ইহরাম বেঁধে ওর কার্যাবলী শেষ করে হালাল হওয়ার পর পুনরায় হাজ্জের ইহরাম বাঁধুক। শেষেরটাই প্রকৃত 'তামাত্তু' এবং ধর্মশাস্ত্রবিদদের উক্তিতে এটাই প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে। তবে সাধারণ 'তামাত্তু' বলতে দু'টিকেই বুঝায়। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। কোন কোন বর্ণনাকারী তো বলেন যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও হাজ্জে তামাত্তু করেছিলেন। অন্যান্যগণ বলেন যে, তিনি হাজ্জ ও উমরাহর ইহরাম এক সাথে বেঁধে ছিলেন। তাঁরা সবাই বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কুরবানীর জন্তু ছিল। সুতরাং আয়াতটিতে এই নির্দেশ রয়েছে যে, হাজ্জে তামাত্তুকারী যে কুরবানীর উপর সক্ষম হবে তাই করবে। এর সর্বনিম্ন পর্যায় হচ্ছে

একটি ছাগল কুরবানী করা। গরুও কুরবানী করতে পারে। আওজায়ী (রহঃ) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সহধর্মিণীগণের পক্ষ হতে গরু কুরবানী করেছিলেন, তাঁরা সবাই হাজ্জে তামাত্তু করেছিলেন।' (আবূ দাঊদ ২/৩৬২) এর দ্বারা সাব্যস্ত হচ্ছে যে, তামাত্তুর ব্যবস্থা শারীয়াতে রয়েছে।

ইমরান ইব্ন হুসাইন (রাঃ) বলেন, 'কুরআন মাজীদে তামাত্তুর আয়াতও অবতীর্ণ হয়েছে এবং আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হাজ্জে তামাত্তু করেছি। অতঃপর কুরআনুল হাকীমে এর নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়নি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এটা হতে বাধা দান করেননি। জনগণ নিজেদের মতানুসারে এটাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।' (ফাতহুল বারী ৮/৩৪, মুসলিম ২/৯০০) ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা উমারকে (রাঃ) বুঝানো হয়েছে। মুহাদ্দিসগণের মতে ইমাম বুখারীর (রহঃ) এই কথা সম্পূর্ণরূপেই সঠিক। উমার (রাঃ) হতে নকল করা হয়েছে যে, তিনি জনগণকে এটা হতে বাধা দিতেন এবং বলতেন, 'আমরা যদি আল্লাহ তা'আলার কিতাবকে গ্রহণ করি তাহলে ওর মধ্যে হাজ্জ ও উমরাহকে পূরা করার নির্দেশ বিদ্যমান রয়েছে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ

তোমরা হাজ্জ ও উমরাহকে আল্লাহর জন্য পূরা কর। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৯৬) তবে এটা মনে রাখা দরকার যে, উমারের (রাঃ) এই বাধা প্রদান হারাম হিসাবে ছিলনা। বরং এ জন্যই ছিল যে, মানুষ যেন খুব বেশি করে হাজ্জ ও উমরাহর উদ্দেশে বাইতুল্লাহর যিয়ারাত করে।

তামাত্তু হাজ্জ পালনকারীর সাথে কুরবানীর পশু না থাকলে ১০ দিন সিয়াম পালন করবে

এরপরে বলা হয়েছে ঃ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ যে ব্যক্তির কাছে কুরবানীর পশু থাকবেনা সে হাজ্জের মধ্যে তিনটি সিয়াম পালন করবে এবং হাজ্জ সমাপ্ত করে প্রত্যাবর্তনের পর আরও সাতটি সিয়াম পালন করবে। (তাবারী ৪/৯৭) সুতরাং পূর্ণ দশটি সিয়াম হয়ে যাবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুরবানী করতে সক্ষম হবেনা, সে সিয়াম

পালন করবে। তিনটি সিয়াম হাজ্জের দিনগুলিতে পালন করবে। আলেমদের মতে এই সিয়ামগুলি আ'রাফাহর দিনের অর্থাৎ ৯ যিলহাজ্জ তারিখের পূর্ববর্তী দিনগুলিতে রাখাই উত্তম। 'আতার (রহঃ) উক্তি এটাই। কিংবা ইহরাম বাঁধা মাত্রই সিয়াম পালন করবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ মনীষীর উক্তি এটাই।

যদি কোন ব্যক্তির এই তিনটি সিয়াম বা দু' একটি সিয়াম ছুটে যায় এবং 'আইয়্যামে তাশরীক' অর্থাৎ ঈদুল আয্হার পরবর্তী তিনদিন এসে পড়ে তাহলে আয়িশা (রাঃ) এবং ইব্ন উমারের (রাঃ) উক্তি এই যে, এই ব্যক্তি ঐ দিনগুলিতেও সিয়াম পালন করতে পারে। (তাবারী ৪/৯৫) আলী (রাঃ) হতেও এটা বর্ণিত আছে। ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং উরওয়া ইব্ন যুবাইর (রহঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। তাদের দলীল এই যে, اَلْحَجُّ শব্দটি সাধারণ। সুতরাং এই দিনগুলি এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা সহীহ হাদীসে রয়েছে ঃ

'আইয়্যামে তাশরীক' হচ্ছে খাওয়া, পান করা ও আল্লাহ তা'আলার যিক্র করার দিন। (মুসলিম ২/৮০০)

অতঃপর সাতটি সিয়াম পালন করতে হবে হাজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর। (আবদুর রায্যাক ১/৭৬) এর ভাবার্থ এই যে, যখন স্বীয় অবস্থান স্থলে পৌঁছে যাবে। সুতরাং ফিরার সময় পথেও এই সিয়ামগুলি পালন করতে পারে। মুজাহিদ (রহঃ) ও 'আতা (রহঃ) এ কথাই বলেন। কিংবা এর ভাবার্থ হচ্ছে স্বদেশে পৌঁছে যাওয়া। ইব্ন উমার (রাঃ) এটাই বলেন। একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আবুল আলীয়া (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), 'আতা (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), ইমাম যুহরী (রহঃ) এবং রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ)। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৪৯৮)

সহীহ বুখারীর একটি সুদীর্ঘ হাদীসে রয়েছে যে, 'হাজ্জাতুল বিদা'য় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমরাহর সাথে হাজ্জে তামাত্তু' করেন এবং 'যুলহুলাইফায়' কুরবানী করেন। তিনি কুরবানীর পশু সাথে নিয়েছিলেন। তিনি উমরাহ করেন, অতঃপর হাজ্জ করেন। জনগণও তাঁর সাথে হাজ্জে তামাত্তু করেন। কিছু লোক কুরবানীর জন্তু সাথে নিয়েছিলেন; কিন্তু কিছু লোকের সাথে কুরবানীর জন্তু ছিলনা। মাক্কায় পৌঁছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেন ঃ

'যাদের নিকট কুরবানীর পশু রয়েছে তারা হাজ্জ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ইহরামের অবস্থায়ই থাকবে। আর যাদের কাছে কুরবানীর পশু নেই তারা বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করে সাফা ও মারওয়া পর্বতদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়ে ইহরাম ত্যাগ

করবে। মাথা মুন্ডন করবে অথবা ছেঁটে ফেলবে। অতঃপর হাজ্জের ইহরাম বেঁধে নিবে। কুরবানী দেয়ার ক্ষমতা না থাকলে হাজ্জের মধ্যে তিনটি সিয়াম পালন করবে এবং সাতটি সিয়াম স্বদেশে ফিরে পালন করবে।' (ফাতহুল বারী ৩/৬৩০, মুসলিম ২/৯০) এর দ্বারা প্রমাণিত হল যে, এই সাতটি সিয়াম স্বদেশে ফিরে পালন করতে হবে। অতঃপর বলা হচ্ছে, 'এই পূর্ণ দশ দিন।' এ কথাটি গুরুত্ব দেয়ার জন্য বলা হয়েছে। যেমন আরাবী ভাষায় বলা হয়ে থাকে, 'আমি স্বচক্ষে দেখেছি, নিজ কানে শুনেছি এবং নিজ হাতে লিখেছি।' কুরআন মাজীদেও রয়েছে ঃ

وَلَا طَٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيۡهِ

আর না কোন পাখী, যে তার দু' পাখার সাহায্যে উড়ে থাকে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৩৮) অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

وَلَا تَخُطُّهُۥ بِيَمِينِكَ

এবং তুমি তোমার ডান হাত দিয়ে কোন কিতাব লিখনি। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৪৮) অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَوَٰعَدۡنَا مُوسَىٰ ثَلَٰثِينَ لَيۡلَةً وَأَتۡمَمۡنَٰهَا بِعَشۡرٍ فَتَمَّ مِيقَٰتُ رَبِّهِۦٓ أَرۡبَعِينَ لَيۡلَةً

আমি মূসাকে ওয়াদা দিয়েছিলাম ত্রিশ রাতের জন্য এবং আরো দশ দ্বারা ওটা পূর্ণ করেছিলাম। এভাবে তার রবের নির্ধারিত সময়টি চল্লিশ রাত দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৪২) অতএব এসব জায়গায় যেমন শুধু জোর দেয়ার জন্যই এই শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে তেমনি এই বাক্যটিও জোর দেয়ার জন্যই আনা হয়েছে। আবার এও বলা হয়েছে যে, এটা হচ্ছে পূর্ণ করার নির্দেশ।

মাক্কাবাসীরা হাজ্জে তামাত্তু করবেনা

এরপরে বলা হচ্ছে যে, এই নির্দেশ ঐসব লোকের জন্য যাদের পরিবার পরিজন 'মাসজিদে হারামে' অবস্থানকারী নয়। হারামবাসী যে হাজ্জে তামাত্তু করতে পারেনা এর উপর তো ইজমা' রয়েছে। মুসনাদ আবদুর রায্যাকে বলা হয়েছে, তাউস (রহঃ) বলেছেন যে, তামাত্তু হাজ্জ পালন করতে পারবে শুধুমাত্র তারা যারা মাক্কার হারাম এলাকার মধ্যে পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাস করেনা (Non-resident), কিন্তু যারা মাক্কায় অবস্থান করেন (Resident) তাদের জন্য প্রযোজ্য

নয়। যেমনটি আলোচিত আয়াতে বলা হয়েছে ঃ ইহা *তারই জন্য যার পরিজন পবিত্রতম মাসজিদে উপস্থিত থাকেনা।* ইব্‌ন আব্বাসও (রাঃ) এ কথাই বলেছেন।

অতঃপর বলা হচ্ছে, 'আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর। তাঁর নির্দেশাবলী মেনে চল এবং যেসব কাজের উপর তিনি নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন তা থেকে বিরত থাক। জেনে রেখ যে, তাঁর অবাধ্যদেরকে তিনি কঠিন শাস্তি দিয়ে থাকেন।

١٩٧. ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى ٱلْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا۟ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ ۚ وَٱتَّقُونِ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ

১৯৭। হাজ্জের মাসগুলি সুবিদিত। কেহ যদি ঐ মাসগুলির মধ্যে হাজ্জের সংকল্প করে তাহলে সে হাজ্জের সময়ে সহবাস, দুস্কার্য ও কলহ করতে পারবেনা এবং তোমরা যে কোন সৎ কাজ করনা কেন আল্লাহ তা জ্ঞাত আছেন। আর তোমরা তোমাদের সাথে পাথেয় নিয়ে নাও। বস্তুতঃ উৎকৃষ্ট পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া বা আত্মসংযম। সুতরাং হে জ্ঞানবানগণ! আমাকে ভয় কর।

হাজ্জের জন্য কখন ইহরাম বাঁধতে হবে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ আরাবী ভাষাবিদগণ বলেন যে, প্রথম বাক্যটির ভাবার্থ হচ্ছে, হাজ্জ হল ঐ মাসগুলির হাজ্জ যা সুবিদিত ও নির্দিষ্ট। সুতরাং হাজ্জের মাসগুলিতে ইহরাম বাঁধা অন্যান্য মাসে ইহরাম বাঁধা হতে বেশি পূর্ণতা প্রদানকারী।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), যাবির (রাঃ), 'আতা (রহঃ) এবং মুজাহিদেরও (রহঃ) এটাই অভিমত যে, হাজ্জের ইহরাম হাজ্জের মাস ছাড়া অন্যান্য মাসে বাঁধা সঠিক নয়। তাদের দলীল হচ্ছে اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ এই আয়াতটি। আরাবী ভাষাবিদগণের আর একটি দলের মতে আয়াতটির এই শব্দগুলির ভাবার্থ এই যে,

হাজ্জের সময় হচ্ছে নির্দিষ্ট কয়েকটি মাস। সুতরাং সাব্যস্ত হচ্ছে যে, এই মাসগুলির পূর্বে হাজ্জের ইহরাম বাঁধা ঠিক হবেনা, যেমন সালাতের সময়ের পূর্বে কেহ সালাত আদায় করলে সালাত ঠিক হয়না। ইমাম শাফিঈ (রহঃ) বলেন, 'আমাকে মুসলিম ইব্ন খালিদ (রহঃ) সংবাদ দিয়েছেন, তিনি ইব্ন জুরাইজের (রহঃ) নিকট হতে শুনেছেন, তাঁকে উমার ইব্ন 'আতা (রহঃ) বলেছেন, তাঁর কাছে ইকরিমাহ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন 'কোন ব্যক্তির জন্য এটা উচিত নয় যে, সে হাজ্জের মাসগুলি ছাড়া অন্য মাসে হাজ্জের ইহরাম বাঁধে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ অর্থাৎ হাজ্জের মাসগুলি সুবিদিত।' (আল উম্ম ২/১৩২) এই বর্ণনাটির আরও বহু সনদ রয়েছে। একটি সনদে আছে যে, এটাই সুন্নাত। (ইব্ন খুজাইমা ৪/১৬২)

উসূলে'র গ্রন্থসমূহেও এই জিজ্ঞাস্য বিষয়টির এভাবে নিস্পত্তি করা হয়েছে যে, এটা সাহাবীর (রাঃ) উক্তি এবং তিনি সেই সাহাবী যিনি কুরআনুল হাকীমের ব্যাখ্যাতা। সুতরাং এ উক্তি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরই উক্তি। তাছাড়া তাফসীর ইব্ন মিরদুওয়াইয়ের একটি মারফু' হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'হাজ্জের মাস ছাড়া অন্য মাসে ইহরাম বাঁধা (হাজ্জের উদ্দেশে) কারও জন্য উচিত নয়।' এর ইসনাদও উত্তম। কিন্তু ইমাম শাফিঈ (রহঃ) ও ইমাম বাইহাকী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, এই হাদীসের একজন বর্ণনাকারী হচ্ছেন যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ)। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, হাজ্জের মাসগুলির পূর্বে হাজ্জের ইহরাম বাঁধা যেতে পারে কি? তিনি উত্তরে বলেন, 'না।' (আল উম্ম ২/১৩২, বাইহাকী ৪/৩৪৩) এ বর্ণনাটি পূর্বের বর্ণনার চেয়ে অধিক সঠিক। সংক্ষিপ্তসার হল এই যে, এই বর্ণনা হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন সাহাবীর এবং এর সমর্থন রয়েছে ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) ঐ মন্তব্যে যে, তিনি বলেছেন ঃ ইহা হল সুন্নাতেরই একটি অংশ যে, যিলহাজ্জ মাস শুরু হওয়ার আগেই হাজ্জের উদ্দেশে ইহরামের কাপড় পড়িধান করা যাবেনা। আল্লাহই সর্ব বিষয়ে অধিক জ্ঞাত।

হাজ্জের মাসসমূহ

أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ এর ভাবার্থে আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) বর্ণনা করেন, 'শাওয়াল, যিলকাদ এবং যিলহাজ্জ মাসের দশদিন।' (ফাতহুল বারী ৩/৪৯০) এই বর্ণনাটি তাফসীর ইব্ন জারীর এবং তাফসীর মুস্তাদরাক হাকিমেও রয়েছে।

ইব্ন উমার (রাঃ), আলী (রাঃ), ইব্ন মাসঊদ (রাঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতেও এটা বর্ণিত আছে। 'আতা (রহঃ) মুজাহিদ (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), শা'বী (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), ইব্ন সীরীন (রহঃ), মাকহুল (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহ্হাক ইব্ন মাযাহিম (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং মুকাতিল ইব্ন হিব্বানও (রহঃ) এ কথাই বলেন। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৪৮৬-৪৮৮) ইব্ন জারীরও (রহঃ) একেই প্রাধান্য দিয়ে বলেন ঃ এটি একটি সাধারণ বিষয় যে, দুই মাস এবং তৃতীয় মাসের অংশকে মাসসমূহ বলা হয়ে থাকে। যেমন আরাবরা তাদের কথা বলার সময় বলে থাকে, আমি অমুক অমুক ব্যক্তির কাছে এ বছর কিংবা এই দিনেই গিয়েছি। অথচ সে শুধুমাত্র বছরের কোন এক মাসে অথবা দিনে যাতায়াত করেছিল।

কুরআনুম মাজীদেও রয়েছে فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২০৩)। অর্থাৎ 'যে দু'দিনে তাড়াতাড়ি করে।' অথচ ঐ তাড়াতাড়ি দেড় দিনের হয়ে থাকে। কিন্তু গণনায় দু'দিন বলা হয়েছে।'

আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হাজ্জের মাসগুলিতে উমরাহ করা ঠিক নয়। ইব্ন জারীরও (রহঃ) এ উক্তিগুলির এই ভাবার্থই বর্ণনা করেছেন যে, হাজ্জের সময় তো মিনার দিন (দশই যিলহাজ্জ) অতিক্রান্ত হওয়া মাত্রই শেষ হয়ে যায়। অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ যে ব্যক্তি এই মাসগুলিতে হাজ্জের সংকল্প করে অর্থাৎ হাজ্জের ইহরাম বাঁধে। এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, হাজ্জের ইহরাম বাঁধা ও তা পূরা করা অবশ্য কর্তব্য। 'ফারাদা' শব্দের এখানে অর্থ হচ্ছে সংকল্প করা। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ওদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা হাজ্জ ও উমরাহর ইহরাম বেঁধেছে। 'আতা (রহঃ) বলেন যে, এখানে *'ফারাদা'* এর ভাবার্থ হচ্ছে ইহরাম। ইবরাহীম (রহঃ) ও যাহ্হাকেরও (রহঃ) উক্তি এটাই। (তাবারী ৪/১২৩)

হাজ্জ পালন অবস্থায় স্ত্রী গমন করা যাবেনা

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ইহরাম বেঁধে *'লাব্বাইক'* পাঠের পর কোন স্থানে থেমে যাওয়া উচিত নয়। অন্যান্য মনীষীদেরও এটাই উক্তি। কোন কোন মনীষী বলেন যে, *'ফারাদা'* শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে *'লাব্বাইক'* পাঠ। رَفَثٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে সহবাস। যেমন কুরআনুল কারীমের অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ

রমাযানের রাতে আপন স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা করা তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে। (২ ঃ ১৮৭) ইহরাম অবস্থায় সহবাস এবং ওর পূর্ববর্তী সমস্ত কাজই হারাম। যেমন প্রেমালাপ করা, চুমু দেয়া এবং স্ত্রীদের বিদ্যমানতায় এসব কথা আলোচনা করা। কেহ কেহ পুরুষদের মাজলিসেও এসব কথা আলোচনা করাকে رَفَثٌ এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

ইব্ন জারীর (রহঃ) নাফি (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) বলেছেন, *'রাফাশ'* শব্দের অর্থ হল সহবাস অথবা এ বিষয়ে কোন পুরুষ কিংবা মহিলার সাথে মুখে উচ্চারণ করা, বাক্যালাপ করা। (তাবারী ৪/১২৬) 'আতা ইব্ন আবূ রাবাহ (রহঃ) বলেন যে, 'রাফাশ' অর্থ হল সহবাস অথবা অযথা বাক্যালাপ করা। (তাবারী ৪/১২৭) আমর ইব্ন দীনারও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। 'আতা (রহঃ) বলেন যে, এর সাথে সাথে শিকার করার ব্যাপারেও আলোচনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। (তাবারী ৪/১২৮) তাউস (রহঃ) বলেন, যদি কেহ বলে যে, 'ইহরাম থেকে মুক্ত হয়ে আমি তোমার সাথে সহবাস করব' তাহলে তাও 'রাফাশ' এর অন্তর্ভুক্ত। (তাবারী ৪/১২৮) আবুল আলীয়া (রহঃ) থেকেও একই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ 'রাফাশ' হল স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা, তাকে চুমু দেয়া, তাকে আদর-সোহাগ করা, তার সাথে অশ্লীল কথা-বার্তা বলা এবং এ ধরনের অন্যান্য কাজসমূহ। (তাবারী ৪/১২৯) ইব্ন উমার (রাঃ) এবং ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, 'রাফাশ' শব্দের অর্থ হল মহিলাদের সাথে সহবাস করা। (তাবারী ৪/১২৯) একই মত পোষণ করেছেন সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), আবুল আলীয়া (রহঃ) প্রমুখজন। তারা ইহা বর্ণনা করেছেন 'আতা (রহঃ), মাকহুল (রহঃ), 'আতা আল-খুরাসানী (রহঃ), 'আতা ইব্ন ইয়াসার (রহঃ), আতীয়া (রহঃ), ইবরাহীম (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), যুহুরী (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), মালিক ইব্ন আনাস (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ), আবদুল কারীম ইব্ন মালিক (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ) এবং অন্যান্যদের কাছ থেকে।

হাজ্জের সময় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকতে হবে

فُسُوْقٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে অবাধ্য হওয়া, শিকার করা, গালি দেয়া ইত্যাদি।

وَلاَ فُسُوْقَ এর অর্থ হল আর না পাপের কাজ। মিকসাম (রহঃ) এবং অন্যান্য বিদ্বানগণ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, ইহা হল অবাধ্যতা। একই মতামত ব্যক্ত করেছেন 'আতা (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), তাউস (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাব (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), যুহরী (রহঃ), রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ), 'আতা ইব্‌ন ইয়াসার (রহঃ), 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ) এবং মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ)। (ইব্‌ন আবী হাতিম ২/৪৯৭-৫০০)

ইব্‌ন ওয়াহাব (রহঃ) নাফি (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ) বলেছেন, 'ফুসুক' হল ঐ সমস্ত কাজ করা যা আল্লাহ তা'আলা হারাম এলাকায় করতে নিষেধ করেছেন। (ইব্‌ন আবী হাতিম ২/৪৯৭)

অন্যান্য অনেক আলেম বলেছেন যে, 'ফুসুক' হল কেহকে অভিশাপ দেয়া। তারা নিম্নের হাদীসের উপর ভিত্তি করে এ কথা বলেছেন ঃ কোন মুসলিমকে গালি দেয়া হল 'ফুসুক' এবং হত্যা করা হল কুফরী। (ফাতহুল বারী ১/১৩৫)

আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য দেব-দেবীর নামে পশু যবাহ করাও হচ্ছে 'ফুসুক', যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ

অথবা 'ফিস্‌ক' যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবাহ করা হয়েছে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৪৫) খারাপ উপাধি দ্বারা ডাকাও ফিস্‌ক। যেমন কুরআনে ঘোষিত হয়েছে وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ *এবং তোমরা একে অপরের মন্দ নামে ডেকনা'* (সূরা হুজুরাত, ৪৯ ঃ ১১) সংক্ষিপ্ত কথা এই যে, আল্লাহ তা'আলার প্রত্যেক অবাধ্যতাই ফিস্‌কের অন্তর্গত। এটা সর্বদাই অবৈধ বটে; কিন্তু সম্মানিত মাসগুলিতে এর অবৈধতা আরও বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا۟ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ

অতএব তোমরা এ মাসগুলিতে (ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করে) নিজেদের ক্ষতি সাধন করনা। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৩৬) অনুরূপভাবে হারামের মধ্যে এর অবৈধতা বৃদ্ধি পায়। যেমন ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَن يُرِدۡ فِيهِ بِإِلۡحَادِۭ بِظُلۡمٍ نُّذِقۡهُ مِنۡ عَذَابٍ أَلِيمٍ

আর যে ইচ্ছা করে ওতে পাপ কাজের সীমালংঘন করে, তাকে আমি আস্বাদন করাব মর্মন্তদ শাস্তি। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ২৫)

বলা হয়েছে ঃ যে ব্যক্তি এই বাইতুল্লাহর হাজ্জ করে সে যেন 'রাফাস' এবং 'ফিস্ক' না করে। তাহলে সে পাপ হতে এমনই মুক্ত হয়ে যাবে যেমন তার জন্মের দিন ছিল।' (ফাতহুল বারী ৪/২৫, মুসলিম ২/৯৮৩)

হাজ্জের সময় তর্ক-বিতর্ক থেকে বিরত থাকতে হবে

এর পরে ইরশাদ হচ্ছে ঃ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ হাজ্জে কলহ নেই। অর্থাৎ হাজ্জের সময় এবং হাজ্জের আরকান ইত্যাদির মধ্যে তোমরা কলহ করনা। আবুল আলিয়া (রহঃ), 'আতা (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), যাবির ইব্ন যায়িদ (রহঃ), 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ), মাকহুল (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ), আমর ইব্ন দিনার (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), 'আতা ইব্ন ইয়াসার (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যুহরী (রহঃ) প্রমুখ হতে ভাবার্থ এটাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, তোমরা হাজ্জের সফরে পরস্পর ঝগড়া বিবাদ করনা, একে অপরকে রাগান্বিত করনা এবং কেহ কেহকে গালি দিওনা। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৫০৩-৫০৫)

তাফসীর মুসনাদ আবদ ইব্ন হামীদে একটি হাদীস রয়েছে, যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এরূপ অবস্থায় হাজ্জ পূর্ণ করল যে, কোন মুসলিম তার হাতের দ্বারা এবং মুখের দ্বারা কষ্ট পেলনা, তার পূর্বের সমস্ত পাপ ক্ষমা হয়ে গেল।

হাজ্জের সময় আল্লাহর যিক্‌রে মশগুল থাকতে হবে এবং হাজ্জের পাথেয় থাকতে হবে

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ *তোমরা যে কোন সৎ কাজ কর না কেন আল্লাহ তা অবগত আছেন।* উপরে যেহেতু অন্যায় ও অশ্লীল কাজ হতে বাধা দেয়া হয়েছে, কাজেই এখানে সাওয়াবের কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে,

তাদেরকে কিয়ামাতের দিন প্রতিটি সৎ কাজের পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى *তোমরা হাজ্জের সফরে নিজেদের সাথে পাথেয় নিয়ে নাও।* ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, জনগণ পাথেয় ছাড়াই হাজ্জের সফরে বেরিয়ে পড়ত। পরে তারা মানুষের কাছে চেয়ে বেড়াত। এ জন্যই এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ '*আর তোমরা তোমাদের সাথে পাথেয় নিয়ে নাও।*' ইকরিমাহ (রহঃ) এবং উয়াইনাও (রহঃ) এ কথাই বলেন। সহীহ্ বুখারী, সুনান নাসাঈ প্রভৃতিতেও এই বর্ণনাগুলি রয়েছে। একটি বর্ণনায় এও রয়েছে যে, ইয়ামানবাসীরা এরূপ করত এবং বলত, 'আমরা আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভরশীল।' (ফাতহুল বারী ৩/৪৪৯, আবূ দাউদ ২/৩০৯) আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে এও বর্ণিত আছে যে, যখন তারা ইহরাম বাঁধতো তখন তাদের কাছে যে পাথেয় থাকত তা তারা ফেলে দিত এবং পুনরায় নতুনভাবে পাথেয় গ্রহণ করত। এ জন্যই তাদের উপর এই নির্দেশ দেয়া হয় যে, তারা যেন এরূপ না করে এবং আটা, ছাতু ইত্যাদি খাদ্য যেন পাথেয় হিসাবে সাথে নেয়। (তাবারী ৪/১৫৬) ইব্‌ন উমার (রাঃ) তো এ কথাও বলেছেন যে, সফরে উত্তম পাথেয় রাখার মধ্যেই মানুষের মর্যাদা নিহিত রয়েছে। সাথীদের প্রতি মন খুলে খরচ করারও তিনি শর্ত আরোপ করতেন।

পরকালের পাথেয়

ইহলৌকিক পাথেয়র বর্ণনার সাথে আল্লাহ তা'আলা পারলৌকিক পাথেয়র প্রস্তুতি গ্রহণের প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অর্থাৎ বান্দা যেন তার কাবর রূপ সফরে আল্লাহ তা'আলার ভয়কে পাথেয় হিসাবে সাথে নিয়ে যায়। যেমন অন্য স্থানে পোশাকের বর্ণনা দিয়ে বলেন ঃ

وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ ٱلتَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ

আল্লাহভীতির পরিচ্ছদই হচ্ছে সর্বোত্তম পরিচ্ছদ। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ২৬) অর্থাৎ বান্দা যেন বিনয়, নম্রতা, আনুগত্য এবং আল্লাহ-ভীরুতার গোপনীয় পোশাক হতে শূন্য না থাকে। এমনকি এই গোপনীয় পোশাক বাহ্যিক পোশাক হতে বহু গুণে শ্রেয়।

বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দুনিয়ায় পাথেয় গ্রহণ করে তা আখিরাতে তার উপকারে আসবে (তাবারানী)। এ

নির্দেশ শুনে একজন দরিদ্র সাহাবী (রাঃ) বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার নিকট তো কিছুই নেই।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'এতটুকু তো রয়েছে যে, তোমাকে কারও কাছে ভিক্ষা করতে হয়না এবং উত্তম পাথেয় হচ্ছে আল্লাহর ভয়।' (ইব্ন আবী হাতিম) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ হে জ্ঞানবানগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর। অর্থাৎ আমার শাস্তি ও পাকড়াওকে ভয় কর এবং তোমরা আমার নির্দেশকে অমান্য করনা। তাহলেই মুক্তি পেয়ে যাবে এবং এটাই হবে জ্ঞানের পরিচায়ক।

১৯৮। তোমরা স্বীয় রবের অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করলে তাতে তোমাদের পক্ষে কোন অপরাধ নেই; অতঃপর যখন তোমরা আ'রাফাত হতে প্রত্যাবর্তিত হও তখন পবিত্র স্মৃতি-স্থানের নিকট আল্লাহকে স্মরণ কর; এবং তিনি তোমাদেরকে যেরূপ নির্দেশ দিয়েছেন তদ্রূপ তাঁকে স্মরণ কর; এবং নিশ্চয়ই তোমরা এর পূর্বে বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।	١٩٨. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَٰتٍ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ

হাজ্জের সময় আর্থিক লেন-দেন করা

সহীহ বুখারীতে এ আয়াতের তাফসীরে আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, অজ্ঞতার যুগে উকায, মিজান্নাহ এবং যুলমাজায্ নামে বাজার ছিল। ইসলাম গ্রহণের পর হাজ্জের সময় সাহাবীগণ (রাঃ) ঐ বাজারগুলিতে ব্যবসা করার ব্যাপারে পাপ হওয়ার ভয় করেন। ফলে তাঁদেরকে অনুমতি দেয়া হয় যে, হাজ্জের মৌসুমে ব্যবসা করলে কোন পাপ নেই। (ফাতহুল বারী ৮/৩৪,

আবূ দাঊদ ২/৩৫০) মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মানসুর ইবনুল মুতামির (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও এরূপই ব্যাখ্যা করেছেন।

আবূ উমামা (রহঃ) বলেন, ইব্ন উমার (রাঃ) জিজ্ঞাসিত হন যে, একটি লোক হাজ্জ করতে যাচ্ছে এবং সাথে সাথে ব্যবসাও করছে তার ব্যাপারে নির্দেশ কি? তখন তিনি এই আয়াতটি পাঠ করে শোনান। (তাবারী ৪/১৬৫)

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, আবূ উমামা তাইমী (রহঃ), ইব্ন উমারকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন, 'হাজ্জে আমরা পশু ভাড়া দিয়ে থাকি, আমাদেরও হাজ্জ হয়ে যাবে কি?' তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'তোমরা কি বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করনা?' তোমরা কি আ'রাফায় অবস্থান করনা?' শাইতানকে কি তোমরা পাথর মারনা? তোমরা কি মাথা মুণ্ডন করনা?' তিনি বলেন, 'এইসব কাজতো আমরা করি।' তখন ইব্ন উমার (রাঃ) বলেন, 'তাহলে জেনে রেখ যে, একটি লোক এই প্রশ্নই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও করেছিল এবং ওরই উত্তরে জিবরাঈল (আঃ) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ এই আয়াতটি নিয়ে অবতরণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন লোকটিকে ডাক দিয়ে বলেন ঃ 'তুমি হাজী, তোমার হাজ্জ হয়ে গেছে।' (আহমাদ ২/১৫৫) অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, আবূ সালিহ (রাঃ) আমিরুল মু'মিনীন উমারকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ আপনি কি হাজ্জের সময় আর্থিক লেন-দেন করে থাকেন ? উত্তরে তিনি বললেন ঃ হাজ্জের সময় কি খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন হয়না ? (তাবাবী ৪/১৬৮)

আ'রাফাহ মাঠে অবস্থান

আ'রাফা ঐ জায়গার নাম যেখানে অবস্থান করা হাজ্জের একটি কাজ। মুসনাদ আহমাদ ইত্যাদি গ্রন্থে রয়েছে, আবদুর রাহমান ইব্ন ইমার আদ দাইলী (রাঃ) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ

'হাজ্জ হচ্ছে আ'রাফায়।' (এ কথা তিনি তিন বার বলেন) যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বেই আ'রাফায় পৌঁছে গেল সে হাজ্জ পেয়ে গেল। আর 'মিনা'য় হচ্ছে তিন দিন। যে ব্যক্তি দু'দিনে তাড়াতাড়ি করল তারও কোন পাপ নেই এবং যে বিলম্ব করল তারও কোন পাপ নেই।' (আহমাদ ৪/৩১০, আবূ দাঊদ ২/৪৮৫, তিরমিযী ৩/৬৩৩, নাসাঈ ৫/২৫৬, ইব্ন মাজাহ ২/১০০৩) আ'রাফায় অবস্থানের সময় হচ্ছে ৯ যিলহাজ্জ তারিখে পশ্চিমে সূর্য হেলে যাওয়া থেকে নিয়ে ১০ যিলহাজ্জ তারিখের ফাজর প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত। কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হাজ্জে যুহরের সালাতের পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এখানে অবস্থান করেছিলেন এবং বলেছিলেন, 'আমার নিকট হতে তোমরা তোমাদের হাজ্জের নিয়মাবলী শিখে নাও।' (মুসলিম ২/৯৪৩) উপরে বর্ণিত হাদীস থেকে জানা গেল, যে ব্যক্তি ১০ যিলহাজ্জের ফাজরের পূর্বে আ'রাফার মাঠে উপস্থিত হতে পারল সে হাজ্জের নিয়ম পালন করল।

উরওয়া ইব্ন মুদাররিস ইব্ন হারিসা ইব্ন লাম আত-তা'য়ী (রাঃ) বলেন ঃ আমি মুজদালিফায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হলাম যখন ফাজরের ওয়াক্ত হয়ে গেছে। আমি তাঁকে বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি তা'ইয়ের দু'টি পাহাড় থেকে এসেছি, আমি এবং আমাকে বহনকারী পশু উভয়েই ক্লান্ত। এমন কোন পাহাড় বাদ রাখিনি যেখানে আমি থামিনি। আমার হাজ্জ করা হয়েছে কি? তিনি বলেন ঃ

'যে ব্যক্তি এখানে আমাদের এই সালাত আদায়ের সময় পৌঁছে যাবে এবং চলার সময় পর্যন্ত আমাদের সাথে অবস্থান করবে, আর এর পূর্বে সে আ'রাফায়ও অবস্থান করে থাকবে, রাতেই হোক বা দিনেই হোক, তাহলে তার হাজ্জ পূরা হয়ে যাবে এবং ফারযিয়াত হতে সে অবকাশ লাভ করবে। (আহমাদ ৪/২৬১, আবূ দাঊদ ২/৪৮৬, তিরমিযী ৩/৬৩৩, নাসাঈ ৫/২৬৪, ইব্ন মাজাহ ২/১০০৪) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) (রহঃ) একে সহীহ বলেছেন।

আমীরুল মু'মিনীন আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ইবরাহীমের (আঃ) নিকট আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈলকে (আঃ) প্রেরণ করেন এবং তিনি তাঁকে হাজ্জ করিয়ে দেন। আ'রাফায় পৌঁছে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন عَرَفْتَ 'আপনি চিনতে পেরেছেন কি?' ইবরাহীম (আঃ) বলেন, আর্‌রাফতু অর্থাৎ 'আমি চিনতে পেরেছি।' কেননা এর পূর্বে আমি এখানে এসেছিলাম।' এ জন্যই এ স্থানের নাম আ'রাফাহ' হয়ে গেছে। (মুসনাদ আবদুর রায্যাক ৫/৯৬) 'আতা (রহঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইব্ন উমার (রাঃ) এবং আবূ মিজলায (রহঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৫১৯) আ'রাফাহর নাম 'মাশ'আরুল হারাম', 'মাশ'আরুল আকসা' এবং 'ইলাল'ও বটে। ঐ পাহাড়কেও আ'রাফাহ বলে যার মধ্যস্থলে 'জাবালুর রাহমাত' রয়েছে।

কখন আ'রাফাহ ও মুজদালিফা ত্যাগ করতে হবে

অজ্ঞতা-যুগের অধিবাসীরাও আ'রাফায় অবস্থান করত। যখন রোদ পর্বত চূড়ায় এরূপভাবে অবশিষ্ট থাকত যেরূপভাবে মানুষের মাথায় পাগড়ী থাকে, তখন

তারা সেখান হতে চলে যেত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্যাস্তের পর সেখান হতে প্রস্থান করেন। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৫১৭) অতঃপর তিনি মুযদালিফায় পৌঁছে সেখানে শিবির স্থাপন করেন এবং দুই ভিন্ন ইকামাতে মাগরিব ও ইশার সালাত আদায় করেন। প্রত্যুষে অন্ধকার থাকতেই ওয়াক্তের প্রথমভাগে তিনি ফাজরের সালাত আদায় করেন। ফাজরের সময়ের শেষ ভাগে তিনি ওখান হতে যাত্রা করেন।

যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত একটি সুদীর্ঘ হাদীসে বিদায় হাজ্জের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। এতে এও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্যাস্ত পর্যন্ত আ'রাফায় অবস্থান করেন। যখন সূর্য লুপ্ত হয় এবং কিঞ্চিৎ হলদে বর্ণ প্রকাশ পায় তখন তিনি নিজের সওয়ারীর উপর উসামা ইব্ন যায়িদকে (রাঃ) পিছনে বসিয়ে নেন। অতঃপর তিনি উষ্ট্রীর লাগাম টেনে ধরেন, ফলে উষ্ট্রীর মাথা গদির নিকটে পৌঁছে যায়। ডান হাতের ইশারায় তিনি জনগণকে বলতে থাকেন ঃ 'হে জনমণ্ডলী! তোমরা ধীরে-সুস্থে ও আরাম-আয়েশের সাথে চল। যখনই তিনি কোন পাহাড়ের সম্মুখীন হন তখন তিনি লাগাম কিছুটা ঢিল দেন যাতে পশুটি সহজে উপরে উঠতে পারে। মুযদালিফায় পৌঁছে তিনি এক আযান ও দুই ইকামাতের মাধ্যমে মাগরিব ও ইশার সালাত আদায় করেন। মাগরিব ও ইশার ফার্‌য সালাতের মধ্যবর্তী সময় কোন সুন্নাত ও নফল সালাত আদায় করেননি। অতঃপর ঘুমানোর জন্য শুইয়ে পড়েন। সুবহি সাদিক প্রকাশিত হওয়ার পর আযান ও ইকামাতের মাধ্যমে ফাজরের সালাত আদায় করেন। তারপর 'কাসওয়া' নামক উষ্ট্রীতে আরোহণ করে 'মাশ'আরে হারামে' আসেন এবং কিবলামুখী হয়ে দু'আ করায় লিপ্ত হন। আল্লাহু আকবার ও *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ* পাঠ করে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও একাত্মতা বর্ণনা করতে থাকেন। তারপর তিনি একটু ঘুমিয়ে পড়েন। সূর্যোদয়ের পূর্বেই তিনি এখান হতে রওয়ানা হন। (মুসলিম ২/৮৮৬) উসামাকে (রাঃ) প্রশ্ন করা হয় ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখান হতে যাওয়ার সময় কোন্ গতিতে চলেন? তিনি উত্তরে বলেন ঃ মধ্যম গতিতে তিনি সওয়ারী চালনা করেন। তবে রাস্তা প্রশস্ত দেখলে কিছু দ্রুত গতিতেও চালাতেন। (ফাতহুল বারী ৩/৬০৫, মুসলিম ২/৯৩৬)

মাশ'আর আল হারামের বর্ণনা

আবদুর রায্যাক তার মুসনাদে বর্ণনা করেছেন, ইব্ন উমার (রাঃ) বলেছেন যে, মুজদালিফার সম্পূর্ণ অংশই মাশ'আরে হারামের অন্তর্ভুক্ত। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৫২১) বর্ণিত আছে যে, ইব্ন উমারকে (রাঃ) মাশ'আরে হারাম (অত্র

আয়াতে উল্লিখিত) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ ইহা হল মুজদালিফার এই পাহাড় এবং এর চারিদিকের এলাকা। (তাবারী ৪/১৭৬) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেছেন যে, মুজদালিফার দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী জায়গা হল মাশ‘আরে হারাম। (ইব্‌ন আবী হাতিম ২/৫২১, ৫২২)

যুবারই ইব্‌ন মুতঈম (রাঃ) হতে ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আ‘রাফার সমস্ত জায়গাই অবস্থান স্থল, তবে ‘উরানাহ’ থেকে দূরে থাকবে। মুজদালিফার সমস্ত জায়গাই অবস্থান করার স্থল। তবে ‘মুহাসসার’ এর মধ্যভাগ থেকে দূরে থাকবে। মাক্কার সমস্ত জায়গাই হচ্ছে কূরবানী করার জায়গা এবং সমস্ত আইয়ামে তাশরীকের দিনগুলি (১১-১৩ যিলহাজ্জ) হচ্ছে কূরবানী করার দিন। (আহমাদ ৪/৮২)

একটি মুরসাল হাদীসে রয়েছে যে, আ‘রাফাহর সমস্ত প্রান্তরই অবস্থান স্থল। আ‘রাফাহ হতে উঠ এবং মুযদালিফার প্রত্যেক সীমাই থামার জায়গা। তবে মুহাস্‌সার উপত্যকাটি নয়। মুসনাদ আহমাদে এর পরে রয়েছে যে, মাক্কার সমস্ত গলিই কুরবানী করার জায়গা এবং ‘আইয়ামে তাশরীকের’ (১১-১৩ যিলহাজ্জ) প্রতিটি দিনই হচ্ছে কুরবানীর দিন। কিন্তু এই হাদীসটিও মুনকাতা’। কেননা সুলাইমান ইব্‌ন মূসা রাশদাক যুবাইর ইব্‌ন মুতঈমকে (রাঃ) পায়নি। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ আল্লাহ তা‘আলাকে স্মরণ কর। কেননা তিনি তোমাদেরকে সুপথ দেখিয়েছেন। হাজ্জের আহকাম বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন এবং ইবরাহীমের (আঃ) এই সুন্নাতকে প্রকাশ করেছেন। অথচ তোমরা এর পূর্বে বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। অর্থাৎ এই সুপথ প্রদর্শনের পূর্বে কিংবা এই কুরআনুল হাকীমের পূর্বে অথবা এই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বে প্রকৃতপক্ষে এই তিনটিরই পূর্বে দুনিয়া ভ্রান্তির মধ্যে ছিল।

১৯৯। অতঃপর অন্যান্যরা যেখান হতে প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও প্রত্যাবর্তন কর এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ	١٩٩. ثُمَّ أَفِيضُوا۟ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُوا۟ ٱللَّهَ ۚ

ক্ষমাশীল, করুণাময়।	إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

আ'রাফাহ মাইদানে অবস্থানের পর ঐ স্থান ত্যাগ করার নির্দেশ

আ'রাফায় অবস্থানকারীদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারা এখান থেকে মুযদালিফায় যাবে, যেন 'মাশ'আরে হারামের' নিকট আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করতে পারে। এটাও তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, কুরাইশরাও সমস্ত লোকের সাথে আ'রাফায় অবস্থান করবে, যেমন সর্বসাধারণ এখানে অবস্থান করত। পূর্বে কুরাইশরা তাদের গৌরব ও আভিজাত্য প্রকাশের জন্য মুজদালিফায় অবস্থান করত এবং অন্যরা আ'রাফাহ মাঠের সীমার বাইরে যেতনা।

সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, কুরাইশ ও তাদের মতানুসারী লোকেরা মুযদালিফায়ই থেমে যেত এবং নিজেদের নাম حَمَس রাখত। অবশিষ্ট সমস্ত আরাববাসী আ'রাফায় গিয়ে অবস্থান করত এবং ওখান হতে ফিরে আসত। এ জন্যই ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে যে, সর্বসাধারণ যেখান হতে প্রত্যাবর্তন করত, তোমরা সেখান হতে প্রত্যাবর্তন কর। (ফাতহুল বারী ৮/৩৫) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), 'আতা (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) প্রভৃতি মনীষীও এটাই বলেন। (তাবারী ৪/১৮৬, ১৮৭) ইমাম ইব্ন জারীরও (রহঃ) এই তাফসীরই পছন্দ করেছেন এবং বলেছেন যে, এর উপর 'ইজমা' রয়েছে।

বর্ণিত আছে যে, যুবাইর ইব্ন মুতইম (রাঃ) বলেন ঃ 'আমার উট আ'রাফায় হারিয়ে যায়, আমি উটটি খুঁজতে বের হই। সেখানে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবস্থানরত অবস্থায় দেখতে পাই। আমি বলি, 'এটা কেমন কথা যে, ইনি হচ্ছেন حَمَس, অথচ 'হারামের' বাইরে এসে অবস্থান করছেন।' (আহমাদ ৪/৮০, ফাতহুল বারী ৩/৬০২, মুসলিম ২/৮৯৪) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এখানে إِفَاضَة শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে প্রস্তর নিক্ষেপের উদ্দেশে মুযদালিফা হতে মিনায় যাওয়া। (ফাতহুল বারী ৮/৩৫) আর اَلنَّاسُ শব্দ দ্বারা ইবরাহীমকে (আঃ) বুঝানো হয়েছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা

অতঃপর ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, যার নির্দেশ সাধারণতঃ ইবাদাতের পরে দেয়া হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফার্‌য সালাত সমাপ্ত করার পর তিনবার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন (মুসলিম ১/৪১৪) তিনি জনসাধারণকে 'সুবহানাল্লাহি' 'আল হামদুলিল্লাহি' এবং 'আল্লাহু আকবার' তেত্রিশ বার করে পড়ার নির্দেশ দিতেন (ফাতহুল বারী ২/৩৭৮, মুসলিম ১/৪১৭) ইমাম বুখারী (রহ) ইব্‌ন মারদুআহ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, সাদ্দাদ ইবন আউস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সমুদয় ক্ষমা প্রার্থনার নেতা হচ্ছে নিম্নের এই প্রার্থনাটি ঃ

اَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْــتَـــنِي، وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْــتَطَعْتُ، وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ.

হে আল্লাহ! তুমি আমার রাব্ব, তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমারই বান্দা। আমি যথাসাধ্য তোমার সাথে কৃত প্রতিজ্ঞা পালনে বদ্ধ পরিকর। আমি যা করেছি তার খারাপ প্রভাব থেকে বাঁচার জন্য তোমার আশ্রয় চাই। তুমি আমাকে যে সব নি'আমাত দান করেছ আমি তা স্বীকার করছি। আমি আমার অপরাধও স্বীকার করছি। অতএব আমাকে ক্ষমা কর। কেননা তুমি ছাড়া পাপ ক্ষমা করার আর কেহ নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এই দু'আটি রাতে পাঠ করবে, যদি সে সেই রাতেই মারা যায় তাহলে সে অবশ্যই জান্নাতী হবে। আর যে ব্যক্তি এটি দিনে পাঠ করবে, যদি ঐ দিনই সে মৃত্যুবরণ করে তাহলে অবশ্যই সে জান্নাতী হবে। (ফাতহুল বারী ১১/১০০) আবূ বাকর (রাঃ) একদা বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকে কোন একটি দু'আ শিখিয়ে দিন যা আমি সালাতে পাঠ করব।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আপনি বলুন ঃ

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

'হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের নাফসের উপর অনেক যুল্ম করেছি। তুমি ছাড়া পাপ মোচনকারী আর কেহ নেই। অতএব হে আল্লাহ! অনুগ্রহ করে আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার প্রতি দয়া কর। নিশ্চয়ই তুমি দয়ালু ও সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমাকারী।' (ফাতহুল বারী ১৩/৪৮৪, মুসলিম ৪/২০৭৮)

২০০। অনন্তর যখন তোমরা তোমাদের (হাজ্জের) অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন করে ফেল তখন যেরূপ তোমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে স্মরণ করতে তদ্রুপ আল্লাহকে স্মরণ কর, বরং তদপেক্ষা দৃঢ়তরভাবে স্মরণ কর; কিন্তু মানবমন্ডলীর মধ্যে কেহ কেহ এরূপ আছে যারা বলে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে ইহকালেই দান কর এবং তাদের জন্য আখিরাতে কোনই অংশ নেই।	٢٠٠. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَٰسِكَكُمْ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَآءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنْ خَلَٰقٍ
২০১। আর তাদের মধ্যে কেহ কেহ বলে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দান করুন ও আখিরাতে কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে আমাদেরকে রক্ষা করুন।	٢٠١. وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ
২০২। তারা যা অর্জন করেছে, তাদের জন্য তারই	٢٠٢. أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا

Contents

كَسَبُوا۟ ۚ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ	অংশ রয়েছে এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ সত্বর হিসাব গ্রহণকারী।

হাজ্জের আহকামসমূহ পালন করার পর ইহকাল ও পরকালের ভালাইর জন্য প্রার্থনা করা

এখানে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দেন ঃ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءكُمْ 'হাজ্জ সমাপনের পর খুব বেশি করে আল্লাহকে স্মরণ কর। প্রথম বাক্যের একটি অর্থ এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, শিশু যেমন তার পিতা-মাতাকে স্মরণ করে ঐরূপ তোমরাও আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ কর। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, অজ্ঞতার যুগের লোকেরা হাজ্জের সময় অবস্থানের স্থানে অবস্থান করত। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ জাহিলিয়াতের আমলে লোকেরা হাজ্জের মাঠে উপস্থিত হত এবং তাদের একজন বলত ঃ আমার বাবা (গরীব লোকদেরকে) খাদ্য প্রদান করত, লোকদেরকে (টাকা-পয়সা দিয়ে) সাহায্য করত, রক্তপণ আদায় করত ইত্যাদি ইত্যাদি। তাদের পূর্ব-পুরুষদের ভাল ভাল কাজকে স্মরণ করে বলাবলি করাই ছিল তাদের যিক্র। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি নাযিল করেন, 'তোমরা যেমন তোমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে স্মরণ করতে অনুরূপ আল্লাহকে আরও বেশি স্মরণ কর।'

অতএব এভাবে আল্লাহর উচ্চ মর্যাদা এবং তাঁর মহানত্ত্ব বেশি স্মরণ করার জন্য অধিক উৎসাহিত করা হয়েছে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ যখন কোন আয়াতাংশে 'বরং' শব্দটি ব্যবহার করেন তখন ধরে নিতে হবে যে, তাঁর বান্দারা যেন ঐ কাজটি আরও বেশি করে। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহে নিপতিত হওয়ার কারণ নেই যে, পিতৃ-পুরুষদেরকে স্মরণ করার চেয়ে অবশ্যই আল্লাহকে বেশি স্মরণ করতে হবে। এ ধরণের তুলনামূলক কয়েকটি আয়াতের উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

فَهِيَ كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً

অনন্তর তোমাদের হৃদয় প্রস্তরের ন্যায় কঠিন, বরং কঠিনতর হল। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৭৪)

Contents

تَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً

আল্লাহকে যেরূপ ভয় করবে তদ্রুপ মানুষকে ভয় করতে লাগল। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৭৭)

وَأَرْسَلْنَٰهُ إِلَىٰ مِاْئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ

তাকে আমি লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ১৪৭)

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ

ফলে তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল, অথবা তারও কম। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ৯) অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا খুব বেশি বেশি আল্লাহর যিক্র করার পর তাঁর কাছে চাইতে থাক। কেননা এটা হচ্ছে প্রার্থনা কবূলের সময়।’ সাথে সাথে ঐ সব লোকের অমঙ্গল কামনা করা হচ্ছে যারা আল্লাহর নিকট শুধু দুনিয়া লাভের জন্যই প্রার্থনা জানিয়ে থাকে এবং আখিরাতের দিকে ভ্রুক্ষেপই করেনা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, তাদের জন্য পরকালে কোনই অংশ নেই। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, কতগুলি পল্লীবাসী এখানে অবস্থান করে শুধুমাত্র এই প্রার্থনা করত, ‘হে আল্লাহ! এই বছর ভালভাবে বৃষ্টি বর্ষণ করুন যেন ফসল ভাল জন্মে এবং বহু সন্তান দান করুন ইত্যাদি।’ কিন্তু মু’মিনদের প্রার্থনা উভয় জগতের মঙ্গলের জন্যই হত। এ জন্যই তাদের প্রশংসা করা হয়েছে। এই প্রার্থনার মধ্যে ইহজগত ও পরজগতের সমুদয় মঙ্গল একত্রিত করা হয়েছে এবং সমস্ত অমঙ্গল হতে ক্ষমা চাওয়া হয়েছে। কেননা দুনিয়ার মঙ্গলের মধ্যে নিরাপত্তা, শান্তি, সুস্থতা, পরিবার পরিজন, খাদ্য, শিক্ষা, যানবাহন, দাস-দাসী, চাকর-চাকরানী এবং সম্মান ইত্যাদি সব কিছুই এসে গেল। আর আখিরাতের মঙ্গলের মধ্যে হিসাব সহজ হওয়া, ভয়, ত্রাস হতে মুক্তি পাওয়া, আমলনামা ডান হাতে পাওয়া এবং সম্মানের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করা ইত্যাদি সব কিছুই এসে গেল। এর পরে জাহান্নামের শাস্তি হতে মুক্তি চাওয়া। এর ভাবার্থ এই যে, এরূপ কারণসমূহ আল্লাহ তা‘আলা প্রস্তুত করে দিবেন। যেমন যারা অবৈধ কাজ করে থাকে তা থেকে তারা বিরত থাকবে এবং পাপ কাজ পরিত্যাগ করবে, সন্দেহমূলক কাজ থেকে দূরে থাকবে ইত্যাদি। কাসিম ইব্ন আবদুর রাহমান (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী অন্তর, যিক্রকারী জিহ্বা এবং ধৈর্যধারণকারী দেহ লাভ করেছে সে দুনিয়া ও

আখিরাতের মঙ্গল পেয়ে গেছে এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে মুক্তি লাভ করেছে। (ইব্‌ন আবী হাতিম ২/৫৪২)

সহীহ বুখারীতে রয়েছে, আনাস ইব্‌ন মালিক (রহঃ) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়ই নিম্নের দু'আটি পাঠ করতেন ঃ

اَللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

'হে আল্লাহ, হে আমার রাব্ব! তুমি আমাকে তা দান কর যাতে রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য মঙ্গল, আর আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর।' (ফাতহুল বারী ৮/৩৫)

আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) অন্যত্র বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন মুসলিম রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যান। তিনি দেখতে পান যে, রুগ্ন ব্যক্তিটি ছোট পাখির মত একেবারে ক্ষীণ হয়ে গেছেন এবং শুধু মাত্র অস্থির কাঠামো অবশিষ্ট রয়েছে। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন ঃ তুমি আল্লাহ তা'আলার নিকট কোন প্রার্থনা জানাচ্ছিলে কি?' তিনি বলেন ঃ 'হ্যাঁ, আমি এই প্রার্থনা করছিলাম ঃ 'হে আল্লাহ! আপনি পরকালে আমাকে যে শাস্তি দিতে চান সেই শাস্তি দুনিয়ায়ই দিয়ে দিন।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'সুবহানাল্লাহ! কারও মধ্যে ঐ শাস্তি সহ্য করার ক্ষমতা আছে কি? তুমি নিম্নের দু'আটি পড়নি কেন?'

سُبْحَانَ اللَّهِ لاَ تُطِيْقُهُ أَوْ لاَ تَسْتَطِيْعُهُ فَهَلاَّ قُلْتَ : رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

সুতরাং রুগ্ন ব্যক্তি তখন থেকে ঐ দু'আটিই পড়তে থাকেন এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আরোগ্য দান করেন। (মুসলিম ৪/২০৬৮, আহমাদ ৩/১০৭)

এক ব্যক্তি ইব্‌ন আব্বাসকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করে ঃ 'আমি একটি যাত্রী দলের সেবার কাজে এই পারিশ্রমিকের উপর নিযুক্ত হয়েছি যে, তারা আমাকে তাদের সোয়ারীর উপর উঠিয়ে নিবে এবং হাজ্জের সময় তারা আমাকে হাজ্জ করার অবকাশ দিবে ও অন্যান্য দিন আমি তাদের সেবার কাজে নিয়োজিত থাকব। তাহলে বলুন, এভাবে আমার হাজ্জ আদায় হবে কি? তিনি উত্তরে বলেন ঃ হ্যাঁ, বরং তুমি তো ঐ লোকদেরই অন্তর্ভুক্ত যাদের সম্বন্ধে কুরআনুম মাজীদে أُولَـئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ *তারা যা অর্জন*

করেছে তাদের জন্য তারই অংশ রয়েছে এই আয়াতটি ঘোষিত হয়েছে। (মুসতাদরাক হাকিম ২/২৭৭) সহীহাইনের শর্তে এ হাদীসটি সহীহ।

২০৩। এবং নির্ধারিত দিনসমূহে আল্লাহকে স্মরণ কর; অতঃপর কেহ যদি দু' দিনের মধ্যে (মাক্কায় ফিরে যেতে) তাড়াহুড়া করে তাহলে তার জন্য কোন পাপ নেই। পক্ষান্তরে কেহ যদি দু' দিন বিলম্ব করে তাহলে তার জন্যও পাপ নেই এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও জেনে রেখ যে, তোমাদের সকলকে তাঁরই সন্নিধানে সমবেত করা হবে।	٢٠٣. وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْدُودَٰتٍ ۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ ٱتَّقَىٰ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

তাশরীকের দিনগুলিতে বেশি বেশি আল্লাহর যিক্র করতে হবে

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আইয়ামে তাশরীকের দিনগুলি (১১-১৩ যিলহাজ্জ) হচ্ছে নির্দিষ্ট এবং (যিলহাজ্জের প্রথম) দশ দিন তো সকলেরই জানা আছে। (কুরতুবী ৩/৩) ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, 'নির্ধারিত দিনগুলিতে আল্লাহকে স্মরণ কর' এর অর্থ হচ্ছে প্রত্যেক ফারয সালাত আদায় করার পর তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলা। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৫৪৫)

উকবাহ ইব্ন আমীর (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আ'রাফার দিন (৯ যিলহাজ্জ), কুরবানীর দিন (১০ যিলহাজ্জ) এবং তাশরীকের দিনগুলি (১১-১৩ যিলহাজ্জ) হল আমাদের মুসলিমদের জন্য খুশির দিন। এ দিনগুলি হচ্ছে খাওয়া ও পান করার দিন। (আহমাদ ৪/১৫২) অন্য হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'আইয়ামে তাশরীক হচ্ছে খাওয়া, পান করা ও আল্লাহকে স্মরণ করার দিন।' (আহমাদ ৫/৭৫, মুসলিম ২/৮০০) ইতোপূর্বে এই হাদীসটিও বর্ণিত হয়েছে ঃ

আ'রাফার সমস্ত জায়গাই হচ্ছে অবস্থানের জায়গা এবং আইয়ামে তাশরীক সবই হচ্ছে কুরবানীর দিন।' (আহমাদ ৪/৮২) এই হাদীসটিও পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মিনার দিন হচ্ছে তিনটি। দু'দিনে তাড়াতাড়িকারী বা বিলম্বকারীর জন্য কোন পাপ নেই। (আবূ দাঊদ ২/৪৮৫) ইব্ন জারীরের একটি হাদীসে রয়েছে ঃ

'আইয়ামে তাশরীক হচ্ছে খাওয়া, পান করা ও আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করার দিন।' ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ ইব্ন হুযাইফাকে (রাঃ) এই উদ্দেশে প্রেরণ করেন যে, তিনি যেন মিনার চতুর্দিকে ঘুরে ঘোষণা করেন ঃ 'এই দিনগুলিতে কেহ যেন সিয়াম পালন না করে। এই দিনগুলি হচ্ছে খাওয়া, পান করা ও আল্লাহকে স্মরণ করার দিন।' (তাবারী ৪/২১১)

'নির্দিষ্ট দিন' কী

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدَت হচ্ছে اَيَّامِ تَشْرِيْق এবং এ হচ্ছে চার দিন। ১০ যিলহাজ্জ ও তার পরবর্তী তিন দিন। অর্থাৎ ১০ যিলহাজ্জ হতে ১৩ যিলহাজ্জ পর্যন্ত। (তাবারী ৪/২১৩) ইব্ন উমার (রাঃ), ইব্ন যুবাইর (রাঃ), আবূ মূসা আশআরী (রাঃ), 'আতা (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আবূ মালিক (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবী কাসীর (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), যুহরী (রহঃ), রাবী' ইব্ন আনাস (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ), 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ), ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (রহঃ) প্রভৃতি মনীষীও এটাই বলেন। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৫৪৭-৫৪৯)

আলী (রাঃ) বলেন ঃ 'এ হচ্ছে তিন দিন ১০, ১১, ও ১২ যিলহাজ্জ। এই তিন দিনের মধ্যে যে দিন ইচ্ছা কুরবানী কর। কিন্তু উত্তম হচ্ছে প্রথম দিন।' কিন্তু পূর্ব উক্তিটিই প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে। তাছাড়া পবিত্র কুরআনের শব্দ দ্বারাও এটাই সাব্যস্ত হচ্ছে। কেননা বলা হয়েছে যে, দু'দিনের তাড়াতাড়ি ও বিলম্ব ক্ষমার্হ। কাজেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, ঈদের পরে তিন দিন হওয়াই উচিত এবং এই দিনগুলিতে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করার সময় হচ্ছে কুরবানীর পশু যবাহ করার সময়।

অনুরূপভাবে ভাবার্থ এও হতে পারে যে, শাইতানদের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপের সময় আল্লাহর যিক্র করতে হবে। তা হবে আইয়ামে তাশরীকের প্রত্যেক দিনেই। হাদীসে রয়েছে ঃ

'বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করা, সাফা মারওয়ায় দৌড়ান, শাইতানদের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ ইত্যাদি সমস্ত কাজই হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র প্রতিষ্ঠার জন্য।' (আবূ দাঊদ ২/৪৪৭) যেহেতু আল্লাহ তা'আলা হাজ্জের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রত্যাবর্তনের উল্লেখ করেন এবং পরে মানুষ এসব পবিত্র ভূমি ছেড়ে নিজ নিজ শহরে ও গ্রামে ফিরে যাবে, এজন্য ইরশাদ হচ্ছে, 'তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং বিশ্বাস রেখ যে, তোমাদেরকে তাঁরই সম্মুখে একত্রিত করা হবে। তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে রেখেছেন, আবার তিনিই তোমাদেরকে একত্রিত করবেন। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى ذَرَأَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে বিস্তৃত করেছেন এবং তোমাদেরকে তাঁরই নিকট একত্রিত করা হবে। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৭৯)

২০৪। এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে যার পার্থিব জীবন সংক্রান্ত কথা তোমাকে চমৎকৃত করে, আর সে নিজের (অন্তরস্থ সততা) সম্বন্ধে আল্লাহকে সাক্ষী করে থাকে, কিন্তু বস্তুতঃ সে হচ্ছে কঠোর কলোহ পরায়ণ ব্যক্তি।	٢٠٤. وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُۥ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِى قَلْبِهِۦ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ
২০৫। যখন সে প্রত্যাবর্তন করে তখন তার উদ্দেশ্য থাকে দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি করা এবং শস্য-ক্ষেত্র ও জীব-জন্তু বিনাশ করা; এবং আল্লাহ অশান্তি ভালবাসেননা।	٢٠٥. وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِى ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ
২০৬। যখন তাকে বলা হয়, তুমি আল্লাহকে ভয়	٢٠٦. وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ

أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ ۚ فَحَسْبُهُۥ جَهَنَّمُ ۚ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ	কর, তখন প্রতিপত্তির অহমিকা তাকে অধিকতর অনাচারে লিপ্ত করে। অতএব জাহান্নামই তার জন্য যথেষ্ট এবং নিশ্চয়ই ওটা নিকৃষ্ট আশ্রয় স্থল।
٢٠٧. وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ رَءُوفٌۢ بِٱلْعِبَادِ	২০৭। পক্ষান্তরে কোন কোন লোক এরূপ আছে যে আল্লাহর সন্তুষ্টি সাধনের জন্য আত্মবির্সজন করে, এবং আল্লাহ হচ্ছেন সমস্ত বান্দার প্রতি স্নেহ-পরায়ণ।

মুনাফিকদের চরিত্র

সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াতগুলি আখনাস ইব্ন শারীক সাকাফীর সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়। এই লোকটি মুনাফিক ছিল। প্রকাশ্যে সে মুসলিম ছিল বটে, কিন্তু ভিতরে সে মুসলিমদের বিরোধী ছিল। (তাবারী ৪/২২৯) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ আয়াতগুলি ঐ মুনাফিকদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয় যারা খুবাইব (রাঃ) ও তাঁর সঙ্গীদের দুর্নাম করেছিল, যাঁদেরকে 'রাজী' নামক স্থানে শহীদ করা হয়েছিল। এই শহীদগণের প্রশংসায় শেষের আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং পূর্বের আয়াতগুলি মুনাফিকদের নিন্দা করে অবতীর্ণ হয়। কেহ কেহ বলেন যে, আয়াতগুলি সাধারণ। প্রথম তিনটি আয়াত সমস্ত মুনাফিকদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয় এবং চতুর্থ আয়াতটি সমুদয় মুসলিমের প্রশংসায় অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ৫/২৩০) কাতাদাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) প্রমুখ মনীষীর উক্তি এটাই এবং এটাই সঠিক। নাওফ বাককালী (রহঃ) যিনি তাওরাত ও ইঞ্জীলেরও পণ্ডিত ছিলেন, বলেন ঃ 'আমি এই উম্মাতের কতকগুলো লোকের মন্দ-গুণ আল্লাহ তা'আলার অবতারিত গ্রন্থের মধ্যেই পেয়েছি। বর্ণিত আছে যে, কতকগুলো লোক প্রতারণা করে দুনিয়া কামাচ্ছে। তাদের কথা তো মধুর চেয়েও মিষ্টি, কিন্তু তাদের অন্তর নিম অপেক্ষাও তিক্ত। মানুষকে দেখানোর জন্য তারা ছাগলের চামড়া

পরিধান করে, কিন্তু তাদের অন্তর নেকড়ে বাঘের ন্যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমার উপর সে বীরত্ব প্রকাশ করে এবং আমার সাথে প্রতারণা করে। আমার সত্ত্বার শপথ! আমি তার প্রতি এমন পরীক্ষা পাঠাব যে, সহিষ্ণু লোকেরাও হতভম্ব হয়ে যাবে।''

কুরতুবী (রহঃ) বলেন, 'আমি খুব চিন্তা-গবেষণা করে বুঝতে পারলাম যে, এগুলো মুনাফিকদের বিশেষণ। কুরআনুল হাকীমেও এটা বিদ্যমান রয়েছে।' অতঃপর তিনি وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (২ ঃ ২০৪) এই আয়াতগুলি পাঠ করেন। (তাবারী ৪/২৩২)

'তারা জনসাধারণের সামনে নিজেদের মনের দুষ্টামি গোপন করলেও আল্লাহর সামনে তাদের অন্তরের কুফরী প্রকাশমান'। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ

তারা মানব হতে গোপন করতে চায়, কিন্তু আল্লাহ হতে গোপন করতে পারেনা। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১০৮)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এর অর্থ বর্ণনা করেন, 'মানুষের সামনে তারা ইসলাম প্রকাশ করে এবং আল্লাহর শপথ করে বলে যে, তারা মুখে যা বলছে তাই তাদের অন্তরেও রয়েছে।' আয়াতের সঠিক অর্থ এটাই বটে। আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) হতেও এই অর্থই বর্ণিত আছে। ইমাম ইব্ন জারীরও (রহঃ) এই অর্থই পছন্দ করেছেন। (তাবারী ৪/২৩৩) যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَتُنذِرَ بِهِۦ قَوْمًا لُّدًّا

যাতে তুমি ওটা দ্বারা বিতন্ডা প্রবণ সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৯৭) মুনাফিকদের অবস্থাও তদ্রূপ। তারা প্রমাণ স্থাপনে মিথ্যা বলে, সত্য হতে সরে যায়, সরল ও সঠিক কথা ছেড়ে দিয়ে মিথ্যার আশ্রয় নেয় এবং গালি দিয়ে থাকে। বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে ঃ

'মুনাফিকদের অবস্থা তিনটি। (১) কথা বললে মিথ্যা বলে। (২) অঙ্গীকার করলে তা ভঙ্গ করে। (৩) কোন বিষয়ে বিবাদ হলে সে গালাগালি করে।' (ফাতহুল বারী ১/১১১) অন্য একটি হাদীসে রয়েছে ঃ

‘আল্লাহ তা‘আলার নিকট অতি মন্দ ঐ ব্যক্তি যে অত্যন্ত ঝগড়াটে।’ (ফাতহুল বারী ৮/৩৬) অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে, এরা যেমন কটু ও কর্কশ ভাষী তেমনি এদের কার্যাবলীও অতি জঘন্য। তাদের কাজ তাদের কথার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের আকীদা বা বিশ্বাস একেবারেই অসৎ। এখানে سَعٰى শব্দটির অর্থ হচ্ছে ‘ইচ্ছা করা’। এ শব্দটি ফির‘আউনের বেলায়ও ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ. فَحَشَرَ فَنَادَىٰ. فَقَالَ أَنَا۠ رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ. فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْأَخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰٓ. إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰٓ

অতঃপর সে পশ্চাৎ ফিরে প্রতিবিধানে সচেষ্ট হল। সে সকলকে সমবেত করল এবং উচ্চস্বরে ঘোষণা করে বলল ঃ আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ রাব্ব। ফলে আল্লাহ তাকে ধৃত করলেন আখিরাতের ও ইহকালের দন্ডের নিমিত্ত। যে ভয় করে তার জন্য অবশ্যই এতে শিক্ষা রয়েছে। (সূরা নাযি‘আত, ৭৯ ঃ ২২-২৬) এ ছাড়াও এ শব্দটি নিম্ন আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ

হে মু’মিনগণ! জুমু’আর দিন যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও। (সূরা জুমুআ’হ, ৬২ ঃ ৯) অর্থাৎ (সালাতের জন্য যখন আহ্বান করা হয় তখন) মন স্থির কর এবং জুমু‘আর সালাত আদায় করার জন্য অগ্রসর হও। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি যে, সালাত আদায় করার জন্য ধাবিত হওয়ার ব্যাপারে (তাড়াহুড়া) হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। এখানে سَعْى শব্দটির অর্থ দৌড়ান নয়। কেননা সালাতের জন্য দৌড়িয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ। হাদীসে রয়েছে ঃ

‘যখন তোমরা সালাতের জন্য আগমন কর তখন আরাম ও স্বস্তির সাথে এসো।’ (মুসলিম ১/৪২০) অতএব অর্থ এই যে, মুনাফিকদের উদ্দেশ্য হচ্ছে পৃথিবীর বুকে অশান্তি সৃষ্টি করা এবং শস্যক্ষেত্র ও জীব-জন্তু বিনষ্ট করা।

মুনাফিকরা পৃথিবীতে কিছুই করতে পারেনা একমাত্র ক্ষতির কারণ ছাড়া। তাদের কার্যাবলির জন্য ফসলের ক্ষতি হয় এবং মানব-সন্তান ও পশু-পাখি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, ফলে মানুষ পশুর সাহায্যে যে সমস্ত খাদ্য প্রাপ্ত হয় তা থেকেও বঞ্চিত

হয়। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, মুনাফিকরা যখন পৃথিবীতে অনাসৃষ্টি করে তখন আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করে দেন, ফলে ফল-ফসল এবং মানব-সন্তান ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। মুজাহিদ (রহঃ) হতে এই অর্থও বর্ণিত আছে যে, ঐ মুনাফিকদের শঠতা ও অন্যায় কার্যকলাপের ফলে আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি বন্ধ করে দেন, ফলে শস্যক্ষেত্র ও জীব-জন্তুর ক্ষতি সাধন হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা এই ধরনের বিবাদ ও অশান্তি সৃষ্টিকারীদেরকে মোটেই ভালবাসেননা।

মুনাফিকরা উপদেশ গ্রহণ করেনা

এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, দুষ্ট ও অসদাচরণকারীদেরকে যখন উপদেশের মাধ্যমে বুঝানো হয় তখন তারা আরো উত্তেজিত হয়ে উঠে এবং বিরোধিতার উত্তেজনায় পাপ কাজে আরও বেশি লিপ্ত হয়ে পড়ে। অন্যত্র এ ধরনের আরও আয়াত রয়েছে ঃ

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتُنَا بَيِّنَـٰتٍ تَعْرِفُ فِى وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلْمُنكَرَ ۖ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِنَا ۗ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكُمُ ۗ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ

এবং তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হলে তুমি কাফিরদের মুখমন্ডলে অসন্তোষের লক্ষণ দেখবে; যারা তাদের নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করে তাদেরকে তারা আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। তুমি বল ঃ তাহলে কি আমি তোমাদেরকে এটি অপেক্ষা অন্য কিছুর সংবাদ দিব? ওটা আগুন; এ বিষয়ে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কাফিরদেরকে এবং ওটা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল! (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৭২) এখানেও বলা হচ্ছে যে, মুনাফিকদের জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট এবং নিশ্চয়ই ওটা নিকৃষ্ট আশ্রয় স্থল।

মু'মিনরা আল্লাহকে খুশি করার জন্য উম্মুখ থাকে

মুনাফিকদের জঘন্য চরিত্রের বর্ণনা দেয়ার পর এখন মু'মিনদের প্রশংসা করা হচ্ছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), আনাস (রাঃ), সাঈদ ইব্ন মুসাঈব (রহঃ), আবূ উসমান আন নাহদী (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াতটি সুহাইব ইব্ন সিনান আর-রুমীর (রাঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি মাক্কায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি মাদীনায় হিজরাত করতে চাইলে মাক্কার কাফিরেরা তাঁকে বলে, 'আমরা তোমাকে ধন-সম্পদ নিয়ে মাদীনা যেতে

দিবনা। তুমি ধন-সম্পদ ছেড়ে গেলে যেতে পার। তিনি সমস্ত সম্পদ পৃথক করেন এবং কাফিরেরা তাঁর ঐ সম্পদ অধিকার করে নেয়। সুতরাং তিনি ঐ সব সম্পদ ছেড়ে দিয়েই মাদীনায় হিজরাত করেন। উমার (রাঃ) ও সাহাবীগণের একটি বিরাট দল তাঁর অভ্যর্থনার জন্য 'হুররা' নামক স্থান পর্যন্ত এগিয়ে আসেন এবং তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন ঃ 'আপনি বড়ই উত্তম ও লাভজনক ব্যবসা করেছেন।' এ কথা শুনে তিনি বলেন ঃ 'আপনাদের ব্যবসায়েও যেন আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত না করেন। আচ্ছা বলুন তো, এই অভিনন্দনের কারণ কি?' ঐ মহান ব্যক্তিগণ বলেন ঃ 'আপনার সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে।' তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পৌঁছলে তিনিও তাঁকে সুসংবাদ প্রদান করে বলেন ঃ তোমার ব্যবসা সাফল্যমন্ডিত হয়েছে হে সুহাইব! (তাবারী ৪/২৪৮)

অধিকাংশ মুফাস্সিরের এও উক্তি রয়েছে যে, এই আয়াতটি সাধারণ প্রত্যেক মুজাহিদের ব্যাপারেই প্রযোজ্য। যেমন অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ۚ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِ ۚ فَٱسْتَبْشِرُوا۟ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِۦ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

নিঃসন্দেহে আল্লাহ মু'মিনদের নিকট থেকে তাদের প্রাণ ও তাদের ধন সম্পদসমূহকে এর বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন যে, তাদের জন্য জান্নাত রয়েছে, তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, যাতে তারা (কখনও) হত্যা করে এবং (কখনও) নিহত হয়, এর কারণে (জান্নাত প্রদানের) সত্য অঙ্গীকার করা হয়েছে তাওরাতে, ইঞ্জীলে এবং কুরআনে। নিজের অঙ্গীকার পালনকারী আল্লাহ অপেক্ষা অধিক আর কে আছে? অতএব তোমরা আনন্দ করতে থাক তোমাদের এই ক্রয় বিক্রয়ের উপর, যা তোমরা সম্পাদন করেছ, আর এটা হচ্ছে বিরাট সফলতা। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১১১) হিশাম ইব্ন আমর (রাঃ) যখন কাফিরদের দু'টি ব্যূহ ভেদ করে তাদের মধ্যে ঢুকে পড়েন এবং একাকীই তাদের উপর আক্রমণ চালান তখন কতকগুলি মুসলিম তাঁর এই আক্রমণকে শারীয়াত বিরোধী মনে করেন। কিন্তু উমার (রাঃ) এবং আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীগণ এর প্রতিবাদ

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَاللّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ করেন এবং (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২০৭) এই আয়াতটি পাঠ করে শোনান।

২০৮। হে মু'মিনগণ! তোমরা পূর্ণ রূপে ইসলামে প্রবিষ্ট হও এবং শাইতানের পদাংক অনুসরণ করনা, নিশ্চয়ই সে তোমাদের জন্য প্রকাশ্য শত্রু।	٢٠٨. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
২০৯। অতঃপর স্পষ্ট দলীল প্রমাণাদি তোমাদের নিকট সমাগত হওয়ার পরেও যদি তোমরা পদস্খলিত হয়ে যাও তাহলে জেনে রেখ, আল্লাহ হচ্ছেন মহাপরাক্রান্ত, বিজ্ঞানময়।	٢٠٩. فَإِن زَلَلْتُم مِّنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ ٱلْبَيِّنَـٰتُ فَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

পুরাপুরি ইসলামে আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে

আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপরে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণকে ও তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতা স্বীকারকারীগণকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন তাঁর সমস্ত নির্দেশ মেনে চলে এবং সমস্ত নিষিদ্ধ বিষয় হতে বিরত থাকে ও পূর্ণ শারীয়াতের উপর আমল করে। আল আউফী (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), তাউস (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেছেন যে, سِلْمٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে ইসলাম। (তাবারী ৪/২৫২, ইব্ন আবী হাতিম ২/৫৮৪-৫৮৫) ভাবার্থ আনুগত্য ও সততাও হতে পারে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), আবুল আলীয়া (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ),

মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং যাহ্‌হাক (রহঃ) তাদের তাফসীরে বর্ণনা করেছেন যে, كَافَّةً শব্দের অর্থ হচ্ছে 'সব কিছু' ও 'পরিপূর্ণ।' (ইব্‌ন আবী হাতিম ২/৫৮৬-৫৮৮) বিভিন্ন মহান ব্যক্তি যাঁরা ইয়াহুদী হতে মুসলিম হয়েছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট তারা আবেদন জানিয়েছিলেন যে, তাদেরকে যেন শনিবার উৎসবের দিন হিসাবে পালন করার ও রাতে তাওরাতের উপর আমল করার অনুমতি দেয়া হয়। সেই সময় এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তাদেরকে বলা হয়, ইসলামের নির্দেশাবলীর উপরেই আমল করতে হবে। অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ

إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوٓءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

সে এতদ্ব্যতীত তোমাদেরকে আদেশ করে শাইতানী ও অশ্লীল কাজ করতে এবং আল্লাহ সম্বন্ধে তোমরা যা জাননা তা বলতে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৬৯) এবং

إِنَّمَا يَدْعُوا۟ حِزْبَهُۥ لِيَكُونُوا۟ مِنْ أَصْحَـٰبِ ٱلسَّعِيرِ

সে তো তার দলবলকে আহ্বান করে শুধু এ জন্য যে, তারা যেন উত্তপ্ত জাহান্নামের সাথী হয়। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৬) এবং إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ *সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু'।* এর পরে বলা হচ্ছে, প্রমাণাদি জেনে নেয়ার পরেও যদি তোমরা সত্য হতে সরে পড় তাহলে জেনে রেখ যে, আল্লাহ তা'আলা প্রতিদান দেয়ার ব্যাপারে প্রবল পরাক্রান্ত। না তাঁর থেকে কেহ পলায়ন করতে পারবে, আর না তাঁর উপর কেহ প্রভাব বিস্তার করতে পারবে। তিনি তাঁর নির্দেশাবলী চালু করার ব্যাপারে মহা বিজ্ঞানময়। পাকড়াও করার কাজে তিনি মহান পরাক্রমশালী এবং নির্দেশ জারী করার কাজে তিনি মহা বিজ্ঞানময়। তিনি কাফিরদের উপর প্রভুত্ব বিস্তারকারী এবং তাদের ওজর ও প্রমাণ কর্তন করার ব্যাপারে তিনি নৈপুণ্যের অধিকারী।

২১০। তারা শুধু এই অপেক্ষাই করছে যে, আল্লাহ শুভ্র মেঘমালার ছায়াতলে মালাইকাকে সঙ্গে নিয়ে তাদের নিকট সমাগত হবেন ও সমস্ত কাজের নিস্পত্তি করবেন।	٢١٠. هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِى ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ وَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ ۚ وَإِلَى

ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ	**এবং আল্লাহরই নিকট সমস্ত কার্য প্রত্যাবর্তিত হয়ে থাকে।**

ঈমান আনার ব্যাপারে বিলম্ব করা উচিত নয়

এ আয়াতে মহান আল্লাহ কাফিরদেরকে ধমক দিয়ে বলছেন যে, তারা কি কিয়ামাতেরই অপেক্ষা করছে যে দিন সত্যের সঙ্গে ফাইসালা হয়ে যাবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের ফলভোগ করবে? যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

كَلَّآ إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا. وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا.

وَجِاْىٓءَ يَوْمَئِذٍۭ بِجَهَنَّمَ ۚ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَـٰنُ وَأَنَّىٰ لَهُ ٱلذِّكْرَىٰ

এটা সংগত নয়। পৃথিবীকে যখন চূর্ণ বিচূর্ণ করা হবে এবং যখন তোমার রাব্ব আগমন করবেন, আর সারিবদ্ধভাবে মালাইকা/ফেরেশতাগণও সমুপস্থিত হবে, সেদিন জাহান্নামকে আনয়ন করা হবে এবং সেদিন মানুষ উপলব্ধি করবে, কিন্তু এই উপলব্ধি তার কি করে কাজে আসবে? (সূরা ফাজ্‌র, ৮৯ ঃ ২১-২৩) অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ أَوْ يَأْتِىَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِىَ بَعْضُ

ءَايَـٰتِ رَبِّكَ

তারা কি শুধু এ প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, তাদের কাছে মালাইকা (ফেরেশতা) আসবে? কিংবা স্বয়ং তোমার রাব্ব আসবেন? অথবা তোমার রবের কোন কোন নিদর্শন প্রকাশ হয়ে পড়বে? (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১৫৮)

আবুল আলিয়া (রহঃ) বলেন যে, هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئِكَةُ এর অর্থ হচ্ছে মালাইকাও মেঘপুঞ্জের ছায়াতলে আসবেন এবং আল্লাহ তা‘আলা যাতে চাবেন তাতেই আসবেন। (তাবারী ৪/২৬৪) কোন কোন পঠনে এও আছে ঃ

هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللّهُ وَالْمَلآئِكَةُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ

অর্থাৎ তারা কি এই অপেক্ষাই করছে যে, আল্লাহ তাদের নিকট আগমন করবেন এবং মালাইকা মেঘমালার ছায়াতলে আসবে? অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

Contents

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَـٰمِ وَنُزِّلَ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ تَنزِيلاً

যেদিন আকাশ মেঘপুঞ্জসহ বিদীর্ণ হবে এবং মালাইকাকে নামিয়ে দেয়া হবে। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২৫)

২১১। ইসরাঈল বংশীয়দেরকে জিজ্ঞেস কর, আমি কত স্পষ্ট প্রমাণ তাদেরকে প্রদান করেছি। এবং যে কেহ তার নিকট আল্লাহর অনুগ্রহ সম্পদ আসার পর তা পরিবর্তন করে তাহলে জেনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।	٢١١. سَلْ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ كَمْ ءَاتَيْنَـٰهُم مِّنْ ءَايَةٍۭ بَيِّنَةٍ ۗ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ
২১২। যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের পার্থিব জীবন সুশোভিত করা হয়েছে এবং তারা বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে উপহাস করে থাকে, এবং যারা ধর্মভীরু তাদেরকে উত্থান দিনে সমুন্নত করা হবে; এবং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন অপরিমিত জীবিকা দান করে থাকেন।	٢١٢. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۘ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۗ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

‘আল্লাহর অনুগ্রহ’ ও ‘মু’মিনদের উপহাস’ করার শাস্তি

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, তোমরা লক্ষ্য কর, বানী ইসরাঈলকে আমি বহু মুজিযা প্রদর্শন করেছি। মূসার (আঃ) হাতের লাঠি, তাঁর হাতের ঔজ্জ্বল্য, তাদের জন্য সমুদ্রকে দ্বিখণ্ডিত করা, কঠিন গরমের সময় তাদের উপর মেঘের ছায়া দান করা, তাদের উপর ‘মান্না’ ও ‘সালওয়া’ অবতীর্ণ করা ইত্যাদি। এর দ্বারা আমার

যা ইচ্ছা করা এবং সব কিছুরই উপর ক্ষমতাবান হওয়া স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে, এর দ্বারা আমার নাবী মূসার (আঃ) নাবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু তবু বানী ইসরাঈল আমার নি'আমাতের উপর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে এবং ঈমানের পরিবর্তে কুফরীর উপরই স্থির থেকেছে। কাজেই তারা আমার কঠিন শাস্তি হতে কিরূপে রক্ষা পাবে? কুরাইশ কাফিরদের সম্বন্ধেও এই সংবাদ দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ. جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۖ وَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ

তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনা যারা আল্লাহর অনুগ্রহের বদলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তাদের সম্প্রদায়কে নামিয়ে আনে ধ্বংসের আলয় জাহান্নামে, যার মধ্যে তারা প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট ঐ আবাসস্থল! (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ২৮-২৯) অতঃপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, এই কাফিরেরা শুধুমাত্র ইহলৌকিক জগতের উপরই সন্তুষ্ট রয়েছে। সম্পদ জমা করা এবং আল্লাহর পথে খরচ করতে কার্পণ্য করাই তাদের স্বভাব। বরং যেসব মু'মিন এই নশ্বর জগত হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে সম্পদ বিলিয়ে দিয়েছে তাদেরকে এরা উপহাস করে। অথচ প্রকৃতপক্ষে ভাগ্যবানতো এই মু'মিনরাই। কিয়ামাতের দিন এই মু'মিনদের মর্যাদা দেখে কাফিরদের চক্ষু খুলে যাবে। সেদিন নিজেদের দুর্ভাগ্য ও মু'মিনদের সৌভাগ্য লক্ষ্য করে তারা অনুধাবন করতে পারবে যে, কারা উচ্চ পদস্থ ও কারা নিম্ন পদস্থ। মু'মিনগণ উচ্চতর স্তরের উচ্চতম স্থানে বসবাস করবে, অন্যদিকে কাফিরদের বাসস্থান হবে জাহান্নামের নিম্নতম স্তরের নিম্নতর স্থানে।

ইহকালে আল্লাহ তা'আলা যাকে ধন-সম্পদ দেয়ার ইচ্ছা করেন তাকে তিনি অপরিমিতভাবে দিয়ে থাকেন। আবার তিনি যাকে ইচ্ছা করেন এখানেও দেন এবং পরকালেও দিবেন। যেমন হাদীসে এসেছে ঃ

'(আল্লাহ তা'আলা বলেন) হে আদম সন্তান! তুমি আমার পথে খরচ কর আমি তোমাকে দিতেই থাকব।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিলালকে (রাঃ) বলেন ঃ

'হে বিলাল! তুমি আল্লাহর পথে খরচ করতে থাক এবং আরশের অধিকারী হতে সঙ্কীর্ণতার ভয় করনা।' (তাবারানী ১০/১৯২) কুরআনুল হাকীমে রয়েছে ঃ

وَمَآ أَنفَقۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَهُوَ يُخۡلِفُهُۥ

এবং তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তিনি তার প্রতিদান দিবেন। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৩৯) সহীহ হাদীসে রয়েছে ঃ

‘সকালে দু’জন মালাক অবতরণ করেন। একজন প্রার্থনা করেন, ‘হে আল্লাহ! আপনার পথে ব্যয়কারীকে আপনি বারাকাত দান করুন।’ অপর জন বলেন, ‘হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করুন।’ (ফাতহুল বারী ৩/৩৫৭) অন্য হাদীসে রয়েছে ঃ

‘মানুষ বলে, ‘আমার মাল, আমার মাল। অথচ তোমার মাল তো ঐগুলিই যা তুমি খেয়ে ধ্বংস করেছ, আর যা তুমি দান করেছ। অন্য যত কিছু রয়েছে সেগুলি সবই তুমি অন্যদের জন্য ছেড়ে এখান হতে বিদায় গ্রহণ করবে।’ (মুসলিম ৪/২২৭৩) অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

‘দুনিয়া তারই ঘর যার কোন ঘর নেই, দুনিয়া তারই সম্পদ যার কোন সম্পদ নেই এবং দুনিয়া শুধু ঐ ব্যক্তি সংগ্রহ করে থাকে যার বিবেক নেই।’ (আহমাদ ৬/৭১)

২১৩। মানব জাতি একই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল; অতঃপর আল্লাহ সুসংবাদ বাহক ও ভয় প্রদর্শক রূপে নাবীগণকে প্রেরণ করলেন এবং তিনি তাদের সাথে সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করলেন যেন (ঐ কিতাব) তাদের মতভেদের বিষয়গুলি সম্বন্ধে মীমাংসা করে দেয়, অথচ যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিল, স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ তাদের নিকট সমাগত হওয়ার পর, পরস্পরের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ বশতঃ তারা সেই কিতাবকে	٢١٣. كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِۚ وَمَا ٱخۡتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَتۡهُمُ ٱلۡبَيِّنَٰتُ بَغۡيَۢا بَيۡنَهُمۡۖ

নিয়ে মতভেদ ঘটিয়ে বসলো, বিশ্বাস স্থাপনকারীরা যে বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করত আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে সেই বিষয়ে তাদেরকে সত্য পথে পরিচালিত করেন। আল্লাহর যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে পরিচালিত করেন।	فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ

স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও মতভেদ করা হল দীনকে অস্বীকার করা

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, নূহ (আঃ) ও আদমের (আঃ) মধ্যে দশটি যুগ ছিল। ঐ যুগসমূহের লোকেরা সত্য শারীয়াতের অনুসারী ছিল। অতঃপর তাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়। তখন আল্লাহ তা'আলা নাবীগণকে (আঃ) প্রেরণ করেন। তাঁর কিরা'আতও নিম্নরূপ ঃ

كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّآ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَٱخْتَلَفُوا۟

আর সমস্ত মানুষ (প্রথম) এক উম্মাতই ছিল, অতঃপর তারা মতভেদ সৃষ্টি করল। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ১৯) আল হাকিম তার মুসতাদরাক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ঃ এর বর্ণনার ধারাবাহিকতা সঠিক, কিন্তু দুই শায়খ (ইমাম বুখারী (রহঃ) ও মুসলিম) তাদের কিতাবে বর্ণনা করেননি। (হাকিম ২/৫৪৬) উবাই ইব্ন কা'বেরও (রাঃ) পঠন এটাই। কাতাদাহও (রহঃ) এর তাফসীর এরকমই করেছেন যে, যখন তাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয় তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রথম রাসূল অর্থাৎ নূহকে (আঃ) প্রেরণ করেন। মুজাহিদও (রহঃ) এটাই বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'আমরা দুনিয়ায় আগমন হিসাবে সর্বশেষ বটে, কিন্তু কিয়ামাতের দিন জান্নাতে প্রবেশ লাভ হিসাবে আমরা সর্ব প্রথম হব। আহলে কিতাবকে আল্লাহর কিতাব আমাদের পূর্বে দেয়া হয়েছে এবং আমাদেরকে দেয়া হয়েছে পরে। কিন্তু তারা মতভেদ সৃষ্টি করে এবং আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করেন। জুমু'আ সম্বন্ধেও এদের মধ্যে মতবিরোধ রয়ে যায়। কিন্তু আমাদের এই

সৌভাগ্য লাভ হয় যে, এই দিক দিয়েও সমস্ত আহলে কিতাব আমাদের পিছনে পড়ে রয়েছে। শুক্রবার আমাদের, শনিবার ইয়াহুদীদের এবং রবিবার খৃষ্টানদের।' (মুসনাদ আবদুর রায্যাক ১/৮২)

যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, জুমু'আ ছাড়াও কিবলার ব্যাপারেও এটা ঘটেছে। খৃষ্টানরা পূর্ব দিককে কিবলা বানিয়েছে, ইয়াহুদীরা কিবলা করেছে বাইতুল মুকাদ্দাসকে, কিন্তু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীগণ কা'বাকে তাদের কিবলা রূপে নির্ধারিত করেছে। অনুরূপভাবে সালাতেও মুসলিমরা অগ্রে রয়েছে। আহলে কিতাবের কারও সালাতে রুকু আছে, কিন্তু সাজদাহ নেই, আবার কারও সাজদাহ আছে, কিন্তু রুকু নেই। আবার কেহ কেহ সালাতে কথা-বার্তা বলে থাকে, আবার কেহ কেহ সালাতে চলা-ফিরা করে থাকে। কিন্তু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাতের সালাত নীরবতা ও স্থিরতার সাথে পালিত হয়। এরা সালাতের মধ্যে না কথা বলবে, আর না চলা-ফিরা করবে। এ রকমই সিয়ামের ব্যাপারেও তাদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কিন্তু এতেও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাত সুপথ প্রদর্শিত হয়েছে। পূর্বে উম্মাতবর্গের কেহ কেহ তো দিনের কিছু অংশে সিয়াম পালন করত, কোন দল কোন কোন প্রকারের খাদ্য পরিত্যাগ করত। কিন্তু আমাদের সিয়াম সব দিক দিয়েই পূর্ণতা প্রাপ্ত এবং এর মধ্যে আমাদেরকে সত্য পথ সম্বন্ধে বুঝানো হয়েছে। অনুরূপভাবে ইবরাহীম (আঃ) সম্বন্ধে ইয়াহুদীরা বলেছিল যে, তিনি ইয়াহুদী ছিলেন এবং খৃষ্টানরা বলেছিল যে, তিনি খৃষ্টান ছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি একজন খাঁটি মুসলিম ছিলেন। সুতরাং এ ব্যাপারেও উম্মাতে মুহাম্মাদী সুপথে রয়েছে।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে যখন তাহাজ্জুদ সালাতের জন্য উঠতেন তখন নিম্নের দু'আটি পাঠ করতেন ঃ

اَللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَإِسْرَافِيْلَ‘ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ‘ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ. فِيْمَا كَانُوا فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ. اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ. فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ. إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ.

'হে আল্লাহ! জিবরাঈল, মিকাঈল ও ইসরাফীলের রাব্ব! আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর তুমিই স্রষ্টা। দৃশ্য ও অদৃশ্য সব বিষয়েই তুমি পরিজ্ঞাত। তোমার

বান্দারা যে সব বিষয়ে পারস্পরিক মতভেদে লিপ্ত তুমি তার সুমীমাংসা করে দাও। যে সব বিষয়ে তারা মতভেদ করছে তন্মধ্যে তুমি যাকে ইচ্ছা সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করে থাক। (মুসলিম ১/৫৩৪) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নের দু'আটিও নকল করা হয়েছে ঃ

اَللَّهُمَّ اَرِنَ الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهْ وَاَرِنَ الْبَاطِلَ بَاطِلاً وَّارْزُقْنَا اجْتِنَابَهْ وَلاَ تَجْعَلْهُ مُتَلَبِّسًا عَلَيْنَا فَنَضِلُّ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا

'হে আল্লাহ! যা সত্য তা আমাদেরকে সত্য রূপে প্রদর্শন করুন এবং তার অনুসরণ করার আমাদেরকে তাওফীক প্রদান করুন। আর মিথ্যাকে মিথ্যারূপে আমাদেরকে প্রদর্শন করুন এবং আমাদেরকে ওটা হতে বাঁচার তাওফীক দিন। আমাদের উপর সত্য ও মিথ্যাকে মিশ্রিত করবেননা। যার কারণে আমরা পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ি। হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনি সৎ ও আল্লাহভীরু লোকদের ইমাম বানিয়ে দিন।' (তাখরিজ আল ইয়াহইয়া ৩/১৪১৮)

২১৪। তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ তোমরা এখনও তাদের অবস্থা প্রাপ্ত হওনি যারা তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছে; তাদেরকে বিপদ ও দুঃখ স্পর্শ করেছিল এবং তাদেরকে প্রকম্পিত করা হয়েছিল; এমন কি রাসূল ও তৎসহ বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ বলেছিল ঃ কখন আল্লাহর সাহায্য আসবে? সতর্ক হও, নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী।	٢١٤. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوا۟ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ ۗ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ

পরীক্ষার পর বিজয় লাভ

ভাবার্থ এই যে, পরীক্ষার পূর্বে জান্নাতে প্রবেশের আশা করা ঠিক নয়। পূর্ববর্তী সমস্ত উম্মাতেরই পরীক্ষা নেয়া হয়েছিল। তাদেরকেও রোগ ও বিপদাপদ স্পর্শ করেছিল। بَأْسَآءُ শব্দটির অর্থ দারিদ্রতা এবং ضَرَّاءُ শব্দটির অর্থ রোগও বলা হয়েছে। ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ), ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), আবুল আলীয়া (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), মাররাহ আল-হামাদানী (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), আর-রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ) বলেন যে, اَلْبَأْسَاءِ এর অর্থ হচ্ছে দারিদ্রতা। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, وَالضَّرَّاءِ এর অর্থ হচ্ছে অসুস্থতা।

সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, একদা খাব্বাব ইব্‌ন আরাত (রাঃ) বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি কি আমাদের সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করেননা?' তিনি বলেন ঃ

'এখনই ভীত হয়ে পড়লে? জেনে রেখ যে, পূর্ববর্তী একাত্মবাদীদের মাথার উপর করাত রেখে তাদেরকে পা পর্যন্ত ফেঁড়ে দ্বিখণ্ডিত করে দেয়া হত, কিন্তু তথাপি তারা তাওহীদ ও সুন্নাত হতে সরে পড়তনা। লোহার চিরুণী দিয়ে তাদের দেহের গোশ্‌ত আঁচড়ানো হত, তথাপি তারা আল্লাহর দীন পরিত্যাগ করতনা। আল্লাহর শপথ! আমার এই দীনকে আল্লাহ এমন পরিপূর্ণ করবেন যে, একজন অশ্বারোহী 'সানআ' হতে 'হাযারা মাওত' পর্যন্ত নির্ভয়ে ভ্রমণ করবে এবং একমাত্র আল্লাহর ভয় ছাড়া তার আর কোন ভয় থাকবেনা। তবে অন্তরে এই ধারণা হওয়া অন্য কথা যে, হয়ত তার বকরীর উপরে বাঘ এসে পড়বে। কিন্তু আফসোস! তোমরা তাড়াহুড়া করছ। (ফাতহুল বারী ৬/৭১৬) কুরআন মাজীদে ঠিক এই ভাবটিই অন্য জায়গায় নিম্নলিখিতভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

الٓمٓ. أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓاْ أَن يَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَـٰذِبِينَ

আলিফ লাম মীম, মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' এ কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেয়া হবে? আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম; আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা

সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ১-৩) পরিখার যুদ্ধে' সাহাবীগণেরও পরীক্ষা নেয়া হয়েছিল। যেমন, স্বয়ং পবিত্র কুরআনই এর চিত্র তুলে ধরা হয়েছে ঃ

إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَـٰرُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا۠. هُنَالِكَ ٱبْتُلِىَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا۟ زِلْزَالًا شَدِيدًا. وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَـٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ إِلَّا غُرُورًا

যখন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল উচ্চ অঞ্চল ও নিম্ন অঞ্চল হতে, তোমাদের চক্ষু বিস্ফোরিত হয়েছিল; তোমাদের প্রাণ হয়ে পড়েছিল কণ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ করছিলে। তখন মু'মিনরা পরীক্ষিত হয়েছিল এবং তারা ভীষনভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল এবং মুনাফিকরাও, যাদের অন্তরে ছিল ব্যাধি, তারা বলছিল ঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ১০-১২)

রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস যখন আবূ সুফিয়ানকে (রাঃ) তার কুফরীর অবস্থায় জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'এই নাবুওয়াতের দাবীদারের (মুহাম্মাদ সাঃ) সাথে আপনাদের কোন যুদ্ধ হয়েছিল কি'? আবূ সুফিয়ান (রাঃ) বলেন, 'হ্যাঁ'। হিরাক্লিয়াস পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিল? তিনি বলেন, 'কখনও আমরা জয়যুক্ত হয়েছিলাম এবং কখনও তিনি।' হিরাক্লিয়াস বলেন, 'এভাবেই নাবীগণের (আঃ) পরীক্ষা হয়ে আসছে। কিন্তু পরিণামে প্রকাশ্য বিজয় তাঁদেরই হয়ে থাকে।' (ফাতহুল বারী ৯/২৫) مَثَلُ শব্দটির অর্থ এখানে রীতি। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে وَمَضَى مَثَلُ الْاَوَّلِيْنَ অর্থাৎ 'পূর্ববর্তীদের রীতি অতীত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَأَهْلَكْنَآ أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأَوَّلِينَ

তাদের মধ্যে যারা এদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল ছিল তাদেরকে আমি ধ্বংস করেছিলাম; আর এভাবে চলে আসছে পূর্ববর্তীদের অনুরূপ দৃষ্টান্ত। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৮)

পূর্ব যুগের মু'মিনগণ তাদের নাবীগণের (আঃ) সাথে এরকমই কঠিন অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন এবং সেই সঠিক ও সংকীর্ণ অবস্থা হতে মুক্তি চেয়েছিলেন। উত্তরে তাঁদেরকে বলা হয়েছিল যে, সাহায্য অতি নিকটবর্তী। যেমন অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا

অতঃপর কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি আছে, অবশ্যই কষ্টের সাথে স্বস্তি আছে। (সূরা আলাম নাশরাহ, ৯৪ ঃ ৫-৬) একটি হাদীসে রয়েছে যে, বান্দা যখন নিরাশ হতে থাকে তখন আল্লাহ তা'আলা বিস্মিত হয়ে বলেন, আমার সাহায্য তো এসেই যাচ্ছে, অথচ তারা নিরাশ হয়ে যাচ্ছে।

২১৫। তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, তারা কিরূপে ব্যয় করবে? তুমি বল ঃ তোমরা ধন সম্পত্তি হতে যা ব্যয় করবে তা মাতা-পিতার, আত্মীয়-স্বজনের, পিতৃহীনদের, দরিদ্রদের ও পথিকবৃন্দের জন্য কর; এবং তোমরা যে সব সৎকাজ কর নিশ্চয়ই আল্লাহ তা সম্যক রূপে অবগত।	٢١٥. يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ

দান-খাইরাত করা প্রসঙ্গ

মুকাতিল (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াতটি হচ্ছে নফল দান সম্বন্ধে। (ইব্‌ন আবী হাতিম ২/৬১৯) আয়াতটির ভাবার্থ এই যে, হে নাবী! মানুষ তোমাকে খরচ করার পাত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে। তুমি তাদেরকে বলে দাও, তারা যেন ঐসব লোকের জন্য খরচ করে যাদের বর্ণনা আয়াতটিতে রয়েছে। হাদীসেও রয়েছে ঃ

'তোমরা মায়ের সাথে, পিতার সাথে, বোনের সাথে, ভাইয়ের সাথে, অতঃপর নিকটতম আত্মীয়দের সাথে আদান প্রদান কর।' (হাকিম ৩/৬১১) এই হাদীসটি বর্ণনা করে মাইমুন ইব্‌ন মাহরান (রহঃ) এই আয়াতটি পাঠ করেন। অতঃপর বলেন, 'এগুলিই হচ্ছে খরচ করার স্থান। ঢোল-তবলা, ছবি এবং দেয়ালে কাপড় পরানো, এগুলো খরচের স্থান নয়।' (ইব্‌ন আবী হাতিম ২/৬২০) অতঃপর বলা হচ্ছে, তোমরা যেসব সৎকাজ সম্পাদন করছ, আল্লাহ তা'আলা তা অবগত আছেন এবং তিনি তার জন্য উত্তম বিনিময় প্রদান করবেন। তিনি অণু পরিমাণও অন্যায় করবেননা।

২১৬। জিহাদকে তোমাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য রূপে অবধারিত করা হয়েছে এবং এটি তোমাদের নিকট অপ্রীতিকর; বস্তুতঃ তোমরা এমন বিষয়কে অপছন্দ করছ যা তোমাদের পক্ষে বাস্তবিকই মঙ্গলজনক, পক্ষান্তরে তোমরা এমন বিষয়কে পছন্দ করছ যা তোমাদের জন্য বাস্তবিকই অনিষ্টকর এবং আল্লাহই (তোমাদের ভাল-মন্দ) অবগত আছেন এবং তোমরা অবগত নও।	٢١٦. كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

মুসলিমদের জন্য জিহাদ ফার্‌য করা হয়েছে

দীন ইসলামকে রক্ষার জন্য ইসলামের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করা ফার্‌য হওয়ার নির্দেশ এই আয়াতে দেয়া হয়েছে। যুহরী (রহঃ) বলেন যে, প্রত্যেক লোকের উপরেই জিহাদ ফার্‌য, সে স্বয়ং যুদ্ধে যোগদান করুক বা বাড়ীতে বসেই থাক। যারা বাড়ীতে অবস্থান করবে তাদের নিকট সাহায্য চাওয়া হলে তাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করতে হবে। প্রয়োজনবোধে তাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে যোগদানের আহ্বান জানান হলে তাদেরকে অবশ্যই যুদ্ধের মাঠে যোগ দিতে হবে। সহীহ হাদীসে রয়েছে ঃ 'যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা গেল যে, সে না জিহাদে

অংশগ্রহণ করল, আর না মনে জিহাদের কথা বলল, সে অজ্ঞতা যুগের মৃত্যুবরণ করল।' (মুসলিম ৩/১৫১৭) অন্য হাদীসে রয়েছে ঃ

'মাক্কা বিজয়ের পর আর হিজরাত নেই। তবে রয়েছে জিহাদ ও নিয়্যাত। যখন তোমাদেরকে জিহাদের জন্য ডাক দিবে তখন তোমরা তার জন্য বেরিয়ে পড়বে।' (ফাতহুল বারী ৪/৫৬) মাক্কা বিজয়ের দিন তিনি এই নির্দেশ দিয়েছিলেন।

অতঃপর বলা হচ্ছে, এই জিহাদের নির্দেশ তোমাদের নিকট কঠিন মনে হতে পারে। কেননা এতে কষ্ট ও বিপদ রয়েছে এবং তোমরা নিহত হতে পার কিংবা আহত হতে পার। তা ছাড়া সফরের কষ্ট, শত্রুদের আক্রমণ ইত্যাদি। কিন্তু জেনে রেখ যে, যা তোমরা নিজেদের জন্য খারাপ মনে করছ তাই হয়ত তোমাদের জন্য উত্তম। কেননা এতেই তোমাদের বিজয় এবং শত্রুদের ধ্বংস রয়েছে। তাদের ধন-সম্পদ, তাদের সাম্রাজ্য, এমন কি তাদের সন্তান-সন্ততি পর্যন্ত তোমাদের পায়ের উপর নিক্ষিপ্ত হবে। আবার এও হতে পারে যে, তোমরা যে জিনিসকে তোমাদের জন্য ভাল মনে করছ তাই তোমাদের জন্য ক্ষতিকর। সব কাজের পরিণামের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে। তিনিই জানেন যে, পরিণাম হিসাবে তোমাদের জন্য কোন্ কাজটি ভাল ও কোন্ কাজটি মন্দ। তিনি তোমাদেরকে ঐ কাজেরই নির্দেশ দিয়ে থাকেন যার মধ্যে তোমাদের জন্য ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল নিহিত রয়েছে। সুতরাং তোমরা তাঁর নির্দেশসমূহ মনেপ্রাণে স্বীকার করে নাও এবং তাঁর প্রত্যেক নির্দেশকে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে চল। ওরই মধ্যে তোমাদের মঙ্গল ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

২১৭। তারা তোমাকে নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে; তুমি বল ঃ ওর মধ্যে যুদ্ধ করা অতীব অন্যায়, আর আল্লাহর পথে প্রতিরোধ করা এবং তাঁকে অবিশ্বাস করা ও পবিত্র মাসজিদ হতে তার অধিবাসীদেরকে বহিস্কৃত করা আল্লাহর নিকট তদাপেক্ষা গুরুতর অপরাধ;	٢١٧. يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌۢ بِهِۦ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِۦ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ

وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقَـٰتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَـٰعُوا۟ ۚ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَـٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ	এবং অশান্তি সৃষ্টি হত্যা অপেক্ষা গুরুতর এবং যদি তারা সক্ষম হয় তাহলে তারা তোমাদেরকে তোমাদের ধর্ম হতে ফিরাতে না পারা পর্যন্ত নিবৃত্ত হবেনা; আর তোমাদের মধ্যকার কেহ যদি স্বধর্ম হতে ফিরে যায় এবং ঐ কাফির অবস্থায়ই তার মৃত্যু ঘটে তাহলে তার ইহকাল ও পরকাল সংক্রান্ত সমস্ত সাধনাই ব্যর্থ হয়ে যাবে; তারাই অগ্নির অধিবাসী এবং তারই মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।
٢١٨. إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا۟ وَجَـٰهَدُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أُو۟لَـٰٓئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ	২১৮। নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং আল্লাহর পথে দেশ ত্যাগ করেছে ও ধর্ম-যুদ্ধ করেছে, তারাই আল্লাহর অনুগ্রহ প্রত্যাশী এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

নাখলাহয় সেনা অভিযান এবং নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, যুন্দুব ইব্ন আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং আবূ উবাইদা ইব্ন জাররাহকে (রাঃ) সেনাপতি নিযুক্ত করেন। তিনি

বিদায়ের প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিচ্ছেদের দুঃখে ভীষণ ক্রন্দন করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে ফিরিয়ে নেন এবং তাঁর স্থলে আবদুল্লাহ ইব্ন জাহাশকে (রাঃ) সেনাপতি নিযুক্ত করেন। তাঁকে একটি পত্র দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'বাতনে নাখলাহ' নামক স্থানে পৌঁছার পূর্বে এই পত্র পাঠ করবেনা। সেখানে পৌঁছে এর বিষয়বস্তু দেখার পর সঙ্গীদের কেহকেও তোমার সাথে যাবার জন্য বাধ্য করবেনা।' অতএব আবদুল্লাহ (রাঃ) এই ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়েই যাত্রা শুরু করেন। নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশনামা পাঠ করে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়েন এবং বলেন ঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশনামা পড়েছি এবং তাঁর নির্দেশ পালনে আমি প্রস্তুত রয়েছি।' অতঃপর তিনি চিঠিটি তার সঙ্গীদেরকে পাঠ করে শোনান এবং ঘটনাটি বর্ণনা করেন। সুতরাং দুই ব্যক্তি ফিরে যান, কিন্তু অন্যরা সবাই তার সাথে যাবার জন্য প্রস্তুত হন। সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তারা ইব্ন হাযরামী নামক কাফিরকে দেখতে পান। ঐ দিনটি জমাদিউল আখিরের শেষ দিন ছিল নাকি রযবের প্রথম দিন ছিল এটা তাদের জানা ছিলনা। সুতরাং তারা ঐ দলটির উপর আক্রমণ চালান এবং ইব্ন হাযরামী মারা যায়। মুসলিমদের ঐ দলটি তথা হতে ফিরে আসেন। তখন মুশরিকরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বলে ঃ 'দেখ! তারা নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করেছে এবং হত্যাও করেছে।' এ ব্যাপারে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় (ইব্ন আবী হাতিম ২/৬২৮)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী গ্রন্থের লেখক আবদুল মালিক ইব্ন হিসাম (রহঃ) বর্ণনা করেন, যায়িদ ইব্ন আবদুল্লাহ বাক্কাই (রহঃ) বলেছেন যে, মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার আল মাদানী (রহঃ) তার লিখা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী গ্রন্থে বলেছেন ঃ মুশরিকদের সাথে প্রথম যুদ্ধ বদর প্রান্তর থেকে ফিরে আসার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ ইব্ন জাহাশকে (রাঃ) সেনাপতি নিযুক্ত করে অভিযানে প্রেরণ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাথে আটজন লোক প্রেরণ করেন। তারা সবাই ছিলেন মুহাজির, আনসারগণের মধ্য থেকে কেহ ছিলেননা। তিনি তাকে কিছু লিখিত নির্দেশও দেন এবং আদেশ করেন যে, দুই দিনের পথ অতিক্রম করার পর যেন ঐ লিখিত নির্দেশ আবদুল্লাহ ইব্ন জাহাশ (রাঃ) পাঠ করেন এবং তদনুযায়ী সামনের দিকে অগ্রসর হন। তবে লিখিত আদেশ অনুযায়ী তার সহযাত্রীদের কেহকে যেন তা মানতে বাধ্য করা না হয়।

আবদুল্লাহ ইব্ন জাহাশের (রাঃ) সাথে মাক্কার মুহাজিরদের যারা ছিলেন তারা হলেন আবদ শামস ইব্ন আবদ মানাফ গোত্রের হুযাইফা ইব্ন উতবাহ ইব্ন রাবিয়াহ ইব্ন আবদ শামস ইব্ন আবদ মানাফ (রাঃ), তাদের মিত্র গোত্রের আবদুল্লাহ ইব্ন জাহাশ (রাঃ) যিনি এই অভিযানের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন এবং আসাদ ইব্ন খুযাইমাহ গোত্রের উক্কাসাহ ইন মিহসান (রাঃ)। নাওফাল ইব্ন আবদ মানাফ গোত্রের উতবাহ ইব্ন গাজওয়ান ইব্ন যাবির (রাঃ), জুহরা ইব্ন কিলাব গোত্রের সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ), কা'ব গোত্র এবং তাদের মিত্র থেকে আদী ইব্ন আমর ইব্ন রাবীয়া (রাঃ), তামীম গোত্রের ওয়াকিত ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবদ মানাফ (রাঃ), ইব্ন আরীন ইব্ন সালাবাহ ইব্ন ইব্ন ইয়ারবু (রাঃ), সা'দ ইব্ন লাইস গোত্রের খালিদ ইব্ন বুকাইর (রাঃ), আল হারিস ইব্ন ফিহর গোত্রের সুহাইল ইব্ন বাইদাও (রাঃ) তাদের সাথে ছিলেন। অভিযানের দুই দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর আবদুল্লাহ ইব্ন জাহাশ (রাঃ) নির্দেশিত চিঠিটি পাঠ করেন। তাতে লিখা ছিল ঃ এ চিঠি পাঠ করার পর তোমরা আরও অগ্রসর হবে এবং মাক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী স্থান 'নাখলাহ' নামক স্থানে তোমাদের ঘাঁটি স্থাপন করবে। ওখানে অবস্থান করে কুরাইশদের কাফিলার গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখবে এবং তা আমাদেরকে অবহিত করবে। আবদুল্লাহ ইব্ন জাহাশ (রাঃ) চিঠিটি পাঠ করার পর বলেন ঃ আমি শুনলাম এবং মান্য করলাম। অতঃপর তিনি তার সহকর্মীদের বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন নাখলাহ অভিমুখে যাত্রা করি এবং ওখানে অবস্থান করে কুরাইশ কাফিলার গতিবিধি লক্ষ্য করে তাঁর কাছে খবর পৌঁছাই। তিনি আরও বলেছেন যে, আমার সাথে যেতে তোমাদের কেহকে যেন জোর-যবরদস্তি না করি। সুতরাং যার শহীদ হওয়ার আকাংখা রয়েছে সে যেন আমার সাথে অগ্রাভিযানে যোগ দেয়, আর যার এরূপ ইচ্ছা নেই সে ফিরে যেতে পারে। অতঃপর আবদুল্লাহ ইব্ন জাহাশ (রাঃ) এবং তার সহযোদ্ধাগণ পিছন ফিরে না গিয়ে অভিযানে অগ্রসর হন।

আবদুল্লাহ ইব্ন জাহাশ (রাঃ) তার লোকজনসহ 'ফুরু' নামক স্থানের কাছে হিযাযের, বুহরান নামক স্থানে পৌঁছেন। ওখানে সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) এবং উতবাহ গাজওয়ান (রাঃ) তাদের উটটি হারিয়ে ফেলেন, যার উপর তারা পর্যায়ক্রমে আরোহন করতেন। তারা দু'জন তাদের উটটি খুঁজতে থাকেন এবং আবদুল্লাহ ইব্ন জাহাশ (রাঃ) তার সঙ্গীদের নিয়ে নাখলাহ না পৌঁছা পর্যন্ত সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকেন। তারা দেখতে পান যে, কুরাইশদের একটি কাফিলা

খাদ্য, কিসমিস ও অন্যান্য বানিজ্যিক দ্রব্যসহ তাদেরকে অতিক্রম করে যাচ্ছে। ঐ কাফিলায় আমর ইব্‌ন হাদরামী (যার অপর নাম ছিল আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাদ), মাখযুম গোত্রের উসমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুগীরাহ এবং তার ভাই নাওফিল ইব্‌ন আবদুল্লাহ এবং হিসাম ইব্‌ন মুগীরার মুক্ত দাস হাকাম ইব্‌ন কাইসানও ছিল। তারা সাহাবীগণকে দেখতে পেয়ে ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। কিন্তু যখন তাদের দলে উক্কাসাহ ইব্‌ন মিহসানকে দেখতে পেল তখন কাফিরদের ভয় দূর হয়ে গেল, যেহেতু তার মাথার চুল ছিল মুন্ডন করা। তারা নিজেরা বলাবলি করছিল ঃ এই লোকেরা উমরাহ করে এসেছে, অতএব তাদের ব্যাপারে ভয় পাবার কিছু নেই।

সাহাবীগণ নিজেদের মাঝে আলাপ আলোচনা করলেন। ঐ দিনটি ছিল রজব মাসের শেষ দিন। তারা বলাবলি করছিলেন ঃ আল্লাহর শপথ! তোমরা যদি তাদেরকে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ দাও তাহলে তারা হারাম এলাকায় প্রবেশ করবে এবং তখন তোমাদের কিছুই করার থাকবেনা, আর তোমরা যদি তাদেরকে হত্যা কর তাহলে নিষিদ্ধ মাসে তাদেরকে হত্যা করা হবে। প্রথম দিকে তারা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং কাফিরদেরকে আক্রমণ করা অপছন্দ করে। অতঃপর তারা নিজেরাই আবার উদ্দীপ্ত হয়ে কাফিরদের যেখানে যাকে পাওয়া যায় তাকে হত্যা করতে এবং মালামাল আটক করতে প্রস্তুত হন। অতঃপর ওয়াকিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ আত-তামিমী (রাঃ) কাফিরদের আমীর ইব্‌ন হাদরামীকে লক্ষ্য করে এমন তীর নিক্ষেপ করেন যে, ওতেই তার মৃত্যুর ফাইসালা হয়ে যায়। উসমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ এবং হাকাম ইব্‌ন কাইসানকে বন্দী করা হয়, আর নাওফাল ইব্‌ন আবদুল্লাহ পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। অতঃপর আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহাশ (রাঃ) এবং তার সহযোদ্ধাগণ দুই বন্দী এবং তাদের সাথে থাকা মালামালসহ মাদীনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ফিরে যান।

পথেই সেনাপতি বলে দিয়েছিলেন যে, এই মালের এক পঞ্চমাংশ তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্যই থাকবে। সুতরাং এই অংশটি তাঁরা পৃথক করে রেখে দেন এবং বাকী অংশ সাহাবীগণের (রাঃ) মধ্যে বন্টন করে দেন। যুদ্ধ লব্ধ মালের এক পঞ্চমাংশ যে বের করে দিতে হবে এই নির্দেশ তখন পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়নি। যখন তাঁরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হন তখন তিনি এই ঘটনা শুনে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং বলেন, ‘নিষিদ্ধ মাসগুলিতে যুদ্ধ করতে আমি তোমাদেরকে কখন বলেছিলাম?’ না তিনি সেই যাত্রী দলের কোন মাল গ্রহণ করলেন, আর না বন্দীদেরকে স্বীয়

অধিকারে নিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই কথায় ও কাজে তাঁরা খুবই লজ্জিত হলেন এবং নিজেদের পাপকাজ সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে গেলেন। অতঃপর অন্যান্য মুসলিমরাও তাদের সমালোচনা করতে আরম্ভ করলেন। যারা এ বিষয়টি ভ্রান্ত বলে দাবী করেন তারা বলেন যে, এ ঘটনাটি ঘটেছিল শা'বান মাসে, যে মাস নিষিদ্ধ মাস নয়। আর ওদিকে কুরাইশরা বিদ্রূপ করতে আরম্ভ করল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সহচরগণ নিষিদ্ধ মাসগুলির মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ হতে বিরত হননা। অপর পক্ষে ইয়াহুদীরা একটা কুলক্ষণ বের করে। আমর ইব্ন হাযরামী নিহত হয়েছিল বলে ইয়াহুদীরা বলে عُمِرَتِ الْحَرْبُ অর্থাৎ 'দীর্ঘ দিন ধরে প্রচণ্ড ও ভয়াবহ যুদ্ধ চলতে থাকবে।' আমরের পিতার নাম ছিল হাযরামী। এ জন্যই তারা কুলক্ষণ গ্রহণ করে বলে حَضَرَتِ الْحَرْبُ অর্থাৎ যুদ্ধের সময় উপস্থিত হয়ে গেছে। হত্যাকারীর নাম ওয়াকিদ (রাঃ), কাজেই তারা বলে وَقَدَتِ الْحَرْبُ অর্থাৎ 'যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠেছে।' কিন্তু মহান আল্লাহ এর বিপরীত করে দেন এবং পরিণাম সবই মুশরিকদের প্রতিকূলে হয়। তাদের প্রতিবাদের উত্তরে আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয় যে, যুদ্ধ যদি নিষিদ্ধ মাসে হয়েই থাকে তাহলে তোমাদের কার্যাবলী এর চেয়েও জঘন্য। তোমাদের অশান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে এই যে, তোমরা মুসলিমদেরকে আল্লাহর দীন হতে ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে সম্ভাব্য কোন চেষ্টারই ত্রুটি করনি। এটা হত্যা অপেক্ষাও বেশি মারাত্মক। তোমরা এসব কাজ হতে না বিরত হচ্ছ, না তাওবাহ করছ, আর না লজ্জিত হচ্ছ। এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ হওয়ার পর মুসলিমগণ এই দুঃখ হতে মুক্তিপ্রাপ্ত হন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাত্রীদলকে ও বন্দীদেরকে নিজের অধিকারে নিয়ে নেন। কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট দূত পাঠিয়ে বলে, 'মুক্তিপণ নিয়ে উসমান ইব্ন আবদুল্লাহ এবং হাকাম ইব্ন কাইসানকে ছেড়ে দিন।' কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দূতকে বলেন, 'আমার দু'জন সাহাবী সাদ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) এবং উৎবা ইব্ন গাযওয়ান (রাঃ) যখন এসে যাবেন তখন তোমরা এসো। আমার ভয় হয় যে, তোমরা তাদেরকে কষ্ট দিবে। অতএব তারা উভয়ে এসে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীদ্বয়কে মুক্ত করে দেন। হাকাম ইব্ন কাইসান (রাঃ) তো মুসলিম হয়ে যান এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমাতেই রয়ে যান। তিনি 'বির এ মাউনা' যুদ্ধে অংশ

নিয়ে শহীদ হন (ঐ সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৭০ জন সাহাবীকে ইসলাম শিক্ষা দানের উদ্দেশে নাজ্দ প্রেরণ করেন, কিন্তু বানূ সালীমের লোকেরা ২ জন বাদে অন্য সবাইকে হত্যা করে)। উসমান ইব্ন আবদুল্লাহ মাক্কায় ফিরে যায় এবং সেখানে সে কুফরী অবস্থায়ই মারা যায়। এই আয়াত শুনে ঐ বিজেতাগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসন্তুষ্টি, সাহাবীগণের (রাঃ) সমালোচনা ও কাফিরদের বিদ্রূপের কারণে তাঁদের অন্তরে যে দুঃখ ছিল, সবই দূর হয়ে যায়। কিন্তু এখন তাদের মনে এই চিন্তা হয় যে, এ যুদ্ধের ফলে তারা পারলৌকিক সাওয়াব লাভ করবেন কিনা এবং গাযীদের মধ্যে তাদেরকে গণ্য করা হবে কিনা! এ সম্বন্ধে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে ২১৮ নং আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এর দ্বারা আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে বড় বড় আশা প্রদান করেন। (ইব্ন হিসাম ২/২৫২-২৫৫)

২১৯। মাদক দ্রব্য ও জুয়া খেলা সম্বন্ধে তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে। তুমি বল ঃ এ দু’টোর মধ্যে গুরুতর পাপ রয়েছে এবং কোন কোন লোকের (কিছু) উপকার আছে, কিন্তু ও দু’টোর লাভ অপেক্ষা পাপই গুরুতর; তারা তোমাকে (আরও) জিজ্ঞেস করছে, তারা কি (পরিমান) ব্যয় করবে? তুমি বল ঃ যা তোমাদের উদ্বৃত্ত; এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করেন যেন তোমরা চিন্তা-ভাবনা কর,	٢١٩. يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَـٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيَـٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ
২২০। পার্থিব ও পারলৌকিক বিষয়ে। তারা তোমাকে ইয়াতীমদের সম্বন্ধে	٢٢٠. فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ ۗ

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَـٰمَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ	**জিজ্ঞেস করছে; তুমি বল ঃ তাদের হিত সাধন করাই উত্তম; এবং যদি তোমরা তাদেরকে সম্মিলিত করে নাও তাহলে তারা তোমাদের ভাই; আর কে অনিষ্টকারী, কে হিতাকাংখী আল্লাহ তা অবগত আছেন এবং যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তাহলে তিনি তোমাদেরকে বিপদে ফেলতেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রান্ত, বিজ্ঞানময়।**

মাদকদ্রব্য ক্রমান্বয়ে নিষিদ্ধ করণ

যখন মদ হারাম হওয়ার আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন উমার (রাঃ) বলেন ঃ 'হে আল্লাহ! আপনি এটা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিন।' তখন সূরা বাকারাহর এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। উমারকে (রাঃ) ডাকা হয় এবং তাকে এই আয়াতটি পাঠ করে শোনানো হয়। কিন্তু উমার (রাঃ) পুনরায় এই দু'আ করেন ঃ 'হে আল্লাহ! এটা আপনি আমাদের জন্য আরও স্পষ্ট করে বর্ণনা করুন।' তখন সূরা নিসা'র এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَـٰرَىٰ

হে মু'মিনগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতের জন্য দাঁড়ায়মান হয়োনা। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪৩) প্রত্যেক সালাতের সময় ঘোষিত হতে থাকে যে, নেশাগ্রস্ত মানুষ যেন সালাতের নিকটেও না আসে। উমারকে (রাঃ) ডেকে এই আয়াতটিও পাঠ করে শোনানো হয়। উমার (রাঃ) পুনরায় এই প্রার্থনাই করেন ঃ 'হে আল্লাহ! আপনি আমাদের জন্য এটা আরও স্পষ্ট করে বর্ণনা করুন!' এবার সূরা মায়িদা'র আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। যখন উমারকে (রাঃ) এই আয়াতটিও পাঠ করে শুনানো হয় এবং তার কানে আয়াতটি فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ *'তোমরা কি বিরত হবেনা?* (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৯১) এই শেষ কথাটি পৌঁছে তখন তিনি বলেন ঃ ٱنْتَهَيْنَا

اِنْتَهَيْنَا অর্থাৎ 'আমরা বিরত থাকলাম, আমরা দূরে থাকলাম।' (আহমাদ ১/৫৩১, আবূ দাঊদ ৪/৭৯, তিরমিযী ৮/৪১৫, নাসাঈ ৮/২৮৭)

ইমাম আলী ইব্ন মাদীনী (রহঃ) বলেন যে, এর ইসনাদ উত্তম ও সঠিক। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটাকে সঠিক বলেছেন। মুসনাদ ইব্ন আবী হাতীম গ্রন্থে উমারের (রাঃ) **اِنْتَهَيْنَا اِنْتَهَيْنَا** উক্তির পরে এই কথাগুলিও রয়েছে ঃ মদ সম্পদকে ধ্বংস করে এবং জ্ঞান লোপ করে।' এ বর্ণনাটি এবং এর সঙ্গে মুসনাদ আহমাদে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত অন্যান্য বর্ণনাগুলি সূরা মায়িদায় মদ হারাম সম্বন্ধীয় আয়াতটির তাফসীরে ইনশাআল্লাহ বিস্তারিত বর্ণিত হবে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৯০)

উমার (রাঃ) বলেন ঃ **خَمْرٌ** মদ ঐ জিনিসের প্রত্যেকটিকে বলা হয় যা জ্ঞান লোপ করে। **مَيْسِرٌ** বলা হয় জুয়া খেলাকে। মদ এবং জুয়া ইসলামী কার্যক্রমকে বিঘ্নিত করে। উহা থেকে যে উপকার হয় তা পার্থিব বা ইহলৌকিক। যেমন ইহা শারীরিক শক্তি (সাময়িক) বৃদ্ধি করে, হজমে সাহায্য করে, মেধাশক্তি বৃদ্ধি হয়, এক ধরনের শিহরণ অনুভূত হয় এবং কখনো কখনো আর্থিক লাভবান হওয়া যায়। হাসান ইব্ন সাবিত (রাঃ) জাহিলিয়াত যামানার কবিতায় লিখেছিলেন ঃ মদ পান করে আমরা বাদশাহ ও বীর পুরুষ হয়ে যাই।

অনুরূপভাবে ইহার ব্যবসায়ও লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। এরকমই জুয়া খেলায় বিজয় লাভের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এগুলোর উপকারের তুলনায় ক্ষতি ও অপকারই বেশী। কেননা এর দ্বারা জ্ঞান লোপ পাওয়ার সাথে সাথে ধর্মও ধ্বংস হয়ে থাকে। এই আয়াতে মদ হারাম হওয়ার পূর্বাভাষ থাকলেও স্পষ্টভাবে হারাম হওয়ার কথা বর্ণিত হয়নি। তাই উমার (রাঃ) চাচ্ছিলেন যে, স্পষ্ট ভাষায় মদ হারাম হওয়ার আয়াত অবতীর্ণ হোক। অতএব সূরা মায়িদার আয়াতে পরিষ্কার ভাষায় বলে দেয়া হয় ঃ 'মদ পান, জুয়া খেলা, পাশা খেলা এবং তীরের সাহায্যে পূর্ব লক্ষণ গ্রহণ করা সমস্তই হারাম ও শাইতানী কাজ।

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَـٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَن يُوقِعَ

بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

হে মু'মিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তি ইত্যাদি এবং লটারীর তীর, এ সব গর্হিত বিষয়, শাইতানী কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং এ থেকে সম্পূর্ণ রূপে দূরে থাক, যেন তোমাদের কল্যাণ হয়। শাইতান তো এটাই চায় যে, মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা সৃষ্টি হোক এবং আল্লাহর স্মরণ হতে ও সালাত হতে তোমাদেরকে বিরত রাখে। সুতরাং এখনও কি তোমরা নিবৃত্ত হবেনা? (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৯০-৯১) ইব্ন উমার (রাঃ), শা'বী (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) কাতাদাহ (রহঃ) রাবী ইব্ন আনাস (রাঃ) ও আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, মদের ব্যাপারে প্রথম সূরা বাকারাহর এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এরপর অবতীর্ণ হয় সূরা নিসার আয়াতটি। সর্বশেষে সূরা মায়িদার আয়াতটি অবতীর্ণ করে আল্লাহ তা'আলা মদকে সম্পূর্ণরূপে হারাম করেন। (তাবারী ৪/৩৩১-৩৩৬)

সাধ্যমত দান করা উচিত

'কুলিল আ'ফওয়া' এর একটি পঠন *'কুলিল আ'ফউ'*ও রয়েছে এবং উভয় পঠনই বিশুদ্ধ। দু'টির অর্থ প্রায় একই। আল-হাকাম (রহঃ) মিকসাম (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এ আয়াতের (তারা জানতে চায় তারা কি পরিমান ব্যয় করবে) ভাবার্থ হচ্ছে, তোমরা তোমাদের পরিবারের জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু ব্যয় করবে। আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), 'আতা (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কাব (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আল কাশিম (রহঃ), সালিম (রহঃ), 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ) এবং রাবী ইব্ন আনাসও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৬৫৬, ৬৫৭) সহীহ মুসলিমে রয়েছে, 'এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার কাছে একটি স্বর্ণ মুদ্রা রয়েছে।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'তোমার কাজে লাগাও।' লোকটি বলল ঃ 'আমার নিকট আরও একটি রয়েছে।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'তোমার স্ত্রীর জন্য খরচ কর।' সে

বলল ঃ 'আরও একটি আছে।' তিনি বললেন ঃ 'তোমার ছেলেমেয়ের প্রয়োজনে লাগাও।' সে বলল ঃ 'আমার নিকট আরও একটি রয়েছে।' তিনি বলেন, 'তাহলে এখন তুমি চিন্তা-ভাবনা করে দেখতে পার।' (তাবারী ৪/৩৪০) সহীহ মুসলিমে অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি লোককে বললেন ঃ

'প্রথমে তুমি তোমার নিজ থেকে আরম্ভ কর। প্রথমে ওরই উপরে সাদাকাহ কর। অতিরিক্ত থাকলে ছেলেমেয়ের জন্য খরচ কর। এর পরেও থাকলে নিজের আত্মীয়-স্বজনের উপর সাদাকাহ কর। এর পরেও যদি থাকে তাহলে অন্যান্য অভাবগ্রস্তদের উপর সাদাকাহ কর।' (মুসলিম ২/৬৯২) অন্য একটি হাদীসে রয়েছে ঃ

'হে আদম সন্তান! তোমার হাতে তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা রয়েছে তা আল্লাহর পথে ব্যয় করাই তোমার জন্য মঙ্গলকর এবং তা ব্যয় না করা তোমার জন্য ক্ষতিকর। তবে হ্যাঁ, নিজের প্রয়োজন অনুপাতে খরচ করায় তোমার প্রতি কোন ভর্ৎসনা নেই।' (মুসলিম ১০৩৬) অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

ذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ অর্থাৎ আমি যেমন এই নির্দেশাবলী স্পষ্ট ও খোলাখুলিভাবে বর্ণনা করেছি, তদ্রুপ অবশিষ্ট নির্দেশাবলীও আমি পরিষ্কার ও বিস্তারিত বর্ণনা করব। জান্নাতের অঙ্গীকার ও জাহান্নাম হতে ভয় প্রদর্শনের কথাও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হবে, যেন তোমরা এই নশ্বর জগত হতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পারলৌকিক জগতের প্রতি আগ্রহী হতে পার, যা অনন্তকালের জন্য স্থায়ী হবে। (তাবারী ৪/৩৪৮)

ইয়াতীমের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ

অতঃপর পিতৃহীনদের সম্পর্কে নিদর্শনাবলী অবতীর্ণ হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاء اللّهُ لأعْنَتَكُمْ ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, পূর্বে এই নির্দেশ ছিল ঃ

وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ

আর ইয়াতীমরা বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ব্যতীত তাদের বিষয় সম্পত্তির কাছেও যেওনা (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৫২) এবং ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡيَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ نَارًاۖ وَسَيَصۡلَوۡنَ سَعِيرًا

যারা অন্যায়ভাবে পিতৃহীনদের ধন সম্পত্তি গ্রাস করে, নিশ্চয়ই তা স্বীয় উদরে অগ্নি ব্যতীত কিছুই ভক্ষণ করেনা এবং সত্ত্বরই তারা অগ্নি শিখায় প্রবেশ করবে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১০) এই আয়াতগুলি শ্রবণ করে পিতৃহীনদের অভিভাবকগণ ইয়াতীমদের আহার্য ও পানীয় হতে নিজেদের আহার্য ও পানীয় সম্পূর্ণরূপে পৃথক করে দেন। তখন ঐ পিতৃহীনদের জন্য রান্নাকৃত খাদ্য বেঁচে গেলে হয় ওরাই তা অন্য সময় খেয়ে নিত, না হয় নষ্ট হয়ে যেত। এর ফলে একদিকে যেমন ইয়াতীমদের ক্ষতি হতে থাকে, অপরদিকে তেমনি তাদের অভিভাবকগণ অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। সুতরাং তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে এই সম্বন্ধে আরয করেন। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং সৎ উদ্দেশে ও বিশ্বস্ততার সাথে তাদের সম্পদ নিজেদের সম্পদের সাথে মিলিত রাখার অনুমতি দেয়া হয়। (তাবারী ৪/৩৫০) আবূ দাঊদ, নাসাঈ, হাকিম ইত্যাদিতে এই বর্ণনাটি বিদ্যমান রয়েছে এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মনীষীদের একটি দল এর শান-ই নযুল এটাই বর্ণনা করেছেন। (হাদীস নং ৩/২৯১, ৬/২৫৬ ও ২/১০৩) মুজাহিদ (রহঃ), ‘আতা (রহঃ), আশ শাবী (রহঃ), ইব্ন আবী লাইলা (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সালাফগণের অনেকে একই মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ৪/৩৫০-৩৫৩)

আয়িশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, ‘ইয়াতীমদের খাদ্য ও পানীয় পৃথক করা ছাড়া খুঁটিনাটিভাবে তাদের মাল দেখাশুনা করা খুবই কঠিন।’ (তাবারী ৪/৩৫৫)

اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ এর ভাবার্থ এই পৃথক করণই বটে। কিন্তু وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ বলে মিলিত রাখার অনুমতি দেয়া হয়। কেননা তারাও তো ধর্মীয় ভাই। তবে নিয়াত সৎ হওয়া উচিত। ইয়াতীমদের ক্ষতি করার যদি উদ্দেশ্য থাকে তাহলে সেটাও আল্লাহ তা‘আলার নিকট অজানা নেই। আর যদি ইয়াতীমদের মঙ্গলের ও তাদের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্য থাকে তাহলে সেটাও আল্লাহ তা‘আলা খুব ভালই জানেন।’ আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

আর ইয়াতীমরা বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ব্যতীত তাদের বিষয় সম্পত্তির কাছেও যেওনা। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১৫২)

অতঃপর বলা হচ্ছে, আল্লাহ তোমাদেরকে কষ্ট ও বিপদের মধ্যে জড়িত করতে চাননা। পিতৃহীনদের আহার্য ও পানীয় পৃথক করণের ফলে তোমরা যে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলে আল্লাহ তা'আলা তা দূর করে দিলেন। এখন একই হাঁড়িতে রান্না করা এবং মিলিতভাবে কাজ করা তোমাদের জন্য মহান আল্লাহ বৈধ করলেন।

এমনকি পিতৃহীনের অভিভাবক যদি দরিদ্র হয় তাহলে ন্যায়সঙ্গতভাবে সে নিজের কাজে ইয়াতীমের মাল খরচ করতে পারে। আর যদি কোন ধনী অভিভাবক প্রয়োজন বশতঃ ইয়াতীমের মাল নিজের কাজে লাগায় তাহলে সে পরে তা আদায় করে দিবে। এই জিজ্ঞাস্য বিষয়গুলি সূরা নিসা'র তাফসীরে ইনশাআল্লাহ বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হবে।

২২১। এবং মুশরিক নারীকে ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা বিয়ে করনা এবং নিশ্চয়ই মু'মিন কৃতদাসী মুশরিক মহিলা অপেক্ষা উত্তম যদিও সে তোমাদেরকে মোহিত করে; এবং অংশীবাদীরা বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত তাদের সাথে (মুসলিম নারীদের) বিয়ে দিওনা এবং নিশ্চয়ই অংশীবাদী তোমাদের মনঃপুত হলেও বিশ্বাসী দাস তদপেক্ষা শ্রেয়তর; এরাই জাহান্নামের দিকে আহ্বান করে এবং আল্লাহ স্বীয় ইচ্ছায় জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন ও মানবমন্ডলীর জন্য স্বীয় নিদর্শনাবলী বিবৃত করেন যেন	٢٢١. وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِۦ ۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

তারা শিক্ষা গ্রহণ করে।	يَتَذَكَّرُونَ

মুশরিক নর-নারীকে বিয়ে করা অবৈধ

এখানে মুশরিক মহিলাদেরকে বিয়ে করার অবৈধতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। আয়াতটি সাধারণ বলে প্রত্যেক মুশরিক মহিলাকে বিয়ে করার নিষিদ্ধতা প্রমাণিত হলেও অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَـٰفِحِينَ

আর সতী সাধ্বী মুসলিম নারীরাও এবং তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাবের মধ্যকার সতী-সাধ্বী নারীরাও (তোমাদের বিয়ের জন্য হালাল), যখন তোমরা তাদেরকে তাদের বিনিময় (মহর) প্রদান কর, এ রূপে যে, তোমরা (তাদেরকে) পত্নী রূপে গ্রহণ করে নাও, না প্রকাশ্যে ব্যভিচার কর, আর না গোপন প্রণয় কর। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৫) ইব্ন আব্বাসেরও (রাঃ) উক্তি এটাই যে, ঐ মুশরিক মহিলাদের হতে কিতাবীদের মহিলাগণ বিশিষ্টা। মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), মাকহুল (রহঃ), হাসান ইব্ন সাবিত (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ), যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এবং রাবী ইব্ন আনাসেরও (রহঃ) উক্তি এটাই। কেহ কেহ বলেন যে, এই আয়াতটি শুধুমাত্র মূর্তিপূজক মুশরিকা নারীদের জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে।

ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) কিতাবী মহিলাদেরকে বিয়ে করার বৈধতার উপর ইজমা‘ নকল করেছেন এবং উমারের (রাঃ) এই হাদীস সম্বন্ধে লিখেছেন যে, এটা শুধু রাজনৈতিক যৌক্তিকতার ভিত্তিতে ছিল যেন মানুষ মুসলিম নারীগণের প্রতি অনাগ্রহী না হয় কিংবা অন্য কোন দূরদর্শিতা এই নির্দেশের মধ্যে নিহিত ছিল। একটি বর্ণনায় এও রয়েছে যে, হুযাইফা (রাঃ) যখন এই নির্দেশনামা প্রাপ্ত হন তখন তিনি উত্তরে লিখেন ঃ ‘আপনি কি এটাকে হারাম বলেন?’ মুসলিমদের খলীফা উমার ফারূক (রাঃ), বলেন ঃ ‘আমি হারাম তো বলিনা। কিন্তু আমার ভয় যে, তোমরা মুসলিম নারীদেরকে বিয়ে করছনা কেন?’ এই বর্ণনাটির ইসনাদও বিশুদ্ধ। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, উমার (রাঃ) বলেছেন ঃ ‘মুসলিম পুরুষ খৃষ্টান মহিলাকে বিয়ে করতে পারে, কিন্তু মুসলিম মহিলার সাথে

খৃষ্টান পুরুষের বিয়ে হতে পারেনা।' (তাবারী ৪/৩৬৬) এই বর্ণনাটির সনদ প্রথম বর্ণনাটি হতে সঠিকতর।

ইব্‌ন আবী হাতিমের বর্ণনায় রয়েছে যে, উমার (রাঃ) আহলে কিতাবের সাথে বিয়েকে অপছন্দ করে এই আয়াতটি পাঠ করেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) উমারের (রাঃ) এই উক্তিও নকল করেছেন ঃ 'কোন মহিলা বলে যে, ঈসা (আঃ) তার প্রভু, এই শির্‌ক অপেক্ষা বড় শির্‌ক আমি জানিনা।' (ফাতহুল বারী ৯/৩২৬) ইমাম আহমাদকে (রহঃ) এই আয়াতের ভাবার্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ 'এর দ্বারা আরাবের ঐ মুশরিক মহিলাদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা মূর্তি পূজা করত।'

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'চারটি জিনিস দেখে নারীদেরকে বিয়ে করা হয়। প্রথম মাল, দ্বিতীয় বংশ, তৃতীয় সৌন্দর্য এবং চতুর্থ ধর্মপরায়ণতা। তোমরা ধর্মপরায়ণতাই অনুসন্ধান কর।' (ফাতহুল বারী ৯/৩৫, মুসলিম ২/১০৮৭) সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'সম্পূর্ণ দুনিয়াটাই একটি সম্পদ বিশেষ। দুনিয়ার সম্পদসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম সম্পদ হচ্ছে সতী নারী।'

অতঃপর নির্দেশ দেয়া হচ্ছে ঃ 'মুশরিক পুরুষদের সাথে মুসলিম নারীদের বিয়ে দিওনা।' যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

তারা (মু'মিনা নারীরা) কাফিরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফিরেরা মু'মিনা নারীদের জন্য বৈধ নয়। (সূরা মুমতাহানাহ, ৬০ ঃ ১০) এর পরে বলা হয়েছে, মু'মিন পুরুষ যদি আবিসিনীয় ক্রীতদাসও হয় তথাপি সে স্বাধীন কাফির নেতা হতে উত্তম। ঐসব লোকের সাথে মেলামেশা, তাদের সাহচার্য, দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা এবং দুনিয়াকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেয়া শিক্ষা দেয়। এর পরিণাম হচ্ছে জাহান্নামে অবস্থান। আর আল্লাহ তা'আলার অনুগত বান্দাদের অনুসরণ, তাঁর নির্দেশ পালন জান্নাতের পথে চালিত করে এবং পাপ মোচনের কারণ হয়ে থাকে। মানুষকে উপদেশ ও শিক্ষা দেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে থাকেন।

২২২। এবং তারা তোমাকে (স্ত্রীলোকদের) ঋতু সম্বন্ধে	٢٢٢. وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ

জিজ্ঞেস করছে; তুমি বল ঃ ওটা হচ্ছে অশুচি। অতএব ঋতুকালে স্ত্রীলোকদেরকে অন্তরাল কর এবং উত্তম রূপে শুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটে যেওনা; অতঃপর যখন তারা পবিত্র হবে তখন আল্লাহর নির্দেশ মত তোমরা তাদের নিকট গমন কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাহকারীদেরকে ভালবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরকেও ভালবাসেন।	ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ
২২৩। তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেত্র স্বরূপ; অতএব তোমরা যখন যেভাবে ইচ্ছা স্বীয় জীবনের জন্য ব্যবহার কর এবং নিজেদের আগামী দিনের জন্য ব্যবস্থা কর এবং আল্লাহকে ভয় কর ও জেনে রেখ, একদিন আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হবে। আর বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ জানিয়ে দাও।	٢٢٣. نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّكُم مُّلَٰقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ

ঋতুবতী মহিলাদের সাথে সহবাস করা যাবেনা

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াহুদীরা ঋতুবতী মহিলাদেরকে তাদের সাথে খেতে দিতনা এবং তাদের পাশেও রাখতনা। সাহাবীগণ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তারই উত্তরে وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى

فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয় এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

'সহবাস ছাড়া অন্যান্য সবকিছু বৈধ। এ কথা শুনে ইয়াহুদীরা বলে ঃ 'আমাদের বিরুদ্ধাচরণই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দেশ্য।' উসায়েদ ইব্ন হুযায়ের (রাঃ) এবং ইবাদ ইব্ন বিশর (রাঃ) ইয়াহুদীদের এই কথা নকল করে বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদেরকে তাহলে ঋতুর সময়ও সহবাস করার অনুমতি দিন।' এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখমণ্ডল (এর রং) পরিবর্তিত হয়। অন্যান্য সাহাবীগণ (রাঃ) ধারণা করেন যে, তিনি তাঁদের প্রতি রাগান্বিত হয়েছেন। অতঃপর এই মহান ব্যক্তিদ্বয় চলে যেতে থাকলে রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট কোন এক ব্যক্তি উপঢৌকন স্বরূপ কিছু দুধ নিয়ে আসেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের পিছনে লোক পাঠিয়ে তাদেরকে ডেকে পাঠান এবং ঐ দুধ তাদেরকে পান করান। তখন জানা যায় যে, ঐ ক্রোধ প্রশমিত হয়েছে। (আহমাদ ৩/১৩২)

সুতরাং 'ঋতু অবস্থায় স্ত্রীদের হতে পৃথক থাক' এর ভাবার্থ হচ্ছে 'সহবাস করনা, এ ছাড়া অন্যান্য সবকিছুই বৈধ।' (মুসলিম ১/২৪৬) অধিকাংশ আলেমের অভিমত এই যে, সহবাস বৈধ নয় বটে, কিন্তু প্রেমালাপ করা বৈধ। হাদীসসমূহেও রয়েছে যে, এরূপ অবস্থায় স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও স্ত্রীদেরকে আদর-সোহাগ করতেন, কিন্তু তারা লজ্জাস্থান কাপড় দিয়ে বেঁধে রাখতেন। (আবূ দাঊদ ১/২৮৬)

মাসরূক (রহঃ) একদা আয়িশার (রাঃ) নিকট গমন করেন এবং বলেন ঃ *'আসসালামু আলান নাবী ওয়া আহলিহি'* নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবারের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। উত্তরে আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ 'মারহাবা, মারহাবা! অতঃপর তাঁকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেন। মাসরূক (রহঃ) বলেন ঃ 'আমি আপনাকে একটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি, কিন্তু লজ্জাবোধ করছি।' তিনি বলেন ঃ 'আমি তোমার মা এবং তুমি আমার ছেলে (সুতরাং যা জিজ্ঞেস করতে চাও কর)।' তিনি বলেন ঃ '(আচ্ছা বলুন তো) ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে তার স্বামীর কি করা কর্তব্য?' তিনি বলেন 'লজ্জাস্থান ছাড়া সবই জায়িয। (তাবারী ৪/৩৭৮) অন্য সনদেও বিভিন্ন শব্দে আয়িশা (রাঃ) হতে এ উক্তি বর্ণিত আছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) মুজাহিদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ)

এবং ইকরিমাহর (রহঃ) ফাতওয়া এটাই। ভাবার্থ এই যে, ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে উঠা-বসা, খাওয়া ও পান করা ইত্যাদি সবই সর্বসম্মতিক্রমে জায়িয।

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'আমি ঋতু অবস্থায় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথা ধৌত করতাম, তিনি আমার ক্রোড়ে হেলান দিয়ে শুইয়ে কুরআন মাজীদ পাঠ করতেন। (ফাতহুল বারী ১/৪৭৯) অন্যত্র আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ আমি হাড় চুষতাম এবং তিনিও ওখানেই মুখ দিয়ে চুষতেন। আমি পানি পান করে তাঁকে গ্লাস দিতাম এবং তিনিও ওখানেই মুখ দিয়ে ঐ গ্লাস হতে ঐ পানিই পান করতেন।' (মুসলিম ১/২৪৫)

হারিস হেলালিয়াহর (রাঃ) কন্যা মায়মুনা (রাঃ) বলেন ঃ 'নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাঁর কোন সহধর্মিণীর সাথে আদর-সোহাগের ইচ্ছা করতেন তখন তিনি তাকে কাপড় বেঁধে দেয়ার নির্দেশ দিতেন। (ফাতহুল বারী ১/৪৮৩, মুসলিম ১/২৪৩) এ রকমই সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে এই হাদীসটি আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। (ফাতহুল বারী ১/৪৮০, মুসলিম ১/২৪২) এ ছাড়া ইমাম আহমাদ (রহঃ), আবূ দাউদ (রহঃ), তিরমিযী (রহঃ) এবং ইব্ন মাজাহ (রহঃ) আরও বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন সা'দ আল-আনসারী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ

'আমার স্ত্রীর ঋতু অবস্থায় তার সাথে আমার কোন কিছু বৈধ আছে কি?' তিনি বলেন ঃ 'কাপড়ের উপরের সব কিছুই বৈধ। আহমাদ ৪/৩৪২, আবূ দাউদ ১/১৪৫, তিরমিযী ১/৪১৫ এবং ইব্ন মাজাহ ১/২১৩) এরপরে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّٰهُ তারা যখন পবিত্র হবে তখন তাদের সাথে সহবাস কর। যখন হায়েযের রক্ত আসা বন্ধ হবে এবং সময় অতিক্রান্ত হবে, ওর পরেও স্ত্রীর সাথে স্বামীর সহবাস হালাল হবেনা যে পর্যন্ত না সে গোসল করবে। তবে হ্যাঁ, যদি তার কোন ওজর থাকে এবং গোসলের পরিবর্তে যদি তার জন্য তায়াম্মুম করা যায়েয হয় তাহলে তায়াম্মুম করার পর তার কাছে স্বামী আসতে পারবে। এতে সমস্ত আলেমের মতৈক্য রয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, একবার তো يَطْهُرْنَ রয়েছে; এর ভাবার্থ হচ্ছে হায়েযের রক্ত বন্ধ হওয়া এবং *'তাতাহ্হারনা'* শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে গোসল করা। মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিববান (রহঃ) লায়েস ইব্ন সা'দ (রহঃ) প্রমুখ মহান ব্যক্তিগণও এটাই বলেন। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৬৮২, ৬৮৩)

স্ত্রীদের মলদ্বার ব্যবহার করা নিষেধ

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ ... مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّٰهُ তোমরা ঐ জায়গা দিয়ে এসো, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যার নির্দেশ দিচ্ছেন। এর ভাবার্থ হচ্ছে সম্মুখের স্থান। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) প্রমুখ অনেক মুফাসসিরও এই অর্থই বর্ণনা করেছেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে শিশুদের জন্মগ্রহণের জায়গা। (ইব্‌ন আবী হাতিম ২/৬৮৪) এছাড়া অন্য স্থান অর্থাৎ পায়খানার রাস্তায় সঙ্গম করা নিষেধ। এ রকম কাজ যারা করে তারা সীমা অতিক্রমকারী। সাহাবা (রাঃ) এবং তাবেঈন (রহঃ) হতে এর ভাবার্থ এরূপ বর্ণিত হয়েছে ঃ 'হায়েয অবস্থায় যে স্থান হতে তোমাদেরকে বিরত রাখা হয়েছিল এখন ঐ স্থান তোমাদের জন্য হালাল হয়ে গেল। এর দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝা গেল যে, পায়ু পথে অর্থাৎ পায়খানার জায়গায় সহবাস করা হারাম।

'তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের ক্ষেত্র বিশেষ' এর অর্থ

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের ক্ষেত্র বিশেষ। অর্থাৎ সন্তান বের হওয়ার স্থানে তোমরা যেভাবেই চাও তোমাদের ক্ষেত্রে এসো। নিয়ম ও পদ্ধতি পৃথক হলেও স্থান একই। অর্থাৎ সম্মুখ দিক দিয়ে অথবা পিছন দিক দিয়ে। সহীহ হাদীসে রয়েছে ঃ

'ইয়াহুদীরা বলত যে, স্ত্রীর সঙ্গে সম্মুখ দিক দিয়ে সহবাস না করলে, স্ত্রী যদি গর্ভবতী হয় তাহলে টেরা চক্ষু বিশিষ্ট সন্তান জন্মলাভ করবে।' তাদের এ কথার খণ্ডনে এই বাক্যটি অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী ৪/৩৯৭, মুসলিম ২/১০৫৮, আবূ দাঊদ ২/৬১৮) এতে বলা হয় যে, স্বামীর এ ব্যাপারে স্বাধীনতা রয়েছে। 'ইব্‌ন আবী হাতীম' গ্রন্থে রয়েছে যে, ইয়াহুদীরা এই কথাটিই মুসলিমদেরকেও বলেছিল। ইব্‌ন জুরাইজ (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই স্বাধীনতা দিয়েছেন যে, সম্মুখের দিক দিয়ে আসতে পারে এবং পিছনের দিক দিয়েও আসতে পারে। কিন্তু স্থান একটিই হবে। (ইব্‌ন আবী হাতীম ২/৬৯৩) অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, আনসারগণের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করল ঃ 'আমরা আমাদের স্ত্রীদের নিকট কিরূপে আসব এবং কিরূপে ছাড়ব?' তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'তারা তোমাদের ক্ষেত্র বিশেষ, যেভাবেই চাও এসো; তবে তা অবশ্যই জননেন্দ্রিয় দ্বারাই হতে হবে। (আহমাদ ১/২৬৮)

বর্ণিত আছে যে, আবদুল্লাহ ইব্ন সাবিত (রাঃ) আবদুর রাহমান ইব্ন আবূ বাকরের (রাঃ) কন্যা হাফসার (রাঃ) নিকট এসে বলেন, 'আমি একটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে চাই, কিন্তু লজ্জাবোধ করছি।' তিনি বলেন, 'হে ভ্রাতুস্পুত্র! লজ্জা করনা, যা জিজ্ঞেস করতে চাও জিজ্ঞেস কর।' তিনি বলেন, আচ্ছা বলুন তো, স্ত্রীদের সাথে পিছনের দিক দিয়ে সহবাস করা বৈধ কি?' তিনি বলেন, 'উম্মে সালামাহ (রাঃ) আমাকে বলেছেন যে, আনসারগণ (রাঃ) স্ত্রীদেরকে উল্টা করে শুইয়ে দিতেন এবং ইয়াহুদীরা বলত যে, এভাবে সহবাস করলে সন্তান টেরা হয়ে থাকে। অতঃপর যখন মুহাজিরগণ (রাঃ) মাদীনায় আগমন করেন এবং এখানকার মহিলাদের সাথে তাদের বিয়ে হয়, তখন তারাও এরূপ করতে চাইলে একজন মহিলা তার স্বামীর এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত আপনার কথা মানতে পারিনা। সুতরাং তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হন। উম্মে সালামাহ (রাঃ) তাকে বসতে দিয়ে বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখনই এসে যাবেন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করলে ঐ আনসারী মহিলাটি তো লজ্জায় জিজ্ঞেস করতে না পেরে ফিরে যান। কিন্তু উম্মে সালামাহ (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আনসারী মহিলাটিকে ডেকে পাঠাও।' তিনি তাকে ডেকে আনলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ এই আয়াতটি পাঠ করে শোনান এবং বলেন, 'স্থান একটিই হবে।' (আহমাদ ৬/৩০৫, তিরমিযী ৮/৩২২) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

ইমাম নাসাঈ (রহঃ) কা'ব ইব্ন আলকামাহ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, একদা নাফি'কে (রহঃ) আবূ নায্র (রহঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ লোকেরা বলাবলি করছে যে, আপনি নাকি ইব্ন উমারের (রাঃ) বরাতে বলেছেন যে, মহিলাদের গুহ্যদ্বারে গমন করা জায়িয রয়েছে? তিনি উত্তরে বলেন ঃ তারা আমার ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলছে। তাহলে শোন! তোমাদেরকে আমি একটি ঘটনার কথা বর্ণনা করছি। ইব্ন উমার (রাঃ) কুরআন পাঠ করছিলেন, এমতাবস্থায় আমি সেখানে উপস্থিত হই, যখন তিনি نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ *তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেত্রস্বরূপ, অতএব তোমরা যখন যেভাবে ইচ্ছা ক্ষেত্রে গমণ কর* পাঠ করেন তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ হে

নাফি! তুমি কি জান, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পিছনে কি কারণ ছিল? আমি বললাম ঃ না জানিনা। তিনি বললেন ঃ আমরা মাক্কার কুরাইশরা কখনো কখনো স্ত্রীদের পিছন থেকে সহবাস করতাম। যখন আমরা মাদীনায় হিজরাত করি এবং সেখানকার আনসারী মহিলাদেরকে বিয়ে করি তখন তাদের সাথেও পিছন দিক থেকে সহবাস করার ইচ্ছা করি। কিন্তু এটি তারা অপছন্দ করে এবং এটি একটি বিশেষ আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। অতঃপর আনসারী মহিলাগণ ইয়াহুদীদের অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করে পার্শ্বদেশ ফিরে শয়ন করে সহবাস কাজ সম্পন্ন করতে থাকে, তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করেন। (নাসাঈ ৫/৩১৫) এ বর্ণনাটি ধারাবাহিকতার দিক দিয়ে সঠিক।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হুযাইমা ইব্ন শাবি আল খাতামী (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'হে জনমণ্ডলী! তোমরা লজ্জাবোধ কর। আল্লাহ তা'আলা সত্য কথা বলতে লজ্জাবোধ করেননা।' স্ত্রীদের গুহ্যদ্বারে সহবাস করনা'। (আহমাদ ৫/২১৫, নাসাঈ ৫/৩১৫, ইব্ন মাজাহ ১/৬১৯) আরও একটি বর্ণনায় রয়েছে ঃ

'যে ব্যক্তি কোন স্ত্রী বা পুরুষের গুহ্যদ্বারে এ কাজ করে, তার দিকে আল্লাহ তা'আলা করুণার দৃষ্টিতে তাকাবেননা। (তিরমিযী ৪/৩২৯, নাসাঈ ৫/৩২০, ইব্ন হিব্বান ৬/২০২) এ ছাড়া ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আলী ইব্ন তালাক (রাঃ) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্ত্রীদের গুহ্যদ্বারে সহবাস করতে নিষেধ করেছেন, আল্লাহ সত্য কথা বলতে লজ্জাবোধ করেননা। (তিরমিযী ৪/২৭৪) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন যে, এ হাদীসটি হাসান।

আবূ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রাহমান দারিমী (রহঃ) তার মুসনাদে বর্ণনা করেছেন যে, সাঈদ ইব্ন ইয়াসার আবূ হুবাব (রহঃ) বলেছেন ঃ আমি ইব্ন উমারকে (রাঃ) বললাম ঃ স্ত্রীদের পিছনদ্বারে গমন করার ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? তিনি জানতে চাইলেন ঃ তুমি কি বলতে চাচ্ছ? আমি বললাম ঃ গুহ্যদ্বারে সহবাস করা। তিনি বললেন ঃ কোন মুসলিম কি এটা করতে পারে? (দারিমী ১/২৭৭) এ হাদীসটির ধারা বর্ণনায় সঠিকতা রয়েছে এবং ইব্ন উমার (রাঃ) হতে মহিলাদের গুহ্যদ্বারে সহবাস করার বিষয়টি পরিস্কারভাবে নাকচ করা হয়েছে।

আবূ বাকর ইব্ন যায়িদ নিশাপুরী (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইসমাঈল ইব্ন রূহ (রহঃ) বলেন যে, তিনি মালিক ইব্ন আনাসকে (রহঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ মহিলাদের পিছন দিকে (গুহ্যদ্বারে) সহবাস করার ব্যাপারে আপনার মতামত কি? তিনি বললেন ঃ সে কি আরাব? যে জায়গা দিয়ে গর্ভ হয় তা ছাড়া অন্য স্থান দিয়ে

কি সহবাস করা যায়? যেভাবে আদেশ করা হয়েছে সেভাবে (স্ত্রী-অঙ্গ) ব্যবহার কর। আমি তাকে বললাম ঃ 'জনাব! জনগণ তো এ কথাই বলে থাকে যে, আপনি এই কাজকে বৈধ বলেন।' তখন তিনি বলেন, 'তারা মিথ্যাবাদী। আমার উপর তারা অপবাদ দিচ্ছে।' সুতরাং ইমাম মালিক (রহঃ) হতেও এর অবৈধতা সাব্যস্ত হচ্ছে। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ), ইমাম শাফিঈ (রহঃ) ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (রহঃ) এবং তাদের সমস্ত ছাত্র ও সহচর যেমন সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (রহঃ), আবূ সালমা (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), তাউস (রহঃ), 'আতা (রহঃ) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) উরওয়া ইব্ন যুবাইর (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং হাসান বাসরী (রহঃ) প্রমুখ মনীষীগণ সবাই এই কাজকে অবৈধ বলেছেন এবং এ বিষয়ে অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। এমনকি তাদের মধ্যে কেহ কেহ এ কাজকে কুফরী পর্যন্ত বলেছেন। এর অবৈধতায় জামহুর উলামাদেরও ইজমা রয়েছে। যদিও কতকগুলি লোক মাদীনার ফকীহগণ হতে এমন কি ইমাম মালিক (রহঃ) হতেও এর বৈধতা নকল করেছেন, কিন্তু এগুলি সঠিক নয়। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ নিজেদের জন্য তোমরা আগেই কিছু পাঠিয়ে দাও। অর্থাৎ নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ হতে বিরত থাক এবং সৎকার্যাবলী সম্পাদন কর, যেন সাওয়াব আগে চলে যায়। এরপর তিনি বলেন ঃ

وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ আল্লাহকে ভয় কর এবং বিশ্বাস রেখ যে, তাঁর সাথে তোমাদেরকে সাক্ষাৎ করতে হবে এবং তিনি পুংখানুপুংখরূপে তোমাদের হিসাব নিবেন। ঈমানদারগণ সদা আনন্দিত থাকবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ 'ভাবার্থ এও হতে পারে যে, সহবাসের ইচ্ছা করলে 'বিসমিল্লাহ' বলবে। (তাবারী ৪/৪১৭) অন্যত্র তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেন ঃ কেহ তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার সময় নিম্নের দু'আটি পাঠ করবে ঃ

بِسْمِ اللَّهِ اَللَّهُمَّ جَنِّبْـــنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْـــتَـــنَا.

'আল্লাহর নামে শুরু করছি। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে শাইতানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচাও এবং আমাদের যে সন্তান দান করবে তাকেও শাইতান থেকে রক্ষা কর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যদি এই সহবাস দ্বারা শুক্র ধরে যায় তাহলে শাইতান ঐ সন্তানের কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা।' (ফাতহুল বারী ৯/১৩৬)

২২৪। এবং মানবমন্ডলীর মধ্যে হিত সাধন, পরহেযগারী ও মীমাংসা করে দেয়ার ক্ষেত্রে তোমরা স্বীয় শপথসমূহের জন্য আল্লাহর নামকে লক্ষ্যবস্তু বানিওনা। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।	٢٢٤. وَلَا تَجۡعَلُواْ ٱللَّهَ عُرۡضَةً لِّأَيۡمَـٰنِكُمۡ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصۡلِحُواْ بَيۡنَ ٱلنَّاسِۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
২২৫। তোমাদের নিরর্থক শপথসমূহের জন্য তোমাদেরকে আল্লাহ ধরবেননা, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে ঐ সব শপথ সম্বন্ধে ধরবেন যেগুলি তোমাদের মনের সংকল্প অনুসারে সাধিত হয়েছে; এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, ধৈর্যশীল।	٢٢٥. لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَـٰنِكُمۡ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتۡ قُلُوبُكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

ভাল কাজ পরিত্যাগ করার শপথ করা যাবেনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা আল্লাহর শপথ করে সাওয়াবের কাজ ও আত্মীয়তার বন্ধন যুক্ত রাখা পরিত্যাগ করনা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَلَا يَأۡتَلِ أُوْلُواْ ٱلۡفَضۡلِ مِنكُمۡ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤۡتُوٓاْ أُوْلِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡمَسَـٰكِينَ وَٱلۡمُهَـٰجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۖ وَلۡيَعۡفُواْ وَلۡيَصۡفَحُوٓاْۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغۡفِرَ ٱللَّهُ لَكُمۡ

তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তদেরকে এবং আল্লাহর পথে যারা গৃহত্যাগ করেছে তাদেরকে কিছুই দিবেনা; তারা যেন তাদের দোষ-ক্রটি উপেক্ষা করে; তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? (সূরা নূর, ২৪

ঃ ২২) পাপের কাজে কেহ যদি কেহ শপথ করে বসে তাহলে সে যেন শপথ ভেঙ্গে দিয়ে কাফ্ফারা আদায় করে।'

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ' আল্লাহর শপথ! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে শপথ করে এবং কাফ্ফারা আদায় করে তা ভঙ্গ না করে ওর উপরেই স্থির থাকে সে বড় পাপী।' (ফাতহুল বারী ১২/৪৪১, মুসলিম ৩/১২৭৬ আহমাদ ২/৩১৭) এই হাদীসটি আরও বহু সনদে অনেক কিতাবে বর্ণিত আছে। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস ও (রাঃ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন ঃ কোন ভাল কাজ না করার ব্যাপারে শপথ করবেনা; এরূপ ক্ষেত্রে কাফফারা আদায় করে ভাল কাজ করবে। (তাবারী ৪/৪২২) একই মতামত ব্যক্ত করেছেন মাসরুক (রহঃ), শা'বি (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), তাউস (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), 'আতা (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মাকহুল (রহঃ), যুহরী (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) প্রমুখগণ। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৭০০-৭০২) জামহুর উলামার এই উক্তির সমর্থন এই হাদীস দ্বারাও পাওয়া যাচ্ছে যে, আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'আল্লাহর শপথ! যদি আমি কোন শপথ করি এবং তা ভেঙ্গে দেয়ায় মঙ্গল বুঝতে পারি তাহলে আমি অবশ্যই তা ভেঙ্গে দিব এবং কাফ্ফারা আদায় করব।' (ফাতহুল বারী ১১/৫২৫, মুসলিম ৩/১২৬৮) সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যদি কোন ব্যক্তি শপথ করে, অতঃপর ওটা ছাড়া মঙ্গল কিছু চোখে পড়ে তাহলে কাফ্ফারা আদায় করে শপথ ভেঙ্গে দিয়ে ঐ সৎ কাজটি তার করা উচিত। (মুসলিম ৩/১২৭২)

অভ্যাসগত শপথের জন্য কোন কাফফারা নেই

বলা হচ্ছে ঃ لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেসব শপথ তোমাদের মুখ দিয়ে অভ্যাসগতভাবে বেরিয়ে যায়, আল্লাহ সেই জন্য তোমাদেরকে দোষী করবেননা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যে ব্যক্তি 'লাত' ও 'উয্যা'র নামে শপথ করে সে যেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ে নেয়।' (ফাতহুল বারী ১১/৫৪৫, মুসলিম ২/১২৬৮) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই ইরশাদ ঐ লোকদের উপর হয়েছিল যারা সবেমাত্র

ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং অজ্ঞতা যুগের শপথসমূহ তাদের মনের কোনে বিদ্যমানই ছিল। তাই তাদেরকে বলা হয়েছিল যে, যদি অভ্যাসগতভাবে কখনও তাদের মুখ দিয়ে এরূপ শির্কের কালেমা বেরিয়েও যায় তাহলে তারা তৎক্ষণাৎ কালেমা তাওহীদ পাঠ করলে এর বিনিময় হয়ে যাবে। এর পরে বলা হচ্ছে, যদি ঐসব শপথ মনের সংকল্প অনুসারে করা হয় তাহলে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই পাকড়াও করবেন। আয়িশা (রাঃ) হতে একটি মারফূ' হাদীস বর্ণিত হয়েছে যা অন্যান্য বর্ণনায় মাওকুফ রূপে এসেছে, তা এই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'অর্থহীন শপথ ঐগুলি যেগুলি মানুষ তাদের ঘর-বাড়ী ও সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে করে থাকে। যেমন হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ বা না, আল্লাহর শপথ!' (আবূ দাঊদ ৩/৫৭২) মোট কথা, অভ্যাস হিসাবেই মুখ দিয়ে এ কথাগুলো বের হয়, এতে মনের সংকল্প মোটেই থাকেনা।

ইব্ন আবী হাতিম বলেছেন যে, 'লাঘু' বা অর্থহীন শপথ হল ঐগুলি যা রাগের মাথায় বলা হয়। তিনি আরও বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ অর্থহীন শপথ হল তা যে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে সম্মতি রয়েছে। এ ধরনের শপথ বাস্তবায়ন না করার কারণে কাফফারা আদায় করতে হবেনা। সাঈদ ইব্ন যুবাইরও (রহঃ) অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৭১৫) সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আনসারী দুই ভাইয়ের মধ্যে মীরাসের কিছু মাল ছিল। একজন অপরজনকে বলেন ঃ 'আমাদের মধ্যে এই মাল বন্টন করা হোক।' তখন অপর জন বলেন ঃ 'যদি তুমি এই মাল বন্টন করতে বল তাহলে আমার অংশের সমস্ত মাল কা'বার জন্য দান করব।' উমার (রাঃ) এই ঘটনাটি শুনে বলেন ঃ 'কা'বা কোন সম্পদের মুখাপেক্ষী নয়। তুমি তোমার শপথ ভেঙ্গে দাও এবং কাফ্ফারা আদায় কর এবং তোমার ভাইয়ের সাথে মীমাংসা করে নাও। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে শুনেছি ঃ 'তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে, আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতায়, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করায় এবং যে জিনিসের উপর অধিকার নেই তাতে না আছে শপথ কিংবা না আছে 'নযর'। (আবূ দাঊদ ৩/৫৮১) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা মনের সংকল্পের সাথে যে শপথ করবে তার জন্য তোমাদেরকে ধরা হবে। অর্থাৎ মিথ্যা জানা সত্ত্বেও যদি তুমি শপথ কর তাহলে এ জন্য আল্লাহ তা'আলা তোমাকে পাকড়াও করবেন। যেমন বলা হয়েছে ঃ

وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَٰنَ

কিন্তু তিনি তোমাদেরকে ঐ শপথসমূহের জন্য পাকড়া করবেন যেগুলিকে তোমরা (ভবিষ্যত বিষয়ের প্রতি) দৃঢ় কর। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৮৯) আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে ক্ষমাকারী এবং তিনি অত্যন্ত সহনশীল।

২২৬। যারা স্বীয় স্ত্রীগণ হতে পৃথক থাকার শপথ করে তারা চার মাস প্রতীক্ষা করবে, অতঃপর যদি তারা প্রত্যাবর্তিত হয় তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।	٢٢٦. لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
২২৭। পক্ষান্তরে যদি তারা তালাক দিতেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয় তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।	٢٢٧. وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

'ইলা' সম্পর্কে আলোচনা

যদি কোন লোক কিছুদিন পর্যন্ত স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাস না করার শপথ করে তাহলে এরূপ শপথকে ايلاء বলা হয়। এর দু'টি রূপ রয়েছে। এই সময় চার মাসের কম হবে বা বেশি হবে। যদি কম হয় তাহলে চার মাস পূরা করবে এবং এই সময়ের মধ্যে স্ত্রীও ধৈর্যধারণ করবে। এর মধ্যে সে স্বামীর নিকট আবেদন জানাতে পারবেনা। এই চার মাস পূরা হওয়ার পর স্বামী-স্ত্রী পরস্পর মিলিত হবে। যেমন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক মাসের জন্য শপথ করেছিলেন এবং পূর্ণ ঊনত্রিশ দিন পৃথক থাকেন এবং বলেন, 'মাস ঊনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে।' (ফাতহুল বারী ৮/৩৮০, মুসলিম ২/১১১৩) উমার (রাঃ) হতে আরও একটি অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৪/১৪৩, মুসলিম ২/১১১০)

আর যদি চার মাসের বেশি সময়ের জন্য শপথ করে তাহলে চার মাস পূর্ণ হওয়ার পর স্বামীর নিকট আবেদন জানানোর অধিকার স্ত্রীর রয়েছে যে, হয় মিলিত হবে, না হয় তালাক দিবে। চার মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাদেরকে বাধ্য করা হবে যে, হয় তারা স্ত্রীদের সাথে মিলিত হবে, না হয় তালাক দিবে।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মাসরুক (রহঃ), আশ-শা'বি (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং ইব্ন জারীরও (রহঃ) এরূপ তাফসীর করেছেন। (তাবারী ৪/৪৬৬-৪৬৭) এর দ্বারা বুঝা গেল যে, اِيْلَاء স্ত্রীদের জন্যই নির্দিষ্ট করা হয়েছে, দাসীদের জন্য নয়। এটাই জামহুর উলামার মতামত।

অতঃপর ঘোষণা হচ্ছে 'চার মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর যদি সে তালাক দেয়ার ইচ্ছা করে' এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, চার মাস অতিবাহিত হলেই তালাক হয়ে যায়না। নাফি (রহঃ) হতে মালিক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমার (রাঃ) বলেছেন ঃ স্বামী যদি তার স্ত্রীর ব্যাপারে 'ইলা' (সহবাস না করার সংকল্প) করে তাহলে চার মাস অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে আপনাআপনি স্ত্রী তালাক হয়ে যাবেনা, চার মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর হয় সে তালাক দিবে অথবা ফিরিয়ে নিবে। (মুয়াত্তা ২/৫৫৬, ফাতহুল বারী ৯/৩৩৫) ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন, সুহাইল ইব্ন আবূ সালিহ (রহঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ আমি ১২ জন সাহাবীকে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে 'ইলা' করার বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছি। তারা সবাই বলেছেন যে, চার মাস অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত কোন কিছুই করতে হবেনা, এরপর হয় সে রেখে দিবে অথবা তালাক দিবে। (তাবারী ৪/৪৯৩) সুহাইল (রহঃ) থেকে দারাকুতনীও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (৪/৬১)

উমার (রাঃ), উসমান (রাঃ), আলী (রাঃ) আবুদ দারদা (রাঃ), উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রাঃ), ইব্ন উমার (রাঃ) ও ইব্ন আব্বাসও (রাঃ) এটাই বলেছেন। তাবেঈগণের মধ্যে সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (রহঃ), উমার ইব্ন আবদুল আযীয (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), তাউস (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (রহঃ) এবং কাসিমেরও (রহঃ) উক্তি এটাই।

২২৮। এবং তালাক প্রাপ্তাগণ তিন ঋতু পর্যন্ত অপেক্ষা করবে; এবং যদি তারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে তাহলে আল্লাহ তাদের গর্ভে যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা তাদের পক্ষে বৈধ হবেনা; এবং এর মধ্যে যদি তারা সন্ধি কামনা করে	٢٢٨. وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ

তাহলে তাদের স্বামীই তাদেরকে প্রতিগ্রহণ করতে সমধিক স্বত্ববান; আর নারীদের উপর তাদের স্বামীদের যেরূপ স্বত্ব আছে, স্ত্রীদেরও তাদের পুরুষদের (স্বামীর) উপর তদনুরূপ ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে; এবং তাদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে; আল্লাহ হচ্ছেন মহা পরাক্রান্ত, বিজ্ঞানময়।	وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَـٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দাত

যে সাবালিকা নারীদের সাথে তাদের স্বামীদের মিলন ঘটেছে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারা যেন তালাকপ্রাপ্তির পর তিন ঋতু পর্যন্ত অপেক্ষা করে। অতঃপর ইচ্ছা করলে অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারে।

‘আল-কুরূ’ এর অর্থ

যে তুহুরে তালাক দেয়া হয় ওটাও গণনার মধ্যে ধরা হয়। কাজেই জানা যাচ্ছে যে, আলোচ্য আয়াতেও قُرُوْءٌ শব্দের ভাবার্থ তুহুর বা পবিত্রতাই নেয়া হয়েছে। আরাব কবিদের কবিতাতেও قُرُوْءٌ শব্দটি তুহুর বা পবিত্রতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। قُرُوْءٌ শব্দ সম্বন্ধে দ্বিতীয় উক্তি এই যে, ওর অর্থ হচ্ছে ‘ঋতু’। তাহলে ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ এর অর্থ হবে তিন ঋতু। সুতরাং স্ত্রী যে পর্যন্ত না তৃতীয় ঋতু হতে পবিত্র হবে সে পর্যন্ত সে ইদ্দাতের মধ্যেই থাকবে। এর একটি দলীল হচ্ছে উমারের (রাঃ) এই ফাইসালাটি ঃ তাঁর নিকট একজন তালাকপ্রাপ্তা নারী এসে বলে ঃ আমার স্বামী আমাকে একটি বা দু'টি তালাক দিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি আমার নিকট সে সময় আগমন করেন যখন আমি কাপড় ছেড়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করেছিলাম (অর্থাৎ গোসলের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম)। তাহলে বলুন, এখন নির্দেশ কি? (অর্থাৎ ‘রাজ’আত’ হবে কি হবেনা?) উমার (রাঃ) আবদুল্লাহ ইব্ন

মাসঊদকে (রাঃ) এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন ঃ এ বিষয়ে আপনার মতামত কি? তিনি উত্তরে বলেন ঃ আমার তো মনে হয় সে এখনো তার স্ত্রী, যেহেতু সে সালাত আদায় করা শুরু করতে পারেনি (তৃতীয় মাসিকের পর পবিত্র হওয়ার পূর্বেই যেহেতু তাকে ফিরিয়ে নিতে চাচ্ছে)। তখন উমার (রাঃ) বললেন ঃ আমারও এটাই অভিমত। (তাবারী ৪/৫০২)

আবূ বাকর (রাঃ), উমার (রাঃ), উসমান (রাঃ), আলী (রাঃ), আবূ দারদা (রাঃ), উবাদাহ ইব্ন সামিত (রাঃ), আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) মু'য়ায (রাঃ), উবাই ইব্ন কা'ব (রা), আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) এবং ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। সাইদ ইব্ন মুসাইয়াব (রহঃ), আলকামাহ (রহঃ), আসওয়াদ (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), 'আতা (রহঃ), তাঊস (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন সীরিন (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), শা'বী (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), মাকহুল (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ), এবং 'আতা আল খুরাসানীও (রহঃ) এটাই বলেছেন।

একটি হাদীসেও রয়েছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাতিমা বিন্ত আবূ হুবাইশকে (রাঃ) বলেছিলেন ঃ 'তোমরা اَقْرَاء এর দিনে সালাত আদায় করবেনা।' (আবূ দাঊদ ১/১৯১, নাসাঈ ৬/২১১) সুতরাং জানা গেল যে, اَقْرَاءٌ শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে ঋতু। কিন্তু এই হাদীসের মুনযির নামে একজন বর্ণনাকারী অপরিচিত বলে ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বলেছেন। তার নাম প্রসিদ্ধি লাভ করেনি। তবে ইব্ন হিব্বান (রহঃ) তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন।

ঋতু এবং তা থেকে পবিত্র হওয়ার ব্যাপারে মহিলাদের বক্তব্য প্রাধান্য পাবে

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ তাদের গর্ভে যা রয়েছে তা গোপন করা বৈধ নয়। অর্থাৎ গর্ভবতী হলেও প্রকাশ করতে হবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইব্ন উমার (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), শা'বী (রহঃ), হাকাম ইব্ন উতাইবাহ (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ),

যাহহাক (রহঃ) এবং অন্যান্যরা এরূপ তাফসীর করেছেন। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৭৪৪, ৭৪৫) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ যদি তাদের আল্লাহর উপর ও কিয়ামাতের উপর বিশ্বাস থাকে। এর দ্বারা মহিলাদেরকে সাবধান করা হচ্ছে যে, তারা যেন মিথ্যা কথা না বলে। এর দ্বারা এটাও জানা যাচ্ছে যে, এই সংবাদ প্রদানে তাদের কথা বিশ্বাসযোগ্য হবে। কেননা এর উপরে কোন বাহ্যিক সাক্ষ্য উপস্থিত করা যেতে পারেনা। তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে যে, 'ইদ্দাত' হতে তাড়াতাড়ি বের হওয়ার জন্য ঋতু না হওয়া সত্ত্বেও যেন তারা 'ঋতু হয়ে গেছে' এ কথা না বলে। কিংবা 'ইদ্দাত'কে বাড়িয়ে দেয়ার জন্য ঋতু হওয়া সত্ত্বেও যেন তারা 'ঋতু হয়নি' এ কথা না বলে।

ইদ্দাত অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার প্রথম অধিকার স্বামীর

এর পরে বলা হচ্ছে ঃ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا যে স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে, 'ইদ্দাতে'র মধ্যে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার তার পূর্ণ অধিকার রয়েছে, যদি 'তালাক-ই রাজঈ' হয়ে থাকে। অর্থাৎ এক তালাক এবং দুই তালাকের পরে স্ত্রীকে ইদ্দাতের মধ্যে ফিরিয়ে নিতে পারে। এ কথা মনে রাখতে হবে যে, এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার সময় তালাক-ই বায়েন (তিন তালাক) ছিলইনা। বরং সে সময় পর্যন্ত শত তালাক দিলেও 'তালাক-ই রাজঈ' থাকত। ইসলামের নির্দেশাবলীর মধ্যে তালাক-ই বায়েন এসেছে যে, যদি তিন তালাক হয়ে যায় তাহলে আর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া যাবেনা।

স্বামী-স্ত্রী উভয়ের উপর রয়েছে উভয়ের অধিকার

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف স্ত্রীদের উপর যেমন স্বামীদের অধিকার রয়েছে তেমনই স্বামীদের উপরও স্ত্রীদের অধিকার রয়েছে। সুতরাং প্রত্যেকেরই অপরের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। সহীহ মুসলিমে জাবীর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বিদায় হাজ্জের ভাষণে জনগণকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

‘হে জনমণ্ডলী! তোমরা স্ত্রীদের সম্বন্ধে আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা আল্লাহর আমানাত হিসাবে তাদেরকে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালেমা দ্বারা তাদের লজ্জাস্থানকে বৈধ করে নিয়েছ। স্ত্রীদের উপর তোমাদের এই অধিকার রয়েছে যে, তারা তোমাদের বিছানায় এমন কেহকে আসতে দিবেনা যাদের প্রতি তোমরা অসন্তুষ্ট। যদি তারা এই কাজ করে তাহলে তোমরা তাদেরকে প্রহার কর। কিন্তু এমন প্রহার করনা যে, বাইরে তা প্রকাশ পায়। তোমাদের উপর তাদের এই অধিকার রয়েছে যে, তোমরা তাদেরকে তোমাদের সামর্থ্য অনুসারে খাওয়াবে ও পরাবে।’ (মুসলিম ২/৮৮৬)

বা’হয ইব্ন হাকিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, মুয়াবীয়া ইব্ন হাইদাহ আল কুশাইরী (রহঃ) তার দাদা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের উপর আমাদের স্ত্রীদের কি কি অধিকার রয়েছে?’ তিনি উত্তরে বললেন ঃ

‘যখন তুমি খাবে তখন তাকেও খাওয়াবে। তুমি যখন পরবে তখন তাকেও পরাবে। তাকে তার মুখের উপর মেরনা। তাকে গালি দিওনা এবং রাগান্বিত হয়ে তাকে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দিওনা বরং বাড়ীতেই রেখ।’ (আবূ দাঊদ ২/৬০৬) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলতেন, ‘আমি পছন্দ করি যে, আমার স্ত্রীকে খুশি করার জন্য আমি নিজেকে সুন্দর করে সাজাই, যেমন আমার স্ত্রী আমাকে খুশি করার জন্য নিজেকে সুন্দর সাজে সাজিয়ে থাকে।’ (তাবারী ৪/৫৩২)

স্ত্রীর উপর স্বামীর শ্রেষ্ঠত্ব

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন, স্ত্রীদের উপর স্বামীদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। অর্থাৎ দৈহিক, চারিত্রিক মর্যাদা, হুকুম, আনুগত্য, খরচ, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি সব দিক দিয়েই স্ত্রীদের উপর স্বামীদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। মোট কথা, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মর্যাদা হিসাবে পুরুষদের প্রাধান্য রয়েছে। যেমন অন্য জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٍ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ

পুরুষরা নারীদের উপর তত্ত্বাবধানকারী ও ভরণপোষণকারী, যেহেতু আল্লাহ তাদের মধ্যে একের উপর অপরকে বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এই হেতু যে, তারা স্বীয় ধন সম্পদ হতে তাদের জন্য ব্যয় করে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৩৪)

এরপরে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর অবাধ্য বান্দাদের উপর প্রতিশোধ নেয়ার ব্যাপারে মহাপরাক্রান্ত এবং স্বীয় নির্দেশাবলীর ব্যাপারে মহাবিজ্ঞ।

২২৯। তালাক দুইবার; অতঃপর (স্ত্রীকে) হয় বিহিতভাবে রাখতে হবে অথবা সদ্ভাবে পরিত্যাগ করতে হবে; আর নিজেদের দেয় সম্পদ থেকে কিছু ফিরিয়ে নেয়া তোমাদের জন্য জায়িয নয় স্ত্রীদের কাছ থেকে, যদি উভয়ে আশংকা করে যে, তারা আল্লাহর সীমা স্থির রাখতে পারবেনা। অনন্তর তোমরা যদি আশংকা কর যে, আল্লাহর নির্দেশ ঠিক রাখতে পারবেনা, সেই অবস্থায় স্ত্রী নিজের মুক্তি লাভের জন্য কিছু বিনিময় দিলে তাতে উভয়ের কোন দোষ নেই; এগুলি হচ্ছে আল্লাহর সীমাসমূহ। অতএব তা অতিক্রম করনা এবং যারা আল্লাহর সীমা অতিক্রম করে বস্তুতঃ তারাই অত্যাচারী।	٢٢٩. ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦ ۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ
২৩০। অতঃপর যদি সে তালাক প্রদান করে তাহলে এরপরে অন্য স্বামীর সাথে বিবাহিতা না হওয়া পর্যন্ত সে তার জন্য বৈধ হবেনা, অতঃপর সে তাকে তালাক প্রদান করলে	٢٣٠. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ

যদি উভয়ে পরস্পর প্রত্যাবর্তিত হয় তাতে উভয়ের পক্ষে কোনই দোষ নেই, যদি আল্লাহর সীমারেখা বজায় রাখার ইচ্ছা থাকে। এবং এগুলিই আল্লাহর সীমাসমূহ, তিনি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য এগুলি ব্যক্ত করে থাকেন।	عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

তালাক দিতে হবে তিন মাসে তিনবার

ইসলামের পূর্বে প্রথা ছিল এই যে, স্বামী যত ইচ্ছা স্ত্রীকে তালাক দিত এবং ইদ্দাতের মধ্যে ফিরিয়ে নিত। ফলে স্ত্রীগণ সংকটপূর্ণ অবস্থায় পতিত হয়েছিল। স্বামী তাদেরকে তালাক দিত এবং ইদ্দাত অতিক্রান্ত হওয়ার নিকটবর্তী হতেই ফিরিয়ে নিত। পুনরায় তালাক দিত। কাজেই স্ত্রীদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। ইসলাম এই সীমা নির্ধারণ করে দেয় যে, এভাবে মাত্র দু'টি তালাক দিতে পারবে। الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ তৃতীয় তালাকের পর ফিরিয়ে নেয়ার আর কোন অধিকার থাকবেনা। আবূ দাঊদে রয়েছে যে, তিন তালাকের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া রহিত হয়ে গেছে। (আবূ দাঊদ ২/৬৪৪)

নাসাঈতেও এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এটাই বলেন। (নাসাঈ ৬/২১২) মুসনাদ ইব্‌ন আবী হাতীম গ্রন্থে রয়েছে, এক ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে বলে ঃ 'আমি তোমাকে রাখবওনা এবং ছেড়েও দিবনা।' স্ত্রী বলে ঃ 'কিরূপে?' সে বলে ঃ 'তোমাকে তালাক দিব এবং ইদ্দাত শেষ হওয়ার সময় হলেই ফিরিয়ে নিব। আবার তালাক দিব এবং ইদ্দাত শেষ হওয়ার পূর্বেই পুনরায় ফিরিয়ে নিব। এরূপ করতেই থাকব।' ঐ মহিলাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে তার এই দুঃখের কথা বর্ণনা করে। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (ইব্‌ন আবী হাতিম ২/৭৫৪, তাবারী ৪/৫৩৯) তৃতীয় তালাকের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার স্বামীর কোন অধিকার থাকলনা এবং তাদেরকে বলা হল দুই তালাক পর্যন্ত তোমাদের অধিকার রয়েছে যে, সংশোধনের উদ্দেশে তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে ফিরিয়ে নিবে যদি তারা ইদ্দাতের মধ্যে থাকে এবং তোমাদের এও অধিকার রয়েছে যে, তোমরা তাদের

ইদ্দাত অতিক্রান্ত হতে দিবে এবং তাদেরকে ফিরিয়ে নিবেনা, যেন তারা নতুনভাবে বিয়ের যোগ্য হয়ে যায়। আর যদি তৃতীয় তালাক দেয়ারই ইচ্ছা কর তাহলে সদ্ভাবে তালাক দিবে। তাদের কোন হক নষ্ট করবেনা, তাদের উপর অত্যাচার করবেনা এবং তাদের কোন ক্ষতি করবেনা।

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ যখন কেহ তার স্ত্রীকে দ্বিতীয়বার তালাক দেয় সে যেন তৃতীয় তালাক প্রদানের সময় আল্লাহকে ভয় করে। হয় সে তাকে তার কাছে রেখে দিবে এবং তার প্রতি দয়ার্দ্র হবে, অন্যথায় তার প্রতি দয়া পরবশ হবে এবং তার কোন অধিকারকে বাধাগ্রস্ত করবেনা। (তাবারী ৪/৫৪৩)

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করে ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এই আয়াতে দুই তালাকের কথাতো বর্ণিত হয়েছে, তৃতীয় তালাকের বর্ণনা কোথায় রয়েছে?' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ 'সদ্ভাবে পরিত্যাগ করতে হবে' এর মধ্যে রয়েছে।' (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২২৯)

মোহর ফিরিয়ে নেয়া

وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا যখন তৃতীয় তালাক দেয়ার ইচ্ছা করবে তখন স্ত্রীকে তালাক গ্রহণে বাধ্য করার উদ্দেশে তার জীবন সংকটময় করা এবং তার প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করা স্বামীর জন্য হারাম। যেমন কুরআন মাজীদে রয়েছে ঃ

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَـٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ

এবং প্রকাশ্য অশ্লীলতা ব্যতীত তোমরা তাদেরকে যা প্রদান করেছ উহার কিয়দংশ গ্রহণের জন্য তাদেরকে প্রতিরোধ করনা। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৯) তবে স্ত্রী যদি খুশি মনে কিছু দিয়ে তালাক প্রার্থনা করে সেটা অন্য কথা। যেমন অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا

কিন্তু যদি তারা সন্তুষ্ট চিত্তে কিয়দংশ প্রদান করে তাহলে সঠিক বিবেচনা মতে তৃপ্তির সাথে ভোগ কর। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪)

খোলা তালাক' এবং মোহর ফিরিয়ে দেয়া

যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতানৈক্য বেড়ে যায় এবং স্ত্রী স্বামীর প্রতি সন্তুষ্ট না থাকে ও তার হক আদায় না করে, এরূপ অবস্থায় যদি সে তার স্বামীকে কিছু প্রদান করে তালাক গ্রহণ করে তাহলে তার দেয়ায় এবং নেয়ায় কোন পাপ নেই। এটাও মনে রাখার বিষয় যে, স্ত্রী যদি বিনা কারণে তার স্বামীর নিকট 'খোলা' তালাক প্রার্থনা করে তাহলে সে অত্যন্ত পাপী হবে।

কখনও কখনও এমন হয় যে, মহিলারা কোন যথাযথ কারণ ছাড়াই বিয়ে ভেঙ্গে দিতে চায় এবং তালাকের জন্য বলতে থাকে। এ ব্যাপারে ইব্ন জারীর (রহঃ) শাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যে স্ত্রী বিনা কারণে তার স্বামীর নিকট তালাক প্রার্থনা করে তার জন্য জান্নাতের সুগন্ধিও হারাম। (তাবারী ৫/৫৬৯, তিরমিযী ৪/৩৬৭) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার কারণ এই যে, মুয়াত্তা ইমাম মালিকে রয়েছে ঃ 'হাবীবা বিন্ত সাহল আনসারিয়া' (রাঃ) সাবিত ইব্ন কায়েস ইব্ন শামাসের (রাঃ) স্ত্রী ছিলেন। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাজরের সালাতের জন্য অন্ধকার থাকতেই বের হন। দরজার উপর হাবীবা বিন্ত সাহলকে (রাঃ) দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করেন, 'কে তুমি'? তিনি বলেন ঃ 'আমি সাহলের কন্যা হাবীবা'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'খবর কি'? তিনি বলেন ঃ 'আমি সাবিত ইব্ন কায়েসের (রাঃ) স্ত্রী রূপে থাকতে পারিনা।' এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নীরব হয়ে যান। অতঃপর তার স্বামী সাবিত ইব্ন কায়েস (রাঃ) আগমন করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন ঃ 'হাবীবা বিন্ত সাহল (রাঃ) কিছু বলেছে।' হাবীবা (রাঃ) বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তিনি আমাকে যা কিছু দিয়েছেন তা সবই আমার নিকট বিদ্যমান রয়েছে এবং আমি ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত রয়েছি।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাবিতকে (রাঃ) বললেন, 'ঐগুলি গ্রহণ কর।' সাবিত ইব্ন কায়েস (রাঃ) তখন সেগুলি গ্রহণ করেন এবং হাবীবা (রাঃ) মুক্ত হয়ে যান।' (মুয়াত্তা মালিক ২/৫৬৪, আহমাদ ৬/৪৩৩, আবূ দাঊদ ২/৬৬৭ এবং নাসাঈ ৬/১৬৯)

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, সাবিতের (রাঃ) স্ত্রী হাবীবা (রাঃ) এ কথাও বলেছিলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাকে চরিত্র ও ধর্মভীরুতার ব্যাপারে

দোষারোপ করছিনা, কিন্তু আমি তাকে ইসলামের মধ্যে কুফরী করাকে (হাবীবার প্রতি সাবিতের দায়িত্ব পালন না করা) অপছন্দ করি।' তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ তুমি কি তোমাকে দেয়া তার বাগান তাকে ফেরত দিবে? মহিলাটি বলল ঃ হ্যাঁ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাবিতকে (রাঃ) বললেন ঃ বাগানটি ফেরত নাও এবং তালাক দাও। (ফাতহুল বারী ৯/৩০৬, নাসাঈ ৬/১৬৯)

খোলা তালাকের ইদ্দাত

রুবাই বিনত মুওয়ায়্যিয ইব্ন আফরা (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় খোলা তালাকের জন্য অনুরোধ করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে এক ঋতুকাল ইদ্দাত পালন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। (তিরমিযী ৪/৩৬৩)

আল্লাহর দেয়া সীমা লংঘন করা হল অত্যাচার

এর পরে বলা হচ্ছে, 'এগুলি আল্লাহর সীমাসমূহ।' সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'তোমরা আল্লাহর সীমা অতিক্রম করনা, তাঁর ফার্যসমূহ বিনষ্ট করনা, তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের অসম্মান করনা, শারীয়াতে যেসব বিষয়ের উল্লেখ নেই, তোমরাও সেগুলি সম্পর্কে নীরব থাকবে। (দারাকুতনী ৪/২৯৮)

একই বৈঠকে তিন তালাক দেয়া অবৈধ/হারাম

বর্ণিত এই আয়াত দ্বারা ঐসব মনীষীগণ দলীল গ্রহণ করেছেন যারা বলেন যে, একই সময়ে তিন তালাক দেয়াই হারাম। ইমাম মালিক (রহঃ) ও তাঁর অনুসারীদের এটাই মাযহাব। তাদের মতে সুন্নাত পন্থা এই যে, তালাক একটি একটি করে দিতে হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اَلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ অর্থাৎ 'তালাক দু'বার। 'এগুলি আল্লাহর সীমা, অতএব সেগুলি অতিক্রম করনা।' আল্লাহ তা'আলার এই নির্দেশকে সুনান নাসাঈতে বর্ণিত নিম্নের হাদীস দ্বারা জোরদার করা হয়েছে।

হাদীসটি এই যে, কোন এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে একই সাথে তিন তালাক দিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন ঃ 'আমি তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কি আল্লাহর কিতাবের সাথে খেল-তামাশা শুরু করলে?'

তখন একটি লোক দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি কি তাকে হত্যা করব?' (নাসাঈ ৬/১৪২)

তৃতীয় তালাকের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া যাবেনা

এরপরে বলা হচ্ছে ঃ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে দু'তালাক দেয়ার পরে তৃতীয় তালাক দিয়ে ফেলবে তখন সে তার উপর হারাম হয়ে যাবে, যে পর্যন্ত না অন্য কেহ নিয়মিতভাবে তাকে বিয়ে করে সহবাস করার পর তালাক দিবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, সে যদি কোন লোকের সাথে সহবাস করে থাকে অথবা সে যদি দাসী হয় এবং তার মালিকের সাথে যৌনমিলন করে থাকে তথাপি তার পূর্বস্বামীর সাথে (যে তাকে তিন তালাক দিয়েছে) বিবাহ বন্ধন আইনসিদ্ধ হবেনা। কারণ যার সাথে যৌন মিলনে লিপ্ত হয়েছে সে তার বিয়ে করা স্বামী নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেন ঃ দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সহবাস না করা পর্যন্ত পূর্ব স্বামীর জন্য সে হালাল হবেনা। আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত একটি হাদীসে রয়েছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ 'একটি লোক এক মহিলাকে বিয়ে করল এবং সহবাসের পূর্বেই (তিন) তালাক দিয়ে দিল। অতঃপর সে অন্য স্বামীর সাথে বিবাহিতা হল, সেও তাকে সহবাসের পূর্বে তালাক দিয়ে দিল। এখন কি তাকে বিয়ে করা তার পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল হবে।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'না, না। যে পর্যন্ত না তারা একে অপরের মধুর স্বাদ গ্রহণ করে। (ফাতহুল বারী ৯/২৮৪, মুসলিম ২/১০৫৭)

একটি বর্ণনায় এও রয়েছে যে, আয়িশা (রাঃ) বলেছেন ঃ রিফা'আহ আল-কারাযীর (রাঃ) স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হয় যখন আমি এবং আবূ বাকর (রাঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলাম। সে বলতে লাগল ঃ আমি রিফা'আহর স্ত্রী ছিলাম, কিন্তু সে আমাকে তালাক দেয় যা ছিল অপরিবর্তনযোগ্য (তিন তালাক)। অতঃপর আমি আবদুর রাহমান ইব্‌ন যুবাইরকে (রাঃ) বিয়ে করি। কিন্তু তার গোপনাঙ্গ যেন একটি ছোট রশি (তার স্ত্রীর আকাঙ্খা পূরণ করার ক্ষমতা নেই)। অতঃপর মহিলাটি তার কাপড়ের ভিতর থেকে একটি ছোট রশি বের করে দেখায় (এটা বুঝানোর জন্য সে কত অক্ষম)। খালিদ ইব্‌ন সাঈদ ইবনুল আস (রাঃ) পাশের দরজার কাছে ছিলেন, যাকে

ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়নি, তিনি বলেন ঃ হে আবূ বাকর! আপনি কেন ঐ মহিলাকে নিবৃত্ত করছেননা যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এ ধরনের খোলামেলা কথা বলছে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটু মুচকি হাসলেন এবং মহিলাকে বললেন ঃ তুমি কি রিফা'আহকে আবার বিয়ে করতে চাও? কিন্তু তাতো সম্ভব নয়, যতক্ষণ না তুমি তোমার বর্তমান স্বামীর স্বাদ গ্রহণ করছ এবং সে তোমার স্বাদ গ্রহণ করছে। (আহমাদ ৬/৩৪, ফাতহুল বারী ১০/৫১৮, মুসলিম ২/১০৫৭, নাসাঈ ৬/১৪৬)

হিলা বিয়েতে অংশগ্রহণকারীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ

দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করার ভাবার্থ হচ্ছে ঐ স্ত্রীর প্রতি দ্বিতীয় স্বামীর আগ্রহ থাকতে হবে এবং চিরস্থায়ীভাবে তাকে স্ত্রী রূপে রাখার উদ্দেশে হতে হবে। যদি উদ্দেশ্য থাকে এই যে, দ্বিতীয় বিয়ে করা হবে শুধুমাত্র প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে যাবার জন্য, তাহলে এ ধরনের বিয়ে অবৈধ এবং হাদীসে এ ধরনের বিয়েতে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি অভিশাপ বর্ষিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া এ ধরনের কথা উল্লেখ করে যদি কোন চুক্তিতে স্বাক্ষর করা হয় তাহলে সেই চুক্তিও বাতিল বলে অধিকাংশ আলেম মতামত ব্যক্ত করেছেন।

হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, যে স্ত্রী লোক উলকী করে এবং যে স্ত্রী লোক উলকী করিয়ে নেয়, যে স্ত্রী লোক চুল মিলিয়ে দেয় এবং যে মিলিয়ে নেয়, যে 'হালালা' করে এবং যার জন্য 'হালালা' করা হয়, যে সুদ প্রদান করে এবং যে সুদ গ্রহণ করে এদের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিশাপ দিয়েছেন। (আহমাদ ১/৪৪৮, তিরমিযী ৪/২৬৮, নাসাঈ ৬/১৪৯) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন যে, সাহাবীগণের (রাঃ) আমল এর উপরেই রয়েছে। উমার (রাঃ), উসমান (রাঃ) এবং ইব্ন উমারের (রাঃ) এটাই মাযহাব। তাবেঈ ধর্ম শাস্ত্রবিদগণও এটাই বলেন। আলী (রাঃ), ইব্ন মাসউদ (রাঃ) এবং ইব্ন আব্বাসেরও (রাঃ) এটাই উক্তি। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, সুদের সাক্ষ্যদানকারী এবং লেখকের প্রতিও অভিসম্পাত। যারা যাকাত প্রদান করেনা এবং যারা যাকাত আদায় করার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে তাদের উপরও অভিসম্পাত।

একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ধার করা ষাঁড় কে তা কি আমি তোমাদেরকে বলব?' জনগণ বলেন, 'হ্যাঁ বলুন।' তিনি বলেছেন, 'যে 'হালালা' করে অর্থাৎ যে তালাক প্রাপ্তা নারীকে এজন্য বিয়ে করে যেন সে তার পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যায়।' যে ব্যক্তি এরূপ কাজ করে তার উপরও আল্লাহর লা'নত এবং যে ব্যক্তি নিজের জন্য এটা করিয়ে নেয় সেও

অভিশপ্ত।' একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, এরূপ বিয়ে সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেন, 'এটা বিয়েই নয় যাতে উদ্দেশ্য থাকে এক এবং বাহ্যিক হয় অন্য এবং যাতে আল্লাহর কিতাবকে নিয়ে খেল-তামাশা করা হয়। বিয়ে তো শুধুমাত্র ওটাই যা আগ্রহের সাথে হয়ে থাকে।'

মুসতাদরাক হাকিমে রয়েছে, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইব্ন উমারকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ 'একটি লোক তার স্ত্রীকে তৃতীয় তালাক দিয়ে দেয়। এরপর তার ভাই তাকে এই উদ্দেশে বিয়ে করে যে, সে যেন তার ভাইয়ের জন্য হালাল হয়ে যায়। এই বিয়ে কি শুদ্ধ হয়েছে?' তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'কখনও নয়। আমরা এটাকে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে ব্যভিচারের মধ্যে গণ্য করতাম। বিয়ে ওটাই যাতে আগ্রহ থাকে।' এ হাদীসটি মাওকুফ হলেও এর শেষের বাক্যটি একে মারফু'র পর্যায়ে এনে দিয়েছে। এমন কি অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, আমীরুল মু'মিনীন উমার (রাঃ) বলেছেন ঃ 'যদি কেহ এই কাজ করে বা করায় তাহলে আমি উভয়কে ব্যভিচারের শাস্তি দিব অর্থাৎ রজম করে দিব। (ইব্ন আবী শাইবাহ ৪/২৯৪)

তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা
কখন তার প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে যেতে পারবে

ঘোষণা দেয়া হচ্ছে ঃ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا দ্বিতীয় স্বামী যদি বিয়ে ও সহবাসের পর তালাক দেয় তাহলে পূর্ব স্বামী পুনরায় ঐ স্ত্রীকে বিয়ে করলে কোন পাপ নেই, إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّٰه যদি তারা সদ্ভাবে বসবাস করে এবং এটাও জেনে নেয় যে, ঐ দ্বিতীয় বিয়ে শুধু প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা ছিলনা, বরং প্রকৃতই বিয়ে ছিল। (তাবারী ৪/৫৯৮) এটাই হচ্ছে আল্লাহর বিধান যা তিনি জ্ঞানীদের জন্য প্রকাশ করে দিয়েছেন।

২৩১। এবং তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দাও, আর তারা তাদের নির্ধারিত সময়ে পৌঁছে যায়, তখন তাদেরকে নিয়মিতভাবে রাখতে পার অথবা নিয়মিতভাবে পরিত্যাগ	٢٣١. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍۚ

করতে পার; এবং তাদেরকে যন্ত্রণা দেয়ার জন্য আবদ্ধ করে রেখনা, তাহলে সীমা লংঘন করবে; আর যে ব্যক্তি এরূপ করে সে নিশ্চয়ই নিজের প্রতি অবিচার করে থাকে। এবং আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে বিদ্রুপাচ্ছলে গ্রহণ করনা, তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তোমাদেরকে উপদেশ দানের জন্য গ্রন্থ ও বিজ্ঞান হতে যা অবতীর্ণ করেছেন তা স্মরণ কর, আর আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রেখ যে, আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।	وَلَا تُمۡسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعۡتَدُواْ ۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا ۚ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيۡكُم مِّنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَٱلۡحِكۡمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٌ

তালাক দেয়া স্ত্রীর প্রতি সদয় ব্যবহার করতে হবে

পুরুষদের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, যে তালাকের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার থাকে এই তালাক প্রদানের পর যখন ইদ্দাত শেষ হবে তখন হয় তাদেরকে সদ্ভাবে ফিরিয়ে নিবে অর্থাৎ ফিরিয়ে নেয়ার উপর সাক্ষী রাখবে এবং সদ্ভাবে বসবাস করার নিয়াত করবে অথবা সদ্ভাবে পরিত্যাগ করবে। আর ইদ্দাত শেষ হওয়ার পর কোন ঝগড়া-বিবাদ, মতবিরোধ এবং শত্রুতা না করেই বিদায় দিবে। অজ্ঞতা যুগের জঘন্য প্রথাকে ইসলাম উঠিয়ে দিয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), মাসরুক (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), রাবী (রহঃ) এবং মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) বলেছেন যে, এক লোক তার স্ত্রীকে তালাক দিত এবং যখন তার ইদ্দাতের সময় প্রায় শেষ হয়ে আসত তখন সে আবার ফিরিয়ে নিত। তার এ রকম করার উদ্দেশ্য ছিল স্ত্রীকে কষ্ট দেয়া এবং অন্য কারও সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে না দেয়া। এভাবে সে তালাক দিতে থাকল এবং ইদ্দাত শেষ

হওয়ার আগেই ফিরিয়ে নিতে লাগল। আল্লাহ তার এ আচরণকে নিষিদ্ধ করে আয়াত নাযিল করেন এবং জানিয়ে দেন যে, যারা এরূপ করে তারা অত্যাচারী। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُوًا তোমরা আল্লাহর নির্দেশাবলীকে বিদ্রুপ করনা। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশআরী গোত্রের উপর অসন্তুষ্ট হন। আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'তোমাদের এক লোক কেন বলে ঃ আমি তালাক দিয়েছি, আবার ফিরিয়ে নিয়েছি? জেনে রেখ যে, এগুলো তালাক নয়। স্ত্রীদেরকে তাদের ইদ্দাত অনুযায়ী তালাক প্রদান কর।' (তাবারী ৫/১৪) মাসরুক (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াত ঐ লোকদের উদ্দেশ্য করে নাযিল হয়েছে যারা তাদের স্ত্রীদেরকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশে তালাক দিয়ে আবার ফিরিয়ে নেয় যাতে তাদের ইদ্দাতকাল দীর্ঘায়িত হয়। (তাবারী ৫/৮) হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ), রাবী (রহঃ) এবং মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) বলেছেন ঃ সে হল ঐ লোক যে তার স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং বলে ঃ আমিতো তোমার সাথে কৌতুক করছিলাম! অথবা যে তার দাসীকে মুক্ত করে অথবা বিয়ে করে এবং বলে ঃ আমি তো হাসি-ঠাট্টা করছিলাম মাত্র! আল্লাহ তাদের ব্যাপারে বলেন ঃ আল্লাহর নির্দেশাবলীকে বিদ্রুপাচ্ছলে গ্রহণ করনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৩১)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা আল্লাহর নি'আমাতসমূহ স্মরণ কর যে, তিনি তোমাদের নিকট রাসূল পাঠিয়েছেন, হিদায়াত ও দলীল অবতীর্ণ করেছেন, কিতাব ও সুন্নাত শিখিয়েছেন, নির্দেশও দিয়েছেন এবং নিষেধও করেছেন ইত্যাদি। তোমরা যে কাজ কর এবং যে কাজ হতে বিরত থাক সব সময়েই আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রেখ যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক প্রকাশ্য ও গোপনীয় বিষয় খুব ভালভাবেই জানেন।

২৩২। এবং যখন তোমরা স্ত্রীলোকদেরকে তালাক দাও, অতঃপর তারা তাদের নির্ধারিত সময়ে পৌঁছে যায়, তখন তারা উভয়েই যদি পরস্পরের প্রতি বিহিতভাবে সম্মত হয়ে থাকে,	٢٣٢. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا

تَرَٰضَوۡاْ بَيۡنَهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمۡ يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۗ ذَٰلِكُمۡ أَزۡكَىٰ لَكُمۡ وَأَطۡهَرُۗ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ	সেই অবস্থায় স্ত্রীরা নিজ স্বামীদেরকে বিয়ে করতে গেলে তোমরা তাদেরকে বাঁধা প্রদান করনা; তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এর দ্বারা তাদেরকেই উপদেশ দেয়া হচ্ছে; তোমাদের জন্য এটি শুদ্ধতম ও পবিত্রতম ব্যবস্থা। এবং আল্লাহ অবগত আছেন ও তোমরা অবগত নও।

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তার পূর্ব-স্বামীর কাছে ফিরে যেতে চাইলে অভিভাবকের বাধা দেয়া উচিত নয়

এই আয়াতে স্ত্রীদের অভিভাবক উত্তরাধিকারীদেরকে বলা হচ্ছে যে, যখন কোন মহিলা তালাকপ্রাপ্তা হয় এবং ইদ্দাতও অতিক্রান্ত হয়ে যায় তখন যদি স্বামী-স্ত্রী পরস্পর সম্মত হয়ে পুনরায় বিয়ে করতে ইচ্ছা করে তাহলে যেন তারা তাদেরকে বাধা না দেয়। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ এ আয়াতটি ঐ লোকের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে যে তার স্ত্রীকে একবার অথবা দুইবার তালাক দিয়েছে এবং স্ত্রীও তার ইদ্দাত শেষ করেছে। এমতাবস্থায় সে তার স্ত্রীকে আবার ফিরিয়ে নেয়ার ইচ্ছা করেছে এবং স্ত্রীও ফিরে যেতে ইচ্ছুক। কিন্তু তার পরিবার তার পূর্ব স্বামীর কাছে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী নয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তার পরিবারকে জানিয়ে দিলেন যে, এতে তাদের বাধা দেয়া উচিত নয়। মাসরূখ (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), যুহরী (রহঃ) এবং যাহ্হাক (রহঃ) বলেন যে, এটাই আসলে এই আয়াত (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৩২) নাযিল হওয়ার কারণ। (তাবারী ৫/২২, ২৩)

অভিভাবক ছাড়া বিয়ে বৈধ নয়

এই আয়াতটি এই বিষয়েরও দলীল যে, মহিলারা নিজেই বিয়ে করতে পারেনা এবং অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে হতে পারেনা। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) এই আয়াতের তাফসীরে এই হাদীসটি এনেছেন ঃ

'এক মহিলা অন্য মহিলার বিয়ে দিতে পারেনা এবং সে নিজেও নিজের বিয়ে দিতে পারেনা। এই মহিলারা ব্যভিচারিণী যারা নিজেদের বিয়ে নিজেরাই দিয়ে দেয়।' (ইব্‌ন মাজাহ ১/৬০৬) আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে মহিলাকে তার অভিভাবক বিয়ে দেয়নি, তার বিয়ে বাতিল, তার বিয়ে বাতিল, তার বিয়ে বাতিল। আর একটি হাদীসে রয়েছে ঃ

'প্রাপ্ত বয়স্ক অভিভাবক ও দু'জন ন্যায়পরায়ণ বিশ্বাসী লোক সাক্ষী ছাড়া বিয়ে হয়না।' (মাজমা আয যাওয়ায়িদ ৪/২৮৬)

২ ঃ ২৩২ নং আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্য

এই আয়াতটি মা'কীল ইব্‌ন ইয়াসার (রাঃ) এবং তার বোন সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়। বর্ণিত আছে যে, মা'কীল ইব্‌ন ইয়াসার (রাঃ) বলেন, 'আমার নিকট আমার বোনের বিয়ের প্রস্তাব এলে আমি তার বিয়ে দিয়ে দেই। তার স্বামী কিছুদিন পর তাকে তালাক দেয়। ইদ্দাত অতিক্রান্ত হওয়ার পর পুনরায় সে আমার নিকট বিয়ের প্রস্তাব করে। আমি তা প্রত্যাখ্যান করি। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এটা শুনে মা'কীল (রাঃ) 'আল্লাহর শপথ! আমি তোমার সঙ্গে আমার বোনের বিয়ে দিবনা' এ শপথ সত্ত্বেও বলেন ঃ আমি আল্লাহর নির্দেশ শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি।' অতঃপর তিনি তার ভগ্নিপতিকে ডেকে পাঠিয়ে পুনরায় তার সাথে তার বোনের বিয়ে দেন এবং নিজের কসমের কাফ্‌ফারা আদায় করেন। (ফাতহুল বারী ৮/৪০, আবূ দাঊদ ২/৫৬৯, তিরমিযী ৮/৩২৫, ইব্‌ন আবী হাতিম ২/৭৭৮, তাবারী ৫/১৭-১৯, বাইহাকী ৭/১০৪)

অতঃপর বলা হচ্ছে, এসব উপদেশ ঐসব লোকের জন্য যাদের শারীয়াতের প্রতি বিশ্বাস রয়েছে এবং আল্লাহ ও কিয়ামাতের ভয় রয়েছে। তাদের উচিত, তারা যেন তাদের অধীনস্থ নারীদেরকে এরূপ অবস্থায় বিয়ে হতে বিরত না রাখে, তারা যেন শারীয়াতের অনুসরণ করে এরূপ নারীদেরকে তাদের স্বামীদের হাতে সমর্পণ করে এবং শারীয়াতের পরিপন্থী নিজেদের মর্যাদাবোধ ও জিদকে শারীয়াতের পদানত করে। এটাই তাদের জন্য উত্তম।

২৩৩। এবং যদি কেহ স্তন্য পানের কাল পূর্ণ করতে ইচ্ছা করে তার জন্য জননীগণ পূর্ণ দুই বছর স্বীয় সন্তানদেরকে	٢٣٣. وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ

أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ	স্তন্য দান করবে; আর সন্তানের জনকগণ বিহিতভাবে প্রসূতিদের খোরাক ও তাদের পোষাক দিতে বাধ্য; কেহকেও তার সাধ্যের অতীত কষ্ট দেয়া যাবেনা, নিজ সন্তানের কারণে জননীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা চলবেনা, এবং পিতার জন্যও একই বিধান, কিন্তু যদি তারা পরস্পর পরামর্শ ও সম্মতি অনুসারে স্তন্য ত্যাগ করাতে ইচ্ছা করে তাতে উভয়ের কোন দোষ নেই; আর তোমরা যদি নিজ সন্তানদেরকে স্তন্য পানের জন্য সমর্পণ করে বিহিতভাবে কিছু প্রদান কর তাহলেও তোমাদের কোন দোষ নেই; এবং আল্লাহকে ভয় কর ও জেনে রেখ যে, তোমরা যা করছ আল্লাহ তা প্রত্যক্ষকারী।

মাতৃদুগ্ধ পান করার সময়সীমা দুই বছর

এখানে আল্লাহ তা'আলা শিশুর জননীদেরকে লক্ষ্য করে বলেন যে, শিশুদেরকে দুধ পান করানোর পূর্ণ সময় হচ্ছে দু'বছর। এর পরে দুধ পান করলে তা ধর্তব্য নয় এবং এ সময়ে দু'টি শিশু একত্রে দুধ পান করলে তারা তাদের পরস্পরের দুধ ভাই বা দুধ বোন হওয়া সাব্যস্ত হবেনা। সুতরাং তাদের মধ্যে

বিয়ে হারাম হবেনা। অধিকাংশ ইমামের এটাই মাযহাব। জামেউত তিরমিযীতে এই অধ্যায় রয়েছে ঃ

‘যে দুধ পান দ্বারা (বিয়ের) নিষিদ্ধতা সাব্যস্ত হয় তা এই দু’বছরের পূর্বেই।’ (তিরমিযী ৪/৩১৩) অতঃপর হাদীস আনা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘ঐ দুধ পান দ্বারাই নিষিদ্ধতা (পরস্পরের বিয়ের নিষিদ্ধতা) সাব্যস্ত হয়ে থাকে যে দুগ্ধ পাকস্থলীকে পূর্ণ করে দেয় এবং দুধ ছাড়ার পূর্বে হয়।’ এই হাদীসটি হাসান সহীহ। অধিকাংশ জ্ঞানী, সাহাবীগণ (রাঃ) প্রমুখের এর উপরই আমল রয়েছে যে, দু’বছরের পূর্বের দুধ পানই বিয়ে হারাম করে থাকে। এর পরের সময়ের দুগ্ধ পান বিয়ে হারাম করেনা। এই হাদীসের বর্ণনাকারী সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের শর্তের উপরে রয়েছে। (দারাকুতনী ৪/১৭৪) হাদীসের মধ্যে فِى الثَّدْىِ শব্দটির অর্থও হচ্ছে দুগ্ধ পানের সময় অর্থাৎ দু’বছর পূর্বের সময়। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিশু পুত্র ইবরাহীমের (রাঃ) মৃত্যু হয়েছিল সেই সময় তিনি বলেছিলেন ঃ

‘আমার পুত্র দুগ্ধ পানের যুগে মারা গেল, তার জন্য দুগ্ধদানকারী জান্নাতে নির্দিষ্ট রয়েছে।’ (উমদাতুত তাফসীর ১/১২৬) দারাকুতনীর হাদীসে দু’বছরের পরের দুগ্ধ পান ধর্তব্য না হওয়ার একটি হাদীস রয়েছে।

ইব্ন আব্বাসও (রাঃ) বলেন যে, এই সময়ের পরে কিছুই নেই। (মুয়াত্তা ২/৬০২) সুনান আবূ দাঊদ তায়ালেসীর বর্ণনায় রয়েছে যে, দুধ ছুটে যাওয়ার পর দুধ পান কোন ধর্তব্য বিষয় নয় এবং সাবালক হওয়ার পর পিতৃহীনতার হুকুম প্রযোজ্য নয়। কুরআন মাজীদে রয়েছে ঃ فِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ দুধ ছাড়ার সময় হচ্ছে দু ’বছর। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ১৪) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا তাকে বহন করা ও তার দুধ ছাড়ার সময় হচ্ছে ত্রিশ মাস। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ১৫) দু বছরের পরে দুগ্ধ পানের দ্বারা যে বিয়ের অবৈধতা সাব্যস্ত হয়না এটা হচ্ছে নিম্নলিখিত মনীষীদের উক্তি ঃ আলী (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইব্ন মাসউদ (রাঃ), যাবির (রাঃ), আবূ হুরাইরাহ (রাঃ), ইব্ন উমার (রাঃ), উম্মে সালমা (রাঃ), সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (রহঃ), ‘আতা (রহঃ) এবং জামহুর উলামা।

দুই বছর পরেও স্তন্য দান প্রসঙ্গ

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, আয়িশা (রাঃ) দু’ বছরের পরেও, এমন কি বড় মানুষের দুধ পানকেও বিয়ে অবৈধকারী মনে করতেন। (মুসলিম ২/১০৭৭) ‘আতা (রহঃ) ও লায়েসেরও (রহঃ) উক্তি এটাই। আয়িশা (রাঃ) যেখানে কোন পুরুষ লোকের যাতায়াত দরকার মনে করতেন সেখানে নির্দেশ দিতেন যে, স্ত্রীলোকেরা যেন তাকে তাদের দুধ পান করিয়ে দেয়। নিম্নের হাদীসটি তিনি দলীল রূপে পেশ করেন ঃ ‘আবূ হুযাইফার (রাঃ) গোলাম সালিমকে (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দেন যে, সে যেন আবূ হুযাইফার (রাঃ) স্ত্রীর দুগ্ধ পান করে নেয়। অথচ সে বয়স্ক লোক ছিল এবং এই দুগ্ধ পানের কারণে সে বরাবরই আবূ হুযাইফার (রাঃ) বাড়ীতে যাতায়াত করত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যান্য সহধর্মিণীগণ এটা অস্বীকার করতেন এবং বলতেন যে, এটা সালিমের (রাঃ) জন্য বিশিষ্ট ছিল। (আবূ দাঊদ ২/৫৪৯, ৫৫০) প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য এই নির্দেশ নয়, এটাই জামহুরের মাযহাব এবং উম্মুল মু’মিনীন আয়িশা (রাঃ) ছাড়া সমস্ত নাবী সহধর্মিণীগণেরও একই অভিমত। তাদের দলীল হচ্ছে ঐ হাদীসটি যা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘তোমাদের ভাই কোন্‌টি তা দেখে নাও। দুধ পান সাব্যস্ত সেই সময় হয় যখন দুধ ক্ষুধা নিবারণ করে।’

অর্থের বিনিময়ে দুধ পান করানো

অতঃপর ঘোষণা করা হচ্ছে ঃ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ শিশুদের জননীগণের ভাত-কাপড়ের দায়িত্ব তাদের জনকদের উপর রয়েছে। তারা তা শহরে প্রচলিত প্রথা হিসাবে আদায় করবে। কম বা বেশি না দিয়ে সাধ্যানুসারে তারা শিশুর জননীদের খরচ বহন করবে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত সে, আল্লাহ যা তাকে দান করেছেন তা হতে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যে সামর্থ্য

দিয়েছেন তদপেক্ষা গুরুতর বোঝা তিনি তার উপর চাপিয়ে দেননা। আল্লাহ কষ্টের পর দিবেন স্বস্তি। (সূরা তালাক, ৬৫ ঃ ৭) যাহ্হাক (রহঃ) বলেন, 'যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিবে এবং তার সাথে তার শিশুও থাকবে তখন ঐ শিশুকে দুগ্ধ দানের সময় পর্যন্ত শিশুর মায়ের থাকা খাওয়া এবং মান সম্মত পরিধেয় বস্ত্রের খরচ বহন করা তার স্বামীর উপর ওয়াজিব। (তাবারী ৫/৩৯)

শিশুকে সংকটে নিপতিত না করা

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে, মা যেন তার শিশুকে দুগ্ধ পান করাতে অস্বীকার করে শিশুর পিতাকে সংকটময় অবস্থায় নিক্ষেপ না করে, বরং শিশুকে যেন দুগ্ধ পান করাতে থাকে। কেননা এটা তার জীবন-যাপনের উপায়ও বটে। অতঃপর যখন শিশুর দুগ্ধের প্রয়োজন মিটে যাবে তখন তাকে তার পিতার নিকট ফিরিয়ে দিবে। কিন্তু তখনও যেন পিতার ক্ষতি করার ইচ্ছা না থাকে। অনুরূপভাবে পিতাও যেন বলপূর্বক শিশুকে তার মায়ের নিকট হতে ছিনিয়ে না নেয়। কেননা এতে তার মায়ের কষ্ট হবে। উত্তরাধিকারীদেরও উচিত, তারা যেন শিশুর মায়ের খরচ কমিয়ে না দেয় এবং তারা যেন তার প্রাপ্যের রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং তার ক্ষতি না করে। لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا *নিজ সন্তানের কারণে জননীকে ক্ষতিগ্রস্থ করা চলবেনা।* এর অর্থ হল শিশুর মাকে কষ্ট দেয়ার জন্য শিশুকে তার মায়ের কাছ থেকে নিয়ে নেয়া। মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ), যুহরী (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), সাওরী (রহঃ), ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও এ আয়াতের ইহাই তাফসীর করেছেন। (তাবারী ৫/৪৯, ৫০) আবার এও বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ শিশুর অভিভাবক (পিতা) যেন শিশুর মায়ের জন্যও ব্যয় করে, যেমনভাবে সে পূর্বে ব্যয় করত এবং তার অধিকার থেকে বঞ্চিত না করে অথবা কষ্ট না দেয়। এটাই অধিকাংশ তাফসীরকারকদের মতামত। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইব্ন জারীর (রহঃ) তার তাফসীরে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। তাতে তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, দুই বছর পার হওয়ার পরেও শিশুকে তার মায়ের দুধ পান করানোর ফলে শিশুর শারীরিক কিংবা মানসিক ক্ষতি হতে পারে। সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আলকামাহ (রহঃ) এক মহিলাকে তার শিশুকে দুই বছর বয়স হওয়ার পর আর বুকের দুধ পান না করানোর জন্য বলেন। (তাবারী ৫/৩৬)

দুই বছর পার হওয়ার আগেই দুগ্ধ দান বন্ধ করা প্রসঙ্গ

অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا উভয়ের সম্মতি ও পরামর্শক্রমে যদি দু'বছরের পূর্বেই দুধ ছাড়িয়ে দেয়া হয় তাহলে তাদের কোন পাপ নেই। তবে যদি এতে কোন একজন অসম্মত থাকে তাহলে এই কাজ ঠিক হবেনা। কেননা এতে শিশুর ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। এটা আল্লাহ তা'আলার তাঁর বান্দাদের প্রতি পরম করুণা যে, তিনি বাবা-মাকে এমন কাজ হতে বিরত রাখলেন যা শিশুর ধ্বংসের কারণ এবং তাদেরকে এমন কাজ করার নির্দেশ দিলেন যাতে একদিকে শিশুকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হল, অপরদিকে বাবা-মায়ের পক্ষেও তা হিতকর হল। সূরা তালাকে রয়েছে ঃ

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ

যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্য দান করে তাহলে তাদেরকে পারিশ্রমিক দিবে এবং সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে তোমরা সংগতভাবে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করবে; তোমরা যদি নিজ নিজ দাবীতে অনমনীয় হও তাহলে অন্য নারী তার পক্ষে স্তন্য দান করবে। (সূরা তালাক, ৬৫ ঃ ৬) এখানেও বলা হচ্ছে ঃ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ آتَيْتُم بِالْمَعْرُوف যদি জনক-জননী পরস্পর সম্মত হয়ে কোন ওজর বশতঃ অন্য কারও দ্বারা দুধ পান করাতে আরম্ভ করে এবং পূর্বের পারিশ্রমিক পূর্ণভাবে জননীকে প্রদান করে তাহলেও উভয়ের কোন পাপ নেই। তখন অন্য কোন ধাত্রীর সাথে পারিশ্রমিকের চুক্তি করে দুধপান করিয়ে নিবে। وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ তোমরা প্রতিটি কাজে আল্লাহকে ভয় করে চল এবং জেনে রেখ যে, তোমাদের কথা ও কাজ আল্লাহ ভালভাবেই জানেন।

২৩৪। এবং তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রীদেরকে রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তারা	٢٣٤. وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ

وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ	**(বিধবাগণ) চার মাস ও দশ দিন প্রতীক্ষা করবে; অতঃপর যখন তারা স্বীয় নির্ধারিত সময়ে উপনীত হয় তখন তারা নিজেদের সম্বন্ধে বিহিতভাবে যা করবে তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই; এবং তোমরা যা করছ তদ্বিষয়ে আল্লাহ সম্যক খবর রাখেন।**

বিধবার ইদ্দাতের সময় সীমা

এই আয়াতে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, স্ত্রীগণ তাদের স্বামীদের মৃত্যুর পর যেন চার মাস দশ দিন ইদ্দাত পালন করে। তাদের সাথে সহবাস করা হয়ে থাক আর নাই থাক। এর উপর আলেমদের ইজমা রয়েছে। এর একটি দলীল হচ্ছে এই আয়াতটি। দ্বিতীয় দলীল হচ্ছে ঐ হাদীসটি যা মুসনাদ আহমাদ ও সুনানে রয়েছে এবং ইমাম তিরমিযীও (রহঃ) ওটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন। হাদীসটি এই যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ 'এক লোক এক মহিলাকে বিয়ে করেছিল, কিন্তু তার সাথে সহবাস করেনি। তার জন্য কোন মোহরও ধার্য ছিলনা। এ অবস্থায় লোকটি মারা যায়। তাহলে বলুন এর ফাতওয়া কি হবে?' তারা কয়েকবার তাঁর নিকট যাতায়াত করলে তিনি বলেন, 'আমি নিজের মতানুসারে ফাতওয়া দিচ্ছি। যদি আমার ফাতওয়া ঠিক হয় তাহলে তা আল্লাহর পক্ষ হতে মনে করবে। আর যদি ভুল হয় তাহলে জানবে যে, এটা আমার ও শাইতানের পক্ষ থেকে হয়েছে। আমার ফাতওয়া এই যে, ঐ স্ত্রীকে পূর্ণ মোহর দিতে হবে। এটা তার মৃত স্বামীর আর্থিক অবস্থার অনুপাতে হবে। এতে কম বেশি করা যাবেনা। আর স্ত্রীকে পূর্ণ ইদ্দাত পালন করতে হবে এবং সে মীরাসও পাবে।' এ কথা শুনে মা'কীল ইব্ন ইয়াসার আশযাঈ (রাঃ) দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেন ঃ 'বারওয়া বিন্ত ওয়াশিকের (রাঃ) সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ফাইসালাই করেছিলেন।' আবদুল্লাহ (রাঃ) এ কথা শুনে অত্যন্ত খুশি হন।'

অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে, আশযাঈ গোত্রের কিছু লোক দাঁড়িয়ে গেল এবং বলল ঃ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারওয়া বিন্ত ওয়াশিকের (রাঃ) ব্যাপারে এ ধরণেরই একটি সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। (আহমাদ ৩/৪৮০, আবূ দাউদ ২/৫৮৮, তিরমিযী ৪/২৯৯, নাসাঈ ৬/১৯৮, ইব্ন মাজাহ ১/৬০৯)

স্বামীর মৃত্যুর সময় যে গর্ভবতী থাকবে তার জন্য ইদ্দাত হচ্ছে সন্তান প্রসব পর্যন্ত। কুরআনুল কারীমে রয়েছে ঃ

وَأُوْلَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

এবং গর্ভবতী নারীদের ইদ্দাতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। (সূরা তালাক, ৬৫ ঃ ৪)

বুখারী ও মুসলিমে এর বিপরীত স্পষ্ট হাদীস বিদ্যমান রয়েছে যাতে রয়েছে যে, সুবা'আহ আসলামিয়াহর (রাঃ) স্বামীর মৃত্যুকালে তিনি গর্ভবতী ছিলেন, স্বামীর ইন্তেকালের কয়েকদিন পরেই তিনি সন্তান প্রসব করেন। নিফাস হতে পবিত্র হয়ে ভাল পোশাক পরিধান করেন। আবুস্ সানাবিল ইব্ন বাকাক (রাঃ) এটা দেখে তাকে বলেন, 'তোমাকে সাজতে দেখছি কেন, তুমি কি বিয়ে করতে চাও? আল্লাহর শপথ! চার মাস দশদিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি বিয়ে করতে পারনা।' এ কথা শুনে সুবা'আহ (রাঃ) নীরব হয়ে যান এবং সন্ধ্যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে ফাতওয়া জিজ্ঞেস করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন, 'সন্তান প্রসবের পর থেকেই তুমি ইদ্দাত হতে বেরিয়ে গেছ। সুতরাং এখন তুমি ইচ্ছা করলে বিয়ে করতে পার।' (ফাতহুল বারী ৯/৩৭৯, মুসলিম ২/১১২২)

ইদ্দাত পালনের আদেশ দানের গুঢ় রহস্য

সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (রহঃ) এবং আবুল আলীয়া (রহঃ) বর্ণনা করেন, বিধবাদের জন্য ৪ মাস ১০ দিন ইদ্দাত পালন করার পিছনে বিচক্ষণতা রয়েছে। স্বামী মারা যাওয়ার সময় স্ত্রীর গর্ভাশয়ে ভ্রুণ থাকার সম্ভাবনা থাকলে ৪ মাস ১০ দিনেই তার গর্ভধারণের বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যাবে। এ বিষয়ে সহীহায়িনের একটি হাদীস উল্লেখ করা যেতে পারে। সুবা'আহ আসলামিয়াহর (রাঃ) স্বামীর মৃত্যুকালে তিনি গর্ভবতী ছিলেন, স্বামীর ইন্তেকালের কয়েকদিন পরেই তিনি সন্তান প্রসব করেন। নিফাস হতে পবিত্র হয়ে ভাল পোশাক পরিধান করেন। ... এর পরবর্তী বর্ণনা একটু আগেই করা হয়েছে।

দাসীদের ইদ্দাত পালন

আমরা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি যে, একজন কৃতদাসীর ইদ্দাতকাল অনুরূপ হবে যেমনটি একজন স্বাধীনার জন্য প্রযোজ্য। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, আমর ইবনুল আস (রাঃ) বলেছেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ সম্পর্কে আমাদেরকে বিভ্রান্ত করনা। যখন কোন কৃতদাসী মায়ের মনিব মারা যায় তখন তার ইদ্দাতকাল হবে চার মাস দশ দিন। (আহমাদ ৪/৩০২, আবূ দাঊদ ২/৩৭০, ইব্ন মাজাহ ১/৬৭৩) ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত মারফু' হাদীসে রয়েছে ঃ

'মানব সৃষ্টির অবস্থা এই যে, চল্লিশ দিন পর্যন্ত সে মায়ের গর্ভাশয়ে বীর্যের আকারে থাকে। তার পরে জমাট রক্ত হয়ে চল্লিশ দিন পর্যন্ত থাকে। অতঃপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত মাংসপিণ্ড আকারে থাকে। তার পরে আল্লাহ তা'আলা মালাক/ফেরেশতা পাঠিয়ে দেন। উক্ত মালাক ফুঁ দিয়ে তার ভিতরে আত্মা ভরে দেন। (ফাতহুল বারী ১৩/৪৪৯, মুসলিম ৪/২০৩৬) তাহলে মোট একশ' বিশ দিন হয়। আর একশ' বিশ দিনে চার মাস হয়। সতর্কতার জন্য আরও দশ দিন রেখে দিয়েছেন। কেননা কোন কোন মাস ঊনত্রিশ দিনে হয়ে থাকে। ফুঁ দিয়ে যখন আত্মা ভরে দেয়া হয় তখন সন্তানের গতি অনুভূত হতে থাকে এবং গর্ভ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হয়ে পড়ে। এ জন্যই ইদ্দাতকাল নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

স্বামীর জন্য স্ত্রীর ইদ্দাত পালন করা ওয়াজিব

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوف وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ এ আয়াত থেকে জানা যাচ্ছে যে, ইদ্দাতকালে মৃত স্বামীর জন্য শোক করা স্ত্রীর উপর ওয়াজিব। উম্মে হাবীবা (রাঃ) এবং জাইনাব বিন্ত জাহাস (রাঃ) সম্পর্কিত হাদীসে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যে মহিলা আল্লাহর উপর ও পরকালের উপর বিশ্বাস রাখে তার পক্ষে কোন মৃতের উপর তিন দিনের বেশি বিলাপ করা বৈধ নয়, তবে হ্যাঁ, স্বামীর জন্য চার মাস দশদিন পর্যন্ত শোক প্রকাশ করবে।' (ফাতহুল বারী ৯/৩৯৪, মুসলিম ২/১১২৩) উম্মে সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করে ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার মেয়ের স্বামী মারা গেছে। তার চক্ষু দুঃখ প্রকাশ

করছে। আমি তার চোখে সুরমা লাগিয়ে দিব কি?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'না।' দু' তিনবার সে এই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই উত্তর দেন। অবশেষে তিনি বললেন ঃ 'এটাতো মাত্র চার মাস দশদিন। অজ্ঞতার যুগে তো তোমরা বছর ধরে অপেক্ষা করতে।' (মুসলিম ২/১১২৪)

উম্মে সালমাহর (রাঃ) মেয়ে জাইনাব (রাঃ) (জাহিলিয়াত যামানার বর্ণনা দিয়ে) বলেন ঃ 'পূর্বে কোন মহিলার স্বামী মারা গেলে তাকে কুঁড়ে ঘরে রেখে দেয়া হত, ব্যবহৃত পুরাতন বাজে কাপড় পরতে দেয়া হত এবং সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করা হতে দূরে রাখ হত। সারা বছর ধরে এরকম নিকৃষ্ট অবস্থায় কাটত। এক বছর পরে বের হত এবং উটের বিষ্ঠা নিক্ষেপ করতে দেয়া হত। অতঃপর কোন প্রাণী যেমন গাধা, ছাগল অথবা পাখির শরীরের সাথে নিজের শরীরকে ঘর্ষণ করত। কোন কোন সময়ে সে মরেই যেত।' এই তো ছিল অজ্ঞতা যুগের প্রথা।

ভাবার্থ এই যে, এই সময়ে বিধবাদের জন্য সৌন্দর্য, সুগন্ধি, উত্তম কাপড় এবং অলংকার নিষিদ্ধ ছিল যাতে লোকদেরকে বিয়ে করতে আগ্রহী না করে। আর এই শোক প্রকাশ করা ওয়াজিব। তারা প্রাপ্ত বয়স্ক হোক অথবা অপ্রাপ্ত বয়স্কা হোক কিংবা বৃদ্ধাই হোক। তারা স্বাধীনা হোক অথবা দাসীই হোক। মুসলিম হোক কিংবা কাফিরই হোক। কেননা এই আয়াতের মধ্যে সাধারণ নির্দেশ রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوف ইদ্দাতকাল পালনের পর যদি স্ত্রী লোকেরা সুন্দর সুন্দর সাজে সজ্জিতা হয় বা বিয়ে করে তাহলে তাদের অভিভাবকদের কোন পাপ নেই। এগুলি তাদের জন্য বৈধ। হাসান বাসরী (রহঃ), যুহরী (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) হতেও এরকমই বর্ণিত আছে। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৮১৪)

২৩৫। এবং তোমরা স্ত্রীলোকদের প্রস্তাব সম্বন্ধে পরোক্ষভাবে যা ব্যক্ত কর অথবা নিজেদের মনে গোপনে যা পোষণ কর তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই; আল্লাহ অবগত আছেন যে,	٢٣٥. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِىٓ أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ

তোমরা তাদের বিষয় আলোচনা করবে, কিন্তু গোপনভাবে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দান করনা, বরং বিহিতভাবে তাদের সাথে কথা বল; এবং নির্ধারিত সময় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সংকল্প করনা; এবং এটিও জেনে রেখ যে, তোমাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ তা অবগত। অতএব তোমরা তাঁকে ভয় কর এবং জেনে রেখ যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু।	ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَـٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَـٰبُ أَجَلَهُۥ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

ইদ্দাতের সময় পরোক্ষভাবে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া

ভাবার্থ এই যে, স্পষ্টভাবে না বলে কেহ যদি কোন স্ত্রী লোককে তার ইদ্দাতের মধ্যে কোন উত্তম পন্থায় বিয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করে তাতে কোন পাপ নেই। যেমন তাকে বলে ঃ 'আমি বিয়ে করতে চাই, আমি এরূপ এরূপ মহিলাকে পছন্দ করি; আমি চাই যে, আল্লাহ যেন আমার জোড়া মিলিয়ে দেন। আমি কোন সতী ও ধর্মভীরু স্ত্রী লোককে বিয়ে করতে চাই। (ফাতহুল বারী ৯/৮৪, তাবারী ৫/৯৫, ৯৬)

মুজাহিদ (রহঃ), তাউস (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), শা'বী (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যুহরী (রহঃ), ইয়াযীদ ইব্ন কুসাইদ (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) এবং কাসিম ইব্ন মুহাম্মাদ (রহঃ) এবং সালাফগণের অনেকে ও ইমামগণ বলেছেন যে, যার স্বামী মারা গেছে তাকে পরোক্ষভাবে বিয়ের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৮১৭, ৮১৮)

অনুরূপভাবে তালাক-ই বায়েন প্রাপ্তা নারীকেও তার ইদ্দাতের মধ্যে এরূপ অস্পষ্ট শব্দগুলি বলা বৈধ। যেমন ফাতিমা বিন্ত কায়েস (রাঃ) নাম্নী মহিলাকে

যখন তার স্বামী আবূ আমর ইব্ন হাফস (রাঃ) তৃতীয় তালাক দেন সেই সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছিলেন ঃ 'যখন তোমার ইদ্দাতকাল শেষ হবে তখন আমাকে সংবাদ দিবে এবং তুমি ইদ্দাতকাল ইব্ন উম্মে মাকতুমের ওখানে অতিবাহিত করবে।' ইদ্দাতকাল অতিক্রান্ত হলে ফাতিমা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবহিত করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উসামা ইব্ন যায়িদের (রাঃ) সাথে তাঁর বিয়ে দেন। (মুসলিম ২/১১১৪) তবে হ্যাঁ, যে স্ত্রীকে তালাক-ই রাজঈ দেয়া হয়েছে তাকে তার স্বামী ছাড়া অন্য কারও অস্পষ্টভাবে বিয়ের প্রস্তাব (ইদ্দাত শেষ হওয়ার পূর্বে) দেয়ার অধিকার নেই। 'তোমরা নিজেদের মনে গোপনে যা পোষণ কর' এর ভাবার্থ এই যে, কোন মহিলাকে বিয়ে করার যে আকাংখা তোমাদের অন্তরে পোষণ করছ এতে তোমাদের কোন পাপ নেই। অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَرَبُّكَ يَعۡلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمۡ وَمَا يُعۡلِنُونَ

আর তোমার রাব্ব জানেন তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং তারা যা ব্যক্ত করে। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৬৯) অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَمَن يَفۡعَلۡهُ مِنكُمۡ فَقَدۡ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ

তোমরা যা গোপন কর এবং তোমরা যা প্রকাশ কর তা আমি সম্যক অবগত। (সূরা মুমতাহানাহ, ৬০ ঃ ১)

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা খুব ভালভাবেই জানেন যে, তাঁর বান্দাগণ তাদের আকাংখিতা নারীদেরকে অন্তরে স্মরণ করবে। তাই তিনি সংকীর্ণতা সরিয়ে দিয়েছেন। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, 'কিন্তু তাদের সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়োনা' এর অর্থ হল তাকে বলনা 'আমি তোমাকে ভালবাসি' অথবা এ কথা বলা যে, 'প্রতিজ্ঞা কর যে, অন্য কেহকে বিয়ে করবেনা' (ইদ্দাত শেষ হওয়ার পর) ইত্যাদি ইত্যাদি। (তাবারী ৫/১০৭) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), শা'বি (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), আবুদ্‌দুহা (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ), যুহরী (রহঃ) (ইব্ন আবী হাতিম ২/৮২১) মুজাহিদ (রহঃ) এবং সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল মহিলাদের কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি নেয়া যে, সে অন্য কেহকে বিয়ে করবেনা। (তাবারী ৫/১০৯) অতঃপর আল্লাহ বলেন, বরং বিহিতভাবে তাদের সাথে কথা বল। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) (ইব্ন আবী হাতিম ২/৮২৪), সুদ্দী (রহঃ), সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন

যে, এর অর্থ হচ্ছে পরোক্ষভাবে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া; যেমন বলা, আমি তোমার মত কেহকে বিয়ে করতে আগ্রহী। (তাবারী ৫/১১৪) মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন (রহঃ) বলেন ঃ আমি উবাইদাহকে (রহঃ) এই আয়াতাংশের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ সে তার অভিভাবককে বলতে পারে 'আমাকে প্রথম জিজ্ঞেস না করে তাকে কোথাও বিয়ে দিবেননা।' (ইব্ন আবী হাতিম ২/৮২৬)

যে পর্যন্ত ইদ্দাতকাল শেষ না হবে সে পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবেনা। আলেমদের এ বিষয়ে ইজমা রয়েছে যে, ইদ্দাতের মধ্যে বিয়ে শুদ্ধ নয়। যদি কেহ ইদ্দাতের মধ্যে বিয়ে করে এবং সহবাসও হয়ে যায় তথাপি তাদেরকে পৃথক করে দিতে হবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), শা'বি (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), আবূ মালিক (রহঃ), যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ), যুহরী (রহঃ), 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) এবং যাহ্হাক (রহঃ) বলেছেন যে, ইদ্দাতকাল শেষ হওয়ার পূর্বে বিয়ে করা যাবেনা। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৮২৮, ৮২৯) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ জেনে রেখ যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্তরের কথা অবগত আছেন। সুতরাং তোমরা এর প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁকে সদা ভয় করে চল। স্ত্রীদের সম্পর্কে তোমাদের অন্তরে আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত চিন্তাও যেন স্থান না পায়। আল্লাহ ভীতির নির্দেশের সাথে সাথে মহান আল্লাহ স্বীয় দয়া ও করুণার প্রতি আগ্রহী হওয়ার জন্য বলেন যে, বিশ্বপ্রভু আল্লাহ তাঁর বান্দাদের পাপসমূহ ক্ষমাকারী এবং তিনি সহিষ্ণু।

২৩৬। যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ না করে অথবা তাদের প্রাপ্য নির্ধারণ করার পূর্বে তালাক প্রদান কর তাহলে তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই, এবং তোমরা তাদেরকে কিছু সংস্থান করে দিবে, অবস্থাপন্ন লোক নিজের অবস্থানুসারে এবং অভাবগ্রস্ত লোক তার সাধ্যানুসারে বিহিত	٢٣٦. لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ

সংস্থান (করে দিবে); সৎ কর্মশীল লোকদের উপর ইহাই কর্তব্য।	وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعًۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ

সহবাস হওয়ার আগেই তালাক দেয়া প্রসঙ্গ

বিবাহ বন্ধনের পর সহবাসের পূর্বেও তালাক দেয়ার বৈধতার কথা বলা হচ্ছে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), তাউস (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) এবং হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, এখানে مَسٌّ শব্দের অর্থ সহবাস। (ইব্‌ন আবী হাতিম ২/৮৩১) সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়া, এমন কি মোহর নির্ধারিত না থাকলেও তালাক দেয়া বৈধ।

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে অর্থ প্রদান

স্ত্রীদের খুবই মনঃকষ্ট হবে বলে স্বামীদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারা যেন তাদের অবস্থা অনুপাতে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকে কিছু অর্থ সাহায্য করে।

সাহল ইব্‌ন সা'দ (রাঃ) এবং আবূ উসাইদ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমাইমাহ বিন্‌ত শুরাহবিলকে (রাঃ) বিয়ে করেন। যখন তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে উপস্থিত করা হয় তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রতি হাত বাড়িয়ে দেন, কিন্তু সে তা পছন্দ করেনি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন আবূ উসাইদকে (রাঃ) আদেশ করেন যে, তিনি যেন ঐ মহিলাকে কিছু খাদ্য এবং দুই প্রস্থ কাপড় দিয়ে বিদায় করেন। (ফাতহুল বারী ৯/২৬৯)

২৩৭। আর তোমরা যদি তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক প্রদান কর এবং তাদের মোহর নির্ধারণ করে থাক তাহলে যা নির্ধারণ করেছিলে তার অর্ধেক দিয়ে দাও; কিন্তু যদি তারা ক্ষমা করে কিংবা যার হাতে বিবাহ	٢٣٧. وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ إِلَّآ أَن

সহবাসের পূর্বেই তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী মোহরের অর্ধেক পাবে

এই আয়াতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে যে, পূর্ব আয়াতে যে সব নারীর জন্য 'মাতআ' নির্দিষ্ট করা হয়েছিল তারা শুধুমাত্র ঐসব নারী যাদের বর্ণনা ঐ আয়াতে ছিল। কেননা এই আয়াতে এই বর্ণনা রয়েছে যে, সহবাসের পূর্বে যখন তালাক দেয়া হবে এবং মোহর নির্দিষ্ট থাকবে, তখন তাদেরকে অর্ধেক মোহর দিতে হবে। যদি এখানেও এই অর্ধেক মোহর ছাড়া কোন 'মাতআ' ওয়াজিব হত তাহলে অবশ্যই তা বর্ণনা করা হত। কেননা দু'টি আয়াতের দু'টি অবস্থাকে একের পর এক বর্ণনা করা হচ্ছে। এই আয়াতে বর্ণিত অবস্থার উপর ভিত্তি করে অর্ধমোহরের উপর আলেমদের ইজমা হয়েছে। সুতরাং স্বামী যদি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করার আগেই তালাক দেয় তাহলে স্বামী মোহরের অর্ধেক টাকা প্রদান করবে। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِلاَّ أَن يَعْفُونَ এই অবস্থায় যদি স্ত্রীরা স্বেচ্ছায় তাদের অর্ধেক মোহর ক্ষমা করে দেয় তাহলে এটা ভিন্ন কথা। এই স্বামীর সবই ক্ষমা হয়ে যাবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ 'সায়্যেবা' (যার কুমারীত্ব নষ্ট হয়ে গেছে) স্ত্রী যদি নিজের প্রাপ্য ছেড়ে দেয় তাহলে এ অধিকার তার রয়েছে।' (ইব্ন আবী হাতিম ২/৮৩৯) এ ছাড়া ইমাম আবূ মুহাম্মাদ ইব্ন আবী হাতিম বলেন যে, শুরাইহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন মুসায়িব (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), শা'বী (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), নাফী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাবির ইব্ন যায়িদ (রহঃ), 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ), যুহরী (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান

(রহঃ), ইব্ন সীরীন (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) এবং সুদ্দীও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৮৪০-৮৪২)

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'অথবা ঐ ব্যক্তি ক্ষমা করবে যার হাতে বিবাহ বন্ধন রয়েছে।' একটি হাদীসে রয়েছে যে, এর দ্বারা স্বামীকে বুঝানো হয়েছে। আলীকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা হয় ঃ 'এর দ্বারা কি স্ত্রীদের অভিভাবকগণকে বুঝানো হয়েছে?' তিনি বলেন ঃ 'না, বরং এর দ্বারা স্বামীকে বুঝানো হয়েছে।' আরও বহু মুফাস্সির হতে এটাই বর্ণিত হয়েছে। কেননা প্রকৃতপক্ষে বিয়ে ঠিক রাখা বা ভেঙ্গে দেয়া ইত্যাদি সবকাজই স্বামীর অধিকারে রয়েছে। তা ছাড়া অভিভাবক যার অভিভাবকত্ব করছে তার সম্পদ কেহকে প্রদান করা যেমন তার জন্য বৈধ নয়, অনুরূপভাবে তার মোহর ক্ষমা করে দেয়ারও তার অধিকার নেই। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَأَن تَعْفُوٓاْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى তোমাদের ক্ষমা করে দেয়াই ধর্মপরায়নতার অতি নিকটবর্তী। এর দ্বারা স্বামী স্ত্রী দু'জনকেই বুঝানো হয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ), নাখঈ (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) এবং সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আয়াতে উল্লিখিত বদান্যতার অর্থ হচ্ছে স্ত্রীকে অর্ধেক মোহর দিয়ে দেয়া অথবা মোহরের সম্পূর্ণ অংশ দিয়ে দেয়া। (তাবারী ৫/১৬৫, ১৬৬) অর্থাৎ হয় স্ত্রীই তার অর্ধেক প্রাপ্য তার স্বামীকে ছেড়ে দিবে অথবা স্বামী তার স্ত্রীর প্রাপ্য অর্ধেক মোহরের পরিবর্তে পূর্ণ মোহরই দিয়ে দিবে। অতঃপর বলা হচ্ছে, 'তোমরা পরস্পরের উপকারকে যেন ভুলে যেওনা।' অর্থাৎ তাকে অকর্মন্যরূপে ছেড়ে দিওনা, বরং তার কাজের সংস্থান করে দাও। এরপর বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ জেনে রেখ যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কার্যাবলী প্রত্যক্ষ করছেন। তাঁর কাছে তোমাদের কাজ ও তোমাদের অবস্থা উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে এবং অতি সত্ত্বরই তিনি প্রত্যেক আমলকারীকে তার আমলের পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করবেন।

২৩৮। তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হবে বিশেষতঃ মধ্যবর্তী সালাতের এবং আল্লাহর উদ্দেশে তোমরা	٢٣٨. حَـٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ

বিনীতভাবে দন্ডায়মান হও।	قَـٰنِتِينَ
২৩৯। তবে তোমরা যদি আশংকা কর, সেই অবস্থায় পদব্রজে বা যানবাহনের উপর সালাত সমাপন করে নিবে, পরে যখন নিরাপদ হও তখন তোমাদেরকে যেভাবে শিখিয়ে দেয়া হয়েছে সেইভাবে আল্লাহর প্রশংসা কর যা তোমরা ইতোপূর্বে জানতেনা।	٢٣٩. فَإِنۡ خِفۡتُمۡ فَرِجَالًا أَوۡ رُكۡبَانًا ۖ فَإِذَآ أَمِنتُمۡ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمۡ تَكُونُواْ تَعۡلَمُونَ

আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ হচ্ছে, 'তোমরা সালাতসমূহের সময়ের হিফাযাত কর, তাঁর সীমাগুলির রক্ষণাবেক্ষণ কর এবং সময়ের প্রথম অংশে সালাত আদায় করতে থাক।' আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কোন্ আমল উত্তম?' তিনি বলেন ঃ

'যথাসময়ে সালাত আদায় করা।' তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন ঃ 'তার পরে কোনটি?' তিনি বলেন ঃ 'আল্লাহর পথে জিহাদ করা।' তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন ঃ 'তার পরে কোন্টি?' তিনি বলেন ঃ 'পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা।' আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন ঃ 'যদি আমি আরও কিছু জিজ্ঞেস করতাম তাহলে তিনি আরও উত্তর দিতেন।' (ফাতহুল বারী ২/১২, মুসলিম ১/৯০)

মধ্যবর্তী ওয়াক্ত কোন্টি

তিরমিযী (রহঃ) এবং বাগাবী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যে মধ্যবর্তী সালাতের কথা উল্লেখ করেছেন সেই ব্যাপারে অধিকাংশ সাহাবীগণের মতামত হচ্ছে আসর সালাত। আল কাযী আল মাওয়ারদী (রহঃ) বলেন যে, তাবেঈদের অধিকাংশ আলেমও একই মত পোষণ করেছেন। হাফিয আবূ উমার ইব্ন আবদুল বার (রহঃ) বলেছেন যে, অধিকাংশ হাদীস শাস্ত্রবিদ এবং সালাফগণেরও (আছার) একই অভিমত। তাছাড়া আবূ মুহাম্মাদ ইব্ন আতিয়িয়া (রহঃ) বলেন যে, বেশির ভাগ আলেমগণই তাদের

তাফসীরে আসর সালাতকে মধ্যবর্তী সালাত বলে উল্লেখ করেছেন। হাফিয আবূ মুহাম্মাদ আবদুল মু'মিন ইব্‌ন খালাফ আদদামাতী (রহঃ) তার কিতাবে আসর সালাতকে মধ্যবর্তী সালাত হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, এ বিষয়ে উমার (রাঃ), আলী (রাঃ), ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ), আবূ আইউব (রাঃ), আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রাঃ), সামুরা ইব্‌ন যুনদুব (রাঃ), আবূ হুরাইরাহ (রাঃ), আবূ সাঈদ (রাঃ), হাফসা (রাঃ), উম্মে হাবীবা (রাঃ), উম্মে সালামা (রাঃ), ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং আয়িশার (রাঃ) ইহাই তাফসীর। উবাইদাহ (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), রাযীন (রহঃ), যির ইব্‌ন হুবাইস (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), ইব্‌ন সীরীন (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ), কালবী (রহঃ), মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ), উবাইদাহ ইব্‌ন আবূ মারিয়াম (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও একই তাফসীর করেছেন।

আসরের সালাত মধ্যবর্তী ওয়াক্তের সালাত হওয়ার দলীল

এই উক্তির দলীল এই যে, আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খন্দকের যুদ্ধে বলেছিলেন ঃ

'আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের অন্তর ও তাদের ঘরগুলি আগুন দ্বারা পূর্ণ করুন। তারা صَلَوٰةِ وُسْطَىٰ আসরের সালাত হতে বিরত রেখেছে।' (আহমাদ ১/১১৩) আলী (রাঃ) বলেন ঃ 'আমরা এর ভাবার্থ নিতাম ফাজর অথবা আসরের সালাত। অবশেষে খন্দকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে আমি এ কথা শুনতে পাই।

ইমাম মুসলিম (রহঃ) এবং নাসাঈ (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (হাদীস নং ১/৪৩৭ ও ৬/৩০৩) এ ছাড়া ইমাম বুখারী (রহঃ), আবূ দাঊদ (রহঃ), তিরমিযী (রহঃ) ও অন্যান্য হাদীস সংগ্রহকারীগণও আলীর (রাঃ) বরাতে বিভিন্ন সূত্রে ইহা বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী ৬/১২৪, ৭/৪৬৭, ৮/৪৩, ১১/১৯৭; মুসলিম ১/৪৩৬, আবূ দাঊদ ১/২৮৭, তিরমিযী ৮/৩২৮, নাসাঈ ১/২৩৬, আহমাদ ১/১৩৭) আহযাবের যুদ্ধের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণকে মুশরিকরা যুদ্ধে ব্যস্ত রাখার ফলে তারা যে আসর সালাত আদায় করতে পারেননি এ কথা অন্যান্য সাহাবীগণ হতেও বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মুসলিমও (রহঃ) একই শব্দ প্রয়োগে ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) এবং বারা ইব্‌ন আযিব (রাঃ) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। (হাদীস ১/৪৩৭, ৪৩৮) এ ছাড়া ইমাম আহমাদ (রহঃ) সামুরাহ ইব্‌ন যুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে,

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মধ্যবর্তী সালাত হল আসর সালাত। (আহমাদ ৫/২২)

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সালাতকে হিফাযাত কর, বিশেষ করে মধ্যবর্তী সালাত, এবং বর্ণিত হয়েছে যে, তা হল আসর সালাত। (আহমাদ ৫/৮) অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ইহা হল আসর সালাত। ইব্ন জাফর (রহঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মধ্যবর্তী সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি এ উত্তর দেন। (আহমাদ ৫/৭) ইমাম তিরমিযীও (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসটি হাসান সহীহ বলেছেন। (হাদীস নং ৮/৩২৮) ইমাম মুসলিমের বর্ণনা ছিল নিম্নরূপ ঃ তারা (মুশরিকরা) আমাদেরকে মধ্যবর্তী সালাত আদায় করা থেকে ব্যস্ত (বিরত) রেখেছে, তা হল আসর সালাত। (মুসলিম ১/৪৩৭)

মোট কথা, صَلَوٰة وُسْطَى এর ভাবার্থ আসর সালাত হওয়া সম্বন্ধে বহু হাদীস এসেছে যেগুলির মধ্যে কোনটি হাসান, কোনটি সহীহ এবং কোনটি দুর্বল। জামেউত্ তিরমিযী, মুসলিম প্রভৃতি গ্রন্থেও এ হাদীসগুলি রয়েছে। তাছাড়া এই সালাতের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন এবং যারা এর প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করেছে তাদের প্রতি কঠোর বাণী উচ্চারণ করেছেন। যেমন ইব্ন উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে রয়েছে ঃ

'যার আসরের সালাত ছুটে গেল তার যেন পরিবারবর্গ ও ধনসম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল।' (মুসলিম ১/৪৩৬) বুরাইদাহ ইব্ন হুসাইব (রাঃ) হতে অন্য হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মেঘলা দিনে তোমরা আসরের সালাত সময়ের পূর্বভাগেই আদায় করে নাও। জেনে রেখ, যে ব্যক্তি আসরের সালাত ছেড়ে দেয় তার আমলসমূহ নষ্ট হয়ে যায়'। (ইব্ন মাজাহ ১/২২৪)

সালাত আদায়ের সময় কথা বলা যাবেনা

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَقُومُواْ لِلّٰه قَانِتِينَ তোমরা বিনয় ও হীনতার সাথে আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হও। এর মধ্যে এটা অবশ্যই রয়েছে যে, সালাতের মধ্যে মানবীয় (পার্থিব) কোন কথা থাকবেনা। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতের মধ্যে ইব্ন মাসউদের (রাঃ) সালামের উত্তর দেননি এবং সালাত শেষে তাকে বলেন ঃ

'সালাত হচ্ছে নিমগ্নতার কাজ।' (মুসলিম ১/৪৩৬) মুআবিয়া ইব্ন হাকাম (রাঃ) সালাত আদায় করা অবস্থায় কথা বললে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছিলেন ঃ সালাতের মধ্যে মানবীয় কোন কথা বলা উচিতনা। এতো হচ্ছে শুধুমাত্র আল্লাহর পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করার কাজ।' (মুসলিম ১/৩৮১)

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, যায়িদ ইব্ন আরকাম (রাঃ) বলেন ঃ 'এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে মানুষ সালাতের মধ্যে প্রয়োজনীয় কথাগুলোও বলে ফেলতো। অতঃপর এই আয়াতটি অবতীর্ণ হলে মানুষকে সালাতের মধ্যে নীরব থাকার নির্দেশ দেয়া হয়। (আহমাদ ৪/৩৬৮, ফাতহুল বারী ৩/৮৮, মুসলিম ১/৩৭৩, আবূ দাঊদ ১/৫৮৩, তিরমিযী ৮/৩৩০, নাসাঈ ৩/১৮)

ভয়-ভীতির সময় সালাত আদায়

فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ইতোপূর্বে যেহেতু সালাতের পুরাপূরি সংরক্ষণের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল সেহেতু এখানে ঐ অবস্থার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যেখানে পুরাপুরিভাবে সালাতের মর্যাদা রক্ষা করা সম্ভব হয়না। যেমন যুদ্ধের মাঠে যখন শত্রু সৈন্য সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকে সেই সময়ের জন্য নির্দেশ হচ্ছে, 'যেভাবে সম্ভব হয় সেভাবেই তোমরা সালাত আদায় কর। অর্থাৎ তোমরা সোয়ারীর উপরই থাক বা পদব্রজেই চল, কিবলার দিকে মুখ করতে পার আর না'ই পার, তোমাদের সুবিধামত সালাত আদায় কর'।

ইব্ন উমার (রাঃ) এই আয়াতের ভাবার্থ এটাই বর্ণনা করেছেন। এমনকি নাফি' (রহঃ) বলেন ঃ 'আমি তো জানি যে, এটা মারফু' হাদীস।' (মুয়াত্তা ১/১৮৪, ফাতহুল বারী ৮/৪৬, মুসলিম ১/৫৭৪)

ইমাম মুসলিম (রহঃ), ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ), ইমাম নাসাঈ (রহঃ), ইমাম ইব্ন মাজাহ (রহঃ) এবং ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবীর মাধ্যমে সালাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তা হল নিজ বাসস্থানে ৪ রাক'আত, সফরে থাকা অবস্থায় ২ রাক'আত এবং ভয়-ভীতির সময় ১ রাক'আত। (মুসলিম ১/৪৭৮, ৪৭৯, আবূ দাঊদ ২/৪০, নাসাঈ ৩/১৬৯, ইব্ন মাজাহ ১/৩৩৯, তাবারী ৫/২৪৭) হাসান বাসরী (রহঃ) কাতাদাহ (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ) এবং আরও অনেকে একই মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ৫/২৪০, ২৪১)

ইমাম বুখারী (রহঃ) তার কিতাবে 'দূর্গ বিজয়ের সময় ও শত্রু সৈন্যের সম্মুখীন হওয়ার সময় সালাত আদায় করা' নামে একটি অধ্যায় রেখেছেন। ইমাম আওযায়ী (রহঃ) বলেন যে, যদি বিজয় লাভ আসন্ন হয়ে যায় এবং সালাত আদায় করার সাধ্য না হয় তাহলে প্রত্যেক লোক তার সামর্থ্য অনুসারে ইশারায় সালাত আদায় করে নিবে। যদি এটুকু সময় পাওয়া না যায় তাহলে বিলম্ব করবে যে পর্যন্ত না যুদ্ধ শেষ হয়। আর যদি নিরাপত্তা লাভ হয় তাহলে দু' রাক'আত সালাত আদায় করবে, অন্যথায় এক রাক'আতই যথেষ্ট। কিন্তু শুধু তাকবীর পাঠ করা যথেষ্ট নয়, বরং বিলম্ব করবে যে পর্যন্ত না নিরাপদ হয়। মাকহুলও (রহঃ) এটাই বলেছেন।

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) বলেন ঃ 'তাসতার দূর্গের যুদ্ধে সেনাবাহিনীর মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। সুবহি সাদিকের সময় ভীষণ যুদ্ধ চলছিল। সালাত আদায় করার সময়ই আমরা পাইনি। অনেক বেলা হলে আমরা সেদিন আবূ মূসার (রাঃ) সাথে ফাজরের সালাত আদায় করি। ঐ সালাতের বিনিময়ে যদি আমি দুনিয়া এবং ওর মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবও পেয়ে যাই, তবুও আমি সন্তুষ্ট নই। (ফাতহুল বারী ২/৫০৩)

স্বাভাবিক অবস্থায় খুশু-খুযুর সাথে সালাত আদায় করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ *যখন নিরাপদে থাক তখন আল্লাহকে স্মরণ কর।* অর্থাৎ তোমাদেরকে যেভাবে সালাত আদায় করতে বলেছি যেমন রুকু, সাজদাহ, কিয়াম, তাশাহহুদ এবং খুশু-খুযুর সাথে সালাত আদায় কর। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন যে, তিনি যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন, যা পালন করলে পার্থিব জীবনে এবং পরকালে উপকৃত হওয়া যাবে সেইভাবে কাজ করে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ চিত্তে ইবাদাত ও শুকরিয়া জানাতে হবে। এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা ভয়-ভীতি অবস্থায় সালাত আদায় করার ব্যাপারে বলেন ঃ

فَإِذَا ٱطۡمَأۡنَنتُمۡ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَۚ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَـٰبًا مَّوۡقُوتًا

অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হও তখন সালাত প্রতিষ্ঠিত কর; নিশ্চয়ই সালাত বিশ্বাসীগণের উপর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১০৩) যেমন তিনি ভয়ের সালাতের বর্ণনা দেয়ার পর বলেন ঃ

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ

এবং যখন তুমি তাদের (সৈন্যদের) মধ্যে থাক, অতঃপর সালাতে দন্ডায়মান হও। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১০২) সালাতকে নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা মু'মিনদের উপর ফারয। **صَلَوة خَوْف** এর পূর্ণ বর্ণনা সূরা নিসার **وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ** এর তাফসীরে ইনশাআল্লাহ আসবে।

২৪০। এবং তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুমুখে পতিত হয় ও স্ত্রীগণকে ছেড়ে যায় তারা যেন স্বীয় স্ত্রীগণকে বহিস্কৃত না করে এক বছর পর্যন্ত তাদেরকে ভরণ-পোষণ প্রদান করার জন্য অসীয়াত করে যায়, কিন্তু যদি তারা (স্বেচ্ছায়) বের হয়ে যায় তাহলে নিজেদের সম্বন্ধে বিহিতভাবে তারা যে ব্যবস্থা করে তজ্জন্য তোমাদের কোন দোষ নেই, এবং আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত, বিজ্ঞানময়।	٢٤٠. وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِى مَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
২৪১। আর তালাক প্রাপ্তদের জন্য বিহিতভাবে ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করা ধর্মভীরুগণের কর্তব্য।	٢٤١. وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ

২৪২। এভাবে আল্লাহ স্বীয় নিদর্শনাবলী বিবৃত করেন, যেন তোমরা হৃদয়ঙ্গম কর।	٢٤٢. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَـٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

২ ঃ ২৪০ নং আয়াত বাতিল হওয়া প্রসঙ্গ

অধিকাংশ মুফাস্সিরের উক্তি এই যে, এই আয়াতটি (২৪০ নং আয়াত) এর পূর্ববর্তী আয়াত ((২৩৪ নং আয়াত, অর্থাৎ চার মাস দশ দিন ইদ্দাত বিশিষ্ট আয়াত) দ্বারা রহিত হয়েছে। ইব্ন যুবাইর (রাঃ) উসমানকে (রাঃ) বলেন ঃ 'এই আয়াতটি রহিত হয়ে গেছে, সুতরাং আপনি এটাকে আর কুরআন মাজীদের মধ্যে লিখিয়ে নিচ্ছেন কেন?' তিনি বলেন ঃ হে ভ্রাতুস্পুত্র! পূর্ববর্তী কুরআনে যেমন এটা বিদ্যমান রয়েছে তেমনই এখানেও থাকবে। আমি কোন হের ফের করতে পারিনা।' (ফাতহুল বারী ৮/৪৮) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ 'পূর্বে এই নির্দেশই ছিল যে, পূর্ণ এক বছর ঐ বিধবা স্ত্রীদেরকে তাদের মৃত স্বামীদের সম্পদ হতে খাদ্য-পোশাক দিতে হবে এবং তাদেরকে ঐ বাড়ীতেই রাখতে হবে। অতঃপর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আয়াত এটাকে রহিত করে এবং স্বামীর সন্তান থাকলে তার পরিত্যাক্ত সম্পত্তি হতে স্ত্রীর জন্য এক অষ্টমাংশ, আর সন্তান না থাকলে এক চতুর্থাংশ নির্ধারণ করা হয়। আর স্ত্রীর ইদ্দাতকাল নির্ধারিত হয় চার মাস ও দশ দিন।' (ইব্ন আবী হাতিম ২/৮৭১)

অধিকাংশ সাহাবী (রাঃ) ও তাবেঈ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতটি রহিত হয়েছে। সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (রহঃ) বলেন যে, সূরা আহযাবের يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَات (৩৩ ঃ ৪৯) এই আয়াত দ্বারা সূরা বাকারাহর এই আয়াতটিকে রহিত করা হয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এক বছরের মধ্যে চার মাস দশ দিন তো হচ্ছে মূল ইদ্দাতকাল এবং এটা অতিবাহিত করা স্ত্রীর জন্য ওয়াজিব। আর অবশিষ্ট সাত মাস ও বিশ দিন স্ত্রী তার মৃত স্বামীর বাড়ীতেও থাকতে পারে অথবা চলেও যেতে পারে। মীরাসের আয়াত এটাকেও মানসূখ করে দিয়েছে। সে যেখানে পারে সেখানে গিয়ে ইদ্দাত পালন করবে। বাড়ীর খরচ বহন স্বামীর দায়িত্বে নেই। সুতরাং এসব উক্তি দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, এই আয়াত তো এক বছরের ইদ্দাতকে ওয়াজিবই করেনি। সুতরাং রহিত হওয়ার প্রশ্নই উঠতে পারেনা। এটা তো শুধুমাত্র স্বামীর অসীয়াত

এবং সেটাকেও স্ত্রী ইচ্ছা করলে পূরা করবে, আর ইচ্ছা না হলে করবেনা। তার উপর কোন বাধ্য বাধকতা নেই।

সুতরাং স্ত্রীরা যদি পূরা এক বছর তাদের মৃত স্বামীদের বাড়ীতেই থাকে তাহলে তাদেরকে বের করে দেয়া হবেনা। যদি তারা ইদ্দাতকাল কাটিয়ে সেচ্ছায় চলে যায় তাহলে তাদেরকে বাধা দেয়া হবেনা।

ইমাম ইব্‌ন তাইমিয়াও (রহঃ) এই উক্তিকেই পছন্দ করেন। আরও বহু লোক এটাকেই গ্রহণ করে থাকেন। আর অবশিষ্ট দল এটাকে 'মানসূখ' বলে থাকেন। এখন যদি ইদ্দাতকালের পরবর্তী কাল 'মানসূখ' হওয়াই তাদের উদ্দেশ্য হয় তাহলে তো ভাল কথা, নচেৎ এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেহ কেহ বলেন যে, স্ত্রীকে অবশ্যই মৃত স্বামীর বাড়ীতেই ইদ্দাতকাল অতিবাহিত করতে হবে। তাদের দলীল হচ্ছে মুআত্তা মালিকের এই হাদীসটি ঃ আবূ সাঈদ খুদরীর (রাঃ) বোন ফারী'আহ বিন্‌ত মালিক (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলেন ঃ 'আমাদের ক্রীতদাসেরা পালিয়ে গিয়েছিল। আমার স্বামী তাদের খোঁজে বেরিয়েছিলেন। 'কুদুম' নামক স্থানে তার সাথে তাদের সাক্ষাৎ ঘটে এবং তারা তাকে হত্যা করে। তার কোন ঘর-বাড়ী নেই যেখানে আমি ইদ্দাতকাল অতিবাহিত করব এবং কোন পানাহারের জিনিসও নেই। সুতরাং আপনার অনুমতি হলে আমি আমার পিত্রালয়ে চলে গিয়ে সেখানে আমার ইদ্দাতকাল কাটিয়ে দেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'অনুমতি দেয়া হল।' আমি ফিরে যেতে উদ্যত হয়েছি এমন সময় তিনি আমাকে ডেকে পাঠান বা নিজেই ডাক দেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'তুমি কি বলছিলে?' আমি পুনরায় ঘটনাটি বর্ণনা করি। তখন তিনি বললেন ঃ 'তোমার ইদ্দাতকাল অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত তুমি বাড়ীতেই থাক।' সুতরাং আমি সেখানেই আমার ইদ্দাতকাল চার মাস দশ দিন অতিবাহিত করি।'

অতঃপর উসমান (রাঃ) তাঁর খিলাফাতকালে আমাকে ডেকে পাঠান এবং এই মাসআলাটি জিজ্ঞেস করেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফাইসালাসহ আমার ঘটনাটি বর্ণনা করি। উসমান (রাঃ) এরই অনুসরণ করেন এবং এটাই ফাইসালা দেন।' (মুয়াত্তা ২/৫৯১) আবূ দাউদ (রহঃ), তিরমিযী (রহঃ), নাসাঈ (রহঃ), ইব্‌ন মাজাহও (রহঃ) এটি বর্ণনা করেছেন। (হাদীস নং ২/৭৭৩, ৪/৩১৯ ও ৩৯০; ৬/২০০ ১/৬৫৪) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এই হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

তালাক দেয়ার সময় অর্থ প্রদান করার যুক্তি

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ তালাকপ্রাপ্তা নারীদেরকে 'মাতআ' দেয়া সম্বন্ধে জনগণ বলত ঃ 'আমরা ইচ্ছা হলে দিব, না হলে না দিব।' তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এই আয়াতটিকে সামনে রেখেই কেহ কেহ প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তা নারীকেই, নির্দিষ্ট অর্থ নির্ধারণ করা না থাকলেও কিংবা একত্রে বসবাস না করলেও, কিছু অর্থ দেয়া ওয়াজিব বলে থাকেন। আর কেহ কেহ ওটাকে শুধুমাত্র এইসব নারীর স্বার্থে নির্দিষ্ট মনে করেন যাদের বর্ণনা পূর্বে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ ঐসব নারী যাদের সাথে সহবাস হয়নি এবং মোহরও নির্ধারিত হয়নি এমতাবস্থায় তালাক দেয়া হয়েছে। কিন্তু পূর্ব দলের উত্তর এই যে, সাধারণভাবে কোন নারীর বর্ণনা দেয়া ঐ অবস্থার সাথে ঐ নির্দেশকে নির্দিষ্ট করেনা। এটাই হচ্ছে প্রসিদ্ধ অভিমত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِه এভাবেই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নিদর্শনাবলী হালাল, হারাম, ফারায়েয, হুদুদ এবং আদেশ ও নিষেধ সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যেন কোন কিছু গুপ্ত ও অস্পষ্ট না থাকে এবং যেন তা সবার বোধগম্য হয়।

২৪৩। তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি, মৃত্যুর বিভীষিকাকে এড়ানোর জন্য যারা নিজেদের গৃহ হতে বহির্গত হয়েছিল? অথচ তারা ছিল বহু সহস্র; তখন আল্লাহ তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা মর; পুনরায় তিনি তাদেরকে জীবন দান করলেন; নিশ্চয়ই মানবগণের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেনা।	٢٤٣. أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَـٰرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَـٰهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ

২৪৪। তোমরা আল্লাহর পথে সংগ্রাম কর এবং জেনে রেখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ হচ্ছেন সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।	٢٤٤. وَقَـٰتِلُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
২৪৫। কে সে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণদান করে? অনন্তর তিনি তাকে দ্বিগুণ, বহুগুণ বর্ধিত করেন এবং আল্লাহই (মানুষের আর্থিক অবস্থাকে) কৃচ্ছ বা স্বচ্ছল করে থাকেন এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।	٢٤٥. مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَـٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

মৃত্যু ঘটানো লোকদের বর্ণনা

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এই লোকগুলি সংখ্যায় চার হাজার ছিল। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, তারা ছিল আট হাজার। ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ আয়াতে যে লোকদের কথা বলা হয়েছে তারা ‘দাওয়ারদান’ নামক এক এলাকার বাসিন্দা ছিল। আলী ইব্‌ন আসীমও (রহঃ) বলেন যে, তারা ‘দাওয়ারদান’ এলাকার অধিবাসী ছিল যা ইরাকের ওয়াসিত নামক স্থান থেকে কয়েক মাইল দূরের একটি গ্রাম।

ওয়াকী ইব্‌ন জাররাহ (রহঃ) তার তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, তারা সংখ্যায় ছিল চার হাজার। প্লেগের ভয়ে তারা নিজ এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। তারা বলেছিল ঃ আমাদের এমন এক স্থানে চলে যাওয়া উচিত যেখানে গেলে মৃত্যু থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। অতঃপর তারা এমন এক এলাকায় উপস্থিত হয় যেখানে পৌঁছার পর আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘মরে যাও’ ফলে তারা সবাই সেখানেই মারা যায়। কিছুকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর কোন এক নাবী ঐ স্থান অতিক্রম করার সময় আল্লাহর কাছে দু‘আ করলে আল্লাহ তাঁর দু‘আ কবূল করে তাদেরকে পুর্নজীবিত করেন। তাদের ব্যাপারেই আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াতটি (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৪৩) নাযিল করেন।

কেহ কেহ বলেন যে, তারা একটি জনশূন্য নির্মল বায়ুযুক্ত খোলা মাঠে অবস্থান করছিল। অতঃপর তারা দু'জন মালাইকার চীৎকারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার ফলে তাদের অস্থিগুলিও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সেই জায়গায় জনবসতি গড়ে উঠে। একদা হিযকীল নামে বানী ইসরাঈলের একজন নাবী সেখান দিয়ে গমন করেন। তিনি তাদের পুনর্জীবনের জন্য প্রার্থনা করেন এবং আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা কবূল করেন। আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দেন ঃ 'তুমি বল, 'হে গলিত অস্থিগুলি! আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে তোমরা একত্রিত হয়ে যাও।' অতঃপর প্রত্যেক শরীরের অস্থির কাঠামো দাঁড়িয়ে গেল। এরপর তাঁর উপর আল্লাহর নির্দেশ হল ঃ 'তুমি বল, 'হে অস্থিগুলি! আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে তোমরা গোশ্ত, শিরা ইত্যাদিও তোমাদের উপর মিলিয়ে নাও।' অতঃপর ঐ নাবীর (আঃ) চোখের সামনে এটাও হয়ে গেল। এরপর তিনি আল্লাহর নির্দেশক্রমে আত্মাগুলিকে সম্বোধন করে বলেন ঃ 'হে আত্মাসমূহ! তোমরা আল্লাহ তা'আলার হুকুমে পূর্বের নিজ নিজ দেহের ভিতর প্রবেশ কর।' সঙ্গে সঙ্গে যেমন তারা এক সাথে সব মরে গিয়েছিল তেমনই সবাই এক সাথে জীবিত হয়ে গেল এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের মুখে উচ্চারিত হল ঃ سُبْحَانَكَ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اَنْتَ অর্থাৎ 'আপনি পবিত্র! আপনি ছাড়া কেহ উপাস্য নেই।' কিয়ামাতের দিন ঐ দেহের সঙ্গেই দ্বিতীয়বার আত্মার উত্থিত হওয়ার এটা দলীল। অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ

إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ মানুষের উপর আল্লাহ তা'আলার বড়ই অনুগ্রহ রয়েছে যে, তিনি মহাশক্তির বড় বড় নিদর্শনাবলী তাদেরকে প্রদর্শন করছেন। কিন্তু أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ এটা সত্ত্বেও অধিকাংশ লোক মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেনা।

এ আয়াত থেকে জানা যাচ্ছে যে, আল্লাহ ছাড়া প্রাণ রক্ষা ও আশ্রয় লাভের অন্য কোন উপায় নেই। ঐ লোকগুলি প্লেগের ভয়ে পলায়ন করেছিল এবং ইহলৌকিক জীবনের প্রতি লোভী ছিল, তাই তাদের প্রতি আল্লাহর শাস্তি এসে যায় এবং তারা ধ্বংস হয়। মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, যখন উমার (রাঃ) সিরিয়ার দিকে গমন করেন এবং *'সারাগ'* নামক স্থানে পৌঁছেন তখন আবূ ওবাইদাহ ইব্ন জাররাহ (রাঃ) প্রমুখ সেনাপতিদের সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটে। তারা তাকে সংবাদ দেন যে, সিরিয়ায় প্লেগ রোগ রয়েছে। তখন তারাও সেখানে যাবেন নাকি

যাবেননা এ নিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়। অবশেষে আবদুর রাহমান ইব্‌ন আউফ (রাঃ) এসে তাদের সাথে মিলিত হন এবং বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'যখন এমন জায়গায় প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে যেখানে তোমরা অবস্থান করছ তখন তোমরা তার ভয়ে পলায়ন করনা। আর যখন তোমরা কোন জায়গায় বসে সেখানকার সংবাদ শুনতে পাও তখন তোমরা সেখানে যেওনা।' উমার (রাঃ) এ কথা শুনে আল্লাহর প্রশংসা করে সেখান হতে ফিরে যান। (আহমাদ ১/১৯৪, ফাতহুল বারী ১০/১৮৯, ১৯০ ১২/৩৬১, মুসলিম ৪/১৭৪০)

জিহাদ থেকে পলায়ন করলেই মৃত্যু থেকে রেহাই পাওয়া যাবেনা

অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ঐ লোকদের পলায়ন যেমন তাদেরকে মৃত্যু হতে রক্ষা করতে পারলনা, তদ্রূপ তোমাদেরও যুদ্ধ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়া বৃথা। মৃত্যু ও আহার্য দু'টোই ভাগ্যে নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। নির্ধারিত আহার্য বাড়বেও না কমবেও না। তদ্রূপ মৃত্যুও নির্ধারিত সময়ের পূর্বেও আসবেনা অথবা পিছনেও সরে যাবেনা। অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخۡوَٰنِهِمۡ وَقَعَدُواْ لَوۡ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْۗ قُلۡ فَٱدۡرَءُواْ عَنۡ أَنفُسِكُمُ ٱلۡمَوۡتَ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ

ওরা তারা, যারা গৃহে বসে স্বীয় নিহত ভাইদের সম্বন্ধে বলে ঃ যদি তারা আমাদের কথা মান্য করত তাহলে নিহত হতনা। তুমি বল ঃ যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে নিজেদেরকে মৃত্যু হতে রক্ষা কর। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৬৮) অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبۡتَ عَلَيۡنَا ٱلۡقِتَالَ لَوۡلَآ أَخَّرۡتَنَآ إِلَىٰٓ أَجَلٖ قَرِيبٖۗ قُلۡ مَتَٰعُ ٱلدُّنۡيَا قَلِيلٞ وَٱلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ لِّمَنِ ٱتَّقَىٰ وَلَا تُظۡلَمُونَ فَتِيلاً. أَيۡنَمَا تَكُونُواْ يُدۡرِككُّمُ ٱلۡمَوۡتُ وَلَوۡ كُنتُمۡ فِي بُرُوجٖ مُّشَيَّدَةٖ

এবং তারা বলল ঃ হে আমাদের রাব্ব! আপনি কেন আমাদের উপর যুদ্ধ ফার্‌য করলেন? কেন আমাদেরকে আর কিছুকালের জন্য অবসর দিলেননা? তুমি বল ঃ পার্থিব ফায়দা সীমিত এবং ধর্মভীরুগণের জন্য পরকালই কল্যাণকর; এবং তোমরা খর্জুর বীজ পরিমাণও অত্যাচারিত হবেনা। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদেরকে পেয়ে যাবে, যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান কর। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৭৭-৭৮) এ স্থলে ইসলামী সৈনিকদের উদ্যমশীল নেতা, বীর পুরুষদের অগ্রগামী, আল্লাহর তরবারী এবং ইসলামের আশ্রয়স্থল আবূ সুলাইমান খালিদ ইব্‌ন ওয়ালিদের (রাঃ) ঐ উক্তি উদ্ধৃত করা সম্পূর্ণ সময়োপযোগী হবে যা তিনি ঠিক মৃত্যুর সময় বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ 'মৃত্যুকে ভয়কারী, যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়নকারী কাপুরুষের দল কোথায় রয়েছে? তারা দেখুক যে, আমার গ্রন্থীসমূহ আল্লাহর পথে আহত হয়েছে। দেহের কোন জায়গা এমন নেই যেখানে তীর, তরবারী, বর্শা ও বল্লমের আঘাত লাগেনি। অথচ দেখ যে, আমি যুদ্ধক্ষেত্রে না থেকে বিছানায় পড়ে মৃত্যুবরণ করছি। (তাহযিব আত তাহযিব ৩/১২৪)

'উত্তম ঋণ' এবং উহার প্রতিদান

مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا অতঃপর বিশ্বপ্রভু তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর পথে খরচ করার উৎসাহ দিচ্ছেন। এরূপ উৎসাহ তিনি বিভিন্ন স্থানে দিয়েছেন। হাদীস-ই নযুলেও রয়েছে ঃ 'কে এমন আছে যে, সেই আল্লাহকে ঋণ দিবে যিনি না দরিদ্র, আর না অত্যাচারী?' এই আয়াতটি (২ ঃ ২৪৫) শুনে আবুদ দাহ্‌দাহ আনসারী (রাঃ) বলেছিলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! 'আল্লাহ কি আমাদের নিকট ঋণ চাচ্ছেন?' তিনি বলেন, 'হ্যাঁ'। আবুদ দাহ্‌দাহ তখন বলেন ঃ 'আমাকে আপনার হাতখানি দিন।' অতঃপর তিনি তার হাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত নিয়ে বলেন ঃ 'আমি আমার ছয়শ' খেজুর গাছ বিশিষ্ট বাগানটি আমার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানিত মহান প্রভুকে ঋণ প্রদান করলাম।' সেখান হতে সরাসরি তিনি বাগানে আগমন করেন এবং স্ত্রীকে ডাক দেন ঃ 'হে উম্মুদ দাহ্‌দাহ!' স্ত্রী উত্তরে বলেন ঃ আমি উপস্থিত রয়েছি।' তখন তিনি তাঁকে বলেন ঃ 'তুমি বেরিয়ে এসো। 'আমি এই বাগানটি আমার মহাসম্মানিত প্রভুকে ঋণ দিয়েছি।' (ইব্‌ন আবী হাতীম) *'করয-ই হাসানা'* এর ভাবার্থ আল্লাহ তা'আলার পথেও খরচ হবে, সন্তানদের জন্যও খরচ হবে এবং আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতাও বর্ণনা করা হবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً 'আল্লাহ তা দ্বিগুণ/বহুগুণ করে দিবেন'। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّا۟ئَةُ حَبَّةٍ ۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ

যারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের উপমা যেমন একটি শস্যবীজ, তা হতে উৎপন্ন হল সাতটি শীষ, প্রত্যেক শীষে (উৎপন্ন হল) এক শত শস্য, এবং আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন বর্ধিত করে দেন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৬১) এই আয়াতের তাফসীর ইনশাআল্লাহ অতি সত্ত্বরই আসছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আহার্যের হ্রাস ও বৃদ্ধি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। আল্লাহর পথে খরচ করায় কার্পণ্য করনা। যাকে তিনি বেশি দিয়েছেন তার মধ্যেও যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে এবং যাকে দেননি তার মধ্যেও দূরদর্শিতা রয়েছে। তোমরা সবাই কিয়ামাতের দিন তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তীত হবে।

٢٤٦. أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ مِنۢ بَعْدِ مُوسَىٰٓ إِذْ قَالُوا۟ لِنَبِىٍّ لَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تُقَٰتِلُوا۟ ۖ قَالُوا۟ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَٰتِلَ فِى

২৪৬। তুমি কি মূসার পরে ইসরাঈল বংশীয় প্রধানদের প্রতি লক্ষ্য করনি? নিজেদের এক নাবীকে যখন তারা বলেছিল ঃ আমাদের জন্য একজন রাজা নিযুক্ত করে দাও (যেন) আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে পারি। সে বলেছিল ঃ এটা কি সম্ভবপর নয় যে, যখন তোমাদের উপর যুদ্ধ বিধিবদ্ধ হয়ে যাবে তখন তোমরা যুদ্ধ করবেনা? তারা বলেছিল ঃ আমরা যুদ্ধ করবনা এটা কিরূপে (সম্ভব), অথচ নিজেদের আবাস হতে ও

سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَـٰرِنَا وَأَبْنَآئِنَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا۟ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلظَّـٰلِمِينَ	**স্বজনদের নিকট হতে আমরা বহিস্কৃত হয়েছি? অনন্তর যখন তাদের উপর যুদ্ধ বিধিবদ্ধ হল তখন তাদের অল্প সংখ্যক ব্যতীত সবাই পশ্চাৎপদ হয়ে পড়ল এবং অত্যাচারীদেরকে আল্লাহ সম্যক রূপে অবগত আছেন।**

ঐ ইয়াহুদীদের বর্ণনা যারা তাদের জন্য একজন বাদশাহ নিযুক্ত করার আবেদন জানিয়েছিল

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, ২৪৬ নং আয়াতে যে বাদশাহর কথা বলা হয়েছে তিনি হচ্ছেন নাবী শামভিল। (তাবারী ৫/২৯৩)

ওয়াহাব ইব্ন মুনাব্বিহ (রহঃ) বলেন, মূসার (আঃ) পরে কিছুদিন পর্যন্ত বানী ইসরাঈল সত্যের উপরেই ছিল। অতঃপর তারা শির্ক ও বিদ‘আতের মধ্যে পতিত হয়। তথাপি তাদের মধ্যে ক্রমাগত নাবী পাঠানো হয়। কিন্তু যখন তাদের অন্যায় কার্যকলাপ সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন আল্লাহ তা‘আলা তাদের শত্রুদেরকে তাদের উপর জয়যুক্ত করেন। সুতরাং তাদের শত্রুরা তাদের বহু লোককে হত্যা করল, বহু বন্দী করল এবং তাদের বহু শহর দখল করে নিল। পূর্বে তাদের নিকট তাওরাত ও শান্তিতে পরিপূর্ণ তাবূত (সিন্দুক) বিদ্যমান ছিল যা মূসা (আঃ) হতে উত্তরাধিকার সূত্রে চলে আসছিল। এর ফলে তারা যুদ্ধে জয়লাভ করত। কিন্তু তাদের দুষ্টামি ও জঘন্য পাপের কারণে মহান আল্লাহর এই নি‘আমাত তাদের হাত হতে ছিনিয়ে নেয়া হয় এবং তাদের বংশের মধ্যে নাবুওয়াতও শেষ হয়ে যায়। ‘লাভী’ নামক ব্যক্তির বংশধরের মধ্যে পর্যায়ক্রমে নাবুওয়াত চলে আসছিল, তারা সবাই বিভিন্ন যুদ্ধে মারা যায়। তাদের মধ্যে শুধুমাত্র এক গর্ভবতী স্ত্রী লোক বেঁচে ছিল। তার স্বামীও নিহত হয়েছিল। এখন বানী ইসরাঈলের দৃষ্টি ঐ স্ত্রী লোকটির উপর ছিল। তাদের আশা ছিল যে, আল্লাহ তাকে পুত্রসন্তান দান করবেন এবং তিনি নাবী হবেন। দিন-রাত ঐ স্ত্রী লোকটিরও এই প্রার্থনাই ছিল। আল্লাহ তা‘আলা তার প্রার্থনা কবূল করেন এবং তাকে একটি পুত্রসন্তান দান করেন। ছেলেটির নাম শামভিল বা শামউন রাখা হয়। এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে ‘আল্লাহ আমার প্রার্থনা কবূল করেছেন।’

নাবুওয়াতের বয়স হলে তাঁকে নাবুওয়াত দেয়া হয়। যখন তিনি নাবুওয়াতের দা'ওয়াত দেন তখন তাঁর সম্প্রদায় তাঁর নিকট প্রার্থনা জানায় যে, তাদের উপর যেন একজন বাদশাহ্ নিযুক্ত করা হয় তাহলে তারা তাঁর নেতৃত্বে জিহাদ করবে। বাদশাহ তো প্রকাশিত হয়েই পড়েছিলেন। কিন্তু উক্ত নাবী (আঃ) তাঁর সন্দেহের কথা তাদের নিকট বর্ণনা করেন যে, তাদের প্রতি জিহাদ ফার্য করা হলে তারা জিহাদ হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে না তো? তারা উত্তরে বলে যে, তাদের সাম্রাজ্য ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে এবং তাদের সন্তানদেরকে বন্দী করা হয়েছে তথাপি তারা কি এতই কাপুরুষ যে মৃত্যুর ভয়ে তারা জিহাদ হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে? তখন জিহাদ ফার্য করে দেয়া হল এবং তাদেরকে বাদশাহর সাথে যুদ্ধ ক্ষেত্রে গমন করতে বলা হল। এই নির্দেশ শ্রবণমাত্র অল্প কয়েকজন ব্যতীত সবাই অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল। তাদের এই অভ্যাস নতুন ছিলনা। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা এটা জানতেন।

২৪৭। এবং তাদের নাবী তাদেরকে বলেছিল ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তালূতকে তোমাদের জন্য রাজা রূপে নির্বাচিত করেছেন; তারা বলল ঃ আমাদের উপর তালূতের রাজত্ব কি রূপে (সঙ্গত) হতে পারে? রাজত্বে তার অপেক্ষা আমাদেরই স্বত্ব অধিক, পক্ষান্তরে যথেষ্ট আর্থিক স্বচ্ছলতাও তার নেই; তিনি বললেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাকেই মনোনীত করেছেন এবং তাকে প্রচুর জ্ঞান ও দৈহিক শক্তি দান করেছেন, আল্লাহ তাঁর রাজত্ব যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন এবং আল্লাহ হচ্ছেন দানশীল, সর্বজ্ঞাতা।	٢٤٧. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوٓا۟ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ ۚ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُۥ بَسْطَةً فِى ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ ۖ وَٱللَّهُ يُؤْتِى مُلْكَهُۥ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

যখন বানী ইসরাঈলরা তাদের নাবীকে তাদের একজন বাদশাহ নিযুক্ত করতে বলল তখন নাবী (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে তালূতকে তাদের সামনে বাদশাহরূপে পেশ করলেন। তিনি বাদশাহী বংশের ছিলেননা, বরং একজন সৈনিক ছিলেন। ইয়াহুদার সন্তানরা রাজ বংশের লোক এবং তালূত এদের মধ্যে ছিলেননা। তাই জনগণ প্রতিবাদ করে বলল যে, তালূত অপেক্ষা তারাই রাজত্বের দাবীদার বেশী। দ্বিতীয় কথা এই যে, তিনি দরিদ্র ব্যক্তি। তাঁর কোন ধন-সম্পদ নেই। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি ভিস্তী ছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, তিনি চর্ম সংস্কারক ছিলেন। সুতরাং নাবীর আদেশের সামনে তাদের এই প্রতিবাদ ছিল প্রথম বিরোধিতা। নাবী (আঃ) উত্তর দিলেন ঃ 'এই নির্বাচন আমার পক্ষ হতে হয়নি যে, আমি পুনর্বিবেচনা করব। বরং এটা তো স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ। সুতরাং এই নির্দেশ পালন করা অবশ্য কর্তব্য। তাছাড়া এটাতো প্রকাশমান যে, তিনি তোমাদের মধ্যে একজন বড় আলেম, তাঁর দেহ সুঠাম ও সবল, তিনি একজন বীর পুরুষ এবং যুদ্ধ বিদ্যায় তাঁর পারদর্শিতা রয়েছে।' এর দ্বারা এটাও সাব্যস্ত হচ্ছে যে, বাদশাহর মধ্যে উপরোক্ত গুণাবলী থাকা প্রয়োজন।

এরপরে বলা হচ্ছে যে, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলাই হচ্ছেন মহাবিজ্ঞ এবং সাম্রাজ্যের প্রকৃত অধিকর্তা তিনিই। সুতরাং তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই রাজত্ব প্রদান করে থাকেন। তিনি হচ্ছেন সর্বজ্ঞাতা ও মহাবিজ্ঞানময়। কার এই ক্ষমতা রয়েছে যে, তাঁর কাজের ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করবে? একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ছাড়া সবার ব্যাপারেই প্রশ্ন উঠতে পারে। তিনি ব্যাপক দান ও অনুগ্রহের অধিকারী। তিনি যাকে চান নিজের নি'আমাত দ্বারা নির্দিষ্ট করে থাকেন, তিনি মহাজ্ঞানী। সুতরাং কে কোন্ জিনিসের যোগ্য এবং কোন্ জিনিসের অযোগ্য এটা তিনি খুব ভালভাবেই জানেন।

২৪৮। এবং তাদের নাবী তাদের বলেছিল ঃ তার রাজত্বের নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট সিন্দুক সমাগত হবে, যাতে থাকবে তোমাদের রবের নিকট হতে শান্তি এবং মূসা ও হারুনের পরিবারের (পরিত্যক্ত) কিছু	٢٤٨. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِۦٓ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ

Contents

مُوسَىٰ وَءَالُ هَـٰرُونَ تَحۡمِلُهُ ٱلۡمَلَـٰٓئِكَةُ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَأَيَةً لَّكُمۡ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ	**সামগ্রী, মালাইকা/ফেরেশতা ওটা বহন করে আনবে, তোমরা যদি বিশ্বাস স্থাপনকারী হও তাহলে ওর মধ্যে নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।**

তাদের নাবী তাদেরকে বলেন ঃ ‘তালূতের রাজত্বের প্রথম বারাকাতের নিদর্শন এই যে, শান্তিতে পরিপূর্ণ হারানো তাবূত তোমরা ফিরে পাবে, যার ভিতর রয়েছে পদমর্যাদা, সম্মান, মহিমা, স্নেহ ও করুণা। তাতে আরও রয়েছে আল্লাহর নিদর্শনাবলী যা তোমরা ভালভাবেই জান।’ কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, তা ছিল ‘সাকীনা’ বা শান্তি। (মুসনাদ আবদুর রায্যাক ১/৯৮) অন্যরা বলেন যে, তা ছিল সোনার একটি বড় থালা যাতে নাবীগণের (আঃ) অন্তরসমূহ ধৌত করা হত। ওটা মূসা (আঃ) প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তার মধ্যে তিনি তাওরাতের তক্তা রাখতেন। (তাবারী ৫/৩৩১) একই তাফসীর করেছেন কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) এবং ইকরিমাহ (রহঃ)। আবদুর রায্যাক (রহঃ) বলেছেন যে, তিনি সুফিয়ান সাওরীকে (রহঃ) وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ ‘এবং মূসা ও হারূনের অনুচরদের (পরিত্যক্ত) মঙ্গল বিশেষ’ এর অর্থ জানতে চাইলে তিনি বলেন ঃ কেহ কেহ বলেন যে, ওতে ছিল ‘মান্না’ এর পাত্র, তাওরাতের তক্তা। অন্যরা বলেন যে, উহা ছিল মূসার (আঃ) কিছু কাপড় এবং জুতা। (দেখুন ২০ ঃ ১২) (তাবারী ৫/৩৩৩)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে যুরাইয (রহঃ) বলেন ঃ ‘মালাইকা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থল দিয়ে ঐ তাবূতকে উঠিয়ে জনগণের সামনে নিয়ে আসেন এবং তালূত বাদশাহর সামনে রেখে দেন। তার নিকট তাবূতকে দেখে লোকদের শামঊন নাবীর (আঃ) নাবুওয়াত ও তালূতের রাজত্বের উপর পূর্ণ বিশ্বাস হয়। (তাবারী ৫/৩৩৫)

এরপর নাবী (আঃ) তাদেরকে বলেন ঃ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَّكُمْ ‘আমার নাবুওয়াত ও তালূতের রাজত্বের এটাও একটি প্রমাণ। তোমরা আল্লাহ তা‘আলার উপর, পরকালের উপর এবং তালূতের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর।

২৪৯। অনন্তর যখন তালূত সৈন্যদলসহ বহির্গত হয়েছিল তখন সে বলেছিল, নিশ্চয়ই আল্লাহ একটি নদী দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন, ওটা হতে যে পান করবে সে আমার দলভুক্ত নয় এবং যে স্বীয় হস্ত দ্বারা অঞ্জলি পূর্ণ করে নিবে এবং তদ্ব্যতীত সে আর আস্বাদন করবেনা সে নিশ্চয়ই আমার লোক; কিন্তু তাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক ব্যতীত অন্য সবাই সেই নদীর পানি পান করল, অতঃপর যখন সে ও তার সঙ্গী বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ নদী অতিক্রম করে গেল তখন তারা বলল ঃ জালুত ও তার সেনাবাহিনীর মুকাবিলা করার শক্তি আজ আমাদের নেই; পক্ষান্তরে যারা বিশ্বাস করত যে, তাদেরকে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে তারা বলল ঃ আল্লাহর হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাজিত করেছে; বস্তুতঃ ধৈর্যশীলদের সঙ্গী হচ্ছেন আল্লাহ!

٢٤٩. فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُۥ مِنِّيٓ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةًۢ بِيَدِهِۦ ۚ فَشَرِبُوا۟ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۚ فَلَمَّا جَاوَزَهُۥ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ قَالُوا۟ لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِۦ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَـٰقُوا۟ ٱللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةًۢ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّـٰبِرِينَ

এখন ঐ ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে, যখন বানী ইসরাঈলের লোকেরা তালূতকে বাদশাহ বলে মেনে নিল, তখন তিনি তাদেরকে সাথে নিয়ে যুদ্ধে বের হলেন। সুদ্দীর (রহঃ) উক্তি অনুযায়ী তাদের সংখ্যা ছিল আশি হাজার। (তাবারী ৫/৩৩৯) পথে তালূত তাদেরকে বললেন ঃ 'আল্লাহ তোমাদেরকে একটি নদী দ্বারা পরীক্ষা করবেন।' ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) উক্তি অনুসারে ঐ নদীটি জর্ডান ও ফিলিস্তিনের মধ্যবর্তী স্থলে অবস্থিত ছিল। ঐ নদীটির নাম ছিল 'নাহরুশ্ শারীআহ'। (তাবারী ৫/৩৪০) তালূত তাদেরকে সতর্ক করে দেন যে, কেহ যেন ঐ নদীর পানি পান না করে। যারা পান করবে তারা যেন আমার সাথে না যায়। এক আধ চুমুক যদি কেহ পান করে তাহলে কোন দোষ নেই। কিন্তু সেখানে পৌঁছে তারা অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ে। কাজেই তারা পেট পুরে পানি পান করে। কিন্তু অল্প কয়েকজন অত্যন্ত খাঁটি ঈমানদার লোক ছিলেন। তারা এক চুমুক ব্যতীত পান করলেননা।

ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) উক্তি অনুযায়ী ঐ এক চুমুকেই তাদের পিপাসা মিটে যায় এবং তারা জিহাদেও অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু যারা পূর্ণভাবে পান করেছিল তাদের পিপাসাও নিবৃত্ত হয়নি এবং তারা জিহাদের উপযুক্ত বলেও গণ্য হয়নি। বারা ইব্‌ন আযিব (রাঃ) বলেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ (রাঃ) প্রায়ই বলতেন ঃ 'বদরের যুদ্ধে আমাদের সংখ্যা ততজনই ছিল যতজন তালূতের অনুগত সৈন্যদের সংখ্যা ছিল যারা নদী পার হয়েছিল। অর্থাৎ তিনশ' তেরো জন।' (তাবারী ৫/৩৪৫-৩৪৭) ইমাম বুখারীও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী ৭/৩৩৯)

নদী পার হয়েই অবাধ্য লোকেরা প্রতারণা শুরু করে দিল এবং অত্যন্ত কাপুরুষতার সাথে যুদ্ধে যেতে অস্বীকার করে বসল। শত্রু সৈন্যদের সংখ্যা বেশি শুনে তাদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। সুতরাং তারা স্পষ্টভাবে বলে ফেলল ঃ 'আজ তো আমরা জালূতের সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের মধ্যে অনুভব করতে পারছিনা।' তাদের মধ্যে যাঁরা আলেম ছিলেন তারা তাদেরকে বিভিন্নভাবে বুঝিয়ে বললেন ঃ 'বিজয় লাভ সৈন্যদের আধিক্যের উপর নির্ভর করেনা। ধৈর্যশীলদের উপর আল্লাহ তা'আলার সাহায্য এসে থাকে। বহুবার এরূপ ঘটেছে যে, মুষ্টিমেয় কয়েকটি লোক বিরাট দলকে পরাজিত করেছে। সুতরাং তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং আল্লাহ তা'আলার অঙ্গীকারের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ কর। এই ধৈর্যের বিনিময়ে আল্লাহ তোমাদের সহায় হবেন।' কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তাদের মৃত অন্তরে উত্তেজনার সৃষ্টি হলনা এবং তাদের ভীরুতা দূর হলনা।

২৫০। এবং যখন তারা জালুত ও তার সেনাবাহিনীর সম্মুখীন হল, বলতে লাগল ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে পূর্ণ সহিষ্ণুতা দান করুন, আর আমাদের চরণগুলি অটল রাখুন এবং কাফির জাতির উপর আমাদেরকে সাহায্য করুন!	٢٥٠. وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِۦ قَالُواْ رَبَّنَآ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ
২৫১। তখন তারা আল্লাহর হুকুমে জালুতের সৈন্যদেরকে পরাজিত করল এবং দাউদ জালুতকে হত্যা করল। এবং আল্লাহ দাউদকে রাজ্য ও প্রজ্ঞা দান করলেন এবং তাকে ইচ্ছানুযায়ী শিক্ষা দান করলেন; আর যদি আল্লাহ এক দলকে অপর দলের দ্বারা প্রদমিত না করতেন তাহলে নিশ্চয়ই পৃথিবী অশান্তিপূর্ণ হত, কিন্তু আল্লাহ বিশ্ব জগতের প্রতি অনুগ্রহকারী।	٢٥١. فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُۥدُ جَالُوتَ وَءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُۥ مِمَّا يَشَآءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ
২৫২। এগুলি আল্লাহর নিদর্শন - তোমার নিকট এগুলি সত্যরূপে উপস্থাপন করেছি এবং নিশ্চয়ই তুমি রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত।	٢٥٢. تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ ۚ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ

তালুতের ঈমানদার ক্ষুদ্র সেনাদলটি যখন কাফিরদের কাপুরুষ সেনাদলকে দেখলেন তখন তারা মহান আল্লাহর নিকট করজোড় প্রার্থনা জানিয়ে বলেন ঃ 'হে আল্লাহ! আমাদেরকে ধৈর্য ও অটলতার পাহাড় বানিয়ে দিন এবং যুদ্ধের সময় আমাদের পাগুলি অটল ও স্থির রাখুন! যুদ্ধের মাঠ থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন হতে আমাদেরকে রক্ষা করুন এবং শত্রুদের উপর আমাদেরকে জয়যুক্ত করুন।' তাদের এই বিনীত ও আন্তরিক প্রার্থনা আল্লাহ তা'আলা কবূল করেন এবং তাদের প্রতি সাহায্য অবতীর্ণ করেন। ফলে এই ক্ষুদ্র দলটি কাফিরদের ঐ বিরাট দলটিকে তছনছ করে দেয় এবং দাঊদের (আঃ) হাতে বিরোধী দলের নেতা জালূত মারা যায়। তালূত অঙ্গীকার করেছিলেন, যদি কেহ জালূতকে হত্যা করতে পারে তাহলে তিনি তার সাথে তার মেয়ের বিয়ে দিবেন এবং তার রাজত্বেরও অধিকারী করবেন। তালূত তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেন। অবশেষে দাঊদ (আঃ) একচ্ছত্র সম্রাট হয়ে যান এবং বিশ্বপ্রভুর পক্ষ হতে তাঁকে নাবুওয়াতও দান করা হয় এবং শামউনের (আঃ) পর তিনি নাবী ও বাদশাহ দুইই থাকেন। এখানে 'হিকমাত' এর ভাবার্থ নাবুওয়াত। মহান আল্লাহ স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে কয়েকটি নির্দিষ্ট বিদ্যাও শিক্ষা দেন।

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে, 'যেমন আল্লাহ বানী ইসরাঈলকে তালূতের মত সঠিক পরামর্শদাতা ও চিন্তাশীল বাদশাহ এবং দাঊদের (আঃ) মত মহাবীর সেনাপতি দান করে জালূত ও তার অধীনস্থদেরকে পরাজিত করেছেন, এভাবে যদি তিনি একদলকে অপর দল দ্বারা অপসারিত না করতেন তাহলে অবশ্যই মানুষ ধ্বংস হয়ে যেত। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَٰتٌ وَمَسَٰجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا

আল্লাহ যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খৃষ্টান, সংসার বিরাগীদের উপাসনা স্থল, গীর্জা, ইয়াহূদীদের উপাসনালয় এবং মাসজিদসমূহ যাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহর নাম। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৪০) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'একজন সৎ ও ঈমানদারের কারণে আল্লাহ তা'আলা তার আশে-পাশের শত শত পরিবার হতে বিপদসমূহ দূর করে থাকেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'এটা আল্লাহ তা'আলার একটি নি'আমাত ও অনুগ্রহ যে, তিনি একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত করে থাকেন। তিনিই

প্রকৃত হাকিম। তাঁর প্রতিটি কাজ হিকমাতে পরিপূর্ণ। তিনি তাঁর দলীলসমূহ বান্দাদের নিকট স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন এবং তিনি সমস্ত সৃষ্টজীবের উপর দয়া ও অনুগ্রহ করতে রয়েছেন।

অতঃপর তিনি বলেন, 'হে নাবী! এই ঘটনাবলী এবং সমস্ত সত্য কথা আমি ওয়াহীর মাধ্যমে তোমাকে জানিয়েছি। তুমি আমার সত্য নাবী। আমার এই কথাগুলি এবং স্বয়ং তোমার নাবুওয়াতের সত্যতা সম্বন্ধেও ঐসব লোক পূর্ণভাবে অবগত রয়েছে, যাদের হাতে কিতাব রয়েছে। এখানে মহান আল্লাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাষায় শপথ করে স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণ করেন।

দ্বিতীয় পারা সমাপ্ত।

২৫৩। এই সকল রাসূল, আমি যাদের কারও উপর কেহকে মর্যাদা প্রদান করেছি, তাদের মধ্যে কারও সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন এবং কেহকে পদমর্যাদায় সমুন্নত করেছেন, আর মারইয়াম নন্দন ঈসাকে প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী দান করেছি এবং তাকে পবিত্র আত্মাযোগে সাহায্য করেছি, আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে নাবীগণের পরবর্তী লোকেরা, তাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণপুঞ্জ সমাগত হওয়ার পর পরস্পরের সাথে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হতনা। কিন্তু তারা পরস্পর মতবিরোধ করেছিল; ফলে তাদের কতক হল মু'মিন, আর কতক হল কাফির। বস্তুতঃ আল্লাহ ইচ্ছা	٢٥٣. تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۘ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ ۖ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَـٰتٍ ۚ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَـٰتِ وَأَيَّدْنَـٰهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنۢ بَعْدِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَـٰتُ وَلَـٰكِنِ ٱخْتَلَفُوا۟ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم

مَّن كَفَرَ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُواْ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ	**করলে তারা পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হতনা, কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা'ই সম্পন্ন করে থাকেন।**

আল্লাহ তা'আলা কোন কোন নাবীকে অন্য নাবীদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন

এখানে বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, রাসূলগণের মধ্যেও শ্রেণীভেদ রয়েছে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ عَلَىٰ بَعْضٍ ۖ وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ زَبُورًا

আমি তো নাবীদের কতককে কতকের উপর মর্যাদা দিয়েছি; দাঊদকে আমি যাবুর দিয়েছি। (সূরা ইসরাহ, ১৭ ঃ ৫৫) এখানেও ওরই বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন যে, তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ স্বয়ং আল্লাহর সাথে কথা বলারও মর্যাদা লাভ করেছেন। যেমন মূসা (আঃ), মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আদম (আঃ)।

সহীহ ইব্ন হিব্বানে একটি হাদীস মিরাজের বর্ণনার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন্ আকাশে কোন্ নাবীকে (আঃ) পেয়েছিলেন তারও বর্ণনা রয়েছে। নাবীগণের (আঃ) মর্যাদা কম-বেশি হওয়ার এটাও একটা দলীল।

একটি হাদীসে রয়েছে যে, একজন মুসলিম ও একজন ইয়াহুদীর মধ্যে কিছু বচসা হয়। ইয়াহুদী বলে ঃ 'সেই আল্লাহর শপথ যিনি মূসাকে (আঃ) সারা জগতের উপর মর্যাদা দান করেছেন।' মুসলিমটি এ কথা সহ্য করতে না পেরে তাকে এক চড় মারেন এবং বলেন ঃ 'ওরে খবীস! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতেও তিনি শ্রেষ্ঠ?' ইয়াহুদী সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে মুসলিমটির বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। তিনি বলেন ঃ

'তোমরা আমাকে নাবীগণের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করনা। কিয়ামাতের দিন সবাই অজ্ঞান হয়ে যাবে। সর্বপ্রথম আমার জ্ঞান ফিরবে। আমি দেখব যে, মূসা (আঃ) আল্লাহর আরশের পায়া ধরে রয়েছেন। আমার জানা নেই যে, আমার পূর্বে তাঁরই জ্ঞান ফিরেছে নাকি তিনি আসলে অজ্ঞানই হননি এবং তূর পাহাড়ের

অজ্ঞান হওয়ার বিনিময়ে আজ আল্লাহ তাঁকে অজ্ঞান হওয়া থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছেন। সুতরাং তোমরা আমাকে নাবীগণের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করনা।' (ফাতহুল বারী ৬/৫০৮, মুসলিম ৪/১৮৪৪) এই হাদীসটি কুরআনের এই আয়াতটির বিপরীত বলে মনে হচ্ছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই দু'য়ের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা কিছু নেই।

এ কথার ভাবার্থ হচ্ছে ঃ 'সম্মান ও মর্যাদা প্রদানের ফাইসালা তোমাদের অধিকারে নেই, বরং এ ফাইসালা হবে মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে। তিনি যাঁকে মর্যাদা দান করবেন তোমাদেরকে তা মেনে নিতে হবে। তোমাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশকে মেনে নেয়া ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ কোন নাবীকে অন্য কোন কোন নাবীর উপর প্রাধান্য দিবেনা। (ফাতহুল বারী ৬/৫১৯, মুসলিম ৪/১৮৪৪) এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ ঈসাকে (আঃ) তিনি এমন স্পষ্ট দলীলসমূহ প্রদান করেছেন যেগুলি দ্বারা বানী ইসরাঈলের উপর স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে যে, তাঁর রিসালাত সম্পূর্ণরূপে সত্য। আর সাথে সাথে এটাও স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়েছে যে, ঈসা (আঃ) অন্যান্য বান্দাদের মত আল্লাহর একজন শক্তিহীন ও অসহায় বান্দা ছাড়া আর কিছুই নন। আর তিনি পবিত্রাত্মা অর্থাৎ জিবরাঈল (আঃ) দ্বারা তাঁকে সাহায্য করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, পরবর্তীদের মতবিরোধও তাঁর ইচ্ছারই নমুনা। তাঁর মাহাত্ম্য এই যে, وَلَـــكِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করে থাকেন।

২৫৪। হে বিশ্বাসীগণ! আমি তোমাদেরকে যে উপজীবিকা দান করেছি তা হতে সেদিন সমাগত হওয়ার পূর্বে ব্যয় কর যেদিন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ নেই, আর অবিশ্বাসীরাই অত্যাচারী।	٢٥٤. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِمَّا رَزَقْنَـٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَـٰعَةٌ ۗ وَٱلْكَـٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন নিজেদের সম্পদ সৎ পথে খরচ করে। তাহলে আল্লাহর নিকট তার সাওয়াব জমা থাকবে। অতঃপর বলেন যে, তারা যেন তাদের জীবদ্দশাতেই কিছু দান-খাইরাত করে। কেননা কিয়ামাতের দিন না ক্রয়-বিক্রয় চলবে, আর না পৃথিবী পরিমাণ সোনা দিয়ে জীবন রক্ষা করা যাবে। কারও বংশ, বন্ধুত্ব ও ভালবাসা কোন কাজে আসবেনা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ بَيۡنَهُمۡ يَوۡمَئِذٖ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ

যে দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবেনা, এবং একে অপরের খোঁজ খবর নিবেনা। (সূরা মু’মিনূন, ২৩ ঃ ১০১) সেদিন সুপারিশকারীর সুপারিশ কোন কাজে আসবেনা।

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, কাফিরেরাই অত্যাচারী। অর্থাৎ পূর্ণ অত্যাচারী তারাই যারা কুফরী অবস্থায়ই আল্লাহ তা‘আলার সাথে সাক্ষাৎ করে। ‘আতা ইব্ন দীনার (রহঃ) বলেন, ‘আমি মহান আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে, তিনি কাফিরদেরকে অত্যাচারী বলেছেন, কিন্তু অত্যাচারীদেরকে কাফির বলেননি। (ইব্ন আবী হাতিম ৩/৯৬৬)

২৫৫। আল্লাহ! তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি স্বাধীন ও নিত্য নতুন ধারক, সব কিছুর ধারক। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করেনা। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? সম্মুখের অথবা পশ্চাতের সবই তিনি অবগত আছেন। একমাত্র তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত, তাঁর অনন্ত	٢٥٥. ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُۚ لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيۡءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِۦٓ إِلَّا

জ্ঞানের কোন বিষয়েই কেহ ধারণা করতে পারেনা। তাঁর আসন আসমান ও যমীন ব্যাপী এবং এতদুভয়ের সংরক্ষণে তাঁকে বিব্রত হতে হয়না। তিনিই সর্বোচ্চ, মহীয়ান। (আয়াতুল কুরসী)	بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْعَظِيمُ

আয়াতুল কুরসীর মর্যাদা

এই আয়াতটি আয়াতুল কুরসী। এটি অত্যন্ত মর্যাদা বিশিষ্ট আয়াত। উবাই ইব্ন কা'বকে (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলার কিতাবে সর্বাপেক্ষা মর্যাদা বিশিষ্ট আয়াত কোন্টি? তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই সবচেয়ে ভাল জানেন।' তিনি পুনরায় এটাই জিজ্ঞেস করেন। বারবার প্রশ্ন করায় তিনি বলেন ঃ 'আয়াতুল কুরসী।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাঁকে বলেন ঃ

'হে আবুল মুনযির! আল্লাহ তোমার জ্ঞানে বারাকাত দান করুন! যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ করে আমি বলছি যে, এর জিহ্বা হবে, ওষ্ঠ হবে এবং এটি প্রকৃত বাদশাহর পবিত্রতা বর্ণনা করবে ও আরশের পায়ায় লেগে থাকবে। (আহমাদ ৫/১৪) ইমাম মুসলিমও (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি 'যার হাতে আমার প্রাণ' এ কথাটুকু উল্লেখ করেননি। (হাদীস নং ১/৫৫৬)

আবূ আইউব আনসারী (রাঃ) বলেন ঃ 'আমার ধনাগার হতে জিনেরা খেজুর চুরি করে নিয়ে যেত। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এজন্য অভিযোগ পেশ করি। তিনি বলেন, যখন তুমি তাকে দেখবে তখন بِسْمِ اللَّهِ اَجِيْــبِىْ رَسُوْلَ اللَّهِ পাঠ করবে। যখন সে এলো তখন আমি এটি পাঠ করে তাকে ধরে ফেললাম। সে বলল ঃ আমি আর আসবনা। সুতরাং আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হলে তিনি আমাকে বললেন ঃ 'তোমার বন্দী কি করেছিল? আমি বললাম ঃ তাকে আমি ধরে ফেলেছিলাম, কিন্তু সে আর না আসার অঙ্গীকার করায় তাকে ছেড়ে দিয়েছি।

তিনি বললেন ঃ সে আবার আসবে। আমি তাকে এভাবে দু'তিন বার ধরে ফেলে অঙ্গীকার নিয়ে নিয়ে ছেড়ে দেই। আমি তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বর্ণনা করি। তিনি বারবারই বলেন, সে আবার আসবে। শেষবার আমি তাকে বলি ঃ এবার আমি তোমাকে ছাড়বনা। সে বলল ঃ 'আমাকে ছেড়ে দিন, আমি আপনাকে এমন একটি জিনিস শিখিয়ে দিচ্ছি যে, কোন জিন ও শাইতান আপনার কাছে আসতেই পারবেনা। আমি বললাম ঃ আচ্ছা, বলে দাও। সে বলল, ওটা 'আয়াতুল কুরসী।' আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এটা বর্ণনা করি। তিনি বললেন, সে মিথ্যাবাদী হলেও এটা সে সত্যই বলেছে।' (আহমাদ ৫/৪২২) ইমাম তিরমিযীও (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং একে হাসান গারীব বলেছেন। (হাদীস নং ৮/১৮৩)

সহীহ বুখারীতে كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ 'كِتَابُ الْوَكَالَةِ এবং صِفَةُ اِبْلِيْس এর বর্ণনায়ও এই হাদীসটি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। তাতে রয়েছে যে, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে রামাযানের যাকাতের উপর প্রহরী নিযুক্ত করেন। আমার নিকট একজন আগমনকারী আসে এবং ঐ মাল হতে কিছু কিছু উঠিয়ে নিয়ে সে তার চাদরে জমা করতে থাকে। আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম ঃ 'তোমাকে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নিয়ে যাব। সে বলে ঃ আমাকে ছেড়ে দিন। আমি অত্যন্ত অভাবী, আমার অনেক পোষ্য রয়েছে। আমি তখন তাকে ছেড়ে দেই। সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার রাতের বন্দী কি করেছিল? আমি বললাম ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সে তার ভীষণ অভাবের অভিযোগ করে এবং বলে তার অনেক পোষ্য রয়েছে। তার প্রতি আমার করুণার উদ্রেক হয়। কাজেই আমি তাকে ছেড়ে দেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'সে তোমাকে মিথ্যা কথা বলেছে। সে আবার আসবে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথায় বুঝলাম যে, সে সত্যিই আবার আসবে। আমি পাহারা দিতে থাকলাম। সে এলো এবং খাদ্য উঠাতে লাগল। আবার আমি তাকে ধরে ফেলে বললাম ঃ 'তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে যাব। সে আবার ঐ কথাই বলল, 'আমাকে ছেড়ে দিন। কেননা আমি অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি, আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমি আর চুরি করতে আসবনা।' তার প্রতি আমার দয়া হল। সুতরাং তাকে ছেড়ে দিলাম। সকালে আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

হে আবূ হুরাইরাহ! তোমার রাতের বন্দীটি কি করেছে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সে অভাবের অভিযোগ করায় আমি তাকে দয়া করে ছেড়ে দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'সে তোমাকে মিথ্যা কথা বলেছে। সে আবার আসবে।' আবার আমি তৃতীয় রাতে পাহারা দেই। অতঃপর সে এসে খাদ্য উঠাতে থাকল। আমি তাকে বললাম ঃ 'এটাই তৃতীয় বার এবং এবারই শেষ। তুমি বার বার বলছ যে, আর আসবেনা, অথচ আবার এসেছ। সুতরাং আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে যাবই।' তখন সে বলল ঃ 'আমাকে ছেড়ে দিন, আমি আপনাকে এমন কতকগুলি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি যার মাধ্যমে আল্লাহ আপনার উপকার সাধন করবেন।' আমি বললাম ঃ ঐগুলি কি? সে বলল ঃ 'যখন আপনি বিছানায় শয়ন করবেন তখন আয়াতুল কুরসী পড়ে নিবেন। তাহলে আল্লাহ আপনার জন্য একজন প্রহরী নিযুক্ত করবেন এবং সকাল পর্যন্ত কোন শাইতান আপনার নিকটবর্তী হতে পারবেনা। সুতরাং তাকে আমি ছেড়ে দিলাম। পরদিন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ গত রাতে তোমার বন্দী কি করেছে? আমি উত্তরে বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল! সে আমাকে কিছু কথা বলেছে যা করলে আল্লাহর তরফ থেকে আমি সাহায্য প্রাপ্ত হব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ তা কী? আমি বললাম ঃ সে আমাকে বলেছে যে, যখন তুমি ঘুমাতে বিছনায় যাবে তখন আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে। তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য একজন প্রহরী নিযুক্ত করবেন যে তোমার কাছে অবস্থান করবে, ফলে ভোর পর্যন্ত শাইতান তোমার কাছে আসতে পারবেনা। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ সে চরম মিথ্যাবাদী হলেও এ ব্যাপারে সে সত্য কথাই বলেছে। হে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ)! তিন রাত তুমি কার সঙ্গে কথা বলেছ তা জান কি? আমি বললাম ঃ না। তিনি বললেন ঃ সে শাইতান। (ফাতহুল বারী ৮/৬৭২, ৪/৫৬৮, ৬/৩৮৬) ইমাম নাসাঈ (রহঃ) তার 'আল ইয়াওম ওয়াল লাইলাহ' গ্রন্থে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (দারিমী ৫৩২)

আয়াতুল কুরসীতে রয়েছে আল্লাহর ইস্‌মে আযম

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তিনটি আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার ইসমে আযম রয়েছে। একটিতো হচ্ছে আয়াতুল কুরসী ঃ

ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَىُّ ٱلۡقَيُّومُ

আল্লাহ! তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি স্বাধীন ও নিত্য নতুন ধারক, সব কিছুর ধারক। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৫৫) দ্বিতীয়টি হচ্ছে ঃ

الٓمٓ. ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُ

আলিফ, লাম, মীম। আল্লাহ ছাড়া কোনই ইলাহ (উপাস্য) নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও নিত্য বিরাজমান। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১-২) এবং তৃতীয়টি হচ্ছে ঃ

وَعَنَتِ ٱلۡوُجُوهُ لِلۡحَيِّ ٱلۡقَيُّومِ ۖ وَقَدۡ خَابَ مَنۡ حَمَلَ ظُلۡمًا

স্বাধীন, স্বধিষ্ঠ পালনকর্তার নিকট সকলেই হবে অধোবদন এবং সে'ই ব্যর্থ হবে যে যুল্মের ভার বহন করবে। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১১১) (আহমাদ ৬/৪৬১) ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ), তিরমিযী (রহঃ) এবং ইব্ন মাজাহও (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (হাদীস নং ২/১৬৮, ৯/৪৪৭, ২/১২৬৭) তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

এ ছাড়া ইব্ন মারওদুয়াই (রহঃ) আবূ উমামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যদি কেহ আল্লাহর ইসমে আযমসহ তাঁর কাছে প্রার্থনা করে তাহলে তিনি সেই প্রার্থনা কবূল করেন। তা রয়েছে এই তিনটি সূরায়। সূরা বাকারাহ, সূরা আলে ইমরান এবং সূরা তাহা। (তাবারানী ৮/২৮২)

অন্য হাদীসে রয়েছে যে, ইসমে আযম তিনটি সূরায় রয়েছে। এই নামের বারাকাতে যে প্রার্থনাই আল্লাহ তা'আলার নিকট করা হয় তা গৃহীত হয়ে থাকে। ঐ সূরা তিনটি হচ্ছে সূরা বাকারাহ, সূরা আলে ইমরান এবং সূরা তা-হা। (তাফসীর ইব্ন মিরদুওয়াই)

দামেস্কের খাতিব হিশাম ইব্ন আম্মার (রহঃ) বলেন যে, সূরা বাকারাহর ইসমে আযমের আয়াত হচ্ছে আয়াতুল কুরসী, সূরা আলে ইমরানের প্রথম আয়াত ৩টি এবং সূরা তা-হার وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ এই আয়াতটি।

আয়াতুল কুরসীতে রয়েছে ১০টি পূর্ণাঙ্গ বাক্য

এই আয়াতে পৃথক পৃথক অর্থ সম্বলিত দশটি বাক্য রয়েছে।

১। প্রথম বাক্যে আল্লাহ তা'আলার একাত্মবাদের বর্ণনা রয়েছে যে, اللّٰهُ لاَ إِلَـــهَ إِلاَّ هُوَ সৃষ্টজীবের তিনিই একমাত্র আল্লাহ।

২। দ্বিতীয় বাক্যে রয়েছে যে, الْحَيُّ الْقَيُّومُ তিনি চির জীবন্ত, তাঁর উপর কখনও মৃত্যু আসবেনা। তিনি চির বিরাজমান। কাইউমুন শব্দটির দ্বিতীয় পঠন কাইয়্যামুনও রয়েছে। সুতরাং সমস্ত সৃষ্টজীব তাঁর মুখাপেক্ষী এবং তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। তাঁর অনুমতি ব্যতীত কোন লোকই কোন জিনিস প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারেনা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِۦ

তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তাঁরই আদেশে আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতি। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২৫)

৩। তৃতীয় বাক্যটিতে বলা হচ্ছে ঃ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ

‘না কোন ক্ষয়-ক্ষতি তাঁকে স্পর্শ করে, না কোনও সময় তিনি স্বীয় জীব হতে উদাসীন থাকেন। বরং প্রত্যেকের কাজের উপর তাঁর সজাগ দৃষ্টি রয়েছে। প্রত্যেকের অবস্থা তিনি দেখছেন। সৃষ্টজীবের কোন অণু-পরমাণুও তাঁর হিফাযাত ও জ্ঞানের বাইরে নেই। তন্দ্রা ও নিদ্রা কখনও তাঁকে স্পর্শ করেনা।’ সুতরাং তিনি ক্ষণিকের জন্যও সৃষ্টজীব হতে উদাসীন থাকেননা।

বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে সাহাবীগণকে (রাঃ) চারটি কথার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন ঃ

আল্লাহ তা‘আলা (১) কখনও ঘুমাননা আর পবিত্র সত্ত্বার জন্য নিদ্রা আদৌ শোভনীয় নয়। (২) তিনি দাঁড়ি-পাল্লার রক্ষক। যার জন্য চান ঝুঁকিয়ে দেন এবং যার জন্য চান উঁচু করে দেন। (৩) সমস্ত দিনের কার্যাবলী রাতের পূর্বে এবং রাতের আমল দিনের পূর্বে তাঁর নিকট উঠিয়ে নেয়া হয়। (৪) তাঁর সামনে রয়েছে আলো বা আগুনের পর্দা। সেই পর্দা সরে গেলে যতদূর পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টি পৌঁছে ততদূর পর্যন্ত সমস্ত জিনিস তাঁর চেহারার ঔজ্জ্বল্যে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। (মুসলিম ১/১৬১)

৪। চতুর্থ বাক্যটিতে আল্লাহ বলেন ঃ

لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ

নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অন্যত্র বলেন ঃ

إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّآ ءَاتِي ٱلرَّحْمَٰنِ عَبْدًا. لَّقَدْ أَحْصَىٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا. وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فَرْدًا

আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে এমন কেহ নেই যে দয়াময়ের নিকট উপস্থিত হবেনা বান্দা রূপে। তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করছেন। এবং কিয়ামাত দিবসে তাদের সকলেই তাঁর নিকট আসবে একাকী অবস্থায়। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৯৩-৯৫)

৫। পঞ্চম বাক্যে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ

কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? এ ধরনের অন্য একটি আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ لَا تُغْنِي شَفَٰعَتُهُمْ شَيْـًٔا إِلَّا مِنۢ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَىٰٓ

আকাশে কত মালাইকা/ফেরেশতা রয়েছে, তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসু হবেনা যতক্ষণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তষ্ট তাকে অনুমতি না দেন। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ২৬) এবং

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ

তারা সুপারিশ করে শুধু তাদের জন্য যাদের প্রতি তিনি সন্তষ্ট। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২৮)

কিন্তু তাদের সুপারিশও কোন কাজে আসবেনা। তবে আল্লাহর ইচ্ছা ও সন্তুষ্টি হিসাবে যদি কারও জন্য অনুমতি দেয়া হয় সেটা অন্য কথা। এখানেও আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহা-মর্যাদার কথা বর্ণিত হচ্ছে। তাঁর অনুমতি ও সম্মতি ছাড়া কারও সাহস নেই যে, সে কারও সুপারিশের জন্য মুখ খোলে। হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'আমি আল্লাহ তা'আলার আরশের নীচে গিয়ে সাজদায় পড়ে যাব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যতক্ষণ চাবেন আমাকে এই অবস্থায় রাখবেন। অতঃপর বলবেন ঃ 'মাথা উত্তোলন কর। তুমি বল, তোমার কথা শোনা হবে, সুপারিশ

কর, তা গৃহীত হবে।' তিনি বলেন ঃ 'আমাকে সংখ্যা নির্ধারণ করে দেয়া হবে এবং তাদেরকে আমি জান্নাতে নিয়ে যাব। (মুসলিম ১/১৮০)

৬। ষষ্ঠ বাক্যে বলা হয়েছে ঃ

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

সম্মুখের অথবা পশ্চাতের সবই তিনি অবগত আছেন। অর্থাৎ আল্লাহ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্বন্ধে জ্ঞাত। তাঁর জ্ঞান সমস্ত সৃষ্টজীবকে ঘিরে।' যেমন অন্য জায়গায় মালাইকার উক্তি নকল করা হয়েছে ঃ

وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ۖ لَهُۥ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

আমরা আপনার রবের আদেশ ব্যতীত অবতরণ করিনা; যা আমাদের অগ্রে ও পশ্চাতে আছে এবং যা এই দু'এর অর্ন্তবর্তী তা তাঁরই এবং আপনার রাব্ব কোনো কিছু ভুলেননা। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৬৪)

৭। সপ্তম বাক্যে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ

একমাত্র তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত, তাঁর অনন্ত জ্ঞানের কোন বিষয়েই কেহ ধারণা করতে পারেনা। আল্লাহ তা'আলা যে অসীম জ্ঞানের মালিক তা থেকে তিনি যদি কেহকে জানানোর ইচ্ছা করেন তাহলে তিনি তাকে তা জানান। আল্লাহ যাকে যে জ্ঞান বা প্রজ্ঞা দান করেন তার অধিক জ্ঞাত হওয়ার ক্ষমতা কারও নেই। উহারণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا يُحِيطُونَ بِهِۦ عِلْمًا

কিন্তু তারা জ্ঞান দ্বারা তাঁকে আয়ত্ত করতে পারেনা। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১১০)

৮। অষ্টম বাক্যে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ

তাঁর আসন আসমান ও যমীনকে পরিব্যাপ্ত। ওয়াকী (রহঃ) তার তাফসীরে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ কুরসী হল আল্লাহর পা রাখার স্থান এবং তাঁর সিংহাসন কি ধরনের তা চিন্তা করাও কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। (তাবারানী ১২/৩৯) ইমাম হাকিম তার মুসতাদরাক গ্রন্থেও ইব্ন আব্বাস (রাঃ)

থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (২/২৮২) ইমাম হাকিম (রহঃ) বলেন যে, এ হাদীসটি সহীহায়িনের শর্তে সঠিক। যাহহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ ‘আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে যদি ছড়িয়ে দেয়া হয় এবং সবাইকে মিলিত করে এক করে দেয়া হয় তাহলে তা কুরসীর তুলনায় ঐরূপ যেরূপ জনশূন্য মরু প্রান্তরে একটি বৃত্ত।’ (ইব্‌ন আবী হাতিম ৩/৯৮১)

৯। নবম বাক্যে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفۡظُهُمَا

এতদুভয়ের সংরক্ষণে তাঁকে বিব্রত হতে হয়না।

বরং এগুলি সংরক্ষণ তাঁর নিকট অতীব সহজ। তিনি সমস্ত সৃষ্টজীবের কার্যাবলী সম্বন্ধে সম্যক অবগত। সবকিছুর উপর তিনি রক্ষকরূপে রয়েছেন। কোন কিছুই তাঁর দৃষ্টির অন্তরালে নেই। সমস্ত সৃষ্টজীব তাঁর সামনে অতি তুচ্ছ। সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী এবং সবাই তাঁর নিকট অতি দরিদ্র। তিনি ঐশ্বর্যশালী এবং অতীব প্রশংসিত। তিনি যা চান তাই করে থাকেন। তাঁকে হুকুম দাতা কেহ নেই এবং তাঁর কাজের হিসাব গ্রহণকারীও কেহ নেই।

১০। দশম বাক্যে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡعَظِيمُ

তিনিই সর্বোচ্চ, মহীয়ান প্রত্যেক জিনিসের উপর তিনি ব্যাপক ক্ষমতাবান। সবকিছুরই মালিকানা তাঁর হাতে রয়েছে। এ জন্যই তিনি বলেন ঃ

ٱلۡكَبِيرُ ٱلۡمُتَعَالِ

তিনি সমুন্নত ও মহীয়ান। (সূরা রা‘দ, ১৩ ঃ ৯) এই আয়াতটিতে এবং এই প্রকারের আরও বহু আয়াতে ও সহীহ হাদীসসমূহে মহান আল্লাহর গুণাবলী সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয়েছে এগুলির অবস্থা জানার চেষ্টা না করে এবং অন্য কিছুর সঙ্গে তুলনা না করে বরং ঐগুলির উপর বিশ্বাস রাখাই আমাদের অবশ্য কর্তব্য। আমাদের পূর্ববর্তী মহা মনীষীগণ এই পন্থাই অবলম্বন করেছিলেন।

২৫৬। দীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি কিংবা বাধ্যবাধকতা নেই। নিশ্চয়ই ভ্রান্তি হতে সুপথ প্রকাশিত	٢٥٦. لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن

হয়েছে। অতএব যে তাগুতকে অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সে দৃঢ়তর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরলো যা কখনও ছিন্ন হবার নয় এবং আল্লাহ শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।	يَكْفُرْ بِٱلطَّـٰغُوتِ وَيُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

ধর্মের ব্যাপারে কোন জোর-যবরদস্তি নেই

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ 'কেহকে জোর করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করনা। ইসলামের সত্যতা প্রকাশিত ও উজ্জ্বল হয়ে পড়েছে এবং ওর দলীল প্রমাণাদি বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং জোর জবরদস্তির কি প্রয়োজন? যাকে আল্লাহ সুপথ প্রদর্শন করবেন, যার বক্ষ খুলে দিবেন, যার অন্তর উজ্জ্বল হবে এবং যার চক্ষু দৃষ্টিমান হবে সে আপনা আপনিই ইসলামের প্রেমে পাগল হয়ে যাবে। কিন্তু যার অন্তর-চক্ষু অন্ধ এবং কর্ণ বধির সে এর থেকে দূরে থাকবে। অতঃপর যদি তাদেরকে জোরপূর্বক ইসলামে দীক্ষিত করা হয়, তাতেই বা লাভ কি? তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'কেহকেও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার ব্যাপারে জোর জবরদস্তি করনা।'

এ আয়াতটির শান-ই নুযুল এই যে, মাদীনার মুশরিকরা মহিলাদের সন্তান না হলে এই বলে 'নযর' মানত ঃ 'যদি আমাদের ছেলে-মেয়ে হয় তাহলে আমরা তাদেরকে ইয়াহুদী করে ইয়াহুদীদের নিকট সমর্পণ করব।' এভাবে তাদের বহু সন্তান ইয়াহুদীদের নিকট ছিল। অতঃপর এই লোকগুলি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয় এবং আল্লাহর দীনের সাহায্যকারী রূপে গণ্য হয়। এদিকে ইয়াহুদীদের সাথে মুসলিমদের যুদ্ধ বাঁধে। অবশেষে তাদের আভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র ও প্রতারণা থেকে মুক্তিলাভের উদ্দেশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে দেশ হতে বহিষ্কার করার নির্দেশ দেন। সেই সময় মাদীনার এই আনসার মুসলিমদের যেসব ছেলে ইয়াহুদীদের নিকট ছিল তাদেরকে নিজেদের তত্ত্বাবধানে এনে মুসলিম করার উদ্দেশে তাঁরা ইয়াহুদীদের কাছ থেকে ফেরত চান। সেই সময় এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং তাদেরকে বলা হয় ঃ

'তোমরা তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে জোর-জবরদস্তি করনা। নিশ্চয়ই বাতিল পথ হতে সৎ পথের পার্থক্য পরিস্কার হয়ে গেছে। (তাবারী ৫/৪০৭)

ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈও (রহঃ) তাদের গ্রন্থে হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। (হাদীস নং ৩/১৩২ ও ৬/৩০৪) ইমাম আহমাদ (রহঃ) তার হাদীসগ্রন্থে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে বললেন ঃ

'মুসলিম হয়ে যাও।' সে বলে ঃ আমার মন চায়না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ মন না চাইলেও মুসলিম হও। (আহমাদ ৩/১৮১) এই হাদীসটি *'সুলাসী'*। অর্থাৎ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত এতে তিনজন বর্ণনাকারী রয়েছেন। কিন্তু এর দ্বারা এটা মনে করা উচিত হবেনা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বাধ্য করেছিলেন। বরং তাঁর এই কথার ভাবার্থ হচ্ছে ঃ তুমি কালেমা পড়ে নাও, একদিন হয়ত এমনও আসবে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমার অন্তর খুলে দিবেন এবং তুমি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যাবে। তুমি হয়ত উত্তম নিয়ম ও খাঁটি আমলের তাওফীক লাভ করবে।

তাওহীদ হল ঈমানের মূল স্তম্ভ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ যে ব্যক্তি প্রতিমা/মূর্তি, বাতিল উপাস্য ও শাইতানী কথা পরিত্যাগ করে আল্লাহর একাত্মবাদে বিশ্বাসী হয় এবং সৎকার্যাবলী সম্পাদন করে সে সঠিক পথের উপর রয়েছে। আবুল কাসিম আল বাগাবী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, উমার (রাঃ) বলেন ঃ যে, جِبْت শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে যাদু এবং طَاغُوْت শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে শাইতান। বীরত্ব ও ভীরুতা এ দু'টি হচ্ছে উটের দু'দিকের দু'টি সমান বোঝা যা মানুষের মধ্যে রয়েছে। একজন বীর পুরুষ এক অপরিচিত লোকের সাহায্যার্থে জীবন দিতেও দ্বিধাবোধ করেনা। পক্ষান্তরে একজন কাপুরুষ আপন মায়ের জন্যও সম্মুখে অগ্রসর হতে সাহসী হয়না। মানুষের প্রকৃত মর্যাদা হচ্ছে তার ধর্ম। মানুষের সত্য বংশ হচ্ছে তার উত্তম চরিত্র, সে যে বংশেরই লোক হোক না কেন। উমারের (রাঃ) طَاغُوْت এর অর্থ 'শাইতান' লওয়া যথার্থই হয়েছে। কেননা সমস্ত মন্দ কাজই এর অন্তর্ভুক্ত যেগুলো অজ্ঞতা যুগের লোকদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। যেমন মূর্তি পূজা, তাদের কাছে অভাব

অভিযোগ পেশ করা এবং বিপদের সময় তাদের নিকট সাহায্য চাওয়া ইত্যাদি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى তারা দৃঢ়তর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরল। অর্থাৎ ধর্মের সুউচ্চ ও শক্ত ভিত্তিকে গ্রহণ করল যা কখনও ছিঁড়ে যাবেনা। সুতরাং এ ব্যক্তি সুদৃঢ় অবস্থানে অবস্থান করবে এবং সরল সঠিক পথে অগ্রসর হবে। عُرْوَة وُثْقَى শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে ঈমান, ইসলাম, আল্লাহর একাত্মবাদ, কুরআন ও আল্লাহর পথের প্রতি ভালবাসা এবং তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য শত্রুতা করা। এই রজ্জু তার জান্নাতে প্রবেশ লাভ পর্যন্ত ছিঁড়ে যাবেনা। অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ

নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেননা যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ১১) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ ধারণ করার জন্য শক্ত হাতল হচ্ছে ঈমান বা বিশ্বাস। (তাবারী ৫/৪২১)

মুসনাদ আহমাদের একটি হাদীসে রয়েছে, কায়েস ইব্ন উবাদাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ 'আমি মাসজিদে নববীতে অবস্থান করছিলাম। এমন সময় সেখানে এক ব্যক্তির আগমন ঘটে। তাঁর মুখমণ্ডলে আল্লাহভীতির লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছিল। তিনি হালকাভাবে দুই রাক'আত সালাত আদায় করেন। জনগণ তাকে দেখে মন্তব্য করেন ঃ এই লোকটি জান্নাতী। তিনি মাসজিদ হতে বের হলে আমিও তার পিছনে গমন করি। তার সাথে আমার কথাবার্তা চলতে থাকে। আমি তার মনোযোগ আকর্ষণ করে বলি ঃ 'আপনার আগমনকালে জনগণ আপনার সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করেছিল। তিনি বলেন ঃ সুবহানাল্লাহ! কারও এইরূপ কথা বলা উচিত নয় যা তার জানা নেই। তবে হ্যাঁ, এইরূপ কথা তো অবশ্যই রয়েছে যে, আমি একবার স্বপ্নে দেখি, আমি যেন একটি সবুজ শ্যামল ফুল বাগানে রয়েছি। ঐ বাগানের মধ্যস্থলে একটি লোহার স্তম্ভ রয়েছে যা ভূমি হতে আকাশ পর্যন্ত উঠে গেছে। ওর চুড়ায় একটি আংটা রয়েছে। আমাকে ওর উপরে যেতে বলা হল। আমি বলি যে, আমি তো উঠতে পারবনা। অতঃপর এক ব্যক্তি আমাকে ধরে থাকে এবং আমি অতি সহজেই উঠে যাই। তারপর আমি আংটাটিকে ধরে থাকি। লোকটি আমাকে বলে ঃ খুব শক্ত করে ধরে থাক। আংটাটি আমি ধরে রয়েছি এই অবস্থায়ই আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আমি আমার এই স্বপ্নের কথা বর্ণনা করলে তিনি বলেন ঃ

'ফুলের বাগানটি হচ্ছে ইসলাম, স্তম্ভটি ধর্মের স্তম্ভ এবং আংটাটি হচ্ছে عُرْوَة وُثْقَى তুমি মৃত্যু পর্যন্ত ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

এই লোকটি হচ্ছেন আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রাঃ)। (আহমাদ ৫/৪৫২) এই হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৭/১৬১, ২/৪১৮; ৪/১৯৩০)

২৫৭। আল্লাহই হচ্ছেন মু'মিনদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে নিয়ে যান; আর যারা অবিশ্বাস করেছে তাগুত তাদের পৃষ্ঠপোষক, সে তাদেরকে আলো হতে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী - ওখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।	٢٥٧. ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَوْلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّٰغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَٰتِ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ

আল্লাহ তা'আলা এখানে সংবাদ দিচ্ছেন যে, যারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে তাদেরকে তিনি শান্তির পথ প্রদর্শন করবেন এবং সন্দেহ, কুফর ও শির্কের অন্ধকার হতে বের করে সত্যের আলোর দিকে নিয়ে আসবেন। শাইতানরা কাফিরদের অভিভাবক। তারা তাদেরকে অজ্ঞতা, ভ্রষ্টতা, কুফর ও শির্ককে সুন্দর ও সজ্জিত আকারে প্রদর্শন করে ঈমান ও তাওহীদ হতে সরিয়ে রাখে এবং সত্যের আলো হতে সরিয়ে অসত্যের অন্ধকারে নিক্ষেপ করে। এরাই কাফির এবং এরাই জাহান্নামে চিরকাল অবস্থান করবে। نُوْرٌ শব্দটিকে এক বচন এবং ظُلُمَاتٌ শব্দটিকে বহু বচন আনার কারণ এই যে, হক, ঈমান ও সত্যের পথ একটিই। কিন্তু কুফর কয়েক প্রকারের হয়ে থাকে। কুফরের অনেক শাখা রয়েছে ঐগুলো সবই বাতিল ও অসত্য। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِي مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

আর নিশ্চয়ই এই পথই আমার সরল পথ; এই পথই তোমরা অনুসরণ করে চলবে, এই পথ ছাড়া অন্য কোন পথের অনুসরণ করবেনা, তাহলে তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে সরিয়ে নিবে। আল্লাহ তোমাদেরকে এই নির্দেশ দিচ্ছেন, যেন তোমরা সতর্ক হও। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১৫৩)

وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰتِ وَٱلنُّورَ

এবং সৃষ্টি করেছেন আলো ও অন্ধকার। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১) এবং

عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآئِلِ

যার ছায়া ডানে ও বামে ঢলে পড়ে। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৪৮)

অন্যত্র রয়েছে ঃ وَجَعَلَ الظُّلُمَات وَالنُّوْرَ এবং তিনি অন্ধকার ও আলো সৃষ্টি করেছেন। এই প্রকারের আরও বহু আয়াত রয়েছে যেগুলি দ্বারা সাব্যস্ত হচ্ছে যে, সত্যের একটিই পথ এবং বাতিলের রয়েছে বিভিন্ন পথ।

২৫৮। তুমি কি তার প্রতি লক্ষ্য করনি যে, ইবরাহীমের সাথে তার রাব্ব সম্বন্ধে বিতর্ক করেছিল, যেহেতু আল্লাহ তাকে রাজত্ব প্রদান করেছিলেন। ইবরাহীম বলেছিল ঃ আমার রাব্ব তিনিই যিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু দান করেন; সে বলেছিল ঃ আমিই জীবন ও মৃত্যু দান করি; ইবরাহীম বলেছিল ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক হতে আনয়ন করেন, কিন্তু তুমি ওকে পশ্চিম	٢٥٨. أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجَّ إِبْرَٰهِـۧمَ فِى رَبِّهِۦٓ أَنْ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ رَبِّىَ ٱلَّذِى يُحْىِۦ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا۠ أُحْىِۦ وَأُمِيتُ ۖ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِى بِٱلشَّمْسِ مِنَ

ٱلۡمَشۡرِقِ فَأۡتِ بِهَا مِنَ ٱلۡمَغۡرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِى ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ	দিক হতে আনয়ন কর; এতে সেই অবিশ্বাসকারী হতবুদ্ধি হয়েছিল; এবং আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেননা।

ইবরাহীম (আঃ) ও নামরূদ বাদশাহর সাথে তর্ক-বিতর্ক

মুজাহিদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, ঐ বাদশাহর নাম ছিল নামরূদ ইব্‌ন কিনআন ইব্‌ন কাউস ইব্‌ন সাম ইব্‌ন নূহ। তার রাজধানী ছিল বাবেল। তার বংশক্রমের মধ্যে কিছু মতভেদও রয়েছে। এও বর্ণিত হয়েছে যে, সে হল নামরূদ ইব্‌ন ফালিখ ইব্‌ন আবীর ইব্‌ন শালিখ ইব্‌ন আরফাখশান্দ ইব্‌ন শাম ইব্‌ন নূহ। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, দুনিয়ার পূর্ব-পশ্চিম সাম্রাজ্যের অধিপতি চারজন। তন্মধ্যে দু'জন মুসলিম ও দু'জন কাফির। মুসলিম দু'জন হচ্ছেন সুলাইমান ইব্‌ন দাঊদ (আঃ) ও যুলকারনাইন এবং কাফির দু'জন হচ্ছে নামরূদ ও বখতে নাসর। (তাবারী ৫/৪৩৩) ঘোষণা হচ্ছে ঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَآجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رِبِّه হে নাবী! তুমি স্বচক্ষে ঐ ব্যক্তিকে দেখনি, যে ইবরাহীমের সঙ্গে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল? এই লোকটি নিজেকে আল্লাহ বলে দাবী করেছিল। যেমন তারপরে ফির'আউনও তার নিজস্ব লোকদের মধ্যে এই দাবী করেছিল ঃ 'আমি ছাড়া তোমাদের যে অন্য কোন আল্লাহ আছে তা আমার জানা নেই' তার রাজত্ব দীর্ঘ দিন ধরে চলে আসছিল বলে তার মস্তিস্কে ঔদ্ধত্য ও আত্মম্ভরিতা প্রবেশ করেছিল এবং তার স্বভাবের মধ্যে অবাধ্যতা, অহংকার এবং আত্মগরিমা ঢুকে পড়েছিল। কারও কারও মতে সে সুদীর্ঘ চারশ' বছর ধরে শাসন কাজ চালিয়ে আসছিল। সে ইবরাহীমকে (আঃ) আল্লাহর অস্তিত্বের উপর প্রমাণ উপস্থিত করতে বললে তিনি অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বে আনয়ন এবং অস্তিত্ব হতে অস্তিত্বহীনতায় পরিণতকরণ এই দলীল পেশ করেন। এটা সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল দলীল ছিল। প্রাণীসমূহের পূর্বে কিছুই না থাকা এবং পুনরায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া; এই প্রাণীসমূহের সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের স্পষ্ট দলীল এবং তিনিই আল্লাহ। নামরূদ উত্তরে বলে ঃ এটাতো আমিও করতে পারি। এই কথা বলে সে দু'জন লোককে

ডেকে পাঠায় যাদের উপর মৃত্যু দন্ডাদেশ জারী করা হয়েছিল। অতঃপর সে একজনকে হত্যা করে এবং অপরজনকে ছেড়ে দেয়। (তাবারী ৫/৪৩৩, ৪৩৬, ৪৩৭) এই উত্তর ও দাবী যে কত অবাস্তব ও বাজে ছিল তা বলাই বাহুল্য। ইবরাহীমতো (আঃ) আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর মধ্যে একটি গুণ এই বর্ণনা করেন যে, তিনি সৃষ্টি করেন অতঃপর ধ্বংস করেন। আর নামরূদ তো ঐ লোক দু'টিকে সৃষ্টি করেনি এবং তাদের অথবা তার নিজের জীবন ও মৃত্যুর উপর তার কোন ক্ষমতাই নেই। কিন্তু শুধু অজ্ঞদেরকে প্ররোচিত করার জন্য এবং বাজিমাত করার উদ্দেশে সে যে ভুল করছে ও তর্কের মূলনীতির উল্টো কাজ করছে এটা জানা সত্ত্বেও একটা কথা বানিয়ে নেয়। অতঃপর বাদশাহ নামরূদ ইবরাহীমের (আঃ) অনুবর্তীত হয়ে ঘোষণা করল ঃ

مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِى

আমি ছাড়া তোমাদের অন্য উপাস্য আছে বলে আমি জানিনা। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৩৮)

ইবরাহীমও (আঃ) তাকে বুঝে নেন এবং সেই নির্বোধের সামনে এমন প্রমাণ পেশ করেন যে, বাহ্যতঃ যেন সে ওর সাদৃশ্যমূলক কাজে অকৃতকার্য হয়। তাই তাকে বলেন ঃ فَإِنَّ اللّٰهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ তুমি যখন সৃষ্টি করা ও মৃত্যু দান করার ক্ষমতা রাখার দাবী করছ তখন সৃষ্ট বস্তুর উপরেও তোমার আধিপত্য থাকা উচিত। আমার প্রভু তো এই ক্ষমতা রাখেন যে, সূর্যকে তিনি পূর্ব গগনে উদিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং সে আমার প্রভুর আদেশ পালন করে পূর্ব দিকে উদিত হচ্ছে। এখন তুমি তাকে নির্দেশ দাও, সে যেন পশ্চিম গগনে উদিত হয়। এবার সে বাহ্যতঃ কোন জোড়াতালি দেয়া উত্তরও দিতে পারলনা। বরং সে হতভম্ব হয়ে নিজের অপারগতা স্বীকার করতে বাধ্য হল এবং আল্লাহ তা'আলার প্রমাণ তার উপর পূর্ণরূপে জয়যুক্ত হল। কিন্তু সুপথ প্রাপ্তি তার ভাগ্যে ছিলনা বলে সে সুপথে আসতে পারলনা। এইরূপ বদ-স্বভাবের লোককে আল্লাহ তা'আলা কোন প্রমাণ বুঝার তাওফীক দেননা। ফলে তারা সত্যকে কখনও আলিঙ্গন করেনা। তাদের উপর আল্লাহ তা'আলা ক্রোধান্বিত ও অসন্তুষ্ট হয়ে থাকেন। এই জগতেও তাদের কঠিন শাস্তি হয়ে থাকে।

কোন কোন তর্কশাস্ত্রবিদ বলেন যে, ইবরাহীম (আঃ) এখানে একটি স্পষ্ট ও জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ উপস্থিত করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। বরং প্রথম দলীলটি ছিল দ্বিতীয় দলীলের ভূমিকা স্বরূপ। এ দু'টো দ্বারাই নামরূদের দাবীর

অসারতা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে। জন্ম ও মৃত্যুদানই হচ্ছে প্রকৃত দলীল। ঐ অজ্ঞান ও নির্বোধ এই দাবী করেছিল বলেই এ প্রমাণ পেশ করাও অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল যে, আল্লাহ তা'আলা শুধুমাত্র জন্ম ও মৃত্যুদানের উপরই সক্ষম নন, বরং দুনিয়ার বুকে যতগুলি সৃষ্ট বস্তু রয়েছে সবই তাঁর আজ্ঞাধীন। কাজেই নামরূদকেও বলা হচ্ছে যে, সেও যখন জন্ম ও মৃত্যু দানের দাবী করছে তখন সূর্যও তো একটি সৃষ্ট বস্তু, কাজেই সে তার নির্দেশমত কেন পূর্ব দিকের পরিবর্তে পশ্চিম দিকে উদিত হবেনা? এই যুক্তির ফলে ইবরাহীম (আঃ) খোলাখুলিভাবে নামরূদকে পরাস্ত করেন এবং তাকে সম্পূর্ণরূপে নিরুত্তর করে দেন।

সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, ইবরাহীম (আঃ) আগুন হতে বের হয়ে আসার পর নামরূদের সাথে তাঁর এই তর্ক হয়েছিল। এর পূর্বে ঐ অত্যাচারী রাজার সাথে ইবরাহীমের (আঃ) কোন সাক্ষাৎ হয়নি।

২৫৯। অথবা ঐ ব্যক্তির অনুরূপ যে কোন এক জনপদ অতিক্রম করছিল এবং তা ছিল শূণ্য - নিজ ভিত্তির উপর পতিত। সে বলল ঃ এই নগরের মৃত্যুর পর আল্লাহ আবার তাকে জীবন দান করবেন কিরূপে? অনন্তর আল্লাহ তাকে একশ বছরের জন্য মৃত্যু দান করলেন, অতঃপর তাকে পুনর্জীবিত করলেন এবং বললেন ঃ এ অবস্থায় তুমি কতক্ষণ অতিবাহিত করেছ? সে বলল ঃ একদিন অথবা একদিনের কিয়দংশ। তিনি বললেন ঃ তা নয়, বরং তুমিতো এভাবে একশ বছর ছিলে। তোমার খাদ্য ও পানীয়ের প্রতি লক্ষ্য কর - ওটা	٢٥٩. أَوْ كَٱلَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِۦ هَـٰذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِاْئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُۥ ۖ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۖ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِاْئَةَ عَامٍ فَٱنظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ

يَتَسَنَّهْ ۖ وَٱنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِّلنَّاسِ ۖ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ	বিকৃত হয়নি এবং তোমার গর্দভের প্রতি দৃষ্টিপাত কর; এবং যেহেতু আমি তোমাকে মানবের জন্য নিদর্শন বানাতে চাই; আরও দর্শন কর অস্থিপুঞ্জের দিকে, ওকে কিরূপে আমি সংযুক্ত করি; তৎপর ওকে মাংসাবৃত করি। অনন্তর যখন ওটা তার নিকট স্পষ্ট হয়ে গেল তখন সে বলল ঃ আমি জানি, আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

উযায়েরের (আঃ) ঘটনা

উপরে ইবরাহীমের (আঃ) তর্কের যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে ওটার সাথে এর সংযোগ রয়েছে। ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বলেন, আলী ইব্ন আবূ তালিব (রাঃ) বলেন যে, আয়াতে (২ ঃ ২৫৯) বর্ণিত ব্যক্তি হলেন উযায়ের (আঃ)। ইব্ন জারীরও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইব্ন জারীর (রহঃ) এবং ইব্ন হাতিম (রহঃ) এ বিষয়ে ইব্ন আব্বাস (রাঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং সুলাইমান ইব্ন বুরাইদাহর (রহঃ) বরাতে তাফসীর করেছেন। (তাবারী ৫/৪৩৯, ইব্ন আবী হাতিম ৩/১০০৯) মুজাহিদ ইব্ন যাবর (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াত হল রাজা বাখতে নাসর কর্তৃক যেরুজালেমের একটি গ্রাম সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস এবং জনগণকে হত্যার করার পর ওখানকার বানী ইসরাঈলের এক মহান লোক সম্পর্কিত।

রাজা বখতে নাসর যখন ঐ জনবসতি ধ্বংস করে এবং জনগণকে তরবারির নীচে নিক্ষেপ করে তখন ঐ জনবসতি একেবারে শশ্মানে পরিণত হয়। এরপর ঐ মহান ব্যক্তি সেখান দিয়ে গমন করেন। যখন তিনি দেখেন যে, জনপদটি একেবারে শশ্মান হয়ে গেছে, সেখানে না আছে কোন বাড়ীঘর, আর না আছে কোন মানুষ! সেখানে অবস্থানরত অবস্থায় তিনি চিন্তা করেন যে, এমন জাঁকজমকপূর্ণ শহর যেভাবে ধ্বংস হয়েছে এটা কি আর কোন দিন জনবসতিপূর্ণ হতে পারে! অতঃপর

আল্লাহ তা‘আলা স্বয়ং তাকেই মৃত্যু দান করেন। ইনি তো ঐ অবস্থায়ই থাকেন। আর এদিকে সত্তর বছর পর বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরায় জনবসতিপূর্ণ হয়। পলাতক বানী ইসরাঈল আবার ফিরে আসে এবং নিমেষের মধ্যে শহর ভরপুর হয়ে যায়। পূর্বের সেই শোভা ও জাঁকজমক পুনরায় পরিলক্ষিত হয়। এবারে একশ’ বছর পূর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ তাকে পুনর্জীবিত করেন এবং সর্বপ্রথম চক্ষুর মধ্যে আত্মা প্রবেশ করান যেন তিনি নিজের পুনর্জীবন স্বচক্ষে দর্শন করতে পারেন। অতঃপর যখন ফুঁ দিয়ে সারা দেহে আত্মা প্রবেশ করানো হয় তখন আল্লাহ তা‘আলা মালাক/ফেরেশতার মাধ্যমে তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ

كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ‘তুমি কত দিন ধরে মরেছিলে?’ উত্তরে তিনি বলেন ঃ ‘এখনও তো একদিন পূরাই হয়নি।’ এটা বলার কারণ ছিল এই যে, সকাল বেলা তার আত্মা বের হয়েছিল এবং একশ’ বছর পর যখন তিনি জীবিত হন তখন ছিল সন্ধ্যা। সুতরাং তিনি মনে করেন যে, ঐ দিনই রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে বলেন ঃ

بَل لَّبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ তুমি পূর্ণ একশ’ বছর মৃত অবস্থায় ছিলে। এখন আমার ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য কর যে, পাথেয় হিসাবে যে খাদ্য তোমার নিকট ছিল তা একশ’ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরেও ঐরূপই রয়েছে, পচেওনি এবং সামান্য বিকৃতও হয়নি। ঐ খাদ্য ছিল আঙ্গুর, ডুমুর এবং ফলের নির্যাস। ঐ নির্যাস নষ্ট হয়নি, ডুমুর টক হয়নি এবং আঙ্গুরও খারাপ হয়নি। বরং প্রত্যেক জিনিসই স্বীয় আসল অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। অতঃপর আল্লাহ তাকে বলেন ঃ

وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى العِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا তোমার গাধার যে গলিত অস্থি তোমার সামনে রয়েছে ওদিকে দৃষ্টিপাত কর। তোমার চোখের সামনেই আমি তোমার গাধাকে জীবিত করছি। আমি তোমাকে মানব জাতির জন্য নিদর্শন করতে চাই, যেন কিয়ামাতের দিন পুনরুত্থানের প্রতি তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। অতঃপর তিনি দেখতে দেখতেই অস্থিগুলো স্ব-স্ব জায়গায় সংযুক্ত হয়ে যায়। মুসতাদরাক হাকিমে রয়েছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পঠন نُنْشِزُهَا এর সঙ্গেই রয়েছে এবং ওটাকে نُنْشِرُهَا এর সঙ্গেও পড়া হয়েছে। অর্থাৎ ‘আমি জীবিত করব।’ মুজাহিদের

(রহঃ) পঠনও এটাই। সুদ্দী (রহঃ) প্রমুখ বলেন যে, অস্থিগুলি ডানে-বামে ছড়িয়ে ছিল এবং পচে যাওয়ার ফলে ওগুলির শুভ্রতা চক্‌চক্‌ করছিল। বাতাসে ঐগুলি একত্রিত হয়ে যায়। পরে ওগুলি নিজ নিজ জায়গায় যুক্ত হয়ে যায় এবং পূর্ণ কাঠামো রূপে দাঁড়িয়ে যায়। ওগুলিতে মোটেই গোশ্‌ত ছিলনা। আল্লাহ তা'আলা ওগুলির উপর গোশ্‌ত, শিরা ইত্যাদি পরিয়ে দেন। অতঃপর মালাক/ফেরেশতা পাঠিয়ে দেন। তিনি তার নাসারন্ধ্রে ফুঁক দেন। আল্লাহ তা'আলার হুকুমে তৎক্ষণাৎ গাধাটি জীবিত হয়ে উঠে এবং শব্দ করতে থাকে। (তাবারী ৫/৪৬৮) উযায়ের (আঃ) দর্শন করতে থাকেন এবং মহান আল্লাহর এই সব কারিগরী তাঁর চোখের সামনেই সংঘটিত হয়। এ সব কিছু দেখার পর তিনি বলেন ঃ 'আমার তো এটা বিশ্বাস ছিলই যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সব কিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। কিন্তু আজ আমি তা স্বচক্ষে দর্শন করলাম। সুতরাং আমি আমার যুগের সমস্ত লোক অপেক্ষা বেশি জ্ঞান ও বিশ্বাসের অধিকারী।

২৬০। এবং যখন ইবরাহীম বলেছিল ঃ হে আমার রাব্ব! আপনি কিরূপে মৃতকে জীবিত করেন তা আমাকে প্রদর্শন করুন। তিনি বললেন ঃ তাহলে কি তুমি বিশ্বাস করনা? সে বলল ঃ হ্যাঁ অবশ্যই, কিন্তু তাতে আমার অন্তর পরিতৃপ্ত হবে। তিনি বললেন ঃ তাহলে চারটি পাখী গ্রহণ কর, তারপর ওদেরকে টুকরো টুকরো করে মিশ্রিত কর, অনন্তর প্রত্যেক পাহাড়ের উপর ওদের এক এক খন্ড রেখে দাও, অতঃপর ওদেরকে আহ্বান কর, ওরা তোমার নিকট দৌড়ে আসবে; এবং জেনে রেখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রান্ত, বিজ্ঞানময়।	٢٦٠. وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ رَبِّ أَرِنِى كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَـٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِى ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَٱعْلَمْ

أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ	

ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে জানতে চাইলেন, আল্লাহ কিভাবে মৃতকে পুনরায় জীবন দেন

ইবরাহীমের (আঃ) প্রশ্ন করার অনেক কারণ ছিল। প্রথম এই যে, যেহেতু তিনি এই দলীলই পাপাচারী নামরূদের সামনে পেশ করেছিলেন, তাই তিনি চেয়েছিলেন যে, প্রগাঢ় বিশ্বাস তো রয়েছেই, কিন্তু যেন প্রগাঢ়তম বিশ্বাস জন্মে। অর্থাৎ যেন তিনি চাচ্ছিলেন ঃ 'বিশ্বাস তো আছেই। কিন্তু দেখতেও চাই; সহীহ বুখারীতে এই আয়াতের ব্যাপারে একটি হাদীস রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

ইবরাহীম (আঃ) অপেক্ষা আমরা সন্দেহ পোষণের ব্যাপারে বেশি দাবীদার। তিনি বলেছেন ঃ হে আমার রাব্ব! আপনি কিভাবে মৃতকে জীবিত করেন তা আমাকে দেখান। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ তুমি কি অবিশ্বাস করছ? ইবরাহীম (আঃ) বললেন ঃ না, আমি বিশ্বাস করছি; তবে আমি আমার ঈমানকে সুদৃঢ় করতে চাই। (ফাতহুল বারী ৮/৪৯)

ইবরাহীমের (আঃ) প্রার্থনায় আল্লাহর সাড়া দেয়া

ইবরাহীমের (আঃ) প্রার্থনার কারণে কোন অজ্ঞ ব্যক্তি যেন মনে না করে যে, আল্লাহ তা'আলার এই বিশেষণ সম্পর্কে ইবরাহীমের (আঃ) কোন সন্দেহ ছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ চারটি পাখী গ্রহণ কর। এই কথানুসারে ইবরাহীম (আঃ) যে কি কি পাখি গ্রহণ করেছিলেন সেই ব্যাপারে মুফাসসিরদের কয়েকটি উক্তি রয়েছে। কিন্তু স্পষ্ট কথা এই যে, এর জ্ঞান আমাদের কোন উপকার করতে পারেনা এবং তা না জানায় আমাদের কোন ক্ষতিও নেই। কুরআনও এ ব্যাপারে কিছু উল্লেখ করেনি। ইহাই হল ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আবূ মালিক (রহঃ), আবুল আসওয়াদ আদ-দিলি (রহঃ), ওয়াহাব ইব্ন মুনাব্বিহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং সুদ্দীর (রহঃ) বিশ্লেষণ। (ইব্ন আবী হাতিম ৩/১০৩৯, ১০৪০)

অতঃপর যখন তিনি পাখীগুলি পেয়ে যান তখন ওগুলি জবাই করে খণ্ড খণ্ড করেন এবং ঐ চারটি পাখীর খণ্ডগুলি সব একত্রে মিলিয়ে দেন। এরপর ঐগুলি চারটি পাহাড়ের উপর বা সাতটি পাহাড়ের উপর রেখে দেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ)

বলেন ঃ ওগুলির মাথা নিজের হাতে রাখেন। তারপর আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশক্রমে ওদেরকে আহ্বান করেন। তিনি যেই পাখীর নাম ধরে ডাক দিতেন। ওর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পালকগুলি এদিক ওদিক হতে উড়ে এসে পরস্পর মিলিত হয়ে যেত। অনুরূপভাবে ওর রক্ত, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি যে সকল পাহাড়ে ছিল সবই পরস্পর মিলে যেত। অতঃপর ওটা পূর্ণ পাখী হয়ে তাঁর নিকট উড়ে আসত। তিনি ওর উপর অন্য পাখীর মাথা লাগালে তা সংযুক্ত হতনা। কিন্তু ওর নিজের মাথা লাগালে যুক্ত হয়ে যেত। অবশেষে ঐ চারটি পাখী জীবিত হয়ে উড়ে যায় এবং আল্লাহ তা‘আলার ক্ষমতা বলে মৃতের জীবিত হওয়ার এই বিশ্বাস উৎপাদক দৃশ্য ইবরাহীম (আঃ) স্বচক্ষে দর্শন করেন। (কুরতুবী ৩/৩০০) অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَاعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়। কোন কাজেই তিনি অসমর্থ হননা। তিনি যা চান তা কোন প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই সম্পন্ন হয়ে যায়। প্রত্যেক জিনিসই তাঁর অধিকারে রয়েছে। তিনি তাঁর সমুদয় কথা ও কাজে মহাবিজ্ঞানময়। অনুরূপভাবে নিয়ম-শৃংখলার ব্যাপারে এবং শারীয়াতের নির্ধারণের ব্যাপারেও তিনি মহাবিজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ ‘মহান আল্লাহ ইবরাহীমকে (আঃ) ‘তুমি কি বিশ্বাস করনা?’ এই প্রশ্ন করা এবং ইবরাহীমের (আঃ) ‘হ্যাঁ, বিশ্বাস তো করি, কিন্তু অন্তরকে পরিতৃপ্ত করতে চাই’ এই উত্তর দেয়া, এই আয়াতটি অন্যান্য সমস্ত আয়াত অপেক্ষা বেশি আশা প্রদানকারী বলে আমার মনে হয়।’ (তাবারী ৫/৪৮৯) ভাবার্থ এই যে, কোন ঈমানদারের অন্তরে কোন সময় যদি কোন শাইতানী সংশয় ও সন্দেহ আসে তাহলে সেই জন্য আল্লাহ তাকে পাকড়াও করবেননা। ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির (রহঃ) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইবনুল আসের (রাঃ) সাথে দেখা করেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ কুরআনের কোন্ আয়াতের ব্যাপারে আপনি সর্বাপেক্ষা বেশি আশাবাদী? আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রাঃ) বলেন ঃ

قُلْ يَـٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟

বল ঃ (আমার এ কথা) হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ - আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়োনা। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৫৩) আয়াতটি। যাতে বলা হয়েছে ঃ ‘হে আমার পাপী বান্দারা! তোমরা নিরাশ

হয়োনা, আমি তোমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিব।' তখন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ 'আমার মতে তো সবচেয়ে বেশি আশা উৎপাদনকারী আয়াত হচ্ছে ইবরাহীমের (আঃ) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِـــي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى 'হে আল্লাহ! তুমি কিরূপে মৃতকে জীবিত কর তা আমাকে প্রদর্শন কর' এই উক্তি এবং আল্লাহর 'তুমি কি বিশ্বাস করনা?' এই প্রশ্ন ও তাঁর 'বিশ্বাস করি, কিন্তু আমার অন্তরকে পরিতৃপ্ত করতে চাই' এ আয়াতটি। (ইব্‌ন আবী হাতিম ৩/১০৩২)

২৬১। যারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের উপমা যেমন একটি শস্যবীজ, তা হতে উৎপন্ন হল সাতটি শীষ, প্রত্যেক শীষে (উৎপন্ন হল) এক শত শস্য, এবং আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন বর্ধিত করে দেন; বস্তুতঃ আল্লাহ হচ্ছেন অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ।	٢٦١. مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّاْئَةُ حَبَّةٍ ۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

আল্লাহর উদ্দেশে ব্যয় করার প্রতিদান

এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ঃ مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّه যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে স্বীয় ধন-সম্পদ খরচ করে সে বড়ই বারাকাত ও সাওয়াব লাভ করে। তাকে ১০ থেকে ৭ শত গুণ প্রতিদান দেয়া হয়। সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হল আল্লাহর বাধ্যতার প্রমাণস্বরূপ খরচ করা। মাকহুল (রহঃ) বলেন, এ আয়াতের মর্ম হচ্ছে জিহাদের উদ্দেশে ঘোড়া লালন-পালন করা, অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করা এবং এ বিষয়ে অন্যান্য কার্যাবলীসমূহ। (ইব্‌ন আবী হাতিম ৩/১০৪৭) এখানে সাত শতের উল্লেখ করা হয়েছে আপেক্ষিক হিসাবে, মূল বিষয় হচ্ছে এর গুরুত্ব অনুধাবন করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা উত্তম আমলকারীর উদাহরণ দিচ্ছেন যে, তাদের আমল

হচ্ছে যেন এক একটি শস্য বীজ এবং প্রত্যেক বীজে উৎপন্ন হয়ে থাকে সাতটি শীষ, প্রত্যেক শীষে উৎপন্ন হয় একশ' শস্যদানা। কি মনোমুগ্ধকর উপমা 'একের বিনিময়ে সাতশ' পাবে' সরাসরি এই কথার চেয়ে উপরোক্ত কথা ও উপমার মধ্যে খুব বেশি সূক্ষ্মতা ও পরিচ্ছন্নতা রয়েছে এবং ঐদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সৎ কার্যাবলী আল্লাহ তা'আলার নিকট বৃদ্ধি পেতে থাকে যেমন বপনকৃত বীজ জমিতে বাড়তে থাকে।

তবে ইমাম মুসলিম (রহঃ) আরও বর্ণনা করেছেন ঃ এক ব্যক্তি লাগামসহ একটি সুসজ্জিত উট নিয়ে এসে বলেন ঃ হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এটি আল্লাহর উদ্দেশে দিলাম। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ কিয়ামাত দিবসে তুমি এ জন্য সাত শতটি উট প্রাপ্ত হবে। (মুসলিম ৩/১৫০৫, নাসাঈ ৬/৪৯) ইমাম আহমাদ (রহঃ) তার গ্রন্থে আবূ হুরাইরাহর (রাঃ) বরাতে বর্ণনা করেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

আল্লাহ তা'আলা বানী আদমের প্রতিটি সাওয়াবকে দশটি সাওয়াবের সমান করে দিয়েছেন এবং ওটি বাড়তে বাড়তে সাতশ' পর্যন্ত হয়ে যায়। কিন্তু সিয়ামের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'ওটি বিশেষ করে আমারই জন্য এবং আমি নিজেই ওর প্রতিদান দিব। সিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি খুশি রয়েছে। একটি খুশি ইফতারের সময় এবং অন্যটি তার প্রভুর সাথে সাক্ষাতের সময়। সিয়াম পালনকারীর মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ তা'আলার নিকট মিশকের সুগন্ধি হতেও বেশি পছন্দনীয়। সিয়াম ঢাল স্বরূপ, সিয়াম ঢাল স্বরূপ।' (আহমাদ ২/৪৪৩, মুসলিম ২/৮০৭) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء *এবং আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন বর্ধিত করে দেন*। এ বিষয়টি নির্ভর করে বান্দার একাগ্রতা ও কার্যাবলীর উপর। অতঃপর বলা হয়েছে, وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য বিপুল দাতা ও মহাজ্ঞানী অর্থাৎ তাঁর সাহায্য তাঁর সৃষ্টির সকলের জন্য ব্যাপ্ত, কে তাঁর সাহায্য পাবার যোগ্য এবং কে যোগ্য নয় সেই বিষয়েও তিনিই জানেন। সমস্ত প্রশংসা ও গুণগান একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য।

২৬২। যারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন সম্পদ ব্যয় করে, এবং ব্যয় করার পর	٢٦٢. ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ

فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنًّا وَلَآ أَذًى ۙ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ	অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করেনা, কষ্টও দেয়না, তাদের জন্য তাদের রবের নিকট রয়েছে পুরস্কার; বস্তুতঃ তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবেনা।
٢٦٣. قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذًى ۗ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ	২৬৩। যে দানের পশ্চাতে থাকে ক্লেশ, সেই দান অপেক্ষা উত্তম বাক্য ও ক্ষমাই উৎকৃষ্ট এবং আল্লাহ মহা সম্পদশালী, সহিষ্ণু।
٢٦٤. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ ۖ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُۥ وَابِلٌ فَتَرَكَهُۥ صَلْدًا ۖ لَّا يَقْدِرُونَ	২৬৪। হে মু’মিনগণ! কৃপা প্রকাশ ও ক্লেশ দান করে নিজেদের দানগুলি ব্যর্থ করে ফেলনা সেই ব্যক্তির ন্যায় যে নিজের ধন ব্যয় করে লোক দেখানোর জন্য, অথচ আল্লাহ ও আখিরাতে সে বিশ্বাস করেনা; ফলতঃ তার উপমা, যেমন এক বৃহৎ মসৃন প্রস্তর খন্ড যার উপর কিছু মাটি (জমে) আছে, এ অবস্থায় তাতে বর্ষিত হল প্রবল বর্ষা, অনন্তর তা পরিষ্কার হয়ে গেল; তারা যা অর্জন করেছে তন্মধ্য হতে

عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَـٰفِرِينَ	কোন বিষয়েই তারা সুফল পাবেনা এবং আল্লাহ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেননা।

দান করে তা স্মরণ করিয়ে দেয়ায় নিষেধাজ্ঞা

আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঐ বান্দাদের প্রশংসা করছেন 'যারা দান-খাইরাত করে থাকেন; অতঃপর যাদেরকে দান করেন তাদের নিকট নিজেদের কৃপার কথা প্রকাশ করেনা এবং তাদের নিকট হতে কিছু উপকারেরও আশা করেনা। তারা তাদের কথা ও কাজ দ্বারা দান গ্রহীতাদেরকে কোন প্রকারের কষ্টও দেয়না। মহান আল্লাহ তাঁর এই বান্দাদেরকে উত্তম প্রতিদান প্রদানের ওয়াদা করেছেন যে, তাদের প্রতিদান আল্লাহ তা'আলার দায়িত্বে রয়েছে। কিয়ামাতের দিন তাদের ভয় ও চিন্তার কারণ থাকবেনা। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, মুখ দিয়ে উত্তম কথা বের করা, কোন মুসলিম ভাইয়ের জন্য প্রার্থনা করা, দোষী ও অপরাধীদের ক্ষমা করা ঐ দান-খাইরাত হতে উত্তম যার পিছনে থাকে ক্লেশ ও কষ্ট প্রদান। ইব্‌ন আবী হাতিমের (রহঃ) বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'উত্তম কথা হতে ভাল দান আর কিছু নেই। তোমরা কি মহান আল্লাহর এই ঘোষণা শুননি?

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذًى

যে দানের পশ্চাতে থাকে ক্লেশ দান সেই দান অপেক্ষা উত্তম বাক্য ও ক্ষমা উৎকৃষ্টতর। (২ ঃ ২৬৩) সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা তিন প্রকার লোকের সঙ্গে কথা বলবেননা এবং তাদের প্রতি করুণার দৃষ্টিতে দেখবেননা ও তাদেরকে পবিত্র করবেননা; বরং তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। প্রথম হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে দান করার পর কৃপা প্রকাশ করে। দ্বিতীয় হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে পায়জামা বা লুঙ্গী পায়ের গিঁটের নীচে ঝুলিয়ে পরিধান করে। তৃতীয় হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে মিথ্যা শপথ করে নিজের পণ্য দ্রব্য বিক্রি করে। (মুসলিম ১/১০২) এই আয়াতেও ইরশাদ হচ্ছে ঃ

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأَذَى অনুগ্রহ প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে তোমাদের দান-খাইরাত নষ্ট করনা। এ অনুগ্রহ প্রকাশ ও কষ্ট

দেয়ার পাপ দানের সাওয়াব অবশিষ্ট রাখেনা। অতঃপর অনুগ্রহ প্রকাশকারী ও কষ্ট প্রদানকারীর সাদাকাহ নষ্ট হয়ে যাওয়ার উপমা ঐ সাদাকাহর সাথে দেয়া হয়েছে, যা মানুষকে দেখানোর জন্য দেয়া হয় এবং উদ্দেশ্য থাকে যে, মানুষ তাকে দানশীল উপাধিতে ভূষিত করবে এবং তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য তার মোটেই থাকেনা এবং সে সাওয়াব লাভেরও আশা পোষণ করেনা। এ জন্যই এই বাক্যের পর বলেন ঃ

فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا যদি আল্লাহ তা'আলার উপর ও কিয়ামাতের উপর বিশ্বাস না থাকে তাহলে ঐ লোক-দেখানো দান, অনুগ্রহ প্রকাশ করার দান এবং কষ্ট দেয়ার দানের দৃষ্টান্ত এইরূপ যেমন এক বৃহৎ মসৃণ প্রস্তর খণ্ড, যার উপরে কিছু মাটিও জমে গেছে। অতঃপর প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে সমস্ত ধুয়ে গেছে এবং কিছুই অবশিষ্ট নেই। এই দু' প্রকার ব্যক্তির দানের অবস্থাও তদ্রূপ। লোকে মনে করে যে, সে দানের সাওয়াব অবশ্যই পেয়ে যাবে। যেভাবে এই পাথরের মাটি দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু বৃষ্টিপাতের ফলে ঐ মাটি দূর হয়ে গেছে, তেমনি এই ব্যক্তির অনুগ্রহ প্রকাশ করা ও কষ্ট দেয়ার ফলে এবং ঐ ব্যক্তির রিয়াকারীর ফলে ঐ সব সাওয়াব বিদায় নিয়েছে। আল্লাহ তা'আলার নিকট পৌঁছে তারা কোন প্রতিদান পাবেনা। وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ আল্লাহ তা'আলা অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেননা।

২৬৫। এবং যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি সাধন ও স্বীয় জীবনের প্রতিষ্ঠার জন্য ধন সম্পদ ব্যয় করে তাদের উপমা - যেমন উর্বর ভূভাগে অবস্থিত একটি উদ্যান, তাতে প্রবল বৃষ্টিধারা পতিত হয়, ফলে সেই উদ্যান দ্বিগুণ খাদ্যশস্য দান করে; কিন্তু যদি তাতে বৃষ্টিপাত না হয় তাহলে শিশিরই যথেষ্ট এবং	٢٦٥. وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۭ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَـَٔاتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ

তোমরা যা করছ আল্লাহ তা প্রত্যক্ষকারী।	يُصِبۡهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ

এখানে মহান আল্লাহ ঐ মু'মিনদের দানের দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন যারা তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে দান করে থাকেন এবং উত্তম প্রতিদান লাভেরও তাঁদের পূর্ণ বিশ্বাস থাকে। যেমন হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যে ব্যক্তি (আল্লাহর উপর) বিশ্বাস রেখে ও সাওয়াব লাভের আশা রেখে রামাযানের সিয়াম পালন করে তার পূর্বের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (ফাতহুল বারী ৪/৩০০) رَبْوَة বলা হয় উঁচু ভূমিকে যেখান দিয়ে নদী প্রবাহিত হয়। وَابِلٌ এর অর্থ হচ্ছে প্রবল বৃষ্টিপাত। বাগানটি দ্বিগুণ ফল দান করে। অনান্য বাগানসমূহের তুলনায় এই বাগানটি এইরূপ যে, ওটা উর্বর ভূ-ভাগে অবস্থিত বলে বৃষ্টিপাত না হলেও শিশির দ্বারাই তাতে ফুল-ফল হয়ে থাকে। কোন বছরই ফলশূন্য হয়না। অনুরূপভাবে ঈমানদারদের আমল কখনও সাওয়াবহীন হয়না, তাদেরকে তাদের কাজের প্রতিদান অবশ্যই দেয়া হয়। তবে ঐ প্রতিদানের ব্যাপারে পার্থক্য রয়েছে যা ঈমানদারের খাঁটিত্ব ও সৎ কাজের গুরুত্ব হিসাবে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। বান্দাদের কোন কাজ আল্লাহর নিকট গোপন নেই। বরং তিনি তাদের কার্যাবলী সম্যক অবগত রয়েছেন।

২৬৬। তোমাদের কারও যদি এমন একটি খেজুর ও আঙ্গুর উদ্যান থাকে যার তলদেশ দিয়ে নদী-নালা প্রবাহিত, সেখানে সর্ব প্রকার ফলের সংস্থান তার রয়েছে, আর সে বার্ধক্যে উপনীত হল, অথচ তার কতকগুলি দুর্বল (অপ্রাপ্ত বয়স্ক) সন্তান-সন্ততি রয়েছে, এ অবস্থায় সেই	٢٦٦. أَيَوَدُّ أَحَدُكُمۡ أَن تَكُونَ لَهُۥ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعۡنَابٍ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ لَهُۥ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ وَأَصَابَهُ ٱلۡكِبَرُ وَلَهُۥ

ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَآ إِعۡصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَٱحۡتَرَقَتۡ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلۡأَيَٰتِ لَعَلَّكُمۡ تَتَفَكَّرُونَ	**বাগানে উপস্থিত হল অগ্নিসহ এক বাত্যাবর্ত, আর তা পুড়ে (ভস্মীভূত হয়ে) গেল; তোমরা কেহ এটা পছন্দ করবে কি? এ রূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করেন, যেন তোমরা চিন্তা-ভাবনা কর।**

অসৎ কাজ সৎ কাজকে মুছে দেয়

সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, আমীরুল মু'মিনীন উমার (রাঃ) একদা সাহাবীগণকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ 'এই আয়াতটি কি সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল তা আপনারা জানেন কি?' তাঁরা বলেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলাই খুব ভাল জানেন।' তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে বলেন ঃ আপনারা জানেন কিনা স্পষ্টভাবে বলুন? ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার অন্তরে একটি কথা রয়েছে। তিনি বলেন ঃ হে ভ্রাতুস্পুত্র! তুমি বল এবং নিজেকে তুচ্ছ মনে করনা। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ একটি কাজের দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ কোন্ কাজ? আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এক ধনী ব্যক্তি, যে আল্লাহর আনুগত্যের কাজ করতে রয়েছে। অতঃপর শাইতান তাকে বিভ্রান্ত করে, ফলে সে পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং স্বীয় সৎকার্যাবলী নষ্ট করে দেয়। (ফাতহুল বারী ৮/৪৯) সুতরাং এই বর্ণনাটি এই আয়াতের পূর্ণ তাফসীর। এতে বর্ণিত হচ্ছে যে, একটি লোক প্রথমে ভাল কাজ করল। তারপর তার অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে গেল এবং সে অসৎ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ল। ফলে সে তার পূর্বের সৎকার্যাবলী ধ্বংস করে দিল এবং শেষ অবস্থায় যখন সাওয়াবের বিশেষ প্রয়োজন ছিল সে শূন্যহস্ত হয়ে গেল। যেমন একটি লোক একটি ফল বৃক্ষের বাগান তৈরী করল। বছরের পর বছর ধরে সে বৃক্ষটি হতে ফল আহরণ করতে থাকল। কিন্তু যখন বার্ধক্যে উপনীত হল তখন সে কাজের অযোগ্য হয়ে পড়ল। এখন তার জীবিকা নির্বাহের উপায় মাত্র একটি বাগান। ঘটনাক্রমে একদিন অগ্নিবাহী এক ঘূর্ণিবাত্যা তার বাগানের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাগানটি ভস্মীভূত করে দিল। ঐ রকমই এই লোকটি, সে প্রথমে তো সৎ কার্যাবলীই সম্পাদন করেছিল; কিন্তু পরে দুষ্কার্যে লিপ্ত হওয়ার ফলে তার পরিণাম

ভাল হলনা। এর ফলে, যখন ঐ সৎ কার্যাবলীর প্রতিদান প্রদানের সময় এলো তখন সে শূন্যহস্ত হয়ে গেল। কাফিরও যখন আল্লাহ তা'আলার নিকট গমন করবে তখন সেখানে তার কিছু করার ক্ষমতা থাকবেনা। যেমন ঐ বৃদ্ধ, সে যা কিছু করেছিল অগ্নিবাহী ঘুর্ণিবাত্যা তা ধ্বংস করে দিয়েছে। এখন পিছন হতেও কেহ তার কোন উপকার করতে পারবেনা। (ইব্‌ন আবী হাতিম ৩/১০৭৪) মুসতাদরাক হাকিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নের দু'আটিও পাঠ করতেন ঃ

اللَّهُمَّ تَجْعَلْ اَوسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ عِنْدَ كِبَرِسِنِّيْ وَانْقِضَاءِ عُمْرِىْ

'হে আল্লাহ! আমার বার্ধক্যের সময় ও আয়ু শেষ হয়ে যাওয়ার সময় আমাকে অধিক পরিমাণে রিয্ক দান করুন।' (হাকিম ১/৫৪২) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'আল্লাহ তোমাদের সামনে এই নিদর্শনাবলী বর্ণনা করেন যেন তোমরা চিন্তা-গবেষণা কর এবং তা হতে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ কর। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَـٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَآ إِلَّا ٱلْعَـٰلِمُونَ

মানুষের জন্য এ সব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে থাকি, কিন্তু শুধু জ্ঞানী ব্যক্তিরাই এটা বুঝে। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৪৩)

২৬৭। হে মু'মিনগণ! তোমরা যা উপার্জন করেছ এবং আমি যা তোমাদের জন্য ভূমি হতে উৎপন্ন করেছি, তা হতে উৎকৃষ্ট বস্তু খরচ কর এবং তা হতে এরূপ নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করতে মনস্থ করনা যা তোমরা মুদিত চক্ষু ব্যতীত গ্রহণ করনা; এবং তোমরা জেনে রেখ, আল্লাহ মহা সম্পদশালী, প্রশংসিত।	٢٦٧. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا۟ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُوا۟ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ

غَنِيٌّ حَمِيدٌ	
٢٦٨. ٱلشَّيْطَـٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ ۖ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ	২৬৮। শাইতান তোমাদেরকে অভাবের ভীতি প্রদর্শন করে এবং তোমাদেরকে অশ্লীলতার আদেশ করে এবং আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিকট হতে ক্ষমা ও দয়ার অংগীকার করেন। আল্লাহ হচ্ছেন বিপুল দাতা, সর্বজ্ঞ।
٢٦٩. يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَـٰبِ	২৬৯। তিনি যাকে ইচ্ছা প্রজ্ঞা দান করেন এবং যাকে প্রজ্ঞা দান করা হয় সে নিশ্চয়ই প্রচুর কল্যাণ লাভ করে; বস্তুতঃ জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ ব্যতীত কেহই উপলদ্ধি করতে পারেনা।

হালাল আয় থেকে ব্যয় করতে উৎসাহিত করা

আল্লাহ তা'আলা তাঁর মু'মিন বান্দাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন ব্যবসার মাল, যা আল্লাহ তাদেরকে দান করেছেন এবং সোনা, রূপা, শস্য ইত্যাদি যা তাদেরকে ভূমি হতে বের করে দেয়া হয়েছে তা হতে উত্তম ও পছন্দনীয় জিনিস তাঁর পথে খরচ করে। তারা যেন পঁচা, গলা ও মন্দ জিনিস আল্লাহর পথে না দেয়। আল্লাহ অত্যন্ত পবিত্র, তিনি অপবিত্র জিনিস গ্রহণ করেননা। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ

وَلَا تَيَمَّمُوا۟ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ এমন জিনিস তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করার ইচ্ছা করনা যা তোমাদেরকে দেয়া হলে তোমরাও তা গ্রহণ করতে সম্মত

হতেনা। সুতরাং তোমরা এ রকম জিনিস কিরূপে আল্লাহকে দিতে চাও? আর তিনি তা গ্রহণই বা করবেন কেন? তবে তোমরা যদি সম্পদ হাত ছাড়া হতে দেখে নিজের অধিকারের বিনিময়ে কোন পঁচা-গলা জিনিস বাধ্য হয়ে গ্রহণ করে নাও তাহলে অন্য কথা। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তো তোমাদের মত বাধ্য ও দুর্বল নন যে, তিনি এই সব জঘন্য জিনিস গ্রহণ করবেন? তিনি কোন অবস্থায়ই এই সব জিনিস গ্রহণ করেননা।

বারা ইব্ন আযিব (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ খেজুরের মৌসুমে আনসারগণ নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী খেজুরের গুচ্ছ এনে মাসজিদে নববীর দু'টি স্তম্ভের মধ্যে রজ্জুতে ঝুলিয়ে দিতেন। ঐগুলি আসহাব-ই সুফ্ফা ও দরিদ্র মুহাজিরগণ ক্ষুধার সময় খেয়ে নিতেন। সাদাকাহর প্রতি আগ্রহ কম ছিল এরূপ একটি লোক ওতে খারাপ খেজুরের একটি গুচ্ছ এনে ঝুলিয়ে দেয়। সেই সময় এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং তাতে বলা হয়, 'যদি তোমাদেরকে এই রকমই জিনিস উপঢৌকন স্বরূপ দেয়া হয় তাহলে তোমরা তা কখনও গ্রহণ করতেনা। (তাবারী ৫/৫৫৯)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ 'এর ভাবার্থ এই যে, তোমরা কেহকে উত্তম মাল ধার দিয়েছ, কিন্তু পরিশোধ করার সময় সে নিকৃষ্ট মাল নিয়ে আসবে, এইরূপ অবস্থায় তোমরা কখনও ঐ মাল গ্রহণ করবেনা। আর যদি গ্রহণ করও তাহলে মূল্য কমিয়ে দিয়ে তা গ্রহণ করবে। তাই যে জিনিস তোমরা নিজেদের হকের বিনিময়েই গ্রহণ করছনা, তা তোমরা আল্লাহর হকের বিনিময়ে কেন দিবে? সুতরাং তোমরা উত্তম ও পছন্দনীয় মাল আল্লাহর পথে খরচ কর। এই অর্থই হচ্ছে নিম্নের আয়াতটি ঃ

لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ

তোমরা যা ভালবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনই কল্যাণ লাভ করতে পারবেনা। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৯২) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ আল্লাহ যে তোমাদেরকে তাঁর পথে উত্তম ও পছন্দনীয় মাল খরচ করার নির্দেশ প্রদান করলেন, এ জন্য তোমরা এই কথা মনে করনা যে, আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী। না, না, তিনি তো সম্পূর্ণরূপে অভাবমুক্ত। তিনি কারও প্রত্যাশী নন। বরং তোমরা সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। তাঁর নির্দেশ শুধু এ জন্যই যে, দরিদ্র লোকেরাও যেন দুনিয়ার নি'আমাতসমূহ হতে বঞ্চিত না থাকে। যেমন অন্য জায়গায় কুরবানীর হুকুমের পরে বলেছেন ঃ

لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَـٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ مِنكُمْ

আল্লাহর কাছে পৌঁছেনা ওগুলির গোশত এবং রক্ত, বরং পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৩৭)। তিনি বিপুল দাতা। তাঁর ধনভাণ্ডারে কোন কিছুর স্বল্পতা নেই। হালাল ও পবিত্র মাল হতে সাদাকাহ বের করে আল্লাহর অনুগ্রহ ও মহাদানের প্রতি লক্ষ্য কর। এর বহুগুণ বৃদ্ধি করে তিনি তোমাদেরকে প্রতিদান দিবেন। তিনি দরিদ্রও নন, অত্যাচারীও নন। তিনি প্রশংসিত। সমস্ত কথায় ও কাজে তাঁরই প্রশংসা করা হয়। তিনি ছাড়া কেহ ইবাদাতের যোগ্য নয়। তিনি সারা জগতের পালনকর্তা। তিনি ব্যতীত কেহ কারও পালনকর্তা নয়।

সৎ কাজের ব্যাপারে শাইতানী কুমন্ত্রণা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء وَاللّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ *শাইতান তোমাদেরকে অভাবের ভীতি প্রদর্শন করে এবং তোমাদেরকে অশ্লীলতার আদেশ করে এবং আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিকট হতে ক্ষমা ও দয়ার অংগীকার করেন। আল্লাহ হচ্ছেন বিপুল দাতা, সর্বজ্ঞ।* ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'বানী আদমের মনে শাইতান এক ধারণা জন্মিয়ে থাকে এবং মালাক/ফেরেশতা এক ধারণা জন্মিয়ে থাকে। শাইতান দুষ্টামি ও সত্যকে অবিশ্বাস করার প্রতি উত্তেজিত করে এবং মালাক সৎকাজের প্রতি এবং সত্যকে স্বীকার করার প্রতি উৎসাহিত করে। যার মনে ভাল ধারণা আসবে সে যেন আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং জেনে নেয় যে, এটা আল্লাহর পক্ষ হতে হয়েছে। আর যার মনে কু-ধারণা আসবে সে যেন আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। শেষে এই আয়াতটি (২ ঃ ২৬৮) তিনি পাঠ করেন। (তিরমিযী ৮/৩৩২, নাসাঈ ৬/৩০৫, ইবন আবী হাতিম ৩/১০৯০)

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ এ পবিত্র আয়াতটির ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলার পথে খরচ করতে শাইতান বাধা দেয় এবং মনে কু-ধারণা জন্মিয়ে দেয় যে, এভাবে খরচ করলে সে দরিদ্র হয়ে যাবে। এ কাজ হতে বিরত রাখার পর তাকে পাপের কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে এবং আল্লাহর অবাধ্যতার কাজে, অবৈধ কাজে এবং সত্যের বিরুদ্ধাচরণের কাজে উত্তেজিত করে।

‘হিকমাত’ এর বিশ্লেষণ

এখানে ‘হিকমাত’ শব্দের অর্থ হচ্ছে কুরআন কারীম ও হাদীসের পূর্ণ পারদর্শিতা লাভ, যার দ্বারা রহিতকৃত ও রহিতকারী, স্পষ্ট ও অস্পষ্ট, পূর্বের ও পরের, হালাল ও হারামের এবং উপমার আয়াতসমূহের পূর্ণ পরিচয় লাভ করা। ভাল-মন্দ পড়তে সবাই পারে, কিন্তু ওর ব্যাখ্যা ও অনুধাবন হচ্ছে ঐ হিকমাত, যা মহান আল্লাহ যাকে ইচ্ছা দান করেন। পৃথিবীতে এরূপ বহু লোক রয়েছে যারা ইহলৌকিক বিদ্যায় খুবই পারদর্শী। দুনিয়ার বিষয়সমূহে তারা পূর্ণ জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে থাকে। কিন্তু তারা ধর্ম বিষয়ে একেবারেই অজ্ঞ। আবার পৃথিবীতে বহু লোক এমনও রয়েছেন যারা ইহলৌকিক বিদ্যায় দুর্বল বটে, কিন্তু শারীয়াতের বিদ্যায় বড়ই পারদর্শী। সুতরাং এটাই ঐ হিকমাত যা আল্লাহ তা‘আলা এদেরকে দিয়েছেন এবং ওদেরকে বঞ্চিত রেখেছেন। সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এখানে হিকমাতের ভাবার্থ হচ্ছে ‘নাবুওয়াত’। কিন্তু সঠিক কথা এই যে, ‘হিকমাত’ শব্দটির মধ্যে এই সবগুলিই মিলিত রয়েছে। আর নাবুওয়াতও হচ্ছে ওর উঁচু ও বড় অংশ এবং এটি শুধু নাবীগণের (আঃ) জন্যই নির্দিষ্ট রয়েছে। তাঁরা ছাড়া এটি কেহ লাভ করতে পারেনা। কিন্তু যাঁরা নাবীগণের (আঃ) অনুসারী তাঁদেরকেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা হিকমাতের অন্যান্য অংশ হতে বঞ্চিত রাখেননি। ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ ‘আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ

‘দুই ব্যক্তি ছাড়া কারও প্রতি হিংসা করা যায়না। এক ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দিয়েছেন। অতঃপর তাকে ঐ মাল তাঁর পথে খরচ করার তাওফীক প্রদান করেছেন। দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ প্রজ্ঞা দান করেছেন, অতঃপর সে সেই প্রজ্ঞা অনুযায়ী মীমাংসা করে এবং তা শিক্ষা দেয়। উপদেশ তারাই গ্রহণ করে যারা জ্ঞান ও বিবেকের অধিকারী।’ (আহমাদ ১/৪৩২, ফাতহুল বারী ১/১৯৯, মুসলিম ১/৫৫৯, নাসাঈ ৩/৪২৬, ইব্‌ন মাজাহ২/১৪০৭) অর্থাৎ যারা আল্লাহর কালাম ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস পড়ে বুঝার চেষ্টা করে, কথা মনে রাখে এবং ভাবার্থের প্রতি মনোযোগ দেয় তারাই ভাবার্থ উপলব্ধি করতে পারে। সুতরাং উপদেশ দ্বারা তারাই উপকৃত হয়।

২৭০। এবং যে কোন বস্তু তোমরা ব্যয় করনা কেন, অথবা যে কোন প্রতিজ্ঞা	٢٧٠. وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ

أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُۥ ۗ وَمَا لِلظَّـٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ	(নযর) তোমরা গ্রহণ করনা কেন, আল্লাহ নিশ্চয়ই তা অবগত হন; আর অত্যাচারীদের কোনই সাহায্যকারী নেই।
٢٧١. إِن تُبْدُوا۟ ٱلصَّدَقَـٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّـَٔاتِكُمْ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ	২৭১। যদি তোমরা প্রকাশ্যভাবে দান কর তাহলে তা উৎকৃষ্ট এবং যদি তোমরা তা গোপন কর ও দরিদ্রদেরকে প্রদান কর তাহলে ওটাও তোমাদের জন্য উত্তম, এবং এর দ্বারা তোমাদের কিছু পাপ (এর কালিমা) বিদূরিত হবে; বস্তুতঃ তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আল্লাহ বিশেষ রূপে খবর রাখেন।

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি প্রত্যেকটি দান, প্রতিজ্ঞা (নযর) ও ভাল কাজের খবর রাখেন। তাঁর যেসব বান্দা তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলে, স্বীয় সৎকাজের প্রতিদানের আশা রাখে, তাঁর ওয়াদার প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখে, তাদেরকে তিনি উত্তম প্রতিদান দিবেন। পক্ষান্তরে যারা তাঁর আদেশ ও নিষেধ অমান্য করবে, তাঁর সাথে অন্যদেরও উপাসনা করবে, তারা অত্যাচারী। কিয়ামাতের দিন তাদেরকে বিভিন্ন প্রকারের কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেয়া হবে এবং সেই দিন এমন কেহ থাকবেনা যে তাদেরকে ঐ শাস্তি হতে মুক্তি দিতে পারে বা কোন সাহায্য করতে পারে।

প্রকাশ্যে অথবা অপ্রকাশ্যে দান করার গুরুত্ব

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ প্রকাশ্যভাবে দান করাও ভাল এবং গোপনে

দরিদ্র ও মিসকীনদেরকে দেয়াও উত্তম। কেননা গোপন দানে রিয়াকারী বহু দূরে সরে থাকে। তবে যদি প্রকাশ্য দানের ব্যাপারে দাতার মহৎ কোন উদ্দেশ্য থাকে তাহলে সেটা অন্য কথা। যেমন তার উদ্দেশ্য এই যে, তার দেখাদেখি অন্যরাও দান করবে ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'প্রকাশ্যদানকারী উচ্চ শব্দে কুরআন পাঠকের ন্যায় এবং গোপনে দানকারী ধীরে ধীরে কুরআন পাঠকের ন্যায়। (আবূ দাঊদ ২/৮৩) কুরআন মাজীদের এই আয়াত দ্বারা গোপন দানের শ্রেষ্ঠত্ব সাব্যস্ত হচ্ছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা সাত প্রকারের লোককে তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দিবেন, যে দিন তাঁর ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া থাকবেনা। (১) ন্যায় বিচারক বাদশাহ। (২) সেই নব-যুবক যে তার যৌবন আল্লাহর ইবাদাতে অতিবাহিত করেছে। (৩) ঐ দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্যই পরস্পর ভালবাসা রেখেছে, ঐ জন্যই তারা একত্রিত থাকে এবং ঐ জন্যই পৃথক হয় (৪) ঐ ব্যক্তি যার অন্তর মাসজিদ হতে বের হওয়া থেকে পুনরায় ফিরে আসা পর্যন্ত মাসজিদের সাথে সংযুক্ত থাকে। (৫) ঐ ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহর যিক্‌র করে, অতঃপর তার নয়নযুগল হতে অশ্রুধারা নেমে আসে (৬) ঐ ব্যক্তি যাকে একজন বংশ মর্যাদা ও সৌন্দর্যের অধিকারিণী নারী (নির্লজ্জতার কাজে) আহ্বান করে তখন সে বলে, নিশ্চয়ই আমি সারা জগতের রাব্ব আল্লাহকে ভয় করি। (৭) ঐ ব্যক্তি যে এত গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত যা খরচ করে বাম হাত তা জানতে পারেনা।' (ফাতহুল বারী ৩/৩৪৪, মুসলিম ২/৭১৫)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'দানের বিনিময়ে আল্লাহ তোমাদের পাপ ও অন্যায় দূর করে দিবেন, বিশেষ করে যখন গোপনে দান করা হবে। এর বিনিময়ে তোমরা বহু সুফল প্রাপ্ত হবে। এর দ্বারা তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং পাপসমূহ ক্ষমা হয়ে যাবে। 'য়্যুকাফ্‌ফেরু' শব্দকে য়্যুকাফ্‌ফের পড়া হয়েছে। এতে বাহ্যতঃ এটা শর্তের জবাবের স্থলে عَطْف হবে, যা হচ্ছে فَنِعِمَّا هِيَ শব্দটি। যেমন فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ এর মধ্যে اَكُنْ শব্দটি হয়েছে। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'তোমাদের কোন পাপ ও সাওয়াবের কাজ, দানশীলতা ও কার্পণ্য, গোপনীয় ও প্রকাশ্য, সৎ উদ্দেশ্য ও দুনিয়া অনুসন্ধান প্রভৃতি কিছুই আল্লাহ তা'আলার অজানা নেই। সুতরাং তিনি পূর্ণভাবে প্রতিদান প্রদান করবেন।

২৭২। তাদেরকে সুপথে আনার দায়িত্ব তোমার নয়, বরং আল্লাহর যাকে ইচ্ছা তাকে সৎ পথে পরিচালিত করেন এবং তোমরা ধনসম্পদ হতে যা ব্যয় কর বস্তুতঃ তা তোমাদের নিজেদের জন্য, আর একমাত্র আল্লাহর সন্তোষ লাভের চেষ্টা ব্যতীত (অন্য কোন উদ্দেশে) অর্থ ব্যয় করনা; এবং তোমরা হালাল সম্পদ হতে যা ব্যয় করবে তা সম্পূর্ণভাবে পুনঃপ্রাপ্ত হবে, আর তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবেনা।	٢٧٢. لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَىٰهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ۗ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ ٱللَّهِ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ
২৭৩। দান খাইরাত ঐ সব লোকদের জন্য যারা আল্লাহর কাছে আবদ্ধ হয়ে গেছে, জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র ঘুরাফিরা করতে সক্ষম নয়। তাদের সাবলিল চলাচলের জন্য অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাবহীন মনে করে, তুমি তাদেরকে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনবে। তারা মানুষের কাছে যাঞ্চা করেনা। এবং তোমরা বৈধ সম্পদ থেকে যা ব্যয় কর সে বিষয়ে আল্লাহ	٢٧٣. لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِى ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَٰهُمْ لَا يَسْـَٔلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنفِقُوا۟

مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ	**সম্যকরূপে অবগত।**
٢٧٤. ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ	**২৭৪। যারা রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের রবের নিকট তাদের পুরস্কার রয়েছে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবেনা।**

মুশরিকদেরকে দান করা প্রসঙ্গ

আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, মুসলিম সাহাবীগণ (রাঃ) তাঁদের মুশরিক আত্মীয়দের সাথে আদান-প্রদান করতে অপছন্দ করতেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হয়। তখন এই আয়াতটি (২৭২ নং) অবতীর্ণ হয় এবং তাদেরকে তাদের মুশরিক আত্মীয়দের সাথে লেন-দেন করার অনুমতি দেয়া হয়। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ 'সাদাকাহ শুধুমাত্র মুসলিমদেরকে দেয়া হবে।' যখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'ভিক্ষুক যে কোন মতাবলম্বী হোক না কেন তোমরা তাদেরকে সাদাকাহ প্রদান কর। (ইব্ন আবী হাতিম)

আসমা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ (৬০ ঃ ৮) এই আয়াতের তাফসীরে ইনশাআল্লাহ আসবে। এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ 'তোমরা যা কিছু খরচ করবে তা নিজেদের উপকারের জন্যই করবে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَمَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ

যারা সৎ কাজ করে তারা নিজেদেরই জন্য রচনা করে সুখ-শয্যা। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৪৪)

مَّنۡ عَمِلَ صَـٰلِحًا فَلِنَفۡسِهِۦ

যে ব্যক্তি ভাল কাজ করল তা তার নিজের জন্যই করল। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ৪৬) এ ধরনের আরও বহু আয়াত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَا تُنفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاء وَجْهِ اللّهِ হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ 'মুসলিমের প্রত্যেক খরচ আল্লাহর জন্যই হয়ে থাকে, যদিও সে নিজেই খায় ও পান করে।' (ইব্ন আবী হাতিম ৩/১১৫) 'আতা খুরাসানী (রহঃ) এর ভাবার্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ যখন তুমি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে দান করবে তখন দান গ্রহীতা যে কেহ হোক না কেন এবং যে কোন কাজই করুক না কেন তুমি তার পূর্ণ প্রতিদান লাভ করবে।' (ইব্ন আবী হাতিম ৩/১১৫) এই ভাবার্থটিও খুব উত্তম। মোট কথা এই যে, সৎ উদ্দেশে দানকারীর প্রতিদান যে আল্লাহ তা'আলার দায়িত্বে রয়েছে তা সাব্যস্ত হয়ে গেল। এখন সেই দান কোন সৎ লোকের হাতেই যাক বা কোন মন্দ লোকের হাতেই যাক এতে কিছু যায় আসেনা। সে তার সৎ উদ্দেশের কারণে প্রতিদান পেয়েই যাবে। যদিও সে দেখে-শুনে ও বিচার-বিবেচনা করে দান করে থাকে অতঃপর ভুল হয়ে যায় তাহলে তার দানের সাওয়াব নষ্ট হবেনা। এ জন্য আয়াতের শেষে প্রতিদান প্রাপ্তির সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'এক ব্যক্তি ইচ্ছা করল ঃ 'আজ আমি রাতে দান করব।' অতঃপর সে দান নিয়ে বের হয় এবং একটি ব্যভিচারিণীর হাতে দিয়ে দেয়। সকালে জনগণের মধ্যে এই কথা নিয়ে সমালোচনা হতে থাকে যে, এক ব্যভিচারিণীকে সাদাকাহ দেয়া হয়েছে। এ কথা শুনে লোকটি বলল ঃ 'হে আল্লাহ! আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা যে, আমার দান ব্যভিচারিণীর হাতে পড়েছে।' আবার সে বলল ঃ 'আজ রাতেও আমি অবশ্যই সাদাকাহ প্রদান করব। অতঃপর সে এক ধনী ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়। আবার সকালে জনগণ আলোচনা করতে থাকে যে, রাতে এক ধনী লোককে দান করা হয়েছে। সে বলল ঃ হে আল্লাহ! আপনার জন্যই সমুদয় প্রশংসা যে, আমার দান একজন ধনী ব্যক্তির উপর পড়েছে।' আবার সে বলল ঃ 'আজ রাতেও আমি অবশ্যই দান করব।' অতঃপর সে এক চোরের হাতে দিয়ে দেয়। সকালে পুনরায় জনগণের মধ্যে আলোচনা হতে থাকে যে, রাতে এক

চোরকে সাদাকাহ দেয়া হয়েছে। তখন সে বলল ঃ 'হে আল্লাহ! আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা যে, আমার দান ব্যভিচারিণী, ধনী ও চোরের হাতে পড়েছে।' অতঃপর সে স্বপ্নে দেখে যে, একজন মালাক/ফেরেশতা এসে বলছেন ঃ তোমার দানগুলি আল্লাহর নিকট গৃহীত হয়েছে। সম্ভবতঃ দুশ্চরিত্রা নারীটি তোমার দান পেয়ে ব্যভিচার থেকে বিরত থাকবে, হয়ত ধনী লোকটি এর দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং সেও দান করতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে, আর হতে পারে যে, মাল পেয়ে চোরটি চুরি করা ছেড়ে দিবে।' (ফাতহুল বারী ৩/৩৪০, মুসলিম ২/৭০৯)

কে দান-সাদাকাহ পাবার যোগ্য

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ সাদাকাহ ঐ মুহাজিরদের প্রাপ্য যারা ইহলৌকিক সম্পর্ক ছিন্ন করে স্বদেশ পরিত্যাগ করে, আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে মাদীনায় উপস্থিত হয়েছে। তাদের জীবন যাপনের এমন কোন উপায় নেই যা তাদের জন্য যথেষ্ট হতে পারে এবং তারা সফরও করতে পারেনা যে, চলে-ফিরে নিজেদের খাওয়া পরার ব্যবস্থা করতে পারে।' অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَإِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَقۡصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ

আর যখন তোমরা ভূপৃষ্ঠে ভ্রমন কর তখন সালাত সংক্ষেপ করলে তোমাদের কোন অপরাধ নেই। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১০১) অন্যত্র রয়েছে ঃ

عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرۡضَىٰ ۙ وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ ۙ وَءَاخَرُونَ يُقَـٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ

আল্লাহ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেহ কেহ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ ভ্রমণ করবে এবং কেহ কেহ আল্লাহর পথে সংগ্রামে লিপ্ত হবে। (সূরা মুয্যাম্মিল,৭৩ ঃ ২০) তাদের অবস্থা যাদের জানা নেই তারা তাদের বাহ্যিক পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে এবং কথা-বার্তা শুনে তাদেরকে ধনী মনে করে। বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'ঐ ব্যক্তি মিসকীন নয়, যে বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়ায়, কোথায়ও হয়ত একটি খেজুর পেল, কোথায়ও হয়ত দু'এক গ্রাস খাবার পেল, আবার কোন জায়গায় হয়ত দু' একদিনের খাদ্য প্রাপ্ত হল। বরং মিসকীন ঐ ব্যক্তি যার নিকট ঐ

পরিমাণ খাদ্য নেই যার দ্বারা সে অমুখাপেক্ষী হতে পারে এবং সে তার অবস্থাও এমন করেনি যার ফলে মানুষ তার অভাব অনুভব করে তার প্রতি কিছু অনুগ্রহ করবে। আবার ভিক্ষা করার অভ্যাসও তার নেই।' (ফাতহুল বারী ৩/৩৯৯) ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (আহমাদ ১/৩৮৪) কিন্তু যাদের অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে তাদের কাছে এদের অবস্থা গোপন থাকেনা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم

তাদের মুখে সাজদাহর চিহ্ন থাকবে। (সূরা ফাত্হ, ৪৮ ঃ ২৯) অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ

তুমি অবশ্যই কথার ভঙ্গিতে তাদেরকে চিনতে পারবে। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ৩০) অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا তারা কাকুতি মিনতি করে কারও কাছে প্রার্থনা করেনা অর্থাৎ তারা যাঞ্চার দ্বারা মানুষকে ত্যক্ত-বিরক্ত করেনা এবং তাদের কাছে সামান্য কিছু থাকা অবস্থায় তারা মানুষের কাছে হাত বাড়ায়না। প্রয়োজনের উপযোগী কিছু বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যে ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করেনা তাকেই পেশাগত ভিক্ষুক বলা হয়। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, আবূ সাঈদ (রাঃ) বলেন ঃ আমার মা আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে কিছু সাহায্য পাবার উদ্দেশে তাঁর কাছে পাঠালেন। কিন্তু আমি তাঁর কাছে যাওয়ার পর কিছু না চেয়ে ওখানে বসে পড়লাম। তিনি আমার দিকে ফিরে তাকালেন এবং বললেন ঃ যে (অল্পতে) তুষ্টি লাভ করে আল্লাহ তার ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে দিবেন, যে ব্যক্তি বিনয়ী হবে আল্লাহ তাকে সজ্জন হিসাবে চিহ্নিত করবেন, যে ব্যক্তি তার কাছে যা আছে তাতেই খুশি থাকে আল্লাহ তার অভাব পূরণ করে দিবেন, যে ব্যক্তির সামান্য কিছু থাকা সত্ত্বেও মানুষের কাছে যাঞ্চা করে বেড়ায় আল্লাহ তার ভিক্ষাবৃত্তি দূর করবেননা। আবূ সাঈদ (রাঃ) বলেন, আমি মনে মনে বললাম ঃ আমার তো 'ইয়াকুতাহ' নামের একটি উষ্ট্রী রয়েছে যার মূল্য 'সামান্য কিছুর' চেয়ে অনেক বেশি, সুতরাং আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কোন কিছু না চেয়ে বরং সেখান থেকে চলে আসি। (আহমাদ ৩/৯, আবূ দাঊদ ২/২৭৯, নাসাঈ ৫/৯৫)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ তোমাদের সমস্ত দান সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা সম্যক অবগত রয়েছেন। যখন তোমরা সম্পূর্ণরূপে তাঁর মুখাপেক্ষী হয়ে যাবে তখন তিনি তোমাদেরকে পূর্ণ প্রতিদান দিবেন। তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন নেই।

কুরআনে দান-সাদাকাকারীকে প্রশংসা করা হয়েছে

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঐ সব লোকের প্রশংসা করছেন যারা আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর পথে খরচ করে। তাদেরকেও প্রতিদান দেয়া হবে এবং তারা যে কোন ভয় ও চিন্তা হতে নিরাপত্তা লাভ করবে। পরিবারের খরচ বহন করার কারণেও তাদেরকে প্রতিদান দেয়া হবে। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, মাক্কা বিজয়ের বছর এবং অন্য বর্ণনায় রয়েছে, বিদায় হাজ্জের বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাসকে (রাঃ) রোগাক্রান্ত অবস্থায় দেখতে গিয়ে বলেন ঃ

'তুমি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে যা খরচ করবে তিনি এর বিনিময়ে তোমার মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন, এমনকি তুমি স্বয়ং তোমার স্ত্রীকে যা খাওয়াবে তারও প্রতিদান তোমাকে দেয়া হবে।' (ফাতহুল বারী ৩/১৯৬, মুসলিম ৪/১২৫০) মুসনাদ আহমাদে রয়েছে ঃ যে মুসলিম সাওয়াব লাভের উদ্দেশে নিজের ছেলে-মেয়ের জন্য যা খরচ করে তাও সাদাকাহ। ইমাম বুখারী (রহঃ) ও মুসলিমও (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (আহমাদ ৪/১২২, ফাতহুল বারী ১/৫৫, মুসলিম ২/৬৯৫)

আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য লাভ করার উদ্দেশে যারা রাতে ও দিনে গোপনে ও প্রকাশ্যে নিজেদের ধন-সম্পদ থেকে ব্যয় করে, তাদের প্রভুর নিকট তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত হবেনা।

২৭৫। যারা সুদ ভক্ষণ করে তারা শাইতানের স্পর্শে মোহাভিভূত ব্যক্তির অনুরূপ কিয়ামাত দিনে দন্ডায়মান	٢٧٥. ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ

ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَـٰنُ مِنَ
ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا
ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ
ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ
عَادَ فَأُوْلَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ
هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ

হবে; এর কারণ এই যে, তারা বলে, ব্যবসা সুদের অনুরূপ বৈ তো নয়; অথচ আল্লাহ তা‘আলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন; অতঃপর যার নিকট তার রবের পক্ষ হতে উপদেশ সমাগত হয়, ফলে সে নিবৃত্ত হয়; সুতরাং যা অতীত হয়েছে তার কৃতকর্ম আল্লাহর উপর নির্ভর; এবং যারা পুনরায় সুদ গ্রহণ করবে তারাই হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানেই চিরকাল অবস্থান করবে।

সুদের সাথে জড়িতদের শাস্তিদান প্রসঙ্গ

এর পূর্বে ঐ লোকদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যারা সৎ, দাতা, যাকাত প্রদানকারী, অভাবগ্রস্ত ও আত্মীয়-স্বজনের দেখাশুনাকারী এবং সদা-সর্বদা তাদের উপকার সাধনকারী। এবার ঐসব লোকের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যারা সুদ খায়, দুনিয়া লোভী, অত্যাচারী এবং অপরের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণকারী। এখানে আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলা ঐ সব লোকদের বর্ণনা দিচ্ছেন যাদেরকে কিয়ামাত দিবসে কাবর থেকে পুর্নজীবন দিয়ে উত্থিত করা হবে এবং বিচারের জন্য সমবেত করা হবে। তিনি বলেন ঃ *‘যারা সুদ ভক্ষণ করে তারা শাইতানের স্পর্শে মোহাভিভূত ব্যক্তির ন্যায় কিয়ামাত দিবসে দন্ডায়মান হবে; এর কারণ এই যে, তারা বলে ঃ ব্যবসা সুদের অনুরূপ বৈ তো নয়।* ঐ সুদখোর লোকেরা তাদের কাবর থেকে অজ্ঞান অথবা পাগলের মত দিকভ্রান্ত হয়ে উত্থিত হবে। ইব্ন

আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ যারা সুদ ভক্ষণ করে তাদেরকে কিয়ামাত দিবসে শৃঙ্খলিত বন্দী হিসাবে কাবর থেকে তোলা হবে। (তাবারী ৬/৯) ইব্ন আবী হাতিমও (রহঃ) ইহা বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, আউফ ইব্ন মালিক (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং মুকাতিল ইব্ন হিব্বানও (রহঃ) অনুরূপ তাফসীর করেছেন। (ইব্ন আবী হাতিম ৩/১১৩০, ১১৩১) ইমাম বুখারী (রহঃ) সামুরা ইব্ন যুনদুব (রাঃ) থেকে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যখন আমি লাল রং বিশিষ্ট একটি নদীতে পৌঁছি যার পানি রক্তের মত লাল ছিল, তখন আমি দেখি যে, এক লোক অতি কষ্টে নদীর তীরে আসছে। কিন্তু তীরে একজন মালাক/ফেরেশতা বহু পাথর জমা করে বসে আছেন এবং তার পাশে আরও একজন মালাক রয়েছেন। নদীতে থাকা লোকটি সাতরে তীরের কাছে আসার সাথে সাথে একজন মালাক তার মুখ হা করে ধরছেন এবং অপর মালাক তার মুখে পাথর ভরে দিচ্ছেন। তখন সে ওখান থেকে পলায়ন করছে। অতঃপর পুনরায় এই রূপই হচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করে জানতে পারি যে, তার শাস্তির কারণ এই যে, সে সুদ খেত। (ফাতহুল বারী ৩/২৯৫) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا *এর কারণ এই যে, তারা বলে, ব্যবসা সুদের অনুরূপ বৈ তো নয়; অথচ আল্লাহ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।* এটা মনে রাখার বিষয় যে, তারা যে সুদকে ক্রয়-বিক্রয়ের উপর অনুমান করে করত তা নয়, কেননা মুশরিকরা পূর্ব হতেই ক্রয়-বিক্রয়কেও শারীয়াত সম্মত বলতনা। তাদেরকে উত্তর দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী ঐ বৈধতা ও অবৈধতা সাব্যস্ত হয়েছে। এও সম্ভাবনা রয়েছে যে, এটা কাফিরদেরই উক্তি। তাহলে সূক্ষ্মতার সাথে একটি উত্তরও হয়ে যাচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা একটিকে হারাম করেছেন এবং অপরটিকে হালাল করেছেন এই জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও প্রতিবাদ কিসের? 'সর্বজ্ঞাতা ও মহাবিজ্ঞানময় আল্লাহর নির্দেশের উপর প্রতিবাদ উত্থাপন করার তোমরা কে? তাঁর কাজের বিচার বিশ্লেষণ করার কার অধিকার রয়েছে? সমস্ত কাজের মূল তত্ত্ব তাঁরই জানা রয়েছে। তাঁর বান্দাদের জন্য প্রকৃত উপকার কোন্ জিনিসে রয়েছে এবং প্রকৃত ক্ষতি কোন বস্তুতে রয়েছে সেটাতো তিনিই ভাল জানেন। তিনি উপকারী বস্তু হালাল করেন এবং ক্ষতিকর বস্তু হারাম করেন।

মা তার দুগ্ধপায়ী শিশুর উপর ততো করুণাময়ী হতে পারেনা যতটা করুণাময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের উপর। তিনি যা হতে নিষেধ করেন তার মধ্যে মঙ্গল নিহিত রয়েছে এবং যা করতে আদেশ করেন তার মধ্যেও মঙ্গল রয়েছে। তারপর বলা হচ্ছে, 'আল্লাহ তা'আলার উপদেশ শ্রবণের পর যে ব্যক্তি সুদ গ্রহণ করা হতে বিরত থাকে তার পূর্বের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ

(সে) অতীত (ত্রুটি) আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৯৫) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন মাক্কা বিজয়ের দিন বলেছিলেন ঃ

'অজ্ঞতাপূর্ণ যুগের সমস্ত সুদ আমার পদদ্বয়ের নীচে ধ্বংস হয়ে গেল। সর্বপ্রথম সুদ যা আমি মিটিয়ে দিচ্ছি তা হচ্ছে আব্বাসের (রাঃ) সুদ।' (আবূ দাঊদ ৩/৬২৮) সুতরাং অন্ধকার যুগে যেসব সুদ গ্রহণ করা হয়েছিল সেগুলো ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়নি। বলা হয়েছে ঃ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّٰه *সুতরাং যা অতীত হয়েছে তার কৃতকর্ম আল্লাহর উপর নির্ভর।* অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـــئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ সুদের নিষিদ্ধতা তার কর্ণকুহরে প্রবেশ করার পরেও যদি সে সুদ গ্রহণ পরিত্যাগ না করে তাহলে সে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। চিরকাল সে জাহান্নামে অবস্থান করবে। ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) যাবির (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, যখন *'যারা সুদ ভক্ষণ করে তারা শাইতানের স্পর্শে মোহাভিভূত ব্যক্তির অনুরূপ কিয়ামাত দিবসে দন্ডায়মান হবে'* নাযিল হয় তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

'যে ব্যক্তি এখন সুদ পরিত্যাগ করলনা, সে যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। (আবূ দাঊদ ৩/৬৯৫, হাকিম ২/২৮৫)

مُخَابِرَة শব্দের অর্থ এই যে, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির ভূমিতে শস্যের বীজ বপন করল এবং চুক্তি করল ভূমির এই অংশে যা উৎপন্ন হবে তা আমার এবং অবশিষ্ট তোমার।' مُزَابَنَة শব্দের অর্থ এই যে, একটি লোক অপর একটি লোককে বলে ঃ 'তোমার এই গাছে যা খেজুর রয়েছে তা আমার এবং এর বিনিময়ে আমি তোমাকে এই পরিমাণ খেজুর প্রদান করব।'' مُحَاقَلَة শব্দের অর্থ হচ্ছে এই যে, এক ব্যক্তি

অপর এক ব্যক্তিকে বলে ঃ 'তোমার শস্য ক্ষেত্রে যে শস্য রয়েছে তা আমি ক্রয় করছি এবং ওর বিনিময়ে আমার নিকট হতে কিছু শস্য তোমাকে প্রদান করছি।' ক্রয়-বিক্রয়ের এই পদ্ধতিগুলিকে শারীয়াতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে যেন সুদের মূল কর্তিত হয়। এগুলো নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ বর্ণনায় আলেমদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। কেহ বলেছেন এক রকম এবং কেহ বলেছেন অন্য রকম। বিশ্বাসীদের নেতা দ্বিতীয় খলিফা উমার ইব্ন খাত্তাবের (রাঃ) একটি বক্তব্য এখানে তুলে ধরা প্রয়োজন মনে করছি। তিনি বলেছেন ঃ আমার খুবই আশা ছিল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনটি বিষয় আমাদের কাছে পরিস্কারভাবে জানিয়ে দিবেন যাতে ঐ বিষয়সমূহে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি। তা হল (১) দাদার উত্তরাধিকার (তার নাতী-নাতনীদের সম্পদ থেকে), (২) 'কালালাহ'দের (যে মৃত ব্যক্তি সন্তান অথবা মাতা-পিতা রেখে যায়নি) উত্তরাধিকার এবং (৩) বিভিন্ন সুদের ফাইসালা সংক্রান্ত বিষয়। (ফাতহুল বারী ১০/৪৮, মুসলিম ৪/২৩২২) উমার (রাঃ) ঐ সমস্ত লেন-দেনের কথা উল্লেখ করতে চেয়েছেন যে বিষয়ে পরিস্কারভাবে বলা হয়নি যে, তা সুদ বলে গন্য হবে, কি হবেনা। শারীয়াত বর্ণনা করছে, যে বিষয়টি নিষিদ্ধ করা হয়েছে তার সাথে যদি হালাল কোন কিছু যোগ করা হয় তাহলে তাও নিষিদ্ধ বা হারাম বলে গন্য হবে। কারণ হারাম কাজের সাথে মিশ্রিত হওয়ার ফলে হালাল জিনিসও আর হালাল থাকেনা। অনুরূপভাবে কোন কিছু করার জন্য যদি বাধ্য-বাধকতা থাকে এবং ঐ কাজের সাথে যদি কোন কিছু যোগ করা ছাড়া সম্পূর্ণ করা না যায় তাহলে ঐ জিনিসটিও বাধ্য-বাধকতার আওতায় আসবে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'হালালও স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। কিন্তু এর মধ্যে কতকগুলো জিনিস সন্দেহযুক্ত রয়েছে। এগুলো হতে দূরে অবস্থানকারীগণ নিজেদের ধর্ম ও সম্মান বাঁচালো। ঐ সন্দেহযুক্ত জিনিসগুলোর মধ্যে পতিত ব্যক্তিরাই হচ্ছে হারামের মধ্যে পতিত ব্যক্তি। যেমন কোন রাখাল কোন এক ব্যক্তির রক্ষিত চারণ ভূমির আশে পাশে তার পশুপাল চরিয়ে থাকে। সেখানে এই সম্ভাবনাও রয়েছে যে, ঐ পশুপাল ঐ ব্যক্তির চারণ ভূমিতে ঢুকে পড়বে।' (ফাতহুল বারী ১/১৫৩, মুসলিম ৩/১২১৯) সুনানে হাসান ইব্ন আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যে জিনিস তোমাকে সন্দেহের মধ্যে নিক্ষেপ করে তা ছেড়ে দাও এবং যা পবিত্র তা গ্রহণ কর। (তিরমিযী ৭/২২১, নাসাঈ ৮/৩২৮) উমার (রাঃ) বলতেন

ঃ 'বড়ই আফসোস যে, আমি সুদের তাফসীর পূর্ণভাবে অনুধাবন করতে পারিনি এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ করলেন। হে জনমণ্ডলী! তোমরা সুদ গ্রহণ পরিত্যাগ কর এবং প্রত্যেকে ঐ জিনিস পরিত্যাগ কর যার মধ্যে সামান্যতম সন্দেহ রয়েছে। (আহমাদ ১/৩৬, ইব্ন মাজাহ ২২৭৬)

একটি হাদীসে রয়েছে যে, সুদের সত্তরটি পাপ রয়েছে। সবচেয়ে হালকা পাপ হচ্ছে মায়ের সাথে ব্যভিচার করা। (ইব্ন মাজাহ ২/৭৬৪, হাকিম ২/৩৭) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'এমন যুগ আসবে যে, মানুষ সুদ গ্রহণ করবে।' সাহাবীগণ (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ 'সবাই কি সুদ গ্রহণ করবে? তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'যে গ্রহণ করবেনা তার কাছেও তার ধূলি পৌঁছবে।' (আহমাদ) এই ধূলি হতে বাঁচার উদ্দেশে ঐ কারণগুলোর পাশেও যাওয়া উচিত নয় যেগুলো হারামের দিকে নিয়ে যায়।

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন সূরা বাকারাহর শেষ আয়াতটি সুদের নিষিদ্ধতার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদে এসে তা পাঠ করেন এবং সুদের ব্যবসা হারাম ঘোষণা করেন। (আহমাদ ৬/৪৬) এ ছাড়া ছয়টি হাদীস গ্রন্থের তিরমিযী বাদে অন্যান্য গ্রন্থে এটি বর্ণনা করা হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৫১, মুসলিম ৩/১২০৬, আবূ দাঊদ ৩/৭৫৯, নাসাঈ ৬/৩০৬, ইব্ন মাজাহ ২/১০২২) অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'ইয়াহুদীদেরকে আল্লাহ তা'আলা অভিশপ্ত করেছেন; কেননা যখন তাদের উপর চর্বি হারাম করা হয় তখন তারা কৌশল অবলম্বন করে ঐগুলো গলিয়ে বিক্রি করে এবং মূল্য গ্রহণ করে।' (ফাতহুল বারী ৬/৫৭২, মুসলিম ১২০৭) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'সুদ গ্রহণকারী, প্রদানকারী, সাক্ষ্য দানকারী এবং লিখকদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ।' (মুসলিম ৩/১২১৯)

তাহলে এটা স্পষ্ট কথা যে, সুদের লেখক ও সুদের সাক্ষ্যদাতাদের অযথা আল্লাহ তা'আলার অভিশাপ স্কন্ধে বহন করার কি প্রয়োজন? ভাবার্থ এই যে, শারীয়াতের বন্ধনে এনে কৌশল অবলম্বন করে তারা ঐ সুদের লিখা-পড়া করে, এ জন্য তারাও অভিশপ্ত।

২৭৬। আল্লাহ সুদকে ক্ষয় করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন, বস্তুতঃ আল্লাহ অতি	٢٧٦. يَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ

وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَٰتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ	কৃতঘ্ন পাপাচারীদেরকে ভালবাসেননা।
٢٧٧. إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ	২৭৭। নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে এবং সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করে, সালাতকে প্রতিষ্ঠিত রাখে ও যাকাত প্রদান করে, তাদের জন্য তাদের রবের নিকট পুরস্কার রয়েছে; এবং তাদের কোনো আশংকা নেই এবং তারা দুঃখিত হবেনা।

সুদের মধ্যে আল্লাহর বারাকাত নেই

আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, তিনি সুদকে সমূলে ধ্বংস করেন। অর্থাৎ হয় ওটাকেই সরাসরি নষ্ট করেন, না হয় ওর বারাকাত নষ্ট করেন। দুনিয়ায়ও ওটা ধ্বংসের কারণ হয় এবং পরকালেও শাস্তির কারণ হয়। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

قُل لَّا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ

তুমি বলে দাও ঃ পবিত্র ও অপবিত্র সমান নয়, যদিও অপবিত্রের আধিক্য তোমাকে চমৎকৃত করে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১০০) অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ

আর কু-জনদের সকলকে একজনের উপর অপর জনকে স্তূপীকৃত করবেন এবং অতঃপর জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৩৭) অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ

মানুষের ধন সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, এ আশায় সুদে যা কিছু তোমরা দিয়ে থাক, আল্লাহর দৃষ্টিতে তা বৃদ্ধি পায়না। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৩৯) এ জন্যই আবদুল্লাহ

ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, সুদ বেশি হলেও প্রকৃতপক্ষে তা কমেই যায়। (আহমাদ ১/৩৯৫, তাবারী ৬/১৫) মুসনাদ আহমাদে অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, আমীরুল মু'মিনীন উমার (রাঃ) বলেন ঃ 'জেনে রেখ! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে শুনেছি ঃ 'যে ব্যক্তি মুসলিমদের মধ্যে উচ্চ মূল্যে বিক্রি করার উদ্দেশে খাদ্য শস্য জমা করে রাখে, তাকে আল্লাহ দরিদ্র করে দিবেন অথবা কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত করবেন।' সুনান ইব্ন মাজাহয় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি মুসলিমদের মধ্যে উচ্চ মূল্যের উদ্দেশে খাদ্য শস্য বিক্রি বন্ধ করে রাখে, আল্লাহ তাকে দরিদ্র করবেন অথবা কুষ্ঠ রোগী করবেন।'

আল্লাহ দান-সাদাকাহকে বৃদ্ধি করেন

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ তিনি দানকে বৃদ্ধি করেন। সহীহ বুখারীতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যে ব্যক্তি তার হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুরও দান করে, আল্লাহ তা ডান হাতে গ্রহণ করেন, অতঃপর তিনি তা বর্ধিত করতে থাকেন যেমন তোমরা তোমাদের পশু লালন পালন করে থাক এবং এমন কি তিনি ওর সাওয়াব বড় পাহাড় সমান করে দেন। (ফাতহুল বারী ৩/৩২৬, ১৩/৪২৬, মুসলিম ২/৭০২)

অবিশ্বাসী পাপীদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেননা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاللّٰهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ আল্লাহ অবিশ্বাসী পাপাচারীদেরকে ভালবাসেননা। ভাবার্থ এই যে, যারা দান-খাইরাত করেনা, আল্লাহ তা'আলার বেশি দেয়ার প্রতিশ্রুতির উপর আস্থা রেখে ধৈর্য ধারণ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে দুনিয়ায় সম্পদ জমা করতে থাকে, জঘন্য ও শারীয়াত পরিপন্থী উপায়ে উপার্জন করে এবং বাতিল ও অন্যায়ভাবে জনগণের মাল ভক্ষণ করে তারা আল্লাহ তা'আলার শত্রু। এই কৃতঘ্ন ও পাপীদের প্রতি মহান আল্লাহর দয়া-ভালবাসা নেই।

আল্লাহ শোকর আদায়কারীর প্রশংসা করেন

অতঃপর যারা আল্লাহ তা'আলার রাবুবিয়াতে ঈমান আনে, তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলে, সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করে, আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, আল্লাহ তাদের প্রশংসা করেছেন। তারা সালাত আদায় করে, যাকাত প্রদান করে এবং গরীব আত্মীয়-স্বজনদের হক

আদায় করে। তাদের জন্য কিয়ামাত দিবসে আল্লাহর কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার ও সম্মান এবং তারা অত্যাচারিত হবেনা। তাদের কোন ভয় ও চিন্তা থাকবেনা।

২৭৮। হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং যদি তোমরা মু'মিন হও তাহলে সুদের মধ্যে যা অবশিষ্ট রয়েছে তা বর্জন কর।	٢٧٨. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ
২৭৯। কিন্তু যদি না কর তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। আর যদি তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর তাহলে তোমাদের মূলধন পেয়ে যাবে, তোমরা অত্যাচার করবেনা এবং তোমরাও অত্যাচারিত হবেনা।	٢٧٩. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ
২৮০। আর যদি সে অভাবগ্রস্ত হয় তাহলে স্বচ্ছলতার প্রতীক্ষা করবে এবং যদি তোমরা বুঝে থাক তাহলে তোমাদের জন্য দান করাই উত্তম।	٢٨٠. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
২৮১। আর তোমরা সেই দিনের ভয় কর যেদিন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে, তখন যে যা অর্জন করেছে তা সম্পূর্ণ	٢٨١. وَٱتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ

রূপে প্রদত্ত হবে এবং তারা অত্যাচারিত হবেনা।	مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

আল্লাহভীরুতা অর্জন এবং সুদ পরিহার করা

আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঈমানদার বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন তাঁকে ভয় করে ও ঐ কার্যাবলী হতে বিরত থাকে যেসব কাজে তিনি অসন্তুষ্ট। তাই তিনি বলেন ঃ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ হে মু'মিনগণ! তোমরা সাবধান থেক, প্রতিটি কাজে আল্লাহকে ভয় করে চল এবং মুসলিমদের উপর তোমাদের যে সুদ অবশিষ্ট রয়েছে, সাবধান! যদি তোমরা মুসলিম হও তাহলে তা নিবেনা! কেননা এখন তা হারাম হয়ে গেছে।

যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ), ইব্ন যুরাইয (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতটি সাকিফ গোত্রের উপগোত্র আমর ইব্ন উমায়ির এবং মাখজুম গোত্রের বানী মুগীরাহর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তাদের উভয় গোত্রের মধ্যে জাহিলিয়াত জামানা থেকে সুদের লেন-দেন চলে আসছিল। উভয় গোত্রের লোকেরা যখন ইসলাম কবূল করে তখন মুগীরাহ গোত্রের লোকদের কাছে সাকিফ গোত্রের লোকদের সুদ বাবদ টাকা পাওনা ছিল। মুগীরাহ গোত্রের লোকদের কাছে সুদের টাকা চাইতে গেলে তারা সাকিফ গোত্রের লোকদেরকে বলে ঃ ইসলাম কবূল করার পর আমরা আর সুদ প্রদান করতে পারিনা। অবশেষে তাদের মাঝে ঝগড়া বেঁধে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাক্কার প্রতিনিধি আত্তাব ইব্ন উসাইদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ ব্যাপারে জানতে চেয়ে একটি চিঠি লিখেন।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা লিখে পাঠিয়ে দেন এবং তাদের জন্য সুদ গ্রহণ অবৈধ ঘোষণা করেন। ফলে বানু আমর তাওবাহ করে তাদের সুদ সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দেয়। এই আয়াতে ঐ লোকদের ভীষণভাবে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে যারা সুদের অবৈধতা জানা সত্ত্বেও ওর উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

সুদের অপর নাম আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাঃ) সাথে যুদ্ধ করা

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِه এ আয়াতের ব্যাপারে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ ‘কিয়ামাতের দিন সুদখোরকে বলা হবে, ‘তোমরা অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও।’ (তাবারী ৬/২৬) তিনি বলেন ঃ ‘যে সময়ে যিনি ইমাম থাকবেন তার জন্য এটা অবশ্য কর্তব্য যে, যারা সুদ পরিত্যাগ করবেনা তাদেরকে তাওবাহ করাবেন। যদি তারা তাওবাহ না করে তাহলে তিনি তাদেরকে হত্যা করবেন।’ (তাবারী ৬/২৫) হাসান বাসরী (রহঃ) ও ইব্ন সীরীনেরও (রহঃ) এটাই উক্তি। অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ যদি তাওবাহ কর তাহলে তোমার আসল মাল যার নিকট রয়েছে তা তুমি অবশ্যই আদায় করবে। আরও বলা হয়েছে وَلاَ تُظْلَمُونَ বেশি নিয়ে তুমিও তার উপর অত্যাচার করবেনা এবং সেও তোমাকে কম দিয়ে অথবা মূলধন না দিয়ে তোমার উপর অত্যাচার করবেনা। বিদায় হাজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

‘অজ্ঞতার যুগের সমস্ত সুদ আমি ধ্বংস করে দিলাম। মূল সম্পদ গ্রহণ কর। বেশি নিয়ে তোমরা কারও উপর অত্যাচার করবেনা এবং কেহই তোমাদের মাল আত্মসাৎ করে তোমাদের উপরও অত্যাচার করবেনা। আমি প্রথমেই যার সুদ বাতিল ঘোষণা করছি তা হচ্ছে আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিবের (রাঃ) পাওনা সমস্ত সুদ।’ (ইবন আবী হাতিম ৩/১১৪৭)

আর্থিক অনটনে জর্জরিত দেনাদারের প্রতি দয়ার্দ্র থাকা

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ যদি কোন অস্বচ্ছল ব্যক্তির নিকট তোমার প্রাপ্য থাকে এবং সে তা পরিশোধ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করে তাহলে তাকে কিছুদিন অবকাশ দাও যে, সে আরও কিছুদিন পর তোমাকে তোমার প্রাপ্য পরিশোধ করবে। সাবধান! দ্বিগুণ-ত্রিগুণ হারে সুদ বৃদ্ধি করবেনা। বরং ঐ সব দরিদ্রের ঋণ ক্ষমা করে দেয়াই মহত্তম কাজ। তাবারানীর (রহঃ) হাদীসে রয়েছে, যে ব্যক্তি কিয়ামাতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়া লাভ কামনা করে সে যেন এই

প্রকারের দরিদ্রদেরকে অবকাশ দেয় বা ঋণ সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করে দেয়। মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, যে ব্যক্তি কোন দরিদ্র লোকের উপর স্বীয় প্রাপ্য আদায়ের ব্যাপারে নম্রতা প্রকাশ করে এবং তাকে অবকাশ দেয়; অতঃপর যতদিন পর্যন্ত সে তার কাছে প্রাপ্য পরিশোধ করতে না পারবে ততদিন পর্যন্ত সে প্রতিদিন সেই পরিমাণ দান করার সাওয়াব পেতে থাকবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'সে প্রতিদিন ওর দ্বিগুণ পরিমাণ দানের সাওয়াব পেতে থাকবে।' এ কথা শুনে বুরাইদা (রাঃ) বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! পূর্বে আপনি ঐ পরিমাণ দানের সাওয়াব প্রাপ্তির কথা বলেছিলেন। আর এখন ওর দ্বিগুণ পরিমাণ সাওয়াব প্রাপ্তির কথা বললেন?' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'হ্যাঁ, যে পর্যন্ত মেয়াদ অতিক্রান্ত না হবে সেই পর্যন্ত ওর সমপরিমাণ দানের সাওয়াব লাভ করবে, এবং যখন মেয়াদ অতিক্রান্ত হয়ে যাবে তখন ওর দ্বিগুণ পরিমাণ দানের সাওয়াব লাভ করবে।' (আহমাদ ৫/৩৬০) ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, মুহাম্মাদ ইব্ন কাব আল-কারাযী (রহঃ) বলেছেন যে, এক লোকের কাছে আবূ কাতাদাহর (রাঃ) কিছু টাকা পাওনা ছিল। তিনি ঐ ঋণ আদায়ের তাগাদায় তার বাড়ী যেতেন; কিন্তু সে লুকিয়ে থাকত এবং তার সাথে দেখা করতনা। একদা তিনি তার বাড়ী এলে একটি ছেলে বেরিয়ে আসে। তিনি তাকে তার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেন। সে বলে ঃ 'হ্যাঁ, তিনি বাড়ীতেই আছেন এবং খাবার খাচ্ছেন।' তখন আবূ কাতাদাহ (রাঃ) তাকে উচ্চস্বরে ডাক দিয়ে বলেন ঃ 'আমি জেনেছি যে, তুমি বাড়ীতেই আছ; সুতরাং বাইরে এসো এবং উত্তর দাও। ঐ বেচারা বাইরে এলে তিনি তাকে বললেন ঃ 'লুকিয়ে থাকছ কেন?' লোকটি বলল ঃ 'জনাব! প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আমি একজন দরিদ্র লোক। এখন আমার নিকট আপনার ঋণ পরিশোধ করার মত অর্থ নেই। তাই, লজ্জায় আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারিনা।' তিনি বলেন ঃ 'শপথ কর।' সে শপথ করল। এ দেখে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন এবং বললেন ঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে শুনেছি ঃ 'যে ব্যক্তি দরিদ্র ঋণগ্রস্তকে অবকাশ দেয় কিংবা তার ঋণ ক্ষমা করে দেয় সে কিয়ামাতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়ার নীচে থাকবে।' (মুসলিম ৪/২০৮৪, আহমাদ ৫/৩০৮)

আবূ ইয়ালা (রহঃ) বর্ণনা করেন, হুযাইফা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন একটি লোককে আল্লাহ তা'আলার সামনে আনা হবে। তাকে আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করবেন ঃ

'বল, তুমি আমার জন্য কি সাওয়াব কামাই করেছ?' সে বলবে ঃ 'হে আল্লাহ! আমি এমন একটি অণু পরিমাণ সাওয়াবেরও কাজ করতে পারিনি যার প্রতিদান আমি আপনার নিকট যাঞ্চা করতে পারি।' আল্লাহ তা'আলা তাকে পুনরায় এটাই জিজ্ঞেস করবেন এবং সে একই উত্তরই দিবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আবার জিজ্ঞেস করবেন। এবার লোকটি বলবে ঃ হে আল্লাহ! একটি সামান্য কথা মনে পড়েছে। আপনি দয়া করে কিছু মালও আমাকে দিয়েছিলেন। আমি ব্যবসায়ী লোক ছিলাম। লোকেরা আমার নিকট হতে ধার কর্জ নিত। আমি যখন দেখতাম যে, এই লোকটি দরিদ্র এবং পরিশোধের নির্ধারিত সময়ে সে কর্জ পরিশোধ করতে পারছেনা তখন আমি তাকে আরও কিছুদিন অবকাশ দিতাম। ধনীদের উপরও পীড়াপীড়ি করতামনা। অত্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তিকে ক্ষমাও করে দিতাম।' তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ তাহলে আমি তোমার পথ সহজ করবনা কেন? আমি তো সর্বাপেক্ষা বেশি সহজকারী। যাও আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। তুমি জান্নাতে চলে যাও।' (ফাতহুল বারী ৬/৫৭০, মুসলিম ৩/১১৯৫, ইব্ন মাজাহ ২/৮০৮)

وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন এবং তাদেরকে দুনিয়ার লয় ও ক্ষয়, মালের ধ্বংসশীলতা, পরকালের আগমন, আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন, আল্লাহ তা'আলাকে নিজেদের কাজের হিসাব প্রদান এবং সমস্ত কাজের প্রতিদান প্রাপ্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন ও তাঁর শাস্তি হতে ভয় প্রদর্শন করছেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে এও বর্ণিত আছে যে, কুরআনুল হাকীমের এটাই সর্বশেষ আয়াত। (নাসাঈ ৬/৩০৭, তাবারী ৬/৪০)

ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) একটি বর্ণনায় এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একত্রিশ দিন জীবিত থাকার কথাও বর্ণিত হয়েছে। ইব্ন জুরাইজ (রহঃ) বলেন ঃ পূর্ববর্তী মনীষীদের উক্তি এই যে, এর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নয় দিন জীবিত ছিলেন। শনিবার হতে আরম্ভ হয় এবং তিনি সোমবারে ইন্তেকাল করেন। মোট কথা, কুরআন মাজীদে সর্বশেষ এই আয়াতটিই অবতীর্ণ হয়।

٢٨٢. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟
إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ
مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب
بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا
يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ
ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ
وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ فَإِن كَانَ
ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ
ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ
هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ ۚ
وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن
رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ

২৮২। হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা যখন কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের আদান প্রদান করবে তখন তা লিখে নিবে; আর কোন একজন লেখক যেন ন্যায্যভাবে তোমাদের মধ্যে (ঐ আদান প্রদানের দলীল) লিখে দেয়, আর কোন লেখক যেন (দলীল) লিখে দিতে অস্বীকার না করে, আল্লাহ তাকে যেরূপ শিক্ষা দিয়েছেন, তার উচিত তা লিখে দেয়া, এবং ঋণ গ্রহিতা যেন লিখার বিষয় বলে দেয় এবং তার উচিত স্বীয় রাব্ব আল্লাহকে ভয় করা এবং ওর মধ্যে কিছুমাত্র ব্যতিক্রম না করা; অতঃপর ঋণ গ্রহীতা যদি নির্বোধ বা অযোগ্য অথবা লিখিয়ে নিতে অসমর্থ হয় তাহলে তার অভিভাবকরা ন্যায় সঙ্গতভাবে লিখিয়ে নিবে এবং তোমাদের মধ্যে দু'জন পুরুষ সাক্ষীকে সাক্ষী করবে; কিন্তু যদি দু'জন পুরুষ না পাওয়া যায় তাহলে সাক্ষীগণের মধ্যে তোমরা একজন পুরুষ ও দু'জন নারী

مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ

মনোনীত করবে, যদি নারীদ্বয়ের একজন ভুলে যায় তাহলে একজন অপর জনকে স্মরণ করিয়ে দিবে; এবং যখন আহ্বান করা হয় তখন সাক্ষীগণের অস্বীকার না করা উচিত, এবং ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ বিষয়ের নির্দিষ্ট সময় লিখে দিতে তোমরা অবহেলা করনা, এটা আল্লাহর নিকট অতি সঙ্গত এবং সাক্ষ্যের জন্য এটাই দৃঢ়তর ও সন্দেহে পতিত না হওয়ার নিকটতর; কিন্তু যদি তোমরা কারবারে পরস্পর হাতে হাতে আদান প্রদান কর তাহলে তা লিপিবদ্ধ না করলে তোমাদের পক্ষে দোষ নেই; কিন্তু বাণিজ্যিক লেনদেনের জন্য সাক্ষী রেখ, যেন লেখক কিংবা সাক্ষী ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। যদি এরূপ কর (ক্ষতিগ্রস্ত) তাহলে তা তোমাদের পক্ষে পাপের বিষয়। আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহই তোমাদেরকে শিক্ষা প্রদান করেন এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

লিখিত লেন-দেনে পরবর্তী সময়ে উপকার রয়েছে

কুরআনুল হাকীমে এই আয়াতটি সবচেয়ে বড় আয়াত। সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (রহঃ) বলেন ঃ 'আমার নিকট বর্ণিত হয়েছে যে, আরশ থেকে কুরআন মাজীদের জন্য সর্বশেষ যে আয়াত নাযিল হয়েছে তা হল ঋণের এই আয়াতটি। (তাবারী ৬/৪১) এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঈমানদার বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ তারা যেন আদান-প্রদান লিখে রাখে, তাহলে ঋণের পরিমাণ ও নির্ধারিত সময়ের ব্যাপারে কোন গণ্ডগোল সৃষ্টি হবেনা। এতে সাক্ষীরাও ভুল করবেনা। এর দ্বারা ঋণের জন্য একটি সময় নির্ধারিত করার বৈধতাও সাব্যস্ত হচ্ছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মাদীনায় আসেন তখন এখানকার লোকদের মধ্যে এই রীতি ছিল যে, এক কিংবা দুই বছর আগেই তারা তাদের গাছের ফলের মূল্য বাবদ অগ্রীম টাকা নিয়ে নিত। তাদের এ ধরনের লেন-দেন দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমরা যারা অগ্রীম টাকা (খেজুর বিক্রি বাবদ) নিতে চাও তারা নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখসহ ওযন বা পরিমাপের কথা উল্লেখ করে নিবে। (ফাতহুল বারী ৪/১০৫, মুসলিম ৩/১২২৬) কুরআনুল কারীমে নির্দেশ হচ্ছে, 'তোমরা লিখে রাখ।' ইব্ন জুরাইজ (রহঃ) বলেছেন, যে ধার দিবে সে লিখে রাখবে এবং যে বিক্রি করবে সে সাক্ষী রাখবে। আবূ সাঈদ (রহঃ), শা'বী (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), ইব্ন জুরাইজ (রহঃ), ইব্ন যায়িদ (রহঃ) প্রমুখের উক্তি এই যে, এভাবে লিখে রাখার কাজটি প্রথমে অবশ্য করণীয় কাজ ছিল। কিন্তু পরে তা রহিত হয়ে যায়। পরে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ যদি তোমাদের একের অপরের প্রতি আস্থা থাকে তাহলে যার নিকট তার আমানাত রাখা হবে তা যেন সে আদায় করে দেয়। (২ ঃ ২৮৩) (তাবারী ৬/৪৭, ৪৯, ৫০) ওর দলীল হচ্ছে নিম্নের হাদীসটি। এই ঘটনাটি পূর্ব যুগীয় উম্মাতের হলেও তাদের শারীয়াতই আমাদের শারীয়াত, যদি আমাদের শারীয়াত তা অস্বীকার না করে। যে ঘটনা আমরা এখন বর্ণনা করতে যাচ্ছি তাতে লিখা-পড়া না হওয়া এবং সাক্ষী ঠিক না রাখাকে আইন রচয়িতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অস্বীকার করেননি। মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

বানী ইসরাঈলের এক লোক অন্য এক লোকের কাছে এক হাজার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) ধার চায়। সে বলে ঃ 'সাক্ষী আন।' সে উত্তর দেয় ঃ 'আল্লাহ তা'আলাই আমার সাক্ষী।' সে বলে ঃ 'জামানত আন।' সে উত্তরে বলে ঃ 'আল্লাহ তা'আলার জামানতই যথেষ্ট।' তখন ঋণদাতা লোকটিকে বলে ঃ 'তুমি সত্যই বলছ।' অতঃপর ঋণ আদায়ের সময় নির্ধারিত হয় এবং সে তাকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা গুনে দেয়। এরপর ঋণ গ্রহীতা লোকটি সামুদ্রিক ভ্রমণে বের হয় এবং নিজের কাজ হতে অবকাশ লাভ করে। ঋণ পরিশোধের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার সময় নিকটবর্তী হলে সে সমুদ্রের তীরে আগমন করে। তার ইচ্ছা এই যে, কোন জাহাজ এলে তাতে উঠে বাড়ী চলে আসবে এবং ঐ লোকটির ঋণ পরিশোধ করে দিবে। কিন্তু সে কোন জাহাজ পেলনা। যখন সে দেখল যে, সে সময় মত পৌঁছতে পারবেনা। তখন সে একখানা কাঠ নিয়ে খোদাই করল এবং তাতে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা রেখে দিল এবং এক টুকরো কাগজও রাখল। অতঃপর ওর মুখ বন্ধ করে দিল এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করল, হে প্রভু! আপনি খুব ভাল জানেন যে, আমি অমুক ব্যক্তির নিকট এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা ধার করেছি। সে আমার নিকট জামানত চাইলে আমি আপনাকেই জামিন দেই এবং তাতে সে সন্তুষ্ট হয়ে যায়। সে সাক্ষী উপস্থিত করতে বললে আমি আপনাকেই সাক্ষী রাখি। সে তাতেও সন্তুষ্ট হয়ে যায়। এখন সময় শেষ হতে চলেছে, আমি সদা নৌযান অনুসন্ধান করতে থাকছি যে নৌযানে চড়ে বাড়ী গিয়ে কর্জ পরিশোধ করব। কিন্তু কোন নৌযান পাওয়া যাচ্ছেনা। এখন আমি সেই পরিমান মুদ্রা আপনাকেই সমর্পণ করছি এবং সমুদ্রে নিক্ষেপ করছি ও প্রার্থনা করছি যেন আপনি এই মুদ্রা তার নিকট পৌঁছে দেন।' অতঃপর সে ঐ কাঠটি সমুদ্রে নিক্ষেপ করে এবং নিজ অবস্থান স্থলে চলে আসে। কিন্তু তবুও সে নৌযানের খোঁজে রতই থাকে যাতে নৌযান পেলে সে চলে যাবে। এখানে তো এই অবস্থার উদ্ভব হল। আর ওখানে যে ব্যক্তি তাকে ঋণ দিয়েছিল সে যখন দেখল যে, ঋণ পরিশোধের সময় হয়ে গেছে এবং আজ তার যাওয়া উচিত। অতএব সেও সমুদ্রের তীরে গেল যে, হয়ত ঐ ঋণ গ্রহীতা ফিরে আসবে এবং তার ঋণ পরিশোধ করবে কিংবা কারও হাতে পাঠিয়ে দিবে। কিন্তু যখন সন্ধ্যা হয়ে গেল এবং সে এলোনা তখন সে ফিরে আসার মনঃস্থ করল। সমুদ্রের ধারে একটি কাঠ দেখে মনে করল, বাড়ী তো খালি হাতেই যাচ্ছি, কাঠটি নিয়ে যাই। একে ফেড়ে শুকিয়ে জ্বালানি কাঠ রূপে ব্যবহার করা যাবে। বাড়ী পৌঁছে কাঠটিকে ফাড়া মাত্রই ঝন ঝন করে বেজে উঠে স্বর্ণমুদ্রা বেরিয়ে আসে। গণনা করে দেখে যে, পূরা এক হাজারই রয়েছে। তার কাগজ

খণ্ডের উপর দৃষ্টি পড়ে। ওটা উঠিয়ে পড়ে নেয়। অতঃপর একদিন ঐ লোকটিই এসে এক হাজার দীনার পেশ করে বলে, 'আপনার প্রাপ্য মুদ্রা গ্রহণ করুন এবং আমাকে ক্ষমা করুন। আমি অঙ্গীকার ভঙ্গ না করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু নৌযান না পাওয়ার কারণে বিলম্ব করতে বাধ্য হয়েছি। আজ নৌযান পাওয়ায় মুদ্রা নিয়ে আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছি।' তখন ঐ ঋণ দাতা লোকটি বলে 'আপনি আমার প্রাপ্য পাঠিয়েও দিয়েছিলেন কি? সে বলে, 'আমি তো বলেই দিয়েছি যে, আমি নৌকা পাইনি।' সে বলে, 'আপনি আপনার অর্থ নিয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরে যান। আপনি মহান আল্লাহর উপর নির্ভর করে কাঠের মধ্যে ভরে যে মুদ্রা নদীতে ফেলে দিয়েছিলেন তা আল্লাহ আমার নিকট পৌঁছে দিয়েছেন এবং আমি আমার পূর্ণ প্রাপ্য পেয়েছি।' এই হাদীসের সনদ সম্পূর্ণ সঠিক। সহীহ বুখারীতে সাত জায়গায় এই হাদীসটি এসেছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ লেখক যেন ন্যায় ও সত্যের সঙ্গে লিখে। লিখার ব্যাপারে যেন কোন দলের উপর অত্যাচার না করে, এদিক ওদিক কিছু কম বেশি না করে। বরং আদান-প্রদানকারী একমত হয়ে যা তাকে লিখতে বলবে ঠিক তাই যেন সে লিখে দেয়। যেমন তার প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ রয়েছে যে, তিনি তাকে লিখা–পড়া শিখিয়েছেন, তেমনই যারা লিখা-পড়া জানেনা তাদের প্রতি সেও যেন অনুগ্রহ প্রদর্শন করে তাদের আদান প্রদান ঠিকভাবে লিখে দেয়। হাদীসে রয়েছে ঃ

'কোন কার্যরত ব্যক্তিকে সাহায্য করা এবং কোন অক্ষম ব্যক্তির কাজ করে দেয়াও সাদাকাহ।' (ফাতহুল বারী ৫/১৭৬) অন্য হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যে বিদ্যা জেনে তা গোপন করে, কিয়ামাতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পড়ানো হবে।' (তাবারানী ৫/১১)

মুজাহিদ (রহঃ) এবং 'আতা (রহঃ) বলেন ঃ 'এই আয়াতের ধারা অনুসারে লিখে দেয়া লেখকের উপর ওয়াজিব।' লিখিয়ে নেয়ার দায়িত্ব যার উপর রয়েছে সে যেন হক ও সত্যের সঙ্গে লিখিয়ে নেয় এবং আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে যেন বেশী-কম না করে এবং বিশ্বাসঘাতকতা না করে। যদি এই লোকটি অবুঝ হয়, দুর্বল হয়, নাবালক হয়, জ্ঞান ঠিক না থাকে কিংবা নির্বুদ্ধিতার কারণে লিখিয়ে নিতে অসমর্থ হয় তাহলে তার অভিভাবক ও জ্ঞানী ব্যক্তি লিখিয়ে নিবে।

চুক্তি লিখার সময় সাক্ষীর উপস্থিত থাকতে হবে

অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ চুক্তি লিখার সাথে সাথে সাক্ষ্যও হতে হবে, যেন এই আদান-প্রদানের ব্যাপারটি খুবই শক্ত ও পরিষ্কার হয়ে যায়। 'তোমরা দু'জন পুরুষ লোককে সাক্ষী করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَان যদি দু'জন পুরুষ পাওয়া না যায় তাহলে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রী হলেও চলবে। এই নির্দেশ ধন-সম্পদের ব্যাপারে এবং সম্পদের উদ্দেশের ব্যাপারে রয়েছে। স্ত্রী লোকের জ্ঞানের স্বল্পতার কারণেই দু'জন স্ত্রী লোককে একজন পুরুষের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। যেমন সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'হে মহিলারা! তোমরা দান-খাইরাত কর এবং খুব বেশি আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। আমি জাহান্নামে তোমাদেরই সংখ্যা বেশি দেখেছি।' এক মহিলা বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এর কারণ কি?' তিনি বললেন ঃ

'তোমরা খুব বেশি অভিশাপ দিয়ে থাক এবং তোমাদের স্বামীদের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক। তোমাদের জ্ঞান ও দীনের স্বল্পতা সত্ত্বেও পুরুষদের জ্ঞান হরণকারিণী তোমাদের অপেক্ষা বেশি আর কেহ নেই।' সে পুনরায় জিজ্ঞেস করে, 'দীন ও জ্ঞানের স্বল্পতা কিরূপে?' তিনি উত্তরে বলেন ঃ

'জ্ঞানের স্বল্পতা তো এর দ্বারাই প্রকাশিত হয়েছে যে, দু'জন স্ত্রী লোকের সাক্ষ্য একজন পুরুষ লোকের সাক্ষ্যের সমান; আর দীনের স্বল্পতা এই যে, তোমাদের মাসিক অবস্থায় তোমরা সালাত আদায় করনা ও সিয়াম কাযা করে থাক।' (মুসলিম ১/৮৭) সাক্ষীদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ

مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى

তাদের ন্যায়পরায়ণ হওয়া শর্ত। যারা ন্যায়পরায়ণ নয় তাদের সাক্ষ্য যারা প্রত্যাখ্যান করেছেন, এই আয়াতটিই তাদের দলীল। তারা বলেন যে, সাক্ষীগণকে অবশ্যই ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। দু'জন স্ত্রী লোক নির্ধারণ করারও দূরদর্শিতা বর্ণনা করা হয়েছে যে, যদি একজন ভুলে যায় তাহলে অপরজন তাকে স্মরণ করিয়ে দিবে। *ফাতুজাক্কিরা* শব্দটি অন্য পঠনে *ফাতুজাক্বিরু* রয়েছে।

যারা বলেন যে, একজন মহিলার সাক্ষ্য যদি অন্য মহিলার সাক্ষ্যের সাথে মিলে যায় তখন তা পুরুষ লোকের সাক্ষ্যের মতই হয়ে যায়, এটা তাদের মন

গড়া কথা। প্রথম উক্তিটিই সঠিক। বলা হচ্ছে, সাক্ষীদেরকে ডাকা হলে তারা যেন অস্বীকার না করে অর্থাৎ যখন তাদেরকে বলা হবে তোমরা এসো ও সাক্ষ্য প্রদান কর, তখন তারা যেন অস্বীকৃতি জ্ঞাপন না করে। যেমন লেখকদের ব্যাপারেও এটাই বলা হয়েছে। এখান থেকে এই উপকারও লাভ করা যাচ্ছে যে, সাক্ষী থাকা ফার্‌যে কিফায়া। 'জমহুরের মাযহাব এটাই' এ কথাও বলা হয়েছে। (তাবারী ৬/৬৮)

এই অর্থও বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন সাক্ষীদেরকে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য ডাকা হবে অর্থাৎ যখন তাদেরকে ঘটনা জিজ্ঞেস করা হবে তখন যেন তারা সাক্ষ্য দেয়ার কাজ হতে বিরত না থাকে। আবূ মুজাল্লায (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) প্রমুখ মনীষীগণ বলেন যে, যখন সাক্ষী হওয়ার জন্য কেহকে ডাকা হবে তখন তার সাক্ষী হওয়ার বা না হওয়ার অধিকার রয়েছে। কিন্তু সাক্ষী হয়ে যাওয়ার পর সাক্ষ্য প্রদানের জন্য আহ্বান করা হলে অবশ্যই যেতে হবে। (তাবারী ৬/৭১, ইবন আবী হাতিম ৩/১১৮১) সহীহ মুসলিম ও সুনানের হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'উত্তম সাক্ষী তারাই যারা সাক্ষ্য না চাইতেই (সত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে) সাক্ষ্য দেয়।' সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, 'জঘন্যতম সাক্ষী তারাই যাদের নিকট সাক্ষ্য না চাইতেই (মিথ্যা) সাক্ষ্য দেয়।' অন্য একটি হাদীসে রয়েছে ঃ 'এমন লোক আসবে যাদের শপথ সাক্ষ্যের উপর ও সাক্ষ্য শপথের উপর অগ্রে অগ্রে থাকবে। এতে জানা যাচ্ছে যে, এসব নিন্দাসূচক কথা মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারী সম্বন্ধেই বলা হয়েছে এবং উপরের ঐ প্রশংসামূলক কথা সত্য সাক্ষ্য প্রদানকারী সম্বন্ধে বলা হয়েছে। এভাবেই এই পরস্পর বিরোধী হাদীসগুলির মধ্যে অনুরূপতা দান করা হবে। এই হাদীসসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ মনীষী বলেন, 'সাক্ষ্য দিতে ও সাক্ষী হতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা উচিত নয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِه বিষয় বড়ই হোক আর ছোটই হোক, সময়ের মেয়াদ ইত্যাদি লিখে নাও। আমার এই নির্দেশ ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী এবং সাক্ষ্যের সঠিকতা সাব্যস্তকারী।' কেননা নিজের লিখা দেখে বিস্মৃত কথাও স্মরণ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে লিখা না থাকলে ভুল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা হয়ে থাকে। লিখা থাকলে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকেনা। কেননা মতানৈক্যের সময় লিখা দেখে নিঃসন্দেহে মীমাংসা করা যেতে পারে। এরপর বলা হচ্ছে ঃ

إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا যদি নগদ ক্রয়-বিক্রয় হয় তাহলে বিবাদের কোন সম্ভাবনা নেই বলে না লিখলেও কোন দোষ নেই। এখন রইলো সাক্ষ্য। এ ব্যাপারে সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (রহঃ) বলেন যে, ধার হোক আর নগদই হোক সর্বাবস্থায়ই সাক্ষী রাখতে হবে। অন্যান্য মনীষী হতে বর্ণিত আছে, فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ এ কথা বলে আল্লাহ তা'আলা সাক্ষ্য প্রদানের নির্দেশও উঠিয়ে নিয়েছেন। এটাও মনে রাখার বিষয় যে, জামহুরের মতে এই নির্দেশ ওয়াজিবের জন্য নয়, বরং এর মধ্যে মঙ্গল নিহিত আছে বলে মুস্তাহাব হিসাবে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর দলীল হচ্ছে নিম্নের হাদীসটি যা খুযাইমাহ ইব্ন সাবীত আল আনসারী (রহঃ) থেকে ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। উমারাহ ইব্ন খুযাইমাহ আল আনসারী (রহঃ) বলেন, তার চাচা যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন সাহাবী ছিলেন, তিনি বলেন যে, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক বেদুঈনের সাথে একটি ঘোড়া কেনার ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেদুঈনকে তাঁর পিছন পিছন চলে আসতে (বাড়ীতে) বলেন যাতে তিনি তার ঘোড়ার দাম দিয়ে দিতে পারেন। বেদুঈনটি মূল্য নেয়ার উদ্দেশে তাঁর পিছনে পিছনে তাঁর বাড়ীর দিকে আসে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব দ্রুত চলছিলেন এবং বেদুঈনটি ধীরে ধীরে চলছিল। ঘোড়াটি যে বিক্রি হয়ে গেছে এ সংবাদ জনগণ জানতনা বলে তারা ঐ ঘোড়ার দাম করতে থাকে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ঘোড়াটি যে দামে বিক্রি করেছিল তার চেয়ে বেশি দাম উঠে যায়। বেদুঈন নিয়াত পরিবর্তন করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডাক দিয়ে বলে ঃ 'জনাব, আপনি হয় ঘোড়াটি ক্রয় করুন, না হয় আমি অন্যের হাতে বিক্রি করে দেই।' এ কথা শুনে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেমে যান এবং বলেন ঃ 'তুমি তো ঘোড়াটি আমার কাছে বিক্রি করেই ফেলেছ; সুতরাং এখন আবার কি বলছ?' বেদুঈনটি তখন বলে ঃ 'আল্লাহর শপথ! আমি বিক্রি করিনি।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমার ও আমার মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় হয়ে গেছে।' এখন এদিক ওদিক থেকে লোক এ কথা ও কথা বলতে থাকে। ঐ

নির্বোধ তখন বলে, আমি আপনার নিকট বিক্রি করেছি তার সাক্ষী নিয়ে আসুন। মুসলিমগণ তাকে বারবার বলে, ওরে হতভাগা! তিনি তো আল্লাহর রাসূল, তাঁর মুখ দিয়ে তো সত্য কথাই বের হয়। কিন্তু তার ঐ একই কথা, সাক্ষ্য নিয়ে আসুন। এ সময় খুযাইমা (রাঃ) এসে পড়েন এবং বেদুঈনের কথা শুনে বলেন ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ঘোড়াটি বিক্রি করেছ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেন, তুমি কি করে সাক্ষ্য দিচ্ছ? তিনি বলেন, আপনার সত্যবাদিতার উপর ভিত্তি করে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

‘আজ খুযাইমার (রাঃ) সাক্ষ্য দু’জন সাক্ষীর সাক্ষ্যের সমান। (আহমাদ ৫/২১৫, আবূ দাঊদ ৪/৩১, নাসাঈ ৭/৩০১) সুতরাং এই হাদীস দ্বারা ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা প্রমাণিত হয়না। কিন্তু মঙ্গল ওর মধ্যেই রয়েছে যে, ব্যবসা বাণিজ্যেরও সাক্ষী রাখতে হবে। এর পর বলা হচ্ছে ঃ

وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ যা লিখিয়ে নিচ্ছে লেখক যেন তার বিপরীত কথা না লিখে। অনুরূপভাবে সাক্ষীরও উচিত যে, সে যেন মূল ঘটনার উল্টা সাক্ষ্য না দেয় অথবা সাক্ষ্য প্রদানে কার্পণ্য না করে। হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ মনীষীর এটাই উক্তি। (তাবারী ৬/৮৫, ৮৬) অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ আমি যা করতে নিষেধ করি তা করা এবং যা করতে বলি তা হতে বিরত থাকা চরম অন্যায়। এর শাস্তি তোমাদেরকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে। এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ তোমরা প্রতিটি কাজে আল্লাহ তা‘আলার কথা স্মরণ করে তাঁকে ভয় করে চল, তাঁর আদেশ পালন কর এবং তাঁর নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাক। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا

হে মু’মিনগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর তাহলে তিনি তোমাদেরকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার একটি মান নির্ণায়ক শক্তি দান করবেন। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ২৯) অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَءَامِنُوا۟ بِرَسُولِهِۦ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِۦ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِۦ

হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তিনি তাঁর অনুগ্রহে তোমাদেরকে দিবেন দ্বিগুণ পুরস্কার এবং তিনি তোমাদেরকে দিবেন আলো, যার সাহায্যে তোমরা চলবে। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ২৮) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ কার্যসমূহের পরিণাম এবং গূঢ় রহস্য সম্পর্কে, ঐগুলির মঙ্গল ও দূরদর্শিতা সম্পর্কে আল্লাহ সম্পূর্ণ সজাগ রয়েছেন। কোন কিছুই তাঁর দৃষ্টির অন্তরালে নেই; তাঁর জ্ঞান সারা জগৎকে ঘিরে রয়েছে এবং প্রত্যেক জিনিসেরই প্রকৃত জ্ঞান তাঁর রয়েছে।

٢٨٣. وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَـٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

২৮৩। এবং যদি তোমরা প্রবাসে থাক ও লেখক না পাও তাহলে বন্ধকী বস্তু নিজের দখলে রাখ। অতঃপর কেহ যদি কেহকে বিশ্বাস করে তাহলে যাকে বিশ্বাস করা হয়েছে তার পক্ষে গচ্ছিত দ্রব্য প্রত্যর্পণ করা উচিত এবং স্বীয় রাব্ব আল্লাহকে ভয় করা উচিৎ। সাক্ষ্য গোপন করনা; এবং যে কেহ তা গোপন করবে, নিশ্চয়ই তার মন পাপাচারী; বস্তুতঃ আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত।

বন্ধক রাখার ব্যাপারে কুরআনের আদেশ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ সফর অবস্থায় যদি ধারের আদান-প্রদান হয় এবং কোন লেখক পাওয়া না যায় অথবা কলম, কালি, কাগজ ইত্যাদি না থাকে তাহলে বন্ধক রাখ এবং যে জিনিস বন্ধক রাখবে তা ঋণ দাতার অধিকারে দিয়ে দাও। مَقْبُوْضَةَ শব্দ দ্বারা এই দলীল গ্রহণ করা হয়েছে যে, বন্ধক যে পর্যন্ত অধিকারে না আসবে সেই পর্যন্ত তা অপরিহার্য হবেনা। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়া হতে চির বিদায় গ্রহণ করেন তখন তাঁর লৌহ বর্মটি আবুশ শাহাম নামক একজন ইয়াহুদীর নিকট ত্রিশ ‘ওয়াসাক’ (প্রায় ১৮০ কেজি) বার্লির বিনিময়ে বন্ধক ছিল, যে যব তিনি স্বীয় পরিবারের খাবারের জন্য গ্রহণ করেছিলেন। অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, ঐ ইয়াহুদীটি ছিল মাদীনায় অবস্থান করা এক ইয়াহুদী। (ফাতহুল বারী ৪/৩৫৪, মুসলিম ৩/১২২৬) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ যদি তোমাকে কেহ বিশ্বাস করে তাহলে তোমার উচিত সেই বিশ্বাসের মূল্য দেয়া। অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ পাওনাদারের উচিত আল্লাহকে ভয় করা যে, তিনি সব কিছু জানেন ও লক্ষ্য করছেন যে, কে কি ধরণের আচরণ করছে। ইমাম আহমাদ (রহঃ) এবং সুনানে বর্ণিত হয়েছে, কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন, সামুরাহ (রাঃ) বলেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

‘ঋণ গ্রহীতা যে ঋণ নিয়ে থাকে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত তার হাত তা (ঋণের বোঝা) বহন করে বেড়াবে।’ (আহমাদ ৫১৩, আবূ দাঊদ ৩/৮২২, তিরমিযী ৪/৪৮২, নাসাঈ ৩/৪১১, ইব্ন মাজাহ ২/৮০২) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ ‘সাক্ষ্য গোপন করনা, বিশ্বাস ভঙ্গ করনা এবং তা প্রকাশ করা হতে বিরত হয়োনা। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ মনীষী বলেন যে, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া এবং সাক্ষ্যকে গোপন করা বড় পাপ (কবিরা পাপ)। সুদ্দী (রহঃ) মন্তব্য করেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে, সে তার মনে পাপ পুষিয়ে রেখেছে। (তাবারী ৬/১০০) এখানেও বলা হচ্ছে যে, সাক্ষ্য গোপনকারীর মন পাপাচারী। অন্যস্থানে রয়েছে ঃ

وَلَا نَكۡتُمُ شَهَـٰدَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذٗا لَّمِنَ ٱلۡأٓثِمِينَ

আল্লাহর সাক্ষ্যকে আমরা গোপন করবনা, (যদি এরূপ করি তাহলে) এমতাবস্থায় আমরা ভীষণ পাপী হব। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১০৬) অন্যত্র রয়েছে ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ إِن يَكُنۡ غَنِيًّا أَوۡ فَقِيرٗا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْۚ وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا

‘হে মু’মিনগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে সাক্ষ্য দানকারী, সুবিচার প্রতিষ্ঠাকারী হও এবং যদিও এটা তোমাদের নিজের অথবা মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতিকূল হয়, যদি সে সম্পদশালী কিংবা দরিদ্র হয় তাহলে আল্লাহই তাদের জন্য যথেষ্ট; অতএব সুবিচারে স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করনা, আর তোমরা যদি ঘুরিয়ে পেচিয়ে কথা বল কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কর্মের পূর্ণ সংবাদ রাখেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৩৫)

٢٨٤. لِّلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ وَإِن تُبۡدُواْ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ أَوۡ تُخۡفُوهُ يُحَاسِبۡكُم بِهِ ٱللَّهُۖ فَيَغۡفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ

২৮৪। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহর এবং তোমাদের অন্তরে যা রয়েছে তা প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখ, আল্লাহ তার হিসাব তোমাদের নিকট হতে গ্রহণ করবেন; অতঃপর তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন; এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়োপরি শক্তিমান।

বান্দা যদি মনে মনে কিছু ভাবে সে জন্য কি সে দায়ী হবে

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনিই হচ্ছেন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের একচ্ছত্র অধিপতি। ছোট, বড়, প্রকাশ্য, গোপনীয় বিষয়সমূহের হিসাব গ্রহণকারী। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

قُلْ إِن تُخْفُوا۟ مَا فِى صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ۗ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

'*তুমি বল ঃ তোমাদের অন্তরসমূহে যা রয়েছে তা তোমরা গোপন কর অথবা প্রকাশ কর আল্লাহ তা অবগত আছেন।* (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ২৯) অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى

তিনি গোপনীয় ও প্রকাশ্য বিষয়সমূহ খুব ভাল জানেন। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৭) এই অর্থ সম্বলিত আরও বহু আয়াত রয়েছে। এখানে ওর সাথে এটাও বলেছেন যে, তিনি তার হিসাব গ্রহণ করবেন। এই আয়াতটি (২ ঃ ২৮৪) অবতীর্ণ হলে সাহাবীগণের (রাঃ) উপর এটা খুব কঠিন বোধ হয় যে, ছোট বড় সমস্ত জিনিসের আল্লাহ তা'আলা হিসাব গ্রহণ করবেন। সুতরাং তাদের ঈমানের দৃঢ়তার কারণে তারা কম্পিত হন। তাই তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বসে পড়েন এবং বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদেরকে সালাত, সিয়াম, জিহাদ এবং দানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যা আমাদের সাধ্যের মধ্যে রয়েছে; কিন্তু এখন যে আয়াত অবতীর্ণ হল তা পালন করার শক্তি আমাদের নেই।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

'তোমরা কি ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের মত বলতে চাও যে, আমরা শুনলাম ও মানলামনা? তোমাদের বলা উচিত, আমরা শুনলাম ও মানলাম। হে আল্লাহ, আমরা আপনার দয়া কামনা করছি। হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে তো আপনার নিকটই ফিরে যেতে হবে।' অতঃপর সাহাবীগণ (রাঃ) এ কথা মেনে নেন এবং তাদের মুখে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিখিয়ে দেয়া কথাগুলি উচ্চারিত হতে থাকে। তখন আল্লাহ নিম্নের আয়াতাংশ নাযিল করেন ঃ

ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَـٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّن رُّسُلِهِۦۚ وَقَالُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۖ غُفۡرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيۡكَ ٱلۡمَصِيرُ

রাসূল তার রাব্ব হতে তার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা বিশ্বাস করে এবং মু'মিনগণও (বিশ্বাস করে); তারা সবাই আল্লাহকে, তাঁর মালাইকাকে, তাঁর গ্রন্থসমূহকে এবং তাঁর রাসূলগণকে বিশ্বাস করে; (তারা বলে) আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কেহকেও পার্থক্য করিনা, এবং তারা বলে, আমরা শুনলাম; স্বীকার করলাম। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ২৮৪ নং আয়াতটি বাতিল করেন এবং

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَا

কোন ব্যক্তিকেই আল্লাহ তার সাধ্যের অতিরিক্ত কর্তব্য পালনে বাধ্য করেননা; সে যা উপার্জন করেছে তা তারই জন্য এবং যা সে অর্জন করেছে তা তারই উপর বর্তাবে। হে আমাদের রাব্ব! আমরা যদি ভুলে যাই অথবা ভুল করি সেজন্য আমাদেরকে অপরাধী করবেননা। আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। (আহমাদ ২/৪১২) ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা এই কষ্ট উঠিয়ে দিয়ে উপরোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। মুসলিমগণ যখন বলেন ঃ

رَبَّنَا وَلَا تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إِصۡرٗا كَمَا حَمَلۡتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِنَا

হে আমাদের রাব্ব! আমরা যদি ভুলে যাই অথবা ভুল করি সেজন্য আমাদেরকে অপরাধী করবেননা। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হ্যাঁ, 'আমি এটাই করব।' মুসলিমগণ বলেন ঃ

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلۡنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ

হে আমাদের রাব্ব! আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেরূপ গুরুভার অর্পণ করেছিলেন আমাদের উপর তদ্রূপ ভার অর্পণ করবেননা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'এটা কবূল করা হল।' অতঃপর মুসলিমগণ বলেন ঃ

وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ ۚ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ

এবং আমাদের পাপ মোচন করুন ও আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আমাদেরকে দয়া করুন, আপনিই আমাদের আশ্রয়দাতা! অতএব কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে জয়যুক্ত করুন। এটাও আল্লাহ তা'আলা কবূল করেন। (মুসলিম ১/১১৫) এই হাদীসটি আরও বহু পন্থায় বর্ণিত হয়েছে।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, আমি ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) নিকট ঘটনা বর্ণনা করি যে, وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ এই আয়াতটি পাঠ করে আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) খুবই ক্রন্দন করেছেন। তখন ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার সময় সাহাবীগণের (রাঃ) এই অবস্থাই হয়েছিল, তারা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন এবং তারা এই কথাও বলেছিলেন, 'অন্তরের মালিক তো আমরা নই। সুতরাং অন্তরের ধারণার জন্যও যদি আমাদেরকে ধরা হয় তাহলে তো খুব কঠিন ব্যাপার হবে।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন ঃ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا বল।' সাহাবীগণ এই কথাই বললেন। অতঃপর পরবর্তী আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়। এই আয়াতগুলি দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, কার্যাবলীর জন্য ধরা হবে বটে; কিন্তু মনের ধারণা ও সংশয়ের জন্য ধরা হবেনা।' অন্য ধারায় এই বর্ণনাটি ইব্ন মারজানা (রহঃ) হতেও এভাবে বর্ণিত আছে। তাতে এও রয়েছে, কুরআন ফাইসালা করে দিয়েছে যে, তোমাদেরকে তোমাদের সৎ ও অসৎ কাজের উপর ধরা হবে, তা মুখের দ্বারাই হোক অথবা অন্য অঙ্গের দ্বারাই হোক। কিন্তু মনের সংশয় ক্ষমা করে দেয়া হল। আরও বহু সাহাবী (রাঃ) ও তাবেঈ (রহঃ) দ্বারা এর রহিত হওয়া সাব্যস্ত হয়েছে। (আহমাদ ১/৩৩২) সহীহ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মাতের মনের ধারণা ও সংশয় ক্ষমা করেছেন। তারা যা বলবে বা করবে তার উপরেই তাদেরকে ধরা হবে। (ফাতহুল বারী ৯/৩০০, মুসলিম ১/১১৭, আবূ দাউদ ২/৬৫৭, তিরমিযী ৪/৩৬১, নাসাঈ

৬/১৫৬, ইবন মাজাহ ১/৬৫৮) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা মালাইকাকে বলেন ঃ

‘যখন আমার বান্দা খারাপ কাজের ইচ্ছা পোষণ করে তখন তা লিখনা, যে পর্যন্ত না সে করে বসে। যদি করেই ফেলে তাহলে একটি পাপ লিখ। আর যখন সে সৎকাজের ইচ্ছা করে তখন শুধু ইচ্ছার জন্যই একটি সাওয়াব লিখ এবং যখন করে ফেলবে তখন একের বিনিময়ে দশটি সাওয়াব লিখে নাও। (ফাতহুল বারী ১৩/৪৭৩, মুসলিম ১/১১৭)

২৮৫। রাসূল তার রাব্ব হতে তার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা বিশ্বাস করে এবং মু’মিনগণও বিশ্বাস করে। তারা সবাই আল্লাহকে, তাঁর মালাইকাকে, তাঁর গ্রন্থসমূহকে এবং তাঁর রাসূলগণকে বিশ্বাস করে; আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কেহকেও পার্থক্য করিনা। এবং তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং স্বীকার করলাম। হে আমাদের রাব্ব! আমরা আপনারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনারই দিকে শেষ প্রত্যাবর্তন।	٢٨٥. ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِۦ ۚ وَقَالُوا۟ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ
২৮৬। কোন ব্যক্তিকেই আল্লাহ তার সাধ্যের অতিরিক্ত কর্তব্য পালনে বাধ্য করেননা। সে যা উপার্জন করেছে তা তারই জন্য এবং যা সে অর্জন করেছে তা তারই উপর বর্তাবে। হে আমাদের রাব্ব! আমরা যদি	٢٨٦. لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ

إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إِصۡرًا كَمَا حَمَلۡتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلۡنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ ۖ وَٱعۡفُ عَنَّا وَٱغۡفِرۡ لَنَا وَٱرۡحَمۡنَآ ۚ أَنتَ مَوۡلَىٰنَا فَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ.	ভুলে যাই অথবা ভুল করি সেজন্য আমাদেরকে অপরাধী করবেননা। হে আমাদের রাব্ব! আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেরূপ গুরুভার অর্পণ করেছিলেন আমাদের উপর তদ্রুপ ভার অর্পণ করবেননা; হে আমাদের রাব্ব! যা আমাদের শক্তির বাইরে ঐরূপ ভার বহনে আমাদেরকে বাধ্য করবেননা, এবং আমাদের পাপ মোচন করুন ও আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আমাদেরকে দয়া করুন, আপনিই আমাদের আশ্রয়দাতা! অতএব কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে জয়যুক্ত করুন।

হে আল্লাহ! ২ ঃ ২৮৫-২৮৬ আয়াতের বদৌলতে আমাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন!

এই আয়াত দু'টির ফাযীলাতের বহু হাদীস রয়েছে। সহীহ বুখারীতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যে ব্যক্তি এ আয়াত দু'টি রাতে পাঠ করবে তার জন্য এ দু'টিই যথেষ্ট। সহীহ বুখারী ছাড়াও অন্যান্য পাঁচটি হাদীস গ্রন্থেও একই শব্দ প্রয়োগে বর্ণনা করা হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৬৭২, মুসলিম ১/৫৫৫, আবূ দাউদ ২/১১৮, তিরমিযী ৮/১৮৮, নাসাঈ ৫/১৪, ইব্ন মাজাহ ১/৪৩৫) সহীহায়েনে বিভিন্ন বরাতের মাধ্যমে হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৭/৩৬৯, ৮/৭১২, মুসলিম ১/৫৫৪, আহমাদ ৪/১১৮)

সহীহ মুসলিমে রয়েছে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিরাজে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তিনি সপ্তম আকাশে অবস্থিত সিদরাতুল মুনতাহায়

পৌঁছেন, যে জিনিস আকাশের দিকে উঠে যায় তা এই স্থান পর্যন্ত পৌঁছে থাকে ও এখান হতেই নিয়ে নেয়া হয় এবং যে জিনিস উপর থেকে নেমে আসে ওটাও এখান পর্যন্তই পৌঁছে থাকে। অতঃপর এখান হতেই নিয়ে নেয়া হয়। সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিনটি জিনিস দেয়া হয়। (১) পাঁচ ওয়াক্ত সালাত। (২) সূরা বাকারাহর শেষ আয়াতগুলি এবং (৩) একাত্মবাদীদের সমস্ত পাপের ক্ষমা। (মুসলিম ১/১৫৭)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ 'আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে বসেছিলাম এবং জিবরাঈলও (আঃ) তাঁর নিকট ছিলেন। এমন সময় আকাশ হতে এক ভয়াবহ শব্দ আসে। জিবরাঈল (আঃ) উপরের দিকে চক্ষু উত্তোলন করেন এবং বলেন ঃ আকাশের ঐ দরজাটি খুলে গেল যা আজ পর্যন্ত কোন দিন খুলেনি।' তথা হতে এক মালাক/ফেরেশতা অবতরণ করেন এবং নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ আপনি সন্তোষ প্রকাশ করুন! আপনাকে ঐ দু'টি নূর দেয়া হচ্ছে যা আপনার পূর্বে কোন নাবীকে দেয়া হয়নি। তা হচ্ছে সূরা ফাতিহা ও সূরা বাকারাহর শেষ আয়াত দু'টি। এগুলির প্রত্যেকটি অক্ষরের উপর আপনাকে নূর দেয়া হবে। (মুসলিম ১/৫৫৪, নাসাঈ ৫/১২) ইমাম নাসাঈর (রহঃ) বর্ণনায় এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

সূরা বাকারাহর শেষ দুই আয়াতের তাফসীর

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ তারা (প্রত্যেক মু'মিন) সবাই আল্লাহকে, তাঁর মালাইকাকে, তাঁর গ্রন্থসমূহকে এবং তাঁর রাসূলগণকে বিশ্বাস করে থাকে; (তারা বলে) আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কেহকেও পার্থক্য করিনা' অর্থাৎ প্রত্যেক মু'মিন এ বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ এক এবং একক, তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন।

তিনি ছাড়া কেহ উপাসনার যোগ্য নেই এবং তিনি ছাড়া কেহ পালনকর্তাও নেই। এই মু'মিনরা সমস্ত নাবীকেই (আঃ) স্বীকার করে। তারা সমস্ত রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, ঐ আসমানী কিতাবসমূহকে সত্য বলে বিশ্বাস করে যেগুলি নাবীগণের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। তারা নাবীগণের (আঃ) মধ্যে কোন পার্থক্য করেনা। অর্থাৎ কেহকে মানবে এবং কেহকে মানবেনা তা নয়। বরং সকলকেই সত্য বলে স্বীকার করে এবং বিশ্বাস রাখে যে, তাঁরা সবাই সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং মানুষকে ন্যায়ের দিকে আহ্বান করতেন। তবে কোন কোন আহকাম প্রত্যেক নাবীর যুগে পরিবর্তিত হত বটে, এমনকি

শেষ পর্যন্ত শেষ নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শারীয়াত সকল শারীয়াতকে রহিতকারী হয়ে যায়। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সর্বশেষ নাবী ও সর্বশেষ রাসূল। কিয়ামাত পর্যন্ত তাঁর শারীয়াত বাকী থাকবে এবং একটি দল তাঁর অনুসরণও করতে থাকবে। وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا তারা স্বীকারও করে, আমরা আল্লাহর কালাম শুনলাম এবং তাঁর নির্দেশাবলী আমরা অবনত মাথায় স্বীকার করে নিলাম। তারা বলল ঃ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا হে আমাদের প্রভু! আপনারই নিকট আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন। অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন আপনারই নিকট আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। জিবরাঈল (আঃ) বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এখানে আপনার ও আপনার অনুসারী উম্মাতের প্রশংসা করা হচ্ছে। এই সুযোগে আপনি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করুন, তা গৃহীত হবে এবং তাঁর নিকট যাঞ্চা করুন যে, তিনি যেন সাধ্যের অতিরিক্ত কষ্ট না দেন।' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا কোন ব্যক্তিকেই আল্লাহ তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত কর্তব্য পালনে বাধ্য করেননা। এটা বান্দার প্রতি মহান আল্লাহর করুণা ও অনুগ্রহ।

সাহাবীগণের (রাঃ) মনে পূর্ববর্তী আয়াতের (২৮৪) জন্য যে চিন্তা জেগেছিল এবং আল্লাহ তা'আলা মনের ধারণার জন্যও যে হিসাব নিবেন তা তাদের কাছে যে খুব কঠিন ঠেকেছিল, আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত (২৮৫) দ্বারা তা নিরসন করেন। ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা হিসাব গ্রহণ করবেন বটে, কিন্তু সাধ্যের অতিরিক্ত কাজের জন্য তিনি শাস্তি প্রদান করবেননা। কেননা মনে হঠাৎ কোন ধারণা এসে যাওয়াটা রোধ করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। বরং হাদীসে তো এটাও এসেছে যে, এরূপ ধারণাকে খারাপ মনে করাও ঈমানের পরিচায়ক।

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ নিজ নিজ কর্মের ফল সকলকেই ভোগ করতে হবে। ভাল কাজ করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে এবং মন্দ কাজের ফল মন্দ হবে। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে প্রার্থনা শিখিয়ে দিচ্ছেন এবং তা কবূল করারও তিনি অঙ্গীকার করছেন। বান্দা প্রার্থনা করছে ঃ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا হে আমাদের রাব্ব! যদি আমাদের ভ্রম

অথবা ত্রুটি হয় তজ্জন্যে আমাদেরকে ধরবেননা। অর্থাৎ যদি ভুল বশতঃ কোন নির্দেশ পালনে আমরা ব্যর্থ হই অথবা কোন মন্দ কাজ করি কিংবা শারীয়াত বিরোধী কোন কাজ আমাদের দ্বারা সম্পন্ন হয় তাহলে আমাদেরকে তজ্জন্য পাকড়াও না করে দয়া করে ক্ষমা করুন। ’ইতোপূর্বে সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহর (রাঃ) উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণিত হয়েছে যে, এই প্রার্থনার উত্তরে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, আমি এটা কবূল করেছি। (মুসলিম ১/১১৫) অন্য হাদীসে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আমার উম্মাতের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করা হয়েছে এবং জোরপূর্বক যে কাজ করিয়ে নেয়া হয় তজ্জন্যও ক্ষমা রয়েছে।’ (মুসলিম ১/১১৬) আরও বলা হয়েছে ঃ رَبَّنَا وَلاَ تَحمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا হে আল্লাহ! আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেরূপ গুরুভার অর্পণ করেছিলেন আমাদের উপর তদ্রূপ গুরুভার অর্পণ করবেননা। আল্লাহ তা‘আলা তাদের এই প্রার্থনাও কবূল করেন। হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আমি শান্তিপূর্ণ ও সহজ ধর্ম নিয়ে প্রেরিত হয়েছি।’ (আহমাদ ৫/২৬৬) رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ হে আমাদের রাব্ব! যা আমাদের সাধ্যের বাইরে এরূপ কার্যভার বহনে আমাদেরকে বাধ্য করবেননা। এই প্রার্থনার উত্তরেও আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে মঞ্জুরী ঘোষিত হয়। (ইবন আবী হাতিম ৩১২৩৫) وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আমাদেরকে মার্জনা করুন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন। অর্থাৎ আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করুন, অমাদের পাপসমূহ মার্জনা করুন, আমাদের অসৎকার্যাবলী গোপন রাখুন এবং আমাদের উপর সদয় হউন যেন পুনরায় আমাদের দ্বারা আপনার অসন্তুষ্টির কোন কাজ সাধিত না হয়। এ জন্য মনীষীদের উক্তি রয়েছে যে, পাপীদের জন্য তিনটি জিনিসের প্রয়োজন। (১) যে বিষয়টি আল্লাহ ও তাদের মাঝে সাব্যস্ত তা ক্ষমা করে দেয়া (২) তারা যে ভুল করেছে তা যেন অন্যান্য বান্দা থেকে আল্লাহ গোপন রাখেন এবং (৩) ভবিষ্যতে তারা যাতে আর পাপ কাজ না করে সেই জন্য আল্লাহ যেন তাদেরকে হিফাযাত করেন। এর উপরও আল্লাহ তা‘আলার মঞ্জুরী ঘোষিত হয়। أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ আপনিই আমাদের সাহায্যকারী, আপনার

উপরেই আমাদের ভরসা, আপনার নিকটই আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি, আপনিই আমাদের আশ্রয়স্থল। আপনার সাহায্য ছাড়া না আমরা অন্য কারও সাহায্য পেতে পারি, না কোন মন্দ কাজ হতে বিরত থাকতে পারি। আপনি আমাদেরকে ঐ লোকদের উপর সাহায্য করুন যারা আপনার মনোনীত ধর্মের বিরোধী, যারা আপনার একাত্মবাদে বিশ্বাসী নয়, যারা আপনার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতকে অস্বীকার করে, যারা আপনার ইবাদাতে অন্যদেরকে অংশীদার করে; আপনি আমাদেরকে তাদের উপর জয়যুক্ত করুন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে আমাদেরকে তাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করুন। আল্লাহ তা'আলা এর উত্তরেও বলেন ঃ হ্যাঁ আমি করব। অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ হ্যাঁ, আমি এটাও করলাম। মু'আজ (রাঃ) এই আয়াতটি শেষ করে আমীন বলতেন। (তাবারী ৬/১৪৬)

সূরা বাকারাহর তাফসীর সমাপ্ত।